চার্বাকের খোঁজে

ভারতীয় দর্শন

রণদীপম বসু

| চার্বাকের খোঁজে-....| পাঠসূচি |
-রণদীপম বসু
-....
ভারতীয় দর্শন (Indian Philosophy) বলতে আমরা এমন এক আধ্যাত্মিক দর্শনের জগতকে বুঝে থাকি যেখানে প্রায় সবগুলো দর্শনই বিপুলভাবে আধ্যাত্মবাদে পরিপূর্ণ। এই সর্বগ্রাসী আধাত্মবাদের বিপরীতে কেবল একটি মাত্র দর্শন যে তার বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী ধারায় একক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্র ধরে সেই প্রাচীনকাল থেকেই নিজের অবস্থানটিকে শক্ত করে ধরে রেখেছে তা হলো চার্বাক দর্শন (carvaka)। আধ্যাত্মবাদীরা যাকে 'নাস্তিক-শিরোমণি' নামে আখ্যায়িত করতে অভ্যস্ত, সেই চার্বাককে খোঁজার চিহ্নরেখা হিসেবে এই আপাত পাঠসূচি নির্ধারণ।
পথ চলতে চলতে এই সূচিপাঠে পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটতেই পারে, এবং অনেকগুলো সূচির ক্ষেত্রে যে আরো বেশকিছু শাখা-প্রশাখা গজিয়ে যাওয়াটাও খুব অস্বাভাবিক হবে না, তাও নিশ্চয় করে বলা যায়। তবে পথে নেমেছিই যখন, শেষ না-পেলেও গন্তব্য একটা তো হবেই। সে আশা বুকে ধরেই সময়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা।...
....
-পাঠসূচি-
....

...
[সহায়ক গ্রন্থসূচি...]

১.০ : ভূমিকা

...

ভারতীয় দর্শন বলতে আমরা এমন এক আধ্যাত্মিক দর্শনের জগতকে বুঝে থাকি যেখানে প্রায় সবগুলো দর্শনই বিপুলভাবে আধ্যাত্মবাদে পরিপূর্ণ। এই সর্বগ্রাসী আধাত্মবাদের বিপরীতে কেবল একটি মাত্র দর্শন যে তার বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী ধারায় একক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্র ধরে সেই প্রাচীনকাল থেকেই নিজের অবস্থানটিকে শক্ত করে ধরে রেখেছে তা হলো চার্বাক দর্শন (carvaka philosophy) ।

.

শুধু তাই নয়, ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির প্লাবনে ভেজা মাটিতে পাশাপাশি দাঁড়ানো এই মতবাদের বহমান অক্ষুণ্নতা স্বমহিমায় এতোটাই উজ্জ্বল যে, ভারতীয় দার্শনিকরা তাঁদের নিজ নিজ মতবাদকে সাজাতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রতিপক্ষের কাছ থেকে সম্ভাব্য আপত্তি অনুমান করে আগেভাগেই যুক্তি তর্কের সাহায্যে সেই আপত্তি খণ্ডনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। দু'পক্ষের দ্বন্দ্বময় যুক্তি আর পাল্টা যুক্তির যুযুধান স্রোতের বিপুল আয়োজনে ভারতীয় দর্শনের জগতটা তড়তড় করে এক সমৃদ্ধ অবস্থানে এগিয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে চার্বাক পক্ষের নিজেদের অবস্থানের জায়গাটা ঢাকা পড়ে গেছে এক রহস্যজনক অন্ধকারে। চার্বাকদের নিজস্ব রচনা সম্ভারগুলো দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিলুপ্ত এখন। তা কি যথোচিত সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে, না কি ক্ষমতাসীন প্রতিপক্ষের দুরভিসন্ধিমূলক অভিপ্রায়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে আমাদের জানার উপায় নেই। তবে বস্তুতই এ মতবাদ যে শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়াবার যোগ্যতা রাখে তা অপরপক্ষের সমরায়োজনের প্রস্তুতি থেকেই আমাদেরকে অনুমান করতে হয়। এই বিরুদ্ধপক্ষ কর্তৃক চার্বাক মতবাদকে ঠেকানো ও খণ্ডনের বিচিত্র প্রয়াস হিসেবে সেই দ্বন্দ্বপ্রসূত বিরোধী রচনাগুলোই চার্বাক মতবাদ জানার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য মহামূল্যবান উৎস হয়ে আছে আজো।

.

বিরুদ্ধপক্ষের নিজেদের অনুকুল দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উপস্থাপিত দর্শন-তত্ত্ব ও সাহিত্যে প্রতিপক্ষের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও মূলানুগ মতবাদ জানার প্রচেষ্টা কতোটা সন্দেহমুক্ত ও নির্ভরযোগ্য হবে তার আশঙ্কা প্রশ্নাতীত নয় যদিও, কিন্তু চার্বাকদের নিজস্ব সৃষ্টিসম্ভারের একান্তই অনুপস্থিতিতে এ ছাড়া আমাদের উপায়ও নেই। তাঁদের দর্শনসম্বন্ধীয় ধারণার জন্য অন্যের রচনার উপর এই নির্ভরতার কারণেই হয়তো চার্বাক মতের সুপ্রাচীন শক্তিটা অবিকৃতভাবে আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে না কখনোই। তবে যুক্তিশীল কল্পনা অবারিত করলে তা অনুমান করা মোটেও দুঃসাধ্য হবে না বলে বিশ্বাস। এই অনুমান যথাযথ করার নিমিত্তে ভারতীয় দর্শনের প্রাথমিক পরিচিতি ও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য জেনে রাখা আবশ্যক।

২.০ : ভারতীয় দর্শন-সূত্র

…

যদিও ‘Philosophy’ শব্দটিই ভারতবর্ষে দর্শন নামে পরিচিত, তবু এই Philosophy এবং দর্শন- শব্দ দুটি ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে সমার্থবোধক নয় এবং এদের উৎসও এক নয়। Philosophy শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হলো জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ (Love of wisdom), আর ভারতীয় দর্শনের বিষয় বা উদ্দেশ্য হলো সত্য বা তত্ত্বোপলব্ধি। ‘দর্শন’ কথাটার সাধারণ অর্থ হলো দেখা বা প্রত্যক্ষ করা। কিন্তু যে-কোন প্রকার দেখাকেই ‘দর্শন’ নামে অভিহিত করা যায় না। ভারতীয় মতে ‘দর্শন’ বলতে বোঝায় আত্মদর্শন, অর্থাৎ আত্মাকে দেখা বা জানা। এর অর্থ আত্মাকে উপলব্ধি করা। অতএব, দর্শন হলো সত্য বা তত্ত্বকে দেখা এবং তার স্বরূপ উপলব্ধি করা অর্থাৎ সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। আর যিনি সত্য বা তত্ত্বকে জীবনে উপলব্ধি করেছেন তিনিই সত্যদ্রষ্টা বা তত্ত্বজ্ঞানী দার্শনিক। এই হলো ভারতীয় দর্শনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

.

যদিও জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা শুধুমাত্র দর্শনেরই আলোচ্য বিষয় নয়, মানব-সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে বিজ্ঞান জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে দার্শনিক ব্যাখ্যার একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানশাস্ত্র কোন এক বিশেষ শ্রেণীর জাগতিক ঘটনার বা ঘটনাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু দর্শনের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর। দর্শনের জিজ্ঞাসা হলো হলো মানুষের স্বরূপের জিজ্ঞাসা, মানব জীবনের পরম লক্ষ্যের জিজ্ঞাসা, জগৎ-সৃষ্টির আদি রহস্যের জিজ্ঞাসা। মানুষ দেহ-ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিমাত্র কিনা কিংবা দৃশ্যমান জগৎ যথার্থই সত্য কিনা, দর্শন সে প্রশ্ন তুলেছে। যেহেতু মানুষ নিজেই তার নিজের সৃষ্টি-রহস্যের ব্যাখ্যা চেয়েছে, ফলে মানুষের ক্রিয়ার সঙ্গে সচেতনতা ও মননশীলতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই সে নিজেকেই প্রশ্ন করে- ‘আমি কে?’ এই ‘আমি’র জিজ্ঞাসা বিজ্ঞানের মধ্যে পাওয়ার কথা নয়। চার্বাক ছাড়া অন্যান্য দর্শন এই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে পরিদৃশ্যমান দেহ, ইন্দ্রিয় ও জাগতিক বস্তুর উর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় কোন পরম সত্তার উপলব্ধির কথা ঘোষণা করেছে। এই উপলব্ধি কেবলই অলৌকিকতার ব্যাপার নয়, এই উপলব্ধি সাধনালব্ধ হলেও তা বিচার ও মনননির্ভর।

ভারতীয় মুনি-ঋষিরা জগৎ ও জীবনের যে সত্যকে তাঁদের কথিত সাধনায় উপলব্ধি করেছেন তাকে তাঁরা সেভাবেই ব্যক্ত করেছেন বলে মনে করা হয়। মুনি-ঋষিদের এই তথাকথিত সাধনালব্ধ উপলব্ধির উপর নির্ভর করে সৃষ্ট হয়েছে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়। বলা হয়ে থাকে, এ সকল সম্প্রদায় একই পরম সত্যের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভাসিত করেছেন। তাই ভারতীয় দর্শন হলো জগৎ ও জীবনের পরম ও চরম উপলব্ধি। তবে সত্য উপলব্ধির দার্শনিক প্রপঞ্চে ভারতীয় দর্শন-চিন্তার ক্রমবিকাশে প্রধানত দুটি পরস্পর বিপরীত ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি হলো আস্তিক ধারা, অন্যটি নাস্তিকপন্থি।

বর্তমান প্রচলিত অর্থে যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাঁদেরকে আস্তিক এবং যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তাঁদেরকে নাস্তিক বলা হলেও প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে আস্তিক ও নাস্তিক শব্দদুটি বর্তমান অর্থে নয়, বরং এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

.

আস্তিক্য বনাম নাস্তিক্য :

আস্তিক ও নাস্তিক প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র সংশ্লিষ্ট ব্যাকরণসূত্র উল্লেখ করা যেতে পারে। পাণিনির প্রাচীনত্ব নিয়ে দ্বিমত না-থাকলেও তার আনুমানিক সময়কাল ধরা হয় খ্রীস্টপূর্ব ৬০০-৪০০ এর মধ্যে। পাণিনি তাঁর ব্যাকরণসূত্রে 'অস্তি নাস্তি দ্বিষ্টং মতিঃ'-এর মাধ্যমে দুটি বিপরীত মত-গোষ্ঠির উদ্ধৃতি টেনেছেন। এই সূত্রানুসারে 'দ্বিষ্টং পরলোকো অস্তি' অর্থাৎ পরলোক আছে এরূপ বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আস্তিক এবং 'দ্বিষ্টং পরলোকো নাস্তি' অর্থাৎ পরলোক নাই এরূপ বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নাস্তিক বলা হয়েছে।

.

পাণিনি সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যাকরণকার পতঞ্জলি (অনূ্যন খ্রীস্টপূর্ব ১৫০) তাঁর 'মহাভাষ্য' গ্রন্থে 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' শব্দের সংজ্ঞা সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করেছেন। পতঞ্জলির মতে 'অস্তি' বা 'আছে' এই ধারণার বশবর্তী লোকেরা আস্তিক এবং এর বিপরীত 'ন অস্তি' এই ধারণায় প্রভাবিত লোকেরা নাস্তিক পদের দ্বারা অভিধেয় (মহাভাষ্য ৪/৪/১)। অর্থাৎ আস্তিকেরা যে বিশেষ বস্তু বা ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সেগুলিকে স্বীকৃতি না-দেয়ার জন্য নাস্তিকেরা স্বতন্ত্র এক গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' এসবের বিস্তৃত বিবরণ না থাকলেও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে নাস্তিক শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরো কিছু আভাস পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে মহাভারত থেকে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে (১২/১২/৫, ১২/২৬৯/৬৭, ১২/২৭০/৬৭) নাস্তিকদের দ্বারা অস্বীকৃত বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে বৈদিক সমর্থনকে যুক্ত করার প্রয়াস দেখা যায়। যেমন-

বেদবাদাপবিদ্ধাংস্তু তান্ বিদ্ধি ভৃশনাস্তিকান্।
ন হি বেদোক্তমুৎসৃজ্য বিপ্রঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।। (মহাভারত : ১২/১২/৫)
দেবযানেন নাকস্য পৃষ্ঠমাপ্নোতি ভারত!।
অত্যাশ্রমানয়ং সর্ব্বানিত্যাহুর্বেদনিশ্চয়াঃ।। (মহাভারত : ১২/১২/৬)
ব্রাহ্মণাঃ শ্রুতিসম্পন্নাস্তান্নিবোধ নরাধিপ!।
বিত্তানি ধর্ম্মলব্ধানি ক্রতুমুখ্যেম্ববাসৃজন্।। (মহাভারত :১২/১২/৭)।

.

অর্থাৎ : সম্ভব থাকিলেও যাহারা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করে, আপনি তাহাদিগকে বেদবাক্য পরিত্যাগী অত্যন্ত নাস্তিক বলিয়া অবগত হউন। ৫।
ভরতনন্দন! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে বেদোক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেবযানে স্বর্গে যাইতে পারেন না। বিশেষতঃ বেদবিশ্বাসী লোকেরা এই গৃহস্থাশ্রমকে সমস্ত আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। ৬।

নরনাথ! যে সকল ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানসম্পন্ন, আপনি তাঁহাদিগকে জানিয়া রাখুন। যাঁহারা ন্যায়ার্জিত ধর্ম উত্তম যজ্ঞে বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই বেদজ্ঞঅন-সম্পন্ন। ৭।

.

এবং-

'নাস্তিক্যমন্যথা চ বেদানাং পৃষ্ঠতঃ ক্রিয়া।' (মহাভারত : ১২/২৬৯/৬৭)। ইত্যাদি।

অর্থাৎ : বেদের উপরে অবজ্ঞা করা এক প্রকার নাস্তিকতা। ইত্যাদি।

.

এছাড়া প্রাচীন গ্রন্থ মনুস্মৃতিও প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে। সেখানে স্পষ্ট দেখা যায়, মনুর মতে বেদনিন্দুকেরাই 'নাস্তিক' আখ্যায় অভিহিত হওয়ার যোগ্য-

যোহবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।

স সাধুভি র্বহিষ্কার্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।। ২ / ১১।। (মনুসংহিতা)।

অর্থাৎ : যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্র অর্থাৎ অসৎ-তর্ককে অবলম্বন ক'রে ধর্মের মূলস্বরূপ এই শাস্ত্রদ্বয়ের (শ্রুতি ও স্মৃতির) প্রাধান্য অস্বীকার করে (বা অনাদর করে), সাধু ব্যক্তিদের কর্তব্য হবে- তাকে সকল কর্তব্য কর্ম এবং সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা (অর্থাৎ অপাংক্তেয় ক'রে রাখা)। কারণ, সেই ব্যক্তি বেদের নিন্দাকারী, অতএব নাস্তিক।

.

বেদবিরোধী নাস্তিকদের কার্যকলাপে বৈদিক ঐতিহ্যের ধারক বাহক মনুর সমর্থন না থাকাই যে স্বাভাবিক তা মনুসংহিতার বিভিন্ন স্থানে নাস্তিকদের নির্দ্বিধ নিন্দা করার মধ্যেই পরিস্ফুট হয়। যেমন-

অনপেক্ষিতমর্যাদং নাস্তিকং বিপ্রলুম্পকম্ ।

অরক্ষিতারমত্তারং নৃপং বিদ্যাদধোগতিম্ ।। ৮/৩০৯।। (মনুসংহিতা)।

অর্থাৎ : যে রাজা শাস্ত্রবিধি ও শিষ্টাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মব্যবস্থা রক্ষা করেন না, কিন্তু নাস্তিক এবং অযথা অন্যায় অর্থদণ্ডাদির দ্বারা যিনি প্রজাবর্গের ধন হরণ করেন, যিনি প্রজাগণকে রক্ষা করেন না, অথচ যিনি সেই প্রজাদের দ্রব্য সমূহের অত্তা অর্থাৎ ভোগকারী, এইরকম রাজা নরকে পতিত হয়েছেন বলে বুঝতে হবে।

.

উল্লেখ্য, মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতিথি উপরিউক্ত শ্লোকে উল্লিখিত 'নাস্তিক' শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে-

'নাস্তি পরলোকা নাস্তি দত্তং নাস্তি হুতমিতি নাস্তিকঃ।' (মনুসংহিতা)।

অর্থাৎ : পরলোক বলে কিছু নেই, যাগ-দান-হোম এগুলিও কিছু নয়- এইরকম কথা যিনি বলেন এবং এই বিশ্বাসে যিনি চলেন তিনি নাস্তিক।

.

অতএব, দেখা যাচ্ছে, বৈদিক ঐতিহ্যের প্রভাবপুষ্ট সকলের কাছে 'নাস্তিক' সংজ্ঞাটি আসলে বৈদিক প্রাধান্যের বিরোধীদের অর্থেই ব্যবহার্য। ভারতীয় দর্শনগুলিকে 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক'

এই দুটি সুনির্দিষ্ট বিভাগে চিহ্নিত করার মূলেও রয়েছে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রেরণা। অর্থাৎ যাঁরা বেদের সিদ্ধান্ত প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন তাঁদেরকে আস্তিক এবং যাঁরা বেদের সিদ্ধান্তকে অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করেন না তাঁদেরকে নাস্তিক সম্প্রদায় বলা হয়। তাই বৌদ্ধ ও জৈনগণ পরলোক স্বীকার করলেও বেদনিন্দা করে নাস্তিক আখ্যায় অভিহিত হয়েছে। আর চার্বাকরা বেদ ও পরলোক উভয়ই অস্বীকার করে একেবারে নাস্তিক শিরোমণি আখ্যায় ভূষিত হয়েছে। তাই হয়তো মাধবাচার্য্য (চতুর্দশ শতক) তাঁর 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন- 'নাস্তিকশিরোমণিনা চার্বাকেণ'। অপরদিকে বেদ এবং উপনিষদানুসারী ষড়দর্শন যথা- সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত হলো সম্পূর্ণই বেদবিহিত আস্তিক দর্শন।

.

আবার অষ্টম শতকের জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সূরী তাঁর 'ষড়্দর্শনসমুচ্চয়' গ্রন্থে 'আস্তিকবাদিনাম্' বা আস্তিকবাদ হিসেবে যখন বৌদ্ধ ও জৈন মতের উল্লেখ করেন, তখন এটাই প্রতীয়মান হয় যে আস্তিক সংজ্ঞাটা এখানে পরিবর্তিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে টীকাকার সোমতিলক সূরীর মতে উক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত এই 'আস্তিকবাদিনাম্' পদটির অর্থ হচ্ছে-

> 'পরলোকগতিপুণ্যপাপাস্তিক্যবাদিনাম্', অর্থাৎ আস্তিকবাদী বলতে তাঁদেরকেই বোঝায় যাঁদের পরলোক, পুণ্য, পাপ ইত্যাদিতে আস্থা আছে।

.

হরিভদ্র সূরীর এই পরিবর্তিত অর্থেও দেখা যাচ্ছে চার্বাকরা নাস্তিকগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একইভাবে অষ্টম শতকেরই বৌদ্ধ আচার্য শান্তরক্ষিতের 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থে পরলোকের অস্তিত্ব অস্বীকার করার কারণে লোকায়ত মতকে 'পরানাস্তিকতা' আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। এখানে চার্বাক মতেরই অন্যতম প্রাচীন নাম লোকায়ত দর্শন।

.

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন জগতের অপরাপর সবগুলো দর্শনেই চার্বাক মতকে যার যার মতো করে নিজেদের বিপরীত অবস্থানে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও বেদের প্রাধান্যকে স্বীকার না করার জন্য ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির সমর্থকগোষ্ঠি জৈন ও বৌদ্ধ মতকে আস্তিক্যের মর্যাদা দিতে চাননি, তবু ভারতের ঐতিহ্যগত সাধারণ মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের সাপেক্ষে বৌদ্ধ ও জৈনরা যে স্বাভাবিকভাবে নাস্তিক্য প্রভাবের বাইরে, তারই ইঙ্গিত হয়তো এটা। তা থেকে একটা বিষয়ে একমত হওয়া যায় যে, 'নাস্তিক' সংজ্ঞার মধ্যে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের ইঙ্গিতই লুকিয়ে আছে। আর এই বিদ্রোহী মনোভাবের মূর্ত প্রতীক আসলে চার্বাকই। কেননা এই নাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গিটাকে যদি জড়বাদী ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলেই এ পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে যায় আমাদের কাছে। প্রাচীন ভারতীয় অপরাপর সমস্ত ভাববাদী দর্শনের বিপরীতে একমাত্র জড়বাদী দর্শনই হলো চার্বাক দর্শন। মূলত এজন্যেই মাধবাচার্য তাঁর 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে

চার্বাকদেরকে ‘নাস্তিকশিরোমণি’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

.

চার্বাক দর্শনের মূল কথাগুলো হচ্ছে- প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ; পৃথিবী (মাটি), জল, তেজ (আগুন) ও বায়ু- এই চারটি হচ্ছে তত্ত্ব; অর্থ ও কাম- দু’টি পুরুষার্থ; জীবনে ভোগ ত্যাজ্য নয় গ্রাহ্য। ভূতচতুষ্টয় হতে চৈতন্যের উৎপত্তি, পুনর্জন্ম বা পরলোক নেই, মৃত্যুই মোক্ষ। ভূতচতুষ্টয়ের মিলনে উৎপন্ন চৈতন্যবিশিষ্ট এই দেহ হতে বিচ্ছিন্ন পৃথক জীব নেই; ঈশ্বর বা আত্মা বলেও কিছু নেই। অগ্নিহোত্র, ত্রয়ী বেদ, ত্রিদণ্ড ও ভস্মগুণ্ঠন হচ্ছে প্রজ্ঞাপৌরুষহীন ব্যক্তিগণের জীবিকামাত্র। ত্রয়ী ধূর্ত্তগণের প্রলাপ ও বেদের বিধানের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, উভয়ই বঞ্চনামূলক ও মিথ্যা। দণ্ডনীতিই একমাত্র বিদ্যা, বার্ত্তা (কৃষি ইত্যাদি অর্থনীতিসংক্রান্ত বিদ্যা) দণ্ডনীতির অন্তর্ভুক্ত। সত্যান্বেষণে প্রয়োজন অনুভব ও বুদ্ধিকে পথপ্রদর্শক করা, ইত্যাদি।

৩.০ : ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়

...

প্রাচীন ভারতে দর্শনের জগতে প্রথমে যে আস্তিক দর্শনেরই উদ্ভব হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, এই আস্তিক্যবাদের বিরোধিতার সূত্র ধরেই মূলত নাস্তিক্য দর্শনের সূত্রপাত। আস্তিক দর্শনগুলির মতে বেদ কোন মানুষের সৃষ্টি নয়, অর্থাৎ বেদ অপৌরুষেয়। এবং বেদমন্ত্রগুলি প্রাচীন আর্য ঋষিদের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছিলো বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে এই ঋষিরা মন্ত্রকর্তা ছিলেন না, ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা। এঁরা ধ্যানবলে উপলব্ধ সত্যকে ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রে। তাই আস্তিক দর্শনের সূচনা ও ক্রমবিকাশে বেদের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

.

রচনাকালের পরম্পরা ও প্রকৃতি অনুযায়ী ‘বেদ’ চারটি- ১) ঋগ্বেদ, ২) সামবেদ, ৩) যজুর্বেদ, ৪) অথর্ববেদ। এখানে আমাদের ধারণা স্বচ্ছ রাখার প্রয়োজনে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রতিটা বেদ আসলে একেকটা গ্রন্থ মাত্র নয়।
এই প্রতিটি বেদের চারটি অংশ:

ক) ‘সংহিতা’ বা সংগ্রহ- গান, স্তোত্র, মন্ত্র প্রভৃতির সংকলন।
খ) ‘ব্রাহ্মণ’- গদ্যে রচিত একজাতীয় যাগযজ্ঞ-বিষয়ক সুবিশাল সাহিত্য।
গ) ‘আরণ্যক’- অরণ্যে রচিত একজাতীয় সাহিত্য, বিশ্ব-রহস্যের সমাধান অন্বেষণই তার প্রধান উদ্দেশ্য।
ঘ) ‘উপনিষদ’- আক্ষরিক অর্থে গুহ্য-জ্ঞান, দার্শনিক তত্ত্বের বিচারই এর প্রধান বিষয়বস্তু। এই উপনিষদকে ‘বেদান্ত’ সাহিত্যও বলা হয়।

.

বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশকে কর্মকাণ্ড, আরণ্যককে উপাসনাকাণ্ড এবং উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। রচনাকাল ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রত্যেকটি অংশের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে বলে স্বীকৃত। বৈদিক সাহিত্যের বহু প্রাচীন অংশই বিলুপ্ত হয়েছে। তবুও যা টিকে আছে তাও আকারে সুবিশাল।

.

উল্লেখ্য, বেদের সুক্ত বা সংহিতাগুলো অতি প্রাচীনকালে দীর্ঘ সময় নিয়ে রচিত হয়েছে। অর্থাৎ তা কোন একক ব্যক্তির রচিত নয়। বংশ পরম্পরাক্রমে তা মুখে মুখে রচিত হয়েছে এবং শ্রুতির মাধ্যমে তা সংরক্ষিত হয়েছে। তাই বেদকে শ্রুতি গ্রন্থও বলা হয়। বেদের রচনাকাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও ধারণা করা হয় খিস্টপূর্ব ২০০০ বা ২৫০০-তে এর রচনাকাল শুরু এবং রচনা সম্পন্ন হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০ থেকে ৫০০-এর মধ্যে। সুনির্দিষ্ট কোন সন-তারিখের হিসাব করা সম্ভব না হলেও গবেষকদের স্থির সিদ্ধান্ত এটুকু যে, গৌতম বুদ্ধের পূর্বেই এ-সাহিত্যের রচনা ও সংকলন সমাপ্ত হয়েছিলো। এই দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় বহু শতাব্দির ব্যবধানের কারণেই বেদের প্রথম দিকের রচনাগুলোর সাথে শেষের দিকের

রচনাগুলোর উদ্দেশ্য, ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তর পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে। এ প্রেক্ষিতে তাই এটা খেয়াল রাখা আবশ্যক যে, সুদীর্ঘ যুগ ধরে বৈদিক মানুষদের সমাজ-ব্যবস্থা এবং চিন্তা-চেতনায় যে পরিবর্তন ঘটেছিলো তারই ধারাবাহিক এবং সাহিত্যিক নিদর্শন এই বেদ, ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে যার মূল্য অতুলনীয়। মানবজাতির ইতিহাসে এ-জাতীয় এমন বিস্তীর্ণ নিদর্শন দ্বিতীয়টি বিরল।

.

বেদের ব্রাহ্মণ যুগের শেষের দিকে ক্রিয়াবহুল যাগ-যজ্ঞের বিরুদ্ধে শিক্ষিত অগ্রবর্তী ব্যক্তিদের মনে হয়তো এক ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাঁরা মনে করেন ব্যাপক ক্রিয়াবহুল সময়সাপেক্ষ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান নিরর্থক। যেমন শতপথ এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আত্মজ্ঞান ছাড়া মোক্ষলাভ করা যায় না। কাজেই শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনের প্রতিক্রিয়া থেকেই আরণ্যক ও উপনিষদের সৃষ্টি হয়। উপনিষদ হলো জ্ঞানকাণ্ডের চরম পরিণতি। এই উপনিষদের সংখ্যা অনেক হলেও প্রধান উপনিষদ বারোটি। যথা- ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, প্রশ্ন, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, কৌষিতকি ও শ্বেতাশ্বতর।

.

বেদ ও উপনিষদের পরেই ভারতবর্ষে ছয়টি আস্তিক দর্শনের আবির্ভাব হয়। তবে এই আস্তিক দর্শনগুলির ক্রমবিকাশে তিনটি স্তর বা পর্যায় লক্ষ্য করা যায়- (১) সূত্র, (২) ভাষ্য এবং (৩) বার্ত্তিক।
ভারতীয় দর্শনে ছোট ছোট অর্থপূর্ণ বাক্যকে বলা হয় সূত্র। সূত্রের লক্ষণে বলা হয়-

‘অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্ ।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ’।।
অর্থাৎ : অল্প অক্ষরযুক্ত, সন্দেহমুক্ত, সারযুক্ত, সর্বত্র প্রয়োগযোগ্য এবং নির্দোষ নিয়মকেই সূত্র বলে। সূত্র হলো সংক্ষিপ্ত বাক্যের নম্র উপচার।

ভারতীয় দর্শনে ছোট ছোট অর্থপূর্ণ বাক্যকে বলা হয় সূত্র। মূলত ছোট ছোট অর্থপূর্ণ বচনের সাহায্যে এরকম কিছু সূত্রের আবরণে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাকে সযত্নে গেঁথে রাখা হতো। স্বল্পতম অক্ষরবিশিষ্ট এরকম কিছু সংখ্যক সূত্রের মাধ্যমে দর্শন-চিন্তার প্রথম আত্মপ্রকাশই ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত ধারা এবং ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশ শাখারই আদি রচনা এই জাতীয় কিছু সূত্রের সমষ্টি বলে মনে করা হয়। সূত্রগুলোয় অক্ষরসংখ্যা নিয়মনের দিকে খুব জোর দেয়া হয়েছে, ফলে সংক্ষিপ্ততম অবয়বে ব্যাপকতম অর্থব্যঞ্জনার প্রবণতা প্রত্যেক সূত্রে দেখা যায়। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে তখনো কোন লিখিত গ্রন্থ বা মুদ্রাযন্ত্র ছিলো না। তাই শিষ্যদের পক্ষে তা বোঝা বা মনে রাখা অত্যন্ত কঠিন হতো বলে তা প্রতিকারের লক্ষ্যে ছোট ছোট অর্থপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করা হতো। এই সূত্রগুলিই পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে এরকম সূত্রগ্রন্থই ষড়দর্শনের আদিগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। এসব গ্রন্থে দর্শনের মৌলিক চিন্তাগুলি সূত্রের মাধ্যমে গ্রথিত ও সংরক্ষিত হয়েছে।

যেমন-

.

(১) সাংখ্য দর্শনের আদিগ্রন্থ হলো কপিলের সাংখ্যসূত্র। বর্তমানে কপিলের সাংখ্যসূত্র দুষ্প্রাপ্য বা বিলুপ্ত।
(২) যোগদর্শনের আদিগ্রন্থ হলো পতঞ্জলির যোগসূত্র।
(৩) ন্যায়দর্শনের আদিগ্রন্থ হলো গৌতমের ন্যায়সূত্র।
(৪) বৈশেষিক দর্শনের আদিগ্রন্থ হলো কণাদের বৈশেষিক সূত্র।
(৫) মীমাংসা দর্শনের মূলগ্রন্থ হলো জৈমিনির মীমাংসা-সূত্র।
(৬) বেদান্ত দর্শনের মূলগ্রন্থ হলো বেদব্যাস বা বাদরায়নের ব্রহ্মসূত্র।

.

এভাবে ভারতীয় দর্শনসাহিত্যের আদিগুরুদের যে সূত্র রচনার মাধ্যমে তাঁদের নিজ নিজ দার্শনিক মতবাদের উদ্বোধন, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একাধিক অর্থের দ্যোতনা রয়েছে, কখনো কখনো এদের প্রকৃত অর্থ বোঝাও কঠিন ছিলো। অনেক সময় একই সূত্রের পৃথক পৃথক বা পরস্পর বিরোধী অর্থ করা হতো। ফলে সূত্রগুলির প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এবং এ কারণে সূত্রের পর আসে ভাষ্য। তাই প্রত্যেকটি সূত্রগ্রন্থেরই ভাষ্য রয়েছে। আবার কোন কোন সূত্রগ্রন্থের একাধিক ভাষ্যও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন-

.

(১) ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার ভাষ্য হলো বাচস্পতি মিশ্রের তত্ত্বকৌমুদী।
(২) যোগসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন বেদব্যাস।
(৩) ন্যায়সূত্রের প্রখ্যাত ভাষ্যকার হলেন ঋষি বাৎসায়ন।
(৪) বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্যগ্রন্থ হলো প্রশস্তপাদের পদার্থ ধর্মসংগ্রহ।
(৫) মীমাংসা-সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন শবরস্বামী।
(৬) বেদব্যাস রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার হলেন আচার্য শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য, বল্লভ, নিম্বার্ক।

.

সূত্রগ্রন্থের ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগের ভাষ্যকারেরা নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী সূত্রগুলির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়ায় এগুলির মাধ্যমে বহুস্থলে পরস্পরবিরোধী সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থের প্রকাশও লক্ষ্য করা যায়। ফলে একই দর্শনে ভিন্নমতাবলম্বী বহু শাখাগোষ্ঠির উদ্ভবও লক্ষ্যণীয়। আর এসব ভাষ্যগ্রন্থের পর এসেছে অজস্র বিখ্যাত প্রকরণ বা টীকাগ্রন্থ। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় দর্শনের ক্রমবিকাশের বিশাল সাহিত্য-পরম্পরা।

.

আর নাস্তিক দর্শন বলতে ভারতীয় দর্শনে প্রধানত জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাক এই তিনটি দর্শনকে বোঝানো হলেও প্রথম দুটো অর্থাৎ জৈন ও বৌদ্ধ মূলত ভাববাদী দর্শন। অন্যদিকে একমাত্র জড়বাদী বা বস্তুবাদী দর্শন হলো চার্বাক দর্শন। সে বিবেচনায় শুধু ভারতীয় দর্শনেই নয়, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণে চার্বাককে পৃথিবীর প্রাচীনতম জড়বাদী দর্শন

হিসেবেও গণ্য করা হয়।

.

তবে আস্তিক দর্শনগুলির মতো নাস্তিক দর্শনগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ করে চার্বাক দর্শনের স্বীকৃত কোন সূত্রগ্রন্থ বা ভাষ্যগ্রন্থ পাওয়া যায় না। যদিও সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে বিভিন্ন আস্তিক ভাবধারার দার্শনিক গ্রন্থের ভাষ্যকারদের রচনায় নাস্তিক দর্শনসূত্রের প্রচুর উদ্ধৃতি রয়েছে। মূলত নাস্তিক মত খণ্ডনের নিমিত্তেই এসব উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। এই উদ্ধৃত সূত্রগুলি কখনও চার্বাক, কখনও লোকায়ত, আবার কখনও বা বার্হস্পত্য বিশেষণে বিশেষিত। তবে আস্তিক দর্শনের ক্রমবিকাশের মতোই নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়েরও ক্রমবিকাশ ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়।

…

৪.০ : বিভিন্ন দর্শন-সম্পদায়

প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলিকে যে দুটি পঙক্তিতে তালিকাভুক্ত করা হয় তা হলো- (ক) নাস্তিক দর্শন-সম্প্রদায় ও (খ) আস্তিক দর্শন-সম্প্রদায়।

নাস্তিক দর্শন-সম্প্রদায়ের অগ্রভাগেই আছে চার্বাক-দর্শন; বিভিন্ন দার্শনিক-সাহিত্যে চার্বাককে নাস্তিক-শিরোমণি হিসেবেও আখ্যায়িত করতে দেখা যায়। চার্বাক ছাড়া বাকি দুটি নাস্তিক সম্প্রদায় হলো- জৈন-দর্শন ও বৌদ্ধ-দর্শন।
অন্যদিকে প্রচলিত মতে বেদবিহিত অর্থাৎ বৈদিক-সংস্কৃতির অনুসারী আস্তিক দর্শন-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত দর্শন ছয়টি বলে এগুলি একসাথে ষড়দর্শন নামেও বহুল পরিচিত। এই ষড়দর্শনের অন্তর্ভুক্ত দর্শনগুলি হলো- ন্যায়-দর্শন, বৈশেষিক-দর্শন, সাংখ্য-দর্শন, যোগ-দর্শন, পূর্ব-মীমাংসা বা মীমাংসা-দর্শন এবং উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন।
ভারতীয় দর্শনের এই বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির অতি সংক্ষিপ্ত কিছুটা পরিচয় জেনে রাখলে আমাদের পরবর্তী আলোচনা আত্মস্থ করতে অনেকটা সুবিধাজনক ও চিত্তাকর্ষক হবে।

(ক) নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায় :

যেহেতু আমাদের লক্ষ্যই হলো চার্বাকের খোঁজ করা, তাই বর্তমান গ্রন্থে আমাদের এখনকার ও পরবর্তী যাবতীয় উদ্যোগের মূল কেন্দ্রই হচ্ছে চার্বাক-মতের একটা যৌক্তিক রূপরেখা প্রণয়ন-প্রত্যাশা। সেক্ষেত্রে চার্বাক-দর্শনের আগাম পরিচয় উপস্থাপন অতি-স্বাভাবিক কারণেই প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ইতিহাস ঐতিহ্য দৃষ্টান্ত সহ সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে। তবু আমরা প্রচলিত চিন্তাধারায় চার্বাক-দর্শনের প্রাথমিক পরিচয়সহ বাকি সম্প্রদায়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জেনে নিতে পারি।

চার্বাক-দর্শন

চার্বাকের মূল তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত-সার আগেই বলা হয়েছে। তবু আরেকটু যদি বলতে হয়, চার্বাককেই নামান্তরে লোকায়ত বা বার্হস্পত্য দর্শন বলে উল্লেখ করার নজির আছে। বার্হস্পত্য মানে বৃহস্পতি-প্রতিষ্ঠিত দর্শন। বৌদ্ধশাস্ত্র, মহাভারত, মনুস্মৃতি প্রভৃতির নজির থেকে অনায়াসেই অনুমান করা যায়, সম্প্রদায়টির ইতিহাস সুপ্রাচীন। কিন্তু এ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন রচনা আবিষ্কৃত হয়নি এবং হবার সম্ভাবনাও নেই বলে মনে হয়। অথচ এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে এককালে এ-জাতীয় রচনা সত্যিই প্রচলিত ছিলো। আর তাই সন্দেহ প্রযুক্ত হয় যে হয়তো বা বিপক্ষ-মতাবলম্বীরা স্বেচ্ছায় তা ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু এ-সন্দেহ প্রমাণসাপেক্ষ হোক আর নাই হোক, মোটের উপর আজকের দিনে অন্যান্য বিপক্ষ-সম্প্রদায়ের রচনা সম্ভার থেকেই এই সম্প্রদায়টির পরিচয় সংগ্রহ করতে বাধ্য হতে হয়। অর্থাৎ, অন্যান্য সম্প্রদায়ের দার্শনিকরা চার্বাক বা লোকায়ত-মতের খণ্ডন-প্রসঙ্গে যে-সব উক্তি করেছেন তা থেকেই ওই সুপ্রাচীন সম্প্রদায়টির প্রকৃতরূপ পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা নিতে হয়। স্বভাবতই এ-প্রচেষ্টা সমস্যা-কণ্টকিত। কেননা প্রথমত, এ-জাতীয় বিপক্ষ-উক্তিগুলি খণ্ড

ও বিক্ষিপ্ত- বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাক বা লোকায়ত মতের যে উল্লেখ রয়েছে, এ-জাতীয় উল্লেখের মধ্যে সব সময় খুব সুস্পষ্ট সঙ্গতিও নেই। দ্বিতীয়ত, এই উল্লেখগুলি অত্যন্ত প্রকটভাবেই বিরুদ্ধ ও বিরূপ মনোভাবের পরিচায়ক যে, অনেক সময় এমনকি ওই প্রাচীন সম্প্রদায়টিকে নেহাতই উপহাস-পরিহাসের বিষয় বলে প্রতিপন্ন করবার প্রচেষ্টাই হয়েছে। তাই বিপক্ষ-সম্প্রদায়ের এ-জাতীয় বিরুদ্ধ-সাক্ষ্যগুলির উপর নির্বিচারে নির্ভর করা যায় না। তৃতীয়ত, প্রাচীনতর নিদর্শনগুলির মধ্যে আলোচ্য সম্প্রদায়টি সম্বন্ধে যেটুকু উল্লেখ তাও অনেকাংশে পৌরাণিক কল্পনায় আচ্ছন্ন হতে দেখা যায়; তা থেকে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা খুবই সযত্ন-প্রচেষ্টা-সাপেক্ষ।

এ-জাতীয় নানা সমস্যা সত্ত্বেও এটুকু অন্তত নিঃসন্দেহে বলা যায়, চার্বাক বা লোকায়ত বলতে প্রাচীনকালের কোনো এক বস্তুবাদী বা জড়বাদী দার্শনিক সম্প্রদায় বোঝাতো। আধুনিক যুগের বস্তুবাদের সঙ্গে ওই প্রাক্-বৌদ্ধ যুগের সুপ্রাচীন বস্তুবাদের অভিন্নত্ব প্রত্যাশা করা যায় না অবশ্যই। তবু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা আত্মা নামক ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা অস্বীকার করে জড়দেহকেই চূড়ান্ত সত্য মনে করেছিলেন এবং তাঁদের মতে ঈশ্বর ও পরলোকের কথা কল্পনামাত্র। তাঁরা এও দাবি করেছেন, বেদ বা শ্রুতির কোনো প্রামাণ্য নেই, এবং বৈদিক যাগযজ্ঞ শুধু অর্থহীনই নয়- প্রবঞ্চনামূলকও। তাছাড়া এটাও ধারণা করা হয় যে, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এই চার্বাকেরাই যুক্তিবিদ্যা বা তর্কবিদ্যার প্রবর্তন করেছিলেন, যদিও এ-বিষয়ে তাঁদের প্রকৃত বক্তব্যের প্রায়ই এক বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের নীতিবোধ সম্বন্ধেও বহু কুৎসা প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও চার্বাক বা লোকায়তিকদের কোনো এক সুস্থ নীতিবোধের ইঙ্গিত উদ্ধার করা অসম্ভব নয় বলে আধুনিককালের বিদ্বান গবেষকেরা মনে করেন।

জৈন-দর্শন
ভারতের প্রাচীনতম অসনাতন নাস্তিক্য ধর্মদর্শনের অন্যতম হচ্ছে জৈনদর্শন। ‘জিন’ শব্দ থেকে জৈন শব্দের উৎপত্তি। ‘জিন’ অর্থ বিজয়ী। যিনি ষড়রিপুকে জয় করেছেন, তিনিই জিন। জৈনদের মতে, যথার্থ সাধনার বলে রাগ, দ্বেষ, কামনা বাসনা জয় করে যাঁরা মুক্তি বা মোক্ষলাভ করেছেন তাঁরাই জিন। জৈন ঐতিহ্যে এজাতীয় চব্বিশজন মুক্ত পুরুষের পারম্পর্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়, যাঁদেরকে তীর্থঙ্কর বলা হয়। এই পরম্পরায় চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মধ্যে সর্বপ্রথম হলেন ঋষভদেব এবং সর্বশেষ হলেন বর্ধমান বা মহাবীর। মহাবীর ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। তাই জৈন ঐতিহ্যের ওই চব্বিশজন তীর্থঙ্করের পারম্পর্য ঐতিহাসিকভাবে সত্য হলে জৈনধর্মকে অত্যন্ত প্রাচীন বলে স্বীকার করতে হবে।

জৈনরা বেদও মানেন না, ঈশ্বরও নয়। প্রত্যেক জীবই জিনদের পন্থা অনুসরণ করে বন্ধনমুক্ত হতে পারে বলে তাঁদের বিশ্বাস। দার্শনিক দৃষ্টিতে জৈনদের নিজেদের মধ্যে কোন ভেদ না থাকলেও পরবর্তীকালে জৈনধর্ম দু’টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায় আচারগত দৃষ্টিতে

কিছুটা ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ায়। জৈনমতের এই দু'টি অবান্তর ভেদ হচ্ছে- শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। দিগম্বর সম্প্রদায়ের যতি বা সন্ন্যাসীরা নিজ শরীরের আচ্ছাদনের জন্য বস্ত্রের উপযোগ গ্রহণ করেন না, তাঁরা সর্বদা নগ্ন থাকেন। কিন্তু শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের যতিরা সাদা বস্ত্র পরিধান করেন। আচারগত ধর্মানুষ্ঠানের খুঁটিনাটি ভিন্নতা ছাড়া উভয় সম্প্রদায়ের মূল ধর্মসূত্র অভিন্ন।

জৈনদর্শনের মূল কথা হলো, সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা জগতকে যেভাবে জানি তাই সত্য ও যথার্থ। জগতে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, অতএব কোনো এক বা অদ্বিতীয় পরমসত্তার কল্পনা করা নিরর্থক। এই বস্তুসমূহ প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত, জীব এবং অজীব। দেহ যেমনই হোক না কেন, প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুর মধ্যেই জীব বা আত্মা আছে। এই আত্মা অবিনাশী, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়। জীবন্ত প্রাণী হত্যা না করা তথা সমস্ত জীবের প্রতি ঐকান্তিক অহিংসাই জৈনধর্মের অপরিহার্য মূলনীতি। জৈনরা বেদ ও উপনিষদে বিবৃত কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। যেমন তাঁরা পুনর্জন্মবাদ ও কর্মবাদে বিশ্বাস করতেন এবং মেনে নিয়েছিলেন যে কৃতকর্মের ফল অনুযায়ী জীবের জন্ম হয়। জন্মান্তরে আত্মা ইতর প্রাণী, মানুষ, দেবতা কিংবা দৈত্যের দেহ ধারণ করতে পারে। এই মতে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের দাসত্ব হতে মুক্ত হয়ে উর্ধ্বগতি লাভ করতে পারে, পূর্ণ মুক্তি পেতে হলে দেবতারও মানুষের ঘরে পুনর্জন্ম লাভ করা দরকার। তবে সবকিছু ছাপিয়ে জৈনরা অহিংসাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

জৈনদর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ ভেদে তিন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করা হয়। প্রত্যক্ষ হচ্ছে সকলের স্বীকৃত প্রমাণ। লোকব্যবহারের দৃষ্টিতে জৈনরা অনুমানকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করেন এবং তীর্থঙ্করদের উপদেশবাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলে মনে করেন। শব্দের অন্য নাম হচ্ছে আগম।

দার্শনিক তত্ত্ব এবং এমনকি যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রেও জৈনদের অহিংসা-নীতির প্রভাব চোখে পড়ে। কেননা দার্শনিক তত্ত্ব বিচারেও জৈনরা বিপক্ষ-মতের প্রতি এক অদ্ভূত সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের দর্শনের একটি মূল কথা হলো অনেকান্তবাদ। এই অনেকান্তবাদের ব্যাখ্যাটা এরকম,- সত্তা বহুমুখী, অতএব বিবিধভাবে তা বর্ণিত হতে পারে- তার মধ্যে কোনো বর্ণনাই মিথ্যা নয়, আবার কোনো বর্ণনাই একমাত্র সত্য নয়। তাঁদের তর্কবিদ্যার একটি মূলকথা হলো স্যাৎবাদ। এই স্যাৎবাদ কী? এই মতে, সত্তার বহুমুখী দিক সম্বন্ধে সামগ্রিক উক্তি একমাত্র পূর্ণজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব। আমরা পূর্ণজ্ঞানী নই; অতএব প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের প্রতিটি উক্তিই শেষ পর্যন্ত সম্ভাবনামূলক। এই সম্ভাবনার নির্দেশক শব্দ হলো স্যাৎ। স্যাৎ মানে কোনোভাবে সম্ভব। অতএব প্রত্যেক উক্তির সঙ্গে স্যাৎ শব্দ যোগ করা প্রয়োজন। তাছাড়াও, সমস্তরকম বিকল্প-সম্ভাবনার কথা মনে রাখাও প্রয়োজন। অতএব কোনো বিষয়ে শুধু অস্তি (=আছে) বা নাস্তি (=নাই) বলা ঠিক নয়। তার বদলে একই বিষয়ে বলতে হবে- স্যাৎ অস্তি (সম্ভবত আছে), স্যাৎ নাস্তি (সম্ভবত নাই), স্যাৎ অস্তি

চ নাস্তি চ (সম্ভবত আছেও নেইও), স্যাৎ অব্যক্তম্ (সম্ভবত অবক্তব্য), স্যাৎ অস্তি চ অব্যক্তম্ চ (সম্ভবত আছেও অবক্তব্যও), স্যাৎ নাস্তি চ অব্যক্তম্ চ (সম্ভবত নেইও অবক্তব্যও), স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অব্যক্তম্ চ (সম্ভবত আছেও, নেইও, অবক্তব্যও)। স্যাৎ-বাদ বুঝাতে জৈনাচার্যগণ এই যে সাতটি পরামর্শ বা বাক্যের প্রয়োগ করেন, প্রত্যেক বাক্যকে এক একটি 'ভঙ্গি' নামে ডাকা হয় এবং সাত প্রকার বাক্যকে একত্রে সপ্তভঙ্গি বলা হয়। এর পূর্ণনাম 'সপ্তভঙ্গিনয়'।

বলা বাহুল্য, অহিংসা নীতির প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হলেও ভারতীয় দর্শনে এ জাতীয় তর্কবিদ্যার চিত্তাকর্ষক বিকাশ ঘটেছিলো। কোন কোন গবেষক অনুমান করেছেন, জৈনদের এই স্যাৎ-বাদের মধ্যেই আধুনিক স্ট্যাটিসটিকস বিজ্ঞানের মূলসূত্রের আভাস পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ-দর্শন

ভারতীয় দর্শনের যে সকল সম্প্রদায় বেদভিত্তিক উপনিষদীয় চিন্তাধারার বিরোধিতা করেছেন, বৌদ্ধরা তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী সম্প্রদায়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে যখন উপনিষদীয় চিন্তাধারা কর্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসার বিরোধে ধর্মসংকটের ন্যায় তত্ত্বসংকটের সম্মুখীন হয় তখন শাক্যবংশীয় রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের কঠোর তপস্যালব্ধ সত্যের অনুসারী এক বেদবিরোধী সম্পদায় দর্শনের আঙিনায় আবির্ভূত হন। এই সম্প্রদায়ই 'বৌদ্ধ সম্প্রদায়' নামে পরিচিত। বুদ্ধ উপনিষদীয় কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডের চুলচেরা যুক্তিতর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে এবং জড়বাদ ও নাস্তিকতার দার্শনিক সমস্যায় মগ্ন না থেকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য এক আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। এই আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা বেদভিত্তিক না হয়েও সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির সহায়ক হয়েছিলো। ধীরে ধীরে এই চিন্তাধারার প্রভাব এতো বিস্তার লাভ করেছিলো যে ভারতের সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি ধর্মজীবনকেও তা আলোড়িত করেছিলো। নিরীশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও উচ্চমানের আধ্যাত্মিকতার প্রচার বৌদ্ধ চিন্তাধারার প্রতি সাধারণ মানুষকে অতিমাত্রায় আকৃষ্ট করে। এই বৌদ্ধপ্রভাবকে প্রতিহত করার জন্যই পরবর্তীকালে উপনিষদভিত্তিক বেদান্তের নতুন করে ভাষ্য রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। জনমানসে অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার করেছিলো বলেই বেদানুসারী হিন্দু দর্শনে এই মতবাদ খণ্ডনের জন্য বিশেষ যত্ন লক্ষ্য করা যায়।

সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের (৫৬৩-৪৮৩ খ্রিস্টপূর্ব) প্রচারিত মতবাদ থেকেই বৌদ্ধ দর্শন নামের সূত্রপাত। বুদ্ধ নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। অন্যান্য ধর্মের শাস্ত্র যেমন, বৌদ্ধ শাস্ত্রও তেমনি এককালে একজনের দ্বারা লিখিত হয়নি। বুদ্ধের দেহত্যাগের অল্পদিন পরেই প্রবীণ শিষ্যরা তাঁর উপদেশ ও শিক্ষাবলী আবৃত্তি করবার উদ্দেশ্যে রাজগৃহের সপ্তবর্ণী-গুহায় স্থবির মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে মিলিত হন। এই সম্মেলন বৌদ্ধ সঙ্ঘ-ইতিহাসে প্রথম ধর্মসঙ্গীতি নামে পরিচিত। এই সময় থেকে বুদ্ধের বাণী সংগৃহীত ও মুখে মুখে বিস্তৃত হতে আরম্ভ

করে। বুদ্ধের নির্বাণের প্রায় একশ বছর পরে অনুমান খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৩ অব্দে মহারাজ কালাশোকের রাজত্বকালে বৈশালীতে সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলন হয়। ইতোমধ্যে বুদ্ধবাণীর অংশবিশেষ সম্ভবত বিধিবদ্ধ আকারে লিখিতও হয়েছিলো। সঙ্ঘের মধ্যে ধর্ম, দার্শনিক মত, আচার প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বহু মতভেদ বাড়তে বাড়তে অবশেষে অনুমান খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে পাঞ্জাব অথবা কাশ্মীরের কোনও স্থানে চতুর্থ সম্মেলনের পর সঙ্ঘ মহাযান ও হীনযান নামে এই দুই প্রধান শাখায় পুরোপুরি বিভক্ত হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ্য, মহাযান ও হীনযান নাম দুটি মহাযানীদেরই উদ্ভাবন। অতএব হীনযান নামটি বিদ্বেষসূচক বলেই প্রতীত হয়। বৌদ্ধধর্মের এই শাখাটিরই নামান্তর হলো থেরবাদ বা স্থবিরবাদ। থেরবাদী শাস্ত্র পালি ভাষায় লেখা এবং তৎকালীন সিংহল, বর্মা ও শ্যামদেশে তা সংরক্ষিত হয়েছে। মহাযানী শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং নেপাল, তিব্বত, চীন ও জাপানে এই শাখাটির প্রভাব দেখা যায়। তবে থেরবাদীদের পালি সাহিত্যই প্রাচীনতর। তিনটি প্রধান ভাগে এই সাহিত্য সংকলিত হয়েছিলো বলেই এর নাম ত্রিপিটক। পিটক মানে ঝুড়ি। এই তিনটি পিটক হলো- বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধম্মপিটক। ত্রিপিটকের বর্তমান রূপটি ঠিক কবে বিধিবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিলো সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত সম্ভব না হলেও বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনতর রূপটির পরিচয় এর মধ্যেই পাওয়া যায়।
বিনয়পিটকে বৌদ্ধসঙ্ঘ বিষয়ক নির্দেশ এবং সঙ্ঘের পালনীয় বিধি ও অনুশাসন সংকলিত হয়েছে। সূত্রপিটকে মূলত বুদ্ধের বাণী, উপদেশ এবং শিষ্যদের সঙ্গে কথোপকথন স্থান পেয়েছে। অভিধম্মপিটক পরবর্তীকালের সংকলন। রাজা অশোকের পৃষ্ঠপোষকতার তৃতীয় মহাসঙ্গীতির পর এর আবির্ভাব ঘটে।

বুদ্ধ নিজে দর্শনচর্চা করেননি; বরং তিনি দর্শনচর্চার বিরোধীই ছিলেন। দার্শনিক সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন করলে তিনি নীরব থাকতেন। বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তার মূল কথা চারটি। বলা হয়ে থাকে, চারটি আর্য বা শ্রেষ্ঠ সত্যের উদ্ঘাটন করায় শাক্যমুনি গৌতম বোধিলাভ করে 'বুদ্ধ' নামে অভিহিত হন। এই রহস্যের প্রকটিকরণই তাঁর আধ্যাত্মিক জাগরণের (বুদ্ধত্বের) সঙ্কেত দেয়। তাই বৌদ্ধধর্মের রহস্য জানার জন্য এই চার আর্য সত্যের জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। বৌদ্ধদর্শনে যাকে বলা হয় চত্বারি আর্য সত্যানি বা চার আর্যসত্য। বুদ্ধের সমস্ত উপদেশের মূলে এই চারটি আর্যসত্য নিহিত রয়েছে। অধ্যাত্মবাদের গ্রন্থিমোচন না-করা হলেও ক্লেশবহুল প্রপঞ্চ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তথাগত বুদ্ধের আচারমার্গিক নির্দেশনা হলো এই চারটি আর্যসত্য। এগুলো হচ্ছে-
(১) জগত দুঃখময়- সর্বং দুঃখম্ ।
(২) দুঃখ সমুদয় বা দুঃখের হেতু আছে- দুঃখসমুদয়ঃ।
(৩) দুঃখের নিরোধ বা নির্বাণ সম্ভব- দুঃখনিরোধঃ। এবং
(৪) দুঃনিরোধের উপায় বা মার্গ আছে- দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপৎ।
অর্থাৎ চার আর্যসত্য হলো- দুঃখের বিদ্যমানতা, তার কারণের বিদ্যমানতা, তার নিরোধের

সম্ভাব্যতা এবং তাতে সাফল্য লাভের পথ বা উপায়। সংক্ষেপে এদেরকে বলা হয়- দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধমার্গ। এই চার আর্যসত্যকে বুদ্ধের চতুঃসূত্রীও বলা হয়।

এবং দুঃখ নিরোধের সুনির্দিষ্ট মার্গ আছে; তার নাম অষ্টাঙ্গিক-মার্গ- যথা- সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।

বৌদ্ধমতে সত্তা হচ্ছে প্রতিক্ষণে জন্ম ও অবলুপ্তির এক নিরবচ্ছিন্ন ধারা। এই ধারা কার্যকারণসম্বন্ধের নিয়মের অধীন, জগতে চিরস্থায়ী বলে কিছু নেই। সবকিছুই ক্ষণিক। এটিই বৌদ্ধমতে ক্ষণিকবাদ বা ক্ষণভঙ্গবাদ তত্ত্বের প্রতিপাদ্য। বুদ্ধ জগতের সব কিছুকে নিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থায় আছে বলে গণ্য করতেন। এই মতে, ধর্ম হচ্ছে মানুষের ইন্দ্রিয়বোধের অতীত সূক্ষ্ম কণাসমূহ যা নানারূপে সংযোগনিয়োগের দরুণ বস্তুগত বা আত্মগত পদার্থসমূহে গঠন করে। এই ধর্ম হচ্ছে নিয়ত গতিশীল এবং অন্তহীন যোগবিয়োগের বিভিন্ন ছকমাত্র। নির্বাণপ্রাপ্তির অবস্থায় নিয়ত পরিবর্তনশীল ধর্মগুলির গতি রুদ্ধ হয়। ফলে সংসারের সাথে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে, অর্থাৎ এক শরীরী সত্তা থেকে অন্য সত্তায় সংক্রমণ বন্ধ হয় এবং জগতের সাথে বস্তুপদার্থের সংযোগ আর থাকে না।

আমরা কেন দুঃখ ভোগ করি ? এ প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেন, দুঃখের কারণ আছে। অর্থাৎ এ সত্যটি একটি কার্য-কারণ সম্বন্ধীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধ এর নাম দিয়েছেন ‘প্রতীত্যসমুৎপাদ’ (The doctrine of Dependent Origination)। এই প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুসারেই দুঃখের কারণকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন তিনি। এতে বলা হয়েছে, সংসারে অকারণ কোন বস্তু নেই, প্রত্যেক বিষয়ের কারণ থাকে। প্রতিটি ঘটনাই পূর্ববর্তী কোন ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয়। দুঃখ একটি ঘটনা। সুতরাং দুঃখেরও কারণ আছে। কারণের অভাবে দুঃখের উৎপত্তি সম্ভব নয়। দুঃখের কারণটি জানা হলে আমরা দুঃখ নিবৃত্তির পথে এগিয়ে যেতে পারবো। কেননা কারণটিকে দূর করতে পারলেই কার্যটি আর ঘটবে না। সংসারে জরা ও মরণ দুঃখ দু’টি প্রধান। শরীর ধারণ করার দরুন জরা-মরণের দুঃখভোগ করতে হয়, যদি শরীর ধারণ না করতে হয় তবে দুঃখ দু’টি হতে রেহাই পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের কারণ সম্পর্কে একটি বিশেষ সূত্র আছে। যা বৌদ্ধ দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ‘প্রতিত্যসমুৎপাদ’ তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই সূত্র অনুসারে দুঃখ সৃষ্টির একই কারণ নয়। তাদের মধ্যে একটি ধারাবাহিক শৃঙ্খলা রয়েছে। এই কারণ-শৃঙ্খলে বারোটি নিদান বা সংযোগসূত্র আছে। এগুলো হচ্ছে অবিদ্যা, সংস্কার, চেতনা বা বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা বা অনুভূতি, তৃষ্ণা বা ভোগবাসনা, উপাদান বা বিষয়ানুরাগ, ভব, জাতি ও জরামরণ। একে ‘দ্বাদশ নিদান’ও (twelve sources) বলা হয়। এই বারোটি নিদানের

কার্যকারণের যে ব্যবস্থিত নিয়ম বা শৃঙ্খলা তা অস্তিত্বের বৃত্ত 'ভবচক্রে'র বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ জন্মের সাথে সম্বন্ধ। প্রথম নিদান থেকে আরম্ভ করে কারণ খুঁজতে খুঁজতে অন্তিম নিদানে পৌছানো যায়, যার নাম হচ্ছে 'অবিদ্যা', দুঃখের সামগ্রিক কারণ।

স্পষ্টই বোঝা যায়, দর্শনচর্চায় বিরূপ হলেও বুদ্ধকেও তাঁর মূল বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু কিছু দার্শনিক মত ব্যক্ত করতে হয়েছিলো। সেগুলিকে অবলম্বন করেই বৌদ্ধ-দর্শনের প্রাচীন রূপটির ব্যাখ্যা করা হয়।
কিন্তু পরবর্তী কালের বৌদ্ধ-দর্শনের প্রকৃতি অন্যরকম। আগেই বলা হয়েছে যে, বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধমতাবলম্বীদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত মহাযান ও হীনযান নামে বৌদ্ধধর্মের দুটি পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কিন্তু এ হলো ধর্ম-সম্প্রদায়ের কথা। অন্যদিকে, বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যা নিয়ে বিরোধের দিক থেকে পরবর্তীকালে বুদ্ধের অনুগামীদের মধ্যে অনেকগুলি সুস্পষ্ট দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তার মধ্যে প্রধানত চারটি সম্প্রদায় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই প্রধান চারটি বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায় হলো-

(১) বৈভাষিক সম্প্রদায় : এই মতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়েরই অস্তিত্ব আছে এবং প্রত্যক্ষভাবেই বহির্জগতের জ্ঞান হয়। এই মতবাদকে বলা হয় বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদ।
(২) সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় : এই মতেও অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়েরই অস্তিত্ব আছে, কিন্তু বহির্জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। বহির্জগতের মানস-প্রতিবিম্বকে অবলম্বন করে আমরা তার সত্তা অনুমান করতে পারি। এই মতবাদকে বলা হয় বাহ্যানুমেয়বাদ।
(৩) যোগাচার সম্প্রদায় : এই মতে বহির্জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই; একমাত্র মনই সত্য এবং তথাকথিত বহির্জগৎ আসলে মনগড়া- মনের ধারণা। এই মতবাদকে বলা হয় বিজ্ঞানবাদ।
(৪) মাধ্যমিক সম্প্রদায় : এই মতে বহির্জগৎ বা অন্তর্জগৎ কিছুরই প্রকৃত সত্তা নেই- সবই শূন্য, শূন্যই চরম সত্য। এই মতবাদকে বলা হয় শূন্যবাদ।

বুদ্ধের মূল বাণীর সঙ্গে এইসব বিভিন্ন সম্প্রদায়-প্রতিপাদ্য দার্শনিক তত্ত্বের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় কিনা এটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন হলেও একটি বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, স্বয়ং বুদ্ধের মতোই এইসব সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা একান্তভাবেই বেদ-বিরোধী বা শ্রুতিবিরোধী ছিলেন। বস্তুত, পরবর্তীকালের বৈদিক শ্রুতির অনুগামী দার্শনিকেরা শ্রুতি-প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সমর্থনে এবং বৌদ্ধমত বিরোধিতায় যে-সব যুক্তিতর্ক উদ্ভাবন করেছিলেন সেগুলির খণ্ডনই এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির একটি প্রধান প্রচেষ্টা ছিলো। অতএব প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ অনুসরণে এগুলিকে নাস্তিক সম্প্রদায় হিসেবে ভাবতে বাধা নেই।

তবে এই নাস্তিক সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শেষ করার আগে সমকালীন প্রেক্ষিতে

আজীবক নামে অন্য আরেকটি সম্প্রদায় সম্বন্ধে সামান্য কিছু বক্তব্য হয়তো বর্তমান আলোচনার সম্পুরক হিসেবে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আজীবক-সম্প্রদায় :
ভারতীয় ইতিহাসে বর্ধমান মহাবীর (৫৪০-৪৬৮ খ্রিস্টপূর্ব) এবং গৌতম বুদ্ধের (৫৬৩-৪৮৩ খ্রিস্টপূর্ব) সময়কে এক মহত্ত্বপূর্ণ ধর্মসংস্কারের কাল বলে গণ্য করা হয়। এই সময়ে অনেক নতুন ধার্মিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিলো। তার মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের কথা সকলে জানলেও অন্যান্য যে সকল ধর্মের উদ্ভব হয়েছিলো তাদের পরিচয় অজ্ঞাতপ্রায়ই হয়ে গেছে। এরকম এক সম্প্রদায়ের নাম ছিলো আজীবক-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন মখলিপুত্ত গোসাল বা মক্ষলি গোশাল। তবে এই সময়কার আজীবক সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তাঁদের সম্বন্ধে যা কিছু জানা যায় তা জৈন ও বৌদ্ধদের সাহিত্য থেকে পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে- 'বুদ্ধদেবের সময়ে ছয়টি ধর্ম প্রচার হইয়াছিল, তাহাদের নাম যথা, আজীবক- ইহা গোশালা মংখালি পুত্রের ধর্ম, নিগ্রন্থ- ইহা মহাবীরের ধর্ম, পূর্ণ কাশ্যপ একজন ধর্মপ্রবর্তক, অজিত কেশকম্বল একজন, সঙ্গয় একজন ও পোকুদ কত্ত্যায়ন একজন।'-(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৮)

'গোসাল অল্প বয়সে ভিক্ষু হয়েছিলেন। শীঘ্রই 'কেবলিন্' উপাধিপ্রাপ্ত নিজ মত প্রচারকালে মহাবীর বর্ধমানের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁদের উভয়ের আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ও বিচারধারা অত্যন্ত ভিন্ন থাকায় ছয় বছর পর তাঁদের মধ্যে বিবাদ হলে তাঁরা পৃথক সম্প্রদায় স্থাপন করেন। পরবর্তী আজীবক নামে গোসালের সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ হয়। তিনি শ্রাবস্তীকে প্রধান কেন্দ্র বানিয়ে ছিলেন। শ্রাবস্তীর বাইরে এক কুমোড়ের স্ত্রীর অতিথি হয়ে তিনি বসবাস করতে থাকলে ধীরে ধীরে অনেক লোক তাঁর অনুসারী হয়।'- (বিশ্বরূপ সাহা, ভূমিকায় আজীবকদর্শন, নাস্তিকদর্শনপরিচয়ঃ)

পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের বর্ণনায়- 'জৈন পিটক থেকে জানা যায়, প্রথমে তিনি জৈনবাদী সাধু ছিলেন, পরে সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁর যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা এক ধর্মান্ধ, ঈর্ষাপরায়ণ, অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির ব্যক্তির। তিনি মহাবীরকে (= জৈন-তীর্থঙ্কর, নিগণ্ঠ নাতপুত্ত) হত্যার চেষ্টা করেছিলেন; ব্রাহ্মণের দেবমূর্তির ওপর মল-মূত্র ত্যাগের ফলে প্রহৃত হয়েছিলেন, ইত্যাদি। কিন্তু এর বিরুদ্ধে বৌদ্ধ পিটক তাঁকে বুদ্ধ-যুগীয় প্রসিদ্ধ ছয়জন আচার্যের একজন বলে গণ্য করেছেন। আজীবক সম্প্রদায়ের তিনজন আচার্যের একজন হলেন মক্ষলি গোশাল, অপর দু'জনের নাম হলো : নন্দ বাৎস্য এবং কৃশ সাংকৃত্য। (মজ্ঝিমনিকায়-২/৩/৬)। এখানে এমন কথাও আছে যে আজীবক আচার্য মক্ষলি গোশাল উলঙ্গ থাকতেন এবং কিছু সংযমও পালন করতেন। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি কালেও আজীবক সম্প্রদায় ছিল (৫৩৭ খৃঃ.পূঃ.), কেন না, বুদ্ধগয়া থেকে যাত্রা শুরু করে বোধি ও গয়ার মধ্যবর্তী পথে তাঁর সঙ্গে উপক নামে এক আজীবকের সাক্ষাৎ হয়েছিল (মজ্ঝিমনিকায়)।

এতে বোঝা যায়, গোশালের আগে নন্দ বাৎস্য এবং কতিপয় সাংকৃত্য ছিলেন আজীবক সম্প্রদায়ের আচার্য।
পালি ভাষায় মক্ষলি গোশাল নামের ব্যাখ্যা করারও চেষ্টা করা হয়েছে; মক্ষলি = মা খালি অর্থাৎ যার পতন নেই; এবং গোশাল = গোশালায় জাত। পাণিনির মতানুযায়ী মস্করী অর্থ গৃহত্যাগী। পালি ব্যাখ্যার পরিবর্তে পাণিনির ব্যাখ্যানুযায়ী এর অর্থ হবে 'সাধু গোশাল'।'-(দর্শন-দিগদর্শন, পৃষ্ঠা-৭৫)।
অন্যদিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী- 'মক্খলি, মংখলিপুত্ত গোশাল বা মস্করী গোশাল সিংহলি সূত্র অনুসারে গোশালায় এক দাসীর গর্ভে জন্মান। ২৪ বছর প্রব্রজ্যার প্রথম ৬ বছর মহাবীরের সঙ্গে ছিলেন, মতবিরোধ হওয়ায় মহাবীরকে ত্যাগ করে যান এবং আজীবক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। আজীবক সন্ন্যাসীরা নগ্ন থাকতেন, কঠোর নিয়ম-সংযম মেনে চলতেন। গোশাল অদৃষ্টবাদী দর্শন প্রচার করেন। উত্তর ও বিশেষভাবে দক্ষিণ-ভারতে দীর্ঘদিন গোশালের প্রভাব টিকে ছিল।'-(হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা-সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৪)

দার্শনিক চিন্তাসূত্র অনুযায়ী মক্ষলি গোশালকে অকর্মন্যতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আজীবক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত তার বিরোধী ধর্মশাস্ত্র হতে জানা যায়। এই সম্প্রদায়ের মুখ্য সিদ্ধান্ত নিয়তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা হবার তা হবে, যা হবার নয় তা হবে না। যদি ভাগ্যে না থাকে তবে আসন্ন বা ভাবী বস্তুও নষ্ট হয়। নিয়তির সামর্থ্যে শুভ বা অশুভ সকল কিছুই সঙ্ঘটিত হয়। মানুষ বহু চেষ্টা করেও যা হবার তাকে প্রতিরোধ বা পরিবর্তিত করতে পারে না। সেকারণে আজীবক পৌরুষ, কর্ম ও উত্থানের অপেক্ষায় নিয়তি বা ভাগ্যকে অধিক শক্তিমান মনে করেন। এই মতে বস্তুতে যে পরিবর্তন বা বিকার হয় তার কোন কারণ নেই। সংসারে কার্যকারণভাব কার্যকরি নয়, মানুষ নিজের পুরুষার্থকে পরিবর্তিত করতে পারে না।

আজীবক আরামে জীবনযাপনে পক্ষপাতী। মহাবীরের ঘোর তপস্যাময় জীবন তাঁরা পছন্দ করতেন না। সেকারণে গৌতম বুদ্ধও একস্থলে আজীবককে ব্রহ্মচর্যে উদাসীনরূপে উল্লেখ করেছেন বলে জানা যায়। তবে আজীবক ভিক্ষুর জীবন ছিলো অতি সরল। তাঁরা প্রায়শঃ হাতে রেখে ভোজন করতেন। মাছ, মাংস ও মদ্যসেবন তাঁরা ত্যাগ করতেন। তাঁরা দিনে একবার ভিক্ষায় ভোজন করতেন।

'আজীবক সম্প্রদায় প্রথমদিকে বৌদ্ধদের প্রতিপক্ষরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের অবিচল ও মৌলিক সমালোচনা দিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম হতে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে আজীবক ধর্মের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণরূপে ব্রাহ্মণধর্মের বিরোধকে উল্লেখ করা হয়। সমাজে জাতিভেদের কাঠামো ও ব্রাহ্মণদের কর্মবাদের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে গোসাল প্রচারিত সমালোচনা কেবল সমাজের নীচুস্তরের মানুষকে আকর্ষণ করেনি, ববং কারুশিল্পী ও বণিকদের আকর্ষণ করেছিল। এই আজীবক ধর্ম সন্ন্যাসী হতে গৃহী-পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। পালি বৌদ্ধগ্রন্থে

গোসালকে একজন জেলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তিনি নদীর মোহনায় জাল ফেলে অসংখ্য মাছ ধরতেন। এ থেকে বুঝা যায় সে সময়ে আজীবক ধর্মের জনপ্রিয়তা ব্যাপক ছিল।

সম্রাট অশোকের শিলালেখে বলা হয়েছে যে, অনেক গুহানিবাস আজীবককে প্রদান করা হয়েছে। অশোকের পৌত্র দশরথৎ (১৮৪ খ্রী.পূ.) গয়ার নিকটে নাগার্জুন পাহাড়ের অনেক গুহা আজীবককে দান করেছেন। অশোক বিবিধ ধার্মিক সম্প্রদায়ের অবিরোধ সাধনের জন্য 'ধর্মমহামাত্র' নিযুক্ত করেছিলেন। এই আজীবক কয়েক শতাব্দী-পর্যন্ত পৃথগ্‌ভাবে প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে বৌদ্ধদের কাছে তাঁদের পরাজয় ঘটলে তাঁরা জৈনসম্প্রদায়ে মিশে যায়। মনুষ্যজীবনের তাৎপর্য, জগতে ও সমাজে তাদের সুনির্দ্দিষ্ট স্থান, ব্যক্তিগত প্রয়াসের মূল এবং কোন নীতি সঠিক আচরণের ভিত্তি হওয়া উচিত এই সকল বিষয় নিয়ে আজীবকের ধর্মশিক্ষায় সত্যিকারের কোন আলোচনা করা হয় নি, অথচ এই সমস্ত সমস্যা ও সমাধানে বৌদ্ধ ও জৈনগণ অবহিত ছিল। আজীবকের দর্শনে 'সর্বব্যাপী পূর্বনির্ধারণ' বা 'নিয়তি' নীতিগতভাবে এসকল সমস্যার সমাধানকে পরিহার করা হয়েছিল বলে জনপ্রিয়তা হারিয়ে অবলুপ্ত হয়।'- (বিশ্বরূপ সাহা, ভূমিকা, নাস্তিকদর্শনপরিচয়ঃ)।

আজীবক সম্প্রদায়ের দর্শন প্রসঙ্গে রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেন,-
'গোশালের দর্শনের প্রসঙ্গ পালি ত্রিপিটকের কয়েক জায়গায় এসেছে, কিন্তু সর্বত্রই ঐ শব্দসমূহের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে (দীঘনিকায়-১/২)। "প্রাণীর সংক্লেশের (= চিত্ত মালিন্যের) কোনো হেতু (= প্রত্যয়) নেই। অকারণেই চিত্ত মলিন হয়। চিত্তবিশুদ্ধিরও কোনো কারণ নেই। ...অহেতুকই ...বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। বল নেই, বীর্য..., দৃঢ়তা বা পুরুষকার নেই অর্থাৎ কাজে লাগে না। সব সত্তা, প্রাণী, জীব, জড় সকলেই বল-বীর্য ব্যতীতই ভবিতব্যতার বশীভূত হয়ে ছয় জন্মের সুখ-দুঃখ অনুভব করে। অন্যান্য ষাটশত এবং ছয়শত ছাড়াও চৌদ্দশত সহস্র প্রমুখ যোনি আছে। পাঁচশত কর্ম আছে, অন্যান্য পাঁচ কর্ম... তিন, এক এবং অর্ধ কর্ম। বাষট্টি মার্গ (= প্রতিপদ), বাষট্টি অন্তরকল্প, ছয় জন্ম, আট পুরুষ-ভূমি, উনিশ শত আজীবক, উনপঞ্চাশ পরিব্রাজক, উনপঞ্চাশ নাগা-বাস, কুড়িশত ইন্দ্রিয়, ত্রিশশত নরক, ছত্রিশ রজোধাতু সাত সংজ্ঞ-গর্ভ, সাত অচেতন গর্ভ, সাত নিগণ্ঠী গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত স্বর, সাতশত সাত গ্রন্থি, সাতশত সাত প্রপাত, সাতশত সাত স্বপ্ন। ...এবং আশি লক্ষ ক্ষুদ্র বৃহৎ কল্প আছে, যাকে মূর্খ-পণ্ডিত সকলেই জানতে এবং অনুগমন করে দুঃখের অন্ত করতে পারে। সেখানে শ্লীলতা ব্রহত জপ-তপ দ্বারা অপরিপক্ক কর্মকে পরিপক্ক করা যাবে এমন নয়। পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করে তার সমাপ্তি করা যায়। সুখ ও দুঃখ নির্দিষ্ট মাপে পরিমিত। সংসারে ঘটনার উৎকর্ষ হয় না। সুতোর গোলা পড়ে গেলে যেমন ঘুরতে ঘুরতে খোলে, মূর্খ ও পণ্ডিত তেমন সুখের সন্ধানে ছুটাছুটি করেই দুঃখের সমাপ্তি করে।"
এতে বোঝা গেলো মক্ষলি গোশাল ছিলেন সম্পূর্ণ ভাগ্যবাদী। পুনর্জন্ম ও দেবতাকে মেনে

তিনি বলেছেন : জীবনের রাস্তা তুলাদণ্ডের তুল্য, পাপ-পুণ্য তাতে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে না।’- (দর্শন-দিগদর্শন, পৃষ্ঠা-৭৬)।

(খ) আস্তিক দর্শন-সম্প্রদায় :

সাংখ্য-দর্শন

ভারতীয় ষড়দর্শনের অন্যতম সাংখ্যদর্শন বা সাংখ্যশাস্ত্রকে প্রাচীনতম ভারতীয় দর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মহর্ষি কপিল হচ্ছেন এই দর্শনের সূত্রকার। তাই সাংখ্যকে কখনও কখনও কপিল-মত বা কপিল-দর্শন নামেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে, কপিলের শিষ্য ছিলেন আসুরি এবং আসুরির শিষ্য ছিলেন পঞ্চশিখ। কথিত আছে যে, মুনি কপিল দুঃখে জর্জরিত মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর শিষ্য আসুরিকে পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান সাংখ্যশাস্ত্র প্রদান করেছিলেন। আসুরি সেই জ্ঞান পঞ্চশিখকে প্রদান করেন। এরপর পঞ্চশিখ-এর দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্র নানাভাবে বহু শিষ্যের মধ্যে প্রচার হয়েছিলো। পঞ্চশিখ-এর কাছ থেকে শিষ্যপরম্পরাক্রমে মুনি কপিল প্রণীত এই সাংখ্যশাস্ত্র ভালোভাবে জেনে ঈশ্বরকৃষ্ণ আর্য্যা ছন্দে ‘সাংখ্যকারিকা’ নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তা-ই এখন পর্যন্ত সাংখ্য সম্প্রদায়ের প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

সাংখ্যদর্শন কতোটা প্রাচীন তা নিয়ে বহুমত থাকলেও এর প্রাচীনত্ব নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদিতে সাংখ্য দর্শনের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (আনুমানিক ২০০-১০০ খ্রিস্টপূর্ব) কপিল একজন খ্যাতনামা ঋষি এবং সেই উপনিষদে তাঁর দর্শনের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। ভাগবতে কপিল মুনিকে চব্বিশজন অবতারের একজন বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তাঁর পিতার নাম কর্দম ঋষি এবং মাতার নাম দেবহুতি। আবার মহাভারতে কপিল ও আসুরির সাংখ্যমতের উল্লেখ পাওয়া যায় ভালোভাবেই। মহাভারতের শান্তিপর্বে আচারজ্ঞ পিতামহ ভীষ্মের জবানিতে সাংখ্যমত সম্পর্কিত দীর্ঘ উদ্ধৃতি রয়েছে। মহাভারতে সাংখ্যমতের বিস্তৃত আলোচনা থেকে এ দর্শনের প্রভাব ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় অবশ্যই। অন্যদিকে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রাচীন সূত্রগ্রন্থ ‘চরক-সংহিতা’র দার্শনিক অনুক্রমে এই সাংখ্যশাস্ত্রেরই ভিত্তি পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক সংস্কৃতিতে সকল শাস্ত্রের সার বলে কথিত প্রাচীন মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতায়ও সাংখ্যদর্শনের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। মূলত মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের দার্শনিক প্রপঞ্চটাই সংখ্যদর্শন ভিত্তিক। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বিখ্যাত প্রামাণিক গ্রন্থ কৌটিল্য প্রণীত ‘অর্থশাস্ত্র’-এ সাংখ্যদর্শনের প্রশস্তি দেখা যায়। কৌটিল্য সাংখ্যশাস্ত্রকে অনুমোদিত বিদ্যাচতুষ্টয়ের অন্যতম আন্বীক্ষিকীর অন্তর্গত শাস্ত্র হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন- সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত- এই তিনটি শাস্ত্র উক্ত আন্বীক্ষিকী-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

এসব প্রাচীন সাহিত্যে সাংখ্যমতের বহুতর উল্লেখ থেকে অনুমান করাটা অসম্ভব নয় যে, অন্তত খ্রিস্টপূর্ব চারশ বছরের পূর্ব থেকেই ভারতীয় দর্শন জগতে সাংখ্যদর্শনের জোরালো উপস্থিতি ছিলো। এবং প্রাচীন পুঁথিপত্রে এ-দর্শনের প্রভাব এতো ব্যাপক ও বিশাল যে, সাংখ্যমতের পেছনে অতি সুদীর্ঘ যুগের ঐতিহ্য স্বীকার না করলে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না বলে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন। ফলে সাংখ্যদর্শনকে খুবই প্রাচীন বলে স্বীকার করা অমূলক হবে না। আধুনিক বিদ্বানদের কেউ কেউ সাংখ্যকে গৌতম বুদ্ধের চেয়ে অনেক প্রাচীন কালের দর্শন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে সাংখ্য-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কপিলের নাম থেকেই বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তুর নামকরণ হয়েছিলো। অতএব, মোটের উপর এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাংখ্য-দর্শন অবশ্যই অত্যন্ত সুপ্রাচীন এবং তা যে ঠিক কতো পুরনো সে-বিষয়ে বর্তমানে খুব জোর করে কোন কথাই বলা যায় না।

সুপ্রাচীন কাল থেকে সাংখ্যদর্শনের এই যে সুবিস্তৃত প্রভাব, তা সত্ত্বেও আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ দর্শনের মূল গ্রন্থ সংখ্যা যৎসামান্যই বলা যায়। মহর্ষি কপিলকে এ দর্শনের সূত্রকার বলা হলেও কপিল রচিত কোন সাংখ্যসূত্র গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া যায় না। এছাড়া কপিলের শিষ্য আসুরি এবং আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখের রচিত কোন গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। হতে পারে তাদের রচিত গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত। তবে ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'য় পঞ্চশিখ প্রণীত কপিলের উপদেশসমূহের এক বৃহৎ সংগ্রহ 'ষষ্ঠিতন্ত্র'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মূলত ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত 'সাংখ্যকারিকা'-ই বর্তমানে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। ষষ্ঠিতন্ত্র নামে যে বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থ ছিলো, ঈশ্বরকৃষ্ণ সেই ষষ্ঠিতন্ত্রের কাহিনী ও প্রবাদসমূহ বর্জন করে দর্শনের আসল তত্ত্বকে সত্তরটি শ্লোকে গ্রথিত করেছেন।

তবে আধুনিক বিদ্বানদের মতে, এই সাংখ্য-কারিকাতেও সাংখ্য-দর্শনের আদি-অকৃত্রিম পরিচয় পাওয়া যায় কিনা- এ-প্রশ্নও অবান্তর নয়। বস্তুত আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই কারিকাপূর্ব সাংখ্যর রূপটি পুনর্গঠন করবার প্রয়াস করেছেন বলে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন; কেননা তাঁদের মতে কারিকায় সাংখ্য-তত্ত্বের অবিকৃত ব্যাখ্যা নেই। এছাড়া, গীতা প্রভৃতিতে সাংখ্য নামে যে-দর্শনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার মধ্যে প্রাচীন সাংখ্যের পরিভাষা এবং প্রাচীন সাংখ্যের দার্শনিক তত্ত্ব আংশিকভাবে স্বীকৃত হলেও মূল সাংখ্য-দর্শনের পরিচয় অবশ্যই নেই। অতএব স্পষ্টই বোঝা যায়, সাংখ্য-দর্শন যেমন প্রাচীন তার প্রকৃত রূপটি নির্ণয় করা তেমনই কঠিন। আদি-সাংখ্যের সাথে পরবর্তীকালের সাংখ্যমতের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও মৌলিক পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে বলে বিদ্বান গবেষকেরা মনে করেন। আপাতত সংক্ষেপে সাংখ্য-দর্শনের কয়েকটি মূল বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

'কার্য-কারণসম্পর্ক প্রসঙ্গে সাংখ্য-দর্শনে একটি সুনির্দিষ্ট মত আছে; তার নাম সৎকার্যবাদ বা পরিণামবাদ। এই মত অনুসারে কার্য একান্তভাবেই কারণের পরিণাম; কার্যের মধ্যে এমন

কিছু থাকতে পারে না যা কারণের মধ্যে- অবশ্যই অস্ফুট বা বীজাকারে- বর্তমান নয়। অতএব কার্যের মধ্যে যা বর্তমান কারণের মধ্যেও তার সত্তা অনুমেয়। পরিদৃশ্যমান জগৎ আসলে কার্য এবং তা জড়রূপ। অতএব তার কারণ হিসেবেও জড়রূপ কিছু অনুমেয়। সাংখ্যে এই জড়রূপ জগৎকারণকে প্রকৃতি বা প্রধান আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতএব প্রকৃতিকে 'primordial matter' বলা হয়। প্রকৃতির উপাদান ত্রিবিধ : সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এগুলিকে পারিভাষিক অর্থে 'গুণ' বলা হয়; অর্থাৎ চলতি কথায় আমরা গুণ বলতে যা বুঝি সাংখ্যে তা নয়। তিনটি গুণের মধ্যে সাম্যাবস্থা বিচ্যুত হলে প্রকৃতি থেকে ক্রমশ পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের উদ্ভব হয় : সাংখ্যে এই ক্রমবিকাশের সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। ক্রমবিকাশ শুরু হবার আগে পর্যন্ত প্রকৃতির যে আদিম অবস্থা তার নাম অব্যক্ত। কিন্তু প্রকৃতি ছাড়াও সাংখ্যে পুরুষের কথা আছে। পুরুষ উদাসীন, অপ্রধান এবং বহু। সাংখ্যের প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে পুরুষ বলতে চেতন আত্মা বোঝায়। কিন্তু সাংখ্যের আদি অকৃত্রিম রূপটিতেও তাইই বুঝিয়েছিল কিনা- এ বিষয়ে নানা সমস্যা আছে। অতএব সাংখ্য দর্শনে 'পুরুষ'-তত্ত্বের তাৎপর্য প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ বিচার প্রয়োজন হবে। কিন্তু এখানে একটি কথা বলে রাখা যায়। তন্ত্র নামে পরিচিত সাধন-সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও প্রকৃতি ও পুরুষ-তত্ত্বের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। তাই তন্ত্রর সঙ্গে সাংখ্যের কোনো-না-কোনো সম্পর্ক অনুমান করা প্রয়োজন। আধুনিক বিদ্বানেরা এই সম্পর্কের ব্যাখ্যায় সাধারণত বলে থাকেন, তান্ত্রিকেরা সাংখ্য-দর্শন থেকে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু... তন্ত্রের ইতিহাস এমনই প্রাচীন- এবং তন্ত্রে ওই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব এমনই অনিবার্য- যে উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করায় বাধা ওঠে। তাহলে কি এমন প্রকল্পের সুযোগ থাকে যে আদিম তন্ত্রসাধনার অন্তর্নিহিত তত্ত্বগত দিকই কালক্রমে সাংখ্যে সুস্পষ্ট দার্শনিক রূপ গ্রহণ করেছিল?'- (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৫)।

প্রচলিত সাংখ্যমত অনুযায়ী, সাংখ্যকারিকায় দুঃখকে ত্রিবিধ অর্থাৎ তিন প্রকার বলা হলেও এর ব্যাখ্যা সাংখ্যকারিকায় পাওয়া যায় না। সাংখ্য শাস্ত্রকারদের মতে এই ত্রিবিধ দুঃখ বলতে এখানে দুঃখের সংখ্যা তিন- একথা বলা হয় নি। কারণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে স্থিত অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য দুঃখ। এই তিন কালে স্থিত অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য দুঃখ ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে তিন প্রকার- এটাই বক্তব্য। কিন্তু কারিকায় এই তিন প্রকার দুঃখও চিহ্নিত না থাকায় বাচস্পতি মিশ্র তাঁর 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে- দুঃখসমূহের ত্রয় দুঃখত্রয় বা ত্রিবিধ দুঃখ। এই ত্রিবিধ দুঃখ হলো আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।

সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে আন্তর উপায়ে অর্থাৎ শরীরের ভেতর থেকে উৎপন্ন রোগ জরাদি বা কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি হেতু মানসিক দুঃখ-তাপসমূহ হলো আধ্যাত্মিক দুঃখ। এই আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার- শারীর ও মানস। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার তারতম্যের ফলে শারীর দুঃখ জন্মে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, বিষাদ এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয় না

পাওয়ার ফলে মানস দুঃখ জন্মে।
অন্যদিকে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ হলো বাহ্য উপায়ে সাধ্য অর্থাৎ শরীরের বাইরের কোন কারণ থেকে উৎপন্ন দুঃখ। মানুষ, পশু-পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর উৎস থেকে উৎপন্ন যে দুঃখ, তা হলো আধিভৌতিক দুঃখ। আর মহামারী, ভূমিকম্প, যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক প্রভৃতি দৈব বা গ্রহাদির সংস্থান থেকে উৎপন্ন যে দুঃখ, তাই আধিদৈবিক দুঃখ।

জন্ম থেকেই জীব এই দুঃখত্রয়ের ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জরিত। এই ত্রিতাপ দুঃখ থেকে চিরনিবৃত্তিই তার চরম লক্ষ্য বা পরম পুরুষার্থ। এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় কী ?
বলা হচ্ছে, দুঃখের অভিভব বা নিবারণ সম্ভব এবং তিন প্রকার দুঃখের নিবারণের তিন প্রকার উপায় আছে। যথা- (১) দৃষ্টবৎ বা লৌকিক উপায়, (২) আনুশ্রবিক উপায় তথা বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্মকলাপ এবং (৩) সাংখ্যশাস্ত্রবিহিত উপায়- তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান।

যোগ-দর্শন
ভারতীয় আধ্যাত্মদর্শনে অন্যতম প্রভাবশালী দর্শন হলো যোগ দর্শন। মহর্ষি পতঞ্জলি এই দর্শনের সূত্রকার। 'যোগসূত্র' বা 'পাতঞ্জলসূত্র'ই এই দর্শনের মূল বা সূত্রগ্রন্থ। পতঞ্জলির নাম অনুসারে এই দর্শনকে পাতঞ্জল দর্শনও বলা হয়। দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে সাংখ্য ও যোগ দর্শনের মধ্যে প্রভেদ খুবই সামান্য। তাই এ দুটোকে পরস্পর সমানতন্ত্র দর্শন বলা হয়। মহর্ষি কপিলের সাংখ্য দর্শনে স্বীকৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে কোন ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়নি। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বা পঁচিশ প্রতিপাদ্য বিষয় হলো- (১) জ্ঞ বা পুরুষ, (২) অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি বা প্রধান, (৩) মহৎ বা বুদ্ধি, (৪) অহংকার, (৫) মনস্ বা মন (৬) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক- এই পাঁচটি), (৭) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ- এই পাঁচটি), (৮) পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চসূক্ষ্মভূত (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ- এই পাঁচটি), (৯) পঞ্চস্থূলভূত বা পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি বা পৃথিবী, অপ্ বা জল, তেজ বা অগ্নি, মরুৎ বা বায়ু, আকাশ বা ব্যোম্- এই পাঁচটি)। অন্যদিকে পতঞ্জলির যোগ দর্শনে সাংখ্যের পঁচিশটি তত্ত্বের সাথে অতিরিক্ত একটি তত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব যুক্ত করে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছে বলে নিরীশ্বর-সাংখ্যের বিপরীতে যোগ দর্শনকে 'সেশ্বর-সাংখ্য'ও বলা হয়ে থাকে।

প্রাচীন ভারতে 'সাংখ্য' ও 'যোগ' এই দুটি ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের নাম প্রায় সম অর্থে ব্যবহৃত হতো। তাই যোগ-সম্প্রদায়ের এই ঈশ্বর-স্বীকৃতির ইতিহাস ঠিক কতোটা প্রাচীন- তা নিয়ে অস্পষ্টতা থাকলেও, প্রাচীন উপনিষদ পুরাণ ইত্যাদিতে যোগ ও যোগানুষ্ঠান বিধানের উল্লেখ দেখা যায়। এছাড়া প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্র গ্রন্থগুলিতে যথা- মহাভারত, গীতা ইত্যাদিতে এই দুই সম্প্রদায়কে এক বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। তবে সেসব শাস্ত্রগ্রন্থে দুটোকে এক বলা হলেও, দর্শন-সম্প্রদায়গত আলোচিত তত্ত্বের গুরুত্ব অনুযায়ী ভারতীয়

দর্শন জগতে এ দুটি পৃথক সম্প্রদায়, দুটি পৃথক প্রস্থান। কেননা দুই সম্প্রদায়ের ভিত্তি এক হলেও এদের ব্যবহারিক প্রয়োগ ভিন্ন।

যে দর্শন কেবল তত্ত্ব-নিদিধ্যাসন এবং বৈরাগ্য-অভাসের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারে বিশ্বাসী, তাকে সাংখ্য এবং যে দর্শন তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ ক্রিয়ার সাহায্যে আত্মসাক্ষাৎকারে বিশ্বাসী, তাকে যোগ বলা হয়। সাংখ্য বর্ণিত পুরুষতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, জগৎ পরিণাম, সৎকার্যবাদ এবং মোক্ষ এসব যোগসম্মত। তবে কৈবল্যলাভের উপায় সম্পর্কে যোগ দর্শনে সাংখ্যের অতিরিক্ত কিছু নির্দেশ আছে। সাংখ্য দর্শনে বিবেকজ্ঞানকেই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং কৈবল্যলাভের উপায় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে যোগ দর্শনে বিবেকজ্ঞান লাভ ও কৈবল্য প্রাপ্তির জন্য অতিরিক্ত কিছু প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াগুলিকে এককথায় 'যোগ' বলা হয়। তাই বলা হয়- 'যোগ ঠিক দর্শন নয়, যোগ; আর যোগ মানে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ- যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। যোগশাস্ত্রের আরম্ভই হয়েছে এভাবে। তার পর প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠেছে- চিত্তবৃত্তি কী কী? নিরোধ হয় কী প্রকারে? নিরোধের ফল কী? ইত্যাদি।
চিত্তের বৃত্তি সকল নিরোধ হলে যে অবস্থা হয়, তার নাম সমাধি। সমাধিরও প্রকারভেদ আছে; এভাবে আলোচনা বিস্তৃত হয়েছে। মূল কথা হলো, যোগশাস্ত্র সাধণার কথা- দর্শন-চর্চার কথা নয়।

পতঞ্জলির যোগসূত্র চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এরা যথাক্রমে সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। প্রথম সমাধিপাদে রয়েছে যোগের প্রকৃতি, লক্ষ্য ও নানা প্রকারভেদের কথা; দ্বিতীয় সাধনপাদে রয়েছে সমাধিলাভের উপায়। তৃতীয় বিভূতিপাদে রয়েছে যোগীর অলৌকিক শক্তি বা বিভূতিলাভের কথা, আর চতুর্থ কৈবল্যপাদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে মুক্তির প্রকৃতি ও প্রকারভেদের কথা।

যোগশাস্ত্র মতে যোগ-ই তত্ত্বজ্ঞান লাভ এবং দুঃখ-নিবৃত্তির প্রধান উপায়। যোগের দ্বারাই পুরুষ বা আত্মা স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। এই মতে ঈশ্বর-প্রণিধান পুরুষের প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা। তাই সাংখ্য দর্শনকে তত্ত্বমূলক দর্শন এবং যোগ দর্শনকে প্রয়োগমূলক দর্শন বলা বলা হয়ে থাকে। এছাড়াও জগতের বিবর্তন, ভ্রমের ব্যাখ্যা, মোক্ষের স্বরূপ এবং ঈশ্বর-কর্তৃত্বের বিষয়ে সাংখ্য ও যোগের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সাংখ্য-পরিণামবাদ হলো অচেতন উদ্দেশ্যবাদ, কিন্তু যোগ-পরিণামবাদ হলো সচেতন উদ্দেশ্যবাদ। যোগমতে ঈশ্বরই যেহেতু বিবর্তন-প্রক্রিয়ার কর্তা, তাই জগতের বিবর্তন কখনোই অচেতন হতে পারে না। মোটকথা, পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে জগৎ বহির্ভূত যে অতিরিক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকার করেছেন, তার ফলে জগতের অভিব্যক্তি, কল্পান্তে প্রলয় ও তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে যোগমত, সাংখ্যমত থেকে ভিন্ন হয়ে পড়েছে।

ন্যায়-দর্শন

ভারতীয় আস্তিক ষড়দর্শনের মধ্যে ন্যায়দর্শনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ন্যায়দর্শনের দুটি শাখা- প্রাচীন ন্যায় ও নব্য ন্যায়। প্রাচীন ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি গোতম। কেউ কেউ বলেন গৌতম। মহর্ষি রচিত 'ন্যায়সূত্র' হলো ন্যায়দর্শনের মূল গ্রন্থ। গৌতমের অপর নাম অক্ষপাদ (২৫০ খ্রিঃ)। তাঁর এই নাম অনুসারে ন্যায়দর্শনকে অক্ষপাদদর্শনও বলা হয়ে থাকে। অক্ষপাদ গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র বুদ্ধিবাদী বা যুক্তিবাদী।

ন্যায় দর্শনের ইতিহাস অতি প্রাচীন ও বিস্তৃত। এ দর্শনের উপর একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে মহর্ষি গৌতমের 'ন্যায়সূত্র' প্রাচীন ন্যায়দর্শনের মূল গ্রন্থ। এ গ্রন্থে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায় দুটি করে আহ্নিক বা খণ্ডে বিভক্ত। ন্যায়সূত্রের বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ হচ্ছে ভাষ্যকার বাৎসায়নের 'ন্যায়ভাষ্য'। এছাড়া উদ্দ্যোতকরের 'ন্যায়বার্তিক', বাচস্পতি মিশ্রের (নবম শতক) 'ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্য টীকা', উদয়নাচার্যের (দশম শতক) 'ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্যপরিশুদ্ধি' এবং 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি', জয়ন্ত ভট্টের (নবম-দশম শতক) ন্যায়মঞ্জরী ইত্যাদি গ্রন্থে ন্যায়সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উদয়নাচার্যের পরবর্তীকালে দ্বাদশ শতকে মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে ন্যায় দর্শনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। এই নতুন অধ্যায় নব্যন্যায় নামে পরিচিত। গঙ্গেশের যুগান্তকারী গ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণি' এই অধ্যায়ের ভিত্তিস্তম্ভ। প্রথমে মিথিলায় এবং পরে নবদ্বীপে এর প্রসার ঘটে। ন্যায়-সম্প্রদায়ের ইতিহাসে এই নব্য-ন্যায় মতের গ্রন্থটি এমনই যুগান্তর সৃষ্টি করে যে, এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থগুলি এমনকি ন্যায়সূত্র এবং বৈশেষিকসূত্রও অবহেলিত ছিলো বলে জানা যায়। সাম্প্রতিককালে এগুলির চর্চা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

ন্যায়সম্প্রদায়ে তর্কবিদ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। তবে প্রাচীন ন্যায়ে যে সকল দার্শনিক তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়, নব্যন্যায়ে তা বহুলাংশেই অনুপস্থিত। এখানে তর্কবিদ্যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে এবং দার্শনিক তত্ত্বের তুলনায় যৌক্তিক শুদ্ধতা ও যৌক্তিক বিশ্লেষণের উপরই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তারপর থেকে সম্প্রদায়টিতে কোনো নির্দিষ্ট দার্শনিক মত চর্চা করবার উৎসাহ প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে বলে বিদ্বানদের অভিমত। নব্যন্যায়ের এক ও অদ্বিতীয় উৎসাহ কেবল তর্কেই। এই নব্যন্যায় মতকে ঘিরেও বেশ কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছে। তার মধ্যে বাসুদেব সার্বভৌম (পঞ্চদশ শতক), রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য প্রমুখের রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিশ্বনাথের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' এবং অন্নংভট্টের 'তর্কসংগ্রহ' ন্যায়-প্রস্থানের বিশেষ করে নব্যন্যায়ের মূল সিদ্ধান্তগুলিকে সংক্ষেপে ও সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াস।

'নীয়তে অনেন ইতি ন্যায়ঃ।' অর্থাৎ এই শাস্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষের বুদ্ধি স্থির

মীমাংসায় উপনীত হয় বলে এই শাস্ত্রকে বলা হয় ন্যায়। ফলে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে হলে কী কী উপায় অবলম্বন করে শুদ্ধ চিন্তায় উপনীত হতে পারা যায়- তা-ই হলো ন্যায় দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। তাই যথার্থ জ্ঞান লাভের প্রণালী হিসেবেই ন্যায় দর্শনকে আখ্যায়িত করা হয়।

ন্যায় দর্শন যুক্তিমূলক বস্তুবাদী দর্শন। জ্ঞানের বিষয়ের যে জ্ঞান-ভিন্ন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তা এই দর্শনে স্বীকৃত। অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। কারণ বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের জানা বা না-জানার উপর নির্ভর করে না। শুধুমাত্র যুক্তি তর্ক বিচারের মাধ্যমে নৈয়ায়িকরা বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করে নেন বলে নৈয়ায়িকদের বস্তুবাদ যুক্তিমূলক বস্তুবাদ।

যেহেতু ন্যায় দর্শন বেদকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে, তাই ন্যায় দর্শন আস্তিক দর্শন। তবে বেদকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করলেও এ মতবাদ স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের চিন্তাধারাকে ফলপ্রসূ করার জন্য নির্দেশ দেয় বলে ন্যায় দর্শনকে 'ন্যায়বিদ্যা' বলা হয়। এই মতে 'প্রমা' বা যথার্থজ্ঞান লাভের প্রণালীকে 'প্রমাণ' বলা হয়। প্রমা এবং প্রমাণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বলে ন্যায় দর্শনকে প্রমাণশাস্ত্র নামেও অভিহিত করা হয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনুমান, শব্দ প্রভৃতি প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হয়। এই প্রমাণগুলির তত্ত্ব একমাত্র ন্যায়শাস্ত্রেই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া ন্যায়দর্শন সব শাস্ত্রকে নির্ভুলভাবে প্রতিভাত করে বলে ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎসায়ন ন্যায়দর্শনকে 'সর্বশাস্ত্রপ্রদীপ' বা 'সকল বিদ্যার প্রদীপ' নামে অভিহিত করেছেন। আবার যুক্তির দ্বারা বিষয়ের বিশ্লেষণকে 'ঈক্ষা' বা মনন বলে। এই অর্থে অনুমান হলো অন্বীক্ষা (অনু + ঈক্ষা)। ন্যায় দর্শন এই অন্বীক্ষার সমাধা করে অর্থাৎ অনুমান বা ন্যায়ের সাহায্যে বস্তুর জ্ঞানলাভের পথ উন্মুক্ত করে বলে তাকে আন্বীক্ষিকীও বলা হয়ে থাকে।

ন্যায়দর্শনে যুক্তি-তর্ক এবং জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনার প্রাধান্য থাকলেও যুক্তি-তর্ক করাই কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য নয়। ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের মতোই ন্যায়দর্শনের চরম উদ্দেশ্য বা পুরুষার্থ হলো মুক্তি বা মোক্ষ। যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা এই পরম পুরুষার্থ লাভের সহায়ক মাত্র। কী করে এই পুরুষার্থ বা মোক্ষকে লাভ করা যায়, ন্যায়দর্শন সে সম্পর্কে আলোচনা করে বলে তাকে মোক্ষশাস্ত্রও বলা হয়। ন্যায়দর্শন মানুষের পার্থিব জীবনকে দুঃখময় রূপে এবং মোক্ষপ্রাপ্তিকেই মানব জীবনের পরমলক্ষ্য হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। এই মতে অবিদ্যা হলো দুঃখের কারণ এবং তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থজ্ঞানের দ্বারাই অবিদ্যা দূর করে মোক্ষ লাভ করা সম্ভব। ন্যায় মতে জীবের মোক্ষলাভের জন্য ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজন। তাই ন্যায়দর্শনে এই ষোড়শ পদার্থের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। এই ষোলটি পদার্থ হলো- (১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫)

জাতি, (১৬) নিগ্রহস্থান। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য যথার্থজ্ঞানের প্রণালী কী হতে পারে তা ঠিক করার নিমিত্তে ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞানতত্ত্বের প্রয়োজন স্বীকার করা হয়। ন্যায় দর্শনের প্রধান তত্ত্বগুলি হলো- জ্ঞানতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্ব।

বৈশেষিক-দর্শন

ভারতীয় আস্তিক ষড়দর্শনের মধ্যে অন্যতম দর্শন হলো বৈশেষিক দর্শন। এই দর্শনের ‘পদার্থতত্ত্ব’ বা ‘বিশ্বতত্ত্বে’র জ্ঞান প্রাচীনকালে যে কোন ছাত্রের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হতো। বিশ্বতত্ত্বের আলোচনাই বৈশেষিক দর্শনের প্রধান আলোচনা। ন্যায়-সম্প্রদায়ের মতো বৈশেষিক সম্প্রদায়ও মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ বলে মনে করেন। ন্যায়দর্শনে যেমন ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের হেতুরূপে গণ্য করা হতো, বৈশেষিকদর্শনে তেমনি দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যহেতুক তত্ত্বজ্ঞানকেই মোক্ষের হেতুরূপে গণ্য করা হয়।

মহর্ষি কণাদ-এর ‘বৈশেষিকসূত্র’ হলো বৈশেষিক দর্শন-সম্প্রদায়ের মূল ও আদিগ্রন্থ। ‘বিশেষ’ পদার্থের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় এই দর্শন ‘বৈশেষিক দর্শন’ নামে সমধিক পরিচিত হয়ে থাকলেও ক্ষেত্র বিশেষে ‘কণাদদর্শন’, ‘ঔলূক্যদর্শন’, ‘কাশ্যপীয় দর্শন’ প্রভৃতি নামেও পরিচিত। এই নামগুলির পেছনে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে।
মহর্ষি কণাদ ‘কণভূক’, ‘কণভক্ষ’, ‘যোগী’, ‘উলূক’, ‘কাশ্যপ’ প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি দিবাভাগে গহন অরণ্যে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এবং রাত্রিকালে সবাই যখন নিদ্রিত থাকতো তখন তিনি আহারান্বেষণে বের হতেন। এরকম বৃত্তি উলূক বা পেচকের বৃত্তি তুল্য বলে তাঁর উলূক নামকরণ করা হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব-১১-এ এরকম কাহিনীর ছায়া রয়েছে- ‘উলূকঃ পরমো বিপ্রো মার্কণ্ডেয় মহামুনিঃ’।

অন্য এক প্রবাদে বলা হয়েছে কণাদ কঠোর যোগাভ্যাসের ফলে শিবের অনুগ্রহ লাভ করেন। শিব কণাদের তপশ্চর্যায় সন্তুষ্ট হয়ে উলূকের রূপ ধরে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং ষটপদার্থের উপদেশ দান করেন। বায়ুপুরাণেও উল্লেখ আছে যে, কণাদ পরম শৈব ছিলেন। ‘কণাদ’ নাম প্রসঙ্গে ন্যায়কন্দলীতে উল্লেখ আছে, ক্ষেত্রে পড়ে থাকা শস্যকণা ভক্ষণ করে অর্থাৎ একপ্রকার ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন বলে তাঁকে কণাদ বলা হতো। এবং এ কারণেই তাঁকে কণভূক বা কণভক্ষ বলা হতো। আবার কণাদ কাশ্যপ গোত্রীয় ছিলেন বলে তাঁর দর্শনকে কাশ্যপীয় দর্শনও বলা হয়। মোটকথা বৈশেষিক সূত্রকারের বিবিধ নাম অবলম্বনেই এই সম্প্রদায় বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করে। তবে সাধারণভাবে এই দর্শন ‘বৈশেষিক দর্শন’ নামেই পরিচিত।

বৈশেষিক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র ও নিজস্ব গ্রন্থাবলী খুব বেশি নয়। ভারতীয় দর্শন সাহিত্যে প্রাচীনতম সূত্রের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে মহর্ষি কণাদের ‘বৈশেষিক সূত্র’কে স্বীকার করা

হয়। এই গ্রন্থের প্রকৃত কোন ভাষ্যগ্রন্থ পাওয়া যায় না। লঙ্কেশ্বর রাবণ এই দর্শনের প্রাচীন ভাষ্যকার হিসেবে বেদান্ত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। আচার্য শঙ্কর এই ভাষ্যকে রাবণভাষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। বেদান্তদর্শনে বৈশেষিকমতখণ্ডন প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য রাবণভাষ্যের মতের খণ্ডন করেছেন বলে জানা যায়। অনেকের মতে আচার্য প্রশস্তপাদ (২০০ খ্রিঃ)-এর 'পদার্থধর্মসংগ্রহ' বৈশেষিক-দর্শনের সঠিক ভাষ্য না হলেও ভাষ্যস্থানীয় এবং তা প্রশস্তপাদভাষ্য নামে পরিচিত। মূলত পদার্থধর্মসংগ্রহে সূত্র ব্যাখ্যাত হয়নি, তবে সূত্রের তাৎপর্য সংক্ষেপে ও যোগ্যতার সাথে সংগৃহীত হয়েছে। এটিই বর্তমানে প্রাপ্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। উদয়নাচার্যের (১০০০-১১০০ খ্রিঃ) 'কিরণাবলী' এবং শ্রীধরাচার্যের (৯৯১ খ্রিঃ) 'ন্যায়কন্দলী' এই পদার্থধর্মসংগ্রহের উপর উল্লেখযোগ্য টীকাগ্রন্থ। এছাড়া বল্লভাচার্যের (১১০০-১১৫০ খ্রিঃ) 'ন্যায়লীলাবতী', চন্দ্রানন্দের 'বৃত্তি', শঙ্কর মিশ্রের (১৪৬২ খ্রিঃ) 'বৈশেষিকসূত্রোপস্কার' প্রভৃতি বৈশেষিক দর্শনের উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ।

বৈশেষিক সম্প্রদায়ের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলী খুব বেশি না হলেও ভারতীয় দর্শনে বৈশেষিক-মতের আলোচনা সুবিশাল। কেননা বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ন্যায় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট এবং দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে উভয়েরই প্রতিপাদ্য বিষয় অভিন্ন বা প্রায়-অভিন্ন। এজন্যেই ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে সমানতন্ত্র দর্শন বলা হয়। ফলে বহু গ্রন্থেই ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের তত্ত্বসমূহ একই সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হলেও আচার্য উদয়নের কাল থেকেই উভয় দর্শনের তত্ত্বসমূহ একই সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক হিসেবে আলোচিত হতে দেখা যায়। এভাবে পরবর্তীকালে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন চর্চায় শিবাদিত্যের (১১৫০-১২০০ খ্রিঃ) 'সপ্তপদার্থী', লৌগাক্ষি ভাস্করের 'তর্ককৌমুদী', রঘুনাথ শিরোমণির (১৫০০-১৫৫০ খ্রিঃ) দীধিতি বা 'পদার্থতত্ত্বনিরূপণ', বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চাননের (১৬০০-১৬৫০ খ্রিঃ) মুক্তাবলী টীকা সহ 'ভাষাপরিচ্ছেদ' এবং অন্নংভট্টের (১৫৫০-১৬০০ খ্রিঃ) 'তর্কসংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থে বৈশেষিকসম্মত মত এবং ন্যায়সম্মত মতের পার্থক্য প্রাসঙ্গিক স্থলে উল্লেখ করা হলেও যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে যে কোন একটি মতেরই উল্লেখ আছে।

ন্যায় ও বৈশেষিক এই দুই সমানতন্ত্র দর্শনে প্রধান প্রধান বিষয়ে উভয় সম্প্রদায় একমত হলেও কোন কোন অপ্রধান বিষয়ে অবশ্য উভয় সম্প্রদায়ের মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ন্যায়শাস্ত্র প্রধানত প্রমাণশাস্ত্র। তারা প্রমাণ চতুষ্টয়বাদী। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ- এই চারটি প্রমাণ ন্যায়দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় প্রমেয় বা পদার্থ। বৈশেষিক দর্শন মুখ্যত প্রমেয়শাস্ত্র বা পদার্থশাস্ত্র। নৈয়ায়িকদের স্বীকৃত চারটি প্রমাণের মধ্যে বৈশেষিকেরা প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুটি প্রমাণ স্বীকার করেছেন। উপমান ও শব্দ প্রমাণকে বৈশেষিকেরা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অন্তর্গত করেছেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু পরিভাষাগত ভিন্নতাও লক্ষ্য করা যায়।
ন্যায়দর্শনে ষোড়শ পদার্থের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে সপ্ত পদার্থের কথা

বলা হয়েছে। তবে এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। পদার্থ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের সংখ্যার পার্থক্য দুটি ভিন্ন বিন্যাস-প্রক্রিয়ার পার্থক্য মাত্র। বস্তুত সামগ্রিকভাবে জগতের পদার্থ বিষয়ে উভয় মতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ন্যায় দর্শনে ষোড়শ পদার্থের মাধ্যমে যে সকল তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, বৈশেষিক দর্শনে তা সপ্তপদার্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ন্যায় দর্শনে যেমন প্রমাণের আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে, বৈশেষিক দর্শনে তেমনি ভৌততত্ত্ব বা বিশ্বতত্ত্বের আলোচনাই গুরুত্ব পেয়েছে। বিশ্ববৈচিত্র্য তথা পার্থিব জগতকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৈশেষিক সম্প্রদায় সাতটি পদার্থ স্বীকার করেছেন। এই সাতটি পদার্থ হলো- দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। জগতে এমন কিছু নেই যা এই সাতটি পদার্থের কোন না কোনটির অন্তর্গত নয়। সুতরাং, বিশ্বের মৌলিক তত্ত্ব হলো সাতটি। অবশ্য 'অভাব' বা সপ্তম পদার্থটি সংক্রান্ত কিছু মতভেদ আছে বলে জানা যায়। দেবীপ্রসাদ বলেন, খুব সম্ভব, বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রাচীন পর্যায়ে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে 'অভাব'-এর কথা স্বীকৃত হয়নি; প্রশস্তপাদই প্রথম 'অভাব' হিসেবে সপ্তম পদার্থের কথা স্বীকার করেন- তাঁর আগে পর্যন্ত বৈশেষিক দর্শনে শুধু ছয়টি পদার্থ স্বীকৃত হয়েছিলো। অর্থাৎ অনেক সময় বৈশেষিক-দর্শনকে ষট্পদার্থ-বর্ণন বলা হয়। দ্রব্য নামের পদার্থ আবার নয় রকম- পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। এর মধ্যে প্রথম পাঁচটি দ্রব্যকে,- পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজ ও আকাশকে- পঞ্চভূত বলে। অর্থাৎ এই পাঁচটি দ্রব্যের সাধারণ সংজ্ঞা 'ভূত' বা ম্যাটার। এই মতে, পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ ছাড়া প্রথম চারটির মূলে রয়েছে চার-রকম পরমাণু। পৃথিবী আদি পরমাণুপুঞ্জ। বৈশেষিক-মতে, পরমাণু নিত্য, তার উৎপত্তি নেই, বিনাশ নেই। এইজন্য বৈশেষিক-দর্শনকে পরমাণুবাদ আখ্যা দেওয়া হয়; কারণ, অচেতন ও নিত্য পরমাণুপুঞ্জই সমস্ত জন্য-দ্রব্যের মূল উপাদান-কারণ বলে এই মতে স্বীকৃত।

মীমাংসা-দর্শন

ভারতীয় দর্শনে যে ছয়টি সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় নিঃসংশয়ে বৈদিক বা বেদমূলক। এদের একটি হলো পূর্ব-মীমাংসা বা সংক্ষেপে মীমাংসা, অন্যটি উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত।

সাধারণত বেদের যে চারটি পর্যায় স্বীকার করা হয়- সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ- এদের মধ্যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে বলা হয় কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে, বিশেষ করে যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণগুলিতে বেদের যাজ্ঞিক ক্রিয়াকর্মের স্বরূপ এবং কর্মবিষয়ক বেদবাক্যসমূহের তাৎপর্য বিবৃত হয়েছে। তার বিচারকে বলা হয় পূর্ব-মীমাংসা। আর জ্ঞানকাণ্ড, অর্থাৎ বেদের অন্তিমভাগ বা উপনিষদ (বেদান্ত) যার মূখ্য বিষয় হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যেখানে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি এবং জ্ঞান-বিষয়ক বাক্যসমূহের অর্থ বিবৃত হয়েছে, তার বিচারকে বলা হয় উত্তর-মীমাংসা। কিন্তু দার্শনিকদের ব্যবহার অনুসারে জৈমিনি প্রবর্তিত পূর্বমীমাংসা বোঝাতে কেবল 'মীমাংসা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, আর

উত্তর-মীমাংসা বোঝাতে সাধারণভাবে ‘বেদান্ত’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। পূর্ব-মীমাংসার আরেক নাম ধর্ম-মীমাংসা বা কর্ম-মীমাংসা, এবং উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্তের আরেক নাম ব্রহ্ম-মীমাংসা। তবে এ দুই শাস্ত্রের জন্য যথাক্রমে মীমাংসা দর্শন ও বেদান্ত দর্শন এই দুটি নামই সমধিক প্রচলিত। মীমাংসাদর্শন সম্পূর্ণরূপে বেদমূলক। এতে স্বাধীন মতবাদের অবকাশ নেই বললেই চলে।

মীমাংসাশাস্ত্র দর্শন হলেও অনেকাংশে তা ব্যাকরণ এবং ন্যায়শাস্ত্রের বাদার্থ বা শব্দখণ্ডের মতো। পদশাস্ত্র হলো ব্যাকরণ এবং প্রমাণশাস্ত্র হলো ন্যায়। এই পদবাক্যপ্রমাণ-তত্ত্বজ্ঞ না হলে প্রাচীনকালে কেউ সুপণ্ডিত বলে বিবেচিত হতেন না। তাই প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও ব্যাখ্যায় এগুলির প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। এ প্রেক্ষিতে আচার্যরা মীমাংসাকে বাক্যশাস্ত্রও বলে থাকেন। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের তাৎপর্যবোধে মীমাংসাশাস্ত্র উপায়স্বরূপ বলে এই শাস্ত্রকে ‘ন্যায়’ও বলা হতো। একারণেই হয়তো মীমাংসাশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ ন্যায়নামেও অভিহিত হয়েছে। যেমন- ‘ন্যায়কণিকা’, ‘ন্যায়মালা’, ‘ন্যায়প্রকাশ’ প্রভৃতি। পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসার এক একটি অধিকরণ বা বিচারের সিদ্ধান্তকেও ন্যায় বলা হতো। মীমাংসা এবং ন্যায়- এই দুটি শব্দই প্রাচীনকাল থেকে মীমাংসাদর্শনরূপ অর্থে প্রচলিত ছিলো। তার্কিক আচার্যরা ন্যায় শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে গ্রহণ করে তাঁদের দর্শনের নামই করেছিলেন ন্যায়দর্শন। পরবর্তীকালে যুক্তিমূলক দর্শনের একটি ভিন্ন প্রস্থান হিসেবে ন্যায়দর্শনের উৎপত্তি হওয়ায় ন্যায় বলতে এখন আর মীমাংসাদর্শনকে বোঝায় না।

বস্তুত বৈদিক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর বৈদিক বাক্যের অর্থ এবং বৈদিক বিধান নিয়ে নানা ধরনের বিবাদ ও অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়। এ সময়ে বেদ-বিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অতি প্রবল আকার ধারণ করলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বেদবাক্য ও বেদবিধি নিয়ে নানা ধরনের সংশয় দেখা যায়। বেদের উপজীব্য যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ড নামক ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানের অসারতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধারক-বাহক যজমান পুরোহিত ব্রাহ্মণদের জীবিকা সংশয় দেখা দেওয়ার প্রেক্ষিতে এ ধর্মসংকট কাটিয়ে উঠার জন্য স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্র বেদবাক্যের তাৎপর্য নির্ধারণে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও প্রবল সংকটকে কাটিয়ে উঠতে পারে না। কেননা ইতোমধ্যে ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ পরিশ্রমলব্ধ কর্মানুষ্ঠানের চাইতে জ্ঞানযোগের মাধ্যমে ধর্ম ও মোক্ষের সন্ধানে প্রবৃত্ত বিভিন্ন জ্ঞান-দর্শনের আবির্ভাব হওয়ায় যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ডের জ্ঞানতাত্ত্বিক দার্শনিক ভিত্তিশূন্যতা দেখা দেয়। মহর্ষি জৈমিনি বৈদিক কর্মকাণ্ডের এই গভীর সংকটকে দূর করার জন্য বেদবাক্যের যথার্থ ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন কর্মের স্বরূপ ও অনুষ্ঠানপ্রণালী স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার অভিপ্রায়ে মীমাংসাসূত্র রচনা করেন।

মীমাংসা-দর্শনের প্রাচীনতম এবং মূল গ্রন্থ হলো জৈমিনির ‘মীমাংসাসূত্র’। ভারতীয় দর্শনের সূত্রগ্রন্থ হিসেবে এটিকেই সর্বপ্রাচীন হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যদিও তার রচনাকাল

সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায় না। বিভিন্ন বিদ্বান-গবেষকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রিস্টীয় ২০০-এর মধ্যে হওয়াই সম্ভব। তবে আধুনিক বিদ্বানমহলে মীমাংসাসূত্র'র রচনাকাল খ্রিস্টীয় ২০০-র কিছু পূর্ববর্তী বলে বিবেচিত হয়। জৈমিনির রচনা বলেই মীমাংসাসূত্রকে 'জৈমিনিসূত্র'ও বলা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে মীমাংসাসূত্রের উপর অনেক ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয় বলে ধারণা করা হয়। তবে এসব ভাষ্যগ্রন্থের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শবরস্বামীর 'শাবরভাষ্য'ই প্রাচীনতম। এই শাবরভাষ্যেই মীমাংসাসূত্রের প্রাচীনতর ব্যাখ্যাকারদের কথা পাওয়া যায়।

শবরের কাল-নির্ণয়ও অনিশ্চিত। শুধু এটুকু ধারণা করা হয় যে, শবর খ্রিস্টীয় ৪০০-এর পূর্ববর্তী হবেন। এবং মীমাংসা-দর্শনের সমস্ত আলোচনার প্রধানতম ভিত্তি এই শাবরভাষ্যই। এমনও শোনা যায়- 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থের প্রণেতা ভর্তৃহরি শবরস্বামীর পুত্র। প্রবাদ আছে- জৈনগণের নিকট থেকে দূরে থাকবার নিমিত্তে তিনি নাকি শবরের বেশ ধারণ করে শবরবসতিতে বাস করতেন। শবরস্বামী জৈমিনিসূত্রের শুধু বারো অধ্যায়ের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। তাঁর ভাষ্যের ভাষা অতি সরল ও প্রসাদগুণযুক্ত। প্রসঙ্গত, শাবরভাষ্য এবং পতঞ্জলির মহাভাষের মতো সরল ভাষায়, ছোট ছোট বাক্যবিন্যাসে আর কোন ভাষ্যগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হতে দেখা যায় নি। আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের ভাষাও সরল ও সাহিত্যগন্ধী বলে অনেকে উল্লেখ করেন। তবে এর বাক্যগুলি শাবরভাষ্যের মতো স্বল্পপদ নয়। শাবরভাষ্য ছাড়া জৈমিনিসূত্র বোঝা অসম্ভব বলেই বিজ্ঞজনের অভিমত।

শবরের পর মীমাংসকাচার্যদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুজন হলেন- প্রভাকর মিশ্র ও কুমারিল ভট্ট। উভয়েই শাবরভাষ্যের ব্যাখ্যা করেছেন। প্রভাকরের প্রধান ও বড়ো ব্যাখ্যাগ্রন্থটির নাম 'বৃহতী' এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার নাম 'লঘ্বী'। কুমারিলের ব্যাখ্যাগ্রন্থের তিনটি খণ্ড- 'শ্লোকবার্তিক', 'তন্ত্রবার্তিক' এবং 'টুপ্-টীকা'। কিন্তু প্রভাকর ও কুমারিল উভয়ের ব্যাখ্যায় এতোটাই মৌলিক পার্থক্য যে, তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে মীমাংসামত দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রভাকরের নাম থেকে প্রথমটিকে প্রাভাকর-সম্প্রদায় এবং কুমারিল-ভট্টর নাম থেকে দ্বিতীয়টিকে ভাট্ট-সম্প্রদায় নামে আখ্যায়িত করা হয়। প্রচলিত মতে প্রভাকর ছিলেন কুমারিলের শিষ্য এবং কুমারিল তাঁকে সম্ভবত বিদ্রূপ করেই গুরু আখ্যা দিয়েছিলেন, এ কারণে প্রভাকর-মত গুরুমত নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মীমাংসা দার্শনিকেরা মূলত বেদের প্রামাণ্য প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেই জ্ঞানের স্বরূপ, যথার্থ ও অযথার্থ জ্ঞানের পার্থক্য নির্ণয়, যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায় এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। মীমাংসা দর্শন মতে, সমস্ত বস্তুই হয় প্রমাণ অথবা প্রমেয়ের অন্তর্গত। এই মতে, প্রমাণ হলো প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের করণ বা উপায়, আর প্রমেয় হলো যথার্থ জ্ঞানের বিষয়।

মূলত মীমাংসা দর্শনের প্রধান উপজীব্য হলো বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈদিক কর্মকাণ্ডের স্বতসিদ্ধতা প্রমাণ করা। যজ্ঞকর্ম যে নিষ্ফল নয় তার আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এ জন্য প্রয়োজন হয় দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার। ভারতীয় দর্শনের নিয়ম অনুযায়ী যে কোন দর্শনই প্রচলিত কিছু বিষয়কে যেমন বস্তু, জগত, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, পাপ-পূণ্য, স্বর্গ-নরক, মোক্ষ, ধর্ম, প্রমাণ-প্রমেয় ইত্যাদি বিষয়কে নিজ নিজ মত অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে হয়। আর তা করতে গিয়ে দার্শনিক বিচারে অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের তত্ত্বের যেখান থেকে যেটুকু স্বীকার করা আবশ্যক তা নিজের মতো করে স্বীকার করা এবং যেখানে বিরোধিতার প্রয়োজন সেখানে বিরোধী যুক্তি উপস্থান করতে মীমাংসকরা কার্পণ্য করলেন না। ফলে একদিকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রচণ্ড অবিশ্বাসী এ দর্শনের বস্তুবাদী বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিস্রোতের পাশাপাশি যজ্ঞানুষ্ঠানের মতো একটি আদিম কুসংস্কারের মধ্যে যাদুক্ষমতা আরোপ প্রচেষ্টার চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন দর্শনটিকে জটিল স্ববিরোধিতায় ঠেলে দিয়েছে বলে একালের বিদ্বানেরা মনে করেন।

মীমাংসাদর্শন সাংখ্য বৌদ্ধ বা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মতো একটা সুশৃঙ্খল সুসংহত দার্শনিক প্রস্থানরূপে গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছে যাগযজ্ঞসম্পৃক্ত মন্ত্ররাশির অর্থবিচারকে উপলক্ষ করে। এই দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য কোন বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভাবন ও প্রচার নয়। মুখ্য উদ্দেশ্য যাগযজ্ঞের সামাজিক প্রয়োজন অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত রাখার জন্য মন্ত্রার্থবিচার। এই বিচারের প্রসঙ্গেই প্রয়োজনানুরূপ দার্শনিক যুক্তিতর্ক বিক্ষিপ্তভাবে উপস্থিত হয়েছে।

বেদান্ত-দর্শন

উত্তর-মীমাংসার নামান্তর হলো বেদান্ত। ভারতীয় ছয়টি আস্তিক দর্শনের মধ্যে বেদান্তদর্শনকে শ্রেষ্ঠ ভাববাদী দর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা ভাববাদের চূড়ান্ত রূপ এই বেদান্তদর্শনের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'বেদান্ত' বলতে বোঝায় বেদের অন্ত বা শেষ। বৈদিক সংস্কৃতির ধারক হিসেবে হিন্দুদের কাছে বেদ সকল জ্ঞানের আকর বলে বিবেচিত। বলা হয়ে থাকে, প্রাচীন মুনি-ঋষিরা তাঁদের উপলব্ধ সত্যকে যে সাহিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে রেখেছেন, তা-ই বেদ। বেদই আস্তিক ষড়দর্শনের ভিত্তি ও উৎস। বেদের চারটি অংশ- মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। সুতরাং বেদের অন্ত অর্থাৎ উপনিষদকেই মুখ্যত বেদান্ত নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ, উপনিষদ তত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা ও সমর্থনই বেদান্তদর্শন।

বেদের চারটি অংশের মধ্যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। কর্মকাণ্ড ক্রিয়া-প্রধান। এতে মন্ত্রের সংকলন ও বিভিন্ন যাগযজ্ঞের বর্ণনা রয়েছে। অপরদিকে জ্ঞানকাণ্ড বিচার-প্রধান। বেদের বিভিন্ন মন্ত্র ও ক্রিয়াকর্মের তাৎপর্য বিচারই এই অংশের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই বিচার চরম পরিণতি লাভ করেছে

উপনিষদ অংশে। উপনিষদ বিভিন্ন কালে রচিত হয়েছে এবং তা সংখ্যায় বহু। এযাবৎ ১১২ খানা উপনিষদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান উপনিষদগুলি হলো ঈশ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, কৌষীতকি, মৈত্রী, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি।

উপনিষদের অর্থ হলো গুরু কর্তৃক শিষ্যের নিকট বর্ণিত রহস্য। ঈশ ব্যতীত সর্বপ্রাচীন (আনুমানিক ৭০০ খ্রিস্টপূর্ব) উপনিষদ ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক গদ্যে রচিত, তার পরবর্তী উপনিষদসমূহ কেবল পদ্যে অথবা গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত। বিভিন্ন উপনিষদে বেদের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন খ্যাত-অখ্যাত দার্শনিক কর্তৃক উপনিষদের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট পার্থক্য আছে। উপনিষদগুলির মুখ্য বিষয় ছিলো লোক বা জগৎ, ব্রহ্ম, আত্মা বা জীব, পুনর্জন্ম এবং মুক্তি।

বৈদিক সাহিত্যের কালানুক্রমিক বিচারে উপনিষদ হলো বেদের সর্বশেষ স্তর। আবার পাঠক্রমের দিক থেকে উপনিষদকে সর্বশেষ স্তরের পাঠ বলা হয়। উৎকর্ষের দিক থেকেও উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যের সর্বোচ্চ স্তর বা পরিপূর্ণ বিকাশ বা সর্বশেষ পরিণতি বলা যায়। প্রাচীন আর্য বা হিন্দু সমাজ কর্তৃক প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম ধর্মে মানুষের জীবনকাল চারটি আশ্রমে বিভক্ত, যথা- ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য জীবনে বেদের মন্ত্রভাগ বা সংহিতা পাঠ করতে হয়। গার্হস্থ্য জীবনে ব্রাহ্মণ পাঠ এবং ব্রাহ্মণোক্ত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করতে হয়। বানপ্রস্থকালে কর্ম হতে অবসর প্রাপ্তি এবং এই সময়ে আরণ্যকই হলো পঠনীয় শাস্ত্র। শেষ পর্যায়ে ভোগ-বিরতির সন্ন্যাস জীবন। সন্ন্যাস আশ্রমে উপনিষদ পাঠের নির্দেশ রয়েছে। উপনিষদে বৈদিক চিন্তাধারার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে বলে উপনিষদভিত্তিক এই তত্ত্বদর্শনই বেদান্তদর্শন নামে পরিচিত।

বেদান্ত-সম্প্রদায়ের প্রধানতম প্রচেষ্টাই হলো উপনিষদ-প্রতিপাদ্য তত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা ও সমর্থন। কিন্তু উপনিষদগুলিতে দার্শনিক তত্ত্বাবলী আলোচিত হলেও সে-আলোচনা বহুলাংশেই বিক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট; তাছাড়া এ-আলোচনা যুক্তিতর্কমূলক সুসংবদ্ধ দার্শনিক আলোচনা নয় এবং নানা উপনিষদে নানা রকম আলোচনার মধ্যে ঠিক কোন্ তত্ত্বকে প্রকৃত উপনিষদ-প্রতিপাদ্য তত্ত্ব বলা হবে সে-কথা নির্ণয় করাও সহজ নয়। স্বভাবতই, উপনিষদের অনুগামী পরবর্তী দার্শনিকেরা উপনিষদ-প্রতিপাদ্য মূল দার্শনিক তত্ত্বকে সনাক্ত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং এই তত্ত্বের সুসংবদ্ধ দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে চাইলেন। এ-প্রচেষ্টার প্রথম পরিচয় বেদান্তসূত্র নামের গ্রন্থ। উপনিষদ-প্রতিপাদ্য মূল দার্শনিক তত্ত্ব বোঝাবার জন্য ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই কারণেই বেদান্তসূত্রের নামান্তর ব্রহ্মসূত্র। অর্থাৎ, বেদান্তের ব্রহ্ম বিষয়ক তত্ত্ব ও বিবিধ ধারণার উৎস উপনিষদ হলেও একই বিষয়ে বিভিন্ন উপনিষদগুলির নিজস্ব ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ঋষির মধ্যে উপলব্ধ সত্য সম্পর্কে পারস্পরিক যে আপাত বিরোধ দেখা দেয়, তা নিরসনকল্পে উপনিষদগুলির মধ্যে

নিহিত চিন্তাগুলিকে সমন্বয় করে সুশৃঙ্খলভাবে সংবদ্ধ করার প্রয়োজনে মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র রচনা করেন। এই ব্রহ্মসূত্রই ব্রহ্মবাদ বা বেদান্তদর্শনের মূল সূত্রগ্রন্থ।

উপনিষদগুলি যেহেতু পূর্বাপর কোন একটি বিশেষ মতবাদের শিক্ষা দেয়নি, বরং আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তির উপযোগী বিভিন্ন প্রকার মতবাদই উপনিষদগুলিতে স্থান পেয়েছে, তাই বিভিন্ন উপনিষদের মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য আছে বলে বাদরায়ণ মনে করেন। এই মূলগত ঐক্যই হলো ব্রহ্মবাদ। এই ব্রহ্মবাদকে কেন্দ্র করেই মহর্ষি বাদরায়ণ কয়েকটি মূল সূত্র সংবদ্ধ করেন। এবং এই সূত্রগুলি ঘিরেই তার ব্যাখ্যা-বিস্তৃতি হিসেবে বাকি সব সূত্র-সমন্বয়ে গোটা ব্রহ্মসূত্র রচিত।

সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম চারটি সূত্র চতুঃসূত্র বা সূত্রচতুষ্টয় নামে পরিচিত। এই চারটি সূত্রকেই ব্রহ্মসূত্রের প্রধান ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সূত্র বলে মনে করা হয়। এমনও বলা হয় যে, চতুঃসূত্রীর সঠিক উপলব্ধি হলেই সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের উপলব্ধি হবে। এই চারটি সূত্র হলো-

(১) 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'।। (ব্রহ্মসূত্র-১/১/১)।।
ভাবার্থ : যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ফল ক্ষণস্থায়ী জানার পর আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজনীয় গুণগুলি অর্জন করে সর্বপ্রকার সংশয় মুক্ত হয়ে 'অতঃপর এখান থেকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' শুরু হলো।
(২) 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'।। (ব্রহ্মসূত্র-১/১/২)।।
ভাবার্থ : জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁর থেকে ঘটে, তিনিই ব্রহ্ম।
(৩) 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'।। (ব্রহ্মসূত্র-১/১/৩)।।
ভাবার্থ : ব্রহ্ম সম্পর্কিত যথার্থ জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় উপনিষদ শাস্ত্র, কারণ শাস্ত্রই তার প্রমাণ এবং তা সর্বসম্মত।
(৪) 'তত্ত্ব সমন্বয়াৎ'।। (ব্রহ্মসূত্র-১/১/৪)।।
ভাবার্থ : কারণ ব্রহ্ম হলেন সেই উপনিষদ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁর ব্রহ্মসূত্রে সর্বসমন্বয় প্রমাণ করতে গিয়ে একদিকে যেমন উপনিষদগুলির অভ্যন্তরীণ বিরোধ পরিহার করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ-বক্তা যে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন, সেসবই এক ব্রহ্মের বিষয়ে। মোটকথা, ব্রহ্ম, জীব, জগৎ ইত্যাদি সম্বন্ধে নিজ সিদ্ধান্ত কী, এবং বিরোধী দার্শনিক সিদ্ধান্ত যে যুক্তিসঙ্গত নয় এই হলো বেদান্তসূত্রের প্রতিপাদ্য।

কিন্তু শুধুমাত্র এই সূত্রগ্রন্থটি পাঠ করে প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা একান্তই কঠিন। সূত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অনেক সময় পূর্ণাঙ্গ বাক্যও নয়। অথচ বেদান্ত সম্প্রদায়ের সমস্ত পরবর্তী

দার্শনিকের কাছেই মূল দার্শনিক গ্রন্থ বলতে এইটিই; অতএব তাঁরা সকলেই বেদান্তমত ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন। এবং সকলের ব্যাখ্যাও এক নয়। কেননা, ব্রহ্মসূত্রের অতিসংক্ষিপ্ত শ্লোকবিশিষ্ট সূত্রগুলি স্বাভাবিকভাবেই অতি দুর্বোধ্য হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে সূত্রগুলির ব্যাখ্যাকল্পে বিভিন্ন আচার্য কর্তৃক যেসব ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে তাতে বেদান্ত ভাষ্যকারদের নিজস্ব বিশ্বাস, ধারণা ও মতভেদ অনুযায়ী অধিকারীভেদে বিভিন্ন উপসম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক উপসম্প্রদায়ের দার্শনিকই দাবি করেছেন, তাঁদের প্রতিপাদ্য দার্শনিক তত্ত্বই প্রকৃত উপনিষদ-প্রতিপাদ্য তত্ত্ব; কিন্তু বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ের দাবির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে এবং অনেক সময় বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা পরস্পরকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতেও দ্বিধা করেননি। এই উপসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান বলতে দুটি- অদ্বৈত-বেদান্ত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্ত।

অদ্বৈতমতে নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র বা অদ্বিতীয় সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। অজ্ঞানবশে আমরা পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তাকে সত্য বলে মনে করি, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হলে বোঝা যাবে চিৎস্বরূপ আমি একমাত্র সত্য। তারই নাম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম নির্গুণ, অর্থাৎ কোন গুণের সাহায্যে তাঁকে ব্যাখ্যা করা চলে না। ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় কিছুর কল্পনা অজ্ঞানের পরিণাম। ওই অজ্ঞানের নামান্তর মায়া; তাই অদ্বৈতবাদকে মায়াবাদ বলে উল্লেখ করবার প্রথাও বিরল নয়।
অন্যদিকে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারেও যদিও ব্রহ্মই চূড়ান্ত সত্য, তবুও ব্রহ্মকে নির্গুণ আখ্যা দেওয়া ভুল। বরং ব্রহ্মকে অনন্ত-কল্যাণগুণের আধার মনে করতে হবে। তিনিই ঈশ্বর; উপাসনাদি সৎকর্মের সাহায্যে তাঁর করুণার উদ্রেক করতে পারলেই জীবের মুক্তি। পরিদৃশ্যমান জড়জগৎ এবং জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য মিথ্যা নয়। কেননা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মধ্যেই চিৎ এবং অচিৎ- চেতনা এবং জড়- উভয় বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। চিৎ বৈশিষ্ট্য থেকেই জীবাত্মার সৃষ্টি, অচিৎ থেকে জড়জগতের । ব্রহ্ম চিৎ-অচিৎবিশিষ্ট। জীবাত্মার সঙ্গে জড়দেহের সম্পর্কই বন্ধনের স্বরূপ এবং তার মূলে আছে জন্মজন্মান্তরের কৃতকর্মজনিত অজ্ঞান। ঈশ্বরের করুণায় জীবাত্মা এই অজ্ঞান কাটিয়ে মুক্তিলাভ করবে।

অদ্বৈত-বেদান্তের সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক শঙ্করাচার্য। কিন্তু তিনি এ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নন। তাঁর গুরুর নাম গোবিন্দ এবং গোবিন্দের গুরুর নাম গৌড়পাদ। গৌড়পাদ পদ্যে মাণ্ডুক্য-উপনিষদের একটি ব্যাখ্যা রচনা করেছিলেন, তার নাম মাণ্ডুক্যকারিকা। এটির রচনাকাল ৭৮০ খ্রিস্টাব্দ বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু অদ্বৈত-সম্প্রদায়ের আচার্য পরম্পরা এর চেয়ে অনেক প্রাচীন হওয়াই সম্ভব বলে বিদ্বানেরা মনে করেন। তবুও অদ্বৈতবাদের সঙ্গে শঙ্করাচার্যের নামই বিশেষভাবে জড়িত, কেননা তিনিই অদ্বৈতবাদের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর শঙ্করের রচনাবলীও সত্যিই সুবিশাল। তার মধ্যে অবশ্য ব্রহ্মসূত্র'র ভাষ্যই সবচেয়ে বিখ্যাত। এই ভাষ্যের নাম শারীরক-ভাষ্য। 'শারীরক' শব্দের অর্থ লক্ষণীয়- 'শরীর শব্দের উপর কুৎসার্থে কণ্ প্রত্যয় করে শারীরক-শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। শারীরক

শব্দের অর্থ কুৎসিত শরীরবাসী জীবাত্মা।
আর বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক আচার্য রামানুজ। তাঁর রচিত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য। ধারণা করা হয় মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য অনুসারে ১০১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও আচার্য-পরম্পরার ইতিহাস অত্যন্ত সুপ্রাচীন বলেই অনুমিত হয়।

বেদান্তের আরো উপসম্প্রদায় রয়েছে। কিন্তু সেগুলি আপাতত আলোচ্য নয়। মোটকথা, পূর্ব-মীমাংসার মতোই বেদান্তকেও শ্রুতিমূলক বা বেদমূলক অর্থে আস্তিক বলা যায়। কেননা পূর্ব-মীমাংসার মতোই এই সম্প্রদায়টির উদ্ভবের সঙ্গেও প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের সুস্পষ্ট ও ধারাবাহিক যোগ আছে। বেদান্ত দর্শন মানেই উপনিষদের দর্শন- অন্তত বৈদান্তিকদের মতে একান্তভাবেই তাই। অবশ্যই উত্তরকালের বৈদান্তিক আচার্যরা বিপক্ষ-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এমন অনেক দার্শনিক প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন যার পরিচয় উপনিষদগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি প্রসঙ্গে পরবর্তী বৈদান্তিকদের আলোচনা উল্লেখ করা যায়। কেননা ইতোমধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা এ-জাতীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন যার সঙ্গে উপনিষদ-প্রতিপাদ্য দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গতি হয় না। স্বভাবতই উপনিষদের সমর্থনে এ-জাতীয় প্রসঙ্গেরও প্রত্যুত্তর রচনা করা প্রয়োজন হয়েছে। তবে এখানেও মনে রাখা দরকার, উত্তরকালের বৈদান্তিকেরা যত নতুন ও জটিল দার্শনিক আলোচনার অবতারণাই করুন না কেন, তার সবটুকুই একটি মূল কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ। অর্থাৎ, স্বাধীন যুক্তি বা বিচার-বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে তাঁরা কেউই বিশ্বের কোনো নতুন ব্যাখ্যা খোঁজেননি; তার বদলে উপনিষদ-প্রতিপাদ্য পুরানো ব্যাখ্যাটিরই নতুন সমর্থন অন্বেষণ করেছেন।

৪.০ : ভারতীয় দর্শনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

...

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নানান পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এরকম কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

.

(০১) দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা। এটি ভারতীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় দর্শনের ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুসরণ করলে দেখা যায় ভারতীয় দার্শনিকরা পরস্পর পরস্পরের দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করেন এবং একে অপরকে ভালোভাবে জানতে আগ্রহী হন। ফলে প্রতিটি দর্শন সম্প্রদায় নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার আগে সর্বপ্রথম বিরোধী পক্ষের মতবাদটি ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করেছেন। একে বলা হয় পূর্বপক্ষ। এরপর যুক্তির সাহায্যে পূর্বপক্ষকে সমালোচনা ও খণ্ডন করা হয়েছে। একে বলা হয় উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত। এভাবেই পারস্পরিক ব্যাখ্যা ও সমালোচনার মাধ্যমে ভারতবর্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন-চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। আর তাই আমরা ভারতীয় দর্শনের একটি বিশেষ মতবাদ জানতে গিয়ে অন্যান্য মতবাদগুলিরও পরিচয় পেয়ে যাই। যেমন, ন্যায় দর্শনের কোন মূলগ্রন্থ অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমাদের চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনেরও বক্তব্য জানার সুযোগ হয়।

.

(০২) ভারতীয় মতে দার্শনিক জ্ঞান হলো সনাতন ও সর্বজনীন। তাই চিন্তা বা মননের এমন কোন বিষয় নেই যা ভারতীয় দর্শনে আলোচিত হয়নি। এই জ্ঞান যে কেবলমাত্র বুদ্ধিকেই তৃপ্ত করে তাই নয়, আমাদের সমগ্র সত্তার প্রকৃত তাৎপর্য ও মূল্যবোধকে জাগ্রত করে এক উচ্চতর চেতনায় উন্নীত করে। এই চেতনা হোক মানবিক কিংবা আধ্যাত্মিক, তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েই ভারতীয় ঋষি বা দার্শনিকরা দর্শনের তত্ত্বজ্ঞানকে জীবনের উপলব্ধি ও আচরণে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন।

.

(০৩) ভারতীয় দর্শনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি। পাশ্চাত্য দর্শনে যেমন দেখা যায় বিভিন্ন দার্শনিক দর্শনের সমস্যাগুলি পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, সৌন্দর্যবিদ্যা, মনোবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখার সমস্যাগুলি স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতীয় দর্শন এক সর্বব্যাপক শাস্ত্র। এখানে বিভিন্ন শাখার সমস্যাগুলি পৃথকভাবে আলোচনা না হয়ে বরং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে সামগ্রিকভাবে বিকাশ লাভ করেছে।

.

(০৪) ভারতীয় মতে দর্শন কেবলমাত্র তত্ত্বের আলোচনা নয়। দর্শনচর্চার মূল উদ্দেশ্য হলো দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কিভাবে জীবনকে পরিচালিত করলে জীবনের পরমার্থ লাভ করা যায়, তা জানা। মোটকথা, মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্য বা পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্যই ভারতবর্ষে দর্শনচর্চার উদ্ভব। আবার যেহেতু জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধেও

তাত্ত্বিক আলোচনার সমৃদ্ধি ভারতীয় দর্শনে কম নয়, তাই বলা যায়, তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয়দিক থেকেই ভারতীয় দর্শন অতীব বৈচিত্র্যপূর্ণ।

.

(০৫) একমাত্র জড়বাদী চার্বাক ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় দর্শনগুলি এক কথায় আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন অর্থাৎ জড়বাদের সম্পূর্ণ বিরোধী মতবাদ। এই মতাবলম্বীরা ঈশ্বর, আত্মা, মোক্ষ প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। যদিও ওই বিষয়গুলির স্বরূপ সম্পর্কে আধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

.

(০৬) চার্বাক ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে চতুর্বিধ পুরুষার্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। মানুষের সাধারণ যা কামনা তাকে ভারতীয় দার্শনিকরা চার ভাগে ভাগ করেছেন- ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। চার্বাক ছাড়া বাকি সব দর্শন সম্প্রদায় মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলে গ্রহণ করেছে। তাদের মতে মোক্ষলাভই জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। তাই এ সমস্ত দর্শনকে মোক্ষশাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। এই মোক্ষকেই মুক্তি, কৈবল্য, অপবর্গ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। মুক্তির অর্থ হলো দুঃখের আত্যন্তিক বা চরম নিবৃত্তি। এই মুক্তিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে- জীবন্মুক্তি এবং বিদেহ মুক্তি।

.

(০৭) চার্বাক ছাড়া আর সব আস্তিক দর্শনে স্বীকার করা হয় যে সমগ্র জগৎ এক নৈতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। ঋগ্বেদে এই নিয়মকে বলা হয়েছে ঋত। ঋত বলতে প্রাকৃতিক ও নৈতিক উভয় প্রকার নিয়ম শৃঙ্খলাকে বোঝাতো। এই ঋতের ধারণাই পরবর্তীকালে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন নামে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। মীমাংসা দর্শনে একে বলা হয়েছে অপূর্ব। অপূর্ব হলো এমন এক নৈতিক নিয়ম যার দ্বারা এই আশ্বাস পাওয়া যায় যে, বর্তমানে অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞের ফল আমরা ভবিষ্যতে ভোগ করতে পারবো। আবার ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে এই নিয়মকে বলা হয় অদৃষ্ট। এই অদৃষ্ট আত্মাতে অদৃশ্যভাবে থাকে এবং যথাসময়ে জীবের কৃতকর্মের ফলাফল দান করে।
বিভিন্ন দর্শনের এই মতবাদই ভারতীয় দর্শনে সাধারণভাবে কর্মবাদ নামে পরিচিত। কর্মবাদ অনুসারে আমাদের কৃতকর্মের ফল আমাদেরকে ভোগ করতেই হবে। পুণ্য কর্মের ফল সুখভোগ এবং পাপ কর্মের ফল দুঃখভোগ। কর্ম দুই প্রকার- অনারব্ধ কর্ম অর্থাৎ, যা এখনও ফল দিতে আরম্ভ করেনি এবং প্রারব্ধ কর্ম অর্থাৎ, যে কর্ম তার ফল দিতে আরম্ভ করেছে। আর এই কর্মবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতীয় জন্মান্তরবাদ। কর্ম এবং কর্মফলের ভোগ- এই দুয়ের মধ্যে রয়েছে কার্য-কারণ সম্বন্ধ। কৃতকর্মের ফল যদি এক জীবনে শেষ না হয় তবে জীবকে নতুন জন্ম পরিগ্রহ করে তার কর্মফল ভোগ করার জন্য এই সংসারে আসতে হয়। এই মতবাদকেই বলা হয় জন্মান্তরবাদ। এভাবে এক কাল্পনিক শাশ্বত নৈতিক নিয়মের উপর ভারতীয় কর্মবাদ এবং জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

.

(০৮) চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের অন্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, ভোগ

এবং ত্যাগের মধ্যে অদ্ভুতভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে চতুরাশ্রম প্রথা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। চতুরাশ্রম হলো মানবজীবনের অন্বিষ্ট অনুযায়ী জীবনকালকে চারটি কর্ম-কালে বিভক্ত করে প্রয়োজনীয় সাধনকর্মে নিয়োজিত হবার যথোপযুক্ত নির্দেশনা। এই চারটি আশ্রম হলো- ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্যের ধর্ম হলো পরবর্তী জীবনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিপাঠ হিসেবে যথাযথ শিক্ষাগ্রহণ, গার্হস্থ্যের ধর্ম সংসার-কর্মে নিয়োজিত হওয়া, বানপ্রস্থ হলো সমাজসংসার ত্যাগ করে অনাসক্ত জীবনযাপন এবং সন্ন্যাস হলো জীবন ও জগতের প্রতি সম্পূর্ণ মোহমায়া মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে একান্ত নির্জনবাসে অতীব কষ্টসহিষ্ণু এক উচ্চতর সাধনচর্চায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়া। ভোগ না হলে কখনোই ত্যাগ ধর্মে মানুষ দীক্ষিত হতে পারে না বলে চতুরাশ্রম প্রথায় ভোগবাদী গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি সমান গুরুত্ব দেয়ার পরই সমাজসংসার ত্যাগ করে বানপ্রস্থে অনাসক্ত জীবনের কথা বলা হয়েছে। ভোগ ও ত্যাগের প্রতি একইভাবে এই গুরুত্ব প্রদান ভারতীয় দর্শনের এক অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য।

.

(০৯) কেবল চার্বাক ছাড়া বাদবাকি ভারতীয় দর্শনে মনে করা হয় অবিদ্যা বা অজ্ঞতাই হলো সকল দুঃখের কারণ। তাদের মতে মানুষ দুঃখ পায় কারণ সে তার আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানে না। আত্মার সংকীর্ণ চেতনা থেকে উদ্ভূত হয় মানুষের ঘৃণা ও আসক্তি। প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করলে প্রিয় ও অপ্রিয়ের পার্থক্য দূরীভূত হয় এবং সব মানুষই এক পরম সত্তার প্রকাশ বলে মানুষ জানতে পারে। সুতরাং তখন দুঃখও দূরীভুত হয়। অনাত্মবাদী বৌদ্ধদর্শনে এই আত্মার স্থলে প্রতীত্য-সমুৎপাদ নীতিকে প্রযুক্ত করা হয়েছে।

.

(১০) ভারতীয় দর্শনের একটি মজার বৈশিষ্ট্য হলো যুক্তিনিষ্ঠ চার্বাক ছাড়া বাকি দর্শনগুলিতে যুক্তি ও বিশ্বাসের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। আস্তিক দর্শনগুলোতে তাই বৈদিক প্রাধান্য স্বীকার করেই বেদবাক্যের উপলব্ধির জন্য শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের কথা বলা হয়েছে। প্রথমে শোনা (শ্রবণ), তারপর যুক্তির দ্বারা বিচার (মনন) এবং অবশেষে উপলব্ধি বা ধ্যান (নিদিধ্যাসন)- এটিই হলো তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ক্রম। ভারতীয় দর্শনের আলোচনা পদ্ধতি মূলত সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত।

.

বস্তুত ভারতীয় দর্শন এমনই এক সর্বব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দর্শন যে, কোন একটি বিশেষ মন্তব্যের দ্বারা এর সবদিক বোঝানো সম্ভব নয়। এর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিকই রয়েছে। জ্ঞানবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতির চুলচেরা আলোচনায় যুক্তি-তর্কের উৎকর্ষে খুবই সম্মানজনক উচ্চতায় আসীন হলেও শেষপর্যন্ত ধর্মীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধিই ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়। কেবল চার্বাক দর্শনই এই ধারাটির তীব্র বিরোধিতাপূর্ণ অবস্থানে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে একমাত্র ব্যতিক্রমী প্রাচীন জড়বাদী দর্শন হিসেবে গৌরবজনক ভূমিকায় নিজেকে বহমান রেখেছে।

তবে প্রসঙ্গক্রমে এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, বহুকাল ধরে বহুভাবে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে যে, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দর্শনের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো আধ্যাত্মিকতা- অর্থাৎ, ভারতীয় দর্শন বুঝি মূলতই মোক্ষ-শাস্ত্র। কেননা ভারতীয় দর্শনের আধুনিক ব্যাখ্যাকারেরা প্রায় সকলেই অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদে আস্থাবান বলে মনে হয়। স্বভাবতই তাঁরা ভারতীয় দর্শনের ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী সম্প্রদায়গুলির উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখানে একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, দর্শন নামে খ্যাত হলেও কোনো কোনো সম্প্রদায় মূলতই মোক্ষ-শাস্ত্র। আর ভারতীয়-দর্শনের আলোচনায় এই সম্প্রদায়গুলির উপরই প্রায় ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ বা জড়বাদের ঐতিহ্য বহুলাংশেই অবহেলিত হয়েছে; অথচ এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ভারতীয় দর্শনেই বস্তুবাদী ঐতিহ্যের গুরুত্ব বড় কম নয়, বরং অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য মনে হয়। এই দিক বিবেচনায় তাই, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, প্রচলিত আলোচনাগুলি অবশ্যই কিছুটা অবাস্তব। অতএব বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের আলোচনায় এই বস্তুবাদী ঐতিহ্যের গুরুত্বটুকু অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে।

আর তাই চার্বাকের আলোচনায় যেতে হলে আমাদেরকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ ধারা এবং বৈদিক সাহিত্য ও উপনিষদীয় কতিপয় বিশ্বতাত্ত্বিক ধারণা সম্পর্কে অবগত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়। নিশ্চয়ই আমরা সে-প্রয়াস নিতেই পারি।
...

১.০ : ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন ধারা

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুটি মূল ধারা প্রবাহিত হতে দেখা যায়- একটি বৈদিক ধারা ও অপরটি বেদ-পূর্ব বা অবৈদিক ধারা। বৈদিক ধারাটি সুস্পষ্টভাবেই আর্যকেন্দ্রিক। আর যে অবৈদিক উপাদানগুলি তাদের স্বকীয় সত্তা নিয়ে কালক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষত্বে ভিন্নমাত্রায় একাকার হয়ে আছে, তা হলো প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতা কেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা।

ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসধারা বলতে এককালে প্রাচীন বৈদিক ধ্যান-ধারণাকেই বুঝাতো, যা বৈদিক সাহিত্যের বিপুল সম্ভারের মধ্যে মূর্ত হয়ে আছে। কিন্তু ১৯২২ সালে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত) সিন্ধু-উপত্যকায় মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তুপের মধ্যে এক সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সাক্ষ্য আবিষ্কারের মাধ্যমে সেই সাবেকী ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীনত্ব হঠাৎ আরো কয়েক হাজার বছর বেড়ে গেলো। সিন্ধু অঞ্চলে ১৯২২-২৭ সালের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক নমুনা বিশ্লেষণ করে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হলো যে, এই সভ্যতাকে অন্তত পাঁচ হাজার বছরের পুরানো বলতে হবে, এবং স্বীকার করতে হবে যে, সুমের আক্কাদ ব্যবিলন মিশর ও অ্যাসিরিয়ার মতো ভারতবর্ষও পৃথিবীতে প্রথম-সভ্যতার ইমারত গড়ে তুলতে অগ্রসর হয়েছিলো। এমনকি এটাও দেখা গেলো যে, কোন কোন দিক থেকে ভারতবর্ষের ওই প্রাচীন সভ্যতা সমসাময়িক মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের তুলনায় উন্নততর ছিলো এবং পরিধির দিক থেকেও তা অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার চেয়ে ঢের বড়ো ছিলো।

প্রত্নতত্ত্বমূলক পরবর্তী কাজের ফলে এই প্রাথমিক প্রত্যয়গুলিই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়েছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণার ইতিহাস সংক্রান্ত সাবেকী ধারণায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত মহেঞ্জোদারোর খননকাজ পরিচালনা করেন স্যার জন মার্শাল, ১৯৩১ সালে তাঁর বিবরণী প্রকাশিত হয়। এই বিবরণীর ভূমিকায় তিনি যে মন্তব্য করেন তার সংক্ষিপ্তসারটুকু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তর্জমায় উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক হবে। স্যার জন বলছেন-

‘এতদিন পর্যন্ত সাধারণত ধরে নেওয়া হতো, বিজয়ী আর্যদের তুলনায় ভারতবর্ষের প্রাক্-আর্য অধিবাসীরা সভ্যতার একেবারে নিম্নস্তরে পড়েছিল। স্পার্টানদের তুলনায় হেলটদের বা বাইজান্টাইন প্রভুদের তুলনায় স্লাভদের যে-দশা, বিজয়ী আর্যদের তুলনায় আর্য-পূর্বদের দশাও বুঝি সেই রকমই- সে-অবস্থা এমনই হীন ও পদানত যে তারা ‘দাস’ বলেই উল্লিখিত হয়েছে। ঋগ্বেদ-মন্ত্র থেকে তাদের নেহাতই এক কৃষ্ণচর্ম খর্বনাসা বর্বরের চিত্র সংগ্রহ করা হতো- ভাষা ও ধর্মবিশ্বাসের মতোই শারীরিক বৈশিষ্ট্যেও তারা সুপুরুষ আর্যদের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। অবশ্যই মাঝে মাঝে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে, তারা গো-সম্পদে সমৃদ্ধ এবং যুদ্ধে

পারদর্শী ছিল এবং তাদের অনেক ‘পুর’ ছিল। কিন্তু বেদ-বিদেরা এই ‘পুর’ বলতে কোনো একরকম সাময়িক আশ্রয়স্থলই বুঝতেন- অর্থাৎ, সাদামাটা মাটির তৈরি কোনো ব্যবস্থা, হয়তো বা বেড়া দিয়ে কিংবা পাথরের কোনো রকম আদিম পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কেননা আর্যদেরই তখনও গ্রাম্যাবস্থা, তাদের সমাজ-সংগঠনও সেই অনুপাতে আদিম। অতএব এ কথা কল্পনা করা কঠিন যে আর্যদের চেয়েও প্রাচীন ভারতবাসীরা- ওই ঘৃণ্য ও নীচ দাসেরা- সুগঠিত নগর বা দুর্গে বাস করতে পারে, বা অন্য কোনো দিক থেকে সভ্যতার উচ্চতর স্তরে উপনীত হতে পারে। বিজেতাদের তুলনায় তাদের মানসিক, দৈহিক, সামাজিক ও ধর্মমূলক নিকৃষ্টতার কথাই স্বতঃসিদ্ধ ছিল এবং ভারতীয় সভ্যতায় তাদের বিশেষ কোনো অবদান স্বীকার করা সম্ভব হয়নি। এ কথা মুহূর্তের জন্যও কল্পনায় আসেনি যে, পাঁচ হাজার বছর আগে- এমনকি আর্যদের নাম পর্যন্ত যখনও শোনা যায় নি- ভারতবর্ষের আর কোথাও হোক-আর-নাই-হোক অন্তত পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে এক উন্নত ও একান্ত স্বকীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে মেসোপটেমিয়া এবং মিশর সভ্যতার সাদৃশ্য অত্যন্ত নিকট, যদিও কোনো কোনো দিক থেকে তা মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের তুলনায় উন্নততর। কিন্তু হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কার তর্কাতীতভাবে এই কথাই প্রমাণ করেছে। তার ফলে বোঝা গিয়েছে, যীশু খ্রিস্টের তিন হাজার বছর আগেও সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরা এক সু-উন্নত সভ্যতার বাহক ছিল এবং সে-সভ্যতার মধ্যে ইন্দো-আর্য সংস্কৃতির চিহ্নমাত্র নেই।... এ সভ্যতায় সমাজ-জীবন ছিল নগর-কেন্দ্রিক এবং কৃষিকাজ ও বাণিজ্যই তার ঐশ্বর্যের প্রধান উৎস। এই বাণিজ্যের ক্ষেত্র নানা দিকে এবং বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। ...এ-সব দিক থেকে সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া ও মিশরের তাম্র-প্রস্তর সভ্যতার সাধারণ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে সিন্ধ-সভ্যতা ছিল পাঞ্জাব ও সিন্ধুর নিজস্ব বিশিষ্ট সভ্যতা। ...দু-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। ...চারুশিল্প এবং ধর্ম-বিশ্বাসের দিক থেকেও সিন্ধু-সভ্যতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্বীকারযোগ্য। ...অবশ্য সিন্ধু-অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অন্যান্য দেশবাসীর বিশ্বাসে নানা সাদৃশ্যও দেখা যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের ধর্মবিশ্বাস এমন একান্তভাবেই ভারতবর্ষীয় যে এমন কি আজকের দিনের হিন্দুধর্মের সঙ্গে- অন্তত বর্তমান হিন্দুধর্মের সর্বপ্রাণবাদ শৈবধর্ম ও শাক্তধর্মের সঙ্গে- সিন্ধু-সভ্যতার ধর্মবিশ্বাসের বিশেষ কোনো পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস বলতে আজও ওই শিব-উপাসনা এবং মাতৃ-উপাসনাই প্রধান।’- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫)

জন মার্শালের এই মন্তব্য থেকে দেবীপ্রসাদ তিনটি মূল বিষয় চিহ্নিত করেছেন। তা হলো-
এক।। সিন্ধু-সভ্যতা শুধু সুপ্রাচীন নয়, সু-উন্নতও ছিলো– বৈদিক সাহিত্যের চেয়ে অনেক প্রাচীন এবং বৈদিক-সাহিত্যে প্রতিফলিত মানব-উন্নতির চেয়ে অনেক বেশি উন্নতির পরিচায়ক।
দুই।। যারা বেদ রচনা করেছিলেন তাঁরা এ-সভ্যতা গড়ে তোলেন নি। সিন্ধু-সভ্যতা একান্তই আর্য-পূর্ব। স্বভাবতই এ সভ্যতার স্মারকগুলির মধ্যে বৈদিক প্রভাবের বা আর্য অবদানের চিহ্ন নেই।

তিন।। কিন্তু উত্তরকালের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে– বিশেষত জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে– সিন্ধু-যুগের ধ্যানধারণা ও পূজা-উপাসনার সাদৃশ্য অত্যন্ত নিকট। অতএব অনুমান হয়, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুদূর সিন্ধু-যুগ থেকে একটি মূল ধারা প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং তার উপর বৈদিক সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই।

জনবহুল ও সু-পরিকল্পিত নগর, সুদক্ষ কারিগরি, সুবিস্তৃত বাণিজ্য এবং চিত্রলিপি প্রভৃতি সিন্ধু-উপত্যকায় আবিষ্কৃত প্রত্নতত্ত্বমূলক নিদর্শনগুলি যে তাম্র-প্রস্তর যুগের এক সু-উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক- এ বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু কোন সভ্যতা ও তার ধ্যান-ধারণা বা সংস্কৃতির প্রভাব কতোটা গভীর ও বিস্তৃত তা বিবেচনায় নিতে হলে দুটি জরুরি উপাদান খোঁজাও আবশ্যক হয়, তা হলো- সেই সভ্যতার পরিধি ও তার অর্থনৈতিক ভিত্তি। সিন্ধু-সভ্যতার ক্ষেত্রেও তার অনুসন্ধান জরুরি বৈকি।
...

২.০ : সিন্ধু সভ্যতা

শুরুতে এ সভ্যতা সিন্ধু নদ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বলে সভ্যতাটির নাম রাখা হয় ‘সিন্ধু-সভ্যতা’। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর মধ্যে প্রথম হরপ্পায় খননকার্য হয় বলে অনেকে একে ‘হরপ্পা-সভ্যতা’ বলেন। যদিও এ সভ্যতা শুধু সিন্ধু নদ কিংবা হরপ্পায় সীমাবদ্ধ ছিলো না। তবে সিন্ধু নদের তীরে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে বিবেচনায় অনেক দিন থেকেই অনুসন্ধান চলছিলো। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম হরপ্পা অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন করা হয়। পশ্চিম পাঞ্জাবের মন্টোগোমারি জেলার ইরাবতি নদীর পূর্ব উপকূলে হরপ্পার অবস্থান। পরের বছর উৎখনন করা হয় মহেঞ্জোদারো অঞ্চলে। পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার খয়েরপুর বিভাগে মহেঞ্জোদারোর অবস্থান। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর দূরত্ব প্রায় ৪৮৩ কিলোমিটার। এর পর থেকে ক্রমাগত খনন কাজ চলতে থাকে। এভাবে ক্রমে বেরিয়ে আসে এই সভ্যতার চমৎকার সব নিদর্শন। এই প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রমাণ হতে থাকে যে সিন্ধু সভ্যতা শুধুমাত্র হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারো নগর দুটোকে ঘিরে বেড়ে ওঠেনি। দূরবর্তী আরও অনেক অঞ্চলেও এর বিস্তার ঘটেছিলো।

২.১ : সভ্যতার আবিষ্কার

বহুসংখ্যক প্রত্নস্থান আবিষ্কার হওয়ায় বর্তমান ভারত ও পাকিস্তানের বিশাল এলাকা জুড়ে এ সভ্যতার বিস্তৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দির তৃতীয় দশকের শুরুতে সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হলেও এ অঞ্চলে পুরাকীর্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো আরও প্রায় এক শতাব্দি আগে। জানা যায়-

‘আনুমানিক ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে চার্লস ম্যাসন (Charles Masson) পাঞ্জাবে মহারাজা রণজিৎসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের দিক থেকে একটি সম্ভাবনাময় ঢিবি দেখেছিলেন হরপ্পায়। অতঃপর ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রধান এবং ভারতে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার পথ প্রদর্শক মেজর জেনারেল কানিংহাম (Sir Alexander Cunningham) ১৮৫৩ থেকে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কয়েকবার জায়গাটি পরিদর্শন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি সচিত্র রিপোর্টও প্রকাশ করেছিলেন। রিপোর্টে সিন্ধু সভ্যতার সুপরিচিত সীল সহ কিছু ছুরির ফলার ছবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। কানিংহামের এই প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রথম পর্যায়ে গবেষকদের তেমন আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। এই ঘটনার প্রায় অর্ধশত বৎসর পর মহেঞ্জোদারো অঞ্চলে আবার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চলে। এখানেও পাওয়া যায় একই ধরনের সীল। এবার এই নিদর্শনসমূহ বিখ্যাত পত্রিকা ‘ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজে’ প্রকাশিত হয়। এতে সাড়া পড়ে যায় চারদিকে। প্রত্নতত্ত্বে উৎসাহী বিশেষজ্ঞগণ ছুটে আসেন ভারতে। ইতোমধ্যে মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া সীলসমূহ সবার নিকট পরিচিত হয়ে উঠেছিল। পণ্ডিতগণ হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া সীলগুলোর সঙ্গে এর কিছুটা মিল খুঁজে পেলেন।’

‘সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারে প্রথম ভূমিকা রাখেন বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বহুকাল আগেই মহেঞ্জোদারোর প্রাচীন ঢিবিকে তিনি অনুমান করেছিলেন কোন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলে। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে তিনি খননকার্য পরিচালনা করেন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু মাটির গভীর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৃৎপাত্র আর পাথরের শিল্পকর্ম। তিনি সহজেই অনুমান করেন সঠিক উৎখনন কার্য চালাতে পারলে নিশ্চয়ই প্রাচীন কোন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে। প্রায় একই সময়ে (১৯২১ খ্রিস্টাব্দে) মহেঞ্জোদারো থেকে প্রায় সাড়ে ছয়শত কিলোমিটার দূরে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন কার্য পরিচালনা করেছিলেন পণ্ডিত দয়ারাম সাহনি। এই অঞ্চল থেকেও একই প্রকার প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়। এবার ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এর গুরুত্ব বুঝতে পারে। এই বিভাগের প্রধান স্যার জন মার্শাল (Sir John Marshall) খনন কার্য চালাতে থাকেন মহেঞ্জোদারোতে। কয়েক বৎসর পর আর্ণেস্ট ম্যাকে (Arnest Mackey) তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দেন। হরপ্পায় খননকার্য চালাতে থাকেন এম, এস, ভাট (M.S.Vat)। এ পর্যায়ে মহেঞ্জোদারোতে কাজ চলে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, আর হরপ্পাতে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ‘আর্কিওলোজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার’ নতুন মহাপরিচালক স্যার মরটিমার হুইলার (Mortimer Wheelir) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মহেঞ্জোদারোতে খননকার্য পরিচালনা করেন। এভাবে অব্যাহত খননকার্যের ফলে মহেঞ্জোদারোতে কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্তরের সন্ধান মেলে। এক একটি স্তরে পাওয়া যায় সিন্ধু সভ্যতার এক এক পর্যায়ের সংস্কৃতির নিদর্শন।’

‘হরপ্পায় এম, এস, ভাট খনন কার্য চালান ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। পরে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে এখানেও যোগ দেন মরটিমার হুইলার। বোঝা যায় মহেঞ্জোদারোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ননিদর্শনের ভাণ্ডার রয়েছে হরপ্পাতে। নিশ্চিত হওয়া যায় মহেঞ্জোদারোর চেয়ে আরও প্রাচীন ছিল হরপ্পার সংস্কৃতি।’

‘হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার পর দুই নগরীর অবস্থানগত গুরুত্ব অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। দুটো নগরীতেই বিভিন্ন পর্যায়ে মনুষ্য বসতি হয়েছে। তাই মাটির বিভিন্ন স্তরে-স্তর বিন্যাস স্পষ্ট। মহেঞ্জোদারোতে যে কয়টি স্তর উৎখনন করা হয়েছে তার মধ্যে কালের ব্যবধান হচ্ছে মাত্র ৬০০ বৎসর। সবচেয়ে নীচের স্তরের বয়স হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ১৯৬৩ অব্দ আর একেবারে উপরের স্তরের বয়স হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ১৬৫০ অব্দ। অন্যদিকে হরপ্পা নগরীর সবচেয়ে নীচের স্তর গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব ২২৪৫ অব্দে। এই নগরীর একেবারে উপরের স্তরের বয়স হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ১৯৬০ অব্দে। তবে দুই নগরীকে একীভূত করে সার্বিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে স্যার জন মার্শাল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে সিন্ধু সভ্যতার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অবস্থান ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫০ থেকে ২৭৫০ অব্দের মধ্যে। মার্শালের এই পিছিয়ে যাবার প্রধান কারণ হচ্ছে ভূতত্ত্ববিদগণের অনুমান। কারণ তাঁরা মনে করেন প্রাপ্ত মাটির স্তরের নীচে আরও স্তর ছিল যাকে নিম্নস্তরের পানি গ্রাস করেছে। প্রাপ্ত অনেক প্রত্নবস্তু এই অনুমানকে সমর্থন করে।- সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপরে উল্লিখিত প্রত্নতাত্ত্বিকগণের সঙ্গে কাশীনাথ দীক্ষিত এবং ননীগোপাল মজুমদারের নামও

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।’- (এ কে এম শাহনাওয়াজ / ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪)।

২.২ : সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তৃতি

‘আবিষ্কারের শুরুর দিকে অনুমান করা হয়েছিলো সিন্ধু উপত্যকাকে ঘিরেই সিন্ধু-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিলো। সে কারণেই এই সভ্যতার নামকরণ হয়েছিলো সিন্ধু-সভ্যতা। কিন্তু ক্রমে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য বৃদ্ধি পেলে ধীরে ধীরে এ ধারণা পাল্টাতে থাকে। পাকিস্তান ও ভারতের বিভিন্ন অংশে উৎখননের ফলে আরও অনেক প্রত্নক্ষেত্রের সন্ধান মিলেছে। এসমস্ত অঞ্চলের বস্তু সংস্কৃতি অনেক ক্ষেত্রে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সংস্কৃতির সঙ্গে ছিলো অভিন্ন। এ কারণে সিন্ধু সভ্যতার পরিধি ও বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতা যে অনেক বিস্তৃত হতে পারে তা ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে স্যার জন মার্শাল অনুমান করেছিলেন।’- (এ কে এম শাহনাওয়াজ / ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা-৩৫)।

‘১৯৪৭-এ হুইলার মন্তব্য করেন, আরব্য-উপসাগরের কিনারা থেকে সিমলা পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত হাজার মাইল ব্যবধানের মধ্যে অন্তত ৩৭টি জায়গায় হরপ্পাসংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ব-লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে পিগট বলেন, মাক্রান-কিনারা থেকে কাথিওয়াড় পর্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত ৯৫০×৭০০×৫০০ মাইল মাপের মোটামুটি একটি ত্রিভুজের মতো এলাকা জুড়ে প্রায় চল্লিশটি গ্রাম ও নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে হুবহু একই রকমের প্রত্নতত্ত্বমূলক নানা নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। ১৯৫৪ সালে চাইল্ড মন্তব্য করেন, হরপ্পা-যুগের সিন্ধু সভ্যতার পরিধি বলতে ‘প্রাচীন সাম্রাজ্য’-যুগের মিশর-সভ্যতার অন্তত দ্বিগুণ এবং সুমের ও আক্কাদ এর সম্ভবত চারগুণ মনে করা যায়।’- (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৪৬)।

‘উৎখননের রিপোর্ট থেকে জানা যায় কমপক্ষে ৭০টি অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার বিস্তার ছিল। মনে করা হয় সিন্ধু সভ্যতা আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। বেলুচিস্তানের মাকরান উপকূলে অবস্থিত সুতকাজেনদোর অঞ্চলের প্রত্নস্থল এর সাক্ষ্য দেয়। সিন্ধু ও পাঞ্জাব ছাড়াও ভারত উপমহাদেশের আরও অনেক অঞ্চলেই সিন্ধু সভ্যতার অনুরূপ সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়ায় এ সমস্ত অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল বলে বর্তমানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থলসমূহ হচ্ছে গুজরাটের লোথাল, দেশলপার, রাজস্থানের কালিবঙ্গান, শতদ্রু নদীর তীরে রূপার, উত্তর-প্রদেশের মীরাট জেলায় অবস্থিত আলমগীরপুর, হরিয়ানার বানাওয়ালি, মিতথাল প্রভৃতি। পাকিস্তানের বেশ কিছু অঞ্চলে (হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো ছাড়া) সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সরাইখোলা, গুমলা, মুন্ডিগাক, রানাঘুনতাই, ডাবরকোট, ডামরসাদাত, ভাবলপুর, কোটদিজি, চানহুদারো, কুল্লি, বালাকোট, আল্লাহদিন, আমরি, কোয়েটা, মেহের গড়, নওশাহরো, পিরক, দেরাওয়ার, ঝুকার ইত্যাদি।’

‘সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃত অঞ্চলের অনেক জায়গায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল বেশ প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক কালপর্ব থেকে এ সমস্ত অঞ্চলে মানব বসতি ছিল এবং সভ্যতা গড়ায় এ সমস্ত অঞ্চলের মানুষ ভূমিকা রেখেছে। এরকম আদি সংস্কৃতির সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বেলুচিস্তানের কিলিগুল মুহম্মদ নামক স্থানে। এখানে প্রাপ্ত প্রত্ন নিদর্শনসমূহ ৩৬৮৮ থেকে ৩৭১২ বছরের পুরোনো। এই অঞ্চলের মানুষেরা রোদে শুকানো ইট দিয়ে ঘর বানাতো এবং গরু, ছাগল ও মেষ পালন করতো। পাথরে তৈরি কিছু দ্রব্যাদিও পাওয়া গিয়েছে। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা হাতে তৈরি মৃৎপাত্র ব্যবহার করতো। পরবর্তী সময়ে কুমোরের চাকায় মসৃণ মৃৎপাত্র তৈরি করা হয় এবং এর উপরে লাল ও কালো রঙের জ্যামিতিক নকশা অঙ্কন করা হয়। ধারণা করা হয় সিন্ধু সভ্যতার পত্তন ঘটার পূর্বে এখানে নবোপলীয় যুগের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল।’
‘আমরি, কোটদিজি, হরপ্পা ও কালিবঙ্গানে সিন্ধু সভ্যতার প্রস্তুতি পর্বের সংস্কৃতি লক্ষ করা গিয়েছে। আমরি অঞ্চলে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালান ননীগোপাল মজুমদার। এখানে নিম্নতম স্তরে পাওয়া গিয়েছে নানা আকারের মৃৎপাত্র, পাথরের তৈরি ছুরির ফলা এবং কিছু তামা ও ব্রোঞ্জের টুকরো। উপরের দিকের স্তরে পাওয়া গিয়েছে রোদে শুকানো ইট ও পাথরে তৈরি ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। চাকায় তৈরি মসৃণ ও নকশা কাটা মৃৎপাত্রও পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে জানা যায় আমরি অঞ্চলের মানষেরা পশুপালন ও কৃষিজীবনে অভ্যস্ত ছিল। আমরি থেকে দেড়শ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে কোটদিজির অবস্থান। এখানে ১৯৫৫-৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন করেন ড. এফ.এ. খান। আমরির মতোই সাংস্কৃতিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে এখানে। ধারণা করা হয় খ্রিস্টপূর্ব ২৬০৫ অব্দে এখানে মানব বসতি ছিল। পরে এখানে একটি মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। কোটদিজি থেকে প্রায় সাড়ে চারশত কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে কালিবঙ্গানের অবস্থান। এখানে উৎখনন করা হয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে। আমরি ও কোটদিজির মতো এখানেও পাকা ঘরবাড়ি পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন ব্যবহার্য দ্রব্য এবং মাটির গুটিকায় তৈরি গলার হার। এখানে সংখ্যায় অল্প হলেও ধাতুর তৈরি অলঙ্কার ও কুঠার পাওয়া গিয়েছে। কালিবঙ্গানে কালো ও লাল রঙের অনেক মৃৎপাত্রের সন্ধান মিলেছে। কালিবঙ্গান সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের মধ্যে।’- (এ কে এম শাহনাওয়াজ / ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা-৩৬)।

এভাবে দেখা যায় যে, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে ক্যাম্বে উপসাগর, আরব সাগর এবং পশ্চিমে ইরান-পাকিস্তান সীমান্ত থেকে পূর্বে ভারতের উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিলো সিন্ধু-সভ্যতার পরিধি। এর মোট আয়তন প্রায় তের লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বলে ইতিহাসবিদেরা মনে করেন।
…

২.৩ : সিন্ধু-সভ্যতার স্রষ্টা

একটি উন্নত নগর সভ্যতা হিসেবে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো আবিষ্কৃত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে কোন্ সময়ে এ সভ্যতার উৎপত্তি ঘটেছিলো এবং কিভাবে তা বিকশিত হয়েছিলো। প্রথম দিকে ধারণা করা হতো এ সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলো আর্যরা, এরা বাইরে থেকে ভারতে এসেছে, সুতরাং হরপ্পা সংস্কৃতি আর্যদেরই দান। কিন্তু কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ মনে করেন মেসোপটেমিয়া ও সুমেরিয়রা এসে সিন্ধু অঞ্চলে সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো। আবার কারো মতে সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা দ্রাবিড়রা। এবং কেউ কেউ বলেন সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা আসলে মিশ্র জাতিগোষ্ঠী। অর্থাৎ সিন্ধু-সভ্যতার স্রষ্টা কারা এ নিয়ে আজো কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। ফলে এ সম্পর্কে প্রধানত চারটি মতবাদ প্রচলিত আছে।

(ক) আর্য সৃষ্ট মতবাদ :

সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার বেশ আগেই আর্যদের গড়া বৈদিক সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা হিসেবে বৈদিক সভ্যতাকেই তখন বিবেচনা করা হতো। এই মতে মনে করা হতো আর্যরা বহিরাগত নয়, এই ভূখণ্ডেই তাদের উৎসভূমি ছিলো। এই ধারণার মধ্য দিয়েই এই মতের সপক্ষে অন্য সব যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে। পরে সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার পরও বেশ কিছুকাল পর্যন্ত এই সভ্যতাটি আর্যদেরই গড়া বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে হরপ্পা সভ্যতার প্রত্ন নিদর্শনসমূহ বিশ্লেষণ করে এই মতামতের সপক্ষে তেমন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এই মতের সপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিগুলি হলো-

প্রথমত, সিন্ধু-সভ্যতায় আর্য জাতির মানুষদের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বৈদিক যুগের নারীদের পরিধেয় অলংকার ও খোঁপা বাঁধার রীতির সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার নারীদের অলংকার ও খোঁপার মিল রয়েছে। তৃতীয়ত, প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে বোঝা যায় সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের খাদ্য ও পোশাকের সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার মানুষদের খাদ্য ও পোশাকের মিল রয়েছে। চতুর্থত, সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া সীলে এবং টেরাকোটায় যে সমস্ত পশু চিত্র বা পশু মূর্তি পাওয়া যায় আর্য সভ্যতায়ও অনুরূপ পশুর অস্তিত্ব ছিলো। পঞ্চমত, আর্য যুগের মতো সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলিতেও বস্ত্রবয়ন শিল্প গড়ে উঠেছিলো। ষষ্ঠত, প্রথম পর্যায়ের গবেষণা থেকে অনুমান করা হয়েছে যে ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে সিন্ধু লিপির মিল রয়েছে- যার পরিণত রূপ পাওয়া যায় আর্য সভ্যতায়।

কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার উপর বিস্তৃত গবেষণার পর সর্বপ্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার জন মার্শাল উপরিউক্ত মতগুলির বিরোধিতা করে স্পষ্টতই দেখিয়েছেন যে, সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা একেবারেই পৃথক। ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন পরিবেশে এবং স্বতন্ত্র উপাদানে তা গড়ে উঠেছে। এ প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিগুলি হলো-

প্রথমত, আর্য সভ্যতা ছিলো গ্রামকেন্দ্রিক। নগর জীবনের পরিচয় বৈদিক সংস্কৃতিতে পাওয়া

যায় না। কিন্তু সিন্ধুবাসীরা গড়ে তুলেছিলো উন্নত নগর সভ্যতা। বৈদিক সাহিত্যের সূত্রে আর্যদের বলা হতো নগর ধ্বংসকারী। দ্বিতীয়ত, সিন্ধু সভ্যতায় লোহার ব্যবহার ছিলো না। নগর সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশের শেষপর্বে লোহার আবিষ্কার হয়েছিলো। তাই সিন্ধু সভ্যতার প্রত্ন নিদর্শনের মধ্যে তামা পাওয়া গেলেও লোহা পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে পরবর্তী সময়ের সভ্যতা বলেই বৈদিক সংস্কৃতিতে তামা ও ব্রোঞ্জের পাশাপাশি লোহার ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। তৃতীয়ত, নগর সভ্যতার ধারক সিন্ধু সভ্যতায় ইটের তৈরি বহুতল বাড়ি তৈরি হয়েছিলো। অন্যদিকে বৈদিক যুগে আর্যরা বাড়ি বানাতো মাটি, বাঁশ ও খড় দিয়ে। চতুর্থত, সিন্ধু সভ্যতায় যেসব পশুর নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে অনুমান করা হয় সিন্ধু-সভ্যতায় ঘোড়ার ব্যবহার হতো না কিংবা ঘোড়ার সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিলো না। অথচ আর্যদের যুদ্ধের প্রধান বাহন ছিলো ঘোড়া। বৈদিক সভ্যতায় ঘোড়া টানা রথেরও প্রচলন ছিলো। পঞ্চমত, নগর সভ্যতা গড়ে তোলার কারণে অনুমান করা সহজ হয়েছে যে সিন্ধুবাসীরা স্থায়ী জীবন বা বসতি গড়েছিলো। কিন্তু পশুপালক আর্যরা অনেকাংশে ছিলো অস্থায়ী যাযাবর। ষষ্ঠত, ধর্মীয় ক্ষেত্রে উভয় সভ্যতার মানুষের মধ্যে যথেষ্ট অমিল ছিলো। সিন্ধু সভ্যতায় ধর্মীয় বিশ্বাস, মাতৃপূজা, লিঙ্গ পূজা, শিব পূজা, বৃক্ষ পূজা প্রচলিত থাকলেও আর্য ধর্মে এগুলির তেমন গুরুত্ব নেই। মার্শালের সিদ্ধান্ত মতে ষাঁড় ছিলো সিন্ধুবাসীদের পূজ্য দেবতা। অন্যদিকে আর্যদের মধ্যে ছিলো গাভী পূজার প্রচলন। আর্যরা লিঙ্গ পূজাকে নিন্দা করতো। আর্য সভ্যতায় পুরুষ দেবতার প্রাধান্য ছিলো, কিন্তু সিন্ধু সভ্যতায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো মাতৃদেবী তথা নারীদেবী। আর্যদের ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ পূজা, যজ্ঞ প্রথা সিন্ধু সভ্যতায় অনুপস্থিত ছিলো। সপ্তমত, সিন্ধু লিপি প্রমাণ করে সিন্ধুবাসীরা লিখতে জানতো। কিন্তু আর্যরা লিখন পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারেনি। অষ্টমত, সবচেয়ে বড়ো যুক্তি হলো, কাল নির্ণয় করে সিদ্ধান্ত নেয়া গেছে যে আর্যরা ভারতে আগমন করেছিলো দেড় থেকে দুই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিলো তার থেকেও দেড় হাজার বছর আগে অন্তত তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এসব যুক্তির কারণে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক জন মার্শাল, বাসাম প্রমুখরা আর্যরা সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা এ মতবাদ সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন।

(খ) সুমেরীয় সৃষ্ট মতবাদ :

বৃটিশ ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার মর্টিমার হুইলার ও গর্ডন চাইল্ড সুমেরীয়দেরকে সিন্ধু সভ্যতার নির্মাতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁরা মনে করেন মেসোপটেমিয়া ও সুমেরের নগরগুলি থেকে এক সময় অভিবাসনকারীরা এসে সিন্ধু অঞ্চলে সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো। গর্ডন চাইল্ড অবশ্য একথাও বলেছেন যে, সুমেরীয় ও সিন্ধু সভ্যতার মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। তবুও নগর বিন্যাস ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে মিলের পরিমাণও যথেষ্ট। মর্টিমার হুইলার সরাসরি হরপ্পা সংস্কৃতি সুমেরীয় সংস্কৃতির নিকট ঋণী বলে মন্তব্য করেছেন। গবেষকদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন সুমেরীয়রাই সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তুলেছেন তাঁদের যুক্তিগুলি হলো-

প্রথমত, মেসোপটেমিয়ার মতোই সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলি গড়ে উঠেছিলো নদীর তীরে। দ্বিতীয়ত, পাঠোদ্ধার করা না গেলেও মেসোপটেমিয়ার মতো সিন্ধু সভ্যতায়ও লিখন পদ্ধতির প্রচলন ছিলো। তৃতীয়ত, সুমেরীয়দের মতো সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরাও মাতৃপূজা করতো। চতুর্থত, মেসোপটেমিয়ার মতো সিন্ধু সভ্যতাতেও কুমোরের চাকার মাধ্যমে মসৃণ মৃৎপাত্র তৈরি করা হতো। পঞ্চমত, মেসোপটেমিয়ার কয়েকটি নগরে নগরদেবতার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এর প্রতিফলন সিন্ধু সভ্যতার সীলে উপস্থিত ছিলো।
একই প্রসঙ্গে যুক্তি উপস্থাপন করে বলা হয় যে, হরপ্পার উৎখননের পর দেখা গেছে মাটির নিম্নতম স্তরেও উন্নত নগর সভ্যতার নিদর্শন ছিলো। যদি স্থানীয় মানুষ এই সভ্যতা গড়ে তুলতো তবে প্রথম পর্যায়েই তাদের পক্ষে এমন দক্ষতার সঙ্গে নগর গড়া সম্ভব হতো না।

এছাড়া সুমেরীয়রা সিন্ধু সভ্যতা গড়ে না তুললেও মরটিমার হুইলার প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই সভ্যতা সুমেরীয়দের নিকট অনেকাংশে ঋণী বলে অথবা উভয় সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিলো বলে যে মন্তব্য করেছেন তার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কারণ হলো-
ক. হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া সীল সুমেরের উর এবং এর আশেপাশে পাওয়া সীলের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। অগ্রবর্তী সভ্যতা হিসেবে মনে করা হয় সুমের এই সীল নির্মাণে সিন্ধু সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে।
খ. ধারণা করা হয় উভয় সভ্যতার মধ্যে সমুদ্র পথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিলো। জানা যায় সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলো থেকে সূতিবস্ত্র রপ্তানি হতো সুমেরে। বাণিজ্যিক সূত্র ধরে পারস্পরিক প্রভাব বিস্তারের পথ সুগম হয়েছিলো।

তবে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তুলতে সুমেরীয় সভ্যতার যে তেমন কোন প্রভাব ছিলো না তা প্রতিষ্ঠিত করতেও কিছু যুক্তি উপস্থাপিত হয়। কারণ এই দুই সভ্যতার মধ্যে স্পষ্ট কিছু বৈসাদৃশ্য ছিলো, যেমন-
প্রথমত, সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির শিল্প অর্থাৎ টেরাকোটার সঙ্গে মেসোপটেমীয় সভ্যতায় পাওয়া টেরাকোটার তেমন কোন মিল পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, উভয় সভ্যতার সীলে মিল থাকলেও নান্দনিক দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট অমিলও লক্ষ্যণীয়। যদিও সিন্ধু সভ্যতার সীলে উৎকীর্ণ লিপি পাঠ করা যায়নি, তবুও বোঝা যায় যে এই লিপি মেসোপটেমিয়ার কিউনিফর্ম লিপি থেকে পৃথক ছিলো। তৃতীয়ত, নগর পরিকল্পনা বিশেষ করে ইমারত, নর্দমা, পয়ঃপ্রণালীর ক্ষেত্রে তেমন কোন মিল উভয় সভ্যতায় নেই। শস্যাগার, বৃহৎ স্নানাগারের অস্তিত্ব সুমেরীয় সভ্যতায় পাওয়া যায়নি। চতুর্থত, পোশাক-পরিচ্ছদ, কবর দেয়ার প্রথার ক্ষেত্রেও অনেক অমিল ছিলো। পঞ্চমত, দুই সভ্যতার মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ অমিলের দিকে ডি.ডি. কোশাম্বী প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন তা হলো কৃষিক্ষেত্রের সেচ ব্যবস্থা। কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির ওপরই প্রাচীন নগর সভ্যতাসমূহ দাঁড়িয়েছিলো। কোশাম্বী স্পষ্টতই দেখিয়েছেন যে কৃষি ভূমিতে জলসেচের ক্ষেত্রে দুই সভ্যতা দুটো ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলো। অর্থাৎ দুই সভ্যতার অভিজ্ঞতাই ছিলো ভিন্ন। তাই সুমেরীয়রা সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা এ মতও

গ্রহণযোগ্য হয়নি।

(গ) মিশ্র জাতি মতবাদ :
আধুনিককালের কোন কোন গবেষক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বাইরের কোন প্রভাবে নয় ভারত উপমহাদেশের ভিতর থেকেই এক স্বকীয় ধারায় সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিলো। এখানকার স্থানীয় মানুষেরাই দীর্ঘদিন ধরে এই ধারার সৃষ্টি করেছিলো। আধুনিক এ মতের প্রবক্তা হলেন প্রত্নতাত্ত্বিক এ, এল, ব্যাসাম। তাঁকে সমর্থন করেছেন খ্যাতিমান পুরাতাত্ত্বিক এফ, আর, অলচিন। তাঁর মতে, এ অঞ্চলের সমৃদ্ধ অর্থনীতি ও জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি একটি নগর সভ্যতা গড়ে তোলার পথ সৃষ্টি করেছিলো।
'বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশে খননকার্যের ফলে জানা গেছে যে চার থেকে তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই অঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক সভ্যতার অস্তিত্ব ছিলো। এ কারণে গর্ডন চাইল্ডের ভাষ্য হলো, সিন্ধু অঞ্চলে নগর সভ্যতা সৃষ্টি ও বিস্তারের পূর্বে এই সংস্কৃতি প্রাথমিক অবস্থায় ছিলো। প্রত্নতাত্ত্বিকদের আবিষ্কার গর্ডন চাইল্ডের ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ এটা স্বীকৃত হয়েছে যে বেলুচিস্তান ও সিন্ধু অঞ্চলের কৃষি ভিত্তিক সংস্কৃতির ধারকদের সরাসরি যোগাযোগ ছিলো সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের সাথে।'
এটা ঠিক যে, 'হরপ্পা সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি একই সঙ্গে গড়ে ওঠেনি। একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রথম নগর জীবনের সূত্রপাত হয়েছিলো। পরে এ অঞ্চলের অভ্যস্ত মানুষ সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছিলো চারদিকে। এ বিষয়টি সিন্ধুর আমরি অঞ্চলে খননকার্য পরিচালনাকারী ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদ 'কাসাল' স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। দেখা গেছে মূল হরপ্পা সংস্কৃতির পাশাপাশি আমরিরও একটি নিজস্ব সংস্কৃতি ছিলো। তাই কাসাল মনে করেছেন হরপ্পা সংস্কৃতি ধীরে ধীরে আমরির উপর প্রভাব ফেলেছিলো। হরপ্পার নগর দেয়ালের নীচে আমরি সংস্কৃতির মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। আবার মহেঞ্জোদারো সভ্যতার নিম্ন স্তরে বেলুচিস্তান-সংস্কৃতির মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এসব থেকে অনুমান করা হয় সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের কৃষি সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো।'

কোন কোন পণ্ডিতদের মতে, 'স্থানীয় মানুষ সিন্ধু সভ্যতা সৃষ্টি করলেও এর পেছনে বিদেশী সভ্যতার প্রচ্ছন্ন অনুপ্রেরণা ছিলো। উৎখনন থেকে ধারণা করা যায় পূর্বতন তেমন অভিজ্ঞতার উৎস ছাড়াই হঠাৎ করে যেন এই নগর সভ্যতাটি পরিপূর্ণভাবে গড়ে উঠেছিলো। বিভিন্ন পর্বে উন্নয়নের বিষয়টি তাঁরা তেমন গুরুত্ব দেননি। এ পর্যায়ের গবেষকদের বিচারে বিদেশী সভ্যতার সক্রিয় প্রভাব ছিলো সিন্ধু সভ্যতার উপর। এই ধারণার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা বলেছেন, সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া সীলে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধরত সম্পূর্ণ নগ্নদেহ বীরের চিত্র খোদিত ছিলো। এই নগ্নতা ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলে না। শিল্পের এই ধারা বিদেশী ঐতিহ্য থেকেই এসেছে। বিশেষ করে প্যালেস্টাইন ও আনাতোলিয়ার ঐতিহ্যের সঙ্গে এর মিল রয়েছে।'- (ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা-৩৯ / এ কে এম শাহনাওয়াজ)

তাছাড়া নৃতত্ত্ববিদ 'ড. গুহ মনে করেন সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা মিশ্র জাতিগোষ্ঠি। নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের সাহায্যে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত নরকঙ্কাল, মাথার খুলি ও চোয়ালের পরীক্ষার ভিত্তিতে এ মত প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। এ মতের সমর্থকরা এসব নিদর্শন থেকে সিন্ধু সভ্যতা অন্তত তিনটি মানবগোষ্ঠির দ্বারা গঠিত বলে মনে করেন। এ মানবগোষ্ঠি হচ্ছে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড (চ্যাপ্টা নাক, পুরু ঠোঁট, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কিত), মেডিটারেনিয়ান (ভূমধ্যসাগরীয় জাতি) এবং মঙ্গোলীয় গোত্রের আলপাইন। আলপাইনরা সম্ভবত নেপাল, আসাম ও চীন থেকে সিন্ধুতে এসেছিলো। যদিও দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে এখনো প্রোটো-অস্ট্রালয়েড ও মেডিটারেনিয়ান জাতির মিশ্রণ দেখা যায়। তবে এই তিন জাতিগোষ্ঠিই সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা শুধু কঙ্কাল, খুলির ভিত্তিতে তা প্রমাণ করা যায় না। ড. ডি.কে. সেন কোন জাতি গোষ্ঠির নাম উল্লেখ না করে মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, চানহুদারো ও লোথালের কয়েকটি কঙ্কাল পরীক্ষা করে একটি জাতিগোষ্ঠি দ্বারা এ সভ্যতা গড়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেন।'- (সূত্র: সভ্যতার ইতিহাস প্রাচীন ও মধ্যযুগ, পৃষ্ঠা-১৯৭ / ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সিকদার)।

(ঘ) দ্রাবিড় সৃষ্ট মতবাদ :

সার্বিক দিক মূল্যায়ন করে আর. ডি. ব্যানার্জি, ফাদার হেরাস, জন মার্শাল সহ অধিকাংশ ইতিহাসবিদের সিদ্ধান্ত দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাতিই সিন্ধু সভ্যতার প্রকৃত স্রষ্টা। এ মতের সপক্ষে তাদের যুক্তি হলো-

প্রথমত, আর্য-পূর্ব যুগে ভারত উপমহাদেশে উত্তর, পশ্চিম এবং সিন্ধু সভ্যতার মুখ্য অঞ্চল উত্তর-পশ্চিম ভারতও দ্রাবিড়দেরই আধিপত্যভুক্ত ছিলো। এর জীবন্ত সাক্ষ্য বর্তমানে বেলুচিস্তানের পাহাড়ি ব্রাহুই উপজাতিরা এখনও দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলে। সিন্ধু সভ্যতার মানুষের ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষারও মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। সিন্ধু লিপির গবেষক ফাদার হেরাস এ ব্যাপারে এক প্রকার নিশ্চিত। দ্বিতীয়ত, সিন্ধুবাসীদের ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় সংস্কৃতির মিল পাওয়া গেছে। দুই সংস্কৃতির মানুষ শৈব ও শাক্ত ধর্মে অনুরাগী ছিলো। উভয়ের মধ্যেই বিশেষ করে দেবী পূজা, লিঙ্গ ও শিব লিঙ্গের পূজার প্রচলন থাকায় উভয় সভ্যতা এক গোত্রীয় বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। তৃতীয়ত, আর্যরা অনার্যদের পরাজিত করেছিলো বলে ঋগ্বেদে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অনার্যরাই হচ্ছে দ্রাবিড়। আর্য-পূর্ব ভারতের প্রাচীন জনগোষ্ঠির মধ্যে মুণ্ডা ও দ্রাবিড়দের অবস্থানের কথা নিশ্চিত করেছেন ইতিহাসবিদগণ। এদের মধ্যে ব্যবসা ও বাণিজ্যে পারদর্শী ও উন্নত সংস্কৃতির ধারক ছিলো দ্রাবিড়গণ। সিন্ধু সভ্যতায়ও এ সকল বৈশিষ্ট্য ছিলো। একারণে দ্রাবিড়দের দ্বারা সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তোলার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চতুর্থত, দ্রাবিড়দের আদিভূমি দক্ষিণ ভারতের মানুষদের দেহগত নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার আদিবাসীদের মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। সিন্ধুর বিভিন্ন নগরে যে সকল নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে তার সঙ্গে ভারতীয় মুণ্ডা ও দ্রাবিড়দের কঙ্কালের মিল পাওয়া যায়। মুণ্ডাদের চেয়ে দ্রাবিড়দের সঙ্গে বেশি মিলের কারণে

প্রাক-আর্য এ সভ্যতাকেই সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা বলে মনে করা হয়।

তবে দ্রাবিড়রাই যে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো এটা নিশ্চিতভাবে বলায় সমস্যা রয়েছে। কারণ দ্রাবিড় সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই সিন্ধুবাসীদের গড়ে তোলা সংস্কৃতির অনুরূপ ছিলো না। এমন কয়েকটি নির্ণীত বৈসাদৃশ্য হচ্ছে-
প্রথমত, দ্রাবিড়দের আদিবাস ছিলো নর্মদা নদীর দক্ষিণে। কিন্তু দক্ষিণ তীরের ভূভাগে কোথাও সিন্ধু সভ্যতার সাংস্কৃতিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি। সিন্ধু সভ্যতার উৎস ও বিস্তার ঘটেছিলো নর্মদা নদীর উত্তর তীরে। দ্বিতীয়ত, মৃতদেহ সমাহিত করা বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতিতে দুই সংস্কৃতির মদ্যে যথেষ্ট অমিল ছিলো। তৃতীয়ত, কারও কারও মতে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে ওঠার অনেককাল পরে ভারতে দ্রাবিড়রা এসেছিলো। তাদের মতে দ্রাবিড়রা ভারতের আগন্তুক জাতি। এই মতের সপক্ষে বড় প্রমাণ ভারতে দ্রাবিড়দের প্রধান আবাসভূমি দক্ষিণ ভারতে পাওয়া দ্রাবিড়দের তৈরি পাথরের স্থাপত্যিক নিদর্শন। এগুলো বড়জোর এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৈরি বলে মনে করা হয়। চতুর্থত, বেলুচিস্তানের ব্রাহুই জাতি দ্রাবিড় ভাষায় কথা বললেও তারা তুর্কি-ইরানি মিশ্রিত উপজাতি, প্রকৃত দ্রাবিড় ভাষী নয়। তাই ভাষার মিলের ভিত্তিতেও ব্রাহুই জাতিকে সিন্ধু সভ্যতার নির্মাতা বলা যায় না।

তবে 'আধুনিককালে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও উৎখননের ফলে সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে বেশ কিছু নতুন ধারণার জন্ম হয়েছে। এসব বিচারে মনে করা হয় তিনটি ভিন্ন স্তরে হরপ্পা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিলো। প্রথমটি প্রাক্-হরপ্পা পর্যায়, দ্বিতীয়টি হরপ্পা পর্যায়ের প্রথম পর্ব এবং তৃতীয়টি হরপ্পা সংস্কৃতির চূড়ান্ত বিকাশ পর্ব। প্রাক্-হরপ্পা পর্যায়ে নবোপলীয় গ্রাম সংস্কৃতির অবসানের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নগর সভ্যতার সূচনা ঘটেছিলো। পরে হরপ্পা সংস্কৃতির যখন বিকাশ ঘটেছিলো তখন পাশাপাশি কোথাও গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারা লক্ষ করা গিয়েছে। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হরপ্পা সংস্কৃতি বিকাশের চূড়ান্তে পৌঁছে।'-
(ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা-৪০ / এ কে এম শাহনাওয়াজ)।
...

২.৪ : সিন্ধু-সভ্যতায় নগর পরিকল্পনা

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে যে নগরের ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্ননিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে তাতে জানা গেলো যে, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবঙ্গান ছিলো নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। নগরসমূহের গঠনশৈলী দেখে ধারণা করা হয় এই সভ্যতার মানুষেরা গ্রামীণ জীবন পরিত্যাগ করে পরিকল্পিত নগর গড়ে তুলেছিলো এবং সিন্ধু সভ্যতা ছিলো তার সমকালীন মানব-সভ্যতায় একটি উন্নত সভ্যতা। কেননা এই নগরসমূহের পরিকল্পনা দেখলে খুব স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায় যে সেই সভ্যতার নগরবাসী সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যসম্মত নগরায়ন করার ব্যাপারে মনোযোগী ছিলো।

মহেঞ্জোদারোর নগরসমূহ গড়ে উঠেছিলো প্রায় এক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে। আর হরপ্পা নগরের সমতল ভূমির সীমা ছিলো আড়াই মাইল। মহেঞ্জোদারো গড়ে উঠেছিলো সিন্ধুনদের তীর ঘেঁষে, অন্যদিকে সিন্ধুর উপনদী রাভী বা ইরাবতির তীরে গড়ে উঠেছিলো হরপ্পা নগরী। দুটো নগরই মোটামুটি একই পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছিলো। উভয় নগরই প্রধান দুই অংশে বিভক্ত ছিলো। একটি অংশ অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং সেখানে ছিলো দুর্গ। বাকি অংশ ছিলো নিচু। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা থাকতো দুর্গ এলাকায় এবং নিচু এলাকায় সাধারণ বা দরিদ্র মানুষের বসবাস ছিলো। প্রকৃত শহর ছিলো দুর্গের নিম্নাঞ্চলে। নগরগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিলো নিম্নরূপ-

ক. রাস্তা : হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো এবং কালিবঙ্গানের রাস্তাগুলো ছিলো সোজা এবং তা বিস্তৃত ছিলো উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে। একদিকের রাস্তা অন্যদিকের রাস্তার সঙ্গে সমকোণে সংযুক্ত। প্রধান রাস্তাগুলো ছিলো ৯ ফুট হতে ৩৪ ফুট চওড়া। ৫ ফুট চওড়া ছোট ছোট গলিপথও ছিলো। নগরবাসীর সুবিধার্থে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরের রাস্তার পাশে সমান দূরত্বে ল্যাম্পপোস্ট স্থাপন করা হয়েছিলো এবং রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে পথের পাশে ডাস্টবিন রাখার ব্যবস্থা ছিলো। রাস্তার প্রান্তসীমার বাড়িঘর বৃত্তাকারে নির্মিত হতো।

খ. গৃহনির্মাণ ও দুর্গ-স্থাপত্য : সিন্ধু সভ্যতায় বিভিন্ন আকৃতির বসতবাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। নগরীর বেশির ভাগ বাড়ি পোড়া ইট দিয়ে নির্মিত ছিলো। প্রত্যেকটি আবাস গৃহ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিলো। আকার ভেদে দুই কক্ষ থেকে পাঁচ কক্ষবিশিষ্ট বাড়ির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন কোন বাড়ি ছিলো বহুতল বিশিষ্ট। বাড়িগুলিতে নানা আকারের কক্ষ, কুয়ো ও স্নানাগার থাকতো। এছাড়াও শয়নকক্ষ, রান্নাঘর, প্রক্ষালন কক্ষ, গুদামঘর ইত্যাদি থাকতো। বাড়ির প্রবেশ দরজা সাধারণত সড়কমুখী হতো। বাড়ির কক্ষগুলোতে আলো বাতাস আসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিলো। রান্নাঘর ও স্নানাগারের ধার ঘেঁষে ড্রেন তৈরি করা হতো। এতে ধারণা করা যায় যে নগরবাসীরা বিলাসবহুল, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করতো।

বৃহৎ হল : সিন্ধু সভ্যতায় বেশ কয়েকটি চমৎকার প্রাসাদের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত 'বৃহৎ হল' অন্যতম। এই হলঘরটির আয়তন ৮০ বর্গফুট। হলঘরের ভেতরে বসার জায়গা হিসেবে সারি সারি বেঞ্চ পাতা ছিলো এবং বেঞ্চগুলোর সামনে ছিলো প্লাটফরম। হলঘরের চারপাশে প্রশস্ত বারান্দা। ঐতিহাসিকদের ধারণা এটিকে হয়তো সভাগৃহ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তাছাড়া মহেঞ্জোদারোতে সবচেয়ে বড় ২৩০ ফুট বাই ৭৮ ফুট আয়তনের প্রকাণ্ড অট্টালিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাসাদটির চারপাশে ছিলো পুরু দেয়াল। বিশ্লেষকদের মতে এটি ছিলো শাসকদের বাসগৃহ।

দুর্গ : হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে একটি করে দুর্গ নির্মিত হয়েছিলো। দুর্গ দুটোর স্থাপত্যিক পরিকল্পনা ছিলো একই রকম। দুর্গের দৈর্ঘ্য ছিলো ১২০০ ফুট এবং প্রস্থ ৬০০ ফুট। দুর্গের চারদিকে কাদামাটি ও কাঁচা ইট দিয়ে পুরু করে ৪০ ফুট উঁচু প্রতিরক্ষা দেয়াল ছিলো। দুর্গের বাইরের অংশে ৪ ফুট পুরু পোড়ানো ইটের আরেকটি অতিরিক্ত দেয়াল ছিলো। চারপাশে নজরদারি করার জন্য তৈরি করা হয়েছিলো সুউচ্চ পর্যবেক্ষণ ঘর।

শস্যাগার : মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার দুর্গে একটি করে দুটো বৃহৎ শস্যাগার পাওয়া গেছে। হরপ্পার শস্যাগারটি ছিলো বৃহত্তম। ১৬৯ ফুট দীর্ঘ ও ১৩৫ ফুট প্রশস্তের বৃহদায়তন শস্যাগারটি ৫০ ফুট দীর্ঘ ও ২০ ফুট প্রশস্ত বিশিষ্ট বেশ কয়েকটি কক্ষে বিভক্ত করা হয়েছিলো। সম্ভবত খাদ্যশস্য নদীপথে পরিবহনের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি শস্যাগার নদীর কাছাকাছি অবস্থিত।

বৃহৎ স্নানাগার : নগর দুর্গের ঠিক মাথায় অবস্থিত মহেঞ্জোদারো নগরের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি বৃহৎ স্নানাগার। ১৮০ ফুট দীর্ঘ ও ১০৮ ফুট প্রশস্ত বিশিষ্ট আয়তনের এই বৃহৎ স্নানাগারের কেন্দ্রস্থলে সাঁতার কাটার উপযোগী ৩৯ ফুট লম্বা ২৩ ফুট চওড়া ও ৮ ফুট গভীর একটি জলাধার বা চৌবাচ্চা ছিলো। এটি সংযুক্ত ছিলো একটি কুয়োর সঙ্গে এবং ব্যবহৃত পানি ড্রেনের মাধ্যমে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিলো। স্নানাগারের দেয়াল ছিলো ইটের তৈরি এবং দেয়ালের গায়ে সুরকি ও বিটুমিনের প্রলেপ দিয়ে পানি নিরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। স্নানাগারের চারপাশে ছিলো বারান্দা এবং বারান্দার পেছনে তিন দিকে ছিলো কক্ষ ও গ্যালারী। ধারণা করা হয়, বর্তমানেও টিকে থাকা পাঁচ হাজার বছরেরও আগে নির্মিত এই স্নানাগারটি দ্বিতল ছিলো এবং সেখানে অনেকগুলো কক্ষ ছিলো। কেউ কেউ মনে করেন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এই স্নানাগারটি নির্মিত হয়েছিলো।

গ. পানি সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালি : হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগরবাসীদের জন্য পানি সরবরাহের চমৎকার ব্যবস্থা ছিলো। পথের ধারে অনেক কূপ খনন করা হতো। অনেক বাড়ির উঠোনেও কূপ ছিলো। বেশিরভাগ কূপ পাওয়া যায় গলিপথের ধারে। মহেঞ্জোদারোর

চেয়ে হরপ্পাতেই বেশি কূপ খননের নিদর্শন রয়েছে।
বেশিরভাগ নগরের পয়ঃপ্রণালি ছিলো উন্নতমানের। পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য মাটির নিচে ড্রেন বানানো হতো। নগরের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে একটি করে স্নানাগার ও ময়লা পানি বের হওয়ার জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা ছিলো। এই ড্রেনগুলো প্রধান ড্রেন বা পয়ঃপ্রণালির সঙ্গে যুক্ত ছিলো। ড্রেনগুলো মাটির উপরে বা নিচে তৈরি হতো। ড্রেন তৈরিতে ব্যবহার করা হতো পোড়ানো ইট। ড্রেনের মুখ সংযুক্ত ছিলো নদীর সাথে। রাস্তার ভূ-গর্ভস্থ ড্রেনে ছিলো আধুনিককালের মতো ম্যানহোল। নগরায়নের এমন আধুনিক ধারণা অন্য কোন প্রাচীন সভ্যতায় দেখা যায়নি। এজন্যই এ. এল. বাসাম বলেছেন, রোমান সভ্যতার পূর্বে অন্য কোন প্রাচীন সভ্যতার এতো পরিণত পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা ছিলো না।

.

২.৫ : সিন্ধু-সভ্যতার ভাস্কর্য ও শিল্পকলা

শিল্পকলার ক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতার অবদান গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শনগুলি বিশ্লেষণ করলে ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও অলঙ্কার শিল্পের দক্ষতা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর শিল্পিদের শিল্পকুশলতারই প্রমাণ বহন করে। তাছাড়া বৃহৎ স্নানাগার, হলঘর, প্রাসাদ, দুর্গ, রাস্তাঘাট নির্মাণ থেকে তাদের স্থাপত্য শিল্পের নৈপুণ্য সম্পর্কে জানা যায়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে ওজনের জন্য বিভিন্ন পরিমাপের বাটখারা ও পরিমাপক স্কেল ব্যবহারে সিন্ধুবাসীদের পাটিগণিতের জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নগর পরিকল্পনার দক্ষতা তাদের জ্যামিতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকার কথা প্রমাণ করে। ‘বৃহৎ স্নানাগারে’র দেয়ালে পানি নিরোধের জন্য বিটুমিনের প্রলেপ দেয়ায় রসায়ণ শাস্ত্রে তাদের জ্ঞান ছিলো বলে মনে হয়। সিন্ধু সভ্যতায় পাথর ও ব্রোঞ্জের তৈরি প্রচুর ভাস্কর্য পাওয়া যাওয়ায় তামা ও টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য মিলিয়ে ইলেকট্রন তৈরি তথা ধাতুবিদ্যা সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের প্রমাণ মেলে।

হয়তোবা সিন্ধু সভ্যতার শিল্পীরা বিশাল ভাস্কর্য নির্মাণে আগ্রহী ছিলো না। তবে চুনাপাথর, ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির ভাস্কর্য সৃষ্টিতে তারা পারদর্শিতা দেখিয়েছে। মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত ৯.৩ সেন্টিমিটার উচ্চতার নগ্ন পুরুষ মূর্তি সিন্ধু সভ্যতার উল্লেখযোগ্য শিল্পকলার নিদর্শন। এতে দাড়ি, চোখ, নাক, কান প্রভৃতি ফুটিয়ে তুলতে চমৎকার শিল্প-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া ব্রোঞ্জের নির্মিত একটি নৃত্যরতা নারী মূর্তির হাত ও পা ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘ করে ভাস্কর্যটিকে একটি বিশিষ্ট গতি দেয়া হয়েছে। তার বাম হাঁটুর ভাঁজ ও কোমরে রাখা ডান হাতের নান্দনিক আবেদন অনস্বীকার্য। আলতোভাবে পায়ের উপর রাখা বাম হাত ও পুরো বাহু জুড়ে পরানো বালা, মূর্তির চোখ, থ্যাবড়া নাক, কোঁকড়ানো চুলের গঠন প্রভৃতি ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে সিন্ধু সভ্যতার ভাস্করদের শিল্পরুচি ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। হরপ্পায় প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের কয়েকটি পশুমূর্তি যেমন- মহিষ, হাতি ও গন্ডারের মূর্তি এবং মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া ষাঁড় ও ছাগলের মূর্তি এ সভ্যতার ভাস্কর্য উৎকর্ষের প্রমাণ দেয়।

সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত প্রস্তর ও ধাতব মূর্তির ভাস্কর্যের চেয়ে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের সংখ্যা বেশি। এগুলোর বিষয়বস্তু মাতৃদেবী, প্রাণী ইত্যাদি। পোড়ামাটির মূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একটি পুরুষ মূর্তি। মূর্তিটির নাক ছিলো লম্বা, চিবুক মাংসল এবং মুখমণ্ডল ছিলো দাড়িগোঁফবিহীন। এছাড়া বাদবাকি মূর্তিগুলি ছিলো নারীর প্রতিকৃতি। মূর্তির গায়ে অলঙ্কার পরানো হতো। সিন্ধু-ভাস্কররা যথেষ্ট দক্ষতায় মুখমণ্ডলে কমনীয়তা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। পোড়ামাটির জীবজন্তুও খোদাই করা হতো। এগুলোর মধ্যে গরু, ষাঁড়, মহিষ, কুকুর, শূকর, হাতি, বানর ও পাখি উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত কিছুই শিল্পমানের দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত ছিলো।

চিত্রশিল্পেও সিন্ধু সভ্যতার মানুষ যে এগিয়ে ছিলো, মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত প্রচুর চিত্রকর্ম সংবলিত মৃৎপাত্র তার প্রমাণ। চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু দু'ধরনের। শিল্পীরা জ্যামিতিক চিত্রের মাধ্যমে সরলরেখা, বক্ররেখা, ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত প্রভৃতি নকশা পাত্রের গায়ে অঙ্কন করতো। তাছাড়া পশু-পাখি, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতির ছবি আঁকতো। বেশ কিছু রঙিন পাত্রও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে আবিষ্কৃত হয়েছে।

সিন্ধু সভ্যতার সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য বড় নিদর্শন হচ্ছে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত প্রায় ২৫০০ টি সীলমোহর। বেশিরভাগ সীলমোহরের আকৃতি ছিলো চারকোণাকার। কয়েকটি ছিলো গোলাকার আর কয়েকটি লম্বাটে। এসব সীলমোহরের অধিকাংশের গায়ে ছোট ছোট লিপি খোদাই করা হয়েছে। সীলগুলোতে বিভিন্ন চিহ্ন এবং ষাঁড়, মহিষ, বাঘ, গণ্ডার, হাতি, ছাগল প্রভৃতি পশুর প্রতিকৃতি খোদাই করা আছে। সীলগুলোতে প্রাপ্ত বিভিন্ন চিহ্নগুলি মূলত আধা চিত্রলিপি বলে ধারণা করা হয়। অধিকাংশ সীলমোহর পাথরের তৈরি হলেও পোড়ামাটি, তামা, ব্রোঞ্জ ও কালো মর্মর প্রভৃতির সীলমোহরও আছে। সীলগুলো কিছুটা ধর্মীয় ও কিছুটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তৈরি করা হতো বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। সীলগুলো মূলত তিন ধরনের- লেখযুক্ত, চিত্রযুক্ত ও লেখচিত্র। ইতিহাসবিদদের মতে এগুলো সিন্ধু সভ্যতার উৎকৃষ্ট কলা নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র শিল্প তৈরিতেও দক্ষতা দেখিয়েছিলেন সিন্ধু সভ্যতার কারিগরগণ। এগুলোর মধ্যে খেলনা, অলঙ্কার, মৃৎপাত্র, ধাতুদ্রব্য ইত্যাদি প্রধান। মাটির তৈরি দুই চাকার ষাঁড়ের খেলনা গাড়ি পাওয়া গেছে হরপ্পায়। এছাড়াও পোড়ামাটি ও তামার এক্কাগাড়ি, পাখি প্রভৃতিও রয়েছে। এই সভ্যতায় স্বর্ণকারগণ অপূর্ব দক্ষতায় নকশাদার স্বর্ণ, রৌপ্য, ইলেকট্রন, তামা ও ব্রোঞ্জের অলঙ্কার তৈরি করতেন। তাদের তৈরি অলঙ্কারসমূহের মধ্যে আংটি, বালা, নাকফুল, নেকলেস, কানের দুল, বাজুবন্দ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোয় কুমারের চাকায় তৈরি অনেক মসৃণ মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। পানি, শস্য, লবন প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য এসব অলঙ্করণ শোভিত মৃৎপাত্র তৈরি করা হতো।

এছাড়াও তামা ও ব্রোঞ্জের গামলা, পাতিল, গ্লাস প্রভৃতিও দক্ষতার সঙ্গে তৈরি করা হতো।

.

২.৬ : সিন্ধু-সভ্যতার অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা

সিন্ধু সভ্যতায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে এখানে একটি জমজমাট অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজ করতো বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেন।

কৃষি : সিন্ধু উপত্যকা, কালিবঙ্গান, হরপ্পায় শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ চাষাবাদের কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় এ সভ্যতার অধিবাসীরা যে মূলত কৃষিজীবী ছিলেন এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তাছাড়া সময়কাল ও ভৌগলিক অবস্থার বিবেচনায় নগর-পত্তনকারী একটা স্থায়ী জনগোষ্ঠির প্রধান জীবিকা কৃষিনির্ভর হওয়াটাই অতি স্বাভাবিক। এখানে গম, যব, মুগ, মসুর, সর্ষে, তিল, বার্লি, তুলা, বাজরা প্রভৃতি শস্য চাষের কথা জানা যায়। কৃষিকাজে ব্যবহৃত হতো ষাঁড়। সিন্ধু সভ্যতায় বৃহৎ শস্যাগারের উপস্থিতি থেকে সভ্যতার কৃষি সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দেয়। ধান উৎপাদনের বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া না গেলেও খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে লোথালবাসী ধান উৎপাদন করেছে অনুমান করা হয়।

পশুপালন : সিন্ধু সভ্যতায় গৃহপালিত জন্তু হিসেবে কুঁজ বিশিষ্ট ষাঁড়, মহিষ, মেষ, শূকর, বিড়াল ও হাতি উল্লেখযোগ্য ছিলো বলে মনে করা হয়। কুকুরকে প্রিয় পোষ্য জীব হিসেবে দেখা হতো। উট ও গাধা ছিলো ভারবাহী পশু। তবে সিন্ধু সভ্যতায় অশ্বের ব্যবহার ছিলো না বলে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক একমত।

শিল্প : সিন্ধু সভ্যতায় বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠার নিদর্শন পাওয়া যায়। তুলা ও পশমের সুতা কাটা ও বস্ত্র তৈরিতে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার বয়নশিল্পীরা পারদর্শী ছিলো। তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র ও ব্যবহার্য দ্রব্য ধাতব শিল্পের অগ্রগতির কথা প্রমাণ করে। অলঙ্কার তৈরিতেও তারা পারদর্শী ছিলো। তবে সেখান থেকে লৌহজাত কোন প্রত্নদ্রব্য আবিষ্কৃত না হওয়ায় প্রত্নতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিদের অভিমত যে, সিন্ধুবাসীরা লোহার ব্যবহার জানতো না। মৃৎশিল্পীরা নানা রকম পাত্র তৈরি ছাড়াও কাঁচের মতো চকচকে ও মসৃণ চীনা মাটির পাত্র নির্মাণে দক্ষ ছিলো। নির্মাণ কার্যে ব্যবহার হতো কাঁচা এবং আগুনে পোড়া ইট। এসব ছাড়াও হাতির দাঁতের চিরুনি, হাতির দাঁতের সূঁচ, কাঠের হাতলবিশিষ্ট তামা ও ব্রোঞ্জের আয়না, মৃৎপাত্র, সীল প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পও গড়ে উঠেছিলো।

ব্যবসা-বাণিজ্য : সিন্ধু সভ্যতার কারিগররা পর্যাপ্ত দ্রব্য উৎপাদন করতো। ভারতের বিভিন্ন অংশে এবং ভারতের বাইরে বহু দেশে এসব পণ্যের চাহিদা ছিলো। সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট ও কাথিওয়ারের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। শিল্পের কাঁচামাল বাইরে থেকে আমদানি করা হতো। পারস্য,

আফগানিস্তান, মিশর, চীন, সুমেরীয় ও ক্রিট সভ্যতার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। সিন্ধু সভ্যতার লোথালে একটি পোতাশ্রয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে যার দৈর্ঘ্য ৭১০ ফুট ও প্রস্থ ১২০ ফুট। সিন্ধু সভ্যতা থেকে হাতির দাঁতের তৈরি জিনিসপত্র, মণি-মুক্তা, ময়ুর রপ্তানি হতো। অন্যদিকে আমদানি হতো তামা ও রূপা। সিন্ধু সভ্যতার কিছু সীল-নিদর্শন সুমেরীয় অঞ্চলে এবং সুমেরীয় অঞ্চলের কিছু নিদর্শন হরপ্পায় পাওয়া যাওয়ায় উভয় সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগের প্রমাণ স্বীকৃত।

ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি : বিভিন্ন দ্রব্যাদি ওজনের জন্য নানান সামগ্রী আবিষ্কৃত হওয়ায় জানা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা বিভিন্ন ওজন পরিমাপের বাটখারা ব্যবহার করতো। ছোট বাটখারাগুলির আকৃতি ছিলো চারকোণাকার এবং বড়গুলি ছিলো গোলাকার ও কিছুটা কৌণিক। বাটখারা তৈরি করা হতো শক্ত পাথর দিয়ে। বাটখারাগুলি সমমাপের হওয়ায় ধারণা করা হয় সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা সঠিক ওজনের ব্যাপারে সতর্ক ছিলো। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন থেকে কয়েকটি দাঁড়িপাল্লার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণ হয়, বড় বড় জিনিসের ওজন করার জন্য ব্রোঞ্জের স্কেল ব্যবহার করা হতো। খুব ভারী বস্তু ওজন করার জন্য ব্যবহার করা হতো কাষ্ঠখণ্ড। কাষ্ঠখণ্ডের একপ্রান্তে দ্রব্য বেঁধে ওজন করা হতো। তাদের ওজন ছিলো ১৬ ভিত্তিক, যেমন- ১৬, ৬৪, ১৬০, ৩২০, ৬৪০। কিছুকাল আগেও আমাদের দেশে ১৬ আনায় ১ টাকা, বা স্বল্প ওজনের ক্ষেত্রে ১৬ আনায় ১ ভরি কিংবা বড় ওজনে ১৬ ছটাকে ১ সের ব্যবহৃত হতো।
কোন জিনিসের দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা স্কেলের মতো লাঠি ব্যবহার করতো। তাদের স্কেলের দৈর্ঘ্য ছিলো আধুনিক ২০.৬২ ইঞ্চির সমান। পরিমাপ দণ্ডে ইঞ্চি সদৃশ নির্দিষ্ট এককের ঘর কাটা থাকতো। হরপ্পাতে এ ধরনের পরিমাপ-দণ্ড পাওয়া গেছে।

'সিন্ধু সভ্যতা হতে সিন্ধুবাসীর যে সাংস্কৃতিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তার আলোকে স্যার জন মার্শাল, গ্রেগরি প্রোজেল প্রমুখের মতে এ সভ্যতা মিশর ও সুমেরীয় সভ্যতার চেয়ে উন্নততর ছিল। উদাহরণ হিসাবে তাঁরা দেখিয়েছেন হরপ্পা সংস্কৃতির মানুষ সে যুগে সুতি বস্ত্রের ব্যবহার জানতো। সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা অনেক বেশি পরিকল্পিত ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে নগর গড়তে সক্ষম হয়েছিল। যে প্রশস্ত ও আলো বাতাসে পূর্ণ ঘর-বাড়িতে সিন্ধু সভ্যতার মানুষ বসবাস করতো তেমন সাধারণ ইমারত মিশর বা মেসোপটেমিয়ার মানুষ তৈরি করতে পারেনি। স্নানাগার তৈরি, ড্রেন ব্যবস্থা, পরিকল্পিত রাস্তা, পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে একমাত্র সিন্ধু সভ্যতার মানুষই দক্ষতা দেখাতে পেরেছিল।'- (এ কে এম শাহনাওয়াজ / ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা-৪৯)।
প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের সামাজিক জীবন ও ব্যবস্থা সম্পর্কেও বেশ ভালো একটি ধারণা পাওয়া যায়।

সামাজিক শ্রেণীভেদ : সিন্ধু সভ্যতায় একদিকে যেমন মূল্যবান ধাতুর অলঙ্কার ও তৈজসপত্র

পাওয়া গেছে অন্যদিকে কম মূল্যবান ধাতু ও পোড়ামাটির দ্রব্যাদিও পাওয়া গেছে। এ থেকে মনে করা হয় সমাজে বিভিন্ন আয়ের লোক বসবাস করতো। কৃষি, রসায়নশিল্প, মৃৎপাত্র, ইট তৈরি ইত্যাদি তাদের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বড় বড় ঘরবাড়ি নগরবাসীর সচ্ছল অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং একইসাথে ধনী-দরিদ্র শ্রেণীর বৈষম্যেরও প্রমাণ দেয়। নৃত্যরতা নারী মূর্তি প্রমাণ করে শহরবাসীর নৃত্যশিল্পের প্রতি অনুরাগ ছিলো। বোঝাই যায় সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা একটা সমাজ জীবন গড়ে তুলেছিলো। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত প্রমাণ থেকে মনে করা হয় বৈদিক যুগের মতো বর্ণপ্রথা চালু না থাকলেও সিন্ধু সভ্যতায় সমাজে চারটি শ্রেণীর মানুষ বসবাস করতো- (১) প্রথম শ্রেণীতে ছিলো শাসক, পুরোহিত, চিকিৎসক, জ্যোতিষী, জাদুকর প্রভৃতি শিক্ষিত শ্রেণী। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলো যোদ্ধা। দুর্গ, দাররক্ষীদের গৃহ ও যুদ্ধাস্ত্র দেখে যোদ্ধা শ্রেণীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। (৩) ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগর ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার লোকজন ছিলো তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আর (৪) চতুর্থ শ্রেণীতে শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনকারী শ্রমজীবী যেমন- কৃষক, শ্রমিক, মুটে, জেলে, তাঁতী, মিস্ত্রি, গৃহকর্মী ইত্যাদি। এর থেকে বোঝা যায় প্রাচীন সব সভ্যতার মতো সিন্ধু সভ্যতার শ্রেণীভেদ প্রথার প্রধান কারণ ছিলো পেশা ভিত্তি।

খাদ্য : সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিলো গম। আর ছাগল, শূকর, হাঁস-মুরগী, কচ্ছপ, কাঁকড়া, মাছ ইত্যাদি ছোটখাট জীবজন্তুর মাংস তাদের প্রোটিনের অভাব পূরণ করতো। মাছ খুবই সাধারণ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো। যব এবং খেজুরও তাদের প্রিয় খাদ্য ছিলো। এছাড়া সব্জি, ফল, দুধ ইত্যাদিও সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা খেতো বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু উৎখননে পাওয়া বিভিন্ন প্রত্নবস্তু বিশ্লেষণ করে হরপ্পা সংস্কৃতির মানুষদের মধ্যে গরুর মাংস খাওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পোশাক-পরিচ্ছদ : আবিষ্কৃত মূর্তি থেকে সিন্ধু সভ্যতার পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সম্ভবত পুরুষরা নিম্ন অংশে ধুতির মতো কাপড় এবং উপরিভাগে সুতার তৈরি চাদর পরিধান করতো। নারীরা দুই প্রস্থ কাপড় পরতো। পুরুষ ও নারী উভয়ে লম্বা চুল রাখতো এবং অলঙ্কার পরিধানে তাদের আগ্রহ ছিলো। নারীদের প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের কথাও অনুমান করা হয়।

২.৭ : সিন্ধু-সভ্যতার ধর্ম বিশ্বাস

সিন্ধু সভ্যতার পরিকল্পিত নাগরিক জীবন থেকে প্রমাণ হয় এখানে একটি দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো। আবিষ্কৃত সীলগুলো প্রমাণ করে রাজ্য পরিচালনায় শাসক রাজা ছিলেন প্রধান। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে মন্দির বা উপাসনা গৃহের অনুপস্থিতি, লিপি পাঠোদ্ধার না হওয়ায় সিন্ধু সভ্যতার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না।

এখানে উল্লেখ্য, সিন্ধু সভ্যতার প্রত্ন-নিদর্শন হিসেবে আবিষ্কৃত ২৫০০ টি সীলে যে চিত্রধর্মী লিপি পাওয়া গেছে, এ লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা আজও সম্ভব হয়নি।
'সর্বপ্রথম স্বরূপবিষ্ণু নামের একজন গবেষক ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুলিপি পাঠের চেষ্টা করেন। পরে অনেকেই এ চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু খুব একটা সাফল্য আসেনি। অনেকের মতে দ্রাবিড় ভাষা থেকে সিন্ধুলিপির উদ্ভব। কেউ কেউ সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এর মিল খুঁজে পেয়েছেন। তবে কোনটি নিশ্চিত করার উপায় নেই। এদিক থেকে কিছুটা চেষ্টা নিয়েছিলেন একজন রুশ পণ্ডিত। তিনি প্রথম কম্পিউটারে সিন্ধুলিপির চিহ্নগুলো শ্রেণীবদ্ধ করেন। এরপরে সংস্কৃত ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা করেন। সবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে সিন্ধু লিপির সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষার ঘনিষ্ঠতাই বেশি। আবার অনেক পণ্ডিত মিশরের হায়ারোগ্লিফিক এবং মেসোপটেমিয়ার কিউনিফর্ম-এর সঙ্গে এই লিপির কিছুটা সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। তবে এসব মতের কোনটাই তেমনভাবে প্রমাণিত নয়।'
'সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে মিশর বা মেমোপটেমিয়া লিপির মতো প্যাপিরাস বা শিলায় সিন্ধু লিপি লাইনের পর লাইন লিখিতভাবে পাওয়া যায়নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু সীলে সামান্য বর্ণবিন্যাস রয়েছে। তাই পাঠোদ্ধার হয়ে পড়েছে প্রায় অসম্ভব।'- (এ কে এম শাহনাওয়াজ / ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা-৪৭)

তবে সিন্ধু লিপি পাঠোদ্ধার না হলেও আবিষ্কৃত সীল, পোড়ামাটির এবং পাথরের কিছু মূর্তি ও অন্যান্য প্রত্ন-নিদর্শন থেকে সে যুগের অধিবাসীদের ধর্মীয় ধারণা সম্পর্কে বেশ কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ্য-
'সিন্ধু-সভ্যতার যে নিদর্শনগুলিকে সাধারণত সীল বলে উল্লেখ করা হয় সেগুলি যে সত্যিই ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে শীলমোহর হিসেবে ব্যবহৃত হতো তার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। অর্থাৎ, সীল শব্দের ব্যবহার নেহাতই প্রথাগত।' 'বরং অধিকাংশ সীলের পিছনে সুতা পরাবার ব্যবস্থা থেকে অনুমান হয় তখনকার লোকেরা এগুলি তাবিজ হিসেবেই অঙ্গে ধারণ করত। অতএব প্রস্তাব হয়েছে, সীল না বলে এগুলিকে সীল-তাবিজ বলাই বাঞ্ছনীয়।' 'অন্তত এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সীলগুলির সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল। অধিকাংশ সীলের উপরেই কোনো-না-কোনো চিত্র এবং কিছু লেখা আছে। লেখাটুকু মন্ত্র ধরণের কিছু হতে পারে', 'যদিও লিপি-পাঠের অভাবে কোনো কথাই খুব বেশি জোর করে বলা যায় না। অতএব এই তথাকথিত সীলগুলির সঙ্গে সেকালের ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক অনুমিত হলেও সে-

ধর্মবিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য অনুমান করবার পক্ষে সীলের উপর অঙ্কিত চিত্রাবলীর উপরই নির্ভর করা সম্ভব। স্বভাবতই শুধুমাত্র এই ছবিগুলি বিচার করে সিন্ধু-ধর্মের কোনো পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয় : অজস্র সীলের উপর অজস্র ছবি, সেগুলিকে অবলম্বন করে অজস্র কথা কল্পনা করা যায়। তবুও সিন্ধু-ধর্মের সূত্র হিসেবে সীলগুলি মূল্যবান। কেননা অন্যান্য নিদর্শনের ভিত্তিতে সিন্ধু-ধর্ম সংক্রান্ত যে-কথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় তার উপর এই চিত্রাবলী মূল্যবান আলোকপাত করতে পারে। একথা স্বীকার করলে মানতে হবে, আমাদের জ্ঞানের বর্তমান পরিস্থিতিতে অত অজস্র সীলের মধ্যে মাত্র কয়েকটি নির্বাচিত সীলই সিন্ধু-ধর্মের পরিচায়ক হিসেবে প্রাসঙ্গিক হবে। অপরপর সীলের চিত্রাবলীতে হয়তো সেকালে নানা রকম পৌরাণিক কাহিনী আঁকা আছে; কিন্তু এখনো তা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।'- (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৬০)

'পোড়ামাটির মূর্তিগুলোর অধিকাংশই ছিল নারী প্রতিকৃতি। এ থেকে মনে করা হয় সিন্ধু সভ্যতায় মাতৃপূজার প্রচলন ছিল। পুরুষ দেবতা হিসাবে শিবের পূজা করা হতো। একটি সীলে তিন মুখবিশিষ্ট পুরুষ দেবতার মূর্তি ছিল। দেবতা সিংহাসনে আসন গেড়ে বসেছিলেন। তাঁর মাথায় ছিল শিং। দেবতার চারপাশে ছিল মহিষ, বাঘ, হাতি ও গণ্ডার। আসনের নিচে ছিল একটি হরিণ। দেবতার হাতে পরা ছিল অনেকগুলো বাজুবন্দ। আর তাঁর গায়ে ছিল বিচিত্র পোশাক। এই দেবতা বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছেন। যেমন 'ত্রিমুখা', 'যোগেশওয়ারা', 'মহাযোগী' অথবা 'পশুপতি'। তবে অনেকেই এই দেবতাকে শিব বলে চিহ্নিত করেছেন। সীলের ছবি থেকে ধারণা করা হয় সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা পশু, বৃক্ষ ও পাখির পূজা করতো। এ যুগে কবরে মৃতের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি রাখা হতো। এতে মনে করা হয় সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিল।'- (এ কে এম শাহনাওয়াজ/ ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা-৪৭)

শক্তি-সাধনা :

তবে সিন্ধু-যুগের দেবীপ্রধান বা মাতৃপ্রধান ধর্ম-বিশ্বাসে সিন্ধুবাসীরা যে মাতৃ-প্রকৃতির শক্তি-সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন তা নির্ভরযোগ্য প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসবিদদের প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকেও অবগত হওয়া যায়। এ প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থের 'সিন্ধু-যুগের ধ্যানধারণা' অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি-প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আমরা সে-আলোচনার কিছুটা সহায়তা নিতে পারি।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মন্তব্য করেছেন, 'প্রাচীন সংস্কৃতিগুলি অনুসন্ধান করলে দেখা যায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও শাক্ত-সম্প্রদায়ের ইতিহাস বহুকালের পুরানো। খুব সম্ভব প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার যুগ থেকেই শৈব ও পাশুপত সম্প্রদায়ের সঙ্গেই আমাদের দেশে তা প্রচলিত ছিলো।'

মহামহোপাধ্যায় আরও বলেছেন, 'সামগ্রিকভাবে ভারতীয় চিন্তাধারার উপর শাক্ত-সম্প্রদায়ের

প্রভাব অত্যন্ত গভীর। ভারতবর্ষের ভৌগলিক পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যায়, এ-দেশে অসংখ্য শক্তি-সাধনার কেন্দ্র ছড়িয়ে আছে। অতীতে এ-সাধনার প্রভাব ব্যাপক ছিলো এবং আজকের দিন পর্যন্ত তা অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে।'

অতএব এই 'শাক্ত-তান্ত্রিক' সংস্কৃতির ইতিহাসকে তিনি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে চেয়েছেন- (১) প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রচলিত প্রাচীন প্রাক্-বৌদ্ধ পর্যায়। (২) খ্রিস্টীয় ১২০০ পর্যন্ত বুদ্ধ-পরবর্তী বা খ্রিস্ট পরবর্তী মধ্যযুগীয় পর্যায়। (৩) খ্রিস্টীয় ১৩০০ থেকে আজ পর্যন্ত আধুনিক পর্যায়। আর শাক্ত-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী বলতে ওই দ্বিতীয় বা মধ্যযুগীয় পর্যায়েরই অবদান। যদিও প্রাচীন পর্যায়ের কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায়নি, তবু অনুমান হয়, মধ্যযুগীয় গ্রন্থাবলীও প্রাচীন ঐতিহ্যের উপরই নির্ভরশীল।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়টির পরিচায়ক কোনো গ্রন্থাবলী পাওয়া না গেলেও অন্য কোন্ ধরণের নিদর্শনের উপর নির্ভর করে তার সংবাদ পাওয়া সম্ভব? এর একমাত্র উত্তর হলো- শক্তি-সাধনার প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের পরিচায়ক বলতেই প্রত্নতত্ত্বলব্ধ সিন্ধু-সভ্যতার স্মারক।

এই স্মারক হলো মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, চানহুদারো এবং সিন্ধু-প্রদেশ ও বেলুচিস্থানের নানা জায়গা থেকে বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ছোট ছোট নারী-মূর্তি। অঙ্গসৌষ্ঠব ও নির্মাণভঙ্গির দিক থেকে সিন্ধু-উপত্যকা ও বেলুচিস্থানে পাওয়া মূর্তিগুলির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এগুলিকে প্রাচীন শক্তি-সাধনার নির্দেশক মাতৃকা বা মহামাতৃকা বা বসুমাতা মূর্তি বলেই সনাক্ত করেছেন। তবে এবিষয়ে প্রায় সমস্ত প্রত্নতত্ত্ববিদের মূল বক্তব্য প্রধানতই স্যার জন মার্শালের যুক্তি ও বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল বলে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন।

তাহলে মার্শালের যুক্তি-বিশ্লেষণ কী? মার্শাল বলছেন, মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পা থেকে পাওয়া পোড়ামাটির মূর্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি খেলার পুতুল হতে পারে। অর্থাৎ এগুলির সঙ্গে হয়তো কোনো রকম ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক নেই। যেমন মেয়েরা ময়দা মাখছে বা খাবারের থালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। অপর কয়েকটি- যেমন শিশুক্রোড়ে মাতা বা অন্তঃসত্ত্বা নারী- মানত-মূলক উপচার হতে পারে; সন্তানকামনায় এ জাতীয় মূর্তি মানত করবার দৃষ্টান্ত আজও বিরল নয়। কিন্তু এগুলির কথা বাদ দিলে বেশির ভাগ মূর্তিকারই সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, প্রায় নিরাবরণ নারী-মূর্তি, কোমরে এক টুকরো কটিবাস বা মেখলা, মাথায় বড় মুকুট ধরনের শিরোভূষণ, তা ছাড়া প্রায়ই জমকালো কণ্ঠহার, রত্নমালা প্রভৃতিও বেলুচিস্তানের মূর্তিকাগুলির সঙ্গে এগুলির পার্থক্য।

প্রশ্ন হলো হরপ্পা-সংস্কৃতির এই মূর্তিকাগুলি কেন দেবী-মূর্তি বা মাতৃ-মূর্তি বলে বিবেচিত হতে বাধ্য? এ-বিষয়ে মার্শাল সুদীর্ঘ যুক্তির অবতারণা করেছেন। তবে তার আগে এই মূর্তিকাগুলির আরো কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মর্টিমার হুইলারের পর্যবেক্ষণ

প্রণিধানযোগ্য। ১৯৪৬ সালের হরপ্পা-উৎখননের ভিত্তিতে মর্টিমার হুইলার বলছেন-
'পোড়ামাটির এই নারী-মূর্তিকাগুলির মুকুট প্রায়ই পেখমের মতো ছড়ানো; তার দুদিকে সাধারণত দুটি করে ছোট্ট বাটির মতো। ভালো করে পরীক্ষা করলে সাধারণত এই বাটির মতো অংশগুলিতে কালো পোড়া-দাগ চোখে পড়ে।'
পোড়া-দাগ কেন? হুইলার অনমান করছেন, হয় এগুলি প্রদীপ হিসেবে ব্যবহৃত হতো আর না হয় তো এগুলিতে ধূপ-ধুনো ধরনের কিছু পোড়ানো হতো। তা হলে খেলার পুতুল নয়, মূর্তিকাগুলির সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্ক-সূচক মূর্ত প্রমাণ রয়েছে বলা যায়।
দ্বিতীয়ত, আধুনিক কালে যে-রকম প্রতিমার গায়ে সিঁদুর মাখাবার প্রথা আছে হরপ্পা-সংস্কৃতির মূর্তিকাগুলির গায়েও সেইভাবে- এবং অবশ্য একই উদ্দেশ্যে- লাল রঙ মাখানো হতো বলেই অনুমান হয়।

এ প্রেক্ষিতে প্রত্নতত্ত্ববিদ ভাট্‌স্‌ বলছেন, হরপ্পায় পাওয়া মূর্তিকাগুলির মধ্যে অন্তত তিন ভাগের গায়ে কোনো রকম রঙ ব্যবহার করা হতো বলে মনে হয় না, যদিও মহেঞ্জোদারোর মূর্তিগুলিতে আধুনিক কালের সিঁদুর মাখাবার মতোই কোনো এক-রকম প্রথা ছিলো। তবে অন্তত মহেঞ্জোদারো মূর্তিকাগুলির গায়ে সিঁদুর-রঙ মাখানো সুস্পষ্ট প্রমাণ চোখে পড়ে এবং তাঁর মতেও এ-থেকে মূর্তিকাগুলির সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্কই প্রমাণিত হয়।
অন্যদিকে আরেক প্রত্ন-ইতিহাসবিদ ম্যাকে মন্তব্য করেছেন, সুদীর্ঘ কাল ধরে নোনা মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকবার ফলে মূর্তিকাগুলির গায়ে মাখানো সিঁদুর রঙ এমনই অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক যে আজকের দিনে তা সহজে চোখে পড়বার কথা নয়। তাই এ-কথা খুব জোর করে বলা সম্ভব নয় যে হরপ্পা-সংস্কৃতির বেশিরভাগ মূর্তিকার গায়ে সিঁদুর-রঙ দেবার প্রথা ছিলো না। এবং ম্যাকে আরও বলেছেন, নারী-মূর্তিকার গায়ে এ-জাতীয় ধর্মানুষ্ঠানগত সিঁদুর-রঙ মাখাবার দৃষ্টান্ত শুধু মাত্র প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; মিশর, সাইপ্রাস, মালটা এবং দানিউব সংস্কৃতির কেন্দ্রেও একই প্রথার পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়, 'ভিলেন্ডর্ফের ভেনাস' নামের প্রত্নতত্ত্বলব্ধ সর্বপ্রাচীন মাতৃমূর্তিকার দৃষ্টান্তেও এই প্রথারই চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে।

হরপ্পা-সংস্কৃতির নারী-মূর্তিকাগুলির সঙ্গে যে ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্ক ছিলো এ বিষয়ে উপরিউক্ত আলোচনায় বিষয়টির মূর্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। এবার হরপ্পা-সংস্কৃতির এই মূর্তিকাগুলি কেন দেবী-মূর্তি বা মাতৃ-মূর্তি বলে বিবেচিত হতে বাধ্য, এ-বিষয়ে স্যার জন মার্শালের সুদীর্ঘ যুক্তি-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয় অংশ-বিশেষ দেবীপ্রসাদের তর্জমায় উদ্ধৃত করা যেতে পারে। স্যার মার্শাল বলছেন-
'এ-কথা অবশ্যই সুবিদিত যে সিন্ধু-উপত্যকা এবং বেলুচিস্তান থেকে পাওয়া নারী-মূর্তিকাগুলির মতোই অজস্র মূর্তিকা পার্সিয়া থেকে ইজিয়ান পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ এলাকা থেকে- বিশেষত ইলাম্‌, মেসোপটেমিয়া, ট্রান্সকাস্পিয়া, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীট, সাইক্লেড্‌স্‌, বলকান ও মিশরের নানা কেন্দ্র থেকে- সংগৃহীত হয়েছে।

কোনো কোনো দেশে এ জাতীয় মূর্তিকা হয়তো অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের, কোথাও বা এগুলির পরিচয় কিছুটা খাপছাড়া, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ওই সব ধর্মগোষ্ঠিগুলির উৎস অভিন্ন হোক আর নাই হোক অন্তত যে সব দেশের এগুলির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে সেখানের সর্বত্র সমজাতীয় ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এ-বিষয়ে সাধারণ মত হলো, মূর্তিকাগুলি মাতৃকা বা প্রকৃতি-দেবীরই প্রতীক। আনাতোলিয়ায় তার পূজার সূত্রপাত হয়, তারপর ক্রমশ তা সমগ্র পশ্চিম-এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এই মূর্তিকাগুলির সঙ্গে সিন্ধু-নদের কিনারায় পাওয়া মূর্তিকাগুলির নিকট সাদৃশ্য থেকে এ-সিদ্ধান্ত সংবরণ করা কঠিন যে সিন্ধু-উপত্যকাতেও এগুলি মাতৃকা বা প্রকৃতি-দেবীরই প্রতীক ছিল এবং পশ্চিমাঞ্চলের সমজাতীয় মূর্তিকাগুলির মতোই এগুলিও একই উদ্দেশ্য সাধন করত। অর্থাৎ, হয় এগুলি ছিল মানতমূলক উপচার, আর না-হয় তো সাধারণ লোকের বাড়িতে ঠাকুর-ঘরের বিগ্রহ, যদিও দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এখন দেখা যাচ্ছে, সিন্ধু-নদ থেকে নীল-নদ পর্যন্ত সারা পথ শুধু ভৌগোলিকভাবেই অবিচ্ছিন্ন নয়, তাম্র-প্রস্তর যুগে পুরো এলাকাটি একই সংস্কৃতি-বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এই পরিস্থিতি থেকে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়-প্রতিষ্ঠই হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম-এশিয়ার সঙ্গে তুলনা যদি বাদ দেইও মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা এবং বেলুচিস্তানের নিদর্শনগুলিকে মাতৃ-দেবী বা তারই কোনো স্থানীয় রূপ বলে সনাক্ত করবার অন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। কেননা আর কোনো দেশেই মাতৃদেবীর উপাসনা ভারতবর্ষের মতো বিস্মৃত অতীত থেকে এমন দৃঢ়প্রতিষ্ট ও ব্যাপক নয়। তাঁকে ‘মাতা’ বা ‘মহামাতা’ বলা হয়, তিনিই হলেন প্রকৃতি-র প্রতিরূপ এবং এই প্রকৃতির ধারণা থেকে ক্রমশ শক্তির ধারণা উদ্ভূত হয়েছিল। তাঁরই প্রতিনিধি বলতে আজকের গ্রামদেবতা- এই দেবীর অসংখ্য নাম এবং স্থানীয় লক্ষণের নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও প্রত্যেকেই ওই ‘প্রকৃতি’-র মূর্ত মানবী-রূপ। প্রতি গ্রামেরই একটি করে নিজস্ব বিশিষ্ট দেবী আছে, গ্রামের ধনী-দরিদ্র সকলেই তাঁর রক্ষায় রক্ষিত এবং প্রায়ই দেখা যায় তাঁর পূজা সমগ্র পূজা-উপাসনার স্থান গ্রহণ করেছে।... আজকাল সাধারণত তাঁর মূর্ত বিগ্রহ গড়া হয়; কিন্তু কখনও শুধু-একটি শিলাখণ্ডই তাঁর প্রতীক, কখনও বা তাঁর দেউলটি শূন্য- কোনো মূর্তি নেই। এ-কথা অনুমান করা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত যে পশ্চিম-এশিয়ার মাতৃদেবীর মতো এগুলিও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত যাই হোক-না-কেন, অন্তত একটি কথায় সন্দেহের অবকাশ নেই, স্থানীয় অনার্যদের দেবলোকে প্রধানা বলতে এই গ্রামদেবতাই। এ-বিষয়ে নানা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আদিম উপজাতিদের মধ্যে আজও এই গ্রামদেবতার ধর্মানুষ্ঠানই টিকে রয়েছে এবং সে-অনুষ্ঠানে প্রধান অংশ গ্রহণ করে অচ্ছুতরই, –ব্রাহ্মণ পূজারী নয়। এই অচ্ছুত বলতে প্রাচীন উপজাতির প্রতিনিধিই- মানুষের কামনা কীভাবে দেবীর শ্রুতিগোচর করা যায় এ-রহস্য শুধু তাদেরই জানা আছে। কোনো কোনো উপজাতি কখনোই হিন্দুধর্মের (বৈদিক বা আর্যধর্মের) আওতায় আসেনি, তাদের মধ্যেই মাতৃদেবী বা বসুমাতার উপাসনা সবচেয়ে প্রবল। বস্তুত, ভারতবর্ষে বা অন্যত্র কোথাওই আর্যদের মধ্যে নারী-দেবতার পক্ষে মহামাতার মতো সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত হবার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। বেদের পৌরাণিক কল্পনায় দেবীরা অপ্রধান, দেবলোকে প্রধান বলতে পুরুষেরাই- দেবীদের

যেটুকু বা গৌরব তা ওই পুরুষের সঙ্গিনী হিসেবেই।'

উপরিউক্ত তথ্য এবং যুক্তি-থেকেই মার্শাল সিন্ধু-সভ্যতার শক্তি-সাধনার প্রচলন অনুমান করেছেন এভাবে-

'প্রথমেই সুস্পষ্টভাবে বলে রাখতে চাই, মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার শাক্ত ধর্মের কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। প্রমাণ বলতে যেটুকু তা নেহাতই ইঙ্গিতমূলক। ভারতবর্ষে শাক্ত-ধর্ম অত্যন্ত প্রাচীন- মাতৃদেবীর সাধনা থেকেই তার উদ্ভব এবং তার সঙ্গে শৈব-সাধনার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তা ছাড়া পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি ধর্মের সঙ্গে তার সাদৃশ্য এমনই যে তা নীরবে উপেক্ষা করা যায় না।... আদিম মাতৃ-উপাসনার বিকাশের এই পর্যায়টিতে দেবী নারী-শক্তির প্রতীকে ('শক্তি') এবং সৃষ্টির সনাতন তত্ত্বে ('প্রকৃতি') পরিণত হয়েছেন, সনাতন পুরুষ-তত্ত্বের ('পুরুষ') সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তিনি বিশ্বের আদিকারণ মা জন্মদায়িনী ('জগৎ-মাতা' বা 'জগদম্বা') রূপে পরিকল্পিত। তাঁর চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হলো শিব-সঙ্গিনী 'মহাদেবী'-র রূপ। আগেই বলেছি, শাক্ত-ধর্ম শৈব-ধর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত। তবুও এই শক্তিই শিবেরও স্রষ্টা এবং প্রাধান্য বলে পরিকল্পিত। তাঁর অপেক্ষাকৃত গৌণ বিকাশগুলির সঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং অন্যান্য সমস্ত দেবতার শক্তি সমন্বিত হয়েছে এবং পরবর্তীকালের শিব-উপাসকেরা যেমন তাঁকেই শ্রেষ্ঠ দেব বা 'মহাদেব' রূপে গ্রহণ করেছেন তেমনি তাঁর এই নারী-সঙ্গিনীটি শক্তি দেবলোকে প্রধানা রূপেই পূজিত- তাঁরই মধ্যে দেবলোকের সমগ্র নারী-শক্তি প্রতিবিম্বিত। শিবের মতোই তাঁরও স্বভাব দ্বিবিধ। তাঁরই শক্তিতে সৃষ্টি হয়, প্রলয় হয়; তাঁরই গর্ভে নিখিল বিশ্বের জন্ম, নিখিল বিশ্বের লয়।... শাক্ত-ধর্মের অনেক তত্ত্ব ও অনুষ্ঠান অবশ্যই পরবর্তীকালের হিন্দুধর্ম থেকে গৃহীত এবং তা আর্য প্রভাবের পরিণাম। কিন্তু তার মূল উপাদান অবশ্যই আর্য-পূর্ব এবং তা স্ত্রী-পুরুষমূলক দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত- এই দ্বৈতবাদ, এম্, বার্থ যেমন বলছেন, ভারতবর্ষের মতোই পুরানো।'

মার্শাল আরও বলেছেন,-

'নিকট প্রাচ্যের কয়েকটি আর্য-পূর্ব ধর্মের সঙ্গে ভারতীয় শাক্ত-ধর্মের আশ্চর্য সাদৃশ্য চোখে পড়ে। এশিয়া মাইনর ও ভূমধ্যসাগরের কিনারায় নানা জায়গায় প্রকৃতি-দেবী বা মাতৃ-দেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল– দেবীর সঙ্গে একটি তরুণ ও অপ্রধান দেবতাও সংযুক্ত। পিউনিক আফ্রিকায় তিনি স্ব-পুত্রের সঙ্গিনী তানিট দেবী, মিশরে হেরাস্-এর সঙ্গিনী আইসিস্, ফিনিসিয়ায় অ্যাডোনিস্-সঙ্গিনী আস্টারোথ্, এশিয়া মাইনরে অ্যাট্রিস-সঙ্গিনী সিবেলী, গ্রীসে তরুণ জিউস-এর সঙ্গিনী রিহিয়া। দেবী সর্বত্রই কুমারী; প্রথমে বিশুদ্ধ গর্ভধারণের ফলে তিনি ওই সঙ্গীর জন্ম দিচ্ছেন এবং তারপর তাঁরই আলিঙ্গনে সমস্ত দেবলোক ও জীবলোক উৎপাদন করছেন।... বলাই বাহুল্য এই সব ধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্থানীয় কয়েকটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের অবদান। তবুও মূল ধ্যানধারণার দিক থেকে এগুলির সঙ্গে ভারতীয় শাক্ত-ধর্মের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। প্রতিটির কেন্দ্রই কোনো মহামাতা বা প্রকৃতি-দেবী;... শাক্তদের মহামাতার মতোই তিনি একাধারে কল্যাণময়ী ও ভীষণা, অকল্যাণের ধ্বংসকারিণী

কিন্তু স্বয়ং আতঙ্ক-সঞ্চারিনী; তিনিই সমস্ত কামনা-বাসনা ও জাদু-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী; তাঁর ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে প্রায়ই নির্বিচার মিলন ও রুধির-বাহুল্য দেখা যায়। ভারতীয় শাক্ত-ধর্মের সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্য অনেকদিন থেকেই পরিলক্ষিত হয়েছে এবং অনেকেই এ-বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। ধরে নেওয়া হয়েছে, সমস্ত দৃষ্টান্তেই ধর্মগুলি সমতুল্য (মাতৃতান্ত্রিক) সমাজ-ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত– প্রাক্-আর্য যুগে ভারতবর্ষ ও নিকট-প্রাচ্যে এই সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।'

এ প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন-
'যে-কথা আগে বোঝা যায় নি– হরপ্পা এবং মোহেনজো-দাড়ো আবিষ্কারের পরই প্রথম বোঝা গেল– তা এই যে তাম্র-প্রস্তর যুগে ভারতবর্ষ ও পশ্চিম এশিয়া একই সভ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এই নতুন জ্ঞানের আলোয় আজ প্রশ্ন তোলবার সময় হয়েছে : ঐহিক সংস্কৃতির দিক থেকে দেশগুলি যে-ভাবে পরস্পর-দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকেও তা হয়ে থাকা সম্ভব কিনা? আর্যরা যদি ইউরোপ ও এশিয়ার প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে ধর্ম-বিস্তার করতে পেরে থাকে তা হলে আর্য-পূর্বদের পক্ষেই বা তা অসম্ভব কেন হবে? পরবর্তী গবেষণার ফলে মার্শালের অন্যান্য কয়েকটি বক্তব্যের মতোই সিন্ধু সভ্যতায় শাক্ত-ধর্মের উদ্ভব সংক্রান্ত উপরোক্ত মন্তব্যও অংশ-বিশেষে সংশোধনসাপেক্ষ হয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হলো, এ-বিষয়ে তাঁর মূল প্রতিপাদ্যটুকু পরবর্তী প্রত্নতত্ত্ববিদেরা প্রায় একবাক্যেই স্বীকার করেছেন– পোড়া-মাটির ওই জাতীয় নারী-মূর্তিকাগুলিকে সকলেই মহামাতা বা বসুমাতার প্রতিকৃতি বলে গ্রহণ করেছেন। সুবিস্তীর্ণ সিন্ধু-সাম্রাজ্যের বহু কেন্দ্র থেকে যদি এ-জাতীয় মূর্তিকা আবিষ্কৃত হয়ে থাকে তা হলে স্বীকার করতে হবে, সিন্ধু-সাম্রাজ্যের প্রধানতম ধর্ম বলতে এই মহামাতা বা বসুমাতার উপাসনাই।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৬৫)

প্রত্নতত্ত্বলব্ধ পোড়ামাটির মূর্তিকা বলতে যদিও প্রধানতই মাতৃকা-দেবীরূপী নারী-মূর্তি, তবুও সংখ্যায় তুলনামূলক নগন্য হলেও কিছু কিছু পুরুষ-মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, এগুলির ব্যাখ্যা কী হবে? নির্মাণকুশলতার দিক থেকে এগুলি এমনই স্থূল- এমনই আনাড়ি হাতের কাজ যে, প্রত্নতত্ত্ববিদ ম্যাকে'র মতে এগুলিকে শিশুদের হাতে গড়া খেলনাই মনে হয়েছে। আর অন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ ভাট্স্-এর বক্তব্য হচ্ছে, অনেকগুলি পুরুষ-মূর্তি দেখলে মনে হয় যেন হাত-জোড় করে উপাসনা করছে। অতএব এগুলিকে উপাস্য দেবতার মূর্তি মনে করবার কারণ নেই। তার বদলে বরং এগুলি উপাসকের প্রতিকৃতি হওয়াই সম্ভব। হরপ্পা-সংস্কৃতির কোনো কোনো সীলেও প্রায় একই রকম উপাসনার ভঙ্গি দেখা যায়।

সিন্ধু-যুগের ধর্ম বিশ্বাস যে দেবীপ্রধান বা মাতৃপ্রধান ছিলো এ বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ বা ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্বিমত নেই, কেননা প্রত্নতত্ত্বলব্ধ পোড়ামাটির নারী-মূর্তিকাগুলি থেকেই

তা প্রমাণ হয়। এ-কথা স্বীকার করেও কোনো কোনো বিদ্বান তর্ক তুলেছেন, তবুও বৈদিক ধর্মের সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার ধর্মের কোনো মৌলিক প্রভেদ প্রমাণ হয় না। তাদের যুক্তি হলো, বৈদিক সাহিত্যেও মাতৃ-উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ধারণা করা যায়, এই তর্ক উত্থাপনের গূঢ় উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়- আর্য-সংস্কৃতিকেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম উৎস-মুখ হিসেবে সাবেকি ধারণা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। তাই এ বিষয়ে বৈদিক সাহিত্যের নজির বিচার করা আবশ্যক বৈকি।

বৈদিক সাহিত্যের দেবীস্তুতি প্রসঙ্গে
ঋগ্বেদে শক্তি-উপাসনা বা মাতৃ-উপাসনার নজির হিসেবে ‘দেবী-সূক্ত’-এর উল্লেখ করা হয়। এটি ‘আত্মা-সূক্ত’ নামেও পরিচিত। এখানে ঋকগুলিতে দেবী নিজের বিষয়ে নিজেই বলছেন, যা ঋগ্বেদের অন্য সূক্তগুলির বৈশিষ্ট্যের সাথে খুবই অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। তাছাড়া এই সূক্তটি যে অত্যন্ত অর্বাচীন- অর্থাৎ অনেক পরবর্তীকালে রচিত হয়ে অত্যন্ত কৃত্রিমভাবেই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের মধ্যে সংকলিত হয়েছিলো- এ-বিষয়ে দায়িত্বশীল বেদবিদদের মধ্যে দ্বিমত নেই।
প্রসিদ্ধ এই দেবী-সূক্তটি (ঋগ্বেদ-১০/১২৫) হলো-
‘অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিন্যেভা।। ১
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্ ।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে।। ২
অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্ ।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ।। ৩
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্ ।
অমন্তবো মাং তা উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রূত শ্রদ্ধিবং তে বদামি।। ৪
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ।। ৫
অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ।। ৬
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম যোনিরপস্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি।। ৭
অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং বভূব’।। ৮
অর্থাৎ ঃ [বাগ্দেবীর উক্তি]
১। আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যদের সঙ্গে এবং সকল দেবতাদের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এ উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দু অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি। ২। যে সোম আঘাত অর্থাৎ প্রস্তর নিষ্পীড়ন দ্বারা উৎপন্ন হন, আমিই তাঁকে ধারণ করি, আমি ত্বষ্টা ও পূষা ও ভগকে ধারণ করি, যে যজমান যজ্ঞসামগ্রী আয়োজনপূর্বক এবং সোমরস প্রস্তুত করে দেবতাদের উত্তমরূপে সন্তুষ্ট করে, আমিই তাকে ধন দান করি। ৩। আমি রাজ্যের অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করেছি, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এরূপে আমাকে দেবতারা নানা স্থানে সন্নিবেশিত করেছেন, আমার আশ্রয়স্থান বিস্তর, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি। ৪। যিনি দর্শন করেন, প্রাণধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমার সহায়তায় সে সকল কার্য করেন। আমাকে যারা মানে না, তারা ক্ষয় হয়ে যায়। হে

বিদ্বান! শোন, আমি যা বলছি তা শ্রদ্ধার যোগ্য। ৫। দেবতারা এবং মনুষ্যেরা যাঁর শরণাগত হয়, তাঁর বিষয় আমিই উপদেশ দিই। যাকে ইচ্ছা আমি বলবান অথবা স্তোতা অথবা ঋষি অথবা বুদ্ধিমান করতে পারি। ৬। রুদ্র যখন স্তোত্রদ্বেষী শত্রুকে বধ করতে উদ্যত হন তখন আমিই তাঁর ধনু বিস্তার করে দিই। লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি। আমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট হয়ে আছি। ৭। আমি পিতা, আকাশকে প্রসব করেছি। সে আকাশ এ জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সে স্থান হতে সকল ভূবনে বিস্তারিত হই, আপনার উন্নত দেহদ্বারা এ দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি। ৮। আমিই সকল ভুবন নির্মাণ করতে করতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এরূপ বৃহৎ হয়েছে যে দ্যুলোককেও অতিক্রম করেছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করেছে।

মহাপণ্ডিত সায়নাচার্যকে বেদের সর্বজন-স্বীকৃত ভাষ্যকার বা টীকাকার বলা হয়। এই দেবী-সূক্ত সম্পর্কে সায়নাচার্যের ভাষ্য হলো- 'বাগ্দেবীকে এ সূক্তের বক্তা অর্থাৎ ঋষি বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু বাক্ যে এ সূক্তের বক্তা, সূক্তের ভেতর তার কোনও নিদর্শন নেই। বক্তা আপনাকে সর্বনিয়ন্তা ও সর্বনির্মাতা বলে পরিচয় দিচ্ছেন। ফলে একমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনীয়, অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর।'

এই দেবী-সূক্তে দেবী বলছেন তিনি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছেন। তিনি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট আছেন, তিনি সকল ভুবনে বিস্তারিত হন। এবং এ প্রেক্ষিতে অত্যন্ত কৌতুহলজনক বিষয় হচ্ছে, এই একই রকম সর্বেশ্বরবাদী চিন্তার প্রকট প্রকাশ দেখা যায় ঋগ্বেদেরই অন্য আরেকটি অর্বাচীন সূক্তের ভিন্ন অবস্থান থেকে, এবং সেই সূক্তটি হচ্ছে ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ সেই 'পুরুষ-সূক্ত', যেখানে এক পরম-পুরুষই সর্বেসর্বা। সেখানে এমন এক সর্বব্যাপী বিরাট পুরুষের কল্পনা করা হয়েছে, যাঁর সহস্র মাথা এবং সহস্র চরণ। পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেও তিনি তাকে অতিক্রম করেছেন, এতো বিরাট তিনি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাঁর অঙ্গ বা বিভিন্ন অংশ হতে চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, স্বর্গ, ভূমি, ইন্দ্র, দিক ও ভুবন সবই সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর দেহই খণ্ডিত হয়ে বিশ্বের নানা বস্তু ও জীবে পরিণত হয়েছে। তিনিই বিশ্বরূপে রূপান্তরিত হয়েছেন। অতি-প্রসিদ্ধ এই পুরুষ-সূক্তটি (ঋগ্বেদ-১০/৯০) হলো-

'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃহাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ।। ১।
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্য।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি।। ২।
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।। ৩।
ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোহস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।। ৪।

তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাড়ূমিমথো পুরঃ।। ৫।
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।। ৬।
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।। ৭।
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সম্ভূতং পৃষদাজ্যম্ ।
পশুন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারাণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে।। ৮।
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত।। ৯।
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ।। ১০।
যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ ।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে।। ১১।
ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পড্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।। ১২।
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।। ১৩।
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পড্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকা অকল্পয়ন্ ।। ১৪।
সপ্তাস্যাসন্ পরিধিয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ।। ১৫।
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্ ।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।। ১৬।
অর্থাৎ :
১। পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থিত থাকেন। ২। যা হয়েছে অথবা যা হবে সকলই সে পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হন, কেননা তিনি অন্নদ্বারা অতিরোহণ করেন। ৩। তাঁর এরূপ মহিমা, তিনি কিন্তু এ অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁর একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁর তিন পাদ। ৪। পুরুষ আপনার তিন পাদ (বা অংশ) নিয়ে উপরে উঠলেন। তাঁর চতুর্থ অংশ এ স্থানে রইলো। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অবচেতন) সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত হলেন। ৫। তিনি হতে বিরাট জন্মিলেন এবং বিরাট হতে সে পুরুষ জন্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণপূর্বক পশ্চাড়াগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করলেন। ৬। যখন পুরুষকে হব্য রূপে গ্রহণ করে দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হলো, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হলো, শরৎ হব্য হলো। ৭। যিনি সকলের অগ্রে

জন্মেছিলেন, সে পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুস্বরূপে সে বহ্নিতে পূজা দেওয়া হলো। দেবতারা ও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ তা দ্বারা যজ্ঞ করলেন। ৮। সে সর্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হতে দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হলো। তিনি সে বায়ব্য পশু নির্মাণ করলেন, তারা বন্য এবং গ্রাম্য। ৯। সে সর্ব হোম-সম্বলিত যজ্ঞ হতে ঋক ও সামসমূহ উৎপন্ন হলো, ছন্দ সকল তথা হতে আবির্ভূত হলো, যজু তা হতে জন্ম গ্রহণ করলো। ১০। ঘোটকগণ এবং অন্যান্য দন্ত পঙক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ জন্মিল। তা হতে গাভীগণ ও ছাগ ও মেষগণ জন্মিল। ১১। পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হলো, কয় খণ্ড করা হয়েছিলো ? এর মুখ কী হলো, দু হস্ত, দু উরু, দু চরণ কী হলো ? ১২। এর মুখ ব্রাহ্মণ হলো, দু বাহু রাজন্য হলো, যা উরু ছিলো তা বৈশ্য হলো, দু চরণ হতে শূদ্র হলো। ১৩। মন হতে চন্দ্র হলেন, চক্ষু হতে সূর্য, মুখ হতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হতে বায়ু। ১৪। নাভি হতে আকাশ, মস্তক হতে স্বর্গ, দু চরণ হতে ভূমি, কর্ণ হতে দিক ও ভূবন সকল নির্মাণ করা হলো। ১৫। দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষস্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করলেন তখন সাতটি পরিধি অর্থাৎ বেদী নির্মাণ করা হলো এবং তিনসপ্ত সংখ্যক যজ্ঞকাষ্ঠ হলো। ১৬। দেবতারা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করলেন, তাই সর্ব প্রথম ধর্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা আছেন, মহিমান্বিত দেবতাবর্গ সে স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করলেন।

এই পুরুষ-সূক্তটির বিশেষ উল্লেখযোগ্যতা হলো, বেদের টীকাকারের মতে, ঋগ্বেদের অন্য কোনো অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার জাতির উল্লেখ নেই। এই সূক্তটিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে বিদ্বানেরা অভিমত ব্যক্ত করেন, কেননা ঋগ্বেদ রচনাকালে আর্যদের মধ্যে জাতি বিভাগ ছিলো না। এবং বিশ্বজগতের নিয়ন্তাকে বলিস্বরূপ অর্পণ করার যে অনুভব এটিও ঋগ্বেদের সময়ের নয়, এমনকি ঋগ্বেদে আর কোথাও তা পাওয়া যায় না। তাছাড়া ব্যাকরণবিদ পণ্ডিতদের সুস্পষ্ট অভিমত হলো, এই পুরুষসূক্তের ভাষা বৈদিক ভাষা নয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত।
অর্থাৎ, বেদ সংকলনকালীন সময়ে উপনিষদীয় চিন্তাজগত থেকে উদ্ভূত ধারণাই পরবর্তীকালে ঋগ্বেদে অর্বাচীন হিসেবে উভয় সূক্তই সংযোজিত হয়েছে বলেই বেদবিদেরা মনে করেন।

ঋগ্বেদে বাক্-দেবী ছাড়া আর একজন মাত্র দেবীকে নিয়ে পুরো একটি সূক্ত রচিত হয়েছে, সেই দেবী হলেন রাত্রী-দেবী। এটিও বেদের অর্বাচীন অংশে। রাত্রী'র উদ্দেশ্যে রচিত এই সূক্তটি (ঋগ্বেদ-১০/১২৭) হলো-
'রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ। বিশ্বা অধি শ্রিয়োহধিত।। ১
ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।। ২
নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী। অপেদু হাসতে তমঃ।। ৩
সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্‌হি। বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ।। ৪
নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ। নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ।। ৫

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে। অথা নঃ সুতরা ভব।। ৬
উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত। উষ ঋণেব যাতয়।। ৭
উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ। রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে'।। ৮
অর্থাৎ :
১। রাত্রিদেবী আগমনপূর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করেছেন। ২। দেবরূপিণী রাত্রিদেবী অতি বিস্তার লাভ করেছেন, যাঁরা নীচে থাকেন, কি যাঁরা উর্ধ্বে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করলেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করেছেন। ৩। রাত্রিদেবী এসে ঊষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ করলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করলেন। ৪। পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে বাস গ্রহণ করে, সেরূপ যাঁর আগমনে আমরা শয়ন করেছি, সে রাত্রি আমাদের শুভকরী হোন। ৫। গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হয়েছে, পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ, সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে শয়ন করেছে। ৬। হে রাত্রি! বৃকী ও বৃককে আমাদের নিকট হতে দূরে নিয়ে যাও, চোরকে দূরে নিয়ে যাও। আমাদের পক্ষে বিশিষ্টরূপে শুভকরী হও। ৭। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট লক্ষ্য হয়ে দেখা দিয়েছে, আমার নিকট পর্যন্ত আচ্ছন্ন করেছে। হে ঊষাদেবি! আমার ঋণকে যেমন পরিশোধপূর্বক নষ্ট কর সেরূপ অন্ধকারকে নষ্ট কর। ৮। হে আকাশের কন্যা রাত্রি! তুমি যাচ্ছ, তোমাকে গাভীর ন্যায় এ সমস্ত স্তব অর্পণ করলাম, তুমি গ্রহণ কর।

বৈদিক সমাজ যে পুরুষপ্রধান এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই, ফলে বৈদিক সাহিত্যে বৈদিক দেবলোকও পুরুষপ্রধানই হবে এটাই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন হচ্ছে-

'বস্তুত বৈদিক দেবলোক যে পুরুষপ্রধান- বা ঋগ্বেদে দেবীমাহাত্ম্য যে নেহাতই গৌণ বা অপ্রধান- এ-বিষয়ে আধুনিক বিদ্বানেরা এত বার এত সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন যে তার পুনরুল্লেখ প্রায় নিষ্প্রয়োজন। ঋগ্বেদের প্রধানতম দেবতা বলতে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ইত্যাদি। সকলেই পুরুষ এবং এই সব পুরুষ দেবতাদের মাহাত্ম্যেই প্রায় সমগ্র ঋগ্বেদ ভরপুর। দেবীরা শুধু যে সংখ্যায় নগন্য তাই নয়, গৌরবেও একান্তই গৌণ। অনেক সময় তাঁদের সত্তাটুকুও সুস্পষ্ট নয়। যেমন ইন্দ্রাণী, বরুণানী প্রভৃতি 'আনী'-প্রত্যয়যুক্ত দেবীরা ইন্দ্র, বরুণ, প্রভৃতির সঙ্গিনীমাত্র; তাছাড়া তাঁদের আর কোনো পরিচয় নেই। 'রাত্রী' ও 'বাক্'-এর উদ্দেশ্যে একটি করে পুরো সূক্ত থাকলেও উভয় সূক্তই ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশভুক্ত এবং দেবী হিসেবে উল্লিখিত হলেও এঁদের সত্তা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। পুরমধি, ধীষণা এবং ইলা সম্বন্ধেও একই কথা, যদিও দেবী হিসেবে এঁদের পরিচয় আরও অস্পষ্ট। অবশ্য ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলেও পৃথিবীর উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত সুক্ত পাওয়া যায়; কিন্তু অন্যত্র কোথাওই তাঁর পরিচয় দেবতা দ্যৌ নিরপেক্ষ নয়। এ-ছাড়া বৃহদ্দিবা, রাকা প্রভৃতি দেবীরা ঋগ্বেদে এমনই নগন্য স্থান অধিকার করেছেন যে তাঁদের কথা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনাই নিষ্প্রয়োজন।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৬৬)

উদাহরণস্বরূপ, ঋগ্বেদে ইন্দ্রাণী, বরুণানী প্রভৃতি দেবপত্নীদের উদ্দেশ্যে রচিত ঋক যেমন-
'আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভরতীম্ । বরূত্রীং ধিষণাং বহ'।। (ঋগ্বেদ-১/২২/১০)
'ইহেন্দ্রাণীমুপ হ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে। অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে।। (ঋগ্বেদ-১/২২/১২)
'উত গ্না ব্যন্তু দেবপত্নীরিন্দ্রাণ্যগ্নায্যশ্বিনী রাট্ ।
আরোদসী বরুণানী শৃণোতু ব্যন্তু দেবীর্য ঋতুর্জনীনাম্'।। (ঋগ্বেদ-৫/৪৬/৮)
অর্থাৎ :
হে অগ্নি! আমাদের রক্ষার্থে দেবপত্নীদের এ যজ্ঞে আন। হে যবিষ্ঠ! হোত্রা, ভারতী ও বরণীয়া ধিষণাকে আন (ঋক-১/২২/১০)। আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সোমপানার্থে ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও অগ্নায়ীকে আহ্বান করি (ঋক-১/২২/১২)। দেবগণের ভার্যা, দেবীগণ হব্য ভোজন করুন। ইন্দ্রাণী, অগ্নায়ী, দীপ্তিমতী অশ্বিনী, রোদসী, বরুণানী এঁরা প্রত্যেকে আমাদের স্তোত্র শুনুন। দেবীগণ হব্য ভোজন করুন; দেবপত্নীগণের মধ্যে যারা ঋতু সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তারা স্তোত্র শ্রবণ ও হব্য ভক্ষণ করুন (ঋক-৫/৪৬/৮)।
এবং পৃথিবীর উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদের সংক্ষিপ্ত সূক্তটি (ঋগ্বেদ-৫/৮৪) হলো-
'বলিত্থা পর্বতানাং খিদ্রং বিভর্ষি পৃথিবি।
প্র যা ভূমিং প্রবত্বতি মহ্না জিনোষি মহিনি।। ১
স্তোমাসস্ত্বা বিচারিণি প্রতি ষ্টোভন্ত্যক্তুভিঃ।
প্র যা বাজং ন হেষন্তং পেরুমস্যস্যর্জুনি।। ২
দৃহ্‌হা চিদ্যা বনস্পতীন্ ক্ষ্ময়া দর্ধর্য্যোজসা।
যত্তে অভ্রস্য বিদ্যুতো দিবি বর্ষন্তি বৃষ্টয়ঃ'।। ৩
অর্থাৎ :
১। হে পৃথিবী! ফলতঃ এস্থলে তুমি পর্বত সকলের খণ্ড ধারণ করছ। তুমি বলশালী ও শ্রেষ্ঠ কারণ তুমি মাহাত্ম্যদ্বারা পৃথিবীর প্রীতি বিধান কর। ২। হে বিচিত্রগমনশালিনী পৃথিবী! স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন। হে অর্জুনি! তুমি শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় বারিপূর্ণ মেঘকে উৎক্ষিপ্ত কর। ৩। যে সময় দীপ্তিশালী অন্তরীক্ষ হতে তোমার মেঘের বৃষ্টি পতিত হয়, সে সময় তুমি দৃঢ় পৃথিবীর সাথে বৃক্ষ সকলকে বলপূর্বক ধারণ করে রাখ।

এখানে উল্লেখ্য যে, বেদের ব্যাখ্যাকার সায়ণাচার্য এই সূক্তে উল্লিখিত পৃথিবী শব্দের অর্থ করেছেন অন্তরীক্ষ। এই সূক্তটি ছাড়া ঋগ্বেদের অন্যত্র ছয়টি সূক্তে দেবী পৃথিবী মহান দেবতা দ্যৌ-এর সাথে সম্পর্কিত। পৃথিবী 'অবম' অর্থাৎ সর্বনিম্ন লোক এবং দ্যৌ পরম বা সর্বোচ্চ লোক। ঋগ্বেদে তাঁরা দুজন বিশ্বের পিতামাতা রূপে কল্পিত। দ্যৌ-এর সাথে সম্পর্কিত হয়ে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রচিত কিছু ঋক যেমন-
'মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্ । পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ'।।
(ঋক-১/২২/১৩)
'তয়োরিদ্ঘৃতবৎপয়ো বিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ। গন্ধর্বসা ধ্রুবে পদে'।। (ঋক-১/২২/১৪)
অর্থাৎ :

মহৎ দ্যৌ ও পৃথিবী আমাদের এ যজ্ঞ রসে সিক্ত করুন এবং পুষ্টি দ্বারা আমাদের পূর্ণ করুন (ঋক-১/২২/১৩)। মেধাবীরা নিজ কর্মগুণে সে দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যে গন্ধর্বের নিবাস স্থানে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে ঘৃতবৎ জল লেহন করেন (ঋক-১/২২/১৪)।

তবে ঋগ্বেদে প্রকৃত উল্লেখযোগ্য দেবী বলতে অদিতি এবং ঊষা। অদিতির উদ্দেশ্যে কোনো স্বতন্ত্র সূক্ত না থাকলেও ঋগ্বেদে তাঁর নাম অন্তত ৮০ বার উল্লিখিত হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রায় সর্বত্রই তিনি আদিত্যদের সঙ্গে এবং আদিত্যজননী হিসেবেই উল্লিখিত; স্বতন্ত্রভাবে তাঁর কথা মাত্র দু-একবারই পাওয়া যায়। যেমন-

'ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নুঃ সনাদ্রাজভ্যো জুহ্বা জুহোমি।
শৃণোতু মিত্রো অর্যমা ভগো নস্তুবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ'।। (ঋক-২/২৭/১)
'পিপর্তু অদিতী রাজপুত্রাতি দ্বেষাংস্যর্যমা সুগেভিঃ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য শর্মোপ স্যাম পুরুবীরা অরিষ্টাঃ'।। (ঋক-২/২৭/৭)
অর্থাৎ :
আমি জুহুদ্বারা সর্বদা শোভমান আদিত্যগণের উদ্দেশে ঘৃতস্রাবী স্তুতি অর্পণ করছি। মিত্র, অর্যমা, ভগ, বহুব্যাপী বরুণ, দক্ষ ও অংশ আমার স্তুতি শুনুন (ঋক-২/২৭/১)। রাজমাতা অদিতি শত্রুগণকে অতিক্রম করে আমাদের অন্যদেশে নিয়ে যান, অর্যমা সুগমপথে আমাদের নিয়ে যান। আমরা বহুবীরবিশিষ্ট এবং হিংসারহিত হয়ে মিত্র ও বরুণের সুখ লাভ করব (ঋক-২/২৭/৭)।

আদিত্য নামের দেবগোষ্ঠির তালিকা ঋগ্বেদে সর্বত্র অভিন্ন নয়, কোথাও ছয়, কোথাও সাত আবার কোথাও আটজন আদিত্যের উল্লেখ রয়েছে। তবে মিত্র বরুণ প্রভৃতি প্রাচীন দেবতারা তার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি ইন্দ্রও কখনো কখনো আদিত্য বলে উল্লিখিত হয়েছেন। যেমন-

'আপশ্চিদ্ধি স্বযশসঃ সদঃসু দেবীরিন্দ্রং বরুণং দেবতা ধুঃ।
কৃষ্টীরন্যো ধারয়তি প্রবিক্তা বৃত্রাণ্যন্যো অপ্রতীনি হন্তি'।। (ঋক-৭/৮৫/৩)
'স সুক্রতুর্ঋতচিদস্তু হোতা য আদিত্য শবসা বাং নমস্বান্ ।
আববর্তদবসে বাং হবিষ্মানসদিৎস সুবিতায় প্রযস্বান্'।। (ঋক-৭/৮৫/৪)
অর্থাৎ :
সোম সকল আয়ত্ত, যশোবিশিষ্ট ও দ্যুতিমান হয়ে সদনে ইন্দ্র ও বরুণ এ উভয় দেবতাকে ধারণ করেন। এঁদের একজন প্রজাগণকে পৃথক পৃথক করে ধারণ করেন, অন্যজন অপ্রতিগত শত্রুগণকে বিনাশ করেন (ঋক-৭/৮৫/৩)। হে আদিত্যদ্বয়! তোমরা বলশালী, যে নমস্কারযুক্ত হয়ে তোমাদের পরিচর্যা করে, সে শোভনকর্মবিশিষ্ট হোতা ঋতজ্ঞ হোন। যে হব্যযুক্ত ব্যক্তি তৃপ্তির জন্য তোমাদের আবর্তিত করে, সে অন্নবান হয়ে একান্ত প্রাপ্তব্য ফল লাভ করে (ঋক-৭/৮৫/৪)।

অতএব ওই দেবজননী অদিতিকে অত্যন্ত প্রাচীনই বলতে হবে। দেবীপ্রসাদের পর্যবেক্ষণ

অনুযায়ী (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৬৭), ‘হয়তো খুব সুপ্রাচীন কালে– অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশ রচিত হবারও আগে, প্রাচীনতম কবিদের সুদূর স্মৃতিতে– এই আদি-জননীর কথা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, ঋগ্বেদের রচনাকালেই তা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেননা, বৈদিক কবিদের একান্ত পুরুষ-প্রধান ধ্যানলোকে এই আদি-জননীর গৌরব বহুলাংশেই ক্ষুণ্ন ও খর্ব হয়েছে। তাই আদিত্যেদের কথা বাদ দিয়ে তাঁর স্বতন্ত্র উল্লেখ একান্তই দুর্লভ। শুধু তাই নয়, ঋগ্বেদের বর্ণনা অনুসারে দেবী অদিতি বারবার ইন্দ্রের স্তুতিতে নিযুক্ত।’ যেমন-

‘বৃষ্ণে যত্তে বৃষণো অর্কমর্চানিন্দ্র গ্রাবাণো অদিতিঃ সজোষাঃ।
অনশ্বাসো যে পবয়োহরথা ইন্দ্রেষিতা অভ্যবর্তন্ত দস্যূন্’।। (ঋক-৫/৩১/৫)

অর্থাৎ :

হে ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী; যখন কল্যাণবর্ষী অদিতি স্তবদ্বারা তোমার পূজা করেছিলেন এবং পাষাণ সকল সোমচূর্ণ করতে আনন্দিত হয়েছিল তখন অশ্বহীন ও রথহীন ইন্দ্র প্রেরিত আদিত্য মরুতগণ গিয়ে দস্যুদের পরাজিত করেছিলেন (ঋক-৫/৩১/৫)।

অতএব, অদিতির আদি-গৌরব সংক্রান্ত যে-কথাই কল্পনা করা হোক না কেন, তাঁর নজির থেকে অন্তত ঋগ্বেদের যুগে কোন রকম দেবী প্রাধান্য প্রমাণ হয় না।
বাকি থাকে ঊষার কথা। ঋগ্বেদের অন্তত ২০টি সূক্ত তাঁর স্তুতিতে রচিত এবং তাঁর উল্লেখ রয়েছে ৩০০ বারেরও বেশি। অতএব ঊষাকে কোনভাবেই অপ্রধানা বা তুচ্ছ মনে করবার কোন কারণ নেই। উদাহরণস্বরূপ, ঊষাস্তুতির অন্যতম একটি সূক্ত (ঋগ্বেদ-৫/৮০) যেমন-

‘দ্যুতদ্যামানং বৃহতীমৃতেন ঋতাবরীমরুণপ্সুং বিভাতীম্ ।
দেবীমুষসং স্বরাবহন্তীং প্রতি বিপ্রাসো মতিভি র্জরন্তে।। ১
এষা জনং দর্শতা বোধয়ন্তী সুগান্ পথঃ কৃণ্বতি যাত্যগ্রে।
বৃহদ্রথা বৃহতী বিশ্বমিন্বোষা জ্যোতির্যচ্ছত্যগ্রে অহ্নাম্ ।। ২
এষা গোভিররুণেভির্যুজানা স্রেধন্তী রয়িমপ্রায়ু চক্রে।
পথো রদন্তি সুবিতায় দেবী পুরুষ্টুতা বিশ্ববারা বি ভাতি।। ৩
এষা ব্যেনী ভবতি দ্বিবর্হা আবিষ্কৃণ্বানা তন্বং পুরস্তাৎ।
ঋতস্য পন্থামন্বেতি সাধু প্রজানতীব ন দিশো মিনাতি।। ৪
এষা শুভ্রা ন তন্বো বিদানোর্ধ্বেব স্নাতী দৃশয়ে নো অস্থাৎ।
অপ দ্বেষো বাধমানা তমাংস্যুষা দিবো দুহিতা জ্যোতিষাগাৎ।। ৫
এষা প্রতীচী দুহিতা দিবো নৃন্যোষেব ভদ্রা নি রিণীতে অপ্সঃ।
ব্যূর্ণ্বতী দাশুষে বার্যাণি পুনর্জ্যোতি র্যুবতিঃ পূর্বথাকঃ’।। ৬

অর্থাৎ :

১। জ্ঞানী ঋত্বিকগণ স্তোত্রদ্বারা সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ়া, সর্বব্যাপিনী, যজ্ঞে সম্যক পূজিতা, অরুণবর্ণা, সূর্যের পুরোবর্তিনী, দীপ্তিমতী ঊষার স্তব করছেন। ২। মনোহারিণী ঊষা মনুষ্যকে প্রবোধিত ও পথ সকল সুগম করে আরোহণপূর্বক সূর্যের অগ্রে যাচ্ছেন। মহতী বিশ্বব্যাপিনী

ঊষা দিবসের আরম্ভে দীপ্তি বিস্তার করেছেন। ৩। রথে অরুণবর্ণ বলীবর্দ যোজনা করে তিনি অবিশ্রান্ত ধন সকল অবিচলিত করছেন। সর্বপূজিত, বিশ্ববাঞ্ছিত, দীপ্তিমতী ঊষা সন্মার্গ সকল প্রকাশিত করে বিরাজ করছেন। ৪। দু প্রদেশে অর্থাৎ উর্ধ্ব ও মধ্য অন্তরীক্ষে অবস্থান করে এবং পূর্বদিক হতে নিজমূর্তি প্রকাশিত করে নিরতিশয় শুভ্রাকৃতি ঊষা সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ডকে প্রবোধিত করে সম্যকরূপে আদিত্যের অনুসরণ করছেন এবং দিক সকলের কোন হিংসা করছেন না। ৫। তিনি সুবেশা রমণীর ন্যায় নিজ মূর্তি প্রকাশিত করে এবং যেন স্নান হতে উত্থিত হয়ে আমাদের নেত্র সমীপে উদিত হচ্ছেন। স্বর্গ কন্যা ঊষা দ্বেষভাজন তমোরাশি বিদূরিত করে দীপ্তিসহকারে আসছেন। ৬। স্বর্গ কন্যা ঊষা পশ্চিমাভিমুখী হয়ে হব্যদাতাকে বাঞ্ছিত ধন প্রদানপূর্বক সুবেশা কামিনীর ন্যায় নিজ সৌন্দর্য বিস্তার করছেন। স্থিরযৌবনা ঊষা পূর্বকালের ন্যায় নিজ-দীপ্তি প্রকাশ করছেন।

এই সূক্তে ঊষাদেবীর আকর্ষণীয় ও মনোহারিনী রূপ ও গুণের স্তুতিই প্রকাশ পায়। ঊষার উদ্দেশে এরকম আরো বেশ কিছু স্তুতি-সূক্ত ঋগ্বেদে রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাঁর নজির থেকে মাতৃ-উপাসনার প্রতি ঠিক কোন্ বৈদিক মনোভাব প্রমাণিত হয়?
'উত্তরে কোশাম্বী অত্যন্ত বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন : ঊষা অবশ্যই মাতৃদেবী, কিন্তু তাঁর স্থান প্রকৃত বৈদিক দেবলোকে নয়- বরং তাঁকে বৈদিক মানুষ বিধ্বস্ত সিন্ধু-সভ্যতার মাতৃদেবী বলেই সনাক্ত করতে হবে।' 'প্রমাণ কী? চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের একটি সূক্তে।'- (দেবীপ্রসাদ/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৬৭)

এখানে যে সূক্তটির কথা বলা হচ্ছে সেটি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্ববহ সূক্ত। বেশ দীর্ঘ এই সূক্তটি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে এবং ইন্দ্রের মহিমা বর্ণনায় রচিত হলেও ইতিহাস ও নৃতত্ত্ববিদদের বিবেচনায় সূক্তটি খুবই তাৎপর্যময়, কেননা এটি অনার্য অসুরদের সাথে আর্যশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের বীরত্ববাহী যুদ্ধের কিছু অপার কৌতুহলোদ্দীপক কীর্তি-সমৃদ্ধ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূক্ত (ঋগ্বেদ-৪/৩০)-
'নকিরিন্দ্র ত্বদুত্তরো ন জ্যাযাঁ অস্তি বৃত্রহন্ । নাকিরেবা যথা ত্বম্ ।। ১
সত্রা তে অনু কৃষ্টয়ো বিশ্বা চক্রেব বাবৃতুঃ। সত্রা মহাঁ অসি শ্রুতঃ।। ২
বিশ্বে চনেদনা ত্বা দেবাস ইন্দ্র যুযুধুঃ। যদহা নক্তমাতিরঃ।। ৩
যত্রোত বাধিতেভ্যশ্চক্রং কুৎসায় যুধ্যতে। মুষায় ইন্দ্র সূর্যম্ ।। ৪
বত্র দেবাঁ ঋঘায়তো বিশ্বা অযুধ্য এক ইৎ। ত্বমিন্দ্র বনূঁরহন্ ।। ৫
যত্রোত মর্ত্যায় কমরিণা ইন্দ্র সূর্যম্ । প্রাবঃ শচীভিরেতশম্ ।। ৬
কিমাদুতাসি বৃত্রহন্মঘবন্মন্যুমত্তমঃ। অত্রাহ দানুমাতিরঃ।। ৭
এতৎ ঘেদুত বীর্যমিন্দ্র চকর্থ পৌংস্যম্ ।
স্ত্রিয়ং যদ্দুর্হণায়ুবং বধীর্দুহিতরং দিবঃ।। ৮
দিবশ্চিদঘা দুহিতরং মহান্মহীয়মানাম্ । ঊষাসমিন্দ্র সং পিণক্ ।। ৯
অপোষা অনসঃ সরৎ সংপিষ্টাদহ বিভ্যুষী। নি যৎসীং শিশ্নথদ্বৃষা।। ১০

এতদস্যা অনঃ শয়ে সুসংপিষ্টং বিপাশ্যা। সসার সীং পরাবতঃ।। ১১
উত সিংধুং বিবাল্যং বিতস্থানামধি ক্ষমি। পরিষ্ঠা ইন্দ্র মায়য়া।। ১২
উত শুষ্ণস্য ধৃষ্ণুয়া প্র মুক্ষ্যে অভি বেদনম্ । পুরো যদস্য সংপিণক্ ।। ১৩
উত দাসং কৌলিতরং বৃহতঃ পর্বতাদধি। অবাহন্নিন্দ্র শম্বরম্ ।। ১৪
উত দাসস্য বর্চিনঃ সহস্রাণি শতাবধীঃ। অধি পঞ্চ প্রধীঁরিব।। ১৫
উত ত্যং পুত্রমগ্রুবঃ পরাবৃক্তং শত্রক্রুতুঃ। উকথেষ্বিন্দ্র আভজৎ।। ১৬
উত ত্যা তুর্বশায়দু অস্নাতারা শচীপতিঃ। ইন্দ্রো বিদ্বাঁ অপারয়ৎ।। ১৭
উত ত্যা সদ্য আর্যা সরয়োরিন্দ্র পারতঃ। অর্ণাচিত্ররথাবধীঃ।। ১৮
অনু দ্বা জহিতা নয়োহন্ধং শ্রোণং চ বৃত্রহন্ । ন তত্তে সুম্নমষ্টবে।। ১৯
শতমশ্মন্ময়ীনাং পুরামিন্দ্রো ব্যাস্যৎ। দিবোদাসায় দাশুষে।। ২০
অস্বাপয়দ্দভীতয়ে সহস্রা ত্রিংশতং হথৈঃ। দাসানামিন্দ্রো মায়য়া।। ২১
স ঘেদুতাসি বৃত্রহন্ৎসমান ইন্দ্র গোপতিঃ। যস্তা বিশ্বানি চিচ্যুষে।। ২২
উত নূনং যদিন্দ্রিয়ং করিষ্যা ইন্দ্র পৌংস্যং। অদ্য নকিষ্টদা মিনৎ।। ২৩
বামং বামং ত আদুরে দেবো দদাত্বর্যমা।
বামং পূষা বামং ভগো বামং দেবঃ করূলতী।। ২৪
অর্থাৎ :
১। হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র! তোমার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কেউ নাই, তোমার চেয়ে প্রশস্যতর কেউ নাই, তুমি যেরূপ সেরূপ কেউই নয়। ২। হে ইন্দ্র! সমস্ত চক্র যেভাবে শকটকে অনুবর্তন করে, সেভাবে লোকে তোমাকে অনুবর্তন করে। তুমি সত্যই মহান ও প্রখ্যাত। ৩। হে ইন্দ্র! সমস্ত দেবগণ তোমাকে বলস্বরূপে গ্রহণ করে যুদ্ধ করেছিল। যেহেতু তুমি দিবারাত্রি শত্রুগণকে বধ করছিলে। ৪। হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে তুমি যুদ্ধকারী কুৎস এবং তার সহকারিগণের জন্য সূর্যের রথচক্র অপহরণ করেছিলে। ৫। হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে তুমি একাকী দেবগণের বাধাকারী সকলের সাথে যুদ্ধ করেছিলে এবং হিংসকদের বধ করেছিলে। ৬। হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে তুমি মনুষ্যের জন্য সূর্যকে হিংসা করেছিলে এবং যুদ্ধ কর্ম দ্বারা এতশকে রক্ষা করেছিলে। ৭। হে বৃত্রহন্তা মঘবা! তারপরে তুমি কি অন্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলে? তুমি এ অন্তরীক্ষে দিবসেই দনুর পুত্রকে বধ করেছিলে। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি যে বীর্য ও বল প্রদর্শন করেছিলে, তার দ্বারা দ্যুলোকের দুহিতা দুষ্ট হননাভিলাষিণী স্ত্রীকে (ঊষাকে) বধ করেছিলে। ৯। হে মহান ইন্দ্র! তুমি দ্যৌ বা দ্যুলোকের কন্যা সকলের পুজনীয় ঊষাকে সংপিষ্ট করেছিলে। ১০। অভীষ্টবর্ষী বৃষরূপ ইন্দ্র যখন উষাকে শিশ্নপ্রয়োগে পিষ্ট করেছিলেন, তখন ভীতা উষা ভগ্ন শকটের নিকট থেকে পলায়ন করলেন। ১১। সেই উষা চূর্ণীকৃত শকট হতে পলায়ন করে বিপাশা নদীর তীরে শয়ন করলেন। ১২। এবং সম্পূর্ণজলা সিন্ধুর চারদিকের মাটিতে ইন্দ্র মায়ার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ১৩। আরও, হে ধর্ষণকারী ইন্দ্র! তুমি শুষ্ণের ধন চারদিক থেকে অবরুদ্ধ ও লুণ্ঠন করেছিলে, তার নগরগুলি ধ্বংস করেছিলে। ১৪। আরও, হে ইন্দ্র! তুমি কুলিতরের অপত্য দাস শম্বরকে (জনৈক অসুরকে : সায়ণ) বৃহৎ পর্বতের উপর পরাজিত করে নিহত করেছিলে। ১৫। আরও, হে ইন্দ্র! চক্রের

চতুর্দিকস্থিত শঙ্কুর ন্যায় দাস বর্চির (জনৈক অসুরের : সায়ণ) চতুর্দিকস্থিত পাঁচশত এবং শতসহস্র অনুচরদেরকে সম্পূর্ণরূপে বধ করেছিলে। ১৬। আরও, শতক্রতু ইন্দ্র সে অগ্রুর পুত্র পরাবৃত্তকে স্তোত্রভাগী করেছিলে। ১৭। যজ্ঞপতি বিদ্বান ইন্দ্র অনভিষিক্ত সে তুর্বশ ও যদুকে অভিষেকের যোগ্য করেছিলে। ১৮। হে ইন্দ্র! তুমি তৎক্ষণাৎ সরযু নদীর (সরযু পাঞ্জাবের এক নদী, আধুনিক সরযু নয়) পারে আর্য অর্ণ ও চিত্ররথকে বধ করেছিলে। ১৯। হে বৃত্রহন্তা! তুমি বন্ধুগণ কর্তৃক ত্যক্ত অন্ধ ও পঙ্গুকে অনুনীত করেছিলে, তোমার দত্ত সুখ কেউ অতিক্রম করতে সমর্থ নয়। ২০। ইন্দ্র শম্বরের প্রস্তরনির্মিত শত সংখ্যক পুরী হব্যদাতা দিবোদাসকে প্রদান করেছিলেন। ২১। ইন্দ্র, দভীতিতির জন্য মায়াবলে ত্রিশ সহস্র সংখ্যক দাসকে হনন করেছিলেন। ২২। হে ইন্দ্র! তুমি এ সমস্ত শত্রুদের বিনাশ করেছ। হে বৃত্রহন্তা! তুমি গাভী সকলের পালক, তুমি সকল যজমানের নিকট সমান। ২৩। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি তোমার বলকে সামর্থ্যযুক্ত করেছিলে, অতএব অধুনাতন কোনও ব্যক্তি একে হিংসা করতে পারে না। ২৪। হে শত্রুবিনাশক ইন্দ্র! অর্যমাদেব তোমার সে মনোহর ধন দান করুন, পূষা সে মনোহর ধন দান করুন, ভগ সে মনোহর ধন দান করুন। করুলতী দেব সে মনোহর ধন দান করুন।

এই সূক্তটির উল্লেখযোগ্যতা হলো, এখানে ইন্দ্রের কীর্তি হিসেবে (৮, ৯, ১০ ও ১১ ঋকে) বলা হচ্ছে, ইন্দ্র ঊষার শকট চূর্ণ করছেন, ঊষাকে শিশ্নপ্রয়োগ অর্থাৎ ধর্ষণ করছেন, এবং ভীতা ঊষা ভয়ে বিপাশার তীরে পলায়ন করছেন। কিন্তু ঊষা যদি বৈদিক দেবলোকের মাতৃদেবীই হয়ে থাকেন তাহলে ঊষার উপর ইন্দ্রের এই আক্রমণ কেন? আলোচ্য সূক্তটিতে তার কোনো সুস্পষ্ট কারণ নির্দিষ্ট হয়নি। তবে ঊষার উপর ইন্দ্রের এই আক্রমণ কোথায় ঘটেছিলো সে-বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় পরবর্তী ঋকগুলিতে। সিন্ধু এবং তার আশপাশ অঞ্চলে ইন্দ্র মায়া ও বীর্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কারণ সিন্ধু, বিপাশা বা পাঞ্জাবের সরযুর শুধু উল্লেখই নয়, শম্বর নামক অনার্য অসুরকে হত্যা করা, প্রস্তরনির্মিত একশত নগর দিবোদাসকে দান করা, শুষ্ণকে পরাজিত করা প্রভৃতির বিবরণও এই সূক্তেই পাওয়া যায়। আধুনিক বিদ্বানেরা ঋগ্বেদের এ-জাতীয় সাক্ষ্য থেকেই আর্য-আক্রমণে সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার কথা অনুমান করেছেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, একই সূক্তে ঊষার উপর ইন্দ্রের আক্রমণ বর্ণনা।

অপরপক্ষে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ঊষা ছিলেন কোনো এক পূজনীয়া প্রাচীন মাতৃদেবী। কিন্তু কাদের মাতৃদেবী? তাঁর প্রতি ইন্দ্রের ওই আক্রোশ থেকে স্বভাবতই অনুমান হয়, ঊষা বৈদিক মানুষদের মাতৃদেবী নন- ‘এর একমাত্র ব্যাখ্যা হল ধর্মবিশ্বাসের সংঘাত- বিপাশা নদীর তীরে পুরুষ-প্রধান আক্রমণকারীদের যুদ্ধদেবতা ইন্দ্র প্রাচীন মাতৃদেবীকে ধ্বংস করছেন।’
তাছাড়া ইন্দ্রের পক্ষে ঊষার উপর আক্রমণ যে অস্বাভাবিক উৎসাহের পরিচায়ক নয় তার অনুমান হয় ঋগ্বেদে বারবার তার বর্ণনা থেকে। যেমন-

‘সোদঞ্চং সিন্ধুমরিণান্মহিত্বা বজ্রেগান উষসঃ সং পিপেষ।
অৎবসো জবিনীভির্বিবৃশ্চন্ত সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার’।। (ঋক-২/১৫/৬)
‘সনামানা চিদ্ধোসয়ো ন্যস্মা অবাহন্নিন্দ্র উষসো যথানঃ।
ঋষ্বৈরগচ্ছঃ সখিভির্নিকামৈঃ সাকং প্রতিষ্ঠা হৃদ্যা জঘন্থ’।। (ঋক-১০/৭৩/৬)
অর্থাৎ :
ইন্দ্র নিজ শক্তি মহিমায় সিন্ধুকে উত্তরদিকে অবস্থিত করেছিলেন, বেগবান সেনাদ্বারা দুর্বল সেনা ভেদ করে বজ্রের দ্বারা ঊষার শকট পিষ্ট করেছিলেন। সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হলে ইন্দ্র এ সকল কর্ম করেছিলেন (ঋক-২/১৫/৬)। ইন্দ্র যেমন ঊষার শকট ধ্বংস করেছিলেন সেইরূপ তুল্যনামধারী শত্রু ধ্বংস করেন। উৎসাহযুক্ত ও মহাবল পরাক্রান্ত বন্ধুস্বরূপ মরুৎগণের সাথে তিনি বিপক্ষের উত্তম উত্তম আবাস স্থান ধ্বংস করলেন (ঋক-১০/৭৩/৬)।

নিঃসন্দেহে সিন্ধু-সভ্যতার ধর্মবিশ্বাস মাতৃ-প্রধান, অন্যদিকে বৈদিক ধর্মবিশ্বাস পুরুষপ্রধান। ‘তাই বৈদিক দেবলোকে দেবী-মাহাত্ম্য নেহাতই গৌণ- দেবীরা সংখ্যায় নগন্য, গৌরবে অকিঞ্চিৎ। এ মন্তব্যে একমাত্র আপাত ব্যতিক্রম প্রাচীন পূজনীয়া ঊষা। কিন্তু তাঁর নজির থেকেও বৈদিক ধর্মবিশ্বাসে কোনোরকম দেবী-মাহাত্ম্য নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় না। কেন না এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই যে ঋগ্বেদের অন্তত স্থান বিশেষে পুরুষ প্রধান-বৈদিক দেবলোকের নায়ক ইন্দ্র ওই ঊষাকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করছেন এবং পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় এক্ষেত্রে ঊষা হলেন প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার মাতৃদেবীই। অতএব অনুমান হয়, সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলি যেমন বৈদিক আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল সম্ভবত সেই ভাবেই পুরুষ-প্রধান ধর্মবিশ্বাসের পক্ষ থেকে সিন্ধু-সভ্যতার প্রাচীন মাতৃপ্রধান ধর্মবিশ্বাসকে ধূলিস্যাৎ করার আয়োজন হয়েছিল। বৈদিক কবিদের কল্পনায় তাই ইন্দ্র-আক্রমণে ঊষার শকট চূর্ণ হচ্ছে এবং ভীতা ঊষা বিপাশার তীরে পলায়ন করছেন।’- (দেবীপ্রসাদ/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৬৯)

তাছাড়া আরেকটি সংশয় এখানে অমূলক হবে কিনা জানি না, কেননা কোন বিদ্বানকেই এযাবৎ এই তীর্যক পর্যবেক্ষণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে দেখা যায়নি। সেটি হলো, ঊষাকে নিয়ে ঋগ্বেদেই বিপরীতমুখী দুই দৃষ্টিভঙ্গি। একদিকে যুদ্ধবাজ ইন্দ্র কর্তৃক সিন্ধু-ধারণার মাতৃদেবী ঊষা আক্রান্ত ও সংপিষ্ট হওয়া, অন্যদিকে বৈদিক কবিকল্পনায় দেবলোক কন্যা হিসেবে ঊষার মনোহারী রূপ ও গুণ প্রকাশক বিভিন্ন স্তুতিসূক্ত। এর ব্যাখ্যা কী হতে পারে? তবে কি ঊষা হচ্ছেন প্রাচীন সেই মাতৃদেবী কিংবা অনার্য সিন্ধু-কন্যার প্রতীকী বা জাতি-নাম? যাঁরা কিনা যুদ্ধবাজ বৈদিক আর্য শিকারি কর্তৃক আক্রান্ত সংপিষ্ট ও বন্দীত্ব বরণের মাধ্যমে বীর-ভোগ্যা দেব-ভোগ্যা অপ্সরাসদৃশ কোন মনোলোভী দেবীর প্রাধান্যহীন মহিমায় বৈদিক কবিকল্পনায় আরোপিত হয়েছেন?

প্রকৃতি-উপাসনা :
বেদ-পূর্ব সিন্ধু-ধর্ম মাতৃপ্রধান এবং বৈদিক ধর্ম যে পুরুষ-প্রধান, এ বিষয়ে বিদ্বান-পণ্ডিতদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হলো, পরবর্তীকালের ভারতবর্ষীয় ধর্মে অন্তত সাধারণ জনগোষ্ঠির মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঋগ্বেদের প্রাচীন পুরুষ-দেবতাদের বিশেষ কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। অন্যদিকে উত্তরকালের এই ধর্মবিশ্বাসের প্রধানতম উপাদান হলো মাতৃ-পূজা- তা কি ওই বেদ-পূর্ব সিন্ধু-ধর্মেরই রেশ? এ ক্ষেত্রে সিন্ধু-যুগে এই ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত ছিলো বলে এর ব্যাখ্যা-সন্ধানে যেমন সিন্ধু-প্রত্নতত্ত্ব-লব্ধ স্মারকগুলির উপর নির্ভর করতে হবে, তেমনি পরবর্তীকালেও এই ধর্মবিশ্বাস বহুলাংশে অক্ষুণ্ন থেকেছে এই অনুমান-জন্য পরবর্তীকালের লিখিত সাহিত্য হয়তো ওই স্মারকগুলির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করতে পারে। অর্থাৎ ওই শাক্ত-ধর্ম বা মাতৃ-উপাসনার ব্যাখ্যা সন্ধানে একাধারে প্রত্নতত্ত্বমূলক ও সাহিত্যমূলক দ্বিবিধ তথ্যের উপর নির্ভর করা যেতে পারে।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ‘ভারতীয় দর্শন’ গ্রন্থসূত্রে জানা যায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কয়েকটি চিত্তাকর্ষক সাহিত্যমূলক সাক্ষ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন, ‘মার্কণ্ডেয়-পুরাণে’র দেবী-মাহাত্ম্যে স্বয়ং দেবী ঘোষণা করছেন-

‘ততঃ অহম্ অখিলং লোকম্ আত্মদেহ-সমুদ্ভবৈঃ।
ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈঃ অবৃষ্টৈঃ প্রাণধারকৈঃ।।
শাকম্ভরী ইতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যামি অহং ভুবি।...’ (মার্কণ্ডেয়-পুরাণ-৯২/৪২-৩)
অর্থাৎ : অনন্তর বর্ষাকালে আত্মদেহ-সমুদ্ভূত প্রাণধারক শাকের সাহায্যে আমি সমগ্র জগতের পুষ্টি-সরবরাহ করবো; তখন আমি জগতে শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হবো।

এখানে শাকম্ভরী নামের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত হলো, শাকাদি উদ্ভিদ দেবীগর্ভপ্রসূত। এ কারণেই দেবী শাককে আত্মদেহ-সমুদ্ভূত বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ দেবী বলতে এখানে বসুমাতা, পৃথিবী। যে-সুপ্রাচীন বিশ্বাস থেকে এই দেশী-নামের উদ্ভব হয়েছিলো তার একটি মূর্ত নিদর্শন হরপ্পা ধ্বংসস্তুপের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। হরপ্পায় এমন একটি অদ্ভূত সীল আবিষ্কৃত হয়েছে- তার এক-পিঠে উত্তানপদ দেবীমূর্তি, এই দেবীর গর্ভ থেকেই উদ্ভিদের উদ্ভব অঙ্কিত হয়েছে। অতএব অনুমান হয়, মার্কণ্ডেয়-পুরাণের এই শাকম্ভরী দেবী পুরাণের চেয়ে অনেক পুরনো; প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-যুগেও তাঁর পরিচয় অস্পষ্ট নয়। সিন্ধু-সভ্যতায় দেবী-রহস্যের সঙ্গে উদ্ভিদ-জগতের সম্পর্ক ইঙ্গিত যে শুধুমাত্র এই সীলটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ তা নয়। অন্যান্য অনেক সীলেও দেবীকে উদ্ভিদ-পরিবৃতা বা উদ্ভিদ-অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে অঙ্কিত করা হয়েছে। এ-জাতীয় নজির থেকেই সিন্ধু-সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন পরিচালনাকারী বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার জন মার্শাল অনুমান করেছিলেন, সিন্ধু-সভ্যতায় বৃক্ষ-উপাসনাও প্রচলিত ছিলো। এবং এ-বিষয়ে তিনি আরো একটি যুক্তি দিয়েছেন যে- উত্তরকালে ভারতবর্ষীয় ধর্ম-বিশ্বাসে বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী বলতে সর্বত্রই দেবীর কল্পনা।

এখানে উল্লেখ্য, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে (ঋগ্বেদ-১০/৭২) দেবী অদিতির বর্ণনাতেও এই কৌতুহলোদ্দীপক 'উত্তানপদ' শব্দ ও ধারণা ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন-

'দেবানাং যুগে প্রথমেহসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি'।। (ঋক-১০/৭২/৩)
'ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি'।। (ঋক-১০/৭২/৪)
অর্থাৎ :
দেবোৎপত্তির পূর্বতন কালে অবিদ্যমান হতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হলো। পরে উত্তানপদ (উত্তানপদ বলতে বৃক্ষ : সায়ণ) হতে দিক সকল জন্ম গ্রহণ করলো (ঋক-১০/৭২/৩)। উত্তানপদ হতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হতে দিক সকল জন্মিল, অদিতি হতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হতে আবার অদিতি জন্মিলেন (ঋক-১০/৭২/৪)।

আারো বেশ কিছু সূক্তের মতোই ঋগ্বেদের এই সূক্তটির রচয়িতা হলেন বৃহস্পতি ঋষি। সন্দেহ নেই, চার্বাক সম্পর্কিত আলোচনায় বৃহস্পতি নামটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যদিও তা ভিন্ন প্রেক্ষিতের আলোচনা। তবে এখানে এই ঋকসমূহে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, বেদ-পূর্ব বা তারচেয়েও অন্তত হাজার বছরের পুরনো সিন্ধু-ধর্মীয় কৃষিভিত্তিক উত্তানপদ-ধারণা ঋগ্বেদেও বহমান থাকা। এর একটি ব্যাখ্যা হতে পারে, নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে স্থায়ী হয়ে যাওয়া আর্য-সভ্যতায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবেচনায় ধীরে ধীরে নিজেদের জীবন-ব্যবস্থাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থার সাথে খাপ-খাইয়ে নেয়া। এবং অবশ্যই তাদের পুরুষ-প্রাধান্য বজায় রেখে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, জন মার্শাল যে সিন্ধু-সভ্যতার অন্যতম উপাদান হিসেবে বৃক্ষ-উপাসনার কথা উল্লেখ করেছেন, এই তথাকথিত বৃক্ষ-উপাসনাকে কি সিন্ধু-ধর্মের কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে, না কি একে শক্তি-সাধনার কোন অভিব্যক্তি বা লক্ষণ মনে করা যুক্তিসঙ্গত? এক্ষেত্রে পরবর্তী কালের ভারতবর্ষীয় ধর্মবিশ্বাসকে যদি এ-প্রশ্নের উপর আলোকপাত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, পরবর্তী কালের শক্তি-সাধনার বিশেষ অঙ্গই হলো উদ্ভিদ-অধিষ্ঠাত্রী বা শস্যদেবীর উপাসনা। কারণ-
'এ-বিষয়ে আধনিক বিদ্বানেরা ইতিপূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন : যাঁর নাম শাকম্ভরী তাঁরই নাম দুর্গা। তাই ফসলের সময়টিতেই দুর্গোৎসবের আয়োজন। কিন্তু দুর্গা-মূর্তি বলতে তো দশভূজা মহিষমর্দিনীর রূপ। কিন্তু শ্রীযুক্ত চন্দ দেখাচ্ছেন, এ-রূপ তুলনায় অনেক অর্বাচীন : প্রচলিত পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে রাবণ-বধের বরপ্রার্থনায় রামচন্দ্র ওই মহিষ-মর্দিনীর উপাসনা করেছিলেন। কিন্তু বাল্মীকির মূল রামায়ণে এ-উপাখ্যান নেই; তার বদলে রামচন্দ্র সেখানে সূর্যের কাছেই বর-প্রার্থনা করছেন। অতএব এই মহিষ-মর্দিনী রূপটি অনেক পরবর্তীকালের; এবং পরবর্তী কালের বলেই (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উদ্ধৃতিতে) ‘‘এখন যে সিংহবাহিনী দশভূজার প্রতিমা গড়াইয়া আমরা পূজা করিয়া থাকি, শত বৎসর পূর্বে ঠিক এমনভাবে প্রতিমা বাংলা কারিগর গড়িত না।... কারণ, আসল কথা এই যে, দুর্গোৎসবের সময় যে-প্রতিমা গড়াইয়া, চণ্ডিমণ্ডপ জোড়া করিয়া আমরা যে-উৎসব করিয়া থাকি সেই উৎসবে ঠিক সেই প্রতিমার পূজা হয় না; পূজা হয় ভদ্রকালীর, পূজা হয় পূর্ণঘটের; দেবীকে আহ্বান করিতে হয় ‘যন্ত্রে’ ও ঘটে।’’ ঘটের উপর নবপত্রিকা স্থাপন করতে হয় এবং দুর্গাপূজার প্রধানতম অনুষ্ঠান এই নবপত্রিকাকে কেন্দ্র করেই। আবার, ওই নয়টি উদ্ভিদের প্রত্যেকটিরই অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে এক-একটি দেবীর কল্পনা। তা হলে দুর্গাপূজার– অর্থাৎ, পরবর্তী ভারতবর্ষীয় ধর্মে মাতৃপূজা সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিব্যক্তিটির– ক্ষেত্রেও দেবীরহস্যের সঙ্গে উদ্ভিদ-জগতের সুস্পষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। শ্রীযুক্ত চন্দ বলেছেন, এই কারণেই শাক্তরা প্রত্যুষে কুলবৃক্ষ বা কুলতরুকে প্রণাম করেন এবং আদি-পর্যায়ে শক্তি বা দুর্গা শস্যদেবী হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছিলেন বলেই তাঁর নামান্তর অন্নদা বা অন্নপূর্ণা।’- (দেবীপ্রসাদ/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৭০)

তার মানে, বৃক্ষ-উপাসনাকে সিন্ধু-ধর্মের কোন এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যাখ্যা না করে বরং এ-কথা অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত হবে যে, সুপ্রাচীন কাল থেকে ওই তথাকথিত বৃক্ষ-উপাসনা শাক্ত-ধর্মেরই একটি প্রধানতম উপাদান ছিলো। এখন প্রশ্ন হলো, শক্তি-সাধন বা মাতৃ-উপাসনার সঙ্গে শস্য জগতের বা উদ্ভিদ-জগতের এ জাতীয় সম্পর্ক কেন? নৃতত্ত্ববিদেরা এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন-
‘পৃথিবী বা প্রকৃতির ফলপ্রসূতামূলক কামনা থেকেই বসুমাতা বা আদ্যা-শক্তি বা জগদম্বা পরিকল্পনার উদ্ভব। অর্থাৎ, এই বসুমাতা-কল্পনার উৎসে আছে এক আদিম বিশ্বাস, সে-বিশ্বাস অনুসারে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা ও মানবীয় ফলপ্রসূতা সমগোত্রীয়। তাই শস্যদায়িনী প্রকৃতিও সন্তানদায়িনী মাতার অনুরূপ- প্রকৃতিও মাতৃরূপে পরিকল্পিত। অতএব প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতাও মানবীয় প্রজননের সংস্পর্শ বা অনুকরণের সঙ্গে সংযুক্ত। নৃতত্ত্ববিদদের পরিভাষায় এই আদিম বিশ্বাসের নাম ‘ফার্টিলিটি ম্যাজিক’– উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে দেশে দেশান্তরে যে-সব বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়েছে, নৃতত্ত্ববিদদের রচনায় তার বহুল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।’- (দেবীপ্রসাদ/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৭১)

এখানে যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হলো, উপরে উল্লিখিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতিতে ‘যন্ত্র’ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে বলা হয়েছে ‘দুর্গোৎসবের সময় যে-প্রতিমা গড়াইয়া, চণ্ডীমণ্ডপ জোড়া করিয়া আমরা যে-উৎসব করিয়া থাকি সেই উৎসবে ঠিক সেই প্রতিমার পূজা হয় না; পূজা হয় ভদ্রকালীর, পূজা হয় পূর্ণঘটের; দেবীকে আহ্বান করিতে হয় ‘যন্ত্রে’ ও ঘটে।’ কেননা ‘যন্ত্র’ শব্দটি তন্ত্র-সাধনার পক্ষে অবিচ্ছেদ্য একটি উপাদান। তন্ত্রে একজাতীয় চিত্রের ব্যবহার আছে, সেগুলিকে যন্ত্র বলে-
‘যন্ত্র সাধারণত দুই প্রকার- পূজাযন্ত্র ও ধারণ-যন্ত্র। পূজাযন্ত্রে যে দেবতার পূজা করিতে

হইবে, সেই দেবতার যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে পূজা করিতে হয়। ঐরূপ যন্ত্রকে পূজাযন্ত্র বলা হয়।
যে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ধারণ করা হয় তাহার নাম ধারণ-যন্ত্র। এই ধারণ-যন্ত্র ভূর্জপত্রে অঙ্কিত করিয়া ধারণ করিতে হয়।...
তন্ত্রে লিখিত আছে, –যন্ত্রে দেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, এইজন্য যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া দেবতার পূজা করিতে হয়। (বিশ্বকোষ-১৫/৪৫)

আর তন্ত্রমতে এই যন্ত্রগুলি অবধারিতভাবেই নারী-জননাঙ্গের প্রতীকচিত্র। 'কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যন্ত্রগুলি যে পূজা, দেবতা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয়ের চেয়ে প্রাচীনতর,–অর্থাৎ, পূজা ও দেবতাদির বিষয় পরে কৃত্রিমভাবে যন্ত্রগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে,–যন্ত্রগুলিকে ভালো করে পরীক্ষা করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমত, মোটের উপর একই চিত্রের সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর সম্পর্ক বা ঐক্য পরিকল্পিত হয়েছে (বৃহৎতন্ত্রসারে বিভিন্ন যন্ত্রের চিত্র দ্রষ্টব্য)। তার থেকেই বোঝা যায়, উক্ত সম্পর্কাদির চেয়েও যন্ত্রগুলি প্রাচীনতর। দ্বিতীয়ত, বহু যন্ত্রের সঙ্গেই যন্ত্রসংযুক্ত দেবতাটির স্পষ্ট বিরোধ দেখা যায়। আধুনিক তান্ত্রিক গ্রন্থাদিতে কয়েকটি প্রসিদ্ধ যন্ত্রের নাম হলো, গণেশযন্ত্র, শ্রীরামযন্ত্র, নৃসিংহযন্ত্র, গোপালযন্ত্র, কৃষ্ণযন্ত্র, শিবযন্ত্র, মৃত্যুঞ্জয়যন্ত্র ইত্যাদি (বৃহৎতন্ত্রসার দ্রষ্টব্য)। উল্লেখিত দেবতাগুলি সকলেই পুরুষ। অথচ, যন্ত্রগুলি অবধারিতভাবেই নারী-জননাঙ্গের প্রতীকচিত্র।'- (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৪০২)
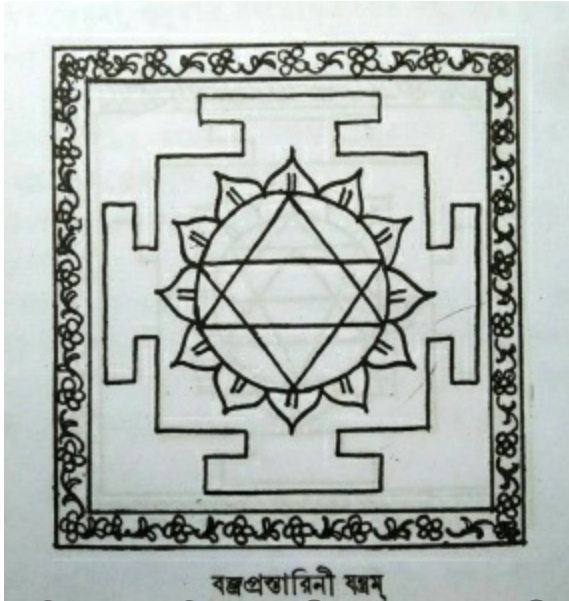
তান্ত্রিক যন্ত্রগুলি যে নারী-জননাঙ্গের প্রতীকমাত্র, এ-বিষয়ে শ্রীচক্রপূজা প্রসঙ্গে স্যার ভান্ডারকরের বক্তব্য হলো-
'It consists in the worship of picture of the female organ drawn in the centre of another consisting of a representation of nine such organs, the whole of which forms the `Sricakra'....The pictures are drawn on a`bhurja' leaf or a piece of silken cloth or a gold leaf.'-(বিশ্বকোষ-১৫/৫৪৫)

তার মানে, এভাবে নারী-জননাঙ্গের চিত্র অঙ্কন করবার পিছনে এক আদিম বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়; সেই বিশ্বাস হলো নারী-জননাঙ্গের উপরই প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতাও নির্ভরশীল। এ-বিষয়ে তন্ত্র-সাধনার আভ্যন্তরীণ তথ্যটুকুও যাচাই করে নেয়া যায়। যেমন, আদিতে দুর্গা যে শস্য-জননী ছিলেন এবং দুর্গোৎসব যে শস্য-উৎসবই ছিলো- সে-বিষয়ে শ্রীযুক্ত চন্দের বক্তব্য থেকেই জানতে পেরেছি আমরা। প্রমাণ হিসেবে তিনি কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, দুর্গোৎসব হলো শারদোৎসব- ফসল পাকবার ঋতু তখন। দ্বিতীয়ত, শাকম্ভরী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দুর্গার নাম। তৃতীয়ত, দুর্গাপূজায় নবপত্রিকার গুরুত্ব। শ্রীযুক্ত চন্দের এই প্রমাণগুলি অসামান্য মূল্যবান নিঃসন্দেহে। তার সাথে প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসেবে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতিটি স্মরণ করতে পারি-
'এখন যে সিংহবাহিনী দশভূজা দুর্গার প্রতিমা গড়িয়া আমরা পূজা করিয়া থাকি, শত বর্ষ পূর্বে ঠিক এমনভাবে প্রতিমা বাংলার কারিকর গড়িত না। গোড়ায় যখন সিংহবাহিনীর মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা এ দেশে প্রচলিত হয়, তখন কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী, কেহই ছিলেন না।... আসল কথা এই যে, দুর্গোৎসবের সময়ে যে প্রতিমা গড়াইয়া, চণ্ডীমণ্ডপ জোড়া করিয়া আমরা যে উৎসব করিয়া থাকি, সে উৎসবে ঠিক সেই প্রতিমার পূজা হয় না; পূজা হয় ভদ্রকালীর, পূজা হয় পূর্ণ ঘটের, দেবীকে আহ্বান করিতে হয় যন্ত্রে ও ঘটে।' (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী-২/২৬৫)

তাহলে মূল কথা দাঁড়াচ্ছে, দুর্গাপূজার আদি-অকৃত্রিম রূপটিকে চিনতে হলে পুত্রকন্যাপরিবৃতা ওই দশভূজাকে বাদ দিয়ে যন্ত্র ও ঘটের উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। এর বর্ণনায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকায়ত দর্শন' (পৃষ্ঠা-৪০৪-৯) এ বর্ণিত তথ্যমূলক দীর্ঘ বিবৃতির সহায়তা নিতে পারি-

সর্বতোভদ্রমণ্ডল

'দুর্গাপূজার প্রধানতম অঙ্গ ওই যন্ত্র ও ঘটের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা যাক। যন্ত্রটির নাম

সর্বতোভদ্রমণ্ডল। এটি তন্ত্রের একটি বিখ্যাত যন্ত্র :
এই চিত্রটি আঁকবার নির্দেশ দিয়ে বলা হচ্ছে (বৃহৎতন্ত্রসার: ৭৪-৫)-
ষটত্রিংশতা পদৈর্মধ্যে লিখেৎ পদ্মং সুলক্ষণম্ ।
বহিঃপঙক্ত্যা ভবেৎ পীঠং পংক্তিযুগ্মেন বীথিকা।।
দ্বারশোতোপশোভাস্রাং শিষ্টাভ্যাং পরিকল্পয়েৎ।
শাস্ত্রোক্তবিধিনা মন্ত্রী ততঃ পদ্মং সমালিখেৎ।।
পদ্মক্ষেত্রস্য সংত্যজ্য দ্বাদশাংশং বিহঃ সুধীঃ।
তন্মধ্যং বিভজেদ্বৃত্তৈস্ত্রিভিঃ সমবিভাগতঃ।।
আদ্যং স্যাৎ কর্ণিকাস্থানং কেশরাণাং দ্বিতীয়কম্ ।
তৃতীয়ং তত্র পত্রাণাং মুক্তাংশেন দলাগ্রকম্ ।।
বাহ্যবৃত্তান্তরালস্য মানেন বিধিনা সুধীঃ।
নিধায় কেশরাগ্রেষু পরিতোহর্ধনিশাকরান্ ।।
লিখিত্বা সার্দ্ধসংস্থানি তত্র সূত্রাণি পাতয়েৎ।
দলাগ্রাণাঞ্চ যন্মানং তন্মানাৎ বৃত্তমালিখেং।।
তদন্তরালং তন্মধ্যসূত্রস্যোভয়তঃ সুধীঃ।
আলিখেদ্বাহ্যহন্তেন দলাগ্রাণি সমন্ততঃ।।
দলমূলেষু যুগশঃ কেশরাণি প্রকল্পয়েৎ।
এতৎ সাধারণং প্রোক্তং পঙ্কজং তন্ত্রবেদিভিঃ।।
———————————————————
অঙ্গুলোৎসেধবিস্তারাঃ সীমারেখাঃ নিতাঃ শুভাঃ।
কর্ণিকাং পীতবর্ণেন কেশরাণ্যরুণেন চ।।
শুক্ল-বর্ণানি পত্রাণি তৎসন্ধীন্ শ্যামলেন চ।
রজসা রঞ্জয়েন্মন্ত্রী যদ্বা পীতৈব কর্ণিকা।।
কেশরাঃ পীতরক্তাঃ স্যুররুণানি দলানি চ।
সন্ধয়ঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ স্যুঃ সিতেনাপ্যসিতেন বা।।
রঞ্জয়েৎ পীঠগর্ভাণি পাদাঃ স্যুররুণপ্রভাঃ।
গাত্রাণি তস্য শুক্লানি বীথিষু চ চতসৃষু।।
আলিখেৎ কল্পলতিকাং দল-পুষ্প-সমন্বিতাম্ ।
বর্ণৈর্নানাবিধৈশ্চিত্রৈঃ সর্ব্বদৃষ্টিমনোহরাম্ ।।
দ্বারানি শ্বেতবর্ণানি শোভা রক্তাঃ সমীরিতাঃ।
উপশোভাঃ পীতবর্ণাঃ কোণান্যসিতভানি চ।।
তিস্রো রেখা বহিঃ কার্য্যাঃ সিতরক্তাসিতাঃ ক্রমাৎ।
মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রমেতৎ সাধারণং মতম্ ।।
অর্থাৎ :
তন্মধ্যে ৩৬টি ঘর লইয়া সুলক্ষণ পদ্ম অঙ্কিত করিবে। ৩৬টি ঘরের বাহিরের এক পংক্তিতে

পীঠ, তাহার পরের দুই পংক্তিতে বীথিকা হইবে। পরে অবশিষ্ট দুই পংক্তি দ্বারা মধ্যস্থলে দ্বার, উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া শোভা এবং শোভাদ্বয়ের পার্শ্বে দুইটি করিয়া উপশোভা এবং পরে কোণ প্রস্তুত করিতে হইবে। যে ৩৬টি ঘর লইয়া পদ্ম অঙ্কিত, তাহার দ্বাদশটি ঘর বাহিরে পৃথক রাখিয়া তন্মধ্যস্থ ২৪টি ঘরকে ৩টি বৃত্ত দ্বারা সমভাগে বিভক্ত করিবে। উহার প্রথম বৃত্ত কর্ণিকা, দ্বিতীয় বৃত্ত কেশর ও তৃতীয়টি পদ্মপত্র। যে দ্বাদশাংশ বাহিরে রাখা হইয়াছে, উহা পত্রের অগ্র। তৃতীয় বৃত্তের মধ্যস্থ স্থানের পরিমাণে পদ্মপত্র রচনা করিবে। কেশর সমূহের অগ্রভাগে অর্ধচন্দ্র অঙ্কিত করিবে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা-সমূহের মধ্যভাগে সূত্রপাত করত পদ্মপত্রের অগ্রগুলির সমান মাপে বৃত্তরেখা আঁকিবে।
মধ্যস্থ সূত্রপাতের দুই পার্শ্বে স্থির হস্তে দলাগ্র আঁকিবে। দলমূলে দুই দুইটি করিয়া কেশর করিতে হয়। ইহাকেই তন্ত্রবেত্তারা সাধারণ পদ্ম কহেন।...
এক অঙ্গুলি উৎসেধ অর্থাৎ বেধ পরিমাণে শুভ্রবর্ণদ্বারা সীমারেখা সকল চিত্রিত করিয়া পীতবর্ণদ্বারা কর্ণিকা, রক্তবর্ণ গুণ্ডিকাদ্বারা কেশর ও শুক্লবর্ণদ্বারা পত্রসকল রঞ্জিত করিয়া শ্যামবর্ণে সমস্ত সন্ধিস্থানে চিত্রিত করিবে। প্রকারান্তরে যথা- কর্ণিকা পীতবর্ণ, কেশরসকল পীত রক্তবর্ণ, পত্রসকল রক্তবর্ণ, সন্ধি কৃষ্ণবর্ণ, পীঠগর্ভ শুক্লবর্ণ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ, পীঠপাদ রক্তবর্ণ ও পীঠগাত্র শুক্লবর্ণ করিয়া বীথিচতুষ্টয়ে পত্র ও পুষ্প সহিত কল্পলতা সর্ববর্ণদ্বারা বিচিত্রিত করিবে। এই কল্পলতিকা দর্শনমনোহর করিবে। দ্বারসকল শুক্লবর্ণ, শোভা রক্তবর্ণ, উপশোভা পীতবর্ণ ও কোণ চতুষ্টয় কৃষ্ণবর্ণ করিবে। মণ্ডলের বহির্দেশে শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ তিনটি রেখা চিত্রিত করিবে। এই প্রকারে সাধারণ সর্বতোভদ্রমন্ডল নির্মাণ করিতে হইবে।

এতোখানি জ্যামিতিক নিষ্ঠা নিয়ে, শোভা এবং উপশোভায় বিভূষিত করে, এই যে সর্বতোভদ্রমণ্ডলটি আঁকবার নির্দেশ পাওয়া গেলো, এর মূল কথা কী? তন্ত্রবেত্তারা জানেন, এর মূল কথা হলো অষ্টদলপদ্ম ও বীথিকা :

ষটত্রিংশতা পদৈর্মধ্যে লিখেৎ পদ্মং সুলক্ষণম্ ।
বহিঃপঙক্ত্যা ভবেৎ পীঠং পংক্তিযুগ্মেন বীথিকা।।
(অর্থাৎ : তন্মধ্যে ৩৬টি ঘর লইয়া সুলক্ষণ পদ্ম অঙ্কিত করিবে। ৩৬টি ঘরের বাহিরের এক পংক্তিতে পীঠ, তাহার পরের দুই পংক্তিতে বীথিকা হইবে।)

সুলক্ষণ পদ্ম এবং বীথিকা; ওই বীথিকার নাম কল্পলতিকা :

আলিখেৎ কল্পলতিকাং দল-পুষ্প-সমন্বিতাম্ ।
(অর্থাৎ : পত্র ও পুষ্প সহিত কল্পলতা সর্ববর্ণদ্বারা বিচিত্রিত করিবে।)

প্রথমে মনে রাখা দরকার, তন্ত্রে এই পদ্ম এবং বীথিকার গুরুত্ব কতোখানি। কেননা, শুধুমাত্র সর্বতোভদ্রমণ্ডল নয়, প্রায় সমস্ত তান্ত্রিক যন্ত্রেরই মূল বিষয়বস্তু বলতে এই পদ্ম এবং বীথিকাই। তান্ত্রিক যন্ত্রের ছবিগুলিকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে খুঁটিনাটির তারতম্য থাকলেও অষ্টদলপদ্ম এবং বীথিকাই সমস্ত চিত্রের মূল বিষয়বস্তু।

তান্ত্রিক যন্ত্রের কেন্দ্রে ত্রিকোণের সাহায্যে নারী-জননাঙ্গ বোঝবার দৃষ্টান্ত। ত্রিকোণের চিত্র ছাড়াও অষ্টদল-পদ্ম রয়েছে। তার তাৎপর্যও একই।
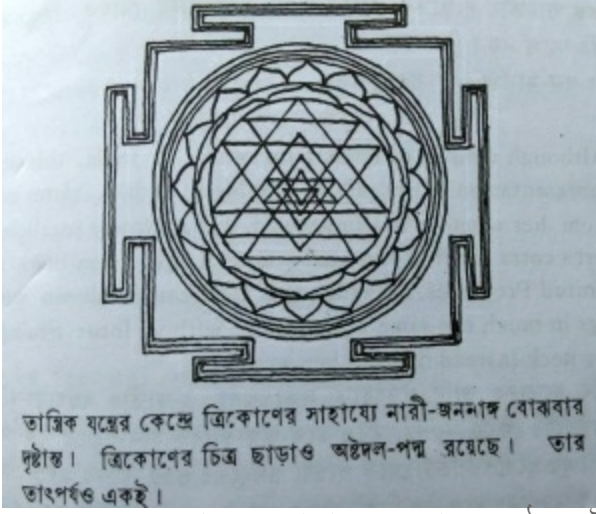
অতএব, যন্ত্র-প্রসঙ্গে প্রধানতম প্রশ্ন ওঠে, ওই পদ্ম বা অষ্টদলপদ্মের প্রকৃত তাৎপর্য কী ? বাংলার পূজাপদ্ধতি এবং তন্ত্রের যন্ত্র-সংকেতের সঙ্গে সামান্যমাত্র পরিচয় যাঁর আছে তিনিই জানেন, তন্ত্রে পদ্ম বা অষ্টদলপদ্ম নারী-জননাঙ্গের প্রতীক মাত্র। অনেক সময় তান্ত্রিক রচনায় পদ্ম শব্দটিকে একেবারে সোজাসুজি সেই অর্থেই গ্রহণ করা হয়। যথা :

'পদ্মমধ্যে গতে শুক্রে সন্ততিস্তেন জায়তে।।' (বিশ্বকোষ-৭/৫৪১)
(অর্থাৎ, পদ্মমধ্যে শুক্রের মিলনে সন্ততির জন্ম)

তন্ত্রে 'পদ্ম'-শব্দের এই জাতীয় ব্যবহার একটুও দুর্লভ নয়। বৌদ্ধতন্ত্র প্রসঙ্গে আধুনিক বিশেষজ্ঞ বলছেন (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৪০৯)-

'Vajra' (with the variant `mani') is a decent or mystic phrase for `linga', the male organ, just as `padma', lotus, is the literary rendering of `bhaga' or `yoni'."
অর্থাৎ : বজ্র (বা মণি) শব্দ পুরুষ-অঙ্গবাচক, যেমন পদ্ম শব্দ হলো ভগ বা নারী-জননাঙ্গের সাহিত্যিক প্রতিশব্দ।

তাহলে পদ্মের অর্থ নারীজননাঙ্গই। এই পদ্মই হলো সর্বতোভদ্রমন্ডলের– তথা সমস্ত তান্ত্রিক যন্ত্রের– মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু সেই সঙ্গেই লক্ষ্য করা দরকার, তান্ত্রিক যন্ত্রগুলিতে শুধুমাত্র পদ্মের চিত্র নয়; পদ্মকে ঘিরে রয়েছে বীথিকা। নারী-জননাঙ্গের সঙ্গে বীথিকার সম্পর্ক কী? তান্ত্রিক যন্ত্র প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি স্বভাবতই সবচেয়ে মৌলিক। যুক্তি অনুসারে, এর মূলে আছে এক আদিম বিশ্বাস : যে-বিশ্বাস থেকে দেবীর নাম হয়েছিলো শাকম্ভরী, কিংবা, যে-বিশ্বাসের মূর্ত পরিচয় হরপ্পার ওই অত্যাশ্চর্য সীলটিতে টিকে আছে। এবং, এইভাবে প্রাকৃতিক উর্বরতার সঙ্গে মানবীর উর্বরতার সংযোগ কল্পনা করা হয়েছে বলেই তন্ত্রে নারী-জননাঙ্গকে উদ্ভিদ-বাচক নাম (লতা) দেওয়া সম্ভব হয়েছিলো।

নিত্যা যন্ত্রম্

এই আদিম বিশ্বাসটির দিক থেকে শক্তি-সাধনার তান্ত্রিক ধ্যানধারণাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তন্ত্রমতে নারী-জননাঙ্গের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। যেমন-

'স্ত্রীভগং পূজনাধারঃ'
অর্থাৎ, 'স্ত্রীভগ বা নারীযোনি হচ্ছে সকল উপাসনার আধার বা উৎস'।

এজাতীয় কথা তন্ত্রে বহুবার পাওয়া যায়। তন্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ সাধনার নামই হলো 'ভগযাগ'। এছাড়া তন্ত্র সাহিত্যে 'লতা' শব্দের প্রচুর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কেননা, তন্ত্র-সাহিত্যে 'লতা' শব্দের একটি পারিভাষিক অর্থ আছে। সে-অর্থ হলো, নারী-জননাঙ্গ। তন্ত্র-সাধনায় অন্যান্য গুহ্য সাধনার মতো আরেকটি গুহ্য ও কঠিন সাধনার নাম লতা-সাধনা। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে-
'বরং ফণী ধরিয়া বিষভক্ষণ করা সহজ, বরং সিংহশার্দূলের সহিত যুদ্ধ করা সহজ, কিন্তু লতা-সাধনা অতি কঠিন, অতি কঠোর।' (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী-২/২৫১)

এরকম গুহ্য ও কঠিন লতা-সাধনার মূল কথাটা কী? দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'লোকায়ত দর্শন' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৩৯৯) উদ্ধৃতি টেনেছেন এভাবে-
'এই সাধনার প্রধান অধিকরণ স্ত্রী, এইজন্য ইহাকে লতাসাধনা কহে। এই সাধনার বিষয় তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে...

লতায়াঃ সাধনং বক্ষ্যে শৃণুস্ব হরবল্লভে।
শতং কেশে শতং ভালে শতং সিন্দুরমন্ডলে।।
স্তনদ্বয়ে শতদ্বন্দ্বং শতং নাভৌ মহেশ্বরি।
শতং যোনৌ মহেশানি উত্থায় চ শতত্রয়ম্ ।।
এবং দশশতং জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধিশ্বরো ভবেৎ।
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি সাধনং ভুবি দুর্লভম্ ।।

রজোহবস্থাং সমানীয় তদ্ যোনৌ স্বেষ্টদেবতাম্ ।
পূজয়িত্বা মহারাত্রৌ ত্রিদিনং পূজয়েন্মনুম্ ।।
ইত্যাদি, ইত্যাদি।
[ভাবার্থ : বিশ্বকোষ, ১৭ খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

বলাই বাহুল্য, আমাদের আধুনিক রুচি ও নীতিবোধের কাছে এ জাতীয় চিন্তাধারা বীভৎস কামবিকারের পরিচায়কমাত্র বলেই দেবীপ্রসাদ বাংলা তর্জমাটুকু এখানে উদ্ধৃত না করে কেবল সূত্র উল্লেখ করেছেন। সে যাই হোক, আমাদের আধুনিক যুগের পটভূমিতে এই তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতিকে যতো বীভৎস বিকৃতি বলে প্রতীয়মান হোক না কেন, সমাজবিকাশের যে-পর্যায়ে এগুলির উদ্ভব হয়েছিলো একমাত্র তারই পটভূমিতে এগুলির আদি-তাৎপর্য অনুসন্ধান করা যাবে।

আমাদের আলোচ্য দুর্গাপূজার প্রধানতম অঙ্গ যে যন্ত্র ও ঘট, তান্ত্রিক প্রণালীতে যন্ত্রের তাৎপর্য দেখলাম সর্বতোভদ্রমণ্ডলের আলোচনায়। এরপর সর্বতোভদ্রমণ্ডলের উপর ঘট প্রতিষ্ঠা করা হবে। এক্ষেত্রে ‘ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি’তে ঘট স্থাপন প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে-
‘অনন্তর সর্বতোভদ্রমণ্ডলোপরি ঘট স্থাপন করিবে। যথা,–শুদ্ধ মৃত্তিকায় পঞ্চশস্য নিক্ষেপ করিবে, তদুপরি ধৌত সুলক্ষণ ঘট, তাহাতে দধ্যক্ষত (দধি মাখানো আতপ চাউল) দিয়া শুদ্ধ জলপূর্ণ করিয়া স্থাপন করিবে। তাহার কণ্ঠে আচারৎ লাল সুতা ও আলতা দেওয়া হয়। মধ্যে পঞ্চপল্লব (আম্র, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, যজ্ঞীয়ডুম্বুর শাখা), অলভে কেবল আম্রপল্লব দিবে। তদভাবে দুইটি পানও দিবার ব্যবস্থা আছে। এক সরা চাউলে একটি হরিতকী কিংবা সুপারী দিয়া তদুপরি স্থাপন করিবে। তদুপরি একটি নির্দোষ সশীর্ষ ফল (নারিকেল অথবা কদলী) দিবে; ঐ ফলকে সিন্দুর রঞ্জিত করিবে। ঘটে একটি সিন্দুর পুত্তলিকা আঁকিবে, পুষ্পমাল্য দিয়া শোভিত করিবে...।’ (ক্রিয়াকান্ড-বারিধি-১/২৩৯)

দেবীপ্রসাদ বলেন, সর্বতোভদ্রমণ্ডলের অর্থ হলো নারী-জননাঙ্গ : সর্বতোভদ্রমণ্ডলের উপর ঘট, ঘটের গায়ে সিন্দুরপুত্তলিকা- মানবীয় প্রজননের প্রায় একটি পূর্ণাঙ্গ নকল তোলবার আয়োজন। এইভাবে মানবীয় প্রজননের নকল তুলে কোন্ কামনা সফল করবার কল্পনা করা হচ্ছে তার আভাস আমরা আগেই পেয়েছি : নারী-জননাঙ্গের তান্ত্রিক নাম লতা, তান্ত্রিক যন্ত্রে অষ্টদলপদ্মকে ঘিরে রয়েছে বীথিকা। অর্থাৎ, নারী অঙ্গের জননশক্তির স্পর্শে প্রকৃতিকে ফলপ্রসূ করবার কল্পনা। ঘট-স্থাপনার মধ্যে সেই চেষ্টাকেই আরো একটু এগিয়ে নিয়ে যাবার আয়োজন করা হলো। শুদ্ধ মৃত্তিকায় পঞ্চশস্য নিক্ষেপ করে ফসল ফলানোর মহড়া শুরু হলো। আর তারপর ঘটের উপরস্থ পল্লবকে স্পর্শ করে কামনা জানানো হবে :
‘ওঁ, অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ উজ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতের্নুত্বা নুত্বা চ সুয়তাং রয়িঃ।’ (ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি-১/২৪০)
অর্থাৎ : হে শক্তিমতি বৃক্ষ, (তুমি) বাঁচিয়া ওঠো ও ফলবতী হও। বনস্পতির পাতাকে সেবা

করিয়া ধন প্রসব করো।

অনেক সময় ঘটের উপরের ডাবটির গায়েই সিন্দুরপুত্তলি এঁকে দিয়ে মানবীয় ফলপ্রসূতার সঙ্গে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার সাদৃশ্যে বিশ্বাসকে আরো স্পষ্ট ও অভ্রান্ত করবার আয়োজন দেখা যায়। ওই যন্ত্র আর ঘটই হলো দুর্গাপূজার প্রধানতম অঙ্গ। তার মানে, কৃষি-আবিষ্কার পর্যায়ের এক আদিম বিশ্বাসই এ-পূজার প্রাণবস্তু। একটু গভীরভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, আদিপর্বে দুর্গাপূজা আসলে পূজাই ছিলো না। পূজার বদলে ছিলো জাদুঅনুষ্ঠান। জাদুঅনুষ্ঠানের মূল কথাটা হলো একটা কামনা সফল করবার চেষ্টাই। কিন্তু তা প্রার্থনা-উপাসনার সাহায্যে ঈশ্বরের করুণা উদ্রেক করে নয়। তার বদলে, কামনা সফল হওয়ার একটা নকল তুলে ওই নকলের সাহায্যেই বাস্তবভাবে কামনাটিকে সফল করবার কল্পনা। অষ্টদলপদ্মের ছবি এঁকে সিন্দুরপুত্তলীর ছবি এঁকে, মানবীয় ফলপ্রসূতার নকল তোলা হলো আর কল্পনা করা হলো প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার কামনাও এইভাবেই সফল হবে।

বলাই বাহুল্য, আমাদের আধুনিক চেতনার দিক থেকে এ-বিশ্বাস একেবারে অর্থহীন। নারী-জননাঙ্গের সঙ্গে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার সম্পর্ক কোথায়? কিন্তু আধুনিক চেতনার মাপকাঠিতে তন্ত্রকে বোঝা যাবে না। তার বদলে এই তান্ত্রিক বিশ্বাসটিকে ঠিকভাবে বুঝতে হলে পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের আচর-অনুষ্ঠানকে- বা পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের আচার-অনুষ্ঠানের স্মারকগুলিকে- বিচার করতে হবে। কিভাবে? দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তর্জমায় অধ্যাপক জর্জ টমসন-এর উদ্ধৃতি-

'উত্তর আমেরিকায় ফসলে পোকা ধরলে ঋতুমতী মেয়েরা রাত্রে নগ্ন হয়ে ক্ষেতের উপর হাঁটে। ইয়োরোপের চাষীদের মধ্যে এ-প্রথা আজো টিকে আছে। খারাপ পোকার প্রতিষেধ হিসেবে প্লিনি ব্যবস্থা দিয়েছেন, ঋতুমতী মেয়েরা খালিপায়ে এলোচুলে কোমরের ওপর পর্যন্ত কাপড় তুলে ক্ষেতের উপর হাঁটবে। কলিউমেল্লার মতে ডিমোক্রাইটসেরও সেই বিধান : তিনি বলেছেন, মেয়েরা খালিপায়ে আর এলোচুলে তিনবার দৌড়ে ক্ষেত প্রদক্ষিণ করবে। ধারণাটা স্পষ্ট এই যে, এ-অবস্থায় নারীদেহে যে-উর্বরাশক্তির আবির্ভাব হয় তাই এ-ভাবে ক্ষেতের মধ্যে সঞ্চারিত করা হবে। অন্যত্র দেখা যায়, ওই শক্তিকে নারীত্বের সহজাত শক্তি হিসেবেই মনে করা হচ্ছে। জুলুদের মধ্যে প্রথা হলো, ক্ষেতে ঘোরবার সময় মেয়েরা নগ্ন হবে, কিন্তু তখন ঋতুমতী যে হতেই হবে তা নয়। মেয়েদের জননাঙ্গ প্রদর্শন-মূলক অনুষ্ঠানাদিরও একই উৎস- এই অনুষ্ঠান গ্রীসে বিশেষ করে ডিমিটর-দেবীর সঙ্গে সংযুক্ত। নানান গ্রীক পূজাপদ্ধতিতে ব্যবস্থা দেখা যায়, পূজারিণীরা খালিপায়ে আর এলোচুলে সার বেঁধে হাঁটবে- ওই পূজাপদ্ধতিগুলিও একই জাতীয় ধারণা থেকে এসেছে।' (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৪১২)

নারী জননাঙ্গকেই মানুষ এককালে উৎপাদন-শক্তির আধার মনে করেছে আর তাই প্রাকৃতিক উৎপাদনে সংকট দেখা গেলে মেয়েরা নগ্নতার সাহায্যে সে-সংকট দূর করতে

চেয়েছে।
এ প্রসঙ্গেই স্মর্তব্য যে আধুনিক বিদ্বানদের অনেকেই দাবি করেছেন, সিন্ধু-সভ্যতার প্রচলিত নানা চিত্রলিপি এবং অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে পরবর্তীকালে তন্ত্র সাধনায় ব্যবহৃত নানা চিত্রাবলীর সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া যায়।
যেমন, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রত্ন-তত্ত্ব খননে এমন কিছু মাতৃমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে যে মাতৃমূর্তিগুলির রচনায় যোনি বা নারী-জননাঙ্গের উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপণ করার চেষ্টা খুবই স্পষ্ট। তাছাড়া মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তুপ থেকে পোড়ামাটির যোনি-মূর্তিও এর জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। এই যোনি ক্রমশই জামিতিক ত্রিকোণের আকার ধারণ করেছে। কেননা তন্ত্র-সাধনায় যন্ত্র হিসেবে প্রচলিত চিত্রগুলির সঙ্গে এই মূর্তির নিম্ন-ভাগের সাদৃশ্যের আভাস পাওয়া যায় বলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের অভিমত। তন্ত্রে যেগুলিকে যন্ত্র বলা হয় সেগুলি আর কিছুই নয়, ওই নারী-জননাঙ্গের প্রতীক-চিহ্নমাত্র।

আদিম মাতৃপ্রধান বা শক্তি-প্রধান চিন্তাধারা ক্রমশ কী করে নারী-জননাঙ্গ-কেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এ-পর্যায়ে তার ব্যাখ্যা কী হতে পারে?-
'প্রাচীন মাতৃমূর্তির পরিকল্পনায় যদি জননাঙ্গকেই ক্রমশ নারীদেহের প্রধানতম অবয়ব বলে গ্রহণ করবার চেষ্টা দেখা যায় তাহলে স্বভাবতই কৃষিভিত্তিক প্রচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তুপের মধ্যে নারীদেহের অন্যান্য অবয়ব বাদ দিয়ে শুধুমাত্র যোনি বা নারী-জননাঙ্গের মূর্তি খুঁজে পাওয়া বিস্ময়ের ব্যাপার হবে না।...
মহেঞ্জোদারোর মানুষেরা এ-জাতীয় যোনি-মূর্তি রচনা করেছিলেন কেন? এর পিছনে নিশ্চয়ই প্রজননের কামনা ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র প্রজননের কামনাই নয়। তার সঙ্গে জড়িত ছিলো ধনোৎপাদনের কামনাও- কৃষিকাজের সাফল্য-কামনাও। কেননা এই যোনি-মূর্তি মানব-বিশ্বাসের এমন এক স্তরের সাক্ষ্য বহন করছে, যেখানে শুধুমাত্র সন্তান-উৎপাদনই নয়– প্রাকৃতিক উৎপাদনও– নারী-জননাঙ্গের উপর নির্ভরশীল।'- (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৩৯৫)

ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসটির স্মারক সিন্ধু-সভ্যতার মধ্যেই পরিসমাপ্ত নয়, বরং উত্তরকালের তন্ত্র-সাধনার মধ্যেই তার অবিচ্ছেদ্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

উর্বরতা-কেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস :
প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে রক্তবর্ণ উর্বরতার প্রতীক। হয়তো আরো অনেক কিছুই প্রাচীন জাদুবিশ্বাসে উর্বরতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু রক্তরঙের প্রতীকটিকে প্রাচীন মানবগোষ্ঠির বিভিন্ন জাতি ও সমাজে তাৎপর্যময়রূপে উর্বরাশক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় বলে নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন। কোথাও ডালিম প্রতীকে, কোথাও সিঁদুর প্রতীকে, কোথাও বা অন্যকিছু। এই ডালিম-ফলের তাৎপর্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক জর্জ টমসনের বক্তব্যটি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লোকায়ত দর্শন গ্রন্থে পাওয়া যায়-

‘প্রাচীন পরিব্রাজক পৌসানিয়াস-এর কাছ থেকে প্রাচীন গ্রীক সমাজ সংক্রান্ত নানা খবর পাওয়া যায়। কিন্তু ডালিম-ফলের রহস্য উদ্ঘাটন করতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত : ‘ডালিমের কথা আমি বিশেষ কিছু বলবো না, কেননা তার রহস্য অত্যন্ত গোপন।’ অধ্যাপক জর্জ টমসন প্রশ্ন তুলছেন, গোপন রহস্যটা কী রকম?
ডালিম-ফলের ভিতরটা টুকটুকে লাল। ডালিমের দানা থেকেই গ্রীক ভাষায় রক্তবর্ণসূচক শব্দটি এসেছে। ডালিম তাই রক্তের প্রতীক। এ-কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু রক্তের তাৎপর্য এখানে ঠিক কী?- এ-প্রশ্নের সমাধান ঠিকমতো করা হয়নি। কেউ কেউ মনে করেন, খুন বা অপঘাত-মৃত্যুর সঙ্গেই এ-রক্তের সম্পর্ক। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে টাইটানরা ডাইওনিসাসকে হত্যা করলে পর তাঁরই রক্ত থেকে ডালিম গাছের জন্ম হয়। এ-ছাড়াও মৃত্যু ও অপঘাতের সঙ্গে ডালিম-এর সম্পর্ক আরো কোনো কোনো দিক থেকে পাওয়া যায়। প্রাচীনদের বিশ্বাস অনুসারে ডালিমের স্বপ্ন অপঘাতের সূচনা করে। কিন্তু অধ্যাপক জর্জ টমসন দেখাচ্ছেন, রক্ত ও রক্তবর্ণের প্রতীক ডালিমের এই অনুষঙ্গগুলি মুখ্য নয়,- গৌণ। অর্থাৎ এগুলির পিছনে একটি মুখ্য তাৎপর্য আছে- সেই তাৎপর্যেরই আলোচনা তুলতে পৌসানিয়াসের সংকোচ হয়েছে।
ডালিম হলো রক্তের প্রতীক। কিন্তু কোন ধরনের রক্ত? প্রাচীন গ্রীক বৈদ্যশাস্ত্র থেকে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। গ্রীক বৈদ্যরা ঋতু ও গর্ভ ব্যাপারেই ডালিম ব্যবহার করবার নির্দেশ দিয়েছেন। এই কারণেই, কোনো কোনো গুহ্য-সম্প্রদায়ের কাছে ডালিম ছিলো ‘টাবু’ : ঋতু-রজকে প্রাচীন কালের মানুষেরা ‘টাবু’ মনে করতেন। থেসমোফোরিয়া-উৎসবের সময় মেয়েদের পক্ষে শুধুই যে মৈথুন নিষিদ্ধ ছিলো তাই নয়; সেই সঙ্গে ডালিমও ছিলো নিষিদ্ধ। আর সেই সঙ্গে নির্দেশ ছিলো, তাদের শ্বেত-শয্যায় শুতে হবে, কেননা এই শ্বেত-শয্যার দরুন তাদের কামভাব সংহত থাকবে এবং তাছাড়াও শয্যার কাছে সাপ আসতে পারবে না। (প্রাচীনদের কল্পনা অনুসারে সাপের সঙ্গেও মেয়েদের যৌন-জীবনের যোগাযোগ আছে।)
অধ্যাপক জর্জ টমসন তাই সিদ্ধান্ত করছেন, শ্বেত-শয্যা যদি মেয়েদের রতিবাসনার প্রতিষেধক বলে বিবেচিত হয় তাহলে সেইসঙ্গেই ডালিম-পরিহারের নির্দেশ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এই ডালিম রতিবাসনার উদ্দীপক বলেই বিবেচিত হয়েছিলো। আর তাই, ডালিম যে-রক্তের প্রতীক সে-রক্তের আদি-তাৎপর্য আঘাত-জাত রক্ত নয়; নারীর যৌন-জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত রক্ত- ঋতু-রজ। প্রাচীনদের কল্পনা অনুসারে, নারীর উৎপাদিকা-শক্তির মূলে রয়েছে এই ঋতুরজই। এবং এই ঋতুরজের সঙ্গে সাদৃশ্যের দিক থেকেই

ডালিম তাদের কাছে উর্বরতার প্রতীক। পৌসানিয়াস যে কেন ডালিমের রহস্য ব্যাখ্যা করতে সংকোচ বোধ করেছিলেন তা বুঝতে পারাও তাই কঠিন নয়।'- (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৩৩৪-৫)

কৃষিকাজ যেহেতু মেয়েদের আবিষ্কার, কৃষিকেন্দ্রিক প্রাচীন অনুষ্ঠান তাই নারীজীবনের নানারকম গোপন ও গভীর রহস্যের সঙ্গে জড়িত। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে রক্ত বর্ণের সঙ্গে নানাদিক থেকে গণেশের নানারকম সম্পর্ক রয়েছে। সিঁদুরের নাম গণেশ-ভূষণ। এই ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে অশোভন ও অসংলগ্ন বলে মনে হয়। কেননা এই সিঁদুর সধবাদেরই সিঁথির ভূষণ। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই সিঁদুরের তাৎপর্যটা কী? এই প্রশ্নের উত্তরেও অধ্যাপক জর্জ টমসন বহু তথ্য পর্যালোচনা করে যে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির নানা মৌলিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করে। তাই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তর্জমায় অধ্যাপক টমসনের সুদীর্ঘ উদ্ধতিটি উপস্থাপন করা যেতে পারে-

'মানুষের সন্তান-উৎপাদন সংক্রান্ত জাদুবিশ্বাস, ফলাফলের বদলে ফলপ্রসূ পদ্ধতিটির সঙ্গে– সন্তানের বদলে ঋতু ও লোকিয়া-স্রাবের সঙ্গে– সংযুক্ত। ফলে ঋতু ও লোকিয়া সমস্ত স্রাবকেই কল্পনা করা হয় নারীর মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রাণদায়িনী শক্তির বিকাশ হিসেবে। আদিম ধ্যানধারণা অনুসারে ঋতুস্রাব সন্তানের জন্মাদানের সমতুল্য পদ্ধতি বলেই বিবেচিত। এই জাদুবিশ্বাসের মধ্যে আত্মবিরোধ আছে : রক্তের ওই শক্তিই আবার তাকে ভয়াবহ করে তোলে। একদিক থেকে ঋতুমতী নারী এতো পবিত্র যে, তাকে স্পর্শ করা চলে না। অপর দিক থেকে সে কলুষিত, অস্পৃশ্য। তার অবস্থা হলো, রোমানরা যাকে বলতো 'sacra'- পবিত্র আর ঘৃণিত দুই-ই। ফলে পুরুষপ্রধান সমাজে ধর্মাচরণের উপর মেয়েদের অধিকার লুপ্ত হবার পর এই জাদুবিশ্বাসের নেতিমূলক দিকটিরই জন্ম হয় : ঋতুমতী নারী শুধুমাত্র কলুষিত বলেই বিবেচিত হয়।
এই ধারণাগুলি সার্বভৌম। ঋতুমতী ও প্রসবিনীদের প্রতি মনোভাব-সংক্রান্ত ধারণায় সবদেশের সবমানুষের মধ্যে যতোখানি মিল আছে আর কোনো বিষয়ে তা নেই। ব্রিফল্ট এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং মানবজাতির সমস্ত শাখা ও মানব সংস্কৃতির সমস্ত পর্যায় থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছেন...
এ্যারিস্টটল, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিজ্ঞানীদের ধারণায়, ঋতুস্রাব বন্ধ হবার পর গর্ভের মধ্যে ওই ঋতুরজ জমেই সন্তানের দেহগঠন করে। এই রক্তই হলো প্রাণদায়িনী রক্ত। তাই, কোনো মানুষ বা কোনো বস্তুর উপর 'টাবু' ধার্য করবার সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হলো, তার উপর রক্ত-চিহ্ন বা রক্ত-বর্ণ চিহ্ন দেওয়া- ঋতুস্রাব বা লোকিয়া-স্রাব বা তারই কোনো অনুকরণ থেকে এই ব্যবস্থার উৎপত্তি। টাবুটির অন্তর্নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্ব অনুসারেই এই রক্তচিহ্নের দু'রকম তাৎপর্য : চিহ্নিত বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক-নিষেধ এবং প্রাণশক্তির সঞ্চার। সারা পৃথিবীতেই দেখা যায়, ঋতুমতীর অঙ্গে লালমাটির প্রলেপ লাগাবার ব্যবস্থা আছে- তার দরুন পুরুষদের দূরে রাখা ও উর্বরা-শক্তির বৃদ্ধি দুটো কাজই হবে। অনেক জায়গায় বিবাহানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে স্ত্রীর কপালে রক্ত-বর্ণ চিহ্ন দেবার ব্যবস্থা আছে- এ-চিহ্নের অর্থ,

স্বামী ছাড়া অন্যান্য সমস্ত পুরুষের কাছেই মেয়েটি নিষিদ্ধ হলো এবং স্বামীর কাছে সে সন্তানদানের জন্য প্রতিশ্রুত হলো। অঙ্গরাগের উৎস এই থেকেই।
বাণ্টুদের একটি জাতির মধ্যে দেখা যায়, প্রতিটি মেয়েই একটি করে লালমাটির পাত্র রাখে; পাত্রগুলি মেয়েদের কাছে পবিত্র, অনুষ্ঠানের সময় এর থেকেই তারা মুখ ও অঙ্গ রঞ্জিত করে। নানা রকম অনুষ্ঠানেই তাদের কাছে এই পাত্রগুলির প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানগুলি উল্লেখযোগ্য : আঁতুড়ঘরের পর্ব শেষ হবার সময় প্রসূতা ও সন্তান উভয়কেই এই লালরঙে রঞ্জিত করা হয়- এরই দরুন সন্তানটি বেঁচে থাকবে এবং মা ফিরে আসবে জীবিতদের মধ্যে। 'দীক্ষা'র (initiation) সময় মেয়েটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা হয় : এইভাবেই মেয়েটি যেন নতুন জন্ম পেলো এবং এবার থেকে সে ফলবতী হবে। অশৌচাবস্থা শেষ হবার পর বিধবারা অগ্নি স্পর্শ করে এবং তাদের লাল রঙে রঞ্জিত করা হয় : এইভাবেই সে মৃত্যুর ছোঁয়াচ থেকে ফিরে আসে।
রক্তবর্ণ হলো নবজীবন। তারজন্যেই দেখা যায়, প্রাচীন প্রস্তর যুগের উচ্চাবস্থার এবং নব্যপ্রস্তর যুগের কবরখানা থেকে পাওয়া হাড়গুলিতে লাল রঙ মাখানো রয়েছে। প্রতীকটির অর্থ আরো স্পষ্ট হয় যখন দেখি,-এবং প্রায়ই তা দেখতে পাওয়া যায়,- কঙ্কালগুলি গুটোনো ভ্রূণাবস্থার ভঙ্গিতে রয়েছে। মৃতের নবজন্ম সুনিশ্চিত করবার আশায় আদিম মানুষেরা এইভাবে তাকে গর্ভস্থ শিশুর মতো কুঁকড়ে এবং জীবনের রঙে রঞ্জিত করে রাখবার চেয়ে বেশি আর কীই বা করতে পারতো?'- (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৩৩৮-৯)

টমসনের রচনা থেকে বিশেষ মূল্যবান এই উদ্ধৃতিটুকু আমাদের দেশের নানান রকম আচার-অনুষ্ঠান এবং ধ্যানধারণাকে এইদিক থেকে বোঝবার সুযোগ করে দেয়। আমাদের দেশের সধবারা সিঁথিতে সিঁদুর দেয় এবং সধবাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সিঁদুরের ব্যবহার ভূয়ঃপ্রচলিত। এর পিছনে সেই আদিম বিশ্বাসই লুকোনো আছে- ওই রক্তবর্ণ ঋতুরজের, অতএব নবজন্মের প্রতীক। ফলে এরই স্পর্শে সধবারা সন্তানবতী হবার কামনাকে সফল করতে চায়। রক্ত ও রক্তবর্ণের এই প্রতীক-তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই আদিম বিশ্বাসের দিক থেকেই সিন্ধু-সভ্যতার মাতৃমূর্তিকা প্রভৃতির ব্যাখ্যা অন্বেষন করেছেন-
'হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর মাতৃ-মূর্তিকাগুলি যে ওই বসুমাতা হিসেবেই পরিকল্পিত হয়েছিল- মার্শাল সর্ব-প্রথম এ-অনুমান করেছিলেন। এবং তাঁর মতে অন্যান্য দেশের বসুমাতার মতোই সিন্ধু-সভ্যতার এই বসুমাতাও প্রকৃতির উর্বরতাদায়িনী বলেই কল্পিত। এই যুক্তি অনুসরণ করেই ম্যাকে মন্তব্য করেছেন, বসুমাতার মূর্তিকা বলেই এগুলি গড়বার উপাদান মৃত্তিকা বা পৃথিবী।'
'বসুমাতার মূর্তিকা বলেই এগুলির মূলে সিন্ধু-সভ্যতার ওই বসুমাতার সম্পর্ক চোখে পড়ে। ম্যাকে এ-বিষয়ে নানা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। যেমন মূর্তিকাগুলির সঙ্গে রক্তবর্ণের সম্পর্ক- আদিম বিশ্বাস অনুসারে ওই রক্তবর্ণ উর্বরতার প্রতীক। দক্ষিণ-বেলুচিস্থানে আবিষ্কৃত দেবী-

মূর্তিকার অঙ্গে যে কড়ির ভূষণ তারও ব্যাখ্যা একই হওয়া সম্ভব। ম্যাকে বলছেন, মাতৃ-মূর্তিকার অঙ্গে এ জাতীয় কড়ির অলংকারই স্বাভাবিক, কেননা সুপ্রাচীন কাল থেকেই কড়ি উর্বরতার অনুকুল জাদুশক্তি-বিশিষ্ট কল্পিত; মহেঞ্জোদারোর মূর্তিকার অঙ্গেও হয়তো এ-জাতীয় কড়ির অলংকার ছিল, কিন্তু এতদিন মাটিচাপা পড়ে থাকার দরুন আমাদের পক্ষে অলংকারের কড়ি সনাক্ত করা কঠিন।'- (দেবীপ্রসাদ/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৭২)

এ প্রেক্ষিতে মনে হয় উল্লেখ করা বাহুল্য হবে না যে, এখনও হিন্দু সংস্কৃতির সাধারণ জনগোষ্ঠিতে শঙ্খ বা শাঁখার ব্যবহার সধবা নারীদের জন্য অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া প্রচলিত বিবাহ-অনুষ্ঠানের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাচার হিসেবে নববিবাহিত দম্পতির মধ্যে পাশা-খেলার নামে কড়ি-খেলার যে আকর্ষণীয় প্রচলন পরিলক্ষিত হয়, তা যে আদতে নবদম্পতির মধ্যে প্রজনন-উর্বরতা কামনার সেই আদিম-বিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠানে কড়ির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আর ভারতীয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম হিসেবে আধুনিকতম মুদ্রার প্রচলনও কিন্তু শুরু হয়েছিলো কড়ির ব্যবহারের মাধ্যমেই। এর সাথে সুপ্রাচীন সিন্ধু-সংস্কৃতির কোন যোগসূত্র আছে কিনা তা ভাববার বিষয় বৈকি। আর সিঁদুর মানেই তো সধবার প্রতীক, যার কাছে ফলনশীল উর্বরতা কামনা করা হচ্ছে।

অতএব, দেবীপ্রধান সিন্ধু-ধর্মে উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাসের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে দেবী বলতে শাকম্ভরী বা বসুমাতা যে সন্তানদায়িনী জননীর অনুরূপ শস্যদায়িনী পৃথিবী অর্থাৎ, প্রাকৃতিক উর্বরতার কামনাই ওই বসুমাতা-কল্পনার প্রধান উপাদান, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই দ্বিমতের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কাদের ধ্যানধারণায় এ-জাতীয় বিশ্বাস গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে? হয়তো এর একটি উত্তরই সম্ভব, প্রাকৃতিক উর্বরতার উপরই যাদের জীবন নির্ভরশীল, পৃথিবীর ফলপ্রসূতাই যাদের সমৃদ্ধির চরম উৎস, অর্থাৎ এক কথায়, যারা কৃষিজীবী। যেহেতু কৃষি-উৎপাদনই ছিলো সিন্ধু-সভ্যতার চরম অর্থনৈতিক ভিত্তি, তাই এ-সভ্যতায় শস্যদায়িনী পৃথিবীর তথা বসুমাতার বা শাকম্ভরীর উপাসনা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

মূলত এই জাদুবিশ্বাসগুলি হচ্ছে প্রাচীন কৃষিজীবী মানুষের ঐকান্তিক উর্বরতা ও ফল কামনারই বহিঃপ্রকাশ। এবং তার ফলে কৃষিকেন্দ্রিক লোকায়ত অনুষ্ঠানে বীজের বদলে উৎপাদন-ক্ষেত্রেরই প্রাধান্য। এই ক্ষেত্রপ্রাধান্য মূলত মাতৃ-প্রাধান্যেরই পরিচায়ক। এখানে বীজ অপ্রধান। আমাদের দেশে এককালে পিতৃপ্রাধান্য ও মাতৃপ্রাধান্য অর্থে বীজপ্রধান ও ক্ষেত্রপ্রধান শব্দ ব্যবহৃত হতো বলে জানা যায়। যদিও পিতৃপ্রধান আর্যসভ্যতায় বীজের প্রাধান্য ঘোষণা করতে গিয়ে 'মনুসংহিতা'য় বলা হয়েছে-

'ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্ ।
ক্ষেত্রবীজসমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্বদেহিনাম্'।। (মনুসংহিতা-৯/৩৩)

‘বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে।
সর্বভূতপ্রসূতির্হি বীজলক্ষণলক্ষিতা’।। (মনুসংহিতা-৯/৩৫)
‘যাদৃশং তূপ্যতে বীজং ক্ষেত্রে কালোপপাদিতে।
তাদৃগ্ রোহতি তত্তস্মিন্ বীজং স্বৈর্ব্যঞ্জিতং গুণৈঃ’।। (মনুসংহিতা-৯/৩৬)
অর্থাৎ :
নারী শস্যক্ষেতের মতো, আর পুরুষ শস্যের বীজস্বরূপ। এই ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগে সকল প্রাণীর উৎপত্তি (মনু-৯/৩৩)। বীজ এবং যোনি এই দুটির মধ্যে বীজই শ্রেষ্ঠ বলে কথিত হয়। কারণ, সর্বত্র সন্তান বীজের লক্ষণ যুক্ত হয়ে থাকে (মনু-৯/৩৫)। বপনের উপযুক্ত বর্ষাকাল প্রভৃতি সময়ে উত্তমরূপে কর্ষণ-সমীকরণ প্রভৃতি পদ্ধতির দ্বারা সংস্কৃত ক্ষেত্রে যেরকম বীজ বপন করা হয়, সেই প্রকার ক্ষেত্রে সেই বীজ বর্ণ-অবয়বসন্নিবেশ রস-বীর্য প্রভৃতি নিজগুণের দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে শস্যরূপে উৎপন্ন হয় (মনু-৯/৩৬)

কিন্তু পিতৃপ্রধান আর্য-আধিপত্যে চাপা পড়েও এতদঞ্চলের প্রাচীন মাতৃপ্রধান কৃষিজীবী মানুষের কামনাগুলি এখনো যে সেই প্রাচীন জাদুবিশ্বাসের রেশ নিয়ে এখনো সমাজের লোকায়তিক ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার প্রমাণ বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠান। যার মধ্যে পুরুষ-প্রধান আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব খুব একটা চোখেই পড়ে না। সেখানে কৃষিকেন্দ্রিক মাতৃপ্রাধান্যই স্বীকৃত। এরকম অন্যতম একটি অনুষ্ঠান হলো ‘গণেশচতুর্থী ব্রত’। এই ব্রতের কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যায় নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত ‘বিশ্বকোষ’-এ (৫/২০৬-৭)। তবে এর পূর্ণতর বিবরণ রয়েছে ১৯০৬ সালের ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারি পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বি. এস. গুপ্তের প্রবন্ধে। তার উপর ভিত্তি করে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘লোকায়ত দর্শন’ গ্রন্থে লিখেন-

‘ব্রতটি এখন প্রধানতই দক্ষিণাপথবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। বোম্বাই ও পুণা অঞ্চলে এই উপলক্ষ্যে বিশেষ ধুমধাম হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমাদের বাংলাদেশের সঙ্গে এই ব্রতের কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে কিছুটা নামান্তরের ও কিছুটা রূপান্তরের আড়ালে এই ব্রতই আমাদের অঞ্চলেও বর্তমান রয়েছে।...
ব্রতটি একদিনে উদ্যাপিত হয় না। সাতদিন ধরে একটানা এর অনুষ্ঠান চলে। কিন্তু মজা হলো, যদিও গণেশের নাম থেকেই ব্রতটির নামকরণ হয়েছে এবং যদিও ব্রত অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে থাকতেই গণেশকে নিয়ে বেশ কয়েকদিন অনেক রকম সমারোহ করা হয়, তবুও আসল অনুষ্ঠানের মধ্যে খোদ গণেশকে দেখতে পাওয়া যায় মাত্র প্রথম দু’-একদিন। বাকি ক’দিনের অনুষ্ঠানটির মধ্যে গণেশের কোন স্থান নেই। হালকা ভাষায় বললে বলা যায়, প্রথম দু’-একদিনের মধ্যেই সিদ্ধিদাতার যেন সুবুদ্ধি দেখা দেয়। কৃষিকেন্দ্রিক এই অনুষ্ঠানটিতে নেহাতই মেয়েলি ব্যাপার বলে চিনতে পেরে তিনি বিদায় নেন দৃশ্যপট থেকে। তাঁর জায়গায়, ব্রতের কেন্দ্রে, এসে দাঁড়ান গৌরী। ফলে গণেশচতুর্থী-ব্রতের বেশির ভাগটাই হয়ে দাঁড়ায় গৌরী-ব্রত।

ভাদ্র মাসের চতুর্থী তিথিতে গণেশ-চতুর্থী ব্রতের শুরু। ওই দিনটিই বুঝি গণেশের জন্মদিন। পুণা ও বোম্বাই অঞ্চলে আজকাল অবস্থাপন্ন বাড়িতে গণেশমূর্তি কিনে এনে এই দিনটিতে মহা সমারোহে গণেশ-পুজো হয়। বলাই বাহুল্য, অবস্থাপন্ন পরিবারের সমারোহের মতোই এই পুজোপাঠের ব্যাপারটাও অবশ্যই অর্বাচীন। হয়তো তার আড়াল থেকে গণেশচতুর্থী ব্রতের প্রথম দিনকার অনুষ্ঠানের আদি ও অকৃত্রিম রূপটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। দুঃখের বিষয়, ইন্ডিয়ান-এ্যান্টিকোয়ারির প্রবন্ধ-লেখকও গণেশকে কৃষি-উৎসবের প্রতীক বলে প্রমাণ করবার ভ্রান্ত আগ্রহে গণেশচতুর্থী ব্রতের প্রথম দিনকার বর্ণনাটি দিতে ভুলে গিয়েছেন। দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ ভাদ্র পঞ্চমীর দিনই, গণেশের বিসর্জন।
এইভাবে, ব্রত অনুষ্ঠানের কেন্দ্র থেকে গণেশ বিদায় গ্রহণ করবার পর ব্রতটির তাৎপর্য স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে।
ভাদ্র ষষ্ঠীর দিন ভোর বেলাতেই মেয়েরা বেরিয়ে পড়ে একরকম শাকের গুচ্ছ সংগ্রহ করে আনতে। শাকগুলি উপড়ে কাপড়ে জড়িয়ে কুলোয় করে বাড়ি আনা হয়। তারপর, বাড়ি এনে সেগুলিকে ওই অবস্থায় চৌকির উপর স্থাপন করে চৌকির নিচে সিঁদুর দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। সন্ধ্যার দিকে এই কলা-বৌ মূর্তিটির পাশে এসে বসে একটি কুমারী মেয়ে। সধবারা পরস্পরকে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। তারপর, কলা-বৌকে নিয়ে বাড়ির ঘরে ঘরে ঘোরা হয়। সঙ্গে চলে কুমারী মেয়েটি। প্রত্যেকটি ঘরেই প্রশ্ন করা হয়, "গৌরী, গৌরী, কী এনেছো তুমি? কী দেখছো তুমি?" উত্তরে কুমারী মেয়েটি গৌরীর হয়ে জবাব দেয়, সে এসেছে প্রচুর ঐশ্বর্য, সে-দেখছে প্রচুর ঐশ্বর্য। কিন্তু শুধু ওই মুখের কথাটুকুই যথেষ্ট নয়। গৌরী যে এসেছিলেন, সত্যিই ঘরে ঘরে ঐশ্বর্য দিয়ে গিয়েছেন- এ-বিষয়ে একটা চাক্ষুষ প্রমাণও এঁকে দেওয়া হয়। দোরগোড়ায় আঁকা হয় গৌরীর পায়ের আলপনা। ঠিক আমাদের বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুজোর মতোই। এবং এই পায়ের আলপনার দিকে নজর করলে বোঝা যায় আমাদের লক্ষ্মীব্রতের মতোই এই গনেশচতুর্থী ব্রতের মূলেও রয়েছে প্রভূত শস্যের কামনা।
ভাদ্র সপ্তমীর দিন মেয়েরা চরকায় কাটা সূতো থেকে নিজের নিজের দৈর্ঘ্যরে ষোলোগুণ করে লম্বা মাপের সূতো নেয় এবং কলা-বৌ-এর পাশে সূতোগুলি রেখে দেয়। পরের দিন ওই সূতো তুলে তাতে ষোলোটি করে গিঁট দিয়ে, হলুদ রং-এ ছুপিয়ে, ভাঁজ করে মেয়েরা গলায় পরে। তাছাড়া, ষোলোটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালে, ষোলোটি তিল এবং ষোলোটি ধান রাখে কলা-বৌ-এর সামনে। এই "ষোলো" সংখ্যাটির দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।'- (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৩২৮-৩০)

কেন ষোলো সংখ্যাটির দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার? প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার প্রত্ন-খননে আবিষ্কৃত নিদর্শন থেকে ১৬ ভিত্তিক ওজন পরিমাপের প্রত্ন-উপাদানের বিষয় স্মর্তব্য। তাছাড়া এই সংখ্যাটিকেই দেখতে পাওয়া যায় বাংলাদেশের আর একটি কৃষি-কামনামূলক ব্রততেও। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে লিখেছেন-

পূর্ববঙ্গের তারাব্রতে একটি ছড়ায় আমরা পাই :
'ষোল ষোল বর্তির হাতে ষোল সরা দিয়া,

মোরা যাই ইন্দ্রপুরীর নাটুয়া হইয়া।'
আর ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারির বর্ণনাদাতা শ্রীযুক্ত বি. এস. গুপ্ত বলছেন-
'The sixteen knots and the sixteen folds of the skein turned into a necklace suggests the number of weeks a rice-crop takes to grow.'

অর্থাৎ, মানব-অগ্রগতির কোনো এক পিছনে ফেলে-আসা-পর্যায়ে এই হলো মেয়েদের কাছে দিন গোনবার কৌশল। দেবীপ্রসাদ আরো বলছেন-
'স্বভাবতই, গণেশচতুর্থী ব্রতের পঞ্চম দিনটিতে মেয়েরা ওই যে হলুদ-ছোপানো সূতোর হার গলায় পরলো সে-হার তারা খুলবে ফসলের সময় এলে–ষোলো সপ্তাহ পরে। আর তারা এই হারটির নাম দেয় মহালক্ষী– গণেশচতুর্থী ব্রতের সঙ্গে বাংলা দেশের লক্ষী ব্রতের মিল নানান দিক থেকে। শস্যের কামনায় অনুষ্ঠিত বাংলা দেশের আর একটি ব্রতের...নাম শসপাতার ব্রত। এবং সেই...অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ হলো নাচ- মেয়েদের নাচ। অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনায়, "সমস্ত রাত দুই দলের নাচগান ছড়াকাটাকাটির উপরে চাঁদের আলো, তারার ঝিকিমিকি।" গণেশচতুর্থী ব্রতের বেলাতেও এই নাচ,– মেয়েদের নাচ,– বাদ যায় না। ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারির বর্ণনাদাতা বলছেন, ভাদ্র সপ্তমীর দিনটিতে মেয়েরা দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি ঘোরে, তারপর পাড়ার মেয়েরা সকলে মিলে রাতভোর নাচ আর গান করে।
এই নাচগানকে আধুনিক অর্থে অবসর-বিনোদন মনে করলে একেবারেই ভুল করা হবে। সমাজ-বিকাশের পুরোনো পর্যায়ে নাচ-গান খাদ্য-আহরণ বা খাদ্য-উৎপাদন-মূলক কৌশলেরই অঙ্গ। দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখা যায় শুম্বা মেয়েরা তাদের নাচ শেষ হবার আগে এমন কি কোদালগুলো স্পর্শ পর্যন্ত করবে না। মিসেস ব্রায়ন স্কট বলছেন, উত্তর বোর্নিওতে ডাইকদের মধ্যে কৃষিকাজকে একঘেঁয়ে একটানা শ্রমের ব্যাপার বলে মনে করলে ভুল করা হবে, কেননা তার ফাঁকে ফাঁকে নানান উৎসবের অবকাশ থাকে। আমেরিকার চেইন্নে-ইন্ডিয়ানদের বেলাতেও দেখা যায় কৃষিকাজের একটি অনিবার্য অঙ্গ হলো মেয়েদের ফসল-নাচ : তরুণী ও যুবতীর দল গোল হয়ে নাচ শুরু করে, পুরুষেরা ধরে গান- যে-মেয়েটি নাচের প্রধান অংশ গ্রহণ করে তার হাতের লাঠির ডগায় শস্যের গুচ্ছ বা বাঞ্ছিত ফসল বাঁধা থাকে।...
গণেশচতুর্থী ব্রতের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। ব্রত-অনুষ্ঠানের শেষে শাকের-উপর-কাপড়-জড়ানো গৌরীমূর্তিটিকে মেয়েরা নদীতে বিসর্জন দিয়ে আসে এবং আসবার সময় নদীর কিনারা থেকে পলিপড়া মাটি মুঠোয় করে নিয়ে আসে, ধানের গোলার উপর আর ক্ষেতের উপর ছিটিয়ে দেয়। ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারির বর্ণনাদাতা বলছেন, এবং ঠিকই বলছেন, এ-অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য খুব সম্ভব এই যে, শুরুতে নদীর কিনারার ওই পলিপড়া জমিতেই শস্যের উদ্গম হতো এবং এইভাবে ওই উর্বর মাটি ছিটোবার পিছনে যে-জাদুবিশ্বাস তা হলো মাটির উর্বরতার স্পর্শে ফসলের প্রাচুর্য পাবার আশা।'- (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৩৩১)

এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, নৃতত্ত্ববিদদের মতে কৃষি-বিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়েই এই জাদুবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা মানুষের মনে সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে। তাই-

'রবার্ট ব্রিফল্ট দেখাচ্ছেন, অসভ্য মানুষদের মধ্যে সর্বত্রই দেখা যায় অন্যান্য কাজের তুলনায় কৃষিকাজকে কেন্দ্র করেই জাদুবিশ্বাস এবং জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরতা সবচেয়ে বেশি। পিউবলো-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে খৃস্টান পাদ্রীরা নানাভাবে খৃস্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেও এই অসভ্য মানুষগুলির মূল বিশ্বাস একটুও টলাতে পারেনি; অথচ এ-বিশ্বাস চুরমার হয়ে যেতে লাগলো যখন ইয়োরোপীয়রা সে-দেশে গিয়ে চাষবাস শুরু করলো। ইয়োরোপীয়দের কৃষিকাজ দেখে ওদের বিশ্বাস এ-ভাবে চুরমার হয়ে যেতে লাগলো কেন? কেননা, ওরা দেখলো কোনো রকম জাদু-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর না করেই ইয়োরোপীয়রা ফসল ফলাতে পারছে এবং সে-ফসল গুণ বা পরিমাণ কোনো দিক থেকেই নিকৃষ্ট নয়। তাই খৃস্টান পাদ্রীরা হাজার বক্তৃতা দিয়েও তাদের মনের যে-বিশ্বাস টলাতে পারেনি ইয়োরোপীয়দের কৃষিকাজ-পরিদর্শন সে-বিশ্বাসকে উৎপাটিত করতে পারলো। পিউবলো-ইন্ডিয়ানদের এই কাহিনীটি থেকেই অনুমান করা যায়, পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের মনে,- এবং অতএব এগিয়ে-আসা মানুষদের পিছনে-ফেলে-আসা পর্যায়েও,- কৃষিকাজ কতো গভীরভাবে জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত এবং জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। অবশ্যই ব্রিফল্ট শুধুমাত্র এই দৃষ্টান্তটির উপরই নির্ভর করেননি। আরো বহু তথ্য সংগ্রহ করে দেখাচ্ছেন, পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের মানুষদের কাছে জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে কৃষিকাজ একান্তই অসম্ভব।'- (দেবীপ্রসাদ/ লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৩৪৩)

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এটি অসম্ভব কেন? এর বাস্তব কারণ ঠিক কী? কৃষি-আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে জাদুবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা এমন ঐকান্তিক কেন? এ প্রেক্ষিতে বাংলার ব্রত সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া যায়। তিনি বলেছেন-

'গঙ্গা শুকুশুকু আকাশে ছাই!'–সেই সময় বর্ষার জলধারা কল্পনা করে বসুধারা ব্রতের অনুষ্ঠান। এই যে জৈষ্ঠ্যের সারা মাস আষাঢ়ের ছবি মনে জাগিয়ে মানুষ প্রতীক্ষা করছে, এটা বড় কম অবসর নয় আবেগ ঘনীভূত হয়ে নানা শিল্প-ক্রিয়ায় প্রকাশ হবার জন্য।...এমনি প্রায় প্রত্যেক ব্রতেই দেখি, কামনা অনেকদিন পর্যন্ত–কোথাও একমাস, কোথাও দুমাস– অতৃপ্ত থাকছে চরিতার্থতার পূর্বে। শস্য ফলবার আগেই শস্য উদ্গমের ব্রত আরম্ভ হল এবং শস্যের প্রকৃত উদ্গমের ও কামনার মাঝের দিনগুলো মনের আবেগে নানা কল্পনায় নানা ক্রিয়ায় ভরে উঠে নাট্য, নৃত্য, আলেখ্য, এমনি-সব নানা শিল্পের জন্ম দিতে লাগল।'
(অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বাংলার ব্রত)

অবনীন্দ্রনাথের কথাগুলি যে আংশিক ঠিক এবং আংশিক ঠিক নয় তা দেখাতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ বলছেন-

'কথাগুলি কতোটুকু পর্যন্ত ঠিক? কামনা এবং কামনা-সফল-হওয়ার মাঝখানের যে-দীর্ঘ

ব্যবধান তাকেই মনের ঘনীভূত আবেগ দিয়ে,–কামনা সফল হওয়ার ছবি দিয়ে,–ভরিয়ে তোলাই হলো ব্রতের উদ্দেশ্য। নৃত্য, নাট্য, আলেখ্য–এমনি সব নানান উপায়ের উপর নির্ভর করেই মনের ওই ঘনীভূত আবেগকে বাঁচিয়ে রাখবার আয়োজন। অবনীন্দ্রনাথের কথাগুলি ঠিক এবং এই দিক থেকেই ঠিক।
কিন্তু ঠিক নয়ও। ঠিক নয় এই কারণে যে, অর্ধ-অসহায় পর্যায়ের ওই মানুষগুলির কাছে কামনা আর কামনা-সফল-হওয়ার মাঝখানের ওই দীর্ঘ ব্যবধানটি এক চূড়ান্ত পরীক্ষার মতো। আর তাই, এই সময়টি জুড়ে নৃত্য, নাট্য, আলেখ্য এমনি সব নানান শিল্পের সাহায্যে মনের আবেগটুকুকে বাঁচিয়ে রাখবার যে-চেষ্টা তার মূলে রয়েছে জীবন-সংগ্রামের নির্মম চাহিদা, অবসর-বিনোদন নয়–এবং সেই কারণেই অবনীন্দ্রনাথ যখন বলছেন ওই ঘনীভূত আবেগের আসল উপাদান হলো অবসর, তখন তাঁর কথা স্বীকারযোগ্য হতে পারে না।’-
(লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৩৪৪)

তবে ব্রতের আদি-তাৎপর্য হিসেবে জীবনসংগ্রামের যে-পটভূমিতে ব্রতের জন্ম তার সঙ্গে জীবনসংগ্রমের আধুনিক পটভূমির যে অনেক তফাৎ তা কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের নিজের রচনাতেই স্বীকৃত হয়েছে। যেমন-
‘অনাবৃষ্টির আশঙ্কা আমাদের যদিই বা এখন কোনোদিন চঞ্চল করে তবে হয়তো ‘হরি হে রক্ষা করো’ বলি মাত্র; কিন্তু ঋতুবিপর্যয়ের মানে যাদের কাছে ছিলো প্রাণ-সংশয়, সেই তখনকার মানুষেরা কোনো অনির্দিষ্ট দেবতাকে প্রার্থনা কেবল মুখে জানিয়ে তৃপ্ত হতে বা নিশ্চিত হতে পারত না; সে ‘বৃষ্টি দাও’ বলে ক্ষান্ত হচ্ছে না; সে বৃষ্টি সৃষ্টি করতে, ফসল ফলিয়ে দেখতে চলেছে।...এখনকার মানুষ এ-রকম বিশ্বাস করে না, ব্রতও করে না।
ব্রত হলো মনষ্কামনার স্বরূপটি। আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি; এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে নৃত্যে; এক কথায়, ব্রতগুলি মানুষের গীত কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত কামনা।...
খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলি ঠিক কোনো দেবতার পুজো নয়; এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব; কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া। মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্য নৃত্য এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা। অন্তত এই প্রণালীতে সমস্ত প্রাচীন জাতিই ব্রত করছে দেখতে পাই।...
আমাদের একটা ভুল ধারণা ব্রত সম্বন্ধে আছে। আমরা মনে করি যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্ম ও নীতি শেখাতে মেয়েদের জন্যে আধুনিক কিন্ডারগার্টেন প্রণালীর মতো ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি আবিষ্কার করে গেছেন। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি কতকটা তাই বটে, কিন্তু আসল মেয়েলি ব্রত মোটেই তা নয়। এগুলি আমাদের পূর্বপুরুষেরও পূর্বেকার পুরুষদের–তখনকার, যখন শাস্ত্র হয়নি, হিন্দুধর্ম বলে একটা ধর্মও ছিল না এবং যখন ছিল লোকেদের মধ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান, যেগুলির নাম ব্রত।’ (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বাংলার ব্রত)

অর্থাৎ বর্তমানে প্রকৃত ব্রত নামে যেগুলির প্রচলন রয়েছে তা আসলে সেই সুপ্রাচীন কৃষিকেন্দ্রিক জীবন-সংগ্রামের অঙ্গ জাদুবিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য প্রভাব। কামনা আর কামনা-সফল-হওয়ার মাঝখানে যে অনিশ্চয়তার ব্যবধান তা সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে কৃষি-বিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়েই। তাই এই পর্যায়েই কামনা-সফল-হওয়ার কল্পনা দিয়ে ব্যবধানটিকে ভরাট করে তোলবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। নকলের সাহায্যে কামনা-সফল-হওয়ার কল্পনাকে ফুটিয়ে তোলাই হলো জাদুবিশ্বাসের প্রাণবস্তু।

.

এভাবে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় কিছু কিছু অব্যাখ্যাত রহস্যময় উপাদান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সিন্ধু-সভ্যতা তথা সিন্ধু-ধর্মের ওই মাতৃপ্রাধান্য আবিষ্কার যে কী অভাবনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন-
‘সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কৃত হবার আগে সাধারণভাবে ভারতবর্ষীয় শাক্ত-ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে চন্দ অনুমান করেন, কোনো-এক মাতৃপ্রধান সমাজ-বাস্তবেই এ-জাতীয় মাতৃপ্রধান ধর্ম-বিশ্বাসের উদ্ভব ও বিকাশ হওয়া সম্ভব। নজির হিসেবে তিনি প্রাচীন যুগের অন্যান্য সমজাতীয় ধর্ম-বিশ্বাসের উল্লেখ করেছেন : এশিয়া মাইনর, সিরিয়া এবং মিশরেও মাতৃপ্রধান সমাজেই মাতৃপ্রধান ধর্ম-বিশ্বাসের আবির্ভাব ঘটেছিল।’
‘সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কারের পর স্পষ্টই বোঝা গেল, এ-দেশে শাক্ত-ধর্মের ইতিহাস কত প্রাচীন। স্বভাবতই, চন্দর উপরোক্ত অনুমান অনুসরণ করে মার্শাল মন্তব্য করলেন, ওই সুপ্রাচীন যুগের মাতৃপ্রধান ধর্ম-বিশ্বাসের পটভূমি হিসেবেও মাতৃপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থার কথাই অনুমান করা স্বাভাবিক।’- (দেবীপ্রসাদ/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৭৩)

যদিও সিন্ধু-যুগের সমাজ-ব্যবস্থায় মাতৃপ্রাধান্যের পরিচয় সত্যিই কতোটুকু বজায় ছিলো সে বিষয়ে কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আজও সম্ভব নয়, কিন্তু সমাজ-বিকাশ সংক্রান্ত সাধারণভাবে জ্ঞাত নৃতাত্ত্বিক নিয়মের দিক থেকে সহজেই অনুমান হয়, হরপ্পা-সংস্কৃতিতে– বিশেষত ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে– মাতৃপ্রাধান্যের সুস্পষ্ট স্মারক টিকে থাকাই স্বাভাবিক। এ-প্রেক্ষিতে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক তথ্য হলো, আধুনিক বিদ্বানদের দ্বারা সিন্ধু-অধিবাসীদের বংশধর হিসেবে মহাভারত-বর্ণিত বাহীকদেরকে সনাক্ত করা। কেননা, মহাভারতে বাহীকদের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে এই মানুষগুলি সম্বন্ধে তীব্র ঘৃণার মনোভাব ফুটে উঠলেও এই বর্ণনা থেকে অবশ্যই অনুমান হয় বাহীকদের মধ্যে মাতৃ-প্রধান ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘লোকায়ত দর্শন’ গ্রন্থে কালিপ্রসন্ন সিংহের (মহাভারত-১১১৫-৭) যে দীর্ঘ তর্জমা উদ্ধৃত করেছেন তার অংশবিশেষ এরকম-
কর্ণ বলছেন-
‘হে মদ্ররাজ! আমি ধৃতরাষ্ট্র সমীপে ব্রাহ্মণ মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তুমি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ ধৃতরাষ্ট্রমন্দিরে বিবিধ বিচিত্র দেশ ও পূর্বতন ভূপতিগণের বৃত্তান্ত কহিতেন। তথায় একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহীক ও মদ্রদেশোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করত

কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে এবং যাহারা সিন্ধুনদী ও তাহার পাঁচ শাখা হইতে দূর প্রদেশে অবস্থিত, সেই সমস্ত ধর্মবর্জিত অশুচি বাহীকগণকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।... আমি নিতান্ত নিগূঢ় কার্যানুরোধ বশতঃ বাহীকগণের সহিত বাস করিয়াছিলাম। তন্নিবন্ধন তাহাদের ব্যবহার বিদিত হইয়াছি। ... তথায় আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিরা গৌড়ীসুরা পান এবং লশুনের সহিত ভৃষ্ট যব, অপুপ ও গোমাংস ভোজন করিয়া থাকে। কামিনীগণ মত্ত, বিবস্ত্র ও মাল্যচন্দন রহিত হইয়া নগরের গৃহপ্রাচীর সমীপে নৃত্য এবং গর্দভ ও উষ্ট্রের ন্যায় চিৎকার করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। তাহারা স্বপরপুরুষ বিবেক-বিহীন হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করত উচ্চৈস্বরে পুরুষগণের প্রতি আহ্লাদজনক বাক্য প্রয়োগ করে।... '

'হে মদ্ররাজ, আর এক ব্রাহ্মণ কুরুসভায় যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। হিমাচলের বহির্ভাগে, যে স্থানে পীলু বন বিদ্যমান আছে এবং সিন্ধু ও তাহার শাখা শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই অরট্টদেশ নিতান্ত ধর্মহীন; তথায় গমন করা অবিধেয়। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃলোক ধর্মভ্রষ্ট সংস্কারহীন অরট্টদেশীয় বাহীকদিগের পূজা গ্রহণ করেন না...'

'হে শল্য! আমি পুনরায় তোমাকে এক উপাখ্যান কহিতেছি... কিছুদিন হইল, এক ব্রাহ্মণ আমাদের ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন...(তিনি কহিলেন)... গান্ধার মদ্রক ও বাহীকেরা সকলেই কামাচারী, লঘুচেতা ও সংকীর্ণ।... হে মদ্রাধিপ! আমি আর একজনের নিকট বাহীকদিগের যে কুৎসিত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাও কহিতেছি...। পূর্বে অরট্টদেশীয় দস্যুরা এক পতিব্রতা সীমন্তিনীকে অপহরণ পূর্বক তাঁহার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে তিনি শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে নরাধমগণ! তোমরা অধর্মাচরণপূর্বক আমার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে; অতএব তোমাদিগের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যাভিচারিণী হইবে। আর তোমরা কখনই এই ঘোরতর শাপ হইতে বিমুক্ত হইবে না। হে শল্য! এই নিমিত্তই অরট্টদিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে।...'

মহাভারতের সংবাদদাতাদের বর্ণনায় বাহীকদের প্রতি যে তীব্র ঘৃণার ভাব রয়েছে, সেই ঘৃণার প্রভাবে তাঁরা কিছুকিছু কাল্পনিক কথা এই বর্ণনার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন হয়তো। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে বাহীকদের সমাজ-জীবন সংক্রান্ত কিছু যে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলির দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে এ-বর্ণনা প্রাগ্-রাষ্ট্র ট্রাইব-সমাজেরই ইঙ্গিত দেয়। ফলে বাহীকদের মধ্যে যৌন-নিষ্ঠার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সভ্য-সমাজের কাছে পরিবার-জীবন বা দাম্পত্য-ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় বাহীকদের মধ্যে মহাভারতের সংবাদদাতারা তা দেখতে পাননি। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে-

'সভ্য-সমাজের এই দাম্পত্য-জীবন চিরন্তন নয় : প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানবজাতিই সভ্যতার দিকে এগোবার পথে যে-পর্যায়গুলি উত্তীর্ণ হয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে সেগুলির মধ্যে আধুনিক বিবাহ-সম্পর্ক অনুপস্থিত।... মর্গানের পরিভাষা অনুসারে মানুষের যাত্রা শুরু হয়েছে

বন্য-দশার নিম্ন স্তর থেকে; তারপর বন্য-দশার মধ্য ও উচ্চ স্তর পেরিয়ে মানুষ বর্বর-দশায় উঠে এলো এবং এই বর্বর-দশারও নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ এই তিনটি স্তর পেরোলে পরই মানুষের পক্ষে সভ্যতার আওতায় পৌঁছানো সম্ভব। এবং মর্গান দেখালেন, বন্য-দশার আগাগোড়া এবং বর্বর-দশার নিম্ন ও মধ্য স্তর পর্যন্ত কোথাও আধুনিক দাম্পত্য-সম্পর্কের বা এক বিবাহের পরিচয় নেই।'- (দেবীপ্রসাদ/ লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-২২৫)

তবে আমাদের আলোচ্য বিষয় হিসেবে এ-ক্ষেত্রে মহাভারতের ওই বর্ণনায় বাহীকদের মধ্যে প্রচলিত উত্তরাধিকার-সূত্রের যে ইঙ্গিতটি পাওয়া গেলো, তাদের মধ্যে পুত্রেরা ধনাধিকারী না হয়ে ভাগিনেয়রাই ধনাধিকারী হয়। এখানেই এই উত্তরাধিকার-সূত্রে মাতৃ-প্রধান সমাজের চিহ্ন থেকে গিয়েছে। আজো আমাদের দেশে মাতৃ-প্রধান অঞ্চলগুলিতে এ-জাতীয় উত্তরাধিকার-সূত্র টিকে থাকতে দেখা যায়। যেমন, খাসিয়া বা অনুরূপ আদিবাসী জনগোষ্ঠির মধ্যে আজও মাতৃ-প্রধান সমাজ-ব্যবস্থা ও দেবী-প্রধান দেবলোকের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্পর্ক টিকে আছে। এক্ষেত্রে-
'পূর্ণাঙ্গ মাতৃ-প্রধান সমাজে উত্তরাধিকার-সূত্র ছিলো মায়ের দিক থেকে মেয়ের দিকে। এই ব্যবস্থারই কিছুটা রদবদল হয়ে মামার দিক থেকে ভাগনের দিকে উত্তরাধিকারসূত্র প্রবর্তিত হলো। তারপর, শেষপর্যন্ত মাতৃ-প্রধান সমাজ সম্পূর্ণভাবে ভেঙে যাবার পর, যখন পূর্ণ পিতৃ-প্রধান সমাজ দেখা দিলো তখন উত্তরাধিকারসূত্র হলো পিতা থেকে পুত্রের দিকে। মাতুল থেকে ভাগিনেয়র দিকে উত্তরাধিকারসূত্র যতোদিন বর্তমান ততোদিন পর্যন্ত সমাজ-সংগঠনে মাতৃ-প্রাধান্যের লক্ষণ রয়েছে বলে অনুমান করা যায়।'- (দেবীপ্রসাদ/ লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-২২৭)

এ-পর্যায়ে যে মৌলিক প্রশ্নটি চলে আসে, প্রাচীন মাতৃপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি কী? উত্তরে বলা যায়-
'প্রাথমিক পর্যায়ের কৃষি-উৎপাদন। কেননা কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার, আদিম কৃষিভিত্তিক সমাজও তাই মাতৃপ্রধান। এবং প্রাচীনকালে ইউফ্রেটিস, নীল ও সিন্ধুনদের কিনারায় মানুষ যে প্রথম সভ্যতার ইমারত গড়ে তুলতে পেরেছিল তার চূড়ান্ত কারণ ওই কৃষি-আবিষ্কার। অতএব এই প্রাচীন সভ্যতাগুলির নিচে মাতৃপ্রধান সমাজের পরিচয় চাপা পড়ে থাকাই স্বাভাবিক, তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, নগর-সভ্যতাগুলির সুউন্নত পর্যায়েও সমাজ-ব্যবস্থা মাতৃপ্রধান ছিল। কেননা আদিম কৃষি-ভিত্তিক মাতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার পরমায়ু খুব দীর্ঘ নয়; প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য অনুসারে অনুমিত হয়েছে, উন্নততর কৃষিকাজের পর্যায়ে– গৃহপালিত পশুর সাহায্যে লাঙল দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া থেকে– কৃষিকাজে পুরুষের ভূমিকাই প্রধান হয়েছে এবং তারই ফলে ক্রমশ সমাজ-ব্যবস্থাও পুরুষ-প্রধান হয়ে উঠেছে। তাই প্রাচীন সভ্যতাগুলির যখন পূর্ণ বিকাশ তখনও সমাজ-ব্যবস্থায় মাতৃ-প্রাধান্যের পরিচয় অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থায় মাতৃ-প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ ও পরিবর্তিত হলেও বিশেষত ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে তার সুস্পষ্ট স্মারক দীর্ঘদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকাই স্বাভাবিক। অতএব

হরপ্পা-সংস্কৃতির বাস্তব সমাজ-ব্যবস্থার মাতৃপ্রাধান্যের পরিচয় কতখানি অক্ষুণ্ন ছিল এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত অনুমানের সুযোগ না থাকলেও এ-সিদ্ধান্তে বাধা নেই যে হরপ্পা-সংস্কৃতিতে– বিশেষ ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে– এই মাতৃপ্রাধান্যের সুস্পষ্ট স্মারক টিকে থেকেছিল। বস্তুত এই দেবী-প্রধান বা মাতৃপ্রধান ধর্মবিশ্বাসই তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।'

'অপরপক্ষে, প্রাচীন আর্য-ধর্মে মাতৃপ্রাধান্যের পরিচয় নেই। ঋগ্বেদের দেবলোক পুরুষ-প্রধান। কেননা, প্রাচীন বৈদিক সমাজ কৃষিভিত্তিক ছিল না, তার প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি পশুপালন। পশুপালন পুরুষের কাজ, পশুপালনমূলক সমাজ পিতৃ-প্রধান বা পুরুষ-প্রধান। এই কারণেই বৈদিক সমাজও একান্তই পুরুষ-প্রধান ছিল এবং এই সমাজই বৈদিক দেবলোকে প্রতিবিম্বিত : স্বভাবতই বৈদিক দেবলোকও পুরুষ-প্রধান- দেবীরা সংখ্যায় নগন্য, গৌরবে গৌণ। অতএব বৈদিক ও প্রাক-বৈদিক– আর্য ও আর্য-পূর্ব– ধর্ম-বিশ্বাসের এই মৌলিক প্রভেদটির ব্যাখ্যা শুধুমাত্র ধর্ম-বিশ্বাসের স্তরে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-প্রভেদের চূড়ান্ত কারণ অর্থনৈতিক।'- (দেবীপ্রসাদ/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৭৪)

লিঙ্গ-উপাসনা :
ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি যে, প্রাক্-বৈদিক ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সিন্ধু-ধর্মের প্রধানতম উপাদান হলো উর্বরতামূলক আদিম জাদুবিশ্বাস বা তার স্মারক। আর এ-বিশ্বাসের মূলসূত্র অনুসারে মানবীয় ফলপ্রসূতা ও প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা একই সূত্রে বাঁধা। স্বভাবতই আদিম মানুষদের মধ্যে প্রচলিত এই বিশ্বাসমূলক আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে– এবং এই বিশ্বাস-উদ্ভূত নানান প্রচলিত ধর্মের ক্ষেত্রেও– জনন-অঙ্গের উপর বিশেষ গুরুত্ব-আরোপণের পরিচয় পাওয়া যায়। সিন্ধু-ধর্মও যে স্বভাবতই তার ব্যতিক্রম নয়, তার প্রমাণ হলো সমগ্র সিন্ধু-সাম্রাজ্য জুড়ে আবিষ্কৃত অজস্র লিঙ্গ ও যোনি মূর্তি। জন মার্শল প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এগুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন এবং প্রায় একবাক্যে এগুলিকে সিন্ধু-ধর্মের পরিচায়ক বলেই গ্রহণ করেছেন।

এ-বিষয়ে বৈদিক সাহিত্যেও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, ঋগ্বেদে শিশ্নদেব বা লিঙ্গ-উপাসকেরা নিন্দিত হয়েছে। যেমন-

‘ন যাতব ইন্দ্র জুজুবুর্নো ন বন্দনা শবিষ্ঠ দেব্যাভিঃ।
স শর্ধদর্যো বিষুণস্য জন্তোর্মা শিশ্নদেবা অপি গুর্ঋতং নঃ’।। (ঋক-৭/২১/৫)
অর্থাৎ : হে ইন্দ্র! যাতুগণ যেন আমাদের হিংসা না করে। হে বলবত্তম ইন্দ্র! তারা যেন আমাদেরকে বেদীস্থ ব্যক্তিদের থেকে পৃথক না করে। প্রভু ইন্দ্র যেন বিষম প্রাণীর শাসনে যেন আমাদেরকে উৎসাহ দেন এবং শিশ্নদেবগণ যেন আমাদের ঋতকে পরাজিত না করে।

কিন্তু এখানে এই শিশ্নদেব বলতে ঠিক কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? অন্য একটি ঋক থেকে এর উত্তর পাওয়া যেতে পারে। যেমন-

‘স বাজং যাতাপদুষ্পদা সনৎস্বর্ষাতা পরি ষদৎসনিষ্যন্ ।
অনর্বা যচ্ছতদুরস্য বেদো ঘ্নঞ্ছিশ্নদেবা অতি বর্পসা ভূৎ’।। (ঋক-১০/৯৯/৩)
অর্থাৎ : তিনি সুচারু গতিতে গমনপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। সর্ববস্তুর দাতা (সেই ইন্দ্র) দিতে উদ্যত হয়ে যুদ্ধে অবস্থিত হন। তিনি নিজতেজে অবিচলিতভাবে শিশ্নদেবগণকে হত্যা করতে করতে পরাভূত করে শতদ্বারবিশিষ্ট শত্রুপুরী হতে ধন অপহরণ করেন।

অতএব অনুমান হয়, ঋগ্বেদে যাদের শিশ্নদেব বা লিঙ্গ-উপাসক বলে উল্লেখ করা হয়েছে তারা শুধুই যে ইন্দ্র-আক্রান্ত ও আর্যদল-লুণ্ঠিত হয়েছিলো তাই নয়, তারাই ছিলো ঐশ্বর্যপূর্ণ শতদ্বার-বিশিষ্ট শত্রুপুরীর অধিবাসীও। কিন্তু বৈদিক আর্যরা কি সিন্ধু-সভ্যতার পুর বা নগর ছাড়াও আর কোনো ঐশ্বর্যপূর্ণ পুর বা নগর ধ্বংস করেছিলো? দেবীপ্রসাদ বলেন-
‘এ-জাতীয় কল্পনার পক্ষে প্রত্নতত্ত্বে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং পাবার কোনো ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাও নেই। অপরপক্ষে, হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া অজস্র লিঙ্গ ও যোনি-মূর্তি থেকে অবশ্যই প্রমাণ হয় ওই প্রাচীন ঐশ্বর্যপূর্ণ নগরবাসীরা শিশ্নদেব বা লিঙ্গ-উপাসক ছিল। অতএব এখানেও সাহিত্যমূলক সাক্ষ্যের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বমূলক

সাক্ষ্যের পূণ-সঙ্গতি দেখা যায় : সিন্ধু-অধিবাসীদেরই ঋগ্বেদ-উল্লিখিত শিশ্নদেব বলে সনাক্ত করতে হবে।’- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৭৫)

অন্যদিকে সিন্ধু-সভ্যতাকে আর্য-কীর্তি বলে প্রতিপন্ন করার আশায় হয়তো এমন কল্পনা করা যেতে পারে যে ঋগ্বেদ-নিন্দিত ওই শিশ্নদেব বলতেও আর্য-গোষ্ঠিভুক্ত কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষই বুঝতে হবে। সেক্ষেত্রে শিশ্নদেবদের সঙ্গে শতদ্বারবিশিষ্ট পুরের সম্পর্ক বিবেচনায় নিলে এ-কথা কল্পনা করা একান্তই অসম্ভব যে প্রাচীন আর্যরাও নগর-সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো। যদিও পরবর্তী কালের বৈদিক সাহিত্যে– বিশেষত যজুর্বেদ, ‘ব্রাহ্মণ’-সাহিত্য এবং শ্রৌতসূত্রে– উর্বরতামূলক জাদু-বিশ্বাসের প্রচুর স্মারক দেখা যায়, এক্ষেত্রে বৈদিক মানুষদের অর্থনীতিতে কৃষিকাজের ক্রমবধমান গুরুত্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক অনুমেয় বলে দেবীপ্রসাদ মনে করেন।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, ঋগ্বেদে ওই শিশ্নদেবদের প্রতি মনোভাব যত বিরূপই হোক না কেন পরবর্তীকালের ভারতবর্ষীয় ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসকে এ-মনোভাব খুব একটা প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয় না। কেননা উত্তরকালের ভারতবর্ষীয় ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম প্রধান পরিচয় বলতে ওই লিঙ্গ-উপাসনাই। এই উপাস্য লিঙ্গ সাধারণত শিবলিঙ্গ- বা শিব বলেই অভিহিত হয়। আর তাই ওই লিঙ্গ-উপাসনাকে শৈব-সাধনার পরিচায়ক বলে গ্রহণ করানোর উৎসাহ অকারণ মনে হয় না। এবং এই উৎসাহের পরিণাম হিসেবেই হয়তো প্রত্নতত্ত্ববিদ জর্জ মার্শাল কর্তৃক অনুমিত হয়েছে, ‘শক্তি-সাধনার মতোই শৈব-সাধনারও সূত্রপাত প্রাচীন প্রাক্-বৈদিক সিন্ধু যুগে এবং বেদোত্তর ভারতবর্ষীয় ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও শক্তি-সাধনার মতোই ওই শৈব-সাধনার অবিচ্ছিন্ন প্রভাব টিকে থেকেছে।’

এক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠে, সিন্ধু যুগেও ওই উপাস্য লিঙ্গ-মূর্তিকে উত্তরকালের মতো শিব-মূর্তি বা শিব-লিঙ্গ আখ্যা দেয়া হতো কিনা তা জানা নেই; অন্তত সিন্ধু-লিপির পাঠোদ্ধারের পূর্বে এ-বিষয়ে কোনো সুনিশ্চিত অনুমানেরও সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত, উত্তরকালে ওই ‘শিব’ নামটিকে কেন্দ্র করে যে অসংখ্য পৌরাণিক কল্পনার জটিলতা সৃষ্ট হয়েছে, এই পৌরাণিক উপাদানগুলির নির্ভুল ইতিহাস নির্ণয় করাও হয়তো একান্তই অসম্ভব। অতএব প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতায় মার্শাল কর্তৃক দাবীকৃত ‘শৈব’-সাধনার স্বাক্ষর কতোটা গ্রহণযোগ্য?
‘সিন্ধু-যুগে প্রচলিত শৈব-ধর্মের নজির হিসেবে মার্শাল সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত কোণা-ভাঙা একটি সীলের উপর। এ-বিষয়ে তাঁর প্রধান যুক্তি হলো, সীলটির উপর অঙ্কিত নানা চিহ্ন থেকে শিব-কল্পনার বিভিন্ন পৌরাণিক উপাদানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়- অতএব ওই সীলের কেন্দ্রস্থ মূর্তিটিকে অবধারিতভাবেই শিবমূর্তি বলে গ্রহণ করতে হবে।’- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৭৬)

কিন্তু শিবের মতো জনপ্রিয় দেবতাকে নিয়ে কল্পিত প্রচুর পৌরাণিক কাহিনীর জটিলতার

মধ্য থেকে পরবর্তীকালে প্রচলিত কয়েকটি নির্বাচিত পৌরাণিক উপাদান অবলম্বন করে প্রাচীন কালের কোনো চিত্রকে অবধারিতভাবে শিবমূর্তি বলে সনাক্ত করা সুসঙ্গত নয় বলেই অনেকে মনে করেন। তাছাড়া সিন্ধু-যুগের অন্যান্য এমন সীলও পাওয়া গেছে যার কেন্দ্রস্থ মূর্তিটি আলোচ্য সীলেরই অনুরূপ, কিন্তু সে মূর্তির সঙ্গে মার্শাল-আলোচিত সীলে পাওয়া পৌরাণিক উপাদানের সম্পর্ক নেই; হয়তো বা অধুনা-অজ্ঞাত-কোনো পৌরাণিক কাহিনীর সম্পর্ক-মুলক ইঙ্গিত থাকা অসম্ভব নয়। তারচেয়ে বরং ভারতবর্ষীয় ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে লিঙ্গ-উপাসনার যে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তার সঙ্গে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো থেকে পাওয়া অজস্র লিঙ্গমূর্তি যে প্রাগৈতিহাসিক অতীতের ইঙ্গিত দেয়, তার যোগসূত্র অন্বেষণের মধ্যেই হয়তো বা এর সমাধান লুকিয়ে আছে। উত্তরকালের প্রথা অনুসারে এই উপাস্য লিঙ্গমূর্তিগুলিকে আমরা যদি শিবলিঙ্গ অ্যাখ্যা দিতে সম্মত হই তা হলেই এই দিক থেকেই সিন্ধু ধর্মে শৈব-সাধনার আদি-রূপ স্বীকারযোগ্য হতে পারে।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন, সিন্ধু-যুগের ওই ধর্ম-বিশ্বাসে লিঙ্গ-উপাসনার এমন গভীর ও ব্যাপক প্রভাব কেন? উত্তর-লাভের মূলসূত্রটা আমরা ইতঃপূর্বেই দেখেছি-
‘অন্যান্য নানা দেশের নানা ধর্ম-বিশ্বাসের মতোই আমাদের দেশের এই প্রাগৈতিহাসিক ধর্মবিশ্বাসটিও এক আদিম উর্বরতামূলক জাদু-বিশ্বাস থেকেই জন্মলাভ করেছিল। সেই আদিম পর্যায়ের মানুষ প্রাকৃতিক উৎপাদিকা-শক্তির বাস্তব রহস্য উদ্ঘাটন করতে শেখেনি, প্রকৃতির ফলপ্রসূতাকেও মানবীয় ফলপ্রসূতার অনুরূপ বলেই কল্পনা করেছিল এবং মানবীয় প্রজননের সান্নিধ্যে বা সাহায্যে প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও সমৃদ্ধ করার আয়োজন করেছিল। অতএব আদিম মানুষদের মধ্যে প্রচলিত এই জাদুবিশ্বাসমূলক আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মানবীয় জননাঙ্গ ও তার অনুকরণের বিবিধ প্রয়োগ চোখে পড়ে; প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসগুলি থেকে তার চিহ্ন বিলুপ্ত হয়নি- সিন্ধু যুগের ধর্মবিশ্বাস থেকেও নয়।’- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৭৭)

আবার সিন্ধু-ধর্মের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য যে মাতৃপ্রাধান্য- মার্শালের এ-সিদ্ধান্ত অবশ্য-স্বীকার্য। অথচ পৌরাণিক ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করে পূর্বোল্লিখিত সীলের তথাকথিত শিব-মূর্তিকে তিনি পুরুষ দেবতা বলেই সনাক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু আলোচ্য সীলের মূর্তিটি পৌরাণিক শিব হোক-বা-নাই-হোক সমগ্র সিন্ধু-সাম্রাজ্য জুড়ে যে-অজস্র লিঙ্গ বা শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মূর্ত সাক্ষ্য কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়, এবং এগুলি অবধারিতভাবেই পুরুষাঙ্গের নিদর্শন। অতএব, ওই মাতৃপ্রধান ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে এগুলির নিদর্শন অন্তত কোনো-এক আপাত-অসঙ্গতির পরিচায়ক বলেই প্রতীত হয়। তাই এখানেও প্রশ্ন, সিন্ধু-যুগের শক্তি-সাধনায়– ওই বসুমাতা বা শাকম্ভরীর উপাসনায়– এই পুরুষতত্ত্বের তাৎপর্য কী হতে পারে?

এক্ষেত্রে পরবর্তী কালের ভারতবর্ষীয় শাক্ত ধর্ম এই প্রশ্নের উপর কী ধরনের আলোকপাত করে তা খুঁজতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী থেকে

প্রথমে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যাংশের উদ্ধৃতি টানেন-

‘তন্ত্রের শাক্ত সাধকগণ বলেন যে, শিব তো স্থাণু-সদৃশ একটা বিদ্যমানতার দ্যোতকমাত্র, তাঁহার উপাসনা করি কোন্ হিসাবে। শক্তি না থাকিলে শিব তো শব, অথচ শক্তি-শূন্যে শিব হইতেই পারেন না। অতএব শিব আছেন, মাথার উপর থাকুন, আমরা মায়ের– আদ্যাশক্তির– উপাসনা করিব। কারণ, তিনিই তো সব– তিনি মেধা, তিনি মায়া, তিনি লজ্জা, তিনি ক্ষমা, তিনি বুদ্ধি, তিনি ধৃতি, তিনি বিদ্যা, তিনি ছাড়া, তিনি শান্তি, তিনি ক্ষান্তি– তাঁহাকে পূজা করিব না তো কাহার পূজা করিব?’

অতঃপর দেবীপ্রসাদ বলেন- ‘অতএব দেখা যায়, উত্তরকালের শাক্ত-তত্ত্ব ঐকান্তিক অর্থে মাতৃপ্রধান হলেও তার মধ্যে শিব বা পুরুষতত্ত্বের যে কোনো-ভাবেই হোক না কেন একটা স্থান থেকে গিয়েছে। শক্তিই প্রধান, শক্তিই মূলতত্ত্ব, তবুও অন্তত গৌণ অর্থে শিব বা পুরুষ-তত্ত্বও স্বীকৃত হয়েছে। স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে সাংখ্য-দর্শনের কথা মনে পড়ে : প্রকৃতিই প্রধান তবু পুরুষও সত্য- যদিচ এই পুরুষ অপ্রধান এবং উদাসীন মাত্র।... আপাতত মন্তব্য হলো, পরবর্তীকালের শাক্ত-ধর্মকে যদি সিন্ধু-ধর্মেরই রেশ বলে স্বীকার করা হয় তা হলে অনুমান করবার সুযোগ থাকে যে সিন্ধু-যুগের ওই প্রাগৈতিহাসিক শাক্ত-ধর্মের মধ্যেই আলোচ্য বৈশিষ্ট্যের বীজ ছিল- হয়তো তারই মূর্ত নিদর্শন হলো ওই বসুমাতামূলক ধর্মবিশ্বাসের স্মারকগুলির মধ্যে যোনি-মূর্তি ছাড়াও লিঙ্গ-মূর্তি বা শিবলিঙ্গগুলি। অতএব সিন্ধু-ধর্মেও এই শিবলিঙ্গ নির্দেশিত পুরুষ তত্ত্বের স্থান গৌণ– অপ্রধান এবং উদাসীন– বলেই অনুমেয়।’- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৭৮)

যদিও অবশ্যই উত্তরকালের ভারতবর্ষীয় ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসে শক্তি-সাধনা ও শৈব-সাধনার মধ্যে পার্থক্য ও প্রভেদ ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং শৈব-ধর্মে ওই শিব বা পুরুষ-তত্ত্ব স্বভাবতই স্বাতন্ত্র এবং প্রাধান্য লাভ করেছে, কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো সেখানেও ওই আদিম মাতৃতত্ত্বের– শক্তির বা প্রকৃতির– গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়নি। যেমন উদাহরণস্বরূপ, শৈব-সিদ্ধান্ত অনুসারে ‘হর’ বা ‘শিব’ (ঈশ্বর) সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ মাত্র; সৃষ্টির উপাদান-কারণ বলতে ‘মায়া’ বা ‘প্রকৃতি’। এদিক থেকে অনুমান হয়, উত্তরকালের শৈব-সাধনায় শিব বা পুরুষতত্ত্বের উপর যতোখানিই আপেক্ষিক গুরুত্ব আরোপিত হোক না কেন তা থেকে ওই আদিম মাতৃপ্রধান বা প্রকৃতিপ্রধান বিশ্বাসের চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়নি বলে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন। অবশ্যই উত্তরকালের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ওই মাতৃপ্রধান বিশ্বাসের অকৃত্রিম ও প্রকৃষ্টতম পরিচয় শক্তি-সাধনা বা তন্ত্র সাধনাতেই- এই তন্ত্র-সাধনা পরবর্তীকালে যতই জটিল ও পল্লবিত রূপ গ্রহণ করুক না কেন।

এ পর্যায়ে এসে আমাদেরকে একটি আপাত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, সিন্ধু-সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ের আদিম কৃষিভিত্তিক সমাজ অবশ্যই মাতৃপ্রধান। কিন্তু নগর-সভ্যতার সুউন্নত পর্যায়েও সমাজ-ব্যবস্থা মাতৃপ্রধান ছিলো এমনটা বলার উপায় নেই। উন্নততর কৃষিকাজের পর্যায়ে গৃহপালিত পশুর সাহায্যে লাঙল দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার মধ্য

দিয়ে কৃষিকাজে পুরুষের ভূমিকাই প্রধান হয়ে ওঠায় ক্রমশ সমাজ-ব্যবস্থাও পুরুষ প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থায় মাতৃ-প্রাধান্য ক্ষুণ্ন ও পরিবর্তিত হলেও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে মাতৃপ্রাধান্যের সুস্পষ্ট স্মারক রয়ে গেছে। তার সাথে পুরুষবাচক কিছু কিছু সহায়ক উপজীবিকা যুক্ত হয়েছে হয়তো, যদিও তা অপ্রধান। যেহেতু কৃষিভিত্তিক উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাসগুলো বরাবরই মাতৃপ্রাধান্যমূলক, তাই সেটি অক্ষুণ্ন থেকেই হয়তো পরবর্তীকালে সেখানে প্রকৃতির সমরূপী প্রজননমূলক জাদুবিশ্বাস হিসেবে আচার-বিশ্বাসে প্রতীকি লিঙ্গ-সাধনার বিষয়টি কালক্রমে ঢুকে গেছে। তারপরও তার অপ্রাধান্যের কারণেই হয়তোবা সেই সিন্ধুবাসীদেরকে পরবর্তীকালের আধিপত্যবাদী আর্য-প্রচারকরা ঋগ্বেদে শিশ্নদেব বলে বিদ্রুপ ও নিন্দা করেছেন। তবে ওই সুপ্রাচীন মাতৃপ্রধান বা প্রকৃতিপ্রধান ধর্ম-বিশ্বাসের সুস্পষ্ট দার্শনিক পরিণতি প্রাচীন সাংখ্য-দর্শনে ঘটেছিলো বলেই অনুমান হয়। এবং যেহেতু ওই প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস অনুসারে আদি-মাতৃকা বলতে বসুমাতা বা পৃথিবী, সেই কারণেই এ-তত্ত্বের দার্শনিক পরিণতি হিসেবে সাংখ্যদর্শনেও সৃষ্টির আদি কারণ বলতে জড়-রূপা প্রকৃতি বা প্রধান বা মায়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'পুরুষ'-তত্ত্ব পরিচয় পাওয়া যায় এই দর্শনে। সাংখ্য-দর্শনের আদি-অকৃত্রিম রূপটির মধ্যে ওই 'পুরুষ'-তত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য হলো, সাংখ্যর পুরুষ 'অপ্রধান' ও 'উদাসীন' বলেই প্রখ্যাত– উত্তরকালের শাক্ত-সাধকদের কাছে যেমন শক্তিই প্রধান, যদিও 'শিব আছে, মাথায় থাকুন–কিন্তু শক্তি-শূন্য শিব তো শবের মতোই'।

তবে এ-প্রসঙ্গে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, পুরুষ-প্রধান বৈদিক ঐহিহ্যের দার্শনিক পরিণতির ক্ষেত্রে তথা উপনিষদের চিন্তাধারায় পুরুষই চরম তত্ত্ব, শেষ সত্য। যেমন কঠ-উপনিষদে বলা হয়েছে-

'মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।।' (কঠোপনিষদ-১/৩/১১)
অর্থাৎ : 'মহৎ'-এর চেয়ে 'অব্যক্ত' ('প্রকৃতি') শ্রেষ্ঠ, অব্যক্তের চেয়ে 'পুরুষ' শ্রেষ্ঠ। পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নয়। তিনিই শেষ, তিনিই পরা গতি অর্থাৎ চূড়ান্ত পরিণতি।

ঋগ্বেদের 'পুরুষ-সূক্তে' এই চিন্তাধারার সূত্রপাত মনে করা হয় এবং ঔপনিষদিক দর্শনে তার চূড়ান্ত পরিণতি। স্বভাবতই বৈদিক চিন্তাবিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে 'পুরুষ' শব্দের অর্থ অপরিবর্তিত নয়। যেমন ছান্দোগ্য-উপনিষদে দেখা যায় এই 'পুরুষ' এক জ্যোতির্ময় 'অ-মানব' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন-

'মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাৎ আদিত্যম্ আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোহমানবঃ স এনান্-ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি।' (ছান্দোগ্য-৫/১০/২)
অর্থাৎ :
তাঁরা (যারা মৃত্যুর পর অর্চিলোক প্রাপ্ত হন) সেখান (অর্চি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণের ছয় মাস) থেকে সংবৎসরে, সংবৎসর থেকে আদিত্যে, আদিত্য থেকে চন্দ্রে এবং চন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ-লোক প্রাপ্ত হন। সেই স্থানে [ব্রহ্মলোক থেকে] এক 'অমানব-পুরুষ' এসে তাদের

ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায়। এই পথই দেবযান অর্থাৎ দেবলোকের পথ।
এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায়, এই অমৃতময় 'পুরুষ' চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মার সঙ্গে অভিন্ন-

'অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্যাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি মধু। যশ্চায়ম্ অস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মা, ইদং অমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ।' (বৃহদারণ্যক-২/৫/১৪)
অর্থাৎ :
এই আত্মা অর্থাৎ দেহ যাবতীয় বস্তুর মধু। যাবতীয় বস্তুও এই দেহের কাছে মধুস্বরূপ। এই দেহে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ আছেন আর দেহ মধ্যে যে জীবাত্মারূপী তেজোময় অমৃতময় অধ্যাত্ম পুরুষ আছেন- দুই-ই এক। ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম। ইনিই সব কিছু।

কিন্তু এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ওই পরব্রহ্ম বা পরমতত্ত্বকে বোঝাবার উদ্দেশ্যেও প্রাচীন 'পুরুষ' শব্দটি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা সম্ভব হয়নি। এবং উপনিষদের স্থান-বিশেষে এমন ইঙ্গিত থেকে গিয়েছে যা থেকে অনুমান হয় এই অমূর্ত দার্শনিক তত্ত্বটির নিচে একান্ত মূর্ত ও মানবাত্মক অর্থ ঢাকা পড়ে আছে। যেমন, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লক্ষ্যণীয়-

'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।।'-(শ্বেতাশ্বতর-৪/৫)
অর্থাৎ :
প্রকৃতি নিজের মতোই অনেক জীব সৃষ্টি করে। তারা কেউ বা লাল, কেউ বা সাদা আবার কেউ বা কালো। একজন অজ্ঞান জীব এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তা ভোগ করে। কিন্তু আরেকজন বুদ্ধিমান এবং বিচারশীল ব্যক্তি পূর্ব পূর্ব অভিজ্ঞতার দরুন তিনি বুঝেছেন যে এই স্থূল জগৎ অজ্ঞান-অবিদ্যারূপী ক্ষণস্থায়ী; সেই কারণেই তিনি এই জগৎকে ত্যাগ করেন।

তাই দেবীপ্রসাদ বলেন- 'স্বভাবতই উপনিষদের চিন্তাধারায় চিন্ময় ব্রহ্ম অর্থে পুরুষ-তত্ত্বের উপর এ-জাতীয় ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপণের ফলে জড়রূপা প্রকৃতি বা মায়া, অজ্ঞান বা অবিদ্যা-বোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই মায়া-নিবৃত্তিই উপনিষদে পরম-পুরুষার্থ বলে ঘোষিত। অতএব অত্যন্ত সুপ্রাচীন কালেই– উপনিষদের যুগেই– ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট মতাদর্শগত সংঘাত পরিলক্ষিত হয় : একদিকে আদিম মাতৃপ্রধান বিশ্বাসের দার্শনিক পরিণতি হিসেবে জড়রূপা প্রকৃতি বা মায়াকে প্রধান বলে গ্রহণ করবার পরিচয়, অপর দিকে আদিম পুরুষপ্রধান বিশ্বাসের দার্শনিক পরিণতি হিসেবে প্রকৃতি বা মায়াকে অবিদ্যা বা মিথ্যা বলে উপেক্ষা করে চিন্ময় পুরুষ বা ব্রহ্মকেই পরম-সত্তা বা পরম-তত্ত্ব বলে গ্রহণ করবার পরিচয়।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৭৯)

পরবর্তীকালের দার্শনিক আলোচনায় ব্রহ্মবাদী বেদান্ত-দর্শন ও প্রাচীন সাংখ্য-দর্শনের মধ্যকার দার্শনিক সংঘাতের তাৎপর্যটাও যে এখানেই লুকায়িত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বেদান্তদর্শনের সূত্রগ্রন্থ 'ব্রহ্মসূত্রে' বিরাট অংশ জুড়ে সাংখ্য-খণ্ডনের আয়োজন এ-কারণেই। এছাড়া প্রাচীন নিরীশ্বর সাংখ্যকে সেশ্বরে রূপান্তরের প্রয়াস এবং সমান্তর দর্শন হিসেবে সেশ্বর-সাংখ্য হিসেবে পরিচিত যোগ-দর্শনের জন্ম-বৃত্তান্তও খুব সম্ভবত এখানেই জড়িয়ে আছে। এ-প্রেক্ষিতে সিন্ধু-ধর্মের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ আবশ্যক।

'সীলের উপর অঙ্কিত যে-মূর্তিকে মার্শাল পৌরাণিক শিব বলে সনাক্ত করতে চেয়েছেন সেটি প্রকৃত শিব-মূর্তি হোক আর নাই হোক তার আসন-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য অবশ্যই লক্ষণীয়। কেননা পরবর্তী কালের ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে এরই নাম যোগাসন– যোগ-সাধনার আসন-ভঙ্গি। বস্তুত মার্শাল নিজেও এই আসন-ভঙ্গিকে যোগাসন বলেই সনাক্ত করেছেন। তাঁর যুক্তি হলো, পুরাণের শিব 'যোগী' অতএব আলোচ্য মূর্তির ওই যোগাসন থেকেও তাকে শিবমূর্তি বলেই গ্রহণ করতে হবে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, সিন্ধু সভ্যতার অন্যান্য সীল এবং কোনো কোনো ভগ্ন প্রস্তরমূর্তিতে এই আসন ভঙ্গিরই পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব এই মূর্ত প্রমাণগুলির দিক থেকে আমরা অনুমান করতে বাধ্য, যে সিন্ধু যুগেও 'যোগ'-সাধনা প্রচলিত ছিল, কিংবা উত্তরকালে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'যোগ' সিন্ধু-ধর্মের মধ্যেই তার সুস্পষ্ট সূত্রপাত দেখা যায়।
কিন্তু সিন্ধু-ধর্মে যোগ-সাধনর নিদর্শক হিসেবে শুধুমাত্র এগুলির উপরই নির্ভর করবার প্রয়োজন নেই। বস্তুত এগুলি আবিষ্কৃত হবার অনেক আগেই রমাপ্রসাদ চন্দ মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত দু'টি প্রস্তরমূর্তির বিশেষত চোখের ভঙ্গি থেকে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্যে যোগী-মূর্তি রচনার যে-বিশিষ্ট রীতি দেখা যায় তার সঙ্গে মহেঞ্জোদারোর ওই প্রস্তরমূর্তিগুলির অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৭৯-৮০)

কী সেই সাদৃশ্য? রমাপ্রসাদ চন্দ বলছেন (সূত্র: ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৮০)-
'The only part of the statuettes that is in fair state of preservation, the bust, is characterized by a stiff erect posture of the head, the neck and the chest, and half-shut eyes looking fixedly at the tip of the nose. This posture is not met with in the figure sculptures, whether pre-historic or historic, of any people outside India; but it is very conspicuous in the images worshipped by all Indian sects including the Jainas and the Buddhists, and is known as the posture of the `yogin' or one engaged in practicing concentration.'

অতএব সিন্ধু-ধর্মে যোগ-সাধনার পরিচয় উপেক্ষা করা যায় না। অবশ্যই পরবর্তীকালে এই

সাধন-পদ্ধতি অত্যন্ত পল্লবিত রূপ গ্রহণ করেছে এবং পরবর্তীকালে 'যোগ' নামের একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক সম্প্রদায়েরও পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সিন্ধু-যুগে যোগ-সাধনা কতখানি পল্লবিত ও জটিল রূপ গ্রহণ করেছিলো এবং 'যোগ' নামের কোনো দার্শনিক সম্প্রদায় একান্তই গড়ে উঠেছিলো কিনা সে-কথা প্রত্নতত্ত্বমূলক গবেষণার বর্তমান পর্যায়ে– বিশেষত সিন্ধু-লিপির পাঠোদ্ধারের পূর্বে– আমাদের পক্ষে জানতে পারা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু- 'একটি কথা অবশ্যই অবধারিতভাবে প্রমাণ হয় : উত্তরকালে এই যোগের রূপ ও রূপান্তর যেমনই হোক না কেন, একে যেভাবে শ্রুতিমূলক বা বেদমূলক বলে দাবি করা হয়েছে তা ঐতিহাসিকভাবে একান্তই অবাস্তব; কেননা বাস্তব ঘটনা হলো শ্রুতি– এমনকি ঋগ্বেদ-সংহিতা– রচিত হবার সহস্রাধিক বছর পূর্বেই এবং আর্য-পূর্বদের মধ্যেই এই সাধন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বৈদিক ঐহিহ্যের বাহকেরা যে-অর্থেই এবং যে-কোনো কারণেই এই সাধন-পদ্ধতিকে স্বীকার এবং গ্রহণ করুন না কেন, একে প্রকৃতপক্ষে শ্রুতিমূলক বা বেদমূলক বলে কল্পনা করবার কোনো রকম সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।'- (দেবীপ্রসাদ/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৮১)

যোগ যে আদিতে কোনো-এক অ-বৈদিক বা বেদ-বহির্ভূত সাধন-পদ্ধতি ছিলো– বিশেষ করে মহেঞ্জোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারের পর– বিদ্বান ও পণ্ডিতদের মধ্যে খুব একটা দ্বিমত নেই। ওই অ-বৈদিক সাধন-পদ্ধতির ইতিহাস যে কতো প্রাচীন এ-বিষয়েও সংশয় নেই। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতা যে বৈদিক আর্যদের আক্রমণেই বিধ্বস্ত হয়েছিলো- একথা অনুমিত হবার পর আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে বৈদিক সাহিত্যের কয়েকটি সাক্ষ্য বিষয়ে নতুন করে বিচার করবার প্রয়োজন হয়েছে। যেমন, কৌষীতকি উপনিষদে প্রতর্দনের প্রতি ইন্দ্র যখন আস্ফালন করে বলছেন-

'ত্রিশীর্ষাণাং ত্বাষ্ট্রম্ অহনম্ । অরুণ্মুখান্ যতীন্ সালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছং। বহ্বীঃ সন্ধা অতিক্রম্য দিবি প্রহ্লাদীয়ান্ অতৃণম্ অহম্ অন্তরীক্ষে পৌলোমান্, পৃথিব্যাং কালখাঞ্জান্ । তস্য মে তত্র ন লোম চ মা মীয়তে।'- (কৌষীতকি-৩/১)

অর্থাৎ :

আমি ত্রিশীর্ষ ত্বষ্টপুত্রকে হত্যা করেছি; আমি অরুণ্মুখ যতিদেরকে সালাবৃকের অর্থাৎ নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছি। অনেক সন্ধিকে লঙ্ঘন করে আমিই স্বর্গে প্রহ্লাদের অসুরদলের অসুরদের, অন্তরীক্ষে পুলোমার আর পৃথিবীতে কালখঞ্জের অনুচরদের নিধন করেছি। এত বিশাল বিশাল কাজ করেও আমার একটা কেশও কারো নষ্ট করার সাধ্য হয়নি।

এখানে ত্রিশীর্ষ বিশেষণটি চিত্তাকর্ষক, কেননা সিন্ধু-সভ্যতার যে-মূর্তিটিকে মার্শাল যোগী-শিব বলে সনাক্ত করতে চেয়েছেন সেটিও সম্ভবত ত্রিশীর্ষ এবং সিন্ধু-সভ্যতার অন্যান্য সীলেও তিনটি শিংযুক্ত মূর্তি পাওয়া গেছে বলে দেবীপ্রসাদের ভাষ্য। যদিও এই ত্রিশীর্ষ বিষয়ক উপনিষদীয় উদ্ধৃতির প্রকৃত পৌরাণিক ব্যাখ্যা বহুলাংশেই বিতর্কসাপেক্ষ। কেননা, পৌরাণিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী ত্বষ্টা মানে বিশ্বকর্মা এবং ত্রিশীর্ষ ত্বষ্টাপুত্র হলো বিশ্বরূপ। কিন্তু ইন্দ্রের

উপরিউক্ত উক্তির মধ্যে আরও চিত্তাকর্ষক বক্তব্য হলো, আমি অরুণ্মুখ যতিদেরকে সালাবৃকের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছি। সালাবৃক মানে নেকড়ে বা হায়না, অরুণ্মুখ মানে বেদনার্ত-মুখ হওয়া সম্ভব।

কিন্তু 'যতি' মানে কী? এর সাধারণ অর্থ করা হয় তপস্বী। তবে মুণ্ডক-উপনিষদ এবং গীতার উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এই যতিরা প্রকৃত যোগ-সাধকই ছিলো। কেননা এই গ্রন্থগুলিতে যোগ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যতিদের সুস্পষ্টভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। যোগসূত্র অনুসারে যোগ-এর আটটি অঙ্গ-

'যমনিয়মাসন-প্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি'- (যোগসূত্র : ২/২৯)
অর্থাৎ : যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি- এই আটটি হলো যোগের অঙ্গ।

মুণ্ডক উপনিষদে যতিদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে।।'- (মুণ্ডক-৩/২/৬)
'সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্ ।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।। (মুণ্ডক-৩/১/৫)
অর্থাৎ :
যাঁরা বেদান্তশাস্ত্রের মর্মার্থ জেনেছেন, সন্ন্যাস ও যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে যেসব যতির চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, তাঁরা এই জীবনেই আত্মাকে উপলব্ধি করেন এবং মৃত্যুকালে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন (মুণ্ডক-৩/২/৬)। কায়মনোবাক্যে সত্যের অনুসরণ ও ব্রহ্মচর্য অভ্যাসের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করতে হয়। দেহের মধ্যে সেই জ্যোতির্ময় পরমাত্মার উপলব্ধির মাধ্যমে যতিরা শুদ্ধ ও অনাসক্ত হয় (মুণ্ডক-৩/১/৫)।

আর গীতায় বলা হয়েছে যতিরা 'প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ', তারা কাম-ক্রোধ-বিযুক্ত ও সংযতচিত্ত, তারা যোগ-ধারণাসম্পন্ন। যেমন-

'দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাহপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।।' (ভগবদ্গীতা-৪/২৮)
'অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাহপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।।' (ভগবদ্গীতা-৪/২৯)
'কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ।।' (ভগবদ্গীতা-৫/২৬)
অর্থাৎ :
যতিরা ত্যাগ, তপস্যা, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ও স্বাধ্যায় ইত্যাদি যোগরূপ সাধনা করেন (গীতা-৪/২৮)। তাঁরা প্রাণ ও অপান বায়ুর দ্বারা গ্রহণ, আহুতি ও রুদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে পূরক, রেচক ও কুম্ভকরূপ প্রাণায়াম-পরায়ণ যোগ-সাধক (গীতা-৪/২৯)। কাম-ক্রোধ-বিযুক্ত ও সংযতচিত্ত যতিগণ জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পরে উভয়ত ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করেন

(গীতা-৫/২৬)।

অতএব এসব উদাহরণ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, যতিরা যোগ-সাধক। যোগ-সাধনার প্রধান লক্ষণগুলি যতিদের মধ্যে দেখা যায়। তাহলে তাদের প্রতি ইন্দ্রের ওই আক্রোশ কেন? এখানে উল্লেখ্য, ইন্দ্র যে যতিদেরকে হায়নার মুখে সমর্পণ করেছিলেন তার স্মৃতি শুধুমাত্র কৌষীতকি উপনিষদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়; তৈত্তিরীয় সংহিতা (তৈঃ সঃ-৩/৩/৭/৩, ২/৫/১/১), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (ঐঃ ব্রাঃ-৭/২৮), শতপথ ব্রাহ্মণ (শঃ ব্রাঃ-১/২/৩/২, ১২/৭/১/১), পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (পঃ ব্রাঃ-১৪/১১/২৮) এবং জৈমিনীয় ব্রাহ্মণেও (জৈঃ ব্রাঃ-১/১৮৫-৬) বারবার একই কথা পাওয়া যায়– ইন্দ্র যতিদের সালাবৃকের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া যতিরা যে অত্যন্ত প্রাচীন কালের যোগ-সাধক ছিলো– ঋগ্বেদে তাদের উল্লেখ থেকে এ-কথা সহজেই অনুমতি হয়। যেমন-

‘তৎ তভ্যামি সুবীর্য্যম তদ্ ব্রহ্ম পূর্বচিত্তয়ে।
য ন যতিভ্যঃ ভর্গবে ধনে হিত য ন প্রষ্কণ্বমাভিতঃ।।’- (ঋগ্বেদ-৮/৩/৯)
অর্থাৎ : হে বীর্যবান ইন্দ্র, তোমার নিকট পূর্ব-যুগের প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের অপেক্ষা অধিক অন্ন যাঞ্চা করছি। যতিদের নিকট থেকে ভৃগুদের ধন প্রদান করে তার দ্বারা কণ্বের পুত্রকে রক্ষা কর।

টীকাকার সায়ণের ব্যাখ্যা অনুসারে ‘যতি’র অর্থ হলো, কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন যজ্ঞবিহীন জনগণ। তৈত্তিরীয় সংহিতা থেকে কৌষীতকি উপনিষদ পর্যন্ত যতিদের প্রতি ইন্দ্রের যে বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হতে পারে না। কিন্তু যতিদের প্রতি ইন্দ্রের এই নিষ্ঠুরতা কেন? ১৯২৯ সালেই শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এই প্রশ্নের একটি উত্তর দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালের প্রত্নতত্ত্বমূলক আবিষ্কারের আলোয় সে-উত্তরের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে বলেই অনুমিত হয়। শ্রীযুক্ত চন্দের বক্তব্যটি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত তর্জমাসহ (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৮২-৩) উদ্ধৃত করা যেতে পারে-

‘The only possible answer to this question is, that yatis were not originally priests of the Vadic cult like the Bhrigus and the Kanvas, but of non-Vedic rites practiced by the indigenous pre-Aryan population of the Indus Valley, in the legend of the slaughter of the Yatis by Indra we probably hear an echo of the conflict between the native priesthood and the intruding Rishis in the proto-historic period. If this interpretation of the legend is correct, it may be asked, what was the religious or magico-religious practice of the Yatis? In classical Sanskrit Yati denotes an ascetic. The term is derived from the root `yat’, to strive, to exert oneself, and is also connected with the root `Yam’, to restrain, to subdue, to control. As Applied to a priest, etymologically

Yati can only mean a person engaged in religious exercise such as `tapas', austerities, and `yoga'.... The marble statuettes of Mohenjo-daro with head, neck and body quite erect and half shut eyes fixed on the tip of the nose has the exact posture of one engaged in practicing Yoga. I therefore propose to recognize in these statuettes the image of the Yatis of the proto-historic and pre-historic Indus Valley intended either for worship or as votive offering. Like the Rishis of the pre-Regvedic and early Regvedic period, these Yatis, who practiced Yoga were also primarily magicians.'
অর্থাৎ :
সংক্ষেপে, বৈদিক সাহিত্যে যতিদের প্রতি যে ইন্দ্র-আক্রোশের পরিচয় পাওয়া যায় তার একমাত্র ব্যাখ্যা হলো, যতিরা বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের অনুগামী ছিল না; তারা সিন্ধু-উপত্যকার স্থানীয় আর্য-পূর্ব জনসাধারণের অ-বৈদিক ধর্মানুষ্ঠান পালন করত। ইন্দ্রের যতি-হত্যা কাহিনীতে সম্ভবত ইতিহাস-আভাসিত যুগে স্থানীয় পুরোহিতশ্রেণীর সঙ্গে আগন্তুক ঋষিদের সংঘর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনীটির এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হলে প্রশ্ন উঠবে, যতিদের ধর্মানুষ্ঠান বা যাদু অনুষ্ঠানমূলক আচরণের প্রকৃতি কী ছিল? ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে যতি শব্দের অর্থ হল তপস্বী।... পুরোহিত-বোধক হিসেবে যতি শব্দের একমাত্র তাৎপর্য হলো তপস্যা এবং যোগমূলক ধর্মানুষ্ঠানে নিরত মানুষ।... মহেঞ্জোদারোর মর্মর-মূর্তিতে যোগাসনের নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায়, মাথা, গলা ও দেহের কঠিন ঋজুভাব, অর্ধনিমীলিত চোখ নাসিকাগ্রের উপর নিবদ্ধ। অতএব এই মূর্তিকে সিন্ধু-উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক এবং ইতিহাস-আভাসিত যুগের যতির মূর্তি বলে সনাক্ত করতে পারি।... ঋগ্বেদ-পূর্ব এবং ঋগ্বেদ সূচনা যুগে বৈদিক ঋষিদের মতোই ওই যোগী যতিরাও প্রধানতই ম্যাজিসিয়ান বা জাদুকর ছিল।...

'যোগ এবং যোগীদের বিরুদ্ধে বৈদিক ঋষিদের ওই প্রাচীন বিরূপতা সত্ত্বেও কালক্রমে কীভাবে এবং কেন বৈদিক ঐতিহ্যেই যোগ-সাধনার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল- এ প্রশ্ন অবশ্যই জটিল। কিন্তু আপাতত মন্তব্য হলো, সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যোগ-সাধনার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই সভ্যতা আর্য-আক্রমণেই বিধ্বস্ত হয়েছে; অতএব বৈদিক ঋষিদের রচনায় সিন্ধু-সভ্যতার যোগীদের বিরুদ্ধে আক্রোশের পরিচয় থাকাই স্বাভাবিক। অপরপক্ষে, যতি বলতে প্রাচীনকালের যোগসাধক বোঝাতো এবং বৈদিক সাহিত্যে বারবার এই উপাখ্যানই পাওয়া যায় যে ইন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাঁদের হত্যা করেছিলেন। অতএব এ-ক্ষেত্রেও প্রত্নতত্ত্বমূলক এং সাহিত্যমূলক সাক্ষ্যের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজতে হলে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের ওই পুরানো অনুমানটিকে স্বীকার করতে হয়। এবং এই দিক থেকে প্রাচীন সিন্ধু-ধর্মের সঙ্গে বৈদিক-ধর্মের সংঘাত চিত্রটিও পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। কেননা, সিন্ধু-ধর্মের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বলতে মাতৃ-উপাসনা, লিঙ্গ-উপাসনা এবং যোগ-সাধনা। অপর পক্ষে বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, ইন্দ্র প্রাচীন পূজনীয়া মাতৃদেবীকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত

করেছেন, শিশ্ন-দেবদের শতদ্বার-বিশিষ্ট নগর লুণ্ঠন করেছেন এবং যতি বা যোগীদের নেকড়ের মুখে সমর্পণ করেছেন। বৈদিক মানুষেরা সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংস করে থাকে তা হলে তাদের সাহিত্যে সিন্ধু-ধর্মের বিরুদ্ধে এ-জাতীয় আক্রোশের পরিচয় থাকাই স্বাভাবিক।'- (দেবীপ্রসাদ/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৮৩)

অতএব, কৃষিজীবীদের যে-উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাস থেকে এই সুপ্রাচীন আর্য-পূর্ব সিন্ধু-ধর্মবিশ্বাসে বসুমাতা-উপাসনা এবং শিশ্ন-উপাসনার উদ্ভব হয়েছিলো তারই মধ্যে যোগ-সাধনার আদি এবং আদিম রূপটির সূত্র অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এবং সিন্ধু-ধর্মের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য পরস্পর-নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র নয়, যদিও পরবর্তীকালে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সিন্ধু-ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গ বহুলাংশেই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করে উত্তরকালে শক্তি-সাধনা, শৈব-সাধনা এবং যোগ-সাধনায় পরিণত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষীয় তথা এতদঞ্চলের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগুলির প্রভাব যে কতো ব্যাপক ও গভীর তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। আর্য-আক্রমণের ফলে ওই প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা বিধ্বস্ত হলেও ভারতবর্ষীয় ধর্মবিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্র থেকে তার প্রভাব বিলুপ্ত হয়নি। বিলুপ্ত যে হয়নি তা মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের বক্তব্য থেকেও তার আভাস মেলে-

'An enquir into the ancient cultures would show that the cult of `Sakti' is very old in India as in other parts of the world. And it is quite possible that it existed along with Saiva and Pasupata cults in the days of the pre-historic Indus-Valley civilization.'—
`The cult of `Sakti' produced a profound influence on general Indian thought. A topographical surveyof India would show that the country is scattered over with numerous centers of `Sakti-sadhana'. It was widespread in the past and has continued unbroken till today.'
অর্থাৎ :
প্রাচীন সংস্কৃতি সংক্রান্ত অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায়, শাক্ত পূজা-পদ্ধতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সুপ্রাচীন। খুব সম্ভব, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতাতে শৈব ও পাশুপত পূজাপদ্ধতির পাশাপাশি এই শাক্ত পূজাপদ্ধতিও বর্তমান ছিলো।
...
শাক্ত-পূজাপদ্ধতি সামগ্রিকভাবে ভারতীয় চিন্তাধারার উপর অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। স্থানবিবরণের দিক থেকে ভারতবর্ষের আলোচনা করলে দেখা যায়, দেশের উপর অসংখ্য শক্তিসাধনার কেন্দ্র ছড়ানো রয়েছে। অতীতে এই শাক্ত-ধর্ম অত্যন্ত প্রবল ছিলো এবং আজকের দিন পর্যন্ত তা অবিচ্ছেদ্যভাবেই চলে আসছে। (সূত্র: লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৩৮২)

আর যেহেতু ভারতীয় দর্শনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো যে, তা সব সময় সাধন-পদ্ধতি ও ধর্মবিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেনি, তাই এতদঞ্চলের দর্শন-চর্চা ও ধর্ম-সাধনাও অনেকাংশেই একাকার হয়ে থেকেছে। ফলে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষীয় ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সিন্ধু-ধর্মের প্রভাব যদি সত্যিই ব্যাপক ও গভীর হয় তাহলে উত্তরকালের দর্শন-চর্চাও যে সম্পূর্ণভাবে সিন্ধু-যুগের প্রভাব-নিরপেক্ষ হয়েছিলো, অন্তত সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার না-হওয়া পর্যন্ত এমন কথা কল্পনা করার সঙ্গত কোনো কারণ নেই বলেই মনে হয়।

২.৮ : সিন্ধু-সভ্যতার পতন

পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, বিভিন্ন কারণে কোন এক অঞ্চলে গড়ে ওঠা সভ্যতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্ট হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে গৌরবের চূঁড়ায় উঠে অতঃপর কোন-না-কোন সংকটে পতিত হয়ে আত্মরক্ষার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে একসময় কালের আয়না থেকে হারিয়ে গিয়ে প্রত্নতত্ত্ব আর ইতিহাসের বিষয়ে পরিণত হয়। হয়তো বা সিন্ধু-সভ্যতার পতনও ঘটেছে এই অবধারিত নিয়মে। কিন্তু প্রয়োজনীয় লিখিত উপাদান ও ঐতিহাসিক দলিলের অভাব থাকায় সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।

কারো কারো মতে ভূ-পৃষ্ঠ ও জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায় সিন্ধু অঞ্চলের মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। সিন্ধু নদের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এ অঞ্চলের অনেকাংশে মরুভূমির প্রভাব পড়ায় ধীরে ধীরে মাটি চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এর ফলে এ সভ্যতা আর আগের মতো শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি। মর্টিমার হুইলারের মতে, সভ্যতার শুরুতে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত ও বনাঞ্চলের যে চিত্র ছিলো তা শেষ দিকে ছিলো প্রায় অনুপস্থিত। এতে কৃষি-ব্যবস্থার পাশাপাশি বন্দর হিসেবে মহেঞ্জোদারো নগরীর গুরুত্ব হ্রাস পায়। ড. হুইলার মনে করেন সিন্ধু সভ্যতার পতনের বেশ আগে থেকেই এর পতনের আভাস পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালের মহেঞ্জোদারো নগরীকে তিনি পূর্বের মহেঞ্জোদারোর 'ছায়ামাত্র' বলে অভিহিত করেন।
তাঁর এই মতের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দের মধ্যেই এ সভ্যতার অবক্ষয় শুরু হয়। তার প্রভাবে সিন্ধু-সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ও পৌর-ব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়ে। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও অন্যান্য নগরের জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃহৎ অট্টালিকার বদলে পুরনো ইটের বাড়ি তৈরি হয়। এমনকি ঘর-বাড়িগুলি রাজপথের উপরে এসে পড়ে এবং একটি বিশৃঙ্খল শহরে পরিণত হয়। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার পতনে এ যুক্তিটি খুব বেশি গ্রহণযোগ্য হয়নি।

কেউ কেউ মনে করেন সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসের পেছনে ভূমিকা রেখেছে সিন্ধু নদের ক্রমাগত বন্যা। তাঁদের মতে প্রাকৃতিক কারণে সিন্ধু নদীর জল অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলো। ফলে ক্রমাগত বন্যার আঘাত আছড়ে পড়তো এ সভ্যতায়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা নিশ্চিত যে ২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রলয়ঙ্করী বন্যায় শহর দুটো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহেঞ্জোদারো নগরীতে বেশ কয়েকবার বন্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে তিন স্তরে ভয়াবহ বন্যার প্রমাণ রয়েছে। লোথাল ও চানহুদারো শহরও দু'বার বন্যার কারণে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে কালিবঙ্গান শহরে বন্যার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবুও শহরটিতে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিলো। তাই বন্যা সভ্যতার ধ্বংস করেছে এটি নিশ্চিত হওয়া যায় না। কারণ বন্যা প্রতিরোধ করার অভিজ্ঞতা নিয়েই প্রাচীন সভ্যতার মানুষেরা তাদের সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলো। এক্ষেত্রে কেউ কেউ বন্যার পাশাপাশি প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পকে এ সভ্যতা

ধ্বংসের কারণ মনে করেন। যদিও ভূমিকম্প হওয়ায় এ সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিলো এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার আরেকটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, জীবন জীবিকার প্রয়োজনে সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা যেভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী ধ্বংস করেছে একইভাবে তা উৎপাদনে মনোযোগ দেয়নি। ফলে এককালে প্রচণ্ড খাদ্য-সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু এসবই দুর্বল যুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়।
তবে উপরের কারণগুলির কোন একটি বা একাধিকের সমন্বয়ে এ সভ্যতা যদি ধ্বংস হয়ে থাকে তবে তা ঘটেছিলো একেবারে সভ্যতার চূড়ান্তে এসে। তাৎক্ষণিকভাবে এ কারণগুলি প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করার যুক্তি নেই। অর্থাৎ পণ্ডিতদের মতে দীর্ঘদিন ধরে সিন্ধু সভ্যতার পতনের সূত্রপাত হিসেবে সভ্যতার বিভিন্ন অঞ্চলে সূক্ষভাবে অবক্ষয় চলে আসছিলো। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর উপরের স্তর পরীক্ষা করে দেখা গেছে নগর পরিকল্পনা থেকে শুরু করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটি ভগ্নদশা চলছিলো। মহেঞ্জোদারোর আয়তনও ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসতে থাকে। আগের মতো সুপরিকল্পিত নগর শেষ দিকে দেখা যায়নি। শেষ দিকের মৃৎপাত্র তৈরিতেও অদক্ষতার ছাপ দেখা যায়। ক্রমে জনসংখ্যার চাপ অনেক বেড়ে যাওয়ায় এবং কৃষিক্ষেত্রে তেমন কোন উন্নয়ন না হওয়ায় জীবন নির্বাহে সংকট বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিদেশের সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিলো শেষ দিকে তাতেও ভাঙন ধরে। এবং এই সংকট-সঙ্কুল অবস্থাতেই বহিঃআক্রমণের মোকাবেলা করতে হয় সিন্ধুবাসীদের।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ বহিরাগতদের দ্বারা সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসের কারণকে সমর্থন করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ মর্টিমার হুইলার সিদ্ধান্ত করেছেন যে উত্তরদিক থেকে আগমনকারী আর্যদের আঘাতেই ধ্বংস হয়েছিলো সিন্ধু-সভ্যতা। তাঁর এই বক্তব্যের প্রধান ভিত্তি সিন্ধু অঞ্চলে পাওয়া কিন্তু প্রত্ননিদর্শন ও বৈদিক সাহিত্যের বক্তব্য। উৎখননের পর দেখা গেছে আক্রমণকারীদের হাত থেকে সম্পদ রক্ষা করার জন্য সিন্ধুবাসীরা সম্ভবত অলঙ্কার ও মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিলো। আবার কোথাও পাওয়া গেছে একসঙ্গে অনেক নরকঙ্কাল। মহেঞ্জোদারোর রাস্তা, সিঁড়ি ও বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু কঙ্কাল পাওয়া গেছে যেগুলির কোন কোনটির মাথার খুলিতে ভারি অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে কঙ্কালগুলিতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিশেষ করে আর্য, অনার্য ও অন্যান্য জাতির লোকের কঙ্কাল প্রাপ্তি থেকে অনেকে মনে করেন সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের একাধিক বহিরাগত শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়েছে। বেলুচিস্তান ও ইরানের কয়েকটি উপজাতীয় লোকের সঙ্গে এসব অস্থি ও কঙ্কালের মিল পাওয়া যায়। আবার বেশ কিছু অস্ত্র ও মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যেগুলো সিন্ধু সভ্যতার মানুষের তৈরি বলে মনে হয়নি। এসব থেকে অনুমান করা হয় প্রাকৃতিক ও আভ্যন্তরীণ সংকটের সঙ্গে বহিরাগত আক্রমণের চূড়ান্ত আঘাত সংযুক্ত হয়েছিলো সিন্ধু সভ্যতার উপর। আর এসবের সম্মিলনেই সিন্ধু সভ্যতার পতন

ঘটেছিলো।

.

আর্য-আক্রমণ ও সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংস :
প্রথমেই স্মর্তব্য যে, সিন্ধু-সভ্যতা ও বৈদিক আর্য-সংস্কৃতির মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদই হলো সিন্ধু-সভ্যতা মূলতই কৃষি-নির্ভর এবং বৈদিক-সংস্কৃতি মূলতই পশুপালন নির্ভর। ইতিহাসবিদদের কিছু কিছু মতবিরোধ সত্ত্বেও সিন্ধু সভ্যতায় আক্রমণকারী বহিরাগতরা যে আর্য জাতিই ছিলো এই যুক্তির পেছনে প্রত্নতত্ত্বমূলক ও প্রাচীন সাহিত্যমূলক নিদর্শন রয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

সিন্ধু-সভ্যতা প্রসঙ্গে গর্ডন চাইল্ড বলেন, এর আদি পর্বের চেয়ে অন্তিম পর্বের কথাই আমাদের কাছে স্পষ্টতর। কেননা প্রত্নতত্ত্বে প্রমাণিত হয়েছে, কোনো এক লিপিহীন প্রাক্-সভ্য মানবদলের আক্রমণেই এ-সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিলো।
কিন্তু এই আক্রমণকারী কারা? এ প্রসঙ্গে ১৯২৬ সালেই শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মন্তব্য করেছিলেন, ঋগ্বেদ থেকেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়– বোঝা যায়, যাঁরা বেদ রচনা করেছিলেন তাঁরাই ধ্বংস করেছিলেন সিন্ধু সভ্যতা।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯২২ সাল থেকে সিন্ধু-উপত্যকার প্রত্নখননের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রত্ন-নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে যাবতীয় তথ্য-প্রমাণসহ তৎকালীন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান স্যার জন মার্শাল প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন ১৯৩১ সালে। ঐ রিপোর্টে এবং পরবর্তীকালে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত চন্দ'র মূল মন্তব্যই সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। শ্রীযুক্ত চন্দ এ-বিষয়ে ঋগ্বেদ থেকে কোন্ ধরনের নজির দেখিয়েছিলেন সংক্ষেপে তা উল্লেখ করা যেতে পারে (সূত্র: দেবীপ্রসাদ/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৫২-৩)-
'ঋগ্বেদের অনেক জায়গায় পুরঃ বা পুর্-এর উল্লেখ দেখা যায়।... একটি ঋকে অয়স্-নির্মিত কোনো শতভূজি বা বিরাট পুরের উল্লেখ আছে। অয়স্ মানে লোহা বা তামা।... স্পষ্টই বোঝা যায় মজবুত বা কঠিন অর্থেই এ সব ক্ষেত্রে অয়স্ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।... ঋগ্বেদে কিন্তু আর্য ঋষি ও উপাসকদের বদলে আর্য শত্রুদের সঙ্গেই পুর-এর সম্পর্ক বারবার চোখে পড়ে। ঋগ্বেদের দু'জন বিখ্যাত রাজা– ভরতদের রাজা দিবোদাস এবং পুরু-দের রাজা পুরুকুৎস– পুর-অধিবাসী শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে নিরত। দিবোদাস ছিলেন... সুবিখ্যাত সুদাস-এর পিতামহ। পরুষ্ণী বা রাবী নদীর পশ্চিম তীরে সুদাস দশটি ট্রাইবকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ভক্ত দিবোদাসের হয়ে ইন্দ্র 'অশ্মনময়ী' শত পুর ধ্বংস করেছিলেন।... আধুনিক বিদ্বানেরা পুর বলতে সাময়িক আশ্রয়স্থল বুঝেছেন।... কিন্তু পুর শব্দের অর্থ হলো নগর বা শহর, কেল্লা নয়। কেল্লার সংস্কৃত প্রতিশব্দ হলো দুর্গ এবং ঋগ্বেদেই তার উল্লেখ পাওয়া যায়।... একটি ঋকে পুর এবং দুর্গ শব্দ পাশাপাশি উল্লিখিত হয়েছে।... ঋগ্বেদের যুগে

কোথাও কোনো নগরের চিহ্নই ছিল না– এ-জাতীয় সংস্কার থেকে মুক্ত হলে উক্ত ঋকে শহর এবং কেল্লা উভয়েরই পরিচয় আমাদের চোখে পড়বে। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোতে নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হবার পর আজ আর এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না যে ঋগ্বেদের আর্যরা বিপক্ষের নগর ও শহরের সঙ্গে পরিচিত ছিল।... এককালে ইন্দ্র-উপাসক আর্যরা সত্যিই এ-দেশের সুসভ্য অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, সেই স্থানীয় মানুষেরা নগরে বাস করতো এবং সুরক্ষিত স্থানের আশ্রয় যুদ্ধ করত– এই ঘটনাটি সত্য এবং জনস্মৃতিতে এর স্মৃতি বহুদিন টিকে থেকেছে। তা হলে, আর্যদের ওই শত্রু বলতে কারা? ঋগ্বেদে কি তাদের সম্বন্ধে আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায়? আমার মনে হয়, সিন্ধু-উপত্যকায় আর্যরা এই যে স্থানীয় নগরবাসীদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিল, ঋগ্বেদের সমস্ত মণ্ডলেই তাদের নাম দেওয়া হয়েছে পণি।... পণি শব্দটি স্পষ্টই পণ বা মূল্য থেকে এসেছে। ... ঋগ্বেদ-উল্লিখিত পণি বলে মানুষেরা ধনী সওদাগর...এবং ঋগ্বেদের নানা জায়গায় এই পণিদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হয়েছে।... ঋগ্বেদের সূক্তগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, বৈদিক আর্যরা প্রধানত দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : পুরোহিত ও যোদ্ধা। পশুপালনই তাদের প্রধান জীবিকা, প্রধান ধনসম্পদ বলতে গোরু। কৃষিকাজের প্রচলন ছিল সীমাবদ্ধ।... সিন্ধু-উপত্যকায় সুপ্রাচীন কালে ব্যবসা-বাণিজ্যমূলক জীবন গড়ে উঠছিল। ওই পণিরা খুব সম্ভব ছিল সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার শেষ পর্যায়ের প্রতিনিধি, সেই পর্যায়েই তারা আক্রমণকারী আর্যদের সংস্পর্শে আসে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে সিন্ধু উপত্যকায় যে-ঘটনা ঘটেছিল তার সঙ্গে সমসাময়িক ইজিয়ানের ঘটনার তুলনা করা যায়– উত্তর-পশ্চিম দেশ থেকে একের পর এক আর্য ভাষাভাষীর ঢেউ এসে পড়ে। এই আক্রমণকারীদের মধ্যে ঋগ্বেদে যারা নিজেদের আর্য আখ্যা দিয়েছে তারা উপত্যকার দক্ষিণাংশে নগর ও সৌধবাসী এক সুসভ্য মানবদলের সংস্পর্শে আসে– এরা প্রধানতই ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করত। বিজেতা আর্যরা ঐহিক সংস্কৃতির দিক থেকে তুলনায় অনুন্নত ছিল; তারা হয় ঐ নগরগুলি ধ্বংস করেছিল আর নয়তো এগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে দিয়েছিল। ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রকে বলা হয়েছে পুরোহা বা পুরন্দর– পুর-ধ্বংসকারী। ইজিএন্-এর প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার মতোই সিন্ধু-উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতাও আর্য-আক্রমণের আঘাত সহ্য করতে পারেনি।'

পরবর্তীকালে প্রত্নতত্ত্বমূলক আবিষ্কার কীভাবে এ-মন্তব্য সমর্থন করেছে তার কিছু পরিচয় জন মার্শাল, এম এস ভাট, ম্যাকে, মর্টিমার হুইলার, পিগট ও গর্ডন চাইল্ড প্রমুখ প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদদের বক্তব্য থেকে পাওয়া যায়। এ-প্রেক্ষিতে তাঁদের বক্তব্য-বিন্যাসের সহজ সূত্র হিসেবে আমরা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থের (পৃষ্ঠা-৫৪-৫) সহায়তা নিতে পারি।

'হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো উভয় ক্ষেত্রেই নগরগুলির বারবার এবং উপর-উপর গড়ে তোলবার পরিচয় পাওয়া যায়– যেন থাকে থাকে সাজানো হয়েছে। কিন্তু দ্রষ্টব্য হলো, নিচের স্তর থেকে উপরের স্তরের দিকে নগরসভ্যতার কোনো ধারাবাহিক উন্নতির ইতিহাস চোখে

পড়ে না। উভয় ক্ষেত্রে শুরু থেকেই সু-উন্নত ও সুপরিকল্পিত নগর এবং নগরশাসকদের ব্যবস্থা এমনই নিখুঁত যে কোনো স্তরের কোনো বাড়িই রাস্তাঘাটের উপর এতটুকুও এগিয়ে আসেনি। কিন্তু সর্বোচ্চ– অতএব সর্বশেষ– স্তরটিতে তা নয়। হরপ্পার শেষ স্তরে নগরনির্মাণপরিকল্পনায় অবক্ষয়ের সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠেছে : পুরানো স্তরের ইট ব্যবহার করে নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে, কিন্তু তা অত্যন্ত বাজে ধরনের; অথচ তার নিচে– পুরানো স্তরে– সওদাগরের সুপরিসর চমৎকার বাড়ি। বাড়িগুলোও রাস্তার উপর এগিয়ে এসেছে– হরপ্পা-নগরীর গৌরবের দিনে কর্তৃপক্ষ যেমন নিখুঁতভাবে নগর-পরিকল্পনার আইনকানুন কায়েম রাখতো তা আর টিকছে না। পিগট্ দেখাচ্ছেন, মহেঞ্জোদারোর সর্বোচ্চ পর্যায়টিতেও আতঙ্কপূর্ণ অবস্থা এবং অবক্ষয়ের ছবি সুপরিস্ফুট। আতঙ্কিত নগরবাসী ধনদৌলত গয়নাগাঁটি মাটিতে পুঁতে রাখবার আয়োজন করছে, পথঘাটের উপর বাড়িঘর এগিয়ে আসছে, ইটের গাঁথনি আগের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট, বড় বড় ঘরগুলো ভাগ করে নিয়ে এক বাড়িতে অনেকে একসঙ্গে থাকবার আয়োজন করছে, এমনকি সদর রাস্তার উপরেই মৃৎপাত্র পোড়াবার চুল্লি তৈরি হচ্ছে। এবং এ-নগর আক্রান্ত হবার পরিচয়ও অস্পষ্ট নয়– রাস্তায় সিঁড়িতে মুখ থুবড়ে পড়া মানুষের কঙ্কাল তার সাক্ষ্য। এমনই দুর্দিনে তারা খুন হয়েছিল যখন বাকি মানুষ প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত– মৃতের সৎকার করবে কে?’

নগরগুলি শেষ পর্যন্ত অধিকার করলো কারা? তারা যে লিপি-হীন প্রাক্-সভ্য ছিলো এ-বিষয়ে হরপ্পা এবং চানহুদারোর নিদর্শন থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হরপ্পার দুটি কবরখানার নাম দেওয়া হয়েছে ‘সিমেট্রি আর-৩৭’ (Cemetery R-37) এবং ‘সিমেট্রি-এইচ্’ (Cemetery H)। হুইলারের মতে প্রথমটি অনেক পুরানো, প্রকৃত হরপ্পা-সংস্কৃতির পরিচায়ক; কিন্তু দ্বিতীয়টি অনেক পরের যুগের। কেননা দ্বিতীয়টিতে শুধু যে কবর দেবার পদ্ধতি অন্য রকম তাই নয়, এই কবরখানায় অন্যান্য এমন নিদর্শন পাওয়া গেছে যাকে কিছুতেই প্রকৃত হরপ্পা-সংস্কৃতির পরিচায়ক বলা যায় না।
এখানে প্রশ্ন হলো, দ্বিতীয় কবরখানাটা যদি প্রকৃত সিন্ধু-অধিবাসীদের না হয়, তাহলে তা কাদের কবরখানা? ১৯৪৩ সালে গর্ডন চাইল্ড একটু রয়েসয়ে মন্তব্য করেছিলেন, এ-কবরখানা আক্রমণকারী আর্যদেরই হওয়া সম্ভব। এবং প্রত্নতত্ত্বমূলক পরবর্তী কাজ– বিশেষত ১৯৪৬ সালের উৎখনন– চাইল্ডের এই মন্তব্যকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৯৪৪ সালে ‘আর্কিওলোজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’র মহাপরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে স্যার মর্টিমার হুইলার বিভিন্ন প্রত্নস্থানে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পরবর্তী যেসব খননকাজ পরিচালনা করেন তার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় সেখানেই সিন্ধু-সভ্যতায় আর্য-আক্রমণের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভিন্ন সাক্ষ্য-নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন- ‘সিমেট্রি-এইচ্’-এর প্রত্ন-নিদর্শনগুলির সঙ্গে প্রকৃত হরপ্পা-সংস্কৃতির নিদর্শনের পার্থক্য থেকে স্বভাবতই অনুমিত হয়েছে, এগুলি কোনো এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পরিচায়ক। তার নাম দেয়া হয় ‘সিমেট্রি-এইচ’ ইন্ডাস্ট্রি। ১৯৪৬ সালের প্রত্ন-খননকাজে স্পষ্টই বোঝা গেলো, হরপ্পা

নগরীর ধ্বংসস্তুপের উপর বেশ অনেকখানি জঞ্জাল জমা হয়েছিলো; তারই উপর আগন্তুক ইন্ডাস্ট্রির স্বাক্ষর। তার মৃৎপাত্র অনেক নিকৃষ্ট, সে-মৃৎপাত্রের সঙ্গে সংযুক্ত গৃহনির্মাণকৌশলের যেটুকু পরিচয় তাও অনেক নিকৃষ্ট– হরপ্পা-সংস্কৃতির নির্মাণকুশলতার সঙ্গে তুলনা হয় না। এই নব্য-ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে অক্ষর-পরিচয়েরও অভাব দেখা যায়। তা ছাড়া, এই আগন্তুক ইন্ডাস্ট্রির আবির্ভাব যেন আকস্মিকভাবেই ঘটেছিলো– সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসস্তুপের উপর হঠাৎ যেন উটকোর মতো এসে পড়েছিলো। এই উৎখননে আরও দেখা গেলো, হরপ্পা-নগরীর শেষদিকের পর্যায়ে রক্ষণ-ব্যবস্থাকে নতুন করে– এবং খানিকটা তাড়াহুড়ো করেই যেন– আরও পাকা-পোক্ত করে তোলবার আয়োজন হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পিগট্-এর মন্তব্য হলো, নগরবাসীরা তখন আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত।
কাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা? স্বভাবতই অনুমান হয়, 'সিমেট্রি-এইচ্'-এর সঙ্গে সংযুক্ত লিপি-হীন নির্মাণ-অনভিজ্ঞ প্রাক্-সভ্য মানবদলের আক্রমণ।

চানহুদারোর ধ্বংসস্তুপ থেকেও মোটের উপর একই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে-
'প্রথম– অর্থাৎ সর্বনিম্ন, অতএব সর্বপ্রাচীন– স্তরে অবধারিত হরপ্পা-সংস্কৃতির পরিচয়। কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তর দুটিতে স্বতন্ত্র এবং আগন্তুক সংস্কৃতির সাক্ষ্য; প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে সময়ের ব্যবধানও সুস্পষ্ট। এর মধ্যে দ্বিতীয় স্তরটির নাম দেওয়া হয় ঝুকর-সংস্কৃতি। অর্থাৎ চানহুদারোতে হরপ্পা-সংস্কৃতির ধ্বংসস্তুপের উপর ঝুকর-সংস্কৃতির মানুষেরা আবাস স্থাপন করেছিল। কিন্তু সে-আবাসের নির্মাণকৌশল অত্যন্ত নিকৃষ্ট। তা ছাড়া, এ-সংস্কৃতির সীল, হাতিয়ার, তাবিজ প্রভৃতিও পাওয়া গিয়েছে। হরপ্পা-সংস্কৃতির সীলের উপরকার সুনিপুণ কারিগরির তুলনায় ঝুকর-সংস্কৃতির সীলগুলি শুধুই যে স্থূল ও বাজে ধরনের তাই নয়– এগুলিতে কোনো লিপির পরিচয় নেই। সিন্ধু-সাম্রাজ্যের অন্যান্য জায়গায়ও এই ঝুকর-সংস্কৃতির স্মারক পাওয়া গিয়েছে এবং সর্বত্রই তা বর্বর-অবস্থারই পরিচায়ক (পিগট্-এর অভিমত)। আরও দ্রষ্টব্য হলো, এই ঝুকর-সংস্কৃতির সীলের সঙ্গে ছবি প্রভৃতির দিক থেকে প্রাচীন হিটাইট-দের সীলের সাদৃশ্য চোখে পড়ে এবং হিটাইটদের এক চুক্তিপত্রে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের নাম আবিষ্কৃত হয়েছে। অতএব চানহুদারোতে হরপ্পা-সংস্কৃতির ধ্বংসস্তুপের উপর ঝুকর-সংস্কৃতির যে-বাহকেরা আবাস স্থাপন করেছিল তাদের সঙ্গে বৈদিক আর্যদের সম্পর্ক– বা যোগাযোগ– থাকা অসম্ভব নয়।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৫৫)

অত্যন্ত স্বাভাবিক যুক্তিতে এটা স্বীকার্য যে, কোনো এক বর্বর মানবদলের আক্রমণেই যদি সিন্ধু-সভ্যতা বিধ্বস্ত হয়ে থাকে তা হলে সিন্ধু-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য স্থানেও তার পরিচয় খুঁজে পাবার কথা। এবং এ-জাতীয় পরিচয় যে সত্যিই কতো প্রচুর পিগট-এর রচনায় তার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় বলে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন। তবে সিন্ধু-সভ্যতায় ওই আক্রমণকারী যে আর্যগোষ্ঠীই ছিলো এ-বিষয়ে স্যার মর্টিমার হুইলার ১৯৪৬ সালের উৎখননের ভিত্তিতে প্রাপ্ত প্রত্নিদর্শন ও বৈদিক-সাহিত্যকে নজির হিসেবে উল্লেখ করে

সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন।

.
সিন্ধু-সভ্যতায় আর্য-আক্রমণের ঋগ্বেদ-সাক্ষ্য :
১৯৪৩ সালে গর্ডন চাইল্ড যে ‘সিমেট্রি-এইচ্’-কে বৈদিক মানুষদের কবরখানা বলে সনাক্ত করতে চেয়েছিলেন, এই প্রসঙ্গে– এবং ১৯৪৬ সালের খননকাজের ভিত্তিতে– স্যার মর্টিমার হুইলার মন্তব্য করেছেন (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তর্জমায়)-

‘ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের পটভূমি হিসেবে ভারতীয় সাহিত্যের নজির খুঁজতে যাওয়া সব-সময়েই কিছুটা বিপজ্জনক এবং সে-বিপদের সম্ভাবনা এখানেও আছে। কিন্তু তার সম্মুখীন হতে আমি সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ নই। সপ্তসিন্ধু পাঞ্জাব ও তার আশপাশে আর্য-আক্রমণের বর্ণনা হিসেবে বারবার স্থানীয় অধিবাসীদের প্রাচীরবেষ্টিত নগর বিধ্বস্ত করবার কথা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে এই নগর বোঝাবার জন্য পুর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর্যদের যুদ্ধদেবতা ইন্দ্র ছিলেন পুরন্দর, পুর-ধ্বংসকারী।... জরার ফলে যে-রকম বস্ত্র বিদীর্ণ হয় ইন্দ্র সেইভাবেই পুরগুলি বিদীর্ণ করতেন। এই পুরগুলি কোথায় ছিল? আগেকার কালে ধরে নেওয়া হতো, এগুলি নেহাতই বুঝি পৌরাণিক কল্পনা, বা হয়তো বড় জোর আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত কোনোরকম অত্যন্ত স্থূল প্রাচীর-পরিখা ধরনের কিছু। হরপ্পায় সাম্প্রতিক খননকাজের ফলে এই চিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। এখানে পাওয়া গিয়েছে এক সুউচ্চ সভ্যতার পরিচয়, সে-সভ্যতা একান্তই আর্য-পূর্ব। আমরা এখন জানতে পেরেছি যে এখানে সুবিশাল রক্ষণ-ব্যবস্থাও রচিত হয়েছিল এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের নদীগুলিকে আয়ত্তে রাখবারও আয়োজন করা হয়েছিল। এ সমস্তই হলো এমন এক যুগের কথা যা কিনা মোটামুটি আর্য-আক্রমণের সমসাময়িক। সেই সভ্যতা বিলুপ্ত হলো কী করে? জলবায়ুর অবস্থা পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ফলে তা হয়তো দুর্বল হয়ে পড়েছিল; কিন্তু তার চূড়ান্ত বিলুপ্তির কারণ খুব সম্ভব কোনো এক ব্যাপক ও কঠিন আক্রমণ। মহেঞ্জোদারোর শেষাবস্থায় নির্বিচারে স্ত্রী-পুরুষ-শিশু হত্যার নিদর্শনও নেহাতই অহেতুক ঘটনা না হওয়াই সম্ভব। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, ইন্দ্রই এ-অপরাধে অভিযুক্ত।’- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৫৫-৬)

কিন্তু এমন কথা কি সত্যিই কল্পনা করা যায়, ইন্দ্র-বিধ্বস্ত ওই সৌধ বলতে হরপ্পার নিদর্শনের বদলে আসলে অন্য কিছু ছিলো– হয়তো এখনও তা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রয়েছে? হুইলার বলছেন-

‘এ কথা কল্পনা করতে হলে দাবি করা দরকার যে হরপ্পার শেষ এবং আর্য-আক্রমণের শুরু, এই দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত সময়টুকুর মধ্যে একই অঞ্চলে অপর কোনো এক শক্তিশালী সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং আর্য আক্রমণকারীরা তারই সুবিস্তৃত রক্ষণব্যবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। এ-জাতীয় কথা স্বীকার করা সহজ নয় এবং এ-কথা স্বীকার করতে হলে হরপ্পার রক্ষণ-ব্যবস্থা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলিকে স্বেচ্ছায় অবজ্ঞা করতে হয়। অবশ্যই

আরও খননকার্যের ফলেই এ-প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর পাওয়া যাবে।'

এ-প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদের মন্তব্য হলো- 'হুইলারের শেষ মন্তব্যটি অবশ্যই বিনয়সূচক। কেননা ভবিষ্যতের প্রত্নতত্ত্বমূলক গবেষণার ফলে সিন্ধু-সভ্যতা সংক্রান্ত যত নতুন তথ্য পাবার সম্ভাবনাই থাকুক না কেন, ওই একই এলাকায় ওই একই যুগের কোনো এক স্বতন্ত্র সুউচ্চ সভ্যতা আবিষ্কারের সম্ভাবনা সত্যিই অবাস্তব। তা ছাড়া প্রমাণ হিসেবে অনাবিষ্কৃত তথ্যের সম্ভাবনা আবিষ্কৃত তথ্যের তুলনায় একান্তই নগন্য। প্রত্নতত্ত্বমুলক ও সাহিত্যমূলক তথ্যের মিলিত ইঙ্গিত থেকে একটি কথাই অনুমান হয় : বৈদিক মানুষদের আক্রমণে হরপ্পা-সভ্যতা বিধ্বস্ত হয়েছিল।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৫৬)

এই অনুমানের পক্ষে ঋগ্বেদের সাক্ষ্য থেকে আরো কিছু যুক্তিও প্রদর্শিত হয়েছে। যেমন, ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে একটি ঋক পাওয়া যায় যেখানে ইন্দ্রের কীর্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-
'বধীদিন্দ্রো বরশিখস্য শেষোহভ্যাবর্তিনে চায়মানয় শিক্ষন্ ।
বৃচীবতো যদ্ধরিয়ূপীয়ায়াং হৎপূর্বে অর্ধে ভিয়সাপরো দর্ত্ ।।'- (ঋগ্বেদ-৬/২৭/৫)
অর্থাৎ : চয়মানের পুত্র অভাবর্তীর প্রতি অনুকূল হয়ে ইন্দ্র বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করেছেন। তিনি হরিয়ূপীয়ার পূর্বভাগে অবস্থিত বরশিখের পুত্র বৃচীবানের বংশধরদের বধ করেন, তখন পশ্চিমভাগে অবস্থিত বরশিখের শ্রেষ্ঠ পুত্র ভয়ে বিদীর্ণ হয়েছিলো।

এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য হলো, উপরিউক্ত ঋকে যে নগরের নাম উল্লেখ রয়েছে- 'হরিয়ূপীয়া', আধুনিক বিদ্বানেরা এ-নগরকে খুব যৌক্তিকভাবেই হরপ্পা বলে সনাক্ত করতে চেয়েছেন। প্রত্ন-ইতিহাসবিদ কোশাম্বী অনুমান করেছেন, এ-যুদ্ধ আর্য এবং আর্য-পূর্বদের মধ্যেই ঘটে থাকা সম্ভব; কেননা বৃচীবানের বংশধরের কথা আর শোনা যায় না, কিন্তু ওই এলাকাতেই চয়মানের বংশধরেরা উত্তরকালেও টিকে থেকেছিলো। এই অনুমানের পক্ষে প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসেবে স্মর্তব্য যে, আলোচ্য ঋকটির রচয়িতা কবির নাম ঋষি ভরদ্বাজ এবং ষষ্ঠ মণ্ডলেই তাঁর রচিত একটি পূর্ববর্তী ঋকে ইন্দ্র অসুরঘ্ন বা অসুরহন্তা বলে কীর্তিত। যেমন-
'তন্নো বি বোচা যদি ভে পুরা চিজ্জরিতার আনশু সুম্নমিন্দ্র।
কস্তে ভাগঃ কিং বয়ো দুধ্র খিদ্বঃ পুরুহূত পুরূবসোহসুরঘ্নঃ।।'- (ঋগ্বেদ-৬/২২/৪)
অর্থাৎ : হে ইন্দ্র ! যদি পূর্বকালে তোমার স্তোতৃগণ সুখলাভ করে থাকেন, তবে আমাদেরও সে সুখ প্রদান করো। হে দুর্ধর্ষ, শত্রুবিজয়ী, ঐশ্বর্যশালী পুরুহূত ! তুমি অসুরনিহন্তা, তোমার জন্য কোন ভাগ ও কোন হব্য কল্পিত হয়েছে।

অতএব অনুমান হয় আলোচ্য পূর্বোক্ত ঋকেও ইন্দ্র অসুরঘ্ন বা অসুর-হত্যাকারী হিসেবেই বৃচীবানের পুত্রদের বধ করেন। বেদ-টীকাকার সায়ণাচার্যও বরশিখকে অসুর বলেছেন। এবং ঋগ্বেদে এখানে অসুর বলতে অবশ্যই আর্যপূর্ব বা অনার্যদের বোঝানো হয়েছে। এই অনার্যদেরকেই ঋগ্বেদে কখনো বা দস্যু কিংবা বিরুদ্ধবাদী হিসেবেও উল্লেখ আখ্যায়িত করা

হয়েছে যাদেরকে ইন্দ্র হত্যা করেছেন, যেমন-
'সসানাত্যা উত সূর্যং সসানেন্দ্রঃ সসান পুরুভোজসং গাম্ ।
হিরণ্যয়মুত ভোগং সসান হত্বী দস্যুন্প্রার্যং বর্ণমাবৎ।।' (ঋগ্বেদ-৩/৩৪/৯)
'ইন্দ্র ওষধীরসনোদহানি বনস্পতীরসনোদন্তরিক্ষম্ ।
বিভেদ বলং নুনুদে বিবাচোহথাভবন্দমিতাভিক্রতুনাম্ ।।' (ঋগ্বেদ-৩/৩৪/১০)
অর্থাৎ :
ইন্দ্র অশ্বদান করেছেন, সূর্য দান করেছেন, বহু লোকের উপভোগযোগ্য গোধন দান করেছেন, দস্যুদের বধ করে আর্যবর্ণকে রক্ষা করেছেন (ঋক-৩/৩৪/৯)। ইন্দ্র ওষধি প্রদান করেছেন, দিবস প্রদান করেছেন, বনস্পতি ও অন্তরীক্ষদের প্রদান করেছেন। তিনি মেঘ ভেদ করেছেন, বিরুদ্ধবাদীদের বধ করেছেন, যারা অভিমুখে যুদ্ধ করতে আসে তাদের বধ করেছেন (ঋক-৩/৩৪/১০)।

পুরন্দর ইন্দ্র যে শত্রুর শত শত পুর, পুরী ও হর্ম্য বা প্রাসাদ ভেদ ও ধ্বংস করেছেন তার নমুনা ঋগ্বেদ জুড়ে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেমন-
'যুধা যুধমুপ ঘেদেষি ধৃষ্ণুয়া পুরা পুরং সমিদং হংস্যোজসা।
নম্যা যদিন্দ্র সখ্যা পরাবতি নিবর্হয়ো নবুচিং নাম মায়িনম্ ।।' (ঋগ্বেদ-১/৫৩/৭)
'ত্বং করঞ্জমুত পর্ণয়ং বধীস্তেজিষ্ঠযাতিথিগ্বস্য বর্তনী।
ত্বং শতা বঙ্গৃদস্যাভিনৎপুরোহনানুদঃ পরিষূতা ঋজিশ্বনা।।' (ঋগ্বেদ-১/৫৩/৮)
'ত্বং পিপ্রুং মৃগয়ং শূশুবাংসমৃজিশ্বনে বৈদথিনায় রন্ধীঃ।
পঞ্চাশৎকৃষ্ণা নি বপঃ সহস্রাৎকং ন পুরো জরিমা বি দর্দঃ।।' (ঋগ্বেদ-৪/১৬/১৩)
'অহং পুরো মন্দসানো ব্যৈরং নব সাকং নবতীঃ শম্বরস্য।
শমতমং বেশ্যং সর্বতাতা দিবোদাসমতিথিগ্বং যদাবম্ ।।' (ঋগ্বেদ-৪/২৭/৩)
অর্থাৎ :
হে ইন্দ্র ! তুমি শত্রুবর্ষণকারীরূপে যুদ্ধ হতে যুদ্ধান্তরে গমন কর, বলদ্বারা নগরের পর নগর ধ্বংস কর। হে ইন্দ্র! তুমি নথী ঋষির সহায়ে দূর দেশে মনুচি নামক মায়াবী অসুরকে বধ করেছিলে (ঋক-১/৫৩/৭)। তুমি অতিথিগ্ব নামক রাজার জন্য করঞ্জ ও পর্ণয় নামক অসুর শত্রুদ্বয়কে তেজস্বী বর্তনী দ্বারা বধ করেছ; তারপর তুমি অনুচর রহিত হয়ে ঋজিশ্বান নামক রাজার দ্বারা চারদিকে বেষ্টিত বঙ্গৃদ নামক অসুর শত্রুর শত নগর ভেদ করেছিলে (ঋক-১/৫৩/৮)। তুমি পিপ্রু ও প্রবৃদ্ধ মৃগয়কে বিনাশ করেছিলে, তুমি সকলকে বিদথীর পুত্র ঋজিশ্বার বশীভূত করেছিলে। তুমি পঞ্চাশৎ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ অনার্য শত্রুকে বিনাশ করেছিলে। জরা যেরূপ রূপ বিনাশ করে, তুমি সেরূপ শম্বরের নগরসমূহ বিনাশ করেছিলে (ঋক-৪/১৬/১৩)। (আপনার কীর্তি বর্ণনা করে ইন্দ্র বলছেন) আমি সোমপানে মত্ত হয়ে শম্বরের নবনবতি বা নিরানব্বই সংখ্যক পুরী এককালে ধ্বংস করেছি। আমি যখন অতিথিগ্ব দিবোদাসকে যজ্ঞে পালন করেছিলাম তখন তাকে শততম পুরী বাসের জন্য দিয়েছিলাম (ঋক-৪/২৭/৩)।

এমন অসামান্য কীর্তির জন্যেই হয়তো ইন্দ্রকে পুরন্দর বা পুর-ধ্বংসকারী বলা হয়। কিন্তু কোথায় এসব পুর ধ্বংস হয়েছে? ঋগ্বেদে সেভাবে স্থানের নাম সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও সিন্ধু, যমুনা, সরস্বতি, শতদ্রু, পরুষ্ণি (ইরাবতি, রাভী), বিতস্তা ইত্যাদি অন্তত উনিশটি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া সপ্তনদী বা সপ্তসিন্ধুরও বেশ কয়েকবার উল্লেখ রয়েছে। যা থেকে ধারণা করা হয়, আর্যদের আবাস তৈরি হয়েছিলো সপ্তসিন্ধুর দেশে অর্থাৎ, বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ছাড়াও আফগানিস্তানের কিছু অংশ বিস্তৃত। ঋগ্বেদের নদী সূক্তের (ঋগ্বেদ-১০/৭৫) পঞ্চম ঋকে সিন্ধু নদীর পূর্বদিকের অর্থাৎ পাঞ্জাব প্রদেশের শাখাগুলির নাম এবং ষষ্ঠ ঋকে পশ্চিম দিকের অর্থাৎ কাবুল প্রদেশের শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। এছাড়া গঙ্গা ও যমুনার অববাহিকাতেও যে আর্যদের বসতি বিস্তার লাভ করেছিলো তা অনুমান করা যায়। যেমন-

'আ যৎসাকং যশসো বাবশাসাঃ সরস্বতী সপ্তথী সিন্ধুমাতা।
যাঃ সুষ্বয়ন্ত সুদুঘাঃ সুধারা অভি স্বেন পয়সা পীপ্যানাঃ।।' (ঋগ্বেদ-৭/৩৬/৬)
'অভি ত্বা সিন্ধো শিশুমিন্ন মাতরো বাশ্রা অর্ষন্তি পয়সেব ধেনবঃ।
রাজেব যুধ্বা নয়সি ত্বমিৎসিচৌ যদাসামগ্রং প্রবতামিনক্ষসি।।' (ঋগ্বেদ-১০/৭৫/৪)
'ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচেতা পুরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া।।' (ঋগ্বেদ-১০/৭৫/৫)
'তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেত্যা ত্যা।
ত্বং সিন্ধা কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহৎস্বা সরথং যাভিরীয়সে।।' (ঋগ্বেদ-১০/৭৫/৬)
'ঋজীত্যেনী রুশতি মহিত্বা পরি জ্রয়াংসি ভরতে রজাংসি।
অদব্ধা সিন্ধুরপসামপস্তমাশ্বা ন চিত্রা বপুষীব দর্শতা।।' (ঋগ্বেদ-১০/৭৫/৭)
'স্বশ্বা সিন্ধুঃ সুরথা সুবাসা হিরণ্যয়ী সুকৃতো বজিনীবতী।
ঊর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যুতাধি বস্তে সুভগা মধূবৃধম্ ।।' (ঋগ্বেদ-১০/৭৫/৮)
অর্থাৎ :
যে নদীগণের মধ্যে সিন্ধু মাতা ও সরস্বতী সপ্তম স্থানীয়া সে কামদুঘা সুধারা নদীগণ প্রবাহিত হচ্ছে। স্বীয় জলে বর্তমান ও অন্নবিশিষ্ট ও কাময়মান নদীসকল যুগপৎ আসুন (ঋক-৭/৩৬/৬)। হে সিন্ধু ! যেমন শিশু বৎসের নিকট তাদের জননী গাভীর দুগ্ধ নিয়ে যায় সেরূপ আর আর নদী শব্দ করতে করতে জল নিয়ে তোমার চতুর্দিকে আসছে। যেমন যুদ্ধ করবার সময় রাজা সৈন্য নিয়ে যায় সেরূপ তোমার সহগামিনী এ দুটি নদী শ্রেণীকে নিয়ে তুমি অগ্রে অগ্রে চলেছ (ঋক-১০/৭৫/৪)। হে গঙ্গা ! হে যমুনা সরস্বতী শতদ্রু ও পরুষ্ণি ! আমার এ স্তবগুলি তোমরা ভাগ করে নাও। হে অসিক্নী-সঙ্গত মরুদবৃধা নদী ! হে বিতস্তা ও সুষোমা সঙ্গত আর্জীকীয়া নদী ! তোমরা শোন (১০/৭৫/৫)। হে সিন্ধু ! তুমি প্রথমে তৃষ্টামা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে চললে। পরে সুসর্ত্তু ও রসা ও শ্বেতীর সাথে মিললে। তুমি ক্রমু ও গোমতীকে, কুভা ও মেহৎনুর সাথে মিলিত করলে। এ সকল নদীর সঙ্গে তুমি এক রথে অর্থাৎ একত্রে গিয়ে থাক (ঋক-১০/৭৫/৬)। এ দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধু সরলভাবে যাচ্ছে,

তাঁর বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল, তিনি অতি মহৎ, তাঁর জল সকল মহাবেগে গিয়ে চতুর্দিক পরিপূর্ণ করছে। যত গতিশালী আছে, এঁর তুল্য গতিশালী কেউ নেই। ইনি ঘোটকীর ন্যায় অদ্ভূত, ইনি স্থূলকায়া, রমণীর ন্যায় সৌষ্ঠবদর্শনা (ঋক-১০/৭৫/৭)। সিন্ধু চিরযৌবনা ও সুন্দরী, এঁর উৎকৃষ্ট ঘোটক, উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলঙ্কার আছে, ইনি উত্তমরূপে সজ্জিত হয়েছেন। এঁর বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে, এঁর তীরে সীলমা খড় আছে। ইনি মধু প্রসবকারী পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত (ঋক-১০/৭৫/৮)।

অতএব, এই সিন্ধু উপত্যকাবাসী অনার্যদের উপর আক্রমণকারী আর্য-সেনাপতি ইন্দ্র যে এ-অঞ্চলেরই বহু নগরী ধ্বংস করেছিলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রত্নতাত্ত্বিক ও প্রাচীন সাহিত্য নিদর্শন থেকে অনুমান হওয়া মোটেও অসঙ্গত নয় যে, আর্য-আক্রমণেই সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিলো। এ-প্রেক্ষিতে সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংস প্রসঙ্গে কোশাম্বী আরও মৌলিক একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন-

‘সহস্র বছরের পুরানো ইতিহাস সত্ত্বেও সিন্ধু-সভ্যতার নগরগুলি অমন আকস্মিকভাবে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হলো কী করে? শুধুমাত্র যুদ্ধে পরাজয়ই তার সমগ্র কারণ হতে পারে না। কেননা, যে মূল অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নগরগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল তা অক্ষুণ্ন থাকলে যুদ্ধে পরাজয় সত্ত্বেও নগরগুলি ঐভাবে নিঃশেষ হয়ে যেতনা। অতএব অনুমান হয়, আর্য-আক্রমণের ফলে শুধুই যে সিন্ধু-সভ্যতার অধিবাসীরা পরাস্ত হয়েছিল তাই নয়, খাদ্য-উৎপাদনের প্রধানতম পদ্ধতিও বিধ্বস্ত হয়েছিল।’ (দেবীপ্রসাদ/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৫৭)

তার মানে, সিন্ধু-সভ্যতার মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি বলতে যেহেতু সুবিস্তৃত কৃষিকাজ, সেক্ষেত্রে ওই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে কৃষিকাজের জন্য কোনো-না-কোনো রকম জলসেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিলো। এই উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই সিন্ধু-উপত্যকার নদীগুলির শাখা-উপশাখায় বাঁধ দিয়ে বন্যার জল রুখে রাখার আয়োজন করা হতো বলে কোশাম্বী মনে করেন। ঋগ্বেদের সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায়, বৈদিক মানুষেরা শুধুমাত্র সিন্ধু-সভ্যতার পুরগুলিই ধ্বংস করেনি; তা ছাড়াও কৃষিকাজের পক্ষে অপরিহার্য ওই বাঁধগুলিও ভেঙে দিয়েছিলো। ফলে ধ্বংস হয়েছিলো সিন্ধু-সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি। এ-বিষয়ে কোশাম্বী ঋগ্বেদের প্রমাণও উদ্ধৃত করেছেন।

‘ইন্দ্রের কীর্তি-বর্ণনায় ঋগ্বেদ-এ বারবার বলা হয়েছে, তিনি জলস্রোতকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ম্যাক্স-মূলার-এর যুগে এ-বর্ণনাকে প্রাকৃতিক ঘটনামূলক পৌরাণিক কাহিনীই মনে করা হয়েছে– বৃষ্টি দেবতা যেন মেঘের অবরোধ ভেঙে বৃষ্টির জল মুক্ত করেছেন। কিন্তু ঋগ্বেদের প্রকৃত বর্ণনা এ-ব্যাখ্যা মোটেই সমর্থন করে না। কেননা সে-বর্ণনা অনুসারে, এইভাবে জলস্রোতকে মুক্ত করবার জন্য ইন্দ্র বৃত্র-কে বধ করেছিলেন। বৃত্র বলতে সাধারণত কোনো দানব-নাম বোঝা হয়। কিন্তু সম্প্রতি অত্যন্ত দক্ষ দু’জন ভাষাতত্ত্ববিদ এই শব্দটি বিশ্লেষণ করেছেন। নিছক ভাষাতত্ত্বমূলক সাক্ষ্যর উপর নির্ভর করেই তাঁরা প্রমাণ করেছেন বৃত্র অর্থে কোনো দানব বোঝা ঠিক নয়– শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো ‘বাধা’, ‘বাঁধ’। ঋগ্বেদের বৃত্র-বিনাশ

বর্ণনাও এই অর্থই সমর্থন করে : ঢালু জমিতে বৃত্র সাপের মতো শুয়ে রয়েছে, তাই নদীস্রোত বাধা পেয়ে থেমে গিয়েছে। ইন্দ্র যখন বজ্রের সাহায্যে তাকে আঘাত করলেন জমি কুঁচকে উঠল, পাথরগুলো রথের চাকার মতো গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল আর বৃত্রর এলিয়ে-পড়া দেহের উপর দিয়ে বয়ে গেল বাধামুক্ত জলস্রোত। বাঁধ ধ্বংস করবার বর্ণনা, সন্দেহ নেই।' (ঐ/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৫৭)

ইন্দ্রের যুদ্ধবাজ বা অনার্যহন্তারক ইত্যাদি হিসেবে প্রসিদ্ধি থাকলেও পুরন্দর বা পুর-ধ্বংসকারী ও বৃত্র-হননকারী হিসেবেই ইন্দ্রের পরিচিতি সর্বাধিক কীর্তিত। কিন্তু ঋগ্বেদের অন্যতম আরেকটি ঋকে পুরী ভগ্নের সাথে সাথে বৃত্রকে ইন্দ্র-কর্তৃক হত্যার বদলে (কোশাম্বীর বর্ণনার অনুরূপ) চূর্ণকরার কথাই স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে সায়ণাচার্যের টীকা তর্জমায়, যেমন-

'আ ক্ষোদো মহি বৃতং নদীনাং পরিষ্ঠিতমসৃজ ঊর্মিমপাম্ ।
তাসামনু প্রবত ইন্দ্র পন্থাম্ প্রার্দয়ো নীচীরপসঃ সমুদ্রম্ ।। (ঋগ্বেদ-৬/১৭/১২)।
অয়া হ ত্যং মায়য়া বাবৃধানং মনোজুবা স্বতবঃ পর্বতেন।
অচ্যুতা চিদ্বীলিতা স্বোজা রূজো বি দৃঢ়হা ধৃষতা বিরপ্শিন্ ।।' (ঋগ্বেদ-৬/২২/৬)।
অর্থাৎ :
হে ইন্দ্র ! তুমি বৃত্র কর্তৃক সমাচ্ছাদিত নদী সকলের প্রকাণ্ড বারিরাশি উন্মুক্ত করেছ; তুমি জলরাশি মুক্ত করেছ। তুমি সে সমস্ত নদীকে নিম্নপথে প্রবাহিত করেছ; তুমি বেগবান সলিলরাশিকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়েছ। (ঋক-৬/১৭/১২)।। হে নিজবলে বলীয়ান ইন্দ্র ! তুমি এ মায়াদ্বারা প্রবৃদ্ধ, প্রসিদ্ধ বৃত্রকে পর্বযুক্ত ও মনোবৎ বেগগামী বজ্রদ্বারা চূর্ণ করেছ। হে শোভন দীপ্তিশালী মহেন্দ্র ! তুমি নিজ দুর্ধর্ষ বজ্রদ্বারা অক্ষয়, অশিথিল ও দৃঢ় পুরী সকল ভগ্ন করেছ। (ঋক-৬/২২/৬)।।

এছাড়াও ঋগ্বেদে কৃত্রিম বাঁধ ভেঙে দেয়া ও নদীর নির্গমন দ্বার খুলে দেয়া প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে-

'সদ্মেব প্রাচো বি মিমায় মানৈর্বজ্রেণ খান্যতৃণন্নদীনাম্ ।
বৃথাসৃজৎপথিভির্দীর্ঘয়াথৈঃ সোমস্য তা নদ ইন্দ্রশ্চকার।।' (ঋগ্বেদ-২/১৫/৩)
'ভিনদ্বলমঙ্গিরোভির্গৃণানো বি পর্বতস্য দৃংহিতান্যৈরৎ।
রিণক্ রোধাংসি কৃত্রিমাণি এষাং সোকস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার।।' (ঋগ্বেদ-২/১৫/৮)
অর্থাৎ :
তিনি (ইন্দ্র) যজ্ঞগৃহের ন্যায় পরিমাণ করে লোক সকলকে প্রাঙ্মুখ করে নির্মাণ করেন, তিনি বজ্রদ্বারা নদীর নির্গমন দ্বার সকল খুলে দেন, তিনি অনায়াসে দীর্ঘকাল গন্তব্য পথে নদী সকলকে প্রেরণ করেন, সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হলে ইন্দ্র এ সকল কর্ম করেছিলেন (ঋক-২/১৫/৩)। অঙ্গিরাগণ স্তব করলে ইন্দ্র বলকে বিদীর্ণ করেছিলেন। পর্বতের দৃঢ়ীকৃত দ্বার উদ্ঘাটিত করেছিলেন। এদের কৃত্রিম রোধ বা বাঁধগুলিও ভেঙে দিয়েছিলেন।

সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হলে ইন্দ্র এ সকল কর্ম করেছিলেন (ঋক-২/১৫/৮)।

অতএব, সিন্ধু-সভ্যতার উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন ও প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য নিদর্শনের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মোটামুটি একমত যে, বেশ আগে থেকেই সিন্ধু-সভ্যতায় অবক্ষয় শুরু হলেও চূড়ান্তভাবে আর্য-আক্রমণের ফলশ্রুতিতেই সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংস পূর্ণতা পায়।

…

২.৯ : সিন্ধু-সভ্যতা ও আর্য-সভ্যতার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার ভারত উপমহাদেশে তো বটেই, এমনকি বিশ্ব ইতিহাসেই এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়েছে এবং এ-সম্পর্কিত সনাতন ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত করেছে। কোন কোন পণ্ডিত যদিও সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে আর্য-সভ্যতা বা বৈদিক-সভ্যতার মিল খুঁজে পেয়েছেন বলে থাকেন, কিন্তু তা আসলে দীর্ঘকালের অবস্থানজনিত কারণে ভৌগলিক ও পারিপার্শ্বিক সমাজাসত্তের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় আত্তিকরণের মাধ্যমে সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার কিছু কিছু উপাদানকে ধারণ করার লক্ষণ হিসেবে আর্য-সভ্যতার চূড়ান্ত পর্বে তা অতি-স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে বলে মনে করা হয়। বস্তুত তুলনামূলক বিচার করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় এই দুই সভ্যতার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট অমিল রয়েছে। যেমন-

(ক) সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কারের আগে মনে করা হতো ভারত-উপমহাদেশের প্রাক্-আর্য অধিবাসীরা ছিলো অসভ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুন্নত। কিন্তু এই সনাতন ধারণা যে মিথ্যা এবং আর্যদের আগমনের আগেই ভারতবর্ষে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো তা সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়।

(খ) সিন্ধু-সভ্যতা ছিলো নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতা। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতির নগরের অবস্থান ও নগর-পরিকল্পনা দেখে বোঝা গেছে যে, নাগরিক জীবনের নানান বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি এ সভ্যতায় রয়েছে। কিন্তু আর্য সভ্যতা ছিলো একেবারেই গ্রামীণ সভ্যতা। শুধু তাই নয়, আর্যরা অনেকটা যাযাবর ও অনগ্রসর এবং নগরজীবন ও নগর নির্মাণের ধারণা তাদের ছিলো না। তারা অজ্ঞতাবশত সিন্ধু-সভ্যতার অনেক নগর ও কৃষি-ব্যবস্থাপনা ধ্বংসও করেছিলো বলে উত্তরকালের আর্য-সাহিত্যেই সাক্ষ্য রয়েছে।

(গ) ধর্মবোধের দিক থেকেও এই দুই সভ্যতার মানুষদের মধ্যে ছিলো অনেক পার্থক্য। সিন্ধু-উপত্যকায় পাওয়া প্রত্ন-নিদর্শন হিসেবে পোড়ামাটির ভাস্কর্য ও সীল পরীক্ষা করে বোঝা গেছে এ সভ্যতা তখনও মাতৃ-প্রধান সংস্কৃতির বাহক এবং তার অধিবাসীরা মাতৃদেবীর পূজারী ছিলো। কিন্তু আর্যরা মাতৃদেবীর আরাধনা করতো বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাছাড়া সিন্ধুবাসীদের মধ্যে লিঙ্গ-পূজার বিশেষ প্রচলন ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আর্যরা লিঙ্গ পূজাকে ঘৃণা করতো বলে আর্য-সাহিত্যে নিদর্শন রয়েছে।
আর্যরা সিন্ধু-সভ্যতার কাছ থেকেও অনেককিছু গ্রহণ করেছে। পরবর্তীকালের আর্য-ধর্মের অনেক রীতি-নীতি সিন্ধু-সভ্যতা থেকে যে নেয়া হয়েছে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তরকালের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম তথা সংস্কৃতিতে সিন্ধু-প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। হিন্দু-সংস্কৃতিতে লিঙ্গ বা শিবপূজা, শক্তি বা তন্ত্র-সাধনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরাসরি সিন্ধু-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া গৌতম বুদ্ধের যোগাসনে ধ্যানমগ্ন মূর্তিতে সিন্ধু-প্রভাব অনস্বীকার্য।

এছাড়াও পরবর্তীকালের ভারত-উপমহাদেশে নগর-পরিকল্পনায় বিশেষ করে রাস্তাঘাট, নর্দমা, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি ক্ষেত্রে সিন্ধু-সভ্যতার বহু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

(ঘ) আর্যরা লোহার ব্যবহার জানতো যা সিন্ধুবাসীদের নিকট পরিচিত ছিলো না। সিন্ধুবাসী তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানতো। একইভাবে ঘোড়ার সঙ্গে সিন্ধুবাসীদের পরিচয়ের কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু আর্য যোদ্ধাদের গুরুত্বপূর্ণ পশু ছিলো ঘোড়া। পণ্ডিতেরা মনে করেন ঘোড়ার সঙ্গে ভারতবর্ষকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো আর্যরা। ঘোড়া এবং লোহার ব্যবহারে পারদর্শী হওয়ায় সফল যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয়েছিলো আর্যরা। অপরপক্ষে হাতির সঙ্গে পরিচিত ছিলো সিন্ধু-সভ্যতার অধিবাসীরা। কিন্তু আর্যরা হাতির সঙ্গে পরিচিত ছিলো এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

(ঙ) আর্যদের সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য কতোটুকু ছিলো তা বোঝার জন্য দুই সভ্যতার প্রাপ্ত মৃৎপাত্র যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। প্রত্নতত্ত্বের দৃষ্টিতে প্রাচীন সংস্কৃতির সময়, অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য সমকালীন মৃৎপাত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আর্য-সভ্যতা ধারণকারী অঞ্চলগুলিতে যে সমস্ত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে সেগুলি ছিলো ধূসর রঙের। অন্যদিকে সিন্ধু-সভ্যতার মৃৎপাত্রের রঙ লাল-কালো।

(চ) মৃতদেহ সৎকারের বিষয়েও দুই সভ্যতার সংস্কৃতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। আর্য-সংস্কৃতির মানুষেরা মৃতদেহ আগুনে পোড়াতো। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার অধিবাসীদের মধ্যে মৃতদেহ কবর দেয়ার রীতি প্রচলিত ছিলো। হরপ্পা-সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলোতে এধরনের অনেক সমাধিস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে।

(ছ) প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্ন-নিদর্শন বিশ্লেষণ করে আর্য ও সিন্ধু সংস্কৃতির অধিবাসীদের খাদ্যাভাস সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া গেছে, যা থেকেও এই দুই সভ্যতার মানুষের সাংস্কৃতিক পার্থক্য অনুমান করা যায়। হরপ্পা-সংস্কৃতির অধিবাসীরা ফল-মূল সব্জির পাশাপাশি মাছ, শূকর, ছাগল প্রভৃতি ছোটখাটো জীবজন্তুর মাংস খেতো। তাদের মধ্যে গরুর মাংস খাওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে আর্যরা মাছ খেতো না। তাদের প্রধান খাদ্য ছিলো গরু, ঘোড়া ও ষাঁড়।

(জ) সিন্ধু ও আর্য সংস্কৃতির মধ্যে যে গুরুতর পার্থক্য অর্থাৎ এই দুই সভ্যতা যে একই মেরুতে ছিলো না তা নিশ্চিত করে লিখন-পদ্ধতির পার্থক্যের ক্ষেত্রে। পাঠোদ্ধার করা না-গেলেও সিন্ধু-সভ্যতায় যে লিপির অস্তিত্ব ছিলো তা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ হরপ্পা-সংস্কৃতির মানুষ লিখন-পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পেরেছিলো। অন্যদিকে আর্য-সভ্যতার সমকালে বৈদিক সাহিত্যগুলি মুখে মুখে প্রচলিত ছিলো বলে সে-সময়কার কোন লিপি পাওয়া যায়নি। মূলত অনেককাল পর এসব সাহিত্যকে বিভিন্নভাবে সংকলিত ও গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছে।

বৈদিক-যুগ এবং তার সাহিত্য, সমাজ ও চিন্তাধারা
ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে দুইটি ধারা প্রবাহিত– বৈদিক ও অবৈদিক– ভারতীয় পণ্ডিতদের গভীর সংস্কার ও সনাতনপন্থী ধারণায় অবৈদিক ধারাটির বিশেষ কোনো গুরুত্ব স্বীকার করা হয়নি প্রত্নখননের মাধ্যমে সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত। উত্তরকালের এতদঞ্চলীয় ধর্মীয় চিন্তা ও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে এই প্রাক্-আর্য সিন্ধু-যুগীয় অবৈদিক উপাদানের ব্যাপক প্রভাবের গুরুত্ব যতোই থাকুক না কেন, এ-সংস্কৃতির অপর যে বৈদিক-উপাদান তার গুরুত্বও কোন অংশে কম নয়। বরং পরবর্তীকালের চিন্তা-জগতে যে ধর্ম ও দার্শনিক ভাবনার বৈপ্লবিক উন্মেষ ঘটে তার অবদান মূলত আর্য-সভ্যতার বৈদিক-সংস্কৃতিকে ঘিরেই। এই বৈদিক-সংস্কৃতির বিকাশ এবং তার প্রভাব ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালে অন্যান্য মত-গোষ্ঠির মতোই লোকায়ত-চার্বাক মত-গোষ্ঠিরও জন্ম অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো বললে হয়তো বা অত্যুক্তি হবে না। তাই ভারতীয় দর্শন-চিন্তার তথা চার্বাকী-ভাবনার সুলুক-সন্ধান করতে হলে বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমে আর্য-সভ্যতার বিশ্লেষণ নির্দ্বিধায় আবশ্যক বলা চলে। এ-প্রেক্ষিতে আমরা খানিকটা সে-প্রয়াস নিতে পারি।

.

১.০ : বৈদিক সভ্যতা
সিন্ধু-সভ্যতা পতনের পর ধীরে ধীরে যে জাতিটি ভারতের ইতিহাসে প্রবেশ করে এরাই ‘আর্য’ নামে পরিচিত। আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বা সংস্কৃতির ধারক হচ্ছে বেদ। বেদের মধ্য দিয়েই আর্যদের সংস্কৃতি ভারতে ছড়ায় বলে বেদের নামানুসারে এই সভ্যতাকে ‘বৈদিক সভ্যতা’ও বলা হয়। আর্য-সংস্কৃতি ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রত্নখননের মাধ্যমে সামান্য কিছু সহায়তা মিললেও আর্য সভ্যতার প্রথম দিকে জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার প্রধান সূত্রই হলো বেদ বা বৈদিক সাহিত্য।

.

আর্য-ঠিঁকুজি :
সিন্ধু-সভ্যতা পতনের পর ভারতে অভিযানকারীরা নিজেদেরকে ‘আর্য’ বলতো। সংস্কৃতে ‘আর্য’ (Arya) শব্দটিকে প্রাচীন পার্সীয়দের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় ‘আইর্য’ (Airya) আর প্রাচীন পার্সীয় সাধারণ ভাষায় ‘আরীয়’ (Ariya) বলা হতো। আর্য শব্দের সাধারণ অর্থ হলো ‘বিশ্বস্ত মানুষ’ বা ‘একই জাতির মানুষ’। তবে বেদের অনুসারী বা বেদ রচনাকারীরা নিজেদেরকে ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদের থেকে আলাদা ও উন্নত জাতি মনে করে পার্থক্য বোঝাতে তারা নিজেদের ‘আর্য’ এবং ভারতের আদি অধিবাসীদের ‘অনার্য’ বলতো। অনার্যদেরকে আর্যরা শত্রু মনে করতো বলে আর্য-গ্রন্থে তাদেরকে দাস বা দস্যু হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ অনার্য মানেই দাস বা দস্যু।

তবে আর্য শব্দের উৎস অনুসন্ধানে উনবিংশ শতাব্দিতে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যথেষ্ট গবেষণা চালিয়েছেন। এরকম একজন জে. সি. পিচার্ড ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে এ-বিষয়ে উপসংহারে পৌঁছতে গিয়ে এমন একটি মানবগোষ্ঠির উল্লেখ করেছেন যারা সংস্কৃত, জার্মান, গথিক প্রভৃতি ভাষাভাষী মানুষের পূর্বপুরুষ ছিলেন এবং এই জাতিগোষ্ঠির মানুষেরা স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে গঙ্গা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো। আরেকজন গবেষক সি. ল্যাসেন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আর্যরা হচ্ছে সবচেয়ে সংগঠিত উদ্যমী ও সৃজনশীল জাতি। তাঁর মতে, ভারতের উচ্চবর্ণের লোকেরা যাঁরা নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে গৌড় বর্ণের তারাই আর্যগোষ্ঠিভুক্ত।

আবার কোন কোন ঐতিহাসিক শুধুমাত্র ভাষা বিচারেই আর্যদের চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে, জাতিগত অর্থে আর্য শব্দটি ব্যবহৃত হবে না– এটি ব্যবহৃত হবে ভাষাগত অর্থে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাঁরা আর্যদের আদিবাস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। মূলত আর্যদের উৎস নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বহু বিতর্ক ও মতভেদ রয়েছে। কেউ মনে করেন অন্য কোথাও নয় ভারতেই আর্যদের আদি নিবাস ছিলো। কোন এককালে ভারত থেকেই তারা পারস্য ও ইউরোপে যায়। এই যুক্তির পক্ষে তাঁদের বক্তব্য হলো, আর্যদের আদিগ্রন্থ 'বেদ' ভারতবর্ষেই রচিত হয়েছিলো কেননা বেদের কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় না যে, আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে এ দেশে এসেছে। ঋগ্বেদের ভৌগোলিক বিবরণ পাঠ করে কেউ কেউ বলেন ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে একটি প্রাচীন অঞ্চলের কথা জানা যায়, এ অঞ্চল ছিলো আর্যদের আদিবাসস্থল। আবার কারো মতে, মুলতানের দেবীকা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে আর্যদের আদি বাসভূমি ছিলো। কেউ আবার এতে দ্বিমত করে বলেন, কাশ্মীর এবং হিমালয়ের সংলগ্ন অঞ্চলে আর্য বসতির সূচনা হয়েছিলো। কেউ আবার মন্তব্য করেন, পঞ্চনদের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোতেই আর্যদের আদি আবাস ছিলো। মোটকথা এফ. ই. পার্জিটার, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝাঁ, ডি এস ত্রিবেদ, এল ডি কল্প, শ্রীকণ্ঠ শাস্ত্রী প্রমুখ সনাতনপন্থী পণ্ডিতদের কেউই স্বীকার করতে সম্মত নন যে আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে। তাঁদের আরো যুক্তি হলো বৈদিক আর্যরা 'সপ্তসিন্ধু'কে তাদের আদি বাসভূমি হিসেবে বলতে চেয়েছে।

এ ব্যাপারে সমাধানে পৌঁছার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদেরাও ভাষার নিদর্শনের সাহায্যে চেষ্টা করেছেন প্রাচীন আর্য সংস্কৃতি খুঁজে পেতে। কিন্তু এ সংস্কৃতির উৎস হিসেবে কোন অঞ্চলকে তাঁরা নির্দিষ্ট করতে পারেননি। বৈদিক সাহিত্য থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে বৈদিক আর্যদের ভাষা ছিলো সংস্কৃত। সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার করা যায়নি বলে সিন্ধু সভ্যতার ভাষা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। যদি প্রমাণ করা যেতো যে সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের আদি ভাষা সংস্কৃত ছিলো তবে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আর্যদের আদিবাস হিসেবে ভারতভূমিকে নির্দিষ্ট করা সহজ হতো। সেই সূত্রে আর্যরা হতো সিন্ধু-সংস্কৃতির উত্তরসূরী। তাই ভাষা-পণ্ডিতেরা মনে করেন সংস্কৃত ভাষার উৎস অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই সম্ভব আর্যদের আদি বাসস্থান নিশ্চিত করা।

অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ দিকে এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন দু'জন ইউরোপীয়– ফরাসি মিশনারী কোরদু (Coeurdoux) এবং কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের ইংরেজ বিচারপতি ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্স। তাঁরা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষার মিল খুঁজে পান। তাঁদের ধারণা এই ভাষাগুলির উৎস একই অঞ্চলে এবং কোন এক সময় এই অঞ্চলের মানুষেরা পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছিলো। একই উৎস থেকে উদ্ভব বলে এই উৎসের ভাষার শাখাসমূহকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বলা হয়। তাঁদের মতে ইন্দো-ইউরোপীয়দের বাসস্থানের উৎস থেকে তাই আর্যদের উৎস অনুসন্ধান করার সুযোগ রয়েছে।

কিন্তু ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রাচীনতম উৎস নিয়েও বিতর্ক আছে। অনেকের মতে ইউরোপে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে লিথুয়ানীয় ভাষা। এই লিথুয়ানীয় ভাষার সূত্র ধরে রাশিয়ার নিকটবর্তী লিথুয়ানিয়াকে আর্য ভাষাভাষীদের আদি বাসস্থান বলা হয়ে থাকে। আবার সব দিক বিবেচনা করে জার্মান পণ্ডিত কোসিনা (Kossina) মনে করেন, ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি বাসস্থান ছিলো উত্তর ইউরোপীয় সমভূমিতে। অধ্যাপক গাইলস (Giles) বলেন, হাঙ্গেরীয় সমভূমি ছিলো তাদের বাসস্থান। এছাড়া অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন মধ্য এশিয়া ছিলো আর্যদের আদি বাসস্থান।

'তবে আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মত অনুযায়ী পোল্যান্ড থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ শুষ্ক ও তৃণময় প্রান্তরে আধা যাযাবর এক গোষ্ঠী বসবাস করতো। এই জাতির গড়ন ছিল লম্বা, নাক ছিল উন্নত, গায়ের রঙ ফর্সা আর মাথা লম্বাটে। তারা ঘোড়াকে বশ মানায় এবং চাকাওয়ালা রথ ব্যবহার করে। তারা প্রধানত মেষপালক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করতো। সামান্য কৃষিকাজেও অভ্যস্ত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের প্রথম দিকে জনসংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পায় আর খরায় পশুচারণভূমির ঘাস পুড়ে যায়। ফলে বাঁচার তাগিদে এ সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা স্থান ত্যাগ করতে থাকে। দলবদ্ধভাবে তারা সরে যেতে থাকে পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে। তারা যে সমস্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে সেখানে শুরু হয় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা। তাদের উপাসনায় স্থান পায় আকাশের দেবতা, ঘোড়া ও রথ। এই গোষ্ঠীর একটি শাখা চলে যায় ইউরোপে; এরাই হলো গ্রিক, ল্যাটিন, কেলট এবং টিউটন জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ। অন্য একটি শাখা চলে যায় আনাতোলিয়া অঞ্চলে। তাদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের মিশ্রণে স্থাপিত হয় হিট্টাইটদের বিশাল সাম্রাজ্য। এর একটি শাখা তাদের পুরাতন বাসস্থানেই রয়ে যায়। এরাই পরবর্তীকালে বাল্টিক ও স্লাভোনিক জাতি গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ হিসাবে চিহ্নিত হয়। একটি শাখা চলে যায় দক্ষিণ দিকে ককেশাস এবং ইরানের সমতল মালভূমিতে। যে ক্যাসাইট বংশ ব্যাবিলন দখল করেছিল এরা এই শাখারই লোক। খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে উত্তর-পূর্ব সিরিয়াতে মিতান্নি নামের লোকদের আবির্ভাব ঘটে। এদের দেবতাদের সঙ্গে ভারতীয় দেবতাদের মিল রয়েছে। যেমন- ইন্দর অর্থাৎ ইন্দ্র, উরুভন অর্থাৎ বৈদিক দেবতা বরুণ ইত্যাদি।' (এ কে এম শাহনাওয়াজ/ ভারত

উপমহাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা-৫৬)

বেশিরভাগ গবেষকদের অভিমত হলো, ভারতে আর্যদের আগমন ঘটে ইরানের মালভূমি থেকে। ভারতে আর্যদের আগমন ও অভিযান চলতে থাকে ধীরে ধীরে– শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে। এই আগমনের সূচনা ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে। প্রথম দিকে আর্যবসতি গড়ে ওঠে পূর্ব পাঞ্জাবে এবং শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এই অঞ্চলই আর্যাবর্ত নামে পরিচিত। ক্রমে ক্রমে আর্যরা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশ্রিত হতে থাকে। এ-প্রক্রিয়ায় দৈহিক দিক থেকে তাদের অনেক পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং এই মিশ্রণের মধ্য দিয়ে ক্রমে ভারতে একটি উচ্চতর সভ্যতার উন্মেষ ঘটে।

.

আর্য-আগমন কাল :

আর্যদের আদিবাসস্থান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আধুনিক গবেষক ও ইতিহাসবিদেরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, আর্যরা আদি-ভারতীয় নয়– বহিরাগত। তবে ভারতে আর্যদের আগমন ঠিক কখন হয়েছিলো তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে আর্য-আগমনের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গ আরেক ধরনের সমস্যায় আবর্তিত হয়েছে। এ সমস্যার সবচেয়ে বড় কারণ হলো ভারতবর্ষে আর্যরা একটি বিশেষ সময়ে এবং একই ধারায় প্রবেশ করেনি বরং দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগতভাবে তারা এদেশে প্রবেশ করেছিলো বলে মনে করা হয়। সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে-

‘সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে আর্যরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে দু-তিনবার দু-তিন দলে ভারতবর্ষে আসে। যারা বেদ নিয়ে এসেছিল তারা হয়তো খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি কোনো সময়ে এখানে পৌঁছয়, তবে তাদের আগেও এখানে অন্য আর্য দল এসেছিল। আর্যরা যখন মধ্যপ্রাচ্য বা ইরান থেকে আসে তখন চাষের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় থাকলেও ঐ দীর্ঘ পথ তারা পশুচারী যাযাবর হিসেবেই আসে। ঐ পথে বহু মানুষ গরু-মোষ ভেড়া-ছাগল নিয়ে তারা আসছিল। তখন তাদের খাদ্য ছিল মাংস, দুধ, দই, ঘি, ছানা, ছাতু, মধু ইত্যাদি। ভারতবর্ষে পৌঁছতে তাদের অনেক সময় লেগেছিল এবং সে সময়টা কাটে যাযাবর ভাবেই। পথের মধ্যে কোথাও কোথাও কিছুদিন ধরে বাস করলেও স্থায়ী জীবনযাত্রার সুযোগ তো ছিল না, ফলে বীজ বুনে ফসল তোলবার মতো সময় তাদের হাতে থাকত না।’- (প্রাচীন ভারত, পৃষ্ঠা-১১)

মূলত আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের কাল নির্ণয়ের প্রয়োজনে প্রথম দৃষ্টি দেয়া হয়েছিলো বৈদিক সাহিত্যের প্রতি। বৈদিক সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদের রচনাকাল জানা-ই এক্ষেত্রে গবেষকদের জন্য বিশেষ জরুরি ছিলো। কিন্তু এ-বিষয়ে সবচাইতে সমস্যার বিষয় হলো ঋগ্বেদ শুরুতেই লিখিত রূপ পায়নি। অনেককাল পর্যন্ত তা মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে ছিলো। এই সংকট উত্তরণের চেষ্টা প্রথম করেন জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স মুলার (Friedrich

Max Muller, 1823-1909 A.D.)। এ কে এম শাহনাওয়াজ-এর 'ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ' গ্রন্থ থেকে জানা যায়-

'তিনি (ম্যাক্স মুলার) একটি গণনা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন যাকে বলা হয় 'Date reckon backward' বা পেছন দিকে গণনার পদ্ধতি। এর মূল কথা হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে শুরু করে পেছনের দিকে গুনে যাওয়া এবং এভাবে প্রাচীন কোন ঘটনার সময় নির্ধারণ করা। 'ম্যাক্স মুলার' এ পদ্ধতির গবেষণা করতে গিয়ে বৈদিক সাহিত্যসমূহকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এসব সাহিত্যের ভাষাগত, ভাবগত ক্রমবিবর্তনের দিকে লক্ষ দেন। এভাবে তিনি বৈদিক সাহিত্যকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেন। প্রথম পর্যায়ে রচিত হয় ঋগ্বেদ এবং তার পরে সাম, যজু ও অথর্ববেদ। দ্বিতীয় পর্যায়ে রচিত হয় 'ব্রাহ্মণ'। আর শেষ পর্যায়ের রচনা ছিল 'উপনিষদ'। ম্যাক্স মুলার উপনিষদের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের আদি রূপের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। এ কারণে তিনি মন্তব্য করতে পেরেছেন যে, উপনিষদের বিন্যাস ঘটানো হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। ১০৮টি উপনিষদ তৈরিতে সময় লেগেছিল কমপক্ষে দু'শো বছর। সে কারণে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে শুরু হয় উপনিষদের গঠন এবং তা শেষ হয় খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে।'

'এই গণনা পদ্ধতির পথ ধরে ম্যাক্স মুলারের পক্ষে মন্তব্য করা সম্ভব হয়েছে যে, ঋগ্বেদের গঠনকাল ছিল ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। ম্যাক্স মুলারের এ সিদ্ধান্ত বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তুরস্কের বোঘাজকুই (Boghajkay) অঞ্চলে পাওয়া যায় একটি শিলালিপি। এটি ছিল দুই রাজার সন্ধি চুক্তি। চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। চুক্তির সাক্ষী হিসাবে চার জন দেবতার নাম লেখা হয়েছে। এঁদের দু'জন হচ্ছেন ইন্দ্র ও বরুণ। ঋগ্বেদ থেকে জানা যায় ইন্দ্র ও বরুণ বৈদিক আর্যদের দেবতা। ম্যাক্স মুলারের বক্তব্যের সমর্থনে এই শিলালিপি ভাষ্য থেকেও মনে করা হয় খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের দিকে ঋগ্বেদের বিন্যাস ঘটানো হয়েছিল। ফলে আর্যদের ভারতে আগমন এরও শতাধিক বৎসর পূর্বে ঘটে থাকবে।'

.

ভারতে আর্য-আগমনের কারণ ও স্থায়ী অবস্থান :

বৈদিক সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে আর্যদের নতুন ভূমির সন্ধানে বের হওয়ার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে মনে করা হয় যে, মূলত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন আর্যদের আদি বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলো। অনুমান করা হয় আর্যদের প্রথম দল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হিন্দুকুশ পর্বতের গিরিপথ দিয়ে উত্তর ভারতে প্রবেশ করেছিলো। ঋগ্বেদের বর্ণনায় আর্যদের বসতি স্থাপনকারী অঞ্চলের কয়েকটি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি কাবুলের কাছে 'কুভা' নদী, একটি কর্রম অঞ্চলে 'ক্রুমু' নদী এবং আরেকটি গোমাল অঞ্চলে 'গোমতী' নদী। এ থেকে ধারণা করা হয় আর্যরা প্রথমে উত্তর পশ্চিম ভারতের আফগানিস্তানে বসতি গড়ে তোলে। এ অঞ্চল থেকেই পরে আর্যরা সিন্ধুর উপত্যকায় বসবাস শুরু করে। বৈদিক সাহিত্যে বিশেষ করে ঋগ্বেদে তাদের বসতি

স্থাপনকারী অঞ্চলকে সপ্তসিন্ধু বা সাত নদীর দেশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এই বর্ণনা থেকে বোঝা গেছে যে, আর্যরা দ্বিতীয় পর্যায়ে আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে বাস করতো। কেননা এ-অঞ্চলে যে সাতটি নদীর অস্তিত্বের কথা জানা যায় সেগুলো হচ্ছে- বিপাশা, রাভি, বিতস্তা (ঝিলাম), চিনাব, শতদ্রু, সরস্বতী ও দৃশদ্বতী।

সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে আর্যদের অবস্থানকালীন সময়ের তেমন উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। এতে ধারণা করা হয় এসময়ে আর্যরা তাদের যাযাবরবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে পারেনি। তাদের মূল পেশা হিসেবে পশুপালন অব্যাহত থাকায় তাদের পক্ষে তখনও স্থায়ী বসতি গড়া সম্ভব হয়নি। এ-কারণে তাদের এসময়কার জীবনব্যবস্থা সম্বন্ধে জানার মতো প্রয়োজনীয় প্রত্ন-নিদর্শন নির্দিষ্ট কোথাও পাওয়া সম্ভব হয়নি। পাঞ্জাবের সমভূমিতে আর্যদের ছড়িয়ে পড়ার প্রধান কারণ হিসেবে মনে করা হয় পশুচারণভূমির আকর্ষণ। বৈদিক সাহিত্য থেকে বুঝা যায় এর পরে আর্যরা স্থানীয় অনার্য অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের বিভিন্ন বর্ণনা ঋগ্বেদের বিভিন্ন মণ্ডলে রয়েছে, যেখানে স্থানীয়দেরকে দাস বা দস্যু আখ্যা দেয়া হয়েছে। এবং ঋগ্বেদের এ জাতীয় বর্ণনা থেকে বোঝা যায় স্থানীয় অনার্যরা সহজেই আর্যদের হাতে পরাস্ত হয়েছিলো।

পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে,- 'ঋগ্বেদের রচনাক্ষেত্র ছিল প্রধানত কুরু, উত্তর-দক্ষিণ পাঞ্চাল দেশ অর্থাৎ বর্তমানের পশ্চিম যুক্তপ্রদেশ যা ছিল আর্যগণের ভারত আগমনের পর তৃতীয় আবাসভূমি। আর্যগণের প্রথম আবাসভূমি ছিল কাবুল ও স্বাত নদীর উপত্যকা (আফগানিস্তান)। দ্বিতীয় অস্থায়ী আবাস তারা নির্বাচন করেন সপ্তসিন্ধুতে (পাঞ্জাব), এবং তৃতীয় স্থান হলো গঙ্গা-যমুনা অধ্যুষিত উর্বর উপত্যকায়। এই আলোচনা থেকেই বোঝা যায় যে, কেন এই গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী পূতভূমি তীর্থক্ষেত্রকে আর্যাবর্ত বলা হয়।'- (দর্শন-দিগদর্শন দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০)

আর্যরা বরাবরই যোদ্ধা জাতি হিসেবে পরিচিত। ঘোড়সওয়ার আর্যদের মাধ্যমেই ভারতবাসীরা প্রথম ঘোড়ার সঙ্গে পরিচিত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে পাওয়া আর্যদের ব্যবহৃত লোহা ও ব্রোঞ্জে নির্মিত কুঠার, তলোয়ার, তীর-ধনুক প্রভৃতি থেকে জানা যায় তারা লোহার ব্যবহার জানতো। স্থানীয় অনার্য অধিবাসীদের পরাজিত করার পর নিজেদের ভেতর অন্তর্কলহ শুরু হয়ে যায় বলে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন এবং দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে এরকম নৈরাজ্য। এ-প্রসঙ্গে এ কে এম শাহনাওয়াজ বলেন-
'বৈদিক সাহিত্য সূত্র থেকে জানা যায় শুরুর দিকে ভারতে প্রবেশকারী আর্যরা পাঁচটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত লেগেই থাকতো। এ সময় কোন কোন গোষ্ঠী অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে অনার্যদের সহায়তা নিতো। এই পাঁচ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান গোষ্ঠীর নাম ছিল 'ভরত'। অনেকের মতে এ নাম থেকেই 'ভারতবর্ষ' নামটির সৃষ্টি হয়েছে। ভরত গোষ্ঠীর প্রধানের নাম ছিল 'দিবদাস'। তাঁর পুত্র সুদাস 'পুরু' নামে অন্য এক আর্য

গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এ যুদ্ধে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন স্থানীয় অধিবাসীরা। 'দশরাজার যুদ্ধে' জয়লাভের খ্যাতি ছিল সুদাসের, পুরাণে উল্লিখিত 'কুরু' জাতির সৃষ্টি হয়েছিল ভরত ও পুরু গোষ্ঠী একত্রিত রূপ থেকে। মূলত আর্যরা সপ্তসিন্ধু অঞ্চল থেকে তৃতীয় পর্যায়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। পরবর্তী বৈদিক যুগে এরা গঙ্গা ও যমুনার উপত্যকায় বসতি বিস্তার করে। এর পর তারা এগিয়ে যায় অযোধ্যার দিকে। সরযু নদীর তীরে বসতি স্থাপন করে। 'মধ্যদেশ' বলে চিহ্নিত একটি অঞ্চলেও আর্যবসতি গড়ে উঠেছিল। এর অবস্থান পূর্ব পাঞ্জাবের সরস্বতী নদী থেকে এলাহাবাদের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মধ্যে ছিল বলে মনে করা হয়।'- (ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা-৫৮)

আর্যরা এরপর মধ্যদেশ ত্যাগ করে আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। বারাণসী, বিহার, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলের দিকে তারা অগ্রসর হয়। বৈদিক যুগে এ অঞ্চলসমূহকে বলা হতো 'প্রাচী' দেশ। এসব অঞ্চলের শক্তিশালী স্থানীয় অধিবাসীরা দীর্ঘদিন আর্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে পেরেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ও উন্নত অস্ত্রের ধারক আর্যদের হাতে তাদের পরাজয় ঘটে। তবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আর্যরা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বে অবস্থিত আসাম রাজ্য অধিকার করতে পারেনি বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।
আর্যদের আরেক ধারা মধ্যদেশের পশ্চিমে অবস্থিত মালব, সৌরাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে। ফলে স্থানীয় লোকদের উপর আর্য সভ্যতার প্রভাব প্রতিফলিত হতে থাকে। এই অঞ্চলকে বলা হতো 'প্রতীচ্য' বা 'পাশ্চাত্য' দেশ। তবে এ সমস্ত অঞ্চলের মানুষের ওপর সম্পূর্ণরূপে আর্যপ্রভাব প্রতিফলিত করা যায়নি। আর্য সাফল্য সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় পরবর্তী বৈদিক যুগে। এ সময়ে পশ্চিম ভারতকে আর্যাবর্তের অংশ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্যাবর্ত অর্থাৎ আর্যদের বসতিস্থানের সীমা উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।

শুরুর দিকে উত্তর ভারতে যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে আর্যদের অবস্থান তৈরি করে নিতে হলেও কিন্তু দক্ষিণ ভারতে আর্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক পরে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে। এ কে এম শাহনাওয়াজ বলেন,- 'দু'টো কারণে দক্ষিণ ভারতে আর্যরা বিলম্বে প্রবেশ করেছে। প্রথমত, ছোটনাগপুর ও মধ্য প্রদেশের দুর্গম পাহাড়ের বাধা অতিক্রম করা সহজ ছিল না, দ্বিতীয়ত, দ্রাবিড় জাতির কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করাটাও খুব সুবিধাজনক হবে বলে আর্যরা বিবেচনা করেনি। রামায়ণ ও মহাভারতের সূত্র থেকে জানা যায়, পববর্তী বৈদিক যুগে আর্য ঋষিদের প্রভাবে দক্ষিণ ভারতে আর্য আগমন সহজ হয়েছিল। এই ঋষিরাই দক্ষিণ ভারতে আর্য সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেন। মহাকাব্যের বর্ণনা অনুযায়ী রামচন্দ্র দক্ষিণ ভারতের বনে অর্থাৎ বিন্ধ্য পর্বতে বনবাসী হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর দেখা হয়েছিল আর্য মুনি 'অগস্ত্যের' সঙ্গে। এভাবেই ধীরে ধীরে দক্ষিণ ভারতে আর্য প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।'- (ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা-৫৯)

.

আর্যদের সমাজ-জীবন :

আর্যদের সমাজ-জীবন বা তাদের সম্পর্কে যা-কিছু ধারণা তার প্রায় সবকিছুরই জানার উৎস হলো বৈদিক সাহিত্য ভাণ্ডার। এক্ষেত্রে আর্যদের সম্পর্কে প্রথম ধারণা স্পষ্ট হয় প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ থেকে। আর্যদের সমাজ ছিলো মূলত পুরুষতান্ত্রিক। সমাজে পুরুষেরই প্রাধান্য ছিলো। পশুপালন, শিকার– এসবে পুরুষের কাজই বেশি ছিলো। চাষ শেখবার পরে মেয়েরা খেত পাহারা দেওয়া, কাপড় বোনা, রান্না, শিশু, বৃদ্ধ ও পুরুষদের সেবায় দিন কাটাতো; হয়তো কিছু সবজি ও ফসলের চাষও করতো। সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'প্রাচীন ভারত' গ্রন্থে বলেন,- 'খুব অল্পকালের মধ্যেই আর্যরা দক্ষিণপূর্ব দিকে এগোতে লাগল, নতুন নতুন অঞ্চলের লোকের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনযাত্রা, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচরণ, সামাজিক রীতিনীতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিল; যজুর্বেদের যুগ থেকেই এই পরিবর্তন চোখে পড়ে। বীজ বোনা থেকে ফসল তোলার মধ্যে সময়টাতে কিছু শিল্পকর্ম, ধাতুর, মাটির, কাঠের, চামড়ার, পুঁতির কাজ চালু হলো। পেশার সংখ্যা বাড়তে লাগলো, বেশবাসে পরিবর্তন এল, নারীর স্বাধীনতা কমতে লাগল ক্রমে। পরাজিত আদিবাসীরা দাসে পরিণত হলো; ভারী কাজের বোঝা এবং যজুর্বেদের যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দাসত্ব তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। যেমন নারীর কাজ ঠিক হয়ে গেল স্বামী সন্তান ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের সেবা এবং বাড়ির কাজ।'

পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর 'দর্শন-দিগদর্শন' গ্রন্থে বলেন,- 'ঋগ্বেদের বর্ণনানুযায়ী আর্যাবর্তের অধিবাসীগণের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি ও পশুপালন। সে যুগের প্রদেশ গভীর অরণ্যে আবৃত থাকায় তাঁদের সুবিধাও হয়েছিল প্রচুর। আর্যগণের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, রুটি, দুধ, ঘি এবং মাংস– বিশেষত গরু ও বাছুরের। এখনকার মতো মশলার প্রচলন না থাকায় সিদ্ধ মাংসের ঝোল-ই– যা ছিল হিন্দী-ইউরোপীয় জাতির একত্রে বাসকালে প্রধান খাদ্য– খুব প্রিয় ছিল। সোমরস ছিল তাঁদের প্রিয় পানীয় এবং চিত্ত বিনোদনের বিষয় ছিল নৃত্যগীত। দেশের অধিবাসী কামার-কুমোরগণ তাদের জাত-ব্যবসা করত। সুতাকাটা ও বয়নশিল্প প্রত্যেক আর্যগৃহেই প্রচলিত ছিল, সুতীবস্ত্র ছাড়া চামড়ার পোশাকও ব্যবহৃত হতো। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মতো মূর্তিপূজাও হতো; কিন্তু আর্যগণ তা অপছন্দ করতেন, বিশেষত প্রতিযোগী সিন্ধুবাসীগণের লিঙ্গ পূজাকে তাঁরা ঘৃণার দৃষ্টিতেই দেখতেন, একে বলতেন, 'শিশ্নদেবাঃ'। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে আর্যাবর্তের আর্যগণ দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন– যেমন ইন্দ্র, বরুণ, সোম, পর্জন্য প্রভৃতি। কোনো কোনো স্তোত্র বা শ্লোকে আমরা যেমন কাব্যকলার সুন্দর নিদর্শন পাই, তেমনই পাই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয়।'

বৈদিক সাহিত্যের বিশ্লেষণের মধ্যেই বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতির সার্বিক অবস্থা ও

চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।

.
বৈদিক সভ্যতার লিপি :
বৈদিক সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাসমনস্ক গবেষকদের কৌতুহলি করে তুলে যে, এমন সাহিত্য যারা সৃষ্টি করেছে তাদের লিখন পদ্ধতি কেমন। যেহেতু অনুমান করা হয় যে ঋগ্বেদ সৃষ্টির শুরুতেই আর্যদের কোন লিপি ছিলো না, তাই ম্যাক্স মুলার অনেক বিচার-বিশ্লেষণের পর বলতে চেয়েছেন যে, আর্যরা লিখতে শিখেছে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পর। কিন্তু অনেকেই এ মত গ্রহণ করেননি। তাঁদের বিচারে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতেই আর্যরা লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পেরেছিলো। বৈদিক ভারতীয়দের প্রাচীনতম লিপিকে বলা হয় 'ব্রাহ্মীলিপি'। ফিনিশীয় বর্ণমালার সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায়।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, নবম খ্রিস্টপূর্বাব্দেই ভারতের আর্যরা ফিনিশীয় বর্ণমালা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো। কিন্তু এই মতামত ভান্ডারকার প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিত গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা মনে করেন, ভারতবাসী লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পেরেছিলো ঋগ্বেদের সময়কাল থেকেই। ভান্ডারকার বিশ্বাস করেন, প্রাচীন ভারতীয় চিত্র বা বর্ণলিপির ধারণা থেকেই ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব ঘটেছিলো। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সিন্ধু সভ্যতায় যে চিত্রলিপি পাওয়া গেছে এই চিত্রলিপি প্রমাণ করেছে প্রাচীন ভারতীয় বর্ণমালার উৎস ছিলো এই সিন্ধুলিপি। গবেষকদের মতে, ব্রাহ্মীলিপির উৎস সিন্ধুলিপির ভেতরেই খুঁজে পাওয়া যাবে। আবিষ্কৃত সবচেয়ে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হয়েছিলো বলে জানা যায়।
…

২.০ : বৈদিক সাহিত্য

ব্রহ্মবিদদের কাছে 'বেদ' মানে যদিও পবিত্র ও পরম জ্ঞান, তবুও পরবর্তীকালে 'বেদ' বলতে এক নির্দিষ্ট সাহিত্যই বোঝায়– ভারতবর্ষীয়, তথা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সর্বপ্রাচীন সাহিত্য। তবে এই সাহিত্য অর্থে 'বেদ' বলতে কোনো একটি গ্রন্থ বিশেষ বোঝায় না– প্রায় শতাধিক গ্রন্থের সমষ্টি বোঝায়। যদিও চলতি কথায় আমরা শুধুমাত্র একধরনের রচনা 'সংহিতা'কেই 'বেদ' আখ্যা দিয়ে থাকি, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই শতাধিক গ্রন্থের সমষ্টিকেই 'বৈদিক সাহিত্য' বলা হয়।

মুণ্ডক-উপনিষদের শ্রুতিতে আছে-

'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি–পরা চৈবাপরা চ'। (মুণ্ডক-১/১/৪)।।
'তত্রাপরা–ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা–যয়া তদক্ষরষধিগম্যতে। (মুণ্ডক-১/১/৫)।।

অর্থাৎ :

ব্রহ্মবিদরা বলেন, দুটি বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। একটির নাম পরাবিদ্যা, অপরটির নাম অপরাবিদ্যা। (মুণ্ডক-১/১/৪)।। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব– এই চার বেদ এবং শিক্ষা (উচ্চারণ), কল্প (আচার-অনুষ্ঠান), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দার্থবিদ্যা), ছন্দ ও জ্যোতিষ (জ্যোতির্বিজ্ঞান) নিয়ে যে ছয় বেদাঙ্গ– এগুলি হলো অপরাবিদ্যা। আর যে বিদ্যাবলে অক্ষরব্রহ্মকে জানা যায়– তা হলো পরাবিদ্যা। (মুন্ডক-১/১/৫)।।

এই শ্রুতির মধ্যেই বৈদিক সাহিত্যের একটি সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়। এখানে বৈদিক সাহিত্যকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগে আছে ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যার উৎস পরাবিদ্যা, যার আশ্রয় বেদেরই অঙ্গীভূত এক শ্রেণীর রচনা যাকে আমরা উপনিষদ বলি এবং অন্য ভাগে যাবতীয় জাগতিক জ্ঞানের উৎস অপরাবিদ্যা, যেখানে প্রথমেই আছে চারটি বেদ– ঋক্, সাম, যজু এবং অথর্ব। তারপর রয়েছে ছয়টি বেদাঙ্গ– শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।

এছাড়া খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'ও বলা হচ্ছে-

'সামর্গ্যজুর্বেদা-স্ত্রয়স্ত্রয়ী। অথর্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোবিচিতির্জোতিষমিতি চাঙ্গানি।
এষ ত্রয়ীধর্মশ্চতুর্ণাং বর্ণানামাশ্রমাণাং চ স্বধর্মস্থাপনাদৌপকারিকঃ।' (অর্থশাস্ত্র-১/৩/১)।।

অর্থাৎ :

সামবেদ, ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ– এই তিনটি 'ত্রয়ী' নামে পরিচিত। অথর্ববেদ এবং ইতিহাসবেদও (যথা, মহাভারত-পুরাণাদি) বেদ-শব্দবাচ্য। শিক্ষা (বর্ণাদির উচ্চারণস্থানের উপদেশবিষয়ক শাস্ত্র), কল্প (যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের উপদেশবিষয়ক আশ্বলায়নাদি-প্রণীত শাস্ত্র), ব্যাকরণ (শব্দের শুদ্ধ্যশুদ্ধির উপদেশবিষয়ক এবং পাণিনিপ্রভৃতির দ্বারা প্রণীত শাস্ত্র), নিরুক্ত (যাস্কপ্রণীত শব্দনির্বচনবিষয়ক শাস্ত্র), ছন্দোবিচিতি (ছন্দোনিরূপণ-বিষয়ক পিঙ্গলাদিপ্রণীত

শাস্ত্র) ও জ্যোতিষ (সূর্যাদির অবস্থান ও গতিপ্রভৃতির প্রতিপাদক শাস্ত্র)– এই ছয়টি (বেদের) অঙ্গ (তাই বলা হয়– ষড়ঙ্গো বেদঃ)।
এই ত্রয়ীতে (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র–) চার বর্ণের এবং (ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস–) চার আশ্রমের নিজ নিজ ধর্ম বা কর্তব্য ব্যবস্থাপিত হওয়ার জন্য এই শাস্ত্র সকলের উপকার সাধন করে থাকে। (অর্থশাস্ত্র-১/৩/১)।।

এখানে দুটি বাক্যে বৈদিক সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও বৈদিক সাহিত্যের সাধারণপরিচয়টুকু স্পষ্ট করতে হলে আমাদেরকে একটু ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় আলোচনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে ‘বৈদিক সাহিত্য’ অর্থে এই ‘বেদ’-কে প্রধানত চারটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেমন-

ক) ‘সংহিতা’ বা সংগ্রহ– গান, স্তোত্র, মন্ত্র প্রভৃতির সংকলন।
খ) ‘ব্রাহ্মণ’– গদ্যে রচিত একজাতীয় যাগযজ্ঞ-বিষয়ক সুবিশাল সাহিত্য।
গ) ‘আরণ্যক’– অরণ্যে রচিত একজাতীয় সাহিত্য, বিশ্ব-রহস্যের সমাধান অন্বেষণই তার প্রধান উদ্দেশ্য।
ঘ) ‘উপনিষদ’– আক্ষরিক অর্থে গুহ্য-জ্ঞান, দার্শনিক তত্ত্বের বিচারই এর প্রধান বিষয়বস্তু। এই উপনিষদকে ‘বেদান্ত’ সাহিত্যও বলা হয়। যদিও ‘আরণ্যক’ ও ‘উপনিষদের’ মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, বেদান্ত-সম্প্রদায়ের পরবর্তী দার্শনিকেরা ‘আরণ্যকে’র বদলে ‘উপনিষদ’ বাক্যের উপরই অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এই বিভাগ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার যে,–
‘ব্রাহ্মণ’, ‘আরণ্যক’ ও ‘উপনিষদ’-এর মধ্যে সীমারেখাগুলি সব সময় সুস্পষ্ট নয়। অর্থাৎ, যদিও রচনাকালের দিক থেকে ‘ব্রাহ্মণে’র পর ‘আরণ্যক’ এবং ‘আরণ্যকে’র পর ‘উপনিষদে’র সৃষ্টি, তাছাড়া যদিও ‘ব্রাহ্মণে’র মূল আলোচ্য-বিষয়ের সঙ্গে ‘আরণ্যক’ ও ‘উপনিষদে’র আলোচ্য বিষয়ের মৌলিক প্রভেদ সুস্পষ্ট, তবুও ‘আরণ্যক’-গুলি অনেকাংশেই ‘ব্রাহ্মণে’র অন্তর্ভুক্ত এবং ‘উপনিষদ’গুলি অনেকাংশেই ‘আরণ্যকে’র অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই ‘আরণ্যক’ ও ‘উপনিষদ’কেও ‘ব্রাহ্মণে’র অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গ্রহণ করবার প্রথা আছে এবং এই অর্থেই ‘বেদ’-এর দুটি ভাগ– ‘মন্ত্র’ বা ‘সংহিতা’ এবং ‘ব্রাহ্মণ’।
দ্বিতীয়ত, রচনাকাল ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে ‘সংহিতা’, ‘ব্রাহ্মণ’, ‘আরণ্যক’ ও ‘উপনিষদে’র মধ্যে পার্থক্য যতখানিই হোক না কেন, অন্তত পরবর্তী কালে এগুলির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা স্বীকার করা হয়েছে; প্রত্যেকটি ‘ব্রাহ্মণ’, ‘আরণ্যক’ ও ‘উপনিষদ’ কোনো না কোনো ‘সংহিতা’র সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে এবং উক্ত ‘সংহিতা’-রই ক্রম-পরবর্তী অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ‘সংহিতা’ থেকে ‘উপনিষদ’ পর্যন্ত সাহিত্যকে ‘বেদ’ আখ্যা দেওয়া হয় বলেই- এবং এই অর্থে ‘বেদ’-এর সর্বশেষ ভাগ বলতে যে-হেতু

'উপনিষদ'ই-সেই-হেতু 'উপনিষদ'কে 'বেদান্ত'ও বলা হয়। স্বভাবতই, পরবর্তী কালের যে-দার্শনিক সম্প্রদায় প্রধানত এই 'উপনিষদে'র উপরই নির্ভরশীল তাকেও 'বেদান্ত-দর্শন' বা অনেক সময় শুধু 'বেদান্ত'–আখ্যা দেওয়া হয়।'- (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৯৮)

গবেষক ম্যাক্স মুলারের মতে বৈদিক সাহিত্য খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিলো বলে অনুমান করা হয়। পণ্ডিতদের মধ্যে বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম সংহিতা ঋগ্বেদের রচনাকাল ১২০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। পরবর্তী সংহিতা ও প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলির রচনাকাল ১০০০ থেকে ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও প্রাচীন আরণ্যক উপনিষদগুলির রচনাকাল ৮০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। এবং পরবর্তী উপনিষদ ও বেদাঙ্গের প্রধান গ্রন্থগুলির রচনাকাল ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগে উত্তরণের এক স্পষ্ট ছবি বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় বলে বিদ্বানদের অভিমত। যদিও ঋগ্বেদ রচনার সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

বৈদিক সাহিত্যের বহু প্রাচীন অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও আজও যা টিকে আছে আকারে তা সুবিশাল। তার কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখা যাক।

.

২.১ : সংহিতা

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে 'সংহিতা' বা সংকলন প্রধানত চারটি–
ক। ঋগ্বেদ-সংহিতা
খ। সামবেদ-সংহিতা
গ। যজুর্বেদ-সংহিতা
ঘ। অথর্ববেদ-সংহিতা।

সাধারণত 'সংহিতা' শব্দটি বাদ দিয়ে এগুলিকে 'ঋগ্বেদ', 'যজুর্বেদ' ইত্যাদি নামেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সংহিতা হলো মন্ত্র। যা থেকে কর্ম ও অনুষ্ঠানের উপকরণাদির জ্ঞান হয় তাকে মন্ত্র বলে। সংহিতা ভাগের মন্ত্রগুলো সাধারণত পদ্যে রচিত।

.

ক। ঋগ্বেদ-সংহিতা :

ঋগ্বেদ-সংহিতা হলো প্রাচীনতম সংহিতা। বিদ্বান-পণ্ডিতেরা ঋক্ শব্দের অর্থ করেছেন স্তুতি-গান। অতএব ঋগ্বেদ মানে 'স্তুতি-গানের জ্ঞান', এবং তারই সংকলন হলো 'ঋগ্বেদ-সংহিতা'। এক কালে ঋগ্বেদের নানান শাখা ছিলো। এরকম পাঁচটি শাখার নাম পাওয়া যায়,

সেগুলি হলো– শাকল, বাষ্কল, আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন এবং মাণ্ডুক। কিন্তু বর্তমানে শুধু শাকল শাখাটিই টিকে আছে, অন্যগুলি বিলীন হয়ে গেছে। তাই ঋগ্বেদ বলতে আজকাল আমরা ঋগ্বেদের শাকল শাখাটিই বুঝে থাকি।

ঋক্-সংহিতায় দুই প্রকার বিভাগ দেখা যায়। প্রথম বিভাগ অনুযায়ী ঋক্-সংহিতা মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত ও ঋক্ এই চার ভাগে বিভক্ত। ঋগ্বেদের মন্ত্রের স্তবককে বলে ঋক্ । কয়েকটি ঋক্ নিয়ে গঠিত হয় সূক্ত। কয়েকটি সূক্ত নিয়ে গঠিত হয় অনুবাক, এবং কয়েকটি অনুবাক নিয়ে গঠিত হয় মণ্ডল। সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতায় ১০টি মণ্ডল, ৮৫টি অনুবাক, ১০২৮টি সূক্ত এবং ১০৪৬২টি ঋক্ স্তবক রয়েছে।
দ্বিতীয় বিভাগ অনুযায়ী ঋক্-সংহিতার ৮টি অষ্টক, ৬৪টি অধ্যায় এবং ২০০৬টি বর্গ রয়েছে। তবে 'মণ্ডল' অনুসারে বিভাগই বর্তমানে সুপ্রচলিত। এখানে উল্লেখ্য, ১০২৮টি সূক্তের মধ্যে ১১টি সূক্তকে 'বালখিল্য' বলা হয়; ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হলেও এগুলি এমনই অর্বাচীন যে মধ্যযুগীয় ভাষ্যকার সায়ণাচার্যও এগুলিকে উপেক্ষা করেছেন বলে জানা যায়। সে-প্রেক্ষিতে ঋগ্বেদের সূক্তের সংখ্যা মতান্তরে ১০১৭টি।

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে এই ঋগ্বেদ অবশ্যই সুপ্রাচীন। বেদের সূক্তগুলি রচিত হয়েছে প্রাচীন ভাষায়। বেদে তা ব্যবহৃত হয়েছে বলে আমরা তাকে বৈদিক ভাষা বলি। শুধু যে তার ভাষা ও ছন্দ সবচেয়ে আদিম তাই নয়, বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত সমস্ত রচনাই ঋগ্বেদ-কে মেনে নিয়েছে, কিন্তু ঋগ্বেদে অন্য কোনো রচনার স্বীকৃতি নেই। আর তা থাকার কথাও নয়। কেননা ঋগ্বেদ সহস্রাধিক গান বা কবিতার একটি সংকলন-গ্রন্থ। যাঁরা এই গান বা কবিতা রচনা করেছিলেন তাঁদের লিপি-পরিচিতি ছিলো না– গানগুলি মুখে-মুখে রচিত হয়েছিলো এবং বংশানুক্রমে মুখে-মুখেই চলে এসেছিলো। এই মুখে মুখে রচিত হবার অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হিসেবে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঋগ্বেদের প্রথম-মণ্ডলের আটত্রিশ-সূক্তের চৌদ্দ-সংখ্যক ঋকের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। এই ঋকটি হলো-
'মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জন্য ইব ততনঃ। গায় গায়ত্রমুক্থ্যম্'।। (ঋগ্বেদ-১/৩৮/১৪)।
অর্থাৎ : মুখে শ্লোক রচনা কর, পর্জন্যের ন্যায় তা বিস্তার কর; উক্থস্তুতি বিশিষ্ট গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত (সূক্ত) পাঠ কর।

এইভাবে মুখে মুখে চলতে চলতে কোন-এক পরবর্তী যুগে এগুলি সংহিতা আকারে সংকলিত হয়। অতএব ঋগ্বেদের সংকলন-কাল ও রচনা-কাল এক নয় এবং ওই সহস্রাধিক সূক্তের রচনাকালও এক হতে পারে না। দশ হাজারেরও বেশি ঋক্ বা শ্লোকের এতো বিপুল সংখ্যা থেকে অনুমান করা হয় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রচয়িতার মাধ্যমেই সমুদয় ঋগ্বেদ সংকলিত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেন-
'সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বেদ হলো ঋগ্বেদ মন্ত্রসংহিতা। ঋগ্বেদের মন্ত্রস্রষ্টা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ঋষিগণ হলেন বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে অনেকেই

বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠের সমকালীন। অঙ্গিরার পৌত্র এবং বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ ছিলেন ১৫০০ খৃষ্টপূর্বের লোক, উত্তর পাঞ্চালের (বর্তমান রোহিলাখণ্ড) রাজা দিবোদাসের রাজপুরোহিত। বিশ্বামিত্র ছিলেন দক্ষিণ পাঞ্চালের (বর্তমান আগ্রার অধিকাংশ অঞ্চল) সঙ্গে যুক্ত। বশিষ্ঠ ছিলেন কুরু (মীরাট এবং আম্বালার অধিকাংশ) রাজের পুরোহিত। সমস্ত ঋগ্বেদ ছিল ছয়-সাত পর্যায়ক্রমে ঋষিগণের রচনাকীর্তি। যেমন বৃহস্পতির বংশানুক্রমে–
অঙ্গিরা–> বৃহস্পতি (১৫২০ খৃঃ.পূঃ) –> ভরদ্বাজ (১৫০০ খৃঃ.পূঃ) –> বিদথী –> নর (১৪৬০ খৃঃ.পূঃ) –> সংকৃতি (১৪৪০ খৃঃ.পূঃ) –> গৌরবীতি (১৪২০ খৃঃ.পূঃ) ও রন্তিদেব।
এদের মধ্যে বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, নর, গৌরবীতি ছিলেন ঋগ্বেদের ঋষি। বৃহস্পতি থেকে গৌরবীতি পর্যন্ত (সাংকৃত্যায়নের আদি পুরুষ) বংশধারার ব্যবধান ছয় পুরুষের। ১৫০০ খৃষ্টপূর্বে ভরদ্বাজের যুগ থেকে প্রতি পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে ২০ বছর অন্তর। এইভাবে বংশগতির ধারা হিসেব করে আমি দেখেছি যে, বৃহস্পতি থেকে গৌরবীতির একশত বছরের মধ্যেই ঋষিগণ সর্বাধিক রচনা করেন এবং ঋগ্বেদের সর্বাধিক অংশ এই সময়ের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। এরপর ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে চলে আসছে। প্রাচীন উপনিষদের মন্ত্রসংহিতার (শুক্ল যজুর্বেদের) মাত্র একটি (ঈশ) অংশ, অন্তিম চল্লিশটি অধ্যায় পাওয়া যায়, বাকি সাতভাগ ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকের।'- (দর্শন-দিগদর্শন দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯)

অতএব, সংকলন-কালের কথা বাদ দিয়েও ঋগ্বেদের প্রাচীনতর রচনা এবং অর্বাচীনতর রচনার মধ্যে বহু যুগের ব্যবধান স্বীকৃত হতে বাধ্য। বস্তুত বহু যুগ ধরে এই ঋক্-স্তুতিগুলি রচিত হয়েছে। ঋগ্বেদের সাক্ষ্যেই দেখা যায় প্রাচীনতর অংশের কোনো কোনো কবি সুদূর অতীতে 'পিতাগণ' রচিত মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন, যেমন-
'প্র বো মহে মহি নমো ভরধ্বমাংগূষ্যং শবসানায় সাম।
যেনা নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞা অর্চন্তো অঙ্গিরসো গা অবিন্দন্'।। (ঋগ্বেদ-১/৬২/২)।
'আ রোদসী বৃহতী বেবিদানাঃ প্র রুদ্রিয়া জভ্রিরে যজ্ঞিয়াসঃ।
বিদন্মর্তো নেমধিতা চিকিত্বানগ্নিং পদে পরমে তস্থিবাংসম্'।। (ঋগ্বেদ-১/৭২/৪)।
'ত ইন্দেবানাং সধমাদ আসন্নৃতাবানঃ কবয়ঃ পূর্ব্যাসঃ।
গূঢ়ং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ববিন্দন্ৎসত্যমন্ত্রা অজনয়ন্নুষাসম্'।। (ঋগ্বেদ-৭/৭৬/৪)।
'য উদাজন্-পিতরো গোময়ং বস্বৃতেনাভিন্দন্পরিবৎসরে বলম্ ।
দীর্ঘায়ুত্বমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ'।। (ঋগ্বেদ-১০/৬২/২)।
অর্থাৎ :
যে স্তোত্র উচ্চৈঃস্বরে গীত হতে পারে এরূপ মহৎ স্তোত্র তোমরা সে মহান বলবান ইন্দ্রের উদ্দেশে অর্পণ কর। তাঁর সহায়তায় আমাদের পূর্বপুরুষ অঙ্গিরাগণ, পদচিহ্ন দেখে পূজা করতঃ পণি অসুর দ্বারা অপহৃত গাভী উদ্ধার করেছিলেন। (ঋক্-১/৬২/২)।। যজ্ঞার্হ দেবগণ বৃহৎ দ্যুলোকে ও পৃথিবীতে বর্তমান থেকে রুদ্রের উপযুক্ত স্তোত্র করেছিলেন; মরুৎগণ ইন্দ্রের সাথে উত্তম স্থানে নিহিত অগ্নিকে জেনে তাঁকে লাভ করেছিলেন।

(ঋক্-১/৭২/৪)।। যে অঙ্গিরাগণ সত্যবান, কবি, পূর্বকালীন পিতা ও যাঁরা গূঢ় জ্যোতি লাভ করেছিলেন এবং অবিতথ মন্ত্রদ্বারা ঊষাকে প্রাদুর্ভূত করেছিলেন, তাঁরাই দেবগণের সঙ্গে একত্রে প্রমত্ত হতেন। (ঋক্-৭/৭৬/৪)।। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা আমাদের পিতাস্বরূপ, তোমরা গোধন তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলে। তোমরা এক বৎসরকাল যজ্ঞ করে গোধনের অপহরণকারী বল নামক শত্রুকে নিধন করেছিলে। তোমরা দীর্ঘায়ু হও। আমি মানব এসেছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর। (ঋক্-১০/৬২/২)।।

আবার ঋগ্বেদে সুপ্রাচীন অতীতের স্মৃতি উদ্ধৃত করবার দৃষ্টান্তও বিরল নয়, যেমন-
'কৃত্যানি সখ্যা বভূবূঃ সচাবহে যদবৃকং পুরা চিৎ।
বৃহন্তং মানং বরুণ স্বধাবঃ সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে'।। (ঋগে¦দ-৭/৮৮/৫)।
'সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে'।। (ঋগে¦দ-১০/১৯১/২)।
অর্থাৎ :
হে বরুণ! আমাদের সে সখ্য কোথায় হয়েছিল? পূর্বকালে যে হিংসারহিত সখ্য ছিল তাই সেবা করছি। হে অন্নবান বরুণ! তোমার মহান ভূতগণের বিচ্ছেদকারী সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহে যাব। (ঋক্-৭/৮৮/৫)।। হে স্তবকর্তাগণ! তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ করা, তোমাদের মন পরস্পর একমত হোক। অধুনাতন দেবতাগণ প্রাচীন দেবতাদের ন্যায় একমত হয়ে যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করছেন। (ঋক্-১০/১৯১/২)।।

আধুনিক বেদবিদেরা ঋগ্বেদে সংকলিত বিভিন্ন স্তরের রচনার পারম্পর্য নির্ণয় করবার নানা রকম প্রচেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে দশম মণ্ডলে সংকলিত সূক্তগুলি যে অন্যগুলির তুলনায় অনেক পরবর্তীকালের রচনা এ-বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডলের সূক্তগুলিকে সর্বপ্রাচীন বলে গণ্য করা হয়। প্রথম ও অষ্টম মণ্ডল সম্ভবত এই দুইয়ের মধ্যবর্তীকালে রচিত হয়েছিলো। নবম মণ্ডলটি ছিলো একটি পৃথক সংকলন বিশেষ; যা পরবর্তীকালে ঋগ্বেদে সংযোজন করা হয়। এই মণ্ডলে সোম সংক্রান্ত সূক্তগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত হয়েছে। তবে এ-কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, ঋগ্বেদের এই স্তর-বিভাগ মোটের উপর নির্ভরযোগ্য হলেও তার উপর যন্ত্রের মতো নির্বিচারে নির্ভর করা যায় না বলে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন। কেননা, দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডলের মধ্যে সংকলিত হলেও কোনো কোনো সূক্ত ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির বিচারে অনেক অর্বাচীন বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে।

ঋগ্বেদে সংকলিত সহস্রাধিক সূক্তগুলি যে স্বভাবতই এক-আধজনের রচনা হতে পারে না তা আগেই বলা হয়েছে। বহু কবি বা ঋষি সুদীর্ঘ যুগ ধরে এগুলি রচনা করেছিলেন। 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থগুলি ছাড়াও পরবর্তীকালে রচিত 'অনুক্রমণী' নামের একজাতীয় গ্রন্থে ঋগ্বেদের প্রতিটি সূক্তের কবি বা ঋষির নামের তালিকা বা সূচীপত্র, দেবতা, ছন্দ– এবং এঁদের সম্বন্ধে নানা

পৌরাণিক উপাখ্যানও– পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ‘অনুক্রমণী’ রচনা করেছিলেন শৌনক এবং ‘সর্বানুক্রমণী’ রচনা করেছিলেন কাত্যায়ন। কিন্তু ঋষি বা কবিদের ওই নাম এবং তাঁদের সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী থেকে কোনো প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না বলে ঋগ্বেদ যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তবে এখানে কৌতুহলোদ্দীপক বৈশিষ্ট্য হলো-

‘প্রথম, নবম ও দশম মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্তের কবি বা ঋষি হিসেবে প্রায়ই এক-একটি স্বতন্ত্র নাম পাওয়া যায়; কিন্তু দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডলের কবি হিসেবে পাওয়া যায় ছয়টি গোত্রের নাম– গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ এবং বশিষ্ঠ। অর্থাৎ, দ্বিতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তই গৃৎসমদ-গোত্রীয় কবির রচনা, তৃতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তই বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় কবি বা ঋষির রচনা, ইত্যাদি। অতএব ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশগুলি যাঁরা রচনা করেছিলেন গোত্র-পরিচয়েই তাঁদের পরিচয়। এই কারণে দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডলকে সাধারণত ইংরেজীতে ‘Family Books’ বলা হয়, যদিও অবশ্যই ‘গোত্র’ আর ‘Family’ এক কথা নয় এবং এই কারণে ‘Family Books’ নামটি কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।’- (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১০০)

আদিতে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি ঠিক কী উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিলো এ-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রতিটি বৈদিক মন্ত্রেরই কোনো-না-কোনো যজ্ঞে প্রয়োগ বা বিনিয়োগ ছিলো। কিন্তু পরবর্তী কালে যে-মন্ত্রকে যে-যজ্ঞে যে-ভাবে ব্যবহার করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আদিতেও অনুরূপ উদ্দেশ্যেই মন্ত্রগুলি রচিত হয়েছিলো এমন মনে হয় না। কেননা, বৈদিক সূক্তগুলি রচিত হবার সময় থেকেই বৈদিক মানুষদের মধ্যে নানা রকম যাগ-যজ্ঞের প্রচলন থাকলেও বৈদিক যজ্ঞের আদি-রূপ এবং পরবর্তী-রূপ এক নয়। পরবর্তী কালে বৈদিক যজ্ঞ অত্যন্ত জটিল ও পল্লবিত রূপ ধারণ করেছিলো, এমনকি যজ্ঞের আদি-উদ্দেশ্যও অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছিলো।

আবার সূক্তগুলি আধুনিক অর্থে বিশুদ্ধ গান বা কবিতা ধরনের কিছু ছিলো মনে করাও সঙ্গত হবে না, কেননা অমন প্রাচীন পর্যায়ের সাহিত্য আধুনিক অর্থে বিশুদ্ধ গান বা কবিতা হতেই পারে না। অর্থাৎ যে-উদ্দেশ্যেই এগুলি রচিত হোক না কেন এগুলির কোনো-না-কোনো ব্যবহারিক বা প্রয়োগের দিক নিশ্চয়ই ছিলো, যদিও আজ তার সুনিশ্চিত ধারণা পাওয়া সম্ভব নয় হয়তো।

পণ্ডিতদের আরও অভিমত হলো, সমস্ত সূক্তের সম্পূর্ণ অর্থও আজ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। তার কারণ, ঋগ্বেদের ভাষা ও ভাব অত্যন্ত প্রাচীন– এমনকি অনেক সময় আদিম পর্যায়ের। ঋগ্বেদের যে-সব ভাষ্যকারের রচনা এখনও টিকে আছে তার মধ্যে সর্বপ্রাচীন বলতে যাস্ক-এর ‘নিরুক্ত’ নামক গ্রন্থ। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে যাস্কের কাল-নির্ণয় করা হয়। ‘নিরুক্ত’ গ্রন্থে তিনি ঋগ্বেদের বহু অংশের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু স্বয়ং যাস্ক অন্তত সতেরো জন পূর্বাচার্যের কথা উল্লেখ করেছেন বলে জানা যায়, ঋগ্বেদের

ব্যাখ্যায় যাঁরা সকলে একমত নন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে অর্থহীন ও পরস্পরবিরোধী বলেও প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলেন। তার মানে সেই সুদূর প্রাচীন কালেই ঋগ্বেদের অর্থ অনেকাংশে বিতর্ক-সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সায়ণাচার্য ঋগ্বেদের একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য রচনা করেছেন। কিন্তু ঋগ্বেদের রচনাকাল এবং সায়ণ-ভাষ্যের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অত্যন্ত সুদীর্ঘ বলেই কোনো বিদ্বান-পণ্ডিত এই ভাষ্যকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে প্রধানত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে নতুন করে ঋগ্বেদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতদের অভিমত হলো, সায়ণের ভাষ্য অনেক ক্ষেত্রে অবশ্যই কষ্টকল্পিত; তবুও তিনি অনেকাংশেই সুপ্রাচীন ঐহিহ্যের উপর নির্ভর করেছেন– তাই এ-ভাষ্যকে এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করবার প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত নয়।

অতএব বুঝাই যাচ্ছে, ঋগ্বেদ নিয়ে আলোচনায় অনেক জটিল সমস্যা রয়েছে যা অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না। কিন্তু একই-সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে, ঋগ্বেদের অনেক অংশ দুর্বোধ্য হলেও আবার বেশির ভাগ অংশেরই অর্থ সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত। এবং তার উপর নির্ভর করেই সামগ্রিকভাবে বৈদিক সমাজ ও বৈদিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে একটা নির্ভরযোগ্য ধারণা পাওয়া অসম্ভব নয়। এর গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেবীপ্রসাদ বলেন-
‘সুদীর্ঘ যুগ ধরে আমাদের দেশে এই বেদ নিয়ে নানা রহস্যজাল বিস্তার করা হয়েছে : বেদই চরম জ্ঞানের চূড়ান্ত আকর, বেদের তত্ত্ব নাকি এমনই গূঢ় ও গভীর যে জন্মজন্মান্তরের সংস্কার ছাড়া তাতে অধিকারই জন্মায় না। বলাই বাহুল্য, এ-জাতীয় কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বেদের ব্যাখ্যা নিয়ে বিদ্বানমহলের সমস্ত সমস্যা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে সন্দেহ নেই : যাঁরা ঋগ্বেদ রচনা করেছিলেন তাঁরা এমন কিছু উন্নত বা সুসভ্য পর্যায়ে জীবন যাপন করতেন না। চাষবাস এবং কারিগরির কাজ সামান্য শিখলেও তাঁরা প্রধানতই পশুপালক ছিলেন এবং তাঁদের রচিত এই সাহিত্যের প্রধানতম বিষয়বস্তু বলতে এই পশুর– এবং সেই সঙ্গে অন্ন, ধন, সন্তান ও নিরাপত্তার– কামনাই। অতএব এ-সাহিত্যে খুব বেশি গূঢ় ও গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অন্বেষণই অবান্তর ও কষ্টকল্পনার পরিচায়ক। অবশ্য ঋগ্বেদের প্রায় সমস্ত সূক্তেই কোনো-না-কোনো বৈদিক দেবতার স্তুতি বা প্রশস্তি করা হয়েছে। কিন্তু তারও উদ্দেশ্য হলো, দেবতারা যেন পার্থিব সম্পদের সহায়ক হন। দ্বিতীয়ত, ...বৈদিক কবিদের কল্পনায় এই দেবতাদের সত্যিই কতখানি আধুনিক আধ্যাত্মিক অর্থে দেবত্ব-প্রাপ্তি হয়েছিল তাও খুবই সংশয়ের বিষয়। তাই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ঋগ্বেদের বৈশিষ্ট্য নয়; প্রধানত বৈশিষ্ট্য বলতে পার্থিব সম্পদের কামনা। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার যেটুকু পরিচয় তা প্রধানত কয়েকটি অর্বাচীন সূক্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাও বহুলাংশে আদিম পৌরাণিক কল্পনার সঙ্গে জড়িত। তাই ঋগ্বেদকে খুব একটা গূঢ় জ্ঞানের আকর মনে করবার সত্যিই কোনো কারণ নেই, যদিও তার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য কোনো অর্থেই তুচ্ছ নয়। বস্তুত আদিম কাব্য হিসেবে– নির্ভীক ও বলিষ্ঠ কল্পনার সম্পদে– এই ঋগ্বেদ বিশ্বসাহিত্যের এক বিরাট গৌরব।’-
(ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১০১)

.
খ। সামবেদ-সংহিতা :
এক কালে সামবেদ-সংহিতার নাকি বহু শাখা ছিলো। কিন্তু বর্তমানে টিকে থাকা মাত্র তিনটি শাখার নাম জানা যায়– কৌথুম, রাণায়নীয় এবং জৈমিনীয় বা তালবকার। এর মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ কৌথুম শাখাই জীবন্ত বা সবচেয়ে প্রচলিত।
সামবেদের ঋক্ বা স্তবক (সূক্ত নয়) সংখ্যা ১৮১০টি। এর মধ্যে কিছু পুনরুক্তি আছে। পুররুক্তিগুলি বাদ দিলে সামবেদ-এ মোট ১৫৪৯টি ঋক্ বা স্তবক সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে ৭৫ ছাড়া বাকি সবই ঋগ্বেদের অষ্টম ও নবম মণ্ডল থেকে সংগৃহীত। অতএব স্বতন্ত্র সাহিত্য-সংকলন হিসেবে সামবেদের বিশেষ কোন মূল্যই নেই বলা যায়। তাহলে সামবেদের প্রকৃত মূল্য কোথায়?

সাম বা সামন্ মানেই হলো সুরঝংকার বা মেলোডি। সুর দিয়ে গাইবার কথা মনে রেখেই যে ঋগ্বেদ থেকে এই ঋক্-গুলি সংকলিত হয়েছে তা এগুলির ছন্দ-বৈশিষ্ট থেকেই অনুমান করা যায়। এগুলির ছন্দ হয় 'গায়ত্রী' না-হয় 'প্রগাথ'। এতে বোঝা যায়, উভয় ছন্দে রচিত সমস্ত ঋকই গান হিসেবে গাইবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিলো। শুধু তাই নয়, যাতে আরও সার্থকভাবে সুর দিয়ে গান হিসেবে গাইবার সুবিধে হয় এই উদ্দেশ্যে সামবেদে সংকলন করবার সময় ঋক্-গুলিতে সচেতনভাবেই কখনো কখনো সামান্য কিছু কিছু অদল-বদল করে নেওয়া হয়েছে। তাই সামবেদের প্রধান কথা গান, সাহিত্য নয়।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'আধুনিককালে আমরা গানের বেলায় কথা বা রচনাভাগের সঙ্গে সুরের যে-রকম সম্পর্ক স্বীকার করি প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্যে তা করা হয়নি। আমরা বলি, 'সুর দেওয়া'– অর্থাৎ কোনো রচনার সঙ্গে কোনো সুর সংযোজিত করা। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে, ঋক্ বা রচনা থেকে সুর যেন স্বভাবতই প্রসূত হয়। এই কারণেই ঋক্-কে বলা হয়েছে 'যোনি'– এই যোনি থেকেই যেমন সামন্ প্রসূত হয়। এ-জাতীয় ধারণার মূলে খুব আদিম পর্যায়ের স্মৃতি টিকে থাকা অসম্ভব নয়। কেননা নৃতত্ত্ববিদদের মতে আদিম মানুষদের মধ্যে ভাষা-ব্যবহারের সঙ্গে সুরের সম্পর্ক অনেকটা এই রকমই।... এইখানে আরও একটি কথা মনে রাখা যায়। আদিম সমাজে গান বলতে আধুনিক অর্থে বিশুদ্ধ কণ্ঠ-সঙ্গীত নয়; তার সঙ্গে শারীরিক অঙ্গভঙ্গির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক চোখে পড়ে।'- (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১০২)

সামবেদ গানেরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো, গান গাইবার সময় পুরোহিতেরা নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে হাত এবং আঙুল নাড়বেন। তবে সামগানের পিছনে যত আদিম পর্যায়েরই স্মৃতি টিকে থাকুক না কেন, সংকলন হিসেবে আমরা সামবেদ-সংহিতাকে যেভাবে পাই তা অবশ্যই আদিম সমাজের পরিচায়ক নয়। পরবর্তী কালে বৈদিক যজ্ঞে নানা ধরনের পুরোহিত নিযুক্ত হতেন; তার মধ্যে এক ধরনের পুরোহিতের নাম 'উদ্গাতা'। যজ্ঞের সময় তাঁদের উপর সামবেদ

গান করবার ভার থাকতো। বিশেষ করে তাঁদের ব্যবহার উদ্দেশ্যেই সামবেদ-সংহিতা সংকলিত।
সামবেদ-সংহিতার প্রধানত দুটি ভাগ– আর্চিক এবং গান। আর্চিকের আবার দুইভাগ– পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক। উদ্গাতা প্রথমে পূর্বার্চিক ভাগের সাহায্যে সুরগুলি আয়ত্ত করবেন– পূর্বার্চিক অংশ যেন সুর মনে রাখবার জন্য গানের প্রথম স্তবকগুলির সংকলন-বিশেষ। তারপর উত্তরার্চিক ভাগের সাহায্যে তিনি বৈদিক স্তোত্রগুলি সুর করে গাইবেন। উত্তরার্চিক ভাগ হলো স্তোত্র সংকলন, প্রতি স্তোত্রে সাধারণত তিনটি করে ঋক্ বা স্তবক। অর্থাৎ, পূর্বার্চিক ভাগে স্তোত্রর প্রথম ঋক্ বা স্তবক অবলম্বনে যে-সব সুর লেখা হয়েছে, উত্তরার্চিকের স্তোত্রগুলি সেই সুরেই গাওয়া হবে।

আর সামবেদের ‘গান’ অংশে সংকলিত গানগুলিতে সাংখ্য-চিহ্ন ব্যবহার করে– এবং পদের অক্ষরগুলির পুনরাবৃত্তি করে– সুরের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বর্তমান কালে সংগীতের স্বরলিপি যাকে বলা হয়। ‘গান’গুলির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, পদের শব্দগুলি ভেঙে ভেঙে সাজাবার সময় মাঝে মাঝে এরকম অর্থহীন উল্লাসব্যঞ্জক শব্দও বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার নাম ‘স্তোভ’। গান গাইবার সময় ফাঁকে ফাঁকে এ-জাতীয় চিৎকার করে উল্লাস প্রকাশ করা হতো– পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের মধ্যে এখনো যে-রকম দেখা যায়। অতএব, দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন-
‘উত্তরকালের বৈদিক যজ্ঞ এবং সে-যজ্ঞে নিযুক্ত উদ্গাতা-পুরোহিতদের সামগান সমাজ-বিকাশের যে-পর্যায়েরই পরিচায়ক হোক না কেন, স্তোভগুলি থেকেই অনুমান করা যায় আদিম বা প্রায় আদিম সমাজেই এ-গানের উৎস। এ-বিষয়ে আরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ‘গান’ নামের অংশে সঙ্কলিত কতকগুলি সঙ্গীতকে বলা হয়েছে ‘গ্রামগেয়-গান’, আর এক অংশকে বলা হয়েছে ‘অরণ্যগেয়-গান’। নাম থেকেই বোঝা যায়, এক-ধরনের গান গাওয়া হতো গ্রামে আর এক ধরনের গান গাইবার জন্য যেতে হতো বনে। কিন্তু ওই গান গাইবার জন্যে বনে যাবার প্রস্তাব কেন? কেননা বিশ্বাস ছিল, এই গানগুলি প্রচণ্ড জাদুশক্তির আধার; তাই সকলের কানে গেলে বিপদের আশঙ্কা আছে। অতএব বনে গিয়ে গানগুলি শিখতে হবে এবং অবশ্যই গুহ্যভাবে এগুলির প্রয়োগ করা হবে। গানের সঙ্গে এ-জাতীয় যাদুশক্তির সম্পর্ক কল্পনাও অবশ্যই আদিম পর্যায়েরই পরিচায়ক। ‘গান’ নামক এই সঙ্কলনটির আরও দুটি ভাগ আছে– ‘উহগান’ এবং ‘উহ্যগান’। প্রথমটি ‘গ্রামগেয়-গানে’র সঙ্গে সংযুক্ত, দ্বিতীয়টি সংযুক্ত ‘অরণ্যগেয়-গানে’র সঙ্গে।’- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১০৩-৪)

.
গ। যজুর্বেদ-সংহিতা :
‘যজুস্’ শব্দের অর্থ হলো যজ্ঞের মন্ত্র। তারই জ্ঞান হলো যজুর্বেদ, এবং এই জ্ঞানের সংকলন যজুর্বেদ-সংহিতা। উত্তরকালের বৈদিক যজ্ঞে সামবেদ যেমন উদ্গাতা নামের পুরোহিতদের বেদ, তেমনি যজুর্বেদ-এর মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করবার ভাব ‘অধ্বর্যু’ নামের

পুরোহিতদের উপর। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যজুর্বেদ-সংহিতার ১০১টি শাখার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বর্তমানে মাত্র পাঁচটি শাখা টিকে আছে। এই পাঁচটি শাখা প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত– কৃষ্ণ-যজুর্বেদ এবং শুক্ল-যজুর্বেদ।
শুক্ল-যজুর্বেদ শুধুমাত্র বিশুদ্ধ মন্ত্রের সংকলন; কিন্তু কৃষ্ণ-যজুর্বেদে মন্ত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কিছুটা ভাষ্য বা ব্যাখ্যা ধরনের রচনারও সংমিশ্রণ রয়েছে। তাই সাধারণভাবে নাম দুটির ব্যাখ্যা করা হয়, 'শুক্ল' বলতে বিশুদ্ধ এবং 'কৃষ্ণ' বলতে অবিশুদ্ধ বা মিশ্রিত মন্ত্রসংকলন।

এছাড়াও যজুর্বেদের এই পক্ষভেদের সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় পৌরাণিক আখ্যায়িকাও প্রচলিত আছে। আখ্যায়িকাটি এরকম-

কথিত আছে, বেদব্যাস বেদমন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ করেন। এই শ্রেণিবিভাগ শেষ হবার পরে, তিনি তাঁর চারজন প্রধান শিষ্যের প্রত্যেককে, এক-একটি বিশেষ বেদে ব্যুৎপন্ন করে, যার যার অধিগত বিদ্যা প্রচারের আদেশ দেন। শিষ্য বৈশম্পায়নের উপর ন্যস্ত হয় যজুর্বেদ প্রচারের ভার। বৈশম্পায়ন স্বনামখ্যাত যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু; তিনি বিশেষ যত্ন করে শিক্ষা দেন তাঁর প্রিয়শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে। কিন্তু বিদ্যার ভারে যাজ্ঞবল্ক্য বিনীত না হয়ে, হয়ে পড়েন ক্রমে উদ্ধত। ফলে, বৈশম্প্যায়ন তাঁকে বেদচর্চার অনুপযুক্ত বলে মনে করে তাঁর অধীত বিদ্যা উদ্গিরণ করে দিতে বলেন।
অধিগত বিদ্যা উগরিয়ে ফেলে দিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য পাণ্ডিত্য-হীন হলেন বটে, কিন্তু বমির সঙ্গে যে-জ্ঞান বাইরে এসে পড়লো, তা এতো মূল্যবান যে তাকে চিরবর্জন করা অসংগত ও অবিধেয় বলে বিবেচিত হলো। কিন্তু এমন মানুষ কে আছে যে এ ক্লেদ গলাধঃকরণ করে তা রক্ষা করবে? তা নেই। কাজেই বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যেরা তিতির পাখির রূপ ধরে এই ক্লেদাক্ত বিদ্যা পুনর্গ্রহণ করলেন। ফলে, তা যথাযথ সংরক্ষিত হলো বটে, কিন্তু ক্লেদাক্ত বিদ্যাকে আর পূর্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা চললো না। তাই তাকে বলা হলো কৃষ্ণ-যজুর্বেদ বা ক্লেদাক্ত-যজুর্বেদ। আর তিতির পাখির রূপ ধরে এই বিদ্যা সংরক্ষণ করা হয়েছে বলে কৃষ্ণ-যজুর্বেদকে নামান্তরে তৈত্তিরীয়-সংহিতাও বলা হয়।
এদিকে যাজ্ঞবল্ক্যের কী হলো? পাণ্ডিত্য-হীন হয়ে তিনি যজুর্বেদ শিক্ষার জন্য বহুদিন সূর্যের তপস্যা করলেন; বেদে সূর্যের দক্ষতা ছিলো অসাধারণ। তাঁর তপস্যায় সিদ্ধ হয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের আবার যজুর্বেদে পূর্ণজ্ঞান লাভ হলো। সূর্য বাজী রূপ ধরে তাঁকে এ জ্ঞান দান করেছিলেন। সূর্য থেকে সরাসরি এ জ্ঞানকে বলা হলো শুক্ল বা নির্মল যজুর্বেদ। আবার বাজী রূপ ধরে সূর্য এই বেদজ্ঞান দিয়েছিলেন বলে শুক্ল-যজুর্বেদকে নামান্তরে বাজসনেয়ী-সংহিতাও বলা হয়।

শুক্ল-যজুর্বেদের একটিমাত্র শাখা পাওয়া যায়, যার নাম 'বাজসনেয়ী-সংহিতা'। অন্যদিকে কৃষ্ণ-যজুর্বেদের চারটি শাখা পাওয়া যায়, এগুলির নাম– 'কাঠক-সংহিতা', 'কপিষ্ঠল-কঠ-সংহিতা', 'মৈত্রায়ণী-সংহিতা' এবং 'তৈত্তিরীয়-সংহিতা' বা 'আপস্তম্ব-সংহিতা'। তবে বর্তমানে যজুর্বেদ-সংহিতা সংকলনে শুক্ল-যজুর্বেদ হলো বাজসনেয়ী-সংহিতা এবং কৃষ্ণ-যজুর্বেদ হলো

তৈত্তিরীয়-সংহিতা। বাজসনেয়ী-সংহিতার ৪০টি অধ্যায়, ৩০৩টি অনুবাক এবং ১৯১৫টি কণ্ডিকা রয়েছে। অন্যদিকে তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ৭টি কাণ্ড, ৪৪টি প্রশ্ন বা প্রপাঠক, ৬৪৪টি অনুবাক এবং ২১৮৪টি কণ্ডিকা বা মন্ত্র রয়েছে।
প্রাচীনকালে যজ্ঞ করবার সময় বৈদিক পুরোহিতদের কাছে এই শাখাগুলির মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। তবে সাধারণভাবে যজুর্বেদ-সংহিতার কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

যজুর্বেদ-সংহিতায় বিভিন্ন রকমের বৈদিক যজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন– অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, রাজসূয়, ইত্যাদি। এইসব বিভিন্ন যজ্ঞে যে-মন্ত্র উচ্চারণ করবার বিধি ছিলো যজুর্বেদ মূলত তারই সংকলন। মন্ত্রগুলির মধ্যে কিছু কিছু ছন্দোবদ্ধ কাব্য, বাকি সব গদ্য। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র বলতে বেশির ভাগই ঋগ্বেদ-সংহিতা থেকে সংগৃহীত। ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত থেকে বিভিন্ন ঋক্ বিভিন্ন যজ্ঞে প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ‘যজুস্’ বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝাতো গদ্যে রচিত মন্ত্রই, এবং এ-জাতীয় মন্ত্রই যজুর্বেদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। তবে সাহিত্য-রচনা বা চিন্তার বিকাশ– কোনোদিক থেকেই এই মন্ত্রগুলির বিশেষ কোনো মূল্য নেই বলেই পণ্ডিতদের অভিমত।
যজুর্বেদের কতকগুলি মন্ত্র খুবই ছোটো ছোটো। যেমন আগুনে আহুতি দেবার সময় ‘ইন্দ্রায় ত্বা’, বা ‘অগ্নায় ত্বা’ ধরনের মন্ত্র। আবার কতকগুলি মন্ত্রে সরল গদ্যে নানা রকম পার্থিব সম্পদের কামনা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন-
‘তনুপা অগ্নেহসি তন্বং মে পাহ্যায়ুর্দা অগ্নেহস্যয়ুর্মে দেহি বর্চোদা অগ্নেহসি বর্চো মে দেহি। অগ্নে যন্মে তন্বা ঊনং তন্ম আপৃণ’।। (শুক্লযজুর্বেদ-৩/১৭)।।
অর্থাৎ : হে অগ্নি, তুমি দেহের পালক, আমার এ শরীর তুমি রক্ষা কর। হে অগ্নি, তুমি আয়ুর দাতা, অকাল মৃত্যু পরিহার করে আমাকে পূর্ণ আয়ুষ্কাল দাও। হে অগ্নি, তুমি তেজের দাতা, আমায় তেজ প্রদান কর। হে অগ্নি, আমার দেহের যে অঙ্গ অপটু, তুমি তার পুষ্টিদান কর।

কিন্তু অনেক মন্ত্রেই এমন বস্তুকে উদ্দেশ্য করে এমন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা হয় যে আমাদের কাছে তা প্রায় অর্থহীন মনে হয়। যেমন, আগুনের উপর রন্ধন-পাত্র স্থাপন করবার সময় মন্ত্র পড়া হবে-
‘বসোঃ পবিত্রমসি। দ্যৌরসি পৃথিব্যসি। মাতরিশ্বনো ঘর্মোহসি বিশ্বধা অসি। পরমেণ ধাম্না দৃংহস্ব মা হ্বার্মা তে যজ্ঞপতি হ্বার্ষীৎ’।। (শুক্লযজুর্বেদ-১/২)।।
অর্থাৎ : হে যজ্ঞাদি কর্মের পবিত্রতা-সম্পাদক, তুমিই হলে আকাশ, তুমিই পৃথিবী, তুমি হলে মাতরিশ্বার কড়াই। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দর্শনে বিরূপ হয়ো না; তোমার যজ্ঞকারক যেন কুটিল না হয়।

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্রগুলি এমনই অর্থহীন ও অসংলগ্ন শব্দরাশির মতো যে

আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ এগুলিকে উন্মাদের প্রলাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু যজুর্বেদে এমন অর্থহীন মন্ত্র কেন?–
‘ভিনটারনিথস্ বলছেন, ভুললে চলবে না যে এগুলি অথর্ববেদ বা এমনকি যজুর্বেদের অন্যান্য অংশে সংরক্ষিত সুপ্রাচীন জনপ্রিয় মন্ত্র নয়; তার বদলে এগুলি হলো উত্তরকালের পুরোহিতদের উদ্ভাবন– যজ্ঞের অসংখ্য অনুষ্ঠানের জন্যে তাঁরা অসংখ্য মন্ত্রও আবিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সেগুলির অর্থসম্ভাবনা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি।
এ-মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর থেকেই বোঝা যায়, বৈদিক যজ্ঞের আদি-রূপ এবং উত্তর-রূপ এক নয়। পরবর্তী কালে– যজুর্বেদের যুগেই– প্রধানত পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাবে বৈদিক যজ্ঞ জটিল অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়েছিল; কিন্তু আদি-পর্বে তা নয়।... আপাতত শুধু একটি কথা বলে রাখা যায় : বৈদিক যজ্ঞের যজুর্বেদে সংরক্ষিত রূপের মধ্যেই অনেক সময় ইঙ্গিত থেকেছে যে এগুলির পিছনে আদিম মানুষদের জাদু-বিশ্বাস ও জাদু-অনুষ্ঠানের স্মৃতি টিকে আছে।’- (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১০৫)

উল্লেখ্য, নৃতাত্ত্বিকদের মতে, ‘জাদু-বিশ্বাস এবং ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দেবতা বা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে, তাঁর উপাসনা করে, তাঁর কাছে মানত করে, তাঁর পূজা করে, তাঁরই করুণায় সিদ্ধি-লাভ করবার কল্পনা। কিন্তু জাদু-বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত মূল কথা হলো একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট ফল পাওয়া যাবে এরকম বিশ্বাস– যেমন অনাবৃষ্টির সময় আকাশে বৃষ্টির একটা নকল তুলতে পারলেই বৃষ্টি হবে। নৃতত্ত্ববিদেরা তাই বলছেন, জাদু-বিশ্বাসের মূল কথা প্রার্থনা-উপাসনা নয়, ভগবানের কাছে আবেদন-নিবেদন করা নয়; তার বদলে নানা রকম আচার-অনুষ্ঠানের সাহায্যে প্রকৃতিকে বশে আনবার– আয়ত্ত করবার– কল্পনাই। নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে, ধর্ম-বিশ্বাসের চেয়ে জাদু-বিশ্বাস অনেক পুরনো। কেননা আদিম মানুষদের মধ্যে সর্বত্রই জাদু-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, ধর্ম-বিশ্বাসের নয়।’

তাই যজুর্বেদে যে বহু বৈদিক দেবতার নাম পাওয়া যায় এবং তাঁদেরই উদ্দেশ্যে মন্ত্র পড়ে নানা রকম আহুতি দেবারও ব্যবস্থা, এগুলিকে পরবর্তী অর্থে পূজা বা উপাসনা মনে করা ভুল হবে। কেননা এই মন্ত্র-উচ্চারণ বা আহুতি প্রভৃতির মূল উদ্দেশ্য দেবতাদের সন্তুষ্ট করা নয়; তার বদলে দেবতাদের বশীভূত করা, বাধ্য করা, আয়ত্তে আনা। বেদ-মীমাংসক অর্থাৎ প্রাচীন মীমাংসা দর্শনেও দেখা যায় যে তাঁরা বিভিন্ন যজ্ঞকে পূজা নয় বরং যজ্ঞের নিজস্ব জাদু-শক্তি তথা অপূর্বের মাধ্যমে কাম্যফল লাভের উপায় হিসেবেই যজ্ঞের তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। এর থেকেই অনুমান হয়, যজুর্বেদের যুগে পুরোহিত শ্রেণী বৈদিক যজ্ঞ প্রসঙ্গে যত রকম জটিলতারই উদ্ভাবন করুন না কেন– এবং যজ্ঞগুলি তাঁদের প্রভাবে যতই রূপান্তরিত হোক না কেন– এগুলি থেকে আদিম পর্যায়ের জাদু-বিশ্বাসের স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি।

.
ঘ। অথর্ববেদ-সংহিতা :
বেদভক্তরা ‘অথর্ব’ বলতে ভেষজবিদ্যা এবং মাঙ্গলিক ক্রিয়াকে বুঝিয়ে থাকেন। এই বেদে যেমন মাঙ্গলিক মন্ত্র আছে তেমনি আবার অমঙ্গলজনক মন্ত্রও আছে। তবে আধুনিক বিদ্বান-গবেষকরা অথর্ববেদ-কে ‘Knowledge of Magic Formulas’ অর্থাৎ জাদু-মন্ত্রের বেদ বা জ্ঞান আখ্যা দিয়েছেন। চলতি কথায় যাকে বলা হয় ঝাড়-ফুঁক বা তুক্-তাক্– অথর্ববেদ আসলে তারই সংকলন।

অথর্ববেদের মাত্র দুটি শাখা টিকে আছে– ‘শৌনক’ এবং ‘পৈপ্পলাদ’। পণ্ডিতেরা প্রথমটিকেই অনেক নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করেছেন। অথর্ববেদ-সংহিতা ২০টি কাণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি কাণ্ড কয়েকটি প্রপাঠকে, প্রতিটি প্রপাঠক কয়েকটি অনুবাকে, প্রতিটি অনুবাক কয়েকটি সূক্তে এবং প্রতিটি সূক্ত কয়েকটি স্তবক বা মন্ত্রে বিভক্ত। মন্ত্রগুলি পদ্য ও গদ্য উভয়রূপেই দৃষ্ট হয়, তবে পদ্যেরই আধিক্য।
এই বেদ-সংহিতায় ২০টি কাণ্ড, ৩৮টি প্রপাঠক, ৯০টি অনুবাক, ৭৩১টি সূক্ত এবং প্রায় ৬০০০ মন্ত্র বা স্তবক রয়েছে। তার মধ্যে বিংশ কাণ্ড বা অধ্যায় অত্যন্ত অর্বাচীন এবং এ অধ্যায়ের প্রায় সবটুকুই ঋগ্বেদেরই সূক্তর সংকলন। এছাড়াও অথর্ববেদের প্রায় এক-সপ্তমাংশ ঋগ্বেদ থেকেই গৃহীত। এবং লক্ষণীয় বিষয় হলো, অথর্ববেদে সংকলিত ঋগ্বেদের সূক্তগুলির প্রায় অর্ধেকই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত; বাকি অর্ধেক প্রধানতই ঋগ্বেদের প্রথম ও অষ্টম মণ্ডল থেকে সংগৃহীত।

‘আর এ-কারণেই অনুমান হয়, অন্তত সংকলন-কালের দিক থেকে অথর্ববেদ ঋগ্বেদের অনেক পরবর্তী। এ-বিষয়ে গবেষকরা কিছু নজিরও দেখিয়েছেন। যেমন, ঋগ্বেদের প্রকৃত প্রাচীন অংশে বৈদিক সমাজে জাতি-ভেদ বা বর্ণাশ্রম-বিভাগের পরিচয় নেই; কিন্তু অথর্ববেদে শুধুই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামের চারটি সুস্পষ্ট বিভাগের উল্লেখ আছে তাই নয়, এর মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার– এমনকি ব্রাহ্মণদের ‘দেবতা’ বলে উল্লেখ করবারও– পরিচয় সুস্পষ্ট। অথর্ববেদেও ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি ঋগ্বেদের দেবতাদের নাম বারবার পাওয়া যায়; কিন্তু এঁদের বৈশিষ্ট্য অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, নামে বিভিন্ন হলেও তাঁদের পরস্পরের মধ্যে আর বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। তাছাড়া, অথর্ববেদের কয়েকটি সূক্তে বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্য অনুসন্ধান করা হয়েছে; এগুলি অবশ্যই অনেক উন্নত পর্যায়ের চিন্তার পরিচায়ক– এমনকি কখনও কখনও ঔপনিষদিক চিন্তার সঙ্গে এই চিন্তার সাদৃশ্য দেখা যায়। অতএব স্বীকার করতেই হবে, অথর্ববেদে সংকলিত অনেক সূক্তই পরবর্তী কালের রচনা; অর্থাৎ, অন্তত সংকলন-কালের দিক থেকে অথর্ববেদ অনেক অর্বাচীন।’- (দেবীপ্রসাদ/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১০৭)

তবে সামগ্রিকভাবে অথর্ববেদকে অর্বাচীন বা পরবর্তী কালের মনে করা সঠিক হবে না।

কেননা অথর্ববেদ-সংহিতাও একটি সংকলন-গ্রন্থ এবং এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সূক্তেরই রচনাকাল এক নয়। ঋগ্বেদের মতোই অথর্ববেদেও প্রাচীনতম এবং অর্বাচীনতম অংশের মধ্যে বহু যুগের ব্যবধান রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। অথর্ববেদের সংকলন-কাল যে অনেক পরবর্তী– তা থেকে এটা মনে করা যায় যে অথর্ববেদে সংকলিত সবচেয়ে অর্বাচীন সূক্তগুলি হয়তো ঋগ্বেদের সবচেয়ে অর্বাচীন সূক্তের চেয়েও পরবর্তী। কিন্তু অথর্ববেদের সর্বপ্রাচীন সূক্তগুলি ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলির সমসাময়িক– বা এমনকি তার চেয়েও প্রাচীনতর– হওয়া অসম্ভব নয় বলেই গবেষকেরা মনে করেন। কেননা এ-বিষয়ে বেশ চিত্তাকর্ষক প্রমাণ রয়েছে।
‘ভারতীয় সাহিত্যে অথর্ববেদের প্রাচীনতম নাম হলো ‘অথর্বাঙ্গিরসঃ’– অর্থাৎ, ‘অথর্বন্ এবং অঙ্গিরস্’। অথর্বন্ ও অঙ্গিরস্-দের এই বেদ বা জ্ঞানকেই পরবর্তীকালে সংক্ষেপে শুধু অথর্ববেদ বলে উল্লেখ করবার প্রথা হয়েছিল। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশের কবি বা ঋষিরাও এই দুটি নামের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন; শুধু তাই নয়, তাঁরা ওই অথর্বন্– এবং বিশেষ করে অঙ্গিরস্-দের– সুপ্রাচীন অতীতের বিরাট শক্তিশালী জাদু-বিদ্যাবিৎ হিসেবেই স্মরণ করতেন।’- (দেবীপ্রসাদ/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১০৭)
যেমন, অঙ্গিরস্-দের প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে বলা হয়েছে-
‘ত ইন্দেবানাং সধমাদ আসন্নৃতাবানঃ কবয়ঃ পূর্ব্যাসঃ।
গূঢ়হং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ববিন্দন্‌ৎসত্যমন্ত্রা অজনয়ন্নুষাসম্’।। (ঋগে¦দ-৭/৭৬/৪)।
অর্থাৎ : যে অঙ্গিরাগণ সত্যবান, কবি, পূর্বকালীন পিতা ও যাঁরা গূঢ় জ্যোতি লাভ করেছিলেন এবং অবিতথ মন্ত্রদ্বারা ঊষাকে প্রাদুর্ভূত করেছিলেন, তাঁরাই দেবগণের সঙ্গে একত্রে প্রমত্ত হতেন। (ঋক্-৭/৭৬/৪)।।

ঋগ্বেদে বারবার এই অঙ্গিরসদের বলা হয়েছে, ‘পিতরঃ নঃ’ অর্থাৎ ‘আমাদের পিতাগণ’ (ঋক্-১/৭১/২), ‘নঃ পূর্বে পিতরঃ’ অর্থাৎ ‘আমাদের প্রাচীন পিতাগণ’ (ঋক্-১/৬২/২), ‘পূর্বঃ অঙ্গিরাঃ’ অর্থাৎ ‘প্রাচীন অঙ্গিরস্-গণ’, ইত্যাদি। আবার ভৃগুগণ এবং অথর্বন্-গণের সঙ্গে অঙ্গিরসদেরও ‘নঃ পিতরঃ’ অর্থাৎ ‘আমাদের পিতাগণ’ বলে উল্লেখ আছে, যেমন-
‘অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম’।। (ঋগ্বেদ-১০/১৪/৬)।
অর্থাৎ : অঙ্গিরা নামক অথর্বন নামক এবং ভৃগু নামক আমাদের পিতৃলোকগণ এ মাত্র এসেছেন, তাঁরা সোমরস পাবার অধিকারী, সে যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকগণ যেন আমাদের শুভানুধ্যান করেন, যেন আমরা তাদের প্রসন্নতা লাভ করে কল্যাণভাগী হই। (ঋক্-১০/১৪/৬)।।
তেমনি, অথর্বন্-দের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-
‘যজ্ঞৈরথর্বা প্রথম পথস্ততে ততঃ সূর্যো ব্রতপা বেন আজনি।
আ গা আজদুশনা কাব্যঃ সচা যমস্য জাতমমৃতং যজামহে’।। (ঋগ্বেদ-১/৮৩/৫)।

অর্থাৎ : অথর্বন-ঋষিগণ যজ্ঞ দ্বারা প্রথমে অপহৃত গাভীগণের পথ বার করেছিলেন, পরে ব্রতপালনকারী কমনীয় সূর্যরূপ ইন্দ্র দৃষ্ট হলে অথর্বগণ ঐ গাভী সকল প্রাপ্ত হলেন; কবির পুত্র উশনা ইন্দ্রের সহায় হয়েছিলেন। আমরা শত্রু দমনের নিমিত্ত সমুৎপন্ন এবং অমর ইন্দ্রের আহ্বান করি। (ঋক্-১/৮৩/৫)।।

অতএব স্বয়ং ঋগ্বেদের কবিরা যে অথর্বন্-অঙ্গিরসদের প্রাচীন পিতাগণ হিসেবে বারবার স্মরণ করছেন তাঁদেরই বেদ বা জ্ঞান ওই অথর্ববেদ-কে সামগ্রিকভাবে ঋগ্বেদের পরবর্তী মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বৈদিক চিন্তাধারার বিকাশ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এ-বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ববহ। কেননা-
'আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ তর্ক তুলেছেন, যেহেতু ঋগ্বেদের পরে অথর্ববেদ– এবং যেহেতু ঋগ্বেদের সূক্তগুলি মূলতই প্রার্থনা-উপাসনা জাতীয় ও অথর্ববেদের সূক্তগুলি মূলতই জাদু-বিশ্বাসগত,– সেইহেতু স্বীকার করা প্রয়োজন যে বৈদিক সাহিত্যে পূজা-উপাসনা ক্রমশই জাদুবিশ্বাসমূলক মন্ত্রের রূপে অধঃপতিত হয়েছিল। অর্থাৎ এঁদের যুক্তি অনুসারে বৈদিক সাহিত্যের নজির হলো আগে ধর্মবিশ্বাস পরে জাদুবিশ্বাস; অতএব নৃতত্ত্ববিদেরা যে মনে করেন, ধর্মবিশ্বাসের তুলনায় জাদুবিশ্বাস অনিবার্যভাবেই প্রাচীনতর এ-কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু আমরা দেখলাম, অথর্ববেদের সংকলন পরবর্তী কালের হলেও এবং অথর্ববেদে সংকলিত অংশবিশেষ অত্যন্ত অর্বাচীন হলেও, সামগ্রিকভাবে অথর্ববেদকে ঋগ্বেদের পরবর্তী বলা সত্যিই অর্থহীন; এছাড়া ঋগ্বেদের সমস্ত মন্ত্রই যে আদিতে প্রার্থনা-উপাসনামূলক ছিল– এ-কথাও জোর করে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।
অবশ্যই এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, অথর্ববেদের প্রধানতম বিষয়বস্তু বলতে আদিম জাদুবিশ্বাস– ঝাড়ফুঁক্, তুক্-তাক্ ইত্যাদিই। শত্রুদমন, রোগনিরসন, বশীকরণ– ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্যে মন্ত্রগুলি প্রয়োগ করা হতো। এদিক থেকে বলা যায়, অথর্ববেদে বৈদিক মানুষদের অত্যন্ত আদিম পর্যায়ের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদির পরিচয় স্পষ্টতরভাবে টিকে আছে। এবং দ্রষ্টব্য হলো, অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে সে-পর্যায়ের বৈদিক মানুষদের সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীর নানা উপজাতির আশ্চর্য সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ভিনটারনিৎস্ তাই বলছেন, 'বস্তুত ওই জাদু-সংগীত ও জাদু অনুষ্ঠান যে-ধ্যানধারণার পরিচায়ক, সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানবজাতির মধ্যে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয়দের অথর্ববেদের জাদু-সংগীত ও জাদু-অনুষ্ঠানে যে অত্যদ্ভুত চিন্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় হুবহু তারই নিদর্শন চোখে পড়ে উত্তর-আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে, আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে, মালয়বাসী ও মোঙ্গলদের মধ্যে, প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে এবং অনেক সময় আধুনিক ইউরোপের কৃষকদের মধ্যেও। এ-বিসয়ে ভিনটারনিৎস্ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন।'- (দেবীপ্রসাদ/ ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১০৮)

তাই দেবীপ্রসাদ বলেন, এদিক থেকে অথর্ববেদের প্রধানতম মূল্য অবশ্যই নৃতত্ত্বমূলক। কেননা অমন আদিম পর্যায়ের ধ্যানধারণা ও আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সাহিত্যগত নিদর্শন

অন্তত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় আর নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, ওই আদিম পর্যায়ের বৈদিক মানুষদের কাছে চিকিৎসাশাস্ত্র বলতে যেটুকু তাও একান্তভাবেই এ-জাতীয় ঝাড়ফুঁক্ ও তুক্-তাক প্রভৃতিই– অর্থাৎ, ওই আদিম জাদুবিশ্বাসের সঙ্গেই জড়িত। জাদুবিশ্বাস-গত ওই প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতির বৈদিক নাম ছিলো 'ভৈষজ্যানি'। অতএব, অন্তত বৈদিক মানুষদের ইতিহাসে চিকিৎসা-বিদ্যার এবং তারই আনুষঙ্গিক উদ্ভিদ-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতিরও– প্রাচীনতম পরিচায়ক ওই অথর্ববেদ। অবশ্য বলাই বাহুল্য, চিকিৎসাবিদ্যার এই প্রাথমিক নিদর্শনকে আধুনিক অর্থে চিকিৎসা-বিজ্ঞান কল্পনা করবার কোনো কারণ নেই।

প্রসঙ্গক্রমে ছোট্ট যে প্রশ্নটি থেকে যায়, প্রাচীন পুঁথিপত্রের নানান জায়গায় 'ত্রয়ী বিদ্যা' নামে তিনটি বেদ অর্থাৎ ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদের উল্লেখ রয়েছে। অথর্ববেদের সুপ্রাচীন অবস্থিতি স্বীকার করলে সেসব প্রাচীন পুঁথিপত্রে অথর্ববেদের স্বীকৃতি নেই কেন? এ-প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদ বলেন, 'অথর্ববেদে সংকলিত আদিম জাদুমন্ত্রগুলি অত্যন্ত সুপ্রাচীন হলেও সংকলনকালের দিক থেকে অথর্ববেদ খুবই অর্বাচীন। স্বভাবতই, জাদুমন্ত্রগুলি যখন সংহিতা-রূপে সংকলিত হয়েছে তখন বৈদিক মানুষদের সমাজ আর আদিম সমাজ নয়; বৈদিক সমাজে তখন ক্ষত্রিয়-বর্ণ ও ব্রাহ্মণ-বর্ণের প্রতিপত্তি সুস্পষ্ট হয়েছে। তাই অনেক সময়েই দেখা যায়, সংকলন-কর্তারা ওই আদিম জাদু-মন্ত্রগুলির সঙ্গে ক্ষত্রিয়শ্রেণী ও ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর স্বার্থ সংযোজিত করেছেন এবং মন্ত্রগুলিকে এই দুই শ্রেণীর স্বার্থে নিয়োগ করবার কল্পনা করেছেন। তবুও মন্ত্রগুলির আদিম জাদুবিশ্বাসমূলক রূপ সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়েনি এবং আধুনিক বিদ্বানেরা অনুমান করছেন যে এই কারণেই পরবর্তী কালের পুরোহিতশ্রেণী দীর্ঘ দিন ধরে অথর্ববেদ-সংহিতাকে খুব বেশি মর্যাদা দিতে চাননি।'

...

২.২ : ব্রাহ্মণ
মীমাংসা-সূত্রকার মহর্ষি জৈমিনি বেদকে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ– এই দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। মন্ত্র হচ্ছে সর্বপ্রাচীন ভাগ। মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হলো ব্রাহ্মণের কর্ম এবং যজ্ঞের বিধিবিধানে তার প্রয়োগ করা। মূলত যাগ-যজ্ঞ সম্বন্ধে নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধমূলক নির্দেশিত গদ্যে রচিত সাহিত্যই ‘ব্রাহ্মণ’। কোন্ যজ্ঞ করলে কী ফল পাওয়া যাবে, কোন্ যজ্ঞে কোন্ পুরোহিতকে কত দক্ষিণা দিতে হবে, কোন্ যজ্ঞকর্মের খুঁটিনাটি প্রক্রিয়া ঠিক কেমনভাবে সাধন করতে হবে, কোন্ যজ্ঞের ঠিক কোথায় কীভাবে কোন্ মন্ত্র প্রয়োগ করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদিই ‘ব্রাহ্মণ’ নামে পরিচিত গ্রন্থগুলির প্রধানতম আলোচ্য-বিষয়। অনেক সময় এতে যজ্ঞকর্ম ছাড়াও খুঁটিনাটি অনুষ্ঠানেরও গূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য উদ্ভাবন করবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

‘কৃষ্ণ-যজুর্বেদ সংহিতা’য় মন্ত্র ছাড়াও নানা জায়গায় যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যাসংক্রান্ত আলোচনা এবং বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়; ধারণা করা হয়, এই অংশগুলি থেকেই পরবর্তী কালের ‘ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে’র সূত্রপাত হতে পারে। কোনো কোনো ‘ব্রাহ্মণে’র স্থানবিশেষে কিছু কিছু প্রাচীন আখ্যায়িকাও সংযোজিত হয়েছে দেখা যায়; কিন্তু এ-জাতীয় আখ্যায়িকাকে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য মনে করা যায় না। তাহলে ‘ব্রাহ্মণ’ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কী? এ-প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন-
‘পৃথিবীর ইতিহাসে যাগযজ্ঞমূলক ক্রিয়াকাণ্ডের এমন জটিল ও বিশাল সাহিত্য কোথাও নেই। কিন্তু এ-সাহিত্য সুখপাঠ্যও নয়, চিন্তার গভীরতার পরিচায়কও নয়। ‘ব্রাহ্মণ’গুলি গদ্যে রচিত। সে-গদ্য এলোমেলো, খাপছাড়া, জটিল ও একান্তই কৃত্রিম। প্রাচীন বৈদিক গানে যে সৃজনী শক্তির পরিচয়, ‘ব্রাহ্মণ’গুলির মধ্যে তার যেন কিছুই অবশিষ্ট নেই। চিন্তাধারার দিক থেকেও আধুনিক পাঠকের কাছে এই ‘ব্রাহ্মণ’গুলি উদ্ভট– এমনকি অবান্তর ও অসম্ভব– মনে হবে। কেননা যাগযজ্ঞের নানান খুঁটিনাটির নানা রকম ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করবার প্রচেষ্টায় গ্রন্থকারেরা যে-সব কথা বলবার চেষ্টা করেছেন প্রায়ই সেগুলির বিশেষ কোনো সুসঙ্গত অর্থ হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে– বা অনেকসময় মন্ত্রগুলির খণ্ড-বিক্ষিপ্ত অংশমাত্রকে– বিভিন্ন যজ্ঞের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত করাবার সময় গ্রন্থকারেরা মন্ত্রগুলির আদি ও অকৃত্রিম তাৎপর্যের প্রতি মোটের উপর ঔদাসীন্যই প্রকাশ করেছেন, কিংবা যেন-তেন প্রকারে ওই প্রাচীন গানগুলিকে বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে চেয়েছেন।’- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১০৯)

এ থেকেই বোঝা যায়, সংহিতায়– বিশেষ করে ঋগ্বেদ-সংহিতায়– সংকলিত প্রাচীন স্তুতিগুলি যে পরিস্থিতিতে রচিত হয়েছিলো, ‘ব্রাহ্মণ’-সাহিত্যে তার পরিচয় আর নেই। তার মানে, যাঁরা এই ‘ব্রাহ্মণ’-সাহিত্য রচনা করেছিলেন তাঁদের কাছে হয়তোবা যাগযজ্ঞের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই হতে পারে না। পূর্বপুরুষদের রচিত প্রাচীন স্তোত্র বা গানগুলি অবশ্যই তাঁদের ধারণায় অতীব পবিত্র, এবং এই কারণেই তাঁরা হয়তো যাগযজ্ঞ সংক্রান্ত নিজেদের

উৎসাহের সঙ্গে কোনোমতে প্রাচীন গানগুলিকে সংযোজিত করতে চেয়েছিলেন। ফলে–
'বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে একদিক থেকে যে-রকম 'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণে'র মধ্যে রচনাকৌশল ও বিষয়বস্তু উভয়েরই অত্যন্ত সুস্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে, অপর দিক থেকে আবার দেখা যায়, যত কৃত্রিমভাবেই হোক না কেন 'ব্রাহ্মণ'-প্রণেতারা প্রাচীন 'সংহিতা'র সঙ্গে কোনো একটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখবার প্রয়াস করেছিলেন। এই প্রয়াসের ফলেই প্রত্যেক 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থকে কোনো-না-কোনো সংহিতার সঙ্গে জুড়ে দেবার আয়োজনও করা হয়েছিল।'

এককালে 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থ অনেক ছিলো; তার মধ্যে বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত হয়েছে। তবু 'ব্রাহ্মণ'-সাহিত্য হিসেবে আজও যা টিকে আছে তার মোট কলেবরও সুবিশাল। যেমন ঋগ্বেদের দুটি ব্রাহ্মণের কথা জানা যায়। একটি ঐতরেয় এবং অন্যটি কৌষীতকি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণকে ভাগ করা হয়েছে চল্লিশটি অধ্যায়ে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সংকলক ছিলেন মহীদাস। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিলো সোমযাগ, অগ্নিহোত্র ও রাজসূয়যজ্ঞ। কৌষীতকি ব্রাহ্মণ বিভক্ত ছিলো ত্রিশটি অধ্যায়ে। এর বিষয়বস্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতো হলেও এখানে সাধারণ গার্হস্থ্য জীবন সম্পর্কেও বক্তব্য রয়েছে। সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদেরও বেশ কিছু 'ব্রাহ্মণ' রয়েছে। 'সংহিতা' গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রধান প্রধান 'ব্রাহ্মণ'গুলির তালিকা এরকম–
ক। ঋগ্বেদ-সংহিতার সঙ্গে সংযুক্ত–
    ১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
    ২। কৌষীতকি বা সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ
খ। সামবেদ-সংহিতার সঙ্গে সংযুক্ত–
    ১। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ
    ২। ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ
    ৩। জৈমিনীয় বা তলবকার ব্রাহ্মণ
গ। কৃষ্ণ-যজুর্বেদ-সংহিতার সঙ্গে সংযুক্ত–
    ১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
    ২। কঠ ব্রাহ্মণ
ঘ। শুক্ল-যজুর্বেদ-সংহিতার সঙ্গে সংযুক্ত–
    ১। শতপথ ব্রাহ্মণ
ঙ। অথর্ববেদ-সংহিতার সঙ্গে সংযুক্ত–
    ১। গোপথ ব্রাহ্মণ।

বিভিন্ন সংহিতার সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের মধ্যে মূল পার্থক্য আসলে কী? পরবর্তী কালের বৈদিক যজ্ঞে যেমন বিভিন্ন পুরাহিত নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা ছিলো, যেমন– ঋত্বিক বা হোতা ঋগ্বেদের সুক্ত উচ্চারণ করবেন, উদ্গাতা সামবেদের গান করবেন, অধ্বর্যু যজুর্বেদের মন্ত্র পাঠ করবেন এবং অগ্নিতে আহুতি দেবেন; তেমনি ঋগ্বেদের সঙ্গে সংযুক্ত 'ব্রাহ্মণে'

ঋত্বিক-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, সামবেদের সঙ্গে সংযুক্ত 'ব্রাহ্মণে' উদ্গাতার উপর, যজুর্বেদের সঙ্গে সংযুক্ত 'ব্রাহ্মণে' অধ্বর্যুর উপর। কিন্তু বিভিন্ন 'ব্রাহ্মণে'র মধ্যে এই পার্থক্যের চেয়ে বড় কথা হলো এর সাদৃশ্যের দিকটা। আর এই সাদৃশ্য বলতে যজ্ঞানুষ্ঠানের নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে জটিল ও সুদীর্ঘ আলোচনা।
মোট কথা, 'ব্রাহ্মণ'-সাহিত্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। এমনকি প্রাচীন বৈদিক দেবতারাও নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করতে বাধ্য। স্রষ্টা প্রজাপতির কথা আছে; কিন্তু ওই প্রজাপতি ও যজ্ঞ অভিন্ন। এক কথায়, যজ্ঞই সব, যজ্ঞ ছাড়া কিছু নেই; যজ্ঞই একমাত্র সত্য, একমাত্র পুরুষার্থ। এই যজ্ঞের কথা– যজ্ঞানুষ্ঠান-পদ্ধতি ও তার গূঢ় গোপন রহস্য– একমাত্র ব্রাহ্মণ-শ্রেণীরই জানা আছে। স্বভাবতই এই 'ব্রাহ্মণ'-সাহিত্যে যজ্ঞবিদ্ ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর চেয়ে বড় আর কিছুই হতে পারে না। কোনো কোনো 'ব্রাহ্মণে' এই ব্রাহ্মণ-শ্রেণীকে দেবতাদের সঙ্গে সমান প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং অবশ্যই বারবার বিধান দেওয়া হয়েছে যাতে ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকে।

স্বভাবতই এ-জাতীয় সাহিত্যে নীতিবোধের স্থান থাকবার কথা নয়, 'ব্রাহ্মণ'-সাহিত্যেও তা নেই। এ-প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদের মন্তব্য হলো-
'ব্রাহ্মণ'-গ্রন্থ-কর্তাদের সামনে একমাত্র আদর্শ হলো, যজমান– এবং অবশ্যই পুরোহিতদের– ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করা। এবং এই সুখ-সমৃদ্ধির জন্য দেবতাদের অনুকম্পা জাগানো বা ওই ধরনের কোনো উপায় অবলম্বন করবার প্রশ্ন ওঠে না; নির্ভুল পদ্ধতিতে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন করতে পারলে যন্ত্রের মতো অবধারিতভাবেই ওই ঐহিক সুখ-ভোগ সম্ভব হবে। স্বভাবতই এ-জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক বিদ্বানদের কাছে অত্যদ্ভূত বলে প্রতীত হয়েছে।'-
(ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১১১)
...

২.৩ : আরণ্যক ও উপনিষদ

বৈদিক সাহিত্যে ‘ব্রাহ্মণ’ গ্রন্থগুলির শেষাংশে আর একজাতীয় রচনা সংযোজিত দেখা যায়, তার নাম ‘আরণ্যক’ ও ‘উপনিষদ’। এই রচনাগুলি ‘ব্রাহ্মণে’র সঙ্গে এমনভাবে সংযোজিত হয়েছে যে অনেক সময় ‘ব্রাহ্মণ’ ও ‘আরণ্যকে’র মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট নয় এবং ‘আরণ্যক’ ও ‘উপনিষদে’র মধ্যেও পার্থক্য প্রায় অস্পষ্ট। তবুও রচনাকালের দিক থেকে ‘আরণ্যক’ ও ‘উপনিষদ’ অবশ্যই পরবর্তী এবং আলোচ্য-বিষয়ের দিক থেকে ‘ব্রাহ্মণে’র সঙ্গে বিশেষ করে ‘উপনিষদে’র পার্থক্য অত্যন্ত মৌলিক।

বলা হয়, ‘ব্রাহ্মণ’ ভাগের পরিশিষ্ট অংশ হচ্ছে ‘আরণ্যক’। অরণ্য বা বন সম্পর্কিত রচনা বলে এগুলোর নাম হয়েছে ‘আরণ্যক’। বৃদ্ধ বয়সে যাঁরা সংসার ধর্ম ত্যাগ করে তপস্যার জন্য অরণ্যবাসী হয়েছেন তাঁদের ধর্মীয় জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে পথ প্রদর্শন করে এই ‘আরণ্যক’ রচিত হয়। ‘আরণ্যক’ নামের রচনাগুলির মধ্যে প্রধানত যাগযজ্ঞ সম্পর্কিত এবং দেবতা সম্পর্কিত বক্তব্য থাকতো। তবে এগুলির বাইরেও অনেক বক্তব্য পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে যে দার্শনিক চিন্তার জন্ম হয় তার আভাস আরণ্যক গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। অথর্ববেদ ছাড়া অন্যসব সংহিতারই ‘আরণ্যক’ গ্রন্থ রয়েছে। তবে বস্তুত বৈদিক ও সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রাচীন ‘উপনিষদ’গুলিতেই সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট ও সচেতন দার্শনিক প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরবর্তী কালেও ভারতীয় দর্শনের অন্তত সম্প্রদায়বিশেষের কাছে ‘উপনিষদ’গুলির গুরুত্ব প্রায় অসীম।

অত্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরে উপনিষদকে অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়েছে বলেই অনেক পরবর্তী যুগেও বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় ও দর্শন-সম্প্রদায়ের প্রচারকেরা নিজেদের বক্তব্যের মর্যাদা বাড়াবার উৎসাহে ‘উপনিষদ’ নাম দিয়ে নতুন নতুন গ্রন্থ রচনা করেছেন। মুক্তিক উপনিষদে ১০৮টি উপনিষদের কথা জানা যায়। এবং নির্ণয় সাগর প্রেস হতে বাসুদেব লক্ষণ শাস্ত্রী উপনিষদের যে সংকলন গ্রন্থ বের করেছিলেন তাতে ১১২টি উপনিষদ স্থান পেয়েছিলো। স্বভাবতই ‘উপনিষদ’ নাম ব্যবহৃত হলেও এ-জাতীয় গ্রন্থাবলীকে প্রকৃত বৈদিক ‘উপনিষদ’ মনে করবার কোনো কারণ নেই। কেননা প্রত্যেকটি প্রাচীন (আরণ্যক’ ও) ‘উপনিষদ’ই কোনো-না-কোনো ‘বেদ’ বা বেদের শাখার সঙ্গে সংযোজিত। তাই যেগুলি বেদের অঙ্গীভূত বা ঐতিহ্য অনুসারে বেদের সাথে সংযুক্ত নয় সেগুলিকে বৈদিক সাহিত্যের অংশ বলে স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ সেগুলি অনেক পরে রচিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বেদবিদ পণ্ডিতেরা প্রকৃত বৈদিক উপনিষদ হিসেবে একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপনিষদগুলি হলো,– ঈশ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, কেন, কঠ, মুন্ডক, মাণ্ডুক্য, কৌষীতকি, মৈত্রী ও শ্বেতাশ্বতর এই তেরোটি উপনিষদ। যেমন–

(ক) বেদের অঙ্গীভূত উপনিষদ :

—-(১) ঈশ,– শুক্ল-যজুর্বেদের বাজসনেয় সংহিতার অংশ
—-(২) ঐতরেয়,– ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকের অংশ
—-(৩) কৌষীতকি,– ঋগ্বেদের শাংখ্যায়ন আরণ্যকের অংশ
—-(৪) তৈত্তিরীয়,– কৃষ্ণ-যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অংশ
—-(৫) বৃহদারণ্যক,– শুক্ল-যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের অংশ
—-(৬) কেন,– সামবেদের জৈমিনীয় বা তলবকার ব্রাহ্মণের অংশ
—-(৭) ছান্দোগ্য,– সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অংশ
—-(৮) প্রশ্ন,– অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখার অন্তর্ভুক্ত
(খ) ঐতিহ্য অনুসারে বেদের সাথে সংযুক্ত :
—-(৯) কঠ,– ঐতিহ্য অনুসারে কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত
—-(১০) শ্বেতাশ্বতর,– ঐতিহ্য অনুসারে কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত
—-(১১) মুণ্ডক,– ঐতিহ্য অনুসারে অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত
—-(১২) মাণ্ডুক্য,– ঐতিহ্য অনুসারে অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত
—-(১৩) মৈত্রায়ণীয়,– ঐতিহ্য অনুসারে কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত

উল্লেখ্য, সর্বশেষ মৈত্রায়ণীয় বা মৈত্রী উপনিষদকে বৈদিক-সাহিত্যের অংশ হিসেবে গ্রহণ না করে কোথাও কোথাও বারোটি উপনিষদকেই বৈদিক-উপনিষদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

যেহেতু প্রত্যেকটি 'উপনিষদ' কোন-না-কোন বেদের সাথে সংযোজিত, তাই উপনিষদের তালিকা প্রস্তুত করবার সয় বেদ-ব্রাহ্মণ-আরণ্যকের সঙ্গে সেগুলির সম্পর্কও উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় বলে বিদ্বানেরা মনে করেন। সে-অনুযায়ী তালিকাটি হলো–

——
সংহিতা——- ————ব্রাহ্মণ——- ————-আরণ্যক——- –উপনিষদ–।
——
ঋগ্বেদ- ১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ১। ঐতরেয় আরণ্যক। ১। ঐতরেয় উপনিষদ
২। কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ২। কৌষীতকি বা শাংখ্যায়ন ২। কৌষীতকি-উপনিষদ্
——
সামবেদ- ১। পঞ্চবিংশ বা তাণ্ড্যমহা ১। আরণ্যক সংহিতা ১। ছান্দোগ্য উপনিষদ্
২। ষড়বিংশ ২। আরণ্যক-গান ২। কেন-উপনিষদ্
৩। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৩। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৩। জৈমিনীয়-উপনিষদ ব্রাহ্মণ

কৃষ্ণ-যজুর্বেদ	১। কঠ ব্রাহ্মণ	১। কঠ আরণ্যক	১। কঠ-উপনিষদ্
	২। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ	২। তৈত্তিরীয়	২। তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্
			৩। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্
			৪। মৈত্রী-উপনিষদ্ বা মৈত্রাণীয়-উপনিষদ্
শুক্ল-যজুর্বেদ	১। শতপথ ব্রাহ্মণ	১। শতপথ আরণ্যক	১। বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্
			২। ঈশ-উপনিষদ্
অথর্ববেদ	১। গোপথ ব্রাহ্মণ	(নাই)	১। মুণ্ডক-উপনিষদ্
			২। মাণ্ডুক্য-উপনিষদ্
			৩। প্রশ্ন-উপনিষদ্

এই তেরোটি উপনিষদের মধ্যে কোনো-কোনোটি আকারের দিক থেকে নেহাতই নগণ্য। যেমন, ঈশ-উপনিষদে মোট শ্লোক-সংখ্যা ১৮টি, এক্ষেত্রে মাণ্ডুক্য-উপনিষদের কলেবর আরও ছোট, মাত্র ১২টি শ্লোক। কেন-উপনিষদ এবং ঐতরেয়-উপনিষদের আকার সামান্য বড়। তবে আকারে ছান্দোগ্য-উপনিষদ এবং বৃহদারণ্যক-উপনিষদ সবচেয়ে বড়।
সামবেদের অঙ্গ ছান্দোগ্য-উপনিষদের আটটি অধ্যায়ে ৬২৭টি মন্ত্র রয়েছে। এই আটটি অধ্যায় ১৫৪টি খণ্ডে বিভক্ত। তবে মন্ত্রসংখ্যা প্রতি খণ্ডে সমসংখ্যক নয়, কোন খণ্ডে কম, কোন খণ্ডে বেশি। শুক্ল-যজুর্বেদের অঙ্গ বৃহদারণ্যক-উপনিষদে ছয়টি অধ্যায়ে ৪৪টি খণ্ড; সর্বশুদ্ধ এর মন্ত্রসংখ্যা ৪৩৯টি। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অঙ্গ তৈত্তিরীয়-উপনিষদের অধ্যায় তিনটি, খণ্ড-সংখ্যা ৩০ এবং মোট মন্ত্রসংখ্যা মাত্র ৫০টি। ঋগ্বেদের অঙ্গ ঐতরেয়-উপনিষদে তিনটি অধ্যায়ে মন্ত্র রয়েছে মাত্র ৩৩টি। প্রথম অধ্যায়ে খণ্ড ৩টি, বাকি দুটি অধ্যায় অখণ্ড। সামবেদীয় কেন-উপনিষদে চারটি অধ্যায়ে মন্ত্রসংখ্যা ৩৪টি। কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় কঠ-উপনিষদের দুটি অধ্যায়ে সর্বশুদ্ধ মন্ত্রসংখ্যা ১২৭। প্রতিটি অধ্যায় তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত; মোট মন্ত্রসংখ্যা ১১৩টি। অথর্ববেদীয় মুণ্ডক-উপনিষদের তিনটি অধ্যায়ে মোট মন্ত্রসংখ্যা ৬৫টি। প্রতিটি অধ্যায় দুটি খণ্ডে বিভক্ত। অথর্ববেদীয় প্রশ্ন-উপনিষদে অধ্যায় ছয়টি এবং মোট মন্ত্রসংখ্যা ৬৭টি। অথর্ববেদীয় মাত্র বারো শ্লোকের মাণ্ডুক্য-উপনিষদ বুঝতে হলে ২১৫ শ্লোকের গৌড়পাদ কারিকা ছাড়া অন্দরে

প্রবেশ করা যায় না।

রচনাভঙ্গির দিক থেকে সমস্ত উপনিষদই এক-রকমের নয়। কোনোটি আগাগোড়াই ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে রচিত, কোনোটি আগাগোড়া গদ্যে রচিত, আবার কোনোটির রচনা আংশিক গদ্যে ও আংশিক পদ্যে। কিন্তু মোটের উপর গদ্য-রচনার পরিচয়ই তুলনায় অনেক বেশি। এবং এ-প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১১৩) বলেন-
'আধুনিক বিদ্বানেরা অনুমান করেছেন যে পদ্যে– বা আংশিকভাবে পদ্যে– রচিত উপনিষদগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা। এ-জাতীয় উপনিষদ বলতে, ঈশা-উপনিষদ, কঠ-উপনিষদ, শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ, মুণ্ডক-উপনিষদ, এবং প্রশ্ন-উপনিষদ,– যদিও অবশ্য প্রশ্ন-উপনিষদে পদ্যাংশ যৎসামান্যই। অপরপক্ষে, ঐতরেয়-উপনিষদ, বৃহদারণ্যক-উপনিষদ, ছান্দোগ্য-উপনিষদ, তৈত্তিরীয়-উপনিষদ এবং কৌষীতকি-উপনিষদ গদ্যে রচিত এবং সে-গদ্য বহুলাংশেই 'ব্রাহ্মণ'-গ্রন্থের অনুরূপ। শুধু তাই নয়; এই পাঁচটি উপনিষদের সঙ্গে 'ব্রাহ্মণ'-গ্রন্থের সম্পর্ক ও সংযোগ অনেক সুস্পষ্ট। অপর-পক্ষে ঈশ, কঠ প্রভৃতি পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি উপনিষদের ক্ষেত্রে তা নয়। এগুলিকে আমরা কোনো আরণ্যকের অংশ হিসেবে পাই না; তার বদলে স্পষ্টই বোঝা যায়, পরবর্তী কালে রচিত হয়েও এগুলি প্রথাগতভাবে কিন্তু সরাসরি কোনো-না-কোনো বেদ বা বেদের শাখার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। অতএব, ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি পাঁচটি উপনিষদকেই প্রাচীনতম বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু উপনিষদের প্রাচীনত্ব-নির্ণয়ে আধুনিক বিদ্বানেরা শুধুমাত্র গদ্যরীতির উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন নি। যেমন, মৈত্রী-উপনিষদ বা মৈত্রায়ণীয়-উপনিষদ এবং মাণ্ডুক্য-উপনিষদ গদ্যে রচিত হলেও সে-গদ্য 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের গদ্যের মতো নয় এবং এই দুটি উপনিষদকে সবচেয়ে পরবর্তী কালের রচনা বলেই সনাক্ত করা হয়েছে। অপরপক্ষে, কেন-উপনিষদ আংশিক গদ্যে এবং আংশিক পদ্যে রচিত; তবুও এটি ঈশ প্রভৃতির পূর্ববর্তী– যদিও ঐতরেয় প্রভৃতির পরবর্তী– বলে বিবেচিত। এদিক থেকে সংক্ষেপে ১৩টি মূল উপনিষদের তালিকা-

ক।। সর্বপ্রাচীন ও গদ্যে রচিত উপনিষদ্ :
—-১। ঐতরেয়।
—-২। বৃহদারণ্যক।
—-৩। ছান্দোগ্য।
—-৪। তৈত্তিরীয়।
—-৫। কৌষীতকি।
খ।। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী এবং আংশিকভাবে পদ্যে রচিত উপনিষদ্ :
—-৬। কেন।
গ।। আরও পরবর্তী এবং সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পদ্যে রচিত উপনিষদ্ :
—-৭। ঈশা।
—-৮। কঠ।

—-৯। শ্বেতাশ্বতর।
—-১০। মুণ্ডক।
—-১১। প্রশ্ন।
ঘ।। সর্ব-পরবর্তী, যদিও গদ্যে রচিত উপনিষদ্ :
—-১২। মৈত্রী (বা মৈত্রায়ণীয়)।
—-১৩। মাণ্ডুক্য।

কিন্তু কাল-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষক-পণ্ডিতদের মধ্যে তারপরও মনে হয় কিছুটা পার্থক্য রয়ে গেছে। যেমন পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর ‘দর্শন-দিগদর্শন’ দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃষ্ঠা-২৪) উপনিষদের কাল-ক্রম উল্লেখপূর্বক যে তালিকাটি দিয়েছেন তা নিম্নরূপ–
(১) প্রাচীনতম উপনিষদ (৭০০ খৃঃ.পূঃ)
—-(ক) ঈশ, (খ) ছান্দোগ্য, (গ) বৃহদারণ্যক
(২) দ্বিতীয় যুগের উপনিষদ (৬০০-৫০০ খৃঃ.পূঃ)
—-(ক) ঐতরেয়, (খ) তৈত্তিরীয়
(৩) তৃতীয় যুগের উপনিষদ (৫০০-৪০০ খৃঃ.পূঃ)
—-(ক) প্রশ্ন, (খ) কেন, (গ) কঠ, (ঘ) মুণ্ডক, (ঙ) মাণ্ডুক্য
(৪) চতুর্থ যুগের উপনিষদ (২০০-১০০ খৃঃ.পূঃ)
—-(ক) কৌষীতকি, (খ) মৈত্রী, (গ) শ্বেতাশ্বতর

তবুও কাল-ক্রম নির্ণয়ে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও তা হয়তো ধর্তব্যের মধ্যে পড়বে না, কেননা, উভয়ক্ষেত্রেই আলোচ্য সেই তেরোটি উপনিষদই তালিকাভুক্ত আছে। আসল কথা হলো, সমস্ত উপনিষদেরই রচনাকাল সমান নয়। কিন্তু এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, গবেষকদের মতে, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যের মতো প্রাচীন ও বৃহদাকার উপনিষদগুলি মোটেই কোনো রকম সুসংহত গ্রন্থ নয়। বরং প্রায়ই দেখা যায়, বিভিন্ন পরিচ্ছেদে অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত এবং এমনকি অসংলগ্নভাবে বিভিন্ন উপাখ্যান এবং দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। এবং একই উপাখ্যান এবং একই দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। অতএব অনুমান করা হয়, এই উপনিষদগুলিকে আমরা পরবর্তী কালে যে সামগ্রিক রূপে পেয়েছি আদিতে মোটেই তা ছিলো না; তার বদলে খুব সম্ভব কয়েকটি ছোট ছোট স্বতন্ত্র উপনিষদকে একত্রিত করে এ-জাতীয় বড় উপনিষদে পরিণত করা হয়েছিলো এবং এইভাবে সামগ্রিক রূপ দেবার সময় নিশ্চয়ই কিছু কিছু নতুন অংশ সংযোজিত হওয়াও অসম্ভব নয়। অতএব ধারণা করা হয়, প্রাচীনতর উপনিষদগুলিও আগাগোড়া সমান প্রাচীন নয়– সম্ভবত একই উপনিষদের মধ্যে প্রাচীন ও পরবর্তী রচনা পাশাপাশি সংকলিত হয়েছে।

তবে ‘ব্রাহ্মণে’র সঙ্গে ‘উপনিষদ’গুলিকে সংযোজিত করে উভয়ের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা

প্রতিপন্ন করবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে দুয়ের আলোচ্য বিষয়ে অন্তত মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন, 'ব্রাহ্মণে'র মূল আলোচ্য হলো যাগযজ্ঞ। অন্যদিকে, যজ্ঞের কথা মাঝে মাঝে উল্লিখিত হলেও উপনিষদের মূল বিষয়বস্তু দার্শনিক তত্ত্বই। অতএব প্রশ্ন ওঠে, 'ব্রাহ্মণ' ও 'উপনিষদ' উভয়ই কি একই শ্রেণীর মানুষের রচনা? এ-প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ বলেন-

'যাঁরা 'ব্রাহ্মণ' রচনা করেছিলেন তাঁরাই– বা তাঁদের বংশধরেরাই উপনিষদ রচনা করেছিলেন,– একথা স্বীকার করলে অনুমান করতে হয় যে কালক্রমে যজ্ঞকথায় তাঁরা নিস্পৃহ হয়েছিলেন এবং ক্রমশই তাঁদের মন বিশ্বের রহস্য অনুসন্ধানের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অনেক সময় এ-জাতীয় একটি কথাই স্বীকার করা হয়। কিন্তু তাতে বাধা আছে। আমরা আগেই দেখেছি, 'ব্রাহ্মণ'-গ্রন্থাবলী ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণীর রচনা এবং পুরোহিত-শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু ওই পুরোহিতেরা যে কালক্রমে নিজেদের স্বার্থ ভুলে, যজ্ঞ-কথায় নিস্পৃহ হয়ে, নির্লিপ্তভাবে বিশ্ব-রহস্যের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন– এ-কথা কল্পনা করবার কোনো বাস্তব বা ঐতিহাসিক কারণ নেই। বরং উপনিষদেরই আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হলো, উপনিষদের যুগেও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা বড় বড় রাজারাজড়াদের হয়ে যজ্ঞ-কর্ম সম্পাদন করছেন এবং দক্ষিণা হিসেবে প্রভূত গো-সম্পদাদি লাভ করছেন।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১১৫)

এ-ব্যাপারে উপনিষদীয় সাক্ষ্য হিসেবে দু-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, ছান্দোগ্য-উপনিষদের একটি উপাখ্যান এরকম (ছান্দোগ্য-১/১০/১-১/১১/৩)–

'মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা সহ জায়য়োষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদাণক উবাস। (ছান্দোগ্য-১/১০/১)।।...... স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ যদ্বতান্নস্য লভেমহি লভেমহি ধনমাত্রাং রাজাহসৌ যক্ষ্যতে স মা সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈর্বৃণীতেতি। (ছান্দোগ্য-১/১০/৬)।।...... ভগবাংস্ত্বেব মে সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈরিতি তথেত্যথ তর্হ্যতে এব সমতিসৃষ্টাঃ স্তুবতাং যাবত্ত্বেভ্যো ধনং দদ্যান্তাবন্মম দদ্যা ইতি তথেতি হ যজমান উবাচ'। (ছান্দোগ্য-১/১১/৩)।।

আখ্যানটির অংশ-বিশেষের সংক্ষিপ্ত তর্জমা :

'একবার কুরুদেশ যখন শিলাবৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হয়েছিলো তখন উষস্তি চাক্রায়ণ (জনৈক পুরোহিত) 'ইভ্য'-গ্রামে আপন পত্নীকে নিয়ে অত্যন্ত দুর্দশায় পড়েছিলেন।' ভিক্ষালব্ধ উচ্ছিষ্ট মাষকলাই খেয়ে তিনি রাত কাটালেন; পরদিন সকালে স্ত্রীকে বললেন, 'হায়, যদি কিঞ্চিৎ অন্ন পেতাম তাহলে কিছু অর্থলাভ হতো। ঐ রাজা যজ্ঞ করবেন; ঋত্বিকগণের সমুদয় কার্য-সম্পাদনের জন্য তিনি আমাকে বরণ করতেন।' স্ত্রী পূর্ব-দিবসের ভিক্ষালব্ধ মাষকলাই সঞ্চয় করে রেখেছিলেন, স্বামীকে খেতে দিলেন। তাই খেয়ে তিনি প্রারব্ধ যজ্ঞে গমন করলেন এবং ইতোমধ্যে রাজা যে পুরোহিতদের যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত করেছিলেন উষস্তি তাঁদের প্রত্যেককে জ্ঞান-দ্বন্দ্বে আহ্বান করলেন। অনন্তর যজমান তাঁকে বললেন, 'আমি আপনাকে জানতে ইচ্ছা করি।' উষস্তি বললেন, 'আমি উষস্তি চাক্রায়ণ।' যজমান বললেন, 'এই সমুদয় ঋত্বিক-কর্মের জন্য আমি সর্বত্র আপনার অন্বেষণ করেছিলাম; আপনার সন্ধান পাই নি বলেই অন্য সমুদয়

লোককে বরণ করেছিলাম। আপনিই আমার সমস্ত ঋত্বিক-কার্যের ভার গ্রহণ করুন। উষস্তি বললেন, 'তাই হোক। এখন এরাই আমার অনুমতিতে স্তুতিগান করুক। আপনি এদের যে-পরিমাণ অর্থ দেবেন আমাকেও সেই পরিমাণ অর্থ দেবেন।' যজমান বললেন, 'তাই দেব।'

বৃহদারণ্যক-উপনিষদের একটি উপাখ্যান এরকম (বৃহদারণ্যক-৩/১/১-২)–
'জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে। তত্র হ কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভুবুঃ। তস্য হ জনকস্য বৈদেহস্য বিজিজ্ঞাসা বভূব–কঃ স্বিদেষাং ব্রাহ্মণানাং অনুচানতম ইতি।...... –নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্মো গোকামা এব বয়ং স্ম ইতি। তং হ তত এব প্রষ্টুং দধ্রে হোতা অশ্বলঃ–।' (বৃহদারণ্যক-৩/১/১-২)।।
আখ্যানটির অংশ-বিশেষের সংক্ষিপ্ত তর্জমা :
বিদেহ-রাজ জনক একবার বহু-দক্ষিণাযুক্ত বিশাল এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। সেই যজ্ঞে কুরু এবং পাঞ্চালের বহু ব্রাহ্মণ সমাগত হয়েছিলেন। বিদেহ-রাজ জনকের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগলো– 'এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, ব্রহ্মিষ্ঠতম?' তিনি সহস্র গাভী অবরুদ্ধ করালেন এবং প্রত্যেক গাভীর শিঙ-এ দশটি করে (সুবর্ণময়) পাদ আবদ্ধ করা হলো। এবং তিনি ব্রাহ্মণদের বললেন, 'হে পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ) তিনি এই গাভীগুলি নিয়ে যান।' উক্ত ব্রাহ্মণেরা প্রগল্ভতা প্রকাশ করলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য নিজের শিষ্যকে বললেন, 'হে সৌম্য সামশ্রবা, এই গাভীগণকে চালিত কর।' এতে অন্য ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবলেন, 'ইনি কীভাবে নিজেকে আমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ বলতে পারেন?' অতএব, বিদেহরাজ নিযুক্ত অন্যান্য পুরোহিতেরা যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

এ-জাতীয় দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই বোঝা যায়, উপনিষদের যুগেও ধনী যজমানেরা বড় বড় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতেন এবং ব্রাহ্মণেরা তাতে পৌরহিত্য করে প্রভূত ধনসম্পদ লাভ করতেন। অতএব মনে হয় না যে এই যুগে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞে নিস্পৃহ হয়ে দার্শনিক তত্ত্বে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যদিও এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে উপনিষদে অনেক সময় যজ্ঞানুষ্ঠানের নানা রকম দার্শনিক ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করবার আয়োজন হয়েছিলো। যেমন, অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বকে বৃহদারণ্যক-উপনিষদের ঋষি ভাবছেন–
'ওঁ ঊষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ। সূর্যশ্চক্ষুর্বাতঃ প্রাণো, ব্যাত্তম্ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ, সংবৎসর আত্মা অশ্বস্য মেধ্যস্য। দ্যৌঃ পৃষ্ঠম্, অন্তরিক্ষমুদরং, পৃথিবী পাজস্যম্ । দিশঃ পার্শ্বে, অবান্তরদিশঃ পর্শব, ঋতুবোহঙ্গানি, মাসাশ্চার্ধ মাসাশ্চ পর্বাণি, অহোরাত্রাণি প্রতিষ্ঠা, নক্ষত্রাণ্যস্থীনি, নভো মাংসানি। উবধ্যং সিকতাঃ, সিন্ধবো গুদা, যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্বতা, ওষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ লোমানি, উদ্যন্ পূর্বার্ধো, নিম্লোচন্, জঘনার্ধো, যৎ বিজৃম্ভতে তদ্ বিদ্যোততে, যৎ বিধূনুতে তৎ স্তনয়তি, যৎ মেহতি তৎ বর্ষতি বাগেবাস্য বাক্'।।
(বৃহদারণ্যক-১/১/১)।।
অর্থাৎ :

ব্রাহ্মমুহূর্ত, সূর্যোদয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে পুব-আকাশে যে ঊষার আভাস, অশ্বের সেটি হলো শির অর্থাৎ মাথা; সূর্য তার চোখ; বায়ু তার প্রাণ; অশ্বের মুখব্যাদন হলো বৈশ্বানর অগ্নি; দেহ হলো সংবৎসর। 'দৌঃ' অর্থাৎ দ্যুলোক এর পিঠ; অন্তরিক্ষ এর উদর; আর পৃথিবী 'পাজস্যম্' অর্থাৎ খুর। দিকগুলি অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ এই চারদিক হলো এর দুটি পাশ, আর অবান্তর দিকগুলি অর্থাৎ অগ্নি-নির্ঋত-বায়ু-ঈশান– এই চার কোণ হলো অশ্বের পাঁজর। ঋতুগুলি এর অঙ্গ; মাস আর পক্ষ এর পর্ব অর্থাৎ সন্ধিস্থল। এই অশ্বমেধ অশ্বের চারটি পা হলো দিন এবং রাত্রি; আকাশের অগণিত নক্ষত্র হলো এর অস্থি, আকাশের মেঘ হলো এর মাংস।
'উবধ্য' অর্থাৎ উদরের অর্ধজীর্ণ-অর্ধপরিপক্ক খাদ্য হলো পৃথিবীর বালুকারাশি; নদীগুলি হলো এর নাড়ী। যকৃৎ এবং 'ক্লোম' অর্থাৎ গলনালী হলো ভূখণ্ডের তাবৎ পর্বত; অশ্বের গায়ে যে লোমরাজি, তা হলো ভূভাগের তাবৎ ওষধি-লতা আর বনস্পতি; অশ্বের প্রথম অর্ধ হলো উদীয়মান সূর্য আর শেষ-অর্ধ হলো অস্তগামী সূর্য। বিশ্বরূপ সেই অশ্ব যখন হাই তোলে, তখন আকাশে চমকে ওঠে বিদ্যুৎলহরী; সে যখন গাত্র বিধূনন করে অর্থাৎ শরীর কাঁপায়, তখন আকাশের মেঘ করে গর্জন। অশ্বের মূত্র-ত্যাগ মেঘের বারি বর্ষণ, আর শব্দ বা বাক্ হলো অশ্বের হ্রেষারব।

অতএব, যে-ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরা 'ব্রাহ্মণ' সাহিত্য রচনা করেছিলেন সেই শ্রেণীর লোকেরাই যে পরবর্তী যুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্তে দার্শনিক তত্ত্বে উৎসাহী হয়ে উপনিষদ রচনা করেন– এ-কথা মনে করা বোধহয় যুক্তিসঙ্গত নয়। তাছাড়া, উপনিষদেরই আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য আছে যে এ-যুগে যাঁরা দার্শনিক চর্চায় অগ্রণী ছিলেন তাঁরা প্রায়ই ক্ষত্রিয় শ্রেণীর মানুষ– ব্রাহ্মণ নন। এ-বিষয়েও দু-একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, ছান্দোগ্য-উপনিষদে (ছান্দোগ্য-৫/৩/১-৭) একটি উপাখ্যান পাওয়া যায় এরকম–
'শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পঞ্চালানং সমিতিমেয়ায় তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ কুমারানু ত্বাশিষৎ পিতেতানু হি ভগব ইতি। (ছান্দোগ্য-৫/৩/১)।।...... পঞ্চ মা রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নানপ্রাক্ষীৎ তেষাং নৈকঞ্চনাশকং বিবক্তুমিতি স হোবাচ যথা মা ত্বং তদৈতানবদো যথাহহমেষাং নৈকঞ্চন বেদ যদ্যহমিমানবেদিষ্যং কথাং তে নাবক্ষ্যমিতি। (ছান্দোগ্য-৫/৩/৫)।।...... তং হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ'। (ছান্দোগ্য-৫/৩/৭)।।
আখ্যানটির অংশ-বিশেষের সংক্ষিপ্ত তর্জমা :
একদা শ্বেতকেতু আরুণেয় পাঞ্চালদের সমিতিতে গিয়েছিলেন। সেখানে রাজন্যবন্ধু (রাজার পরিষদ) প্রবাহণ জৈবলি তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'হে কুমার! তোমার পিতা কি তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন?' শ্বেতকেতু বলেন, 'নিশ্চয়ই দিয়েছেন।' তখন প্রবাহণ জৈবলি শ্বেতকেতুকে পরপর পাঁচটি দার্শনিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; একটিরও উত্তর শ্বেতকেতুর জানা ছিলো না। অতএব শ্বেতকেতু ক্ষুব্ধভাবে পিতা গৌতমের কাছে প্রত্যাবর্তন করে বলেন, 'আপনি আমাকে

উপদেশ না-দিয়েই বলেছিলেন যে আমাকে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন! রাজন্যবন্ধু আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করলেন; আমি তার একটিও উত্তর দিতে পারিনি।' প্রশ্নগুলি শুনে পিতা গৌতম বললেন, 'তুমি আমাকে যেসব প্রশ্নের কথা বললে আমি তাদের একটিরও উত্তর জানি না। আমি জানলে তোমায় কেন বলবো না?' অতএব স্বয়ং গৌতম রাজভবনে গেলেন। রাজা তাঁকে সমাদর করলেন। প্রাতঃকালে রাজা সভায় উপস্থিত হলে গৌতমও সেখানে গেলেন। রাজা তাঁকে বললেন, 'ভগবন্ গৌতম, মনুষ্যসম্বন্ধী বিত্তের বর প্রার্থনা করুন।' গৌতম বললেন, 'হে রাজন্, মনুষ্যসম্বন্ধী বিত্ত আপনারই থাকুক। আপনি আমার পুত্রের কাছে যে-কথা বলেছিলেন, আমাকে তাই বলুন।' শুনে রাজা বিষণ্ন হলেন এবং তিনি গৌতমকে বললেন, 'দীর্ঘকাল (শিষ্য হিসেবে আমার কাছে) বাস করো। (গৌতম তাই করলেন। একদিন) রাজা তাঁকে বললেন, 'তুমি আমাকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলে– তোমার পূর্বে পূরাকালে কোনো ব্রাহ্মণই এই বিদ্যা লাভ করেনি; এইজন্য সর্বলোকে ক্ষত্রিয়দেরই ক্ষমতা ছিলো।'

বৃহদারণ্যক-উপনিষদেও (বৃহদারণ্যক-৬/২/১-৮) এই উপাখ্যানটি পাওয়া যায়; কেবল শেষাংশে সামান্য পার্থক্য। যেমন–

'স হোবাচ প্রতিজ্ঞাতো ম এষ বরো যাং তু কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাঃ তাং মে ব্রূহীতি। (বৃহদারণ্যক-৬/২/৫)।। স হোবাচ দৈবেষু গৌতম তৎ বরেষু, মানুষাণাং ব্রূহীতি। (বৃহদারণ্যক-৬/২/৬)।। স হোবাচ–বিজ্ঞায়তে হাস্তি হিরণ্যস্য আপাত্তং গো-অশ্বানাং দাসীনাং প্রবরাণাং পরিধানস্য মা নো ভবান্ বহোঃ অনন্তস্যাপর্যন্তস্য অভ্যবদান্যো ভূদিতি। স বৈ গৌতম তীর্থেনেচ্ছাসা ইত্যুপৈম্যহং ভবন্তম্ ইতি বাচা হ স্মৈব পূর্ব উপষন্তি। স হ উপায়নকীর্ত্যা উবাস। (বৃহদারণ্যক-৬/২/৭)।। স হোবাচ তথা নস্ত্বং গৌতম মাপরাধাস্তব চ পিতামহা যথেয় বিদ্যেতঃ পূর্বং ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণ উবাস তাং তু অহং তুভ্যং বক্ষ্যামি। কো হি ত্বৈবং ব্রূবন্তমর্হতি প্রত্যাখ্যাতুমিতি। (বৃহদারণ্যক-৬/২/৮)।।

অর্থাৎ :

গৌতম রাজাকে বললেন, 'আপনি প্রতিজ্ঞা করলেন আমায় বর দেবেন। কুমারের কাছে আপনি যা বলেছিলেন আমায় তাই বলুন' (বৃহদারণ্য-৬/২/৫)। রাজা বললেন, 'ওটা দৈববরের অন্তর্ভুক্ত। আপনার সাংসারিক যদি কোন অভাব থাকে সেই মানবীয় বর প্রার্থনা করুন' (বৃহদারণ্যক-৬/২/৬)। গৌতম বললেন, 'রাজন্, আপনি জানেন আমার সুবর্ণের প্রাপ্তি আছে, গো, অশ্ব, দাসী এবং পরিবারবর্গের পরিধেয় বস্ত্রাদিও আছে। যাহা প্রভূত, অনন্ত ফলপ্রদ ও পর্যাপ্তিবিহীন সেই বস্তুটির প্রদান-বিষয়ে আপনি আমার প্রতি অবদান্য হবেন না।' রাজা বলেন, 'হে গৌতম, তাহলে যথোপযুক্তভাবে তা পেতে যত্ন করুন।' গৌতম বললেন, 'আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম' (বৃহদারণ্যক-৬/২/৭)। রাজা বললেন, 'গৌতম, আপনি যেভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছেন আপনাকে প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য আমার নেই। আচার্যের আসনে বসার জন্য আপনি আমাদের অপরাধ নেবেন না, যেমন আপনার পিতামহরাও নেননি। এই বিদ্যা এর পূর্বে কোনো ব্রাহ্মণ আয়ত্ত করেননি। আমি

আপনাকে সেই বিদ্যা বলবো (বৃহদারণ্যক-৬/২/৮)।

এখানে রাজার উক্তির মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য হলো,– 'ইয়ম্ বিদ্যা ইতঃ পূর্বম্ ন কস্মিন্চন ব্রাহ্মণ উবাস', অর্থাৎ, এই বিদ্যা এর পূর্বে কোনো ব্রাহ্মণেই অবস্থান করেনি।
ছান্দোগ্য-উপনিষদের (ছান্দোগ্য-৫/১১/১-৬) আর একটি উপাখ্যান রয়েছে এরকম–
'প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সত্যে মীমাংসাং চক্রুঃ কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি। (ছান্দোগ্য-৫/১১/১)।।...... স হ সম্পাদয়াঞ্চকার প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াস্তেভ্যো ন সর্বমিব প্রতিপৎস্যে হন্তাহমন্যমভ্যনুশাসানীতি। (ছান্দোগ্য-৫/১১/৩)।। ...... তে হোচুর্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেত্তং হৈব বদেদাত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি।' (ছান্দোগ্য-৫/১১/৬)।।
আখ্যানটির অংশ-বিশেষের সংক্ষিপ্ত তর্জমা :
পাঁচজন মহাগৃহস্থ এবং মহাবেদজ্ঞ– তাঁদের নাম, প্রাচীনশাল ঐপমন্যব, সত্যযজ্ঞ পৌলুষি, ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়, জন শার্করাক্ষ্য, বুড়িল আশ্বতরাশ্বি– একত্রিত হয়ে বিচার করেছিলেন, 'কে আমাদের আত্মা? ব্রহ্মই বা কী?' তাঁরা ঠিক করলেন, 'সম্প্রতি উদ্দালক আরুণি এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছেন; তাঁর কাছে যাওয়া যাক।' উদ্দালক স্থির করলেন, 'এই মহাগৃহস্থ এবং মহাবেদজ্ঞরা আমাকে প্রশ্ন করবেন। সম্ভবত আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না। এঁদের অন্য উপদেষ্টার কথা বলে দিই।' তিনি তাঁদের বললেন, 'হে ভগবদ্-গণ! সম্প্রতি অশ্বপতি কৈকেয় এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছেন; তাঁর কাছে যাওয়া যাক।' তাঁরা সকলে অশ্বপতি কৈকেয়-র কাছে গেলেন। অশ্বপতি কৈকেয় অভ্যাগতদের প্রত্যেককে পৃথক-পৃথক অভ্যর্থনা করালেন এবং প্রাতঃকালে শয্যাপরিত্যাগ করে বললেন, 'আমার জনপদে চোর নেই, কুৎসিত ব্যক্তি নেই, মদ্যপ নেই, অগ্নিহোত্রী নয় এমন ব্রাহ্মণ নেই, অবিদ্বান নেই, স্বৈরী নেই, স্বৈরিণী নেই। হে ভগবদ্-গণ, আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েছি; এক-একজন ঋত্বিককে আমি যে-পরিমাণ ধন দেবো আপনাদের প্রত্যেককেও সেই পরিমাণ ধন দেবো। আপনারা এখানে বাস করুন।' তাঁরা বললেন, 'মানুষ যে-প্রয়োজনে আগমন করে সেই প্রয়োজনের কথাই বলা উচিত। আপনি বর্তমান কালে এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছেন, তাঁর বিষয়ই আমাদেরকে বলুন।' তিনি তাঁদের বললেন, 'প্রাতঃকালে আমি প্রত্যুত্তর দেবো।' তাঁরা (শিষ্যত্ব গ্রহণের লক্ষণ) সমিৎপাণি হয়ে পরদিন সকালে তাঁর কাছে আবার উপস্থিত হলেন এবং অশ্বপতি তাঁদের উপনীত (উপনয়ন সংস্কার) না করেই উপদেশ দিলেন।

বৃহদারণ্যক-উপনিষদের আর একটি আখ্যায়িকা (বৃহদারণ্যক-২/১/১-১৫) এরকম–
'দৃপ্তবালাকির্হানুচানো গার্গ্য আস। স হোবাচাজাতশত্রুং কাশ্যং– ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি। স হোবাচ অজাতশত্রুঃ।–সহস্রমেতস্যাং বাচি দদ্মো। জনকো জনক ইতি বৈ জনা ধাবন্তীতি। (বৃহদারণ্যক-২/১/১)।।...... স হোবাচ অজাতশত্রুঃ–এতাবৎ নু? ইত্যেতাবৎ হি ইতি।

নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি। স হোবাচ গার্গ্য–উপ ত্বা যানীতি। (বৃহদারণ্যক-২/১/১৪)।। স হোবাচাজাতশত্রুঃ–প্রতিলোমং চৈতদ্ যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্ । ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি।'... (বৃহদারণ্যক-২/১/১৫)।।

কাহিনীটির অংশবিশেষ সংক্ষিপ্ত তর্জমা :

দৃপ্তবালাকি নামক জনৈক দাম্ভিক বিদ্বান গার্গ্য (গর্গগোত্রোদ্ভূত) ছিলেন। পাণ্ডিত্যাভিমানে তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রুকে গিয়ে বললেন, 'আমি আপনাকে ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দেবো।' অজাতশত্রু বললেন, 'এই কথার জন্যই আমি আপনাকে সহস্র গো দান করবো।' সবাই 'জনক' 'জনক' বলে তাঁর সভাতেই ছোটেন, তিনি প্রসিদ্ধ দাতা এবং শ্রোতা বলে। তারপর অজাতশত্রু দৃপ্তবালাকি-কে প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত ওই গার্গ্য নীরব হলেন। গার্গ্যকে নীরব থাকতে দেখে রাজা অজাতশত্রু বললেন, 'এই পর্যন্তই কি? আর কিছু বলবেন না?' গার্গ্য বললেন, 'এই পর্যন্তই। আর আমার কিছু বলার নেই।' চূর্ণ-দর্প গার্গ্য বুঝলেন কাশীরাজ অজাতশত্রু অসীম জ্ঞানের অধীশ্বর। তাই নিমেষে সব অহমিকা ফেলে দিয়ে গার্গ্য বললেন, 'রাজন্, আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাই। আপনি আমাকে ব্রহ্ম-উপদেশ দিন।' বালাকির এই প্রস্তাবে কিছুটা বিব্রত অজাতশত্রু বললেন, 'ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের কাছে ব্রহ্মোপদেশ নিতে আসা বিপরীত পদ্ধতি (প্রতিলোমম্); আমি আপনাকে সে-বিষয়ে জ্ঞান দেবো।

প্রায় হুবহু এই উপাখ্যানটিই পাওয়া যায় কৌষীতকি-উপনিষদেও (কৌষীতকি-৪/১-১৯)। এবং এ-জাতীয় দৃষ্টান্ত থেকেই আধুনিক গবেষক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বদলে ক্ষত্রিয় শ্রেণীরই উদ্ভাবন। তবে, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন-

'এইভাবে সমগ্র উপনিষদ-দর্শনকে একান্তভাবে ক্ষত্রিয়-শ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত করা সত্যিই সম্ভব কিনা– এ-বিষয়েও নানা প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। কেননা, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, উপনিষদের একজন প্রধান দার্শনিক যাজ্ঞবল্ক্য সুস্পষ্টভাবে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ ছিলেন, সত্যকাম জাবালকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কিছু বলেই সনাক্ত করা যায় না, শকটবান রৈক্ক-কে ব্রাহ্মণ বলেই অনুমান করা স্বাভাবিক। এবং এ-জাতীয় আরও নানা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা সম্ভব।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১১৭)

উল্লিখিত শকটবান রৈক্ক-এর পরিচয়-সন্ধান প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য-উপনিষদের চতুর্থ-অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে রাজা জানশ্রুতি ও রৈক্ক উপাখ্যান রয়েছে। আর সত্যকাম জাবালের পরিচয় প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রসিদ্ধ আখ্যানের শুরুতেই বর্ণনায় পাওয়া যায়–

সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিংগোত্রো ন্বহমস্মীতি। (ছান্দোগ্য-৪/৪/১)।। সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্-গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহহমেতন্ন বেদ যদ্-গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি। (ছান্দোগ্য-৪/৪/২)।।

অর্থাৎ :
একদা সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে সম্বোধন করে বললেন– ‘পূজনীয় মা, আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে (গুরুগৃহে) বাস করতে চাই। আমার কী গোত্র? (ছান্দোগ্য-৪/৪/১)।। জবালা তাকে বললেন– ‘পুত্র, তোমার গোত্র কী তা আমি জানি না। যৌবনে বহু লোকের পরিচর্যায় ব্যস্ত থেকে আমি তোমাকে পেয়েছি। সুতরাং তুমি কোন্ গোত্রীয় তা জানতে পারিনি। আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম। সুতরাং (কেউ গোত্র জিজ্ঞাসা করলে) তুমি সত্যকাম জাবাল বলেই পরিচয় দিও।

অতএব, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সামগ্রিকভাবে উপনিষদের দর্শনকে শুধুমাত্র ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অবদান বলা সম্ভব না-হলেও অন্তত স্বীকার করা প্রয়োজন যে এ-দর্শন বহুলাংশেই ক্ষত্রিয় শ্রেণীর উদ্ভাবন এবং উপনিষদের যুগে ক্ষত্রিয় রাজ-রাজড়ারা দার্শনিক আলাপ-আলোচনা রীতিমতো উপভোগ করতেন। যেমন, বৃহদারণ্যক-উপনিষদের একটি উপাখ্যানের শুরুটা হলো–
‘জনকো হ বৈদেহ আসাঞ্চক্রেহথ হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ। তং হোবাচ–যাজ্ঞবল্ক্য, কিমর্থমচারীঃ? পশূনিচ্ছন্, অন্বন্তনীতি? উভয়মেব সম্রাড়িতি হোবাচ।’ (বৃহদারণ্যক-৪/১/১)।।
অর্থাৎ :
একদা বিদেহ-রাজ জনক সভাসীন ছিলেন; এমন সময় যাজ্ঞবল্ক্য সেখানে উপস্থিত হলেন। জনক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ‘যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি কী প্রয়োজনে এসেছেন– পশুকামনায়, না সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচনার কামনায়?’ যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ‘সম্রাট, আমি উভয় উদ্দেশ্যেই আগমন করেছি।’

অনন্তর জনক এবং যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বের সুদীর্ঘ আলোচনা হলো। অতএব, বলা যেতেই পারে যে, উপনিষদে যে দার্শনিকতার উন্মেষ ঘটেছে তার প্রধান অবদান ক্ষয়িত্রদেরই। আর যাগযজ্ঞ বিষয়ক আলোচনার বাইরে গিয়ে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের মধ্যে যে প্রাসঙ্গিক দর্শন-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় তা মূলত ক্ষত্রিয়-রাজন্য যজমানদের দর্শনালোচনায় নিরন্তর আগ্রহের প্রেক্ষিতে তাদেরকে সন্তুষ্ট করে প্রভূত ধন-সম্পদ লাভের অন্যতম উপায় হিসেবেই ব্রাহ্মণেরা দর্শনালোচনায় অভিনিবেশ করেছিলেন হয়তো। এখানে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতার বিষয়টিও জড়িত হয়ে পড়েছিলো। উপনিষদ জুড়ে যে দার্শনিক-তত্ত্বের উন্মেষ ঘটেছিলো যা থেকে পরবর্তীকালের দার্শনিক প্রস্থানগুলির জন্ম-স্পন্দন শুরু হয়েছিলো বলে দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন, উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন প্রসঙ্গেই এই উপনিষদ-প্রতিপাদ্য তত্ত্বের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা অধিকতর প্রাসঙ্গিক হবে।
…

২.৪ : বেদাঙ্গ
'বেদ' বা 'শ্রুতি' বলতে 'সংহিতা', 'ব্রাহ্মণ', 'আরণ্যক' ও 'উপনিষদ' বোঝায়। কিন্তু এই বেদ-পাঠের সহায়ক হিসেবে আরও কয়েক-রকম রচনা সৃষ্টি হয়েছিলো। সামগ্রিকভাবে সেগুলিকে বলা হয় 'বেদাঙ্গ'। এদের প্রয়োজন ব্যবহারিক। বেদ-পাঠ ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সাহায্য করতো বলে এদের নাম বেদের-অঙ্গ বা বেদাঙ্গ। মূলত পেশাজীবী ও শিক্ষার্থীদের জন্য বেদাঙ্গ সাহিত্য রচিত হয়েছিলো। ছয় ধরনের বিষয়বস্তুতে বিভক্ত ছিলো এই বেদাঙ্গ সাহিত্য। যেমন– শিক্ষা, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প।

(১) শিক্ষা।
'শিক্ষা' হলো প্রথম বেদাঙ্গ। এ-জাতীয় সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় হলো নির্ভুলভাবে বৈদিক শব্দ উচ্চারণের পদ্ধতি। সেকালে বেদ-অধ্যয়ন নিত্য কর্তব্য ছিলো। যজ্ঞেও বেদ পাঠের প্রয়োজন হতো। দৈনিক পাঠকে স্বাধ্যায় বলা হতো। শিক্ষা-গুরু বেদের শব্দরাশির নির্ভুল উচ্চারণ শিক্ষা দিতেন। গুরুর কাছ থেকে শিষ্য তা গ্রহণ করতো। বেদের সংহিতা অংশই প্রধানত শিক্ষার আলোচনার বিষয়।

সংহিতা দুভাবে পাঠ করা হতো। তার পাঠকে পদপাঠ বলা হতো। এই দু'রকম পদপাঠ হলো– অব্যাকৃত পদপাঠ এবং ব্যাকৃত পদপাঠ। সংহিতায় পরস্পর সন্নিবদ্ধ অবস্থায় পদগুলি যেভাবে আছে তেমনভাবে রেখে পাঠ করাকে বলা হয় অব্যাকৃত পদপাঠ। আর ব্যাকৃত পদপাঠে প্রতি পদকে সন্নিবদ্ধ রূপ হতে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পৃথকভাবে উচ্চারণ করা হয়। স্বভাবতই বেদের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে এই জাতীয় উচ্চারণ-পদ্ধতির আলোচনা সংযুক্ত ছিলো। সংহিতা পাঠের সঙ্গে পদপাঠের সম্পর্ক নির্দেশ করতে প্রাতিশাখ্য গ্রন্থের উদ্ভব হয়। তাই প্রাচীনতম 'শিক্ষা'-গ্রন্থের নাম 'প্রাতিশাখ্য'।

প্রত্যেক বেদের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাতিশাখ্য সূত্র আছে। ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ হলো 'ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য' বা 'শাকল-প্রাতিশাখ্য'। সামবেদের প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ অনেকগুলি, যেমন– 'সাম-প্রাতিশাখ্য', 'পুষ্পসূত্র', 'পঞ্চবিধান-সূত্র' ও 'ঋকতন্ত্র ব্যাকরণ'। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের 'তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য-সূত্র' এবং শুক্ল-যজুর্বেদের 'বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্য-সূত্র'। অথর্ববেদের দুটি প্রাতিশাখ্য সূত্র– 'অথর্ববেদ-প্রাতিশাখ্য-সূত্র' ও 'শৌনকীয়-চতুরধ্যায়িকা'।

প্রাতিশাখ্য গ্রন্থগুলি ছাড়াও ছন্দে রচিত কিছু শিক্ষাগ্রন্থ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে প্রধান হলো ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের পাণিনীয় শিক্ষা, সামবেদের নারদীয় শিক্ষা, কৃষ্ণ-যজুর্বেদের ব্যাস শিক্ষা, শুক্ল-যজুর্বেদের যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা এবং অথর্ববেদের মাণ্ডুক্য শিক্ষা।

(২) ব্যাকরণ।
দ্বিতীয় বেদাঙ্গ হচ্ছে 'ব্যাকরণ'। ব্যাকরণের সঙ্গে শিক্ষার খানিকটা যোগ আছে। সংহিতার

অব্যাকৃত পাঠকে সন্ধিবিচ্ছেদ করে ব্যাকৃতরূপে অর্থাৎ পদপাঠে পরিণত করতে সন্ধি বা সংশ্লিষ্ট নিয়মগুলি জানা দরকার। সেগুলি ব্যাকরণের বিষয়। তাছাড়াও বেদপাঠে বা যজ্ঞে তার আরও প্রয়োগ আছে। মন্ত্রকে যজ্ঞে প্রয়োগ করবার সময় কোনও কোনও ক্ষেত্রে পদের লিঙ্গ বিভক্তি প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে। ব্যাকরণ না জানলে পদের অর্থগ্রহণ করা সহজ হয় না, ভাষাকে বিশুদ্ধ রাখাও প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে ব্যাকরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

তবে প্রকৃত বেদাঙ্গ বলতে যে প্রাচীন ব্যাকরণ তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনতম ব্যাকরণ-গ্রন্থ বলতে যা পাওয়া যায় তা হলো পাণিনির ‘অষ্টাধ্যায়ী’ বা ‘পাণিনি-সূত্র’। পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে চৌষট্টি জন পূর্বাচার্যের নাম করেছেন বলে জানা যায়। কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণকে বেদাঙ্গ বলা যায় না, কেননা বৈদিক ভাষা উপলক্ষ্য করেই এবং বেদ পাঠের সহায়ক হিসেবেই এ-ব্যাকরণ রচিত হয়নি। বস্তুত পাণিনির প্রধানতম আলোচ্য বিষয় হলো বেদ-পরবর্তী সংস্কৃত ভাষাই। এখানে স্মর্তব্য যে, বেদের ভাষা এই সংস্কৃতের চেয়ে অনেক প্রাচীন।

(৩) ছন্দ।
‘ছন্দ’ হলো তৃতীয় বেদাঙ্গ। এটি স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। ঋক্-সংহিতার এবং সাম-সংহিতার সব মন্ত্রই ছন্দোবদ্ধ। অবশ্য সাম-সংহিতার মন্ত্র গাওয়া হতো। অথর্ব সংহিতারও বেশিরভাগ মন্ত্রই ছন্দোবদ্ধ। প্রধানত সামবেদের ‘ব্রাহ্মণ’ এবং ‘উপনিষদে’ই বৈদিক ছন্দ সংক্রান্ত নানা আলোচনা পাওয়া যায়। আরও পরবর্তী কালে বেদাঙ্গ হিসেবে বৈদিক ছন্দ সংক্রান্ত আরও নানা আলোচনা-গ্রন্থ রচিত হয়েছিলো।
সকল প্রাতিশাখ্যের শেষে, সামবেদের নিদানসূত্রে, শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে এবং বিভিন্ন অনুক্রমণিকাতে ছন্দ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। পিঙ্গলের ‘ছন্দঃসূত্র’কেই বেদাঙ্গ বলে বিবেচনা করা হয়। তবে এটিকে বিশুদ্ধভাবে বেদাঙ্গ গণ্য করা যায় না। তার প্রথম চার অধ্যায়ে বৈদিক ছন্দের আলোচনা আছে। তারপর অতিরিক্তভাবে লৌকিক ছন্দেরও বিবরণ রয়েছে। অনুমান হয় এ-জাতীয় আরও কয়েকটি ছন্দ-আলোচনা বিলুপ্ত হয়েছে।

(৪) নিরুক্ত।
বেদে ব্যবহৃত শব্দাবলীর উৎপত্তি, অর্থ এবং অর্থান্তর প্রভৃতির আলোচনা-গ্রন্থ হলো চতুর্থ বেদাঙ্গ ‘নিরুক্ত’। নিরুক্তের সঙ্গে নিঘণ্টুর ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। প্রাচীনতম বৈদিক শব্দকোষ হিসেবে যে-গ্রন্থটি পাওয়া গেছে তার নাম ‘নিঘণ্টু’। নিঘণ্টুর মতো তখন আরও অনেক বৈদিক শব্দ-সংগ্রহ ছিলো, সেগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। যাস্ক এই ‘নিঘণ্টু’র ভাষ্য রচনা করেছিলেন, তারই নাম ‘নিরুক্ত’। ‘নিঘণ্টু’তে তালিকাবদ্ধ শব্দগুলি কোন্ ঋকে ঠিক কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ‘নিরুক্তে’ তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।
খ্রিস্টপূর্ব ৭০০-৫০০ অব্দের মধ্যে যাস্কের কাল-নির্ণয় করা হয়েছে। স্পষ্টতই বোঝা যায়, ওই সুপ্রাচীন যুগেই ঋগ্বেদের প্রকৃত অর্থ নিয়ে নানা রকম মতভেদ দেখা দিয়েছিলো;

কেননা যাস্ক এ-জাতীয় নানা মতভেদের উল্লেখ করেছেন। স্বভাবতই ‘নিঘণ্টু’র রচনাকাল ‘নিরুক্ত’র চেয়ে আরও অনেক পুরনো।

‘নিঘণ্টু’তে তিনটি কাণ্ডে পাঁচটি অধ্যায় আছে। প্রথম তিনটি অধ্যায় নিয়ে ‘নৈঘণ্টুক কাণ্ড’। তাতে একার্থবাচক শব্দের সংগ্রহ তাছে। চতুর্থ অধ্যায় হলো ‘ঐকপদিক’ বা ‘নৈগস কাণ্ড’। তাতে একটি অর্থ সূচিত করে এমন শব্দের সংগ্রহ আছে। পঞ্চম অধ্যায় ‘দৈবত কাণ্ড’। তাতে বেদের দেবতাদের নামের সংগ্রহ আছে।
‘নিরুক্তে’র দুটি ষট্-কে বারোটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম ষট্-কে নিরুক্তের প্রথম দুটি কাণ্ডের ব্যাখ্যা আছে। দ্বিতীয় ষট্-কে দৈবত কাণ্ডের ব্যাখ্যা রয়েছে।

‘নিরুক্ত’র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো ভেঙে বলা। এই অর্থে তা ব্যাকরণের পরিপূরক। ব্যাকরণ শব্দগুলিকে ভেঙে পৃথক করে দেয়। নিরুক্ত পদকে ভেঙে তার ব্যাখ্যা করে। ব্যাকরণের সম্বন্ধ শব্দের সাথে, নিরুক্তের সম্বন্ধ অর্থের সাথে। পদকে ভাঙলে তবেই তার অর্থ গ্রহণ করা সহজ হয়। সুতরাং ব্যাকরণ ও নিরুক্ত পরস্পরের পরিপূরক।

(৫) জ্যোতিষ।
পঞ্চম বেদাঙ্গ হলো ‘জ্যোতিষ’। বিভিন্ন তিথি-নক্ষত্রে বিভিন্ন বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনের ব্যবস্থা ছিলো। যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা তাঁকে ঋত্বিক বলে। যজ্ঞের কাল নিরূপিত হতো দিনের বেলায় শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণকে লক্ষ্য করে। এই প্রসঙ্গে অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর গণনা করা ঋত্বিকের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়তো। স্বভাবতই এজন্যে বেদাঙ্গ হিসেবে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উদ্ভব হয়।
লগধের ‘বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ’ নামে একটি প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায়। গ্রন্থটি ছোট এবং এখনও অনেকাংশ দুর্বোধ্য বলে জানা যায়। যাজুষ এবং আর্চভেদে তার দুটি শাখা আছে।

(৬) কল্প।
ষষ্ঠ বেদাঙ্গ হলো ‘কল্প’। কল্পগুলি সূত্র আকারে গ্রথিত। এ-জাতীয় সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় হলো নির্ভুলভাবে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানের পদ্ধতি। অবশ্যই ‘ব্রাহ্মণ’-গ্রন্থগুলিতে এই আলোচনাই বিস্তৃতভাবে করা হয়েছিলো; কিন্তু পরবর্তী কালের পুরোহিতদের পক্ষে এই সুবিশাল ‘ব্রাহ্মণ’-সাহিত্যের সমস্ত আলোচনা মুখস্থ রাখা নিশ্চয়ই সহজ হয়নি। তাই সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে যজ্ঞানুষ্ঠানমূলক আলোচনা মনে রাখবার সুবিধার জন্য ‘কল্প-সূত্র’ রচিত হয়েছিলো। তাতে যেমন যজ্ঞের প্রয়োগবিধি বর্ণিত হয়েছে, তেমনি গার্হস্থ্য জীবনের সংস্কার প্রভৃতির আলোচনাও রয়েছে। যেহেতু বৈদিক যাগযজ্ঞ বলতে নানা রকম এবং সে-বিষয়ে আলোচনাও নানা ধরনের, তাই ‘কল্প-সূত্র’ও এক-রকমের নয়। ‘কল্প-সূত্রে’র চারটি শ্রেণী রয়েছে, যেমন– (ক) শ্রৌতসূত্র, (খ) গৃহ্যসূত্র, (গ) ধর্মসূত্র ও (ঘ) শূল্বসূত্র।

ক। ‘শ্রৌত-সূত্র’– শ্রৌত-যজ্ঞের আলোচনা। ‘ব্রাহ্মণ’-সাহিত্যে যে সমস্ত যজ্ঞের উল্লেখ আছে তাদের বলা হয় শ্রৌত-যজ্ঞ, কারণ ব্রাহ্মণ শ্রুতির অঙ্গ। এই যজ্ঞগুলির সংখ্যা চৌদ্দটি– সাতটি হবির্যজ্ঞ অর্থাৎ ঘৃতাহুতি দিয়ে নিষ্পন্ন করতে হয়, এবং সাতটি সোম-যজ্ঞ অর্থাৎ সোমরস আহুতি দিতে হয়। শ্রৌত-সূত্রে এই চৌদ্দটি যজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এর জন্য তিনটি অগ্নির আধান করতে হয়– গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ। এদের বিষয়েও আলোচনা রয়েছে।

খ। ‘গৃহ্য-সূত্র’— গৃহ্য-যজ্ঞের আলোচনা। চৌদ্দটি শ্রৌত-যজ্ঞ ছাড়া আরও অতিরিক্ত যজ্ঞ আছে। তাদের ‘স্মার্ত-যাগ’ বলা হয়। তাতে ঔপাসন, হোম, বৈশ্বদেব প্রভৃতি সাতটি যজ্ঞের বিধান আছে। এদের আলোচনা রয়েছে গৃহ্য-সূত্রে। স্মার্ত-কর্মগুলি স্মার্ত-অগ্নিতে করা নিয়ম। স্মার্ত-অগ্নির অন্য নাম বৈবাহিক, গৃহ্য, অবিসথ্য ও ঔপাসন অগ্নি। কতকগুলি যজ্ঞের শ্রৌত এবং গৃহ্য উভয় রূপই আছে, যেমন– অগ্নিহোত্র, দশপূর্ণমাস, পশুযাগ, পিতৃযাগ।
এছাড়া হিন্দু-সংস্কৃতিতে জন্ম হতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত যে দশটি সংস্কার ব্যক্তির জীবনে পালন করতে হয়; কারণ বৈদিক যুগ হতে এগুলি পালিত হয়ে আসছে। যেমন– জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, সমাবর্তন, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এগুলি কিভাবে সম্পাদিত হবে তার বিধি গৃহ্য-সূত্রে রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই সংস্কারগুলি হাজার হাজার বছর ধরে অপরিবর্তিতরূপে এখনও বর্তমান আছে।

গ। ‘ধর্ম-সূত্র’— ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-অকর্তব্য, দেশাচার-লোকাচার প্রভৃতির আলোচনা। ‘ধর্ম-সূত্র’ পরিবারকে ছাড়িয়ে সমাজে পরিব্যাপ্ত। এর আর এক নাম হলো ‘সাময়াচারিক-সূত্র’। এখানে সময় অর্থে সর্বসম্মত অনুশাসন বোঝানো হয়েছে। সুতরাং তাতে রয়েছে সর্বসম্মত অনুশাসন এবং আচরণ সম্বন্ধে উপদেশ। এগুলি ‘গৃহ্য-সূত্রে’র সঙ্গে সংযুক্ত এবং বলা বাহুল্য, ন্যায়-অন্যায় বা কর্তব্য-অকর্তব্য সংক্রান্ত প্রাচীন বৈদিক ধারণা যাগযজ্ঞ-অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ নয়। তবুও এই ‘ধর্ম-সূত্র’গুলিই ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম আইন-গ্রন্থের নিদর্শন বলে মনে করা হয়।

ঘ। ‘শূল্ব-সূত্র’— বৈদিক যজ্ঞের যজ্ঞবেদি প্রভৃতির মাপজোক কী রকম হবে তারই আলোচনা এই ‘শূল্ব-সূত্রে’। ‘শূল্ব’ মানে জমি মাপবার দড়ি বা সুতো, গজফিতে ধরনের। তাতে নানা ধরনের যজ্ঞবেদির পরিমাণ, আকার, আয়তন ইত্যাদি ঠিক করবার নিয়ম দেওয়া আছে। এগুলি ‘শ্রৌত-সূত্রে’র সঙ্গে সংযুক্ত এবং ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে জ্যামিতি-বিদ্যার প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যায়।

বেদের বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন ‘শ্রৌত-সূত্র’, ‘গৃহ্য-সূত্র’ প্রভৃতি ‘কল্প-সূত্র’ ছিলো; অনেকগুলি বর্তমান আছে, অনেকগুলি বিলুপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন ‘কল্প-সূত্রে’র সঙ্গে বিভিন্ন প্রাচীন বেদ-বিদ্ বা বিদ্বানের নাম সংযুক্ত। প্রতিটি বেদের সঙ্গে সংযুক্ত নানা শ্রেণীর যেসব ‘কল্প-সূত্র’ পাওয়া

যায়, তার একটি তালিকা নিম্নরূপ–

ঋগ্বেদ :
শ্রৌত-সূত্র : শাংখ্যায়ন-ব্রাহ্মণের সাথে সংযুক্ত ‘শাংখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র’ ও ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের সঙ্গে সংযুক্ত ‘আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র’।
গৃহ্য-সূত্র : ‘শাংখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্র’, ‘আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র’, ‘শম্বিবৎ-গৃহ্যসূত্র’।
তবে ঋগ্বেদে ধর্ম-সূত্র বা শূল্ব-সূত্র নেই।

সামবেদ :
শ্রৌত-সূত্র : পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণের সাথে যুক্ত ‘মশক-শ্রৌতসূত্র’ ও ‘লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্র’, এবং রাণায়নীয় শাখার ‘দ্রাহ্যায়ণ-শ্রৌতসূত্র’।
গৃহ্য-সূত্র : ‘গোভিল-গৃহ্যসূত্র’, রাণায়নীয় শাখার ‘খাদির-গৃহ্যসূত্র’ এবং জৈমিনীয় শাখার ‘জৈমিনীয়-গৃহ্যসূত্র’।
ধর্ম-সূত্র : রাণায়নীয় শাখার ‘গৌতম-ধর্মসূত্র’।
তবে সামবেদের কোন শূল্ব-সূত্র নেই।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদ :
শ্রৌত-সূত্র : তৈত্তিরীয় শাখায়– ‘বৌধায়ন-শ্রৌতসূত্র’, ‘বাধূল-শ্রৌতসূত্র’, ‘ভারদ্বাজ-শ্রৌতসূত্র’, ‘আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র’, ‘হিরণ্যকেশি-শ্রৌতসূত্র’, ‘বৈখানস-শ্রৌতসূত্র। কাঠক শাখায় ‘কাঠক-শ্রৌতসূত্র’, মৈত্রায়ণীয় শাখার ‘মানব-শ্রৌতসূত্র’ এবং ‘বারাহ-শ্রৌতসূত্র’।
গৃহ্য-সূত্র : তৈত্তিরীয় শাখার– ‘বৌধায়ন, বাধূল, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশি ও বৈখানস– গৃহ্যসূত্র।
কাঠক শাখায় ‘কাঠক-গৃহ্যসূত্র’। মৈত্রায়ণীয় শাখার– মানব এবং বারাহ– গৃহ্যসূত্র।
ধর্ম-সূত্র : তৈত্তিরীয় শাখায়– বৌধায়ন, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশি এবং বৈখানস– ধর্মসূত্র।
শূল্ব-সূত্র : তৈত্তিরীয় শাখায়– বৌধায়ন, আপস্তম্ব ও হিরণ্যকেশি– শূল্বসূত্র। কাঠক শাখার ‘কাঠক-শূল্বসূত্র’। মৈত্রায়ণীয় শাখার– মানব এবং বারাহ– শূল্বসূত্র।

শুক্ল-যজুর্বেদ :
শ্রৌত-সূত্র : ‘কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র’।
গৃহ্য-সূত্র : ‘পারস্কর-গৃহ্যসূত্র’।
শূল্ব-সূত্র : ‘কাত্যায়ন-শূল্বসূত্র’।
তবে শুক্ল-যজুর্বেদে ধর্ম-সূত্র নেই।

অথর্ববেদ :
শ্রৌত-সূত্র : ‘বৈতান-শ্রৌতসূত্র’।

গৃহ্য-সূত্র : ‘কৌশিক-গৃহ্যসূত্র’।
তবে এগুলি অন্য বেদের সূত্রের মতো নয়। কৌশিক-সূত্রে অনেক তুকতাকের কথা রয়েছে।
অথর্ববেদে ধর্ম-সূত্র বা শূল্ব-সূত্র নেই।
...

২.৫ : ভাষ্য

ভাষ্য হলো ক্রমান্বয়ে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠা প্রাচীন সাহিত্যের একজাতীয় বোধগম্য ব্যাখ্যা। বৈদিক-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আধুনিক বিদ্বান গবেষকেরা অনুমান করেছেন, সংহিতা-যুগের অনেক পরে পুরোহিতেরা যখন 'ব্রাহ্মণ'-গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন তখনই তাঁদের কাছে প্রাচীন সংহিতায় সংকলিত রচনাবলীর অর্থ অনেকাংশেই অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। কেননা ওই পুরোহিত শ্রেণীর স্মৃতিতেই প্রাচীন রচনাবলী সংরক্ষিত হলেও– এবং এই রচনাবলীকে পরবর্তীকালে পুরোহিতেরা পবিত্রতম বলে গ্রহণ করলেও– ইতোমধ্যে বৈদিক মানুষদের ভাষায় সুগভীর পরিবর্তন ঘটেছে; ফলে প্রাচীন ভাষার পূর্ণাঙ্গ তাৎপর্য 'ব্রাহ্মণ'-কারদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। তাছাড়া 'ব্রাহ্মণে'র যুগে আরও একটি যে উৎসাহ সুস্পষ্ট হয়েছে, তা হলো, ঋগ্বেদ-সংহিতায় সংকলিত সূক্তগুলি আদিতে যে-উদ্দেশ্যেই রচিত হোক না কেন, 'ব্রাহ্মণে'র যুগে এগুলিকে– বা এগুলির অংশবিশেষকে– নানান যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রয়োগ করবার প্রচেষ্টা পরিস্ফুট হয়েছে। আর এ-কারণে 'ব্রাহ্মণ'-গ্রন্থে প্রায়ই দেখা যায়, প্রাচীন ঋক্-গুলির– বা এমনকি অনেক সময় প্রাচীন শব্দগুলিরও– নতুন নতুন অর্থ উদ্ভাবন করবার প্রচেষ্টা চলেছে।

অতএব,– 'পরবর্তীকালে প্রাচীন বৈদিক রচনাবলীর অর্থনির্ণয় প্রসঙ্গে নানা রকম মতান্তর দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। স্পষ্টই বোঝা যায়, 'নিরুক্ত' রচনার যুগেই বেদবিদদের মধ্যে বেদার্থ-নিরূপণ প্রসঙ্গে নানা রকম গভীর ও মৌলিক বিতর্ক শুরু হয়েছিল। কেননা, বেদ-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'নিরুক্ত'-কার স্বয়ং যাস্ক অন্তত সতেরোজন পূর্বানুগামী বিদ্বানের উল্লেখ করেছেন এবং যাস্কের রচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এঁদের মতামত বা ব্যাখ্যা বহুলাংশেই পরস্পরবিরোধী ছিল। এমনকি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমন মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন যে বৈদিক সূক্তগুলি দুর্বোধ্য অর্থহীন ও পরস্পরবিরোধী, অতএব বেদ-ব্যাখ্যা পণ্ডশ্রম মাত্র। উত্তরে অবশ্য যাস্ক বলছেন, অন্ধ যদি স্তম্ভ দেখতে না পায় তাহলে অপরাধটা স্তম্ভের নয়। কিন্তু এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে স্বয়ং যাস্ক অনেক সময় একই বৈদিক শব্দের একাধিক অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব বোঝা যায়, যাস্কের সময় পর্যন্তও প্রাচীন বৈদিক শব্দ ও বাক্যের অর্থনির্ণয় সংক্রান্ত ঐতিহ্যের কোনো অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বর্তমান ছিল না। কিন্তু যাস্কের পূর্ববর্তী বেদ-ব্যাখ্যাকারদের রচনার মতোই তাঁর পরবর্তী ব্যাখ্যাকারদের রচনাও বিলুপ্ত হয়েছে। ঋগ্বেদের সামগ্রিক ভাষ্য বলতে আমরা যা পাই তা হলো খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে সায়ণাচার্যের রচনা; এই সায়ণভাষ্যে ঋগ্বেদের প্রতিটি ঋকের প্রতিটি শব্দ ধরে ধরে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রট্ প্রভৃতি কোনো কোনো আধুনিক ইউরোপীয় বিদ্বান ঋগ্বেদের ব্যাখ্যায় সায়ণের এই ভাষ্যকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করবার প্রস্তাব করেছেন। তাঁদের যুক্তি অনুসারে ঋগ্বেদ রচনার অন্তত দু'তিন হাজার বছর পরে সায়ণ ঋগ্বেদের যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা মূলতই সায়ণের নিজস্ব উদ্ভাবন হতে বাধ্য; তাই এর উপর নির্ভর না করে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ঋগ্বেদের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। রট্ প্রমুখ বিদ্বানেরা সেই চেষ্টাই করেছেন।'- (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/ ভারতীয়

দর্শন, পৃষ্ঠা-১২২)

কিন্তু অন্য বিদ্বানেরা অবশ্যই এইভাবে সায়ণ-ভাষ্যকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে সম্মত নন। তাঁদের মতে সায়ণকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা সায়ণের উপর একান্তভাবে নির্ভর করবার মতোই ভুল। কেননা, যদিও এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে অনেক সময় সায়ণের ব্যাখ্যা তাঁরই উদ্ভাবন তবুও সায়ণ যে একেবারেই কোনো রকম প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করেন নি তাও মনে করা ঠিক নয়। অতএব বেদার্থ-বিচারে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির উপযোগিতা স্বীকার করে অনেকাংশে সায়ণের অনুসরণও বাঞ্ছনীয়। বেদের আলোচনায় মোটের উপর এই মতটিই গ্রহণ করা যেতে পারে।

...

৩.০ : বৈদিক সাহিত্যে সমাজ ও তার চিন্তাধারা

বৈদিক-যুগের সমাজ-সংস্কৃতির রূপটি কেমন ছিলো তা নিরূপণের প্রধানতম মাধ্যম হিসেবে খুব স্বাভাবিকভাবেই গবেষকরা ঋগ্বেদের উপরই নির্ভর করেছেন বেশি। এক্ষেত্রে সমগ্র ঋগ্বেদ জুড়েই যে সমর্থনটির দিকে গবেষকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হলো– যাঁরা বেদ রচনা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন মূলতই পশুপালক। এমনকি তাঁরা ভালো করে কৃষিকাজও শেখেন নি; ধনসম্পদ বলতে তাঁদের কাছে প্রধানতই পশু। এ প্রেক্ষিতে খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো, গোটা ঋগ্বেদ জুড়ে পশু হিসেবে 'গো' বা গরুর প্রাধান্য একচ্ছত্র। তবে বৈদিক মানুষদের কাছে 'গো' কেবল গরুই নয়, অনেক কিছুই।

বৈদিক শব্দকোষ বলে স্বীকৃত 'নিঘণ্টু'-মতে (নিঘণ্টু-১/১) পৃথিবী-বাচক একটি শব্দ হলো 'গো' বা গরু। ভাষ্যকার সায়ণও ঋগ্বেদে স্থান-বিশেষে 'গো' শব্দ পৃথিবী অর্থে গ্রহণ করেছেন, যেমন–

'স্তরীর্যৎসুত সদ্যো অজ্যমানা ব্যাথরব্যথীঃ কৃণুত স্বগোপা।
পুত্রো যৎপূর্বঃ পিত্রোর্জনিষ্ট শম্যাং গৌর্জগার যদ্ধ পৃচ্ছান্'।। (ঋগ্বেদ-১০/৩১/১০)।
অর্থাৎ : রেতসেক প্রাপ্ত হয়ে বৃদ্ধা গাভী প্রসব করলে যেরূপ হয়, অরণি অর্থাৎ অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ সেরূপ অগ্নিকে প্রসব করে। সে অরণি লোকের ক্লেশ দূর করে, যারা অরণিকে রক্ষা করেন সেরূপ ব্যক্তিদের ব্যথা পেতে হয় না। অগ্নি অরণিদ্বয়ের পুত্রস্বরূপ, তিনি পূর্বকালে দু অরণিস্বরূপ মাতা পিতা হতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। এ যে অরণিস্বরূপ গাভী, সে শমী বৃক্ষে জন্ম গ্রহণ করে, তারই অন্বেষণ করা হয়ে থাকে।

'নিঘণ্টু'-মতে আবার 'অদিতি' শব্দও পৃথিবী-বাচক (নিঘণ্টু-১/১) এবং গো-বাচক (নিঘণ্টু-২/১১), দুইই। তেমনি 'ইলা' মানে পৃথিবী (নিঘণ্টু-১/১), গো (নিঘণ্টু-২/১১), বাক্ এবং অন্ন (নিঘণ্টু-১/১১)। তাই দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন–
'এ-জাতীয় শব্দ ব্যবহার থেকেই অনুমান হয়, বৈদিক কবিদের কল্পনা ছিল একান্তই গো-বিভোর বা গো-ময়। গোরুই তাঁদের কাছে সব-কিছু, যেন পুরো পৃথিবী।... জনৈক কবি এমনকি বৈদিক দেবতাদেরও "গো-জাতঃ" বলে বর্ণনা করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। এবং স্বর্গ থেকে পৃথিবীর দূরত্ব নিরূপণের উদ্দেশ্যেও সহস্র গোরুকেই উপর উপর দাঁড় করাবার পরিকল্পনা দেখা যায়।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১২৫)

অতএব বৈদিক সমাজ ও তার চিন্তাধারায় বৈদিক অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে পশুপালন-নির্ভরতা। পশুপালক ছিলেন বলেই বৈদিক কবিদের রচনায় পশু নিয়ে অসম্ভব উচ্ছ্বাস। এবং এই বৈশিষ্ট্যটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। কেননা আমরা আগেই দেখেছি যে, প্রাক্-বৈদিক– বিশেষত সিন্ধু-সভ্যতার– চিন্তাধারার সঙ্গে বৈদিক চিন্তাধারার একটি প্রধান পার্থক্য বলতে পুরুষ-প্রাধান্য। এর কারণ হিসেবেও জেনেছি যে, পশুপালন-নির্ভর সমাজ পুরুষ-প্রধান, ফলে পশুপালকদের চিন্তা-চেতনাতেও এই পুরুষ-প্রাধান্যের পরিচয় স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে,

কৃষি-প্রধান অর্থনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজ-ব্যবস্থা মাতৃ-প্রধান; তাই এ-পর্যায়ের চিন্তাক্ষেত্রেও মাতৃ-প্রাধান্য অনিবার্য এবং কৃষি-ভিত্তিক সিন্ধু-সভ্যতার ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারই রেশ টিকে থেকেছে। আর তাই ভারতীয় দর্শনের– তথা সমগ্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির– ইতিহাসে বৈদিক ও প্রাক্-বৈদিক চিন্তাধারার এই মৌলিক পার্থক্যটুকু মনে রাখা আবশ্যক।

বেদোক্ত সমাজ ও চিন্তাধারা নিয়ে নির্মোহ আলোচনার ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যার কথাও মনে রাখা দরকার যে, বেদ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ যুগ ধরে একটা অন্ধ শ্রদ্ধার ভাব প্রচারিত হয়েছে; এমনকি মৌখিকভাবে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে নানা সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা এর প্রতি সবার আস্তিক্যাভিমানও প্রত্যাশা করেছেন। অন্যদিকে, বেদের বাস্তব চর্চা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; এবং বস্তুত বিভিন্ন-প্রকারের বিধি-নিষেধের সাহায্যে সচেতনভাবে এ-চর্চা সীমাবদ্ধ রাখবার আয়োজনও বেশ প্রখর ছিলো। ফলে এই পরিস্থিতিতে বেদ সংক্রান্ত সংস্কারগত নানান ধারণার উদ্ভবই স্বাভাবিক, যার সুযোগে 'বৈদিক সভ্যতা' ও 'বৈদিক আধ্যাত্মিকতা' নামে নানা অবাস্তব কল্পনার প্রশ্রয় ঘটেছে। আর এগুলির আড়ালে ঢাকা পড়েছে বৈদিক সমাজ ও বৈদিক চিন্তা-চেতনার চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্যগুলি।

ঋগ্বেদ আজ অনেকাংশেই দুর্বোধ্য। এই দুর্বোধ্যতার কারণ কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বের সূক্ষ্মতা বা গভীরতা নয়, বরং ঋগ্বেদের ভাষা এমনই প্রাচীন এবং সে-ভাষায় প্রকাশিত ভাবধারাও প্রায়ক্ষেত্রেই এমনই আদিম যে তার সুনিশ্চিত অর্থ-নির্ণয় অনেক ক্ষেত্রেই সুকঠিন। ম্যাক্স মূলার, ভিনটারনিৎস্ প্রমুখ গবেষকদের মতে, 'ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যের উত্তরাংশে কোনো কোনো প্রাচীন রচনার কাল্পনিক অর্থ-নির্ণয় এবং সে-সংক্রান্ত মতবিরোধ থেকে অনুমিত হয় যে, সুদূর অতীতেই এবং বৈদিক ঐতিহ্যেই ঋগ্বেদ অংশ-বিশেষে দুর্বোধ্য হয়েছিলো।' কিন্তু ভাষা ও ভাবের প্রাচীনত্ব-জনিত এ-দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও ঋগ্বেদকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় মনে করার কোনো কারণ নেই। কেননা, প্রাচীন মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বিদ্বান ও গবেষকদের বহুমুখী প্রচেষ্টায় তার প্রধানতম অংশই সুব্যাখ্যাত হয়েছে। এবং তারই উপর নির্ভর করে বৈদিক ভাবধারার নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া এখন আর অসম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, তার সঙ্গে বেদ সংক্রান্ত সংস্কারগত ধারণাগুলির খুব একটা মিল হয় না বললেই চলে।
এ-প্রেক্ষিতে বেদ-পরিচয়ের বস্তুনিষ্ঠতার প্রয়োজনে আমাদের ভুলে গেলে চলে না যে, শুধুমাত্র ঋগ্বেদে সংকলিত প্রাচীন এবং অর্বাচীন অংশের রচনাকালের মধ্যেই সুদীর্ঘ ব্যবধান রয়েছে এবং সংহিতা থেকে উপনিষদ পর্যন্ত সুবিশাল সাহিত্য রচিত হতে অন্তত কয়েক হাজার বছর সময় লেগেছিলো। ফলে স্বভাবতই পুরো সময় বা যুগটি ধরে বৈদিক সমাজ যে অপরিবর্তিত থাকেনি তা বলার অপেক্ষা রাখে না; বৈদিক ভাবধারায়ও ঘটেছে ক্রম-বিবর্তন।

এখানে আরও উল্লেখ্য, বৈদিক সাহিত্যের সর্বশেষ অংশের নাম হলো উপনিষদ; তাই তাকে

বেদান্ত বলা হয়। এই উপনিষদে অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী চিন্তার সুস্পষ্ট বিকাশ অনস্বীকার্য, যদিও এই ভাববাদের পক্ষে যুক্তি-তর্ক প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত দার্শনিক রূপ দেবার আয়োজন উপনিষদে চোখে পড়ে না। পরবর্তীকালে সচেতনভাবে সে-আয়োজন করেছিলেন উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা। এই বৈদান্তিক আচার্যদের মধ্যেও পারস্পরিক মতপার্থক্য ও মতবিরোধ থাকলেও একটি বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ একমত ছিলেন যে,– উপনিষদের তত্ত্বই পরম তত্ত্ব, অতএব বৈদান্তিক-মাত্রেরই আদর্শ হলো ঔপনিষদিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা, এবং অবশ্যই উপনিষদ-বিরোধী তত্ত্বের খণ্ডনও। তাই বৈদিক ঐতিহ্যে অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী চিন্তাধারা শুধুমাত্র বৈদিক সাহিত্যের অন্তিম পর্যায়েরই পরিচায়ক, সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের নয়। ফলে ঔপনিষদিক অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের আলোচনা উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনের প্রসঙ্গেই প্রাসঙ্গিক হবে। তবে বৈদিক সাহিত্যের উপনিষদ-পূর্ব অংশ এবং ওই ঔপনিষদিক ভাববাদের প্রাক্-ইতিহাস জানতে আমাদেরকে ঋগ্বেদের আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক বেদবাদী বিদ্বানদের মধ্যে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকে এক অভিন্ন চিন্তাধারার– একই অধ্যাত্মবাদের– নিদর্শক বলে ব্যাখ্যা করার যে প্রবণতা দেখা গিয়েছে, বস্তুনিষ্ঠ বিচারে ঋগ্বেদে তার সমর্থন নেই বললেই চলে। কেননা বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীন অংশে– বস্তুত ঋগ্বেদের প্রধানতম অংশে– যে ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায় তাকে অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী আখ্যা দেবার সুযোগ অল্পই। এবং সে-ভাবধারা এমনই আদিম ও প্রাচীন যে তার আধুনিক সংজ্ঞা খোঁজাও নিষ্ফল বলে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন। তিনি এটিকে প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ভাবধারা হিসেবেই আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে–
'বৈদিক ঐতিহ্যে ওই প্রাক্-অধ্যত্মবাদী ভাবধারার ধ্বংসস্তুপের উপরই কালক্রমে অধ্যাত্মবাদী ভাবধারার আবির্ভাব ঘটেছিল; ঋগ্বেদ থেকে উপনিষদ্ পর্যন্ত বিশাল সাহিত্যে এই চিন্তাবিবর্তনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সংরক্ষিত হয়েছে এবং এমনকি উপনিষদের মধ্যেও ওই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ভাবধারার বহু স্মারক টিকে থেকেছে।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১২৭)

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, ওই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ভাবধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? উত্তরে দেবীপ্রসাদ বলেন–
'অন্যান্য আদিম ও অনুন্নত মানুষদের মতো বৈদিক মানুষদেরও আদি-পর্যায়ে জীবন-সংগ্রামের সমস্যা এমনই কঠিন ও ঐকান্তিক যে তদুপরি কোনো অমূর্ত দার্শনিক সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হবার সুযোগ-সম্ভাবনা থাকা স্বাভাবিক নয়। এবং তা ছিলও না। অন্ন-চিন্তাই যেন বৈদিক কবিদের পরম চিন্তা; তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা তাঁদের রচনার বৈশিষ্ট্য নয়। সমগ্র ঋগ্বেদ জুড়ে তাই কয়েকটি নেহাতই পার্থিব কামনার যেন অন্তহীন পুনরুক্তি এবং কামনাগুলিও ওই অনুন্নত পর্যাযের অনুরূপ : অন্নের কামনা, পশুর কামনা, সন্তানের কামনা, ইত্যাদি। উত্তরকালের অধ্যাত্মবাদী দর্শনে যে-মোক্ষের আদর্শ পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকৃত ঋগ্বেদে তার ঐকান্তিক অভাব উপেক্ষণীয় নয়, এবং আমরা...দেখব, অন্তত পূর্ব-মীমাংসকেরা স্বর্গ সংক্রন্ত বৈদিক ধারণার ব্যাখ্যায় লোকোত্তর পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছেন : নিরতিশয় সুখ বা

প্রীতিই স্বর্গ এবং তা ইহলোকেই ভোগ্য। অনুমানের প্রলোভন হয় যে এমনকি উপনিষদের ঋষিদের স্মৃতি থেকেও সেই আদিম যুগের নির্মম প্রাণ-ধারণের সমস্যার কথা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১২৭)

এ-প্রেক্ষিতে ছান্দোগ্য উপনিষদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। ছান্দোগ্যে বলা হয়েছে–
'দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংন্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্যৎ এভিঃ অচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্'।। (ছান্দোগ্য-১/৪/২)।।
অর্থাৎ : দেবতারা মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে ত্রয়ী বিদ্যায় (তিনটি বেদ-এ) প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা ছন্দদ্বারা (নিজেদের) আচ্ছাদিত করেছিলেন। যেহেতু এই সমুদয় দ্বারা আচ্ছাদিত করেছিলেন তাই ছন্দসমূহের নাম ছন্দ।
কিন্তু এই মৃত্যুভয়ের কারণ কী? বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে–
'নৈবেহ কিংচনাগ্র আসীৎ মৃত্যুনৈব ইদম্ আবৃতমাসীৎ। অশনায়য়া অশনায়া হি মৃত্যুঃ।'- (বৃহদারণ্যক-১/২/১)।
অর্থাৎ : পূর্বে এখানে কিছুই ছিলো না। এই জগৎ মৃত্যুর দ্বারা আবৃত ছিলো। 'অশনায়া'-রূপ মৃত্যু। 'অশনায়া' হলো ভোগেচ্ছা-বুভুক্ষা-ক্ষুধার দাহ। কারণ বুবুক্ষাই হলো– মৃত্যু।

উপনিষদ্-বাক্যের এ-জাতীয় অর্থ আধুনিক অধ্যাত্মবাদীদের বিরক্তি সঞ্চার করলেও, দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের ঋষিরা তো ননই– এমনকি উপনিষদের ঋষিরাও সর্বত্র সমানভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণার বাস্তবতা এবং অন্নের গরিমা উপেক্ষা করেননি। অবশ্যই বিশ্বের অন্যান্য আদিম ও অনুন্নত মানুষদের মতোই বৈদিক মানুষদের মনেও পৌরাণিক বিশ্বাস ছিলো। ঋগ্বেদ তাই বহু দেবতার কথায় ভরপুর। কিন্তু এই দেবতাদের নজির থেকেও ঋগ্বেদে প্রকৃত অধ্যাত্মবাদ প্রমাণিত হয় না। কেননা পার্থিব কামনাই এই দেবকল্পনার প্রধানতম উপাদান এবং ঋগ্বেদে বৈদিক দেবতা ও বৈদিক মানুষদের মধ্যে পার্থক্য সবসময় সুস্পষ্ট নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মীমাংসা-দর্শনের আলোচনায় দেখা যাবে যে, বেদের যথার্থ ব্যাখ্যাকার হিসেবে স্বীকৃত পূর্ব-মীমাংসকরা– তথা বেদের উপনিষদ-পূর্ব অংশের উপর একান্ত নির্ভরশীল আচার্যরাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্ভাবনা খণ্ডন করেছেন এবং তাঁদের ব্যাখ্যা অনুসারেও বৈদিক দেবতাদের ঐকান্তিক গৌণত্বই প্রতিপাদিত হয়। অতএব এই দেবতাদের উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে ঋগ্বেদে কোনো আধ্যাত্মিক– তথা দার্শনিক– তত্ত্ব অন্বেষণ করা আদৌ যুক্তিযুক্ত হবে না। তবে বিদ্বান গবেষকদের মতে, প্রাচীন কবিদের রচনায় যদি বাস্তবিকই কোনো অস্ফুট দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আভাস থাকে তা হলে তার পরিচয় 'ঋত'-র তত্ত্বে। 'ঋত'-র কোনো আধুনিক প্রতিশব্দ সম্ভব নয়। ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করে প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতা এবং নৈতিক নিয়মানুবর্তিতার কোনো এক আদিম সমন্বয় অনুমিত হয়। তবে এ নিয়মানুবর্তিতা কিন্তু দেবতাদের ইচ্ছাধীন বা আওতাধীন নয়; বরং দেবতারা ঋত-র অনুগামী এবং মানবদের মতোই ঋতযুক্ত। তাই ঋতকেও অধ্যাত্মবাদরে নজির বলা যায় না বলে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ঋগ্বেদের রচনাকালেই ঋত-র চেতনা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায়; এমনকি কোনো কোনো কবি ঋত-হীন নতুন পরিস্থিতিকে অভিসম্পাত দিয়েছেন এবং অতীতের স্মৃতি উদ্বুদ্ধ করে নতুনভাবে ঋত-র জন্ম আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। প্রশ্ন হলো, ঋগ্বেদের এই অস্ফুট দার্শনিক চেতনার উৎসে কী ছিলো এবং কালক্রমে কেনই বা তা বিলীন হয়ে গেলো? এ প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য– 'মানব-চেতনা সমাজ-নিরপেক্ষ নয়– বৈদিক কবিদের চেতনাও নয়। এই মূল-সূত্র অনুসারে অগ্রসর হয়ে বৈদিক সমাজ-ইতিহাসের মধ্যেই উক্ত প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অন্যান্য আদিম মানুষদের মতোই বৈদিক কবিরাও আদিতে যৌথ-জীবন যাপন করতেন; তখন তাঁদের সমাজ-সংগঠন প্রাক্-বিভক্ত বা আদিম সাম্যসমাজ। এই পর্যায়ের চেতনাই ঋত-র পরিকল্পনায় প্রতিফলিত। কিন্তু কালক্রমে– বিশেষত যুদ্ধ ও লুণ্ঠন-মূলক কীর্তির প্রাধান্য-ফলে– সেই আদিম সাম্য-সংগঠন ধূলিসাৎ হয় এবং তারই ধ্বংসস্তূপের উপর আবির্ভূত হয় ব্রাহ্মণ-সমর্থিত ক্ষত্রিয়-শাসিত সুস্পষ্ট শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ। স্বভাবতই ঋত-র চেতনাও ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১২৮)

মোটকথা, সুবিশাল বৈদিক সাহিত্য রচিত হবার সুদীর্ঘ যুগ ধরে বৈদিক মানুষেরা ক্রমশই আদিম প্রাক্-বিভক্ত সমাজ পিছনে ফেলে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের দিকে অগ্রসর হয়েছে। বৈদিক সমাজ-ইতিহাসের এই মৌলিক পরিবর্তনের মধ্যেই বৈদিক চিন্তা-ইতিহাসের মূল পরিবর্তনটি বোঝার মূলমূত্র পাওয়া যায়। আর চিন্তা-ইতিহাসের মূল পরিবর্তন বলতে প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী চেতনার ধ্বংসস্তূপের উপর অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী চেতনার আবির্ভাব। এ-প্রেক্ষিতে আমরা ঋগ্বেদ-সাহিত্যে প্রাক্-অধ্যাত্মবাদের বৈশিষ্ট্যগুলির অনুসন্ধান ও তার তাৎপর্য পর্যালোচনা করার চেষ্টা করতে পারি। তবে ঋগ্বেদের সমাজ-পরিবর্তন ও চিন্তা-চেতনা পরিবর্তনের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ অনুমানের ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আদিম যৌথ-জীবন যৌথ-শ্রমের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এবং এই পর্যায়ে তাই চিন্তার দায়িত্ব ও শ্রমের দায়িত্ব– তথা জ্ঞানের দায়িত্ব ও কর্মের দায়িত্ব– দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য বা বিরোধ নেই। বৈদিক শব্দ-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য থেকেই অনুমান হয়, বৈদিক সাহিত্যে রচনার কোনো এক পর্যায়ে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে এ-জাতীয় অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বর্তমান ছিলো। কিন্তু বহু পরবর্তীকালে সমাজ-সংগঠন যতো সুস্পষ্টভাবে শ্রেণীবিভক্ত হতে থাকে ততই নিন্দিত হতে থাকে কায়িক শ্রম, গৌরবান্বিত হতে থাকে শ্রম-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞান; এবং তারই চরম পরিণাম অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী চিন্তা-চেতনা। তাই দেখা যায় বেদান্ত বা উপনিষদে কর্ম নিন্দিত ও বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রশংসিত। কিন্তু প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ঋগ্বেদ পর্যায়ে যৌথ-জীবন ও যৌথ-শ্রমের স্মারক খুঁজে পাওয়া অমূলক নয়।

৩.১ : ঋগ্বেদের সমাজ

যে-কোনো সমাজ-সংগঠনের পরিপ্রেক্ষিতেই সেই সমাজের চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, সভ্যতার বিবর্তন ধারায় সব দেশে সব মানুষের উন্নতি সমান তালে ঘটেনি। আধুনিক সভ্য মানুষের পূর্বপুরুষেরা বহু যুগ আগে যে-অবস্থায় বাস করতো কোনো কোনো পিছিয়ে পড়া মানবগোষ্ঠী সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সেই অবস্থায় আটকে থেকেছে। আর এই কারণেই আধুনিক পৃথিবীর ওই পিছিয়ে-পড়ে থাকা মানুষদের পরীক্ষা করে নৃতত্ত্ববিদরা প্রাগৈতিহাসিক অতীতের কথা অন্তত আংশিকভাবে অনুমান করে থাকেন। সে-বিচারে নৃ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে-কোনো আদিম পর্যায়ের সমাজ-সংগঠনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এক স্বতঃস্ফূর্ত গোষ্ঠীগত ঐক্য। এ-ঐক্য এমনই গভীর যে তাদের মধ্যে ব্যক্তি-স্বার্থ ও ব্যক্তি-বোধেরও ঐকান্তিক অভাব পরিলক্ষিত হয়। গোষ্ঠীর সামগ্রিক স্বার্থই প্রত্যেকের নিজস্ব স্বার্থ, প্রত্যেকের সম্পদই গোষ্ঠির সামগ্রিক সম্পদ। প্রাচীন বৈদিক মানুষদের ক্ষেত্রে এরকম কোনো পর্যায় অনুমান করতে হলে এ-ক্ষেত্রেও অনুমানের অবকাশ থাকে যে, বৈদিক সমাজ-বিবর্তনের কোনো-এক পর্যায়েও এ-জাতীয় গোষ্ঠী-চেতনা ও সাম্য-ব্যবস্থার পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। তার মানে অবশ্য এই নয় যে বৈদিক সাহিত্য রচনার সমগ্র যুগ ধরে আগাগোড়াই ওই আদিম সাম্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিলো। উপনিষদের সমাজ, ব্রাহ্মণের সমাজ, এমনকি ঋগ্বেদে সংকলিত অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন অংশে প্রতিফলিত সমাজও নিশ্চয়ই আদিম সাম্য-সমাজ নয়। বস্তুত–

‘সমাজ-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে আদিম সাম্য-সমাজে ভাঙন ধরবার দুটি প্রধান কারণের মধ্যে একটি হলো, পশুপালন-মূলক অর্থনীতির ক্রমবিকাশ। অর্থাৎ, পশুপালনমূলক অর্থনীতির পিছনে আদিম সাম্য-সমাজের স্মৃতি, সামনে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আভাস। বৈদিক মানুষদের ইতিহাসেও এই অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ফলে ক্রমশ-সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগের আবির্ভাব ঘটে থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে-কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ– এবং আধুনিক বিদ্বানদের রচনায় যে-কথা সাধারণত উপেক্ষিত– তা হলো, ঋগ্বেদের নানা জায়গায় ওই আদিম সাম্য-জীবন ও গোষ্ঠী-চেতনার সুস্পষ্ট স্মারক চোখে পড়ে।’-
(দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৩০)

এ-প্রেক্ষিতে ঋগ্বেদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন–
‘ত ইন্দেবানাং সধমাদ আসন্নৃতাবানঃ কবয়ঃ পূর্ব্যাসঃ।
গূঢ়হং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ববিন্দন্ৎসত্যমন্ত্রা অজনয়ন্নুষাসম্’।। (ঋগ্বেদ-৭/৭৬/৪)।
‘সমান ঊর্বে অধি সঙ্গতাসঃ সং জানতে ন যতন্তে মিথস্তে।
তে দেবানাং ন মিনন্তি ব্রতান্যমর্ধন্তো বসুভির্যাদমানাঃ’।। (ঋগ্বেদ-৭/৭৬/৫)।
অর্থাৎ :
সেই ঋতযুক্ত প্রাচীন সত্যবান, কবি, পূর্বকালীন পিতা অঙ্গিরাগণ গূঢ় জ্যোতি লাভ করেছিলেন এবং অবিতথ সত্যমন্ত্রদ্বারা ঊষাকে প্রাদুর্ভূত করেছিলেন, তাঁরাই দেবগণের সঙ্গে

একত্রে প্রমত্ত হতেন। (ঋক্-৭/৭৬/৪)।। তাঁরা সাধারণ গো-সমূহের জন্য সঙ্গত হয়ে একবুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছিলেন; তাঁরা যেন পরস্পরের সাথে যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা করেন; ধনসমূহের সাথে গমন করতে করতে হিংসাবিহীন তাঁরা দেবতাদের ব্রতগুলিকে হিংসা করেন না। (ঋক্-৭/৭৬/৫)।।

ঋক্-দুটি শুধুই যে ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশের অন্তর্ভুক্ত তাই নয়, এখানে আরও প্রাচীনকালের স্মৃতি উদ্ধৃত করবার পরিচয়ও সুস্পষ্ট। এবং সেই সুপ্রাচীন অতীতের কবিরা (অঙ্গিরস্-গণ) 'সাধারণ গো-সমূহের' অধিকারী, 'একবুদ্ধিসম্পন্ন' এবং 'যৌথ কর্মপ্রচেষ্টায়' নিরত। অতএব, কোনো কোনো বিষয়ে ঋক-দুটির তাৎপর্য দুর্বোধ্য হলেও এখানে আদিম সাম্য-জীবনের ইঙ্গিত উপেক্ষণীয় নয় বলেই গবেষকরা মনে করেন। ঋগ্বেদের অন্যান্য ঋকেও ওই সাধারণ ধন এবং সমাজ জীবনের স্মারক লক্ষণীয়–

'বৈশ্বানরঃ প্রত্নথা নাকমারুহদ্দিবস্পৃষ্ঠং ভন্দমানঃ সুমন্মভিঃ।
স পূর্ববজ্জনয়ঞ্জন্তবে ধনং সমানমজ্মং পর্যেতি জাগৃবিঃ'।। (ঋগ্বেদ-৩/২/১২)।
'বপুর্নু তচ্চিকিতুষো চিদস্তু সমানং নাম ধেনু পত্যমানম্'। (ঋগ্বেদ-৬/৬৬/১)।
অর্থাৎ :
স্তোতৃগণ কর্তৃক স্তূয়মান বৈশ্বানর অগ্নি চিরন্তনের ন্যায় অন্তরিক্ষের পৃষ্ঠভূতে (স্বর্গে) আরোহণ করেন। পুরাকালের ন্যায় তিনি (অগ্নি) প্রাণীগণের জন্য সাধারণ ধন সৃষ্টি করেছিলেন; সেইরূপ যজমানগণকেও ধন দান করে জাগ্রত হয়ে ভ্রমণ করেন। (ঋক-৩/২/১২)।। সেই প্রীতিকর এবং বপুবান সাধারণ ধেনুগুলি দ্রুত গমন করতে থাকুক। (ঋক-৬/৬৬/১)।।

এমনকি দেবতাদের মধ্যেও সমান সম্পর্কের ইঙ্গিত ঋগ্বেদে বহুক্ষেত্রেই চোখে পড়ে। যেমন–

'তদিৎসমানমাশাতে বেনন্তা ন প্র যুচ্ছতঃ। ধৃতব্রতায় দাশুষে'।। (ঋগ্বেদ-১/২৫/৬)।
অর্থাৎ : যজ্ঞানুষ্ঠাতা হব্যদাতার প্রতি প্রসন্ন হয়ে (মিত্র ও বরুণ) এ সাধারণ হব্য গ্রহণ করছেন, অগ্রাহ্য করেন না। (ঋক-১/২৫/৬)।।

তবে পর্যাপ্ত বিবেচনায় ঋগ্বেদের সর্বশেষ সূক্তে যৌথ-জীবন ও সমষ্টিচেতনার অন্যতম চিত্তাকর্ষক স্মারক উদ্ধৃতিটি হলো–

'সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে।। (ঋগ্বেদ-১০/১৯১/২)।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্ ।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।। (ঋগ্বেদ-১০/১৯১/৩)।
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি'।। (ঋগ্বেদ-১০/১৯১/৪)।
অর্থাৎ :
তোমরা একত্রে মিলিত হও, এক কণ্ঠে ঘোষণা করো, একত্রে মন বিনিময় করো; যেভাবে অতীতের দেবতাগণ সচেতনভাবে একত্র বসে তাঁদের ভাগ গ্রহণ করতেন।

(ঋক-১০/১৯১/২)।। মন্ত্র সমান হোক, সমিতি সমান হোক, মন সমান হোক, সকলি একরূপ হোক। তোমাদের সাথে একই মন্ত্রে আমি মন্ত্রণা করি, তোমাদের সাথে একই হবি দ্বারা আমি হোম করি। (ঋক-১০/১৯১/৩)।। তোমাদের প্রচেষ্টা এক হোক, অন্তঃকরণ এক হোক, মন এক হোক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও। (ঋক-১০/১৯১/৪)।।

এগুলি হলো ঋগ্বেদের সর্বশেষ সূক্তের শেষ তিনটি ঋক। রচনাকালের দিক থেকেও সূক্তটি অর্বাচীনতম অংশেরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে সমান-জীবনের জন্য গভীর আকুতি থেকে অনায়াসেই অনুমান হয়, বৈদিক মানুষদের সুপ্রাচীন সাম্যজীবন এ-যুগে বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, ঐক্য-কামনায় অতীতের স্মৃতি উদ্বুদ্ধ করবার আয়োজন 'দেবা ভাগং যথাপূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে'– যেভাবে অতীতের দেবতাগণ সচেতনভাবে একত্র বসে তাঁদের ভাগ গ্রহণ করতেন। এতেই বোঝা যায়, অতীতেই এই ব্যবস্থায় ভাঙন ধরেছে; কেননা ইতোমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে, জিতধনে ইন্দ্রের অংশ (বা ভাগ) অপরের চেয়ে বেশি–
'উদিনম্বস্য রিচ্যতেহংশো ধনং ন জিগ্যুষঃ।
য ইন্দ্রো হরিবান্ন দভন্তি তং রিপো দক্ষং দধাতি সোমিনি'।। (ঋগ্বেদ-৭/৩২/১২)।
অর্থাৎ : যে হরিবান ইন্দ্র সোমযুক্ত ব্যক্তিকে বল প্রদান করেন এবং শত্রুরা যাকে হিংসা করতে পারে না, সে ইন্দ্রের ভাগ জয়শীল ব্যক্তির ভাগের ন্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক।

কিন্তু 'ভাগ' বা 'অংশ' মানে কী? দেবতাদের পক্ষে অতীতে একত্রভাগে 'ভাগ' গ্রহণ করবার তাৎপর্যই বা কী? এ-প্রশ্নের উত্তর থেকে বৈদিক সাহিত্যে আদিম সাম্য সম্পর্কের আর একটি প্রাচীন স্মারক চিহ্নিত করা যায় বলে গবেষকেরা মনে করেন। কেননা, ঋগ্বেদে বারবার 'ভাগ', 'অংশ' ও সমবণ্টনের উল্লেখ দেখা যায়। আদিম সাম্য-সমাজের এই ভাগ বা বণ্টনের নিয়মটির সবচেয়ে প্রত্যক্ষ পরিচয় শিকারজীবী পর্যায়ের সমাজে স্বীকৃত। তাই ঋগ্বেদে এগুলিকে সুপ্রাচীন নিয়মের স্মারক বলে গ্রহণ করলে বৈদিক মানুষদের সমাজ-ইতিহাস বোঝা সহায়ক হবে বলে মনে হয়। এ-পর্যায়ে মানুষের ধনস্বরূপ বলতে যেহেতু প্রধানতই খাদ্য-দ্রব্য তাই সমবণ্টনও মূলত ওই খাদ্য-দ্রব্যের বণ্টন– অন্ন-বিভাগ। যদিও ঋগ্বেদের রচনাকালে বৈদিক মানুষেরা অবশ্যই শিকারজীবী পর্যায়ে ছিলো না; ধনসম্পদ বলতে তাদের কাছে প্রধানতই পশু, এবং পরে যুদ্ধে জিত ধন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই পর্যায়েও বৈদিক কবিদের স্মৃতি থেকে ওই সুপ্রাচীন নিয়মের প্রভাব বিলুপ্ত হয়নি। এ-প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য–

'ঋগ্বেদে ধনবাচক একটি শব্দ হলো 'বার্য'। প্রায়ই বহুবচন 'বার্যানাম্' (ঋগ্বেদ-১/৫/২, ১/২৪/৩, ৬/৫/৩ ইত্যাদি) 'বার্যাণি' (ঋগ্বেদ-১/৩৫/৮, ১/১১৩/১৫, ১/১১৪/৫, ১/১৪৯/৫, ১/১৫৯/১ ইত্যাদি) এ-শব্দের প্রয়োগ চোখে পড়ে। এবং তার ব্যাখ্যায় সায়ণ কোথাও বা 'গবাদি ধন' (ঋগ্বেদ-৮/৭১/১১) কোথাও বা 'ব্রীহি যবাদীনাম্' (ঋগ্বেদ-১০/৯/৫) আবার কোথাও শুধু 'বরণীয়ানাং ধানানাম্' (ঋগ্বেদ-১/২৪/৩) অর্থ করেছেন; তাই অনুমান হয়

ঋগ্বেদে এই শব্দ সাধারণভাবে সমস্ত রকম ধনসম্পদ বুঝিয়েছে। চিত্তাকর্ষক কথা হলো, শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। ঋগ্বেদ-ভাষ্যে (ঋগ্বেদ-১/৫/২) সায়ণ দেখাচ্ছেন, 'বৃঙ্' ধাতু থেকে এই শব্দের উৎপত্তি : বৃঙ্ + ণ্যৎ– বার্য। এবং 'বৃঙ্' মানে ভাগ করা বা বিভাগ করা : বৃঙ্ সংভক্তৌ। অতএব, ধনবাচক ওই শব্দটির পিছনেই সুপ্রাচীন সমবণ্টনের নিয়মটির ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়– ধনসম্পদ মানেই হলো এমন জিনিস যার বিভাগ করা হবে। অবশ্য ঋগ্বেদে প্রায়ই সাধারণভাবে ধনসম্পদের কামনা প্রসঙ্গে শব্দটির প্রয়োগ চোখে পড়ে। কিন্তু যে-সুপ্রাচীন সমবণ্টনের নিয়ম থেকে শব্দটির উদ্ভব, অন্তত কোনো কোনো দৃষ্টান্তে উক্ত ধনসম্পদের উপর তার প্রয়োগ কামনা করা হয়েছে। দেবতা সবিতৃকে উদ্দেশ করে কবি শুণঃশেপ বলছেন, "হে সবিতা, তুমি আমাদের ধনসমূহের চিরন্তন বর্ধন ও রক্ষক; আমরা বিশেষভাবে তোমার নিকট হইতে আমাদের ভাগ চাইতেছি (অভি ত্বা দেব সবিতঃ ঈশানং বার্ষাণাং সদা ভাগম্ ঈমহে)" (ঋগ্বেদ-১/২৪/৩)। এখানে 'ভাগ' শব্দের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য অবশ্যই উপেক্ষণীয় নয়। অন্যত্রও দেবতা সবিতৃ প্রসঙ্গে 'ভগ-ভক্তস্য' (ঋগ্বেদ-১/২৪/৫) বিশেষণের প্রয়োগ দেখা যায়। বিশেষণটি চিত্তাকর্ষক : কেননা ঋগ্বেদে 'ভগ' শব্দের অর্থ 'ধনসম্পদ' (নিঘণ্টু-২/১০), এবং ভাগ বা-অংশ দুইই। অতএব 'ভগ-ভক্ত' অর্থে 'যিনি ধন বিতরণ করেন' বা 'যিনি অংশ বণ্টন করেন'– দুইই। এবং 'ভগ' বলতে যদি 'ধন' এবং 'অংশ' দুইই বুঝিয়ে থাকে তাহলে কি অনুমান করা যায় না যে ধনবাচক এই বৈদিক শব্দটির পিছনেও সুপ্রাচীন সমবণ্টন-মূলক নিয়মের ইংগিত থেকে গিয়েছে?'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৩৩)

মূলত শুধুমাত্র শব্দতত্ত্ব-গত ইংগিতই নয়, ঋগ্বেদের বহু দৃষ্টান্তে প্রাচীন পৌরাণিক কল্পনা ভেদ করে সমবণ্টনের কামনাও ফুটে উঠতে দেখা যায়। যেমন–

'স্বস্তয়ে বাজিভিশ্চ প্রণেতঃ সং যন্মহীরিষ আসৎসি পূর্বীঃ।
রায়ো বন্তারো বৃহতঃ স্যামাস্মে অস্তু ভগ ইন্দ্র প্রজাবান্'।। (ঋগ্বেদ-৩/৩০/১৮)।
'ব্রহ্মণস্পতেরভবদ্যথাবশং সত্যো মন্যুর্মহিত কর্মা করিষ্যতঃ।
যো গো উদাজৎস দিবে বি চাভজন্মহীব রীতিঃ শবসাসরৎপৃথক্'।। (ঋগ্বেদ-২/২৪/১৪)।
'ভূরিকর্মণে বৃষভায় বৃষ্ণে সত্যশুষ্মায় সুনবাম সোমম্ ।
য আদৃত্যা পরিপন্থীব শূরোহযজ্বনো বিভজন্নেতি বেদঃ'।। (ঋগ্বেদ-১/১০৩/৬)।
'দেবো ভগঃ সবিতা রায়ো অংশ ইন্দ্রো বৃত্রস্য সঞ্জিতো ধনানাম্ ।
ঋভুক্ষা বাজ উত বা পুরন্ধিরবন্তু নো অমৃতাসস্তুরাসঃ'।। (ঋগ্বেদ-৫/৪২/৫)।
অর্থাৎ :
হে জগতের নির্বাহক ইন্দ্র! আমাদের অশ্বযুক্ত করো ও অবিনাশী করো। আমরা ধনের বণ্টনকর্তা হয়ে মহান হবো; তুমি আমাদেরকে প্রজাযুক্ত ভগ দাও। (ঋক-৩/৩০/১৮)।।
ব্রহ্মণস্পতি যখন কোন মহৎকর্মে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁর মন্ত্র তাঁর অভিলাষানুসারে সফল হয়। যিনি গরুগুলিকে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তিনিই নিজবলের দ্বারা মহাস্রোতের ন্যায় সেই গরুগুলিকে দ্যুলোকের জন্য দেবতাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। (ঋক-২/২৪/১৪)।।

ভূরিকর্মা, দেবশ্রেষ্ঠ, অভীষ্টদাতা, সত্যবল, ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আমরা সোম অভিষব করি; পথনিরোধক চোর যেরূপ পথিকের নিকট হতে ধন কেড়ে নেয়, শূর ইন্দ্র সেরূপ সমাদরে পরিপন্থী যজ্ঞবিহীন ব্যক্তিদের ধন অপহরণপূর্বক যজ্ঞপরায়ণদের নিকট ভাগ করতে করতে গমন করেন। (ঋক-১/১০৩/৬)।। দীপ্তিমান ভগ, ধনাধিপতি সূর্য ও বৃত্রনাশক ইন্দ্র, সমস্ত ধনবিজয়ী ঋভুক্ষা, বাজ ও পুরন্ধি, জিতধনের অংশ আমাদেরকে দাও। (ঋক-৫/৪২/৫)।।

এ-জাতীয় বহু বহু দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদ জুড়ে রয়েছে। দৃষ্টান্তগুলি অনিবার্যভাবেই পৌরাণিক কল্পনায় আচ্ছন্ন হলেও এখানে সুপ্রাচীন সমবণ্টনের নিয়ম– বা এ-নিয়মের প্রয়োগ-মূলক কামনা– অস্পষ্ট নয় বলেই গবেষকেরা মনে করেন। অতএব এগুলিকে আদিম সাম্য-সমাজের স্মারক হিসেবে গ্রহণ করা যায় এবং তার ফলে বৈদিক সমাজ সংক্রান্ত প্রচলিত বদ্ধ সংস্কারগত ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ তৈরি হয়। তবে বৈদিক সাহিত্যে আদিম সাম্য-সমাজের স্মারক বলতে শুধু ওই সমবণ্টন-মূলক নিয়মের ইঙ্গিতই নয়, সমাজ-পরিচালন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সমজাতীয় স্মারক অনুমান করা যেতে পারে। কী সেই স্মারক? ঋগ্বেদে 'সভা', 'বিদথ' ও 'সমিতি'-র বহু নজির দেখা যায়। এগুলি যে পঞ্চায়েৎ-জাতীয়ই কিছু ছিলো সে-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ অল্প। তবে এ-বিষয়ে সংশয়ের অববকাশ নেই যে, প্রাচীন বৈদিক সমাজ-গঠনে এগুলির বিশেষ গুরুত্ব ছিলো। এ-প্রেক্ষিতে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ জে পি মর্গানের নৃতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ মতামত স্মরণে রাখা আবশ্যক। তাঁর মতে,– 'প্রাচীন সমাজের শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রশক্তির পরিচয় নেই। মর্গান তাই রাষ্ট্রভিত্তিক আধুনিক সমাজের আখ্যা দিয়েছিলেন 'পলিটিক্যাল সোসাইটি' বলে। তুলনায় প্রাচীন সমাজের আধুনিক আখ্যায় বলা হয় 'ট্রাইবাল সোসাইটি'। এই ট্রাইবাল সমাজের শাসন-পরিচালন প্রতি স্তরে সভা বা পঞ্চায়েতের উপর নির্ভরশীল। প্রতি ট্রাইবের অন্তর্গত যে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট মানবগোষ্ঠি, সেগুলির নাম হলো 'ক্লান' বা 'গেন্স্'। ক্লানের শাসন-পরিচালনার চূড়ান্ত দায়িত্ব যে-সভার উপর তার সভ্য বলতে ক্লানের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ। এই সভা থেকে মোড়ল, যুদ্ধ-সর্দার প্রভৃতি নির্বাচন করবার ব্যবস্থা। তেমনি, পুরো ট্রাইবের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব একটি সভার উপর, তার সভ্য বলতে বিভিন্ন ক্লানের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আবার যে-কয়েকটি ক্ষেত্রে ট্রাইব উচ্চতর সংগঠনে সংগঠিত সে-ক্ষেত্রেও– এই উচ্চতর সংগঠনেরও– শাসন-পরিচালনের দায়িত্ব একটি উচ্চতর সভার উপর। ইত্যাদি, ইত্যাদি।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৩৫)

প্রাচীন সমাজ সংক্রান্ত এই সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে প্রাচীন বৈদিক সমাজ সম্বন্ধে কিছু স্মারকের বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। বৈদিক কবি বা ঋষিদের রচনায় সভা, সমিতি ও বিদথর গুরুত্ব যে কতটুকু সে-বিষয়ে ঋগ্বেদের কিছু নিদর্শন দেখা যাক। যেমন–

'সং যন্মহী মিথতী স্পর্ধমানে তনূরুচা শূরসাতা যতৈতে।
অদেবয়ুং বিদথে দেবয়ুভিঃ সত্রা হতং সোমসুতা জনেন'।। (ঋগ্বেদ-৭/৯৩/৫)।
'যূয়ং গাবো মেদয়থা কৃশং চিদশ্রীরং চিৎকৃণুথা সুপ্রতীকম্ ।

ভদ্রং গৃহং কৃণুথ ভদ্রবাচো বৃহদ্বো বয় উচ্যতে সভাসু’।। (ঋগ্বেদ-৬/২৮/৬)।
‘কৃতং নো যজ্ঞং বিদথেষু চারুং কৃতং ব্রহ্মাণি সুরিষূ প্রশস্তা।
উপো রয়ির্দেবজুতো ন এতু প্র ণঃ স্পার্হাভিরূতিভিস্তিরেতম্’।। (ঋগ্বেদ-৭/৮৪/৩)।
অর্থাৎ :
যে দুইজন পরস্পর অত্যন্ত হিংসাযুক্ত এবং স্পর্ধিত হয়ে দৈহিক বল ও শৌর্য প্রদর্শন করে হিংসা করতে সচেষ্ট, সোমসেবনকারী দেবতার অনুমোদিত জনসমূহ কর্তৃক সেই দেবতাবিহীন নরগণ বিদথে নিহত হলো। (ঋক-৭/৯৩/৫)।। হে ধেনুগণ! তোমরা মেদযুক্ত হও এবং ক্ষীণ অথবা বিকৃত অঙ্গবিশিষ্ট হয়েও শোভন লক্ষণযুক্ত হও। গৃহকে সমৃদ্ধিময় করো, বাক্যকে ভদ্র করো, সভায় তোমাদের প্রদত্ত প্রচুর অন্নই সম্যক রূপে কীর্তিত হয়। (ঋক-৬/২৮/৬)।। হে ইন্দ্র ও বরুণ, আমাদের যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছে, বিদথসমূহে বীরগণের মধ্যে সুন্দর প্রশস্তি সমাপ্ত হয়েছে; দেবতাদের প্রেরিত ধন আমাদের নিকট আসুক এবং স্পৃহণীয় রক্ষার দ্বারা আমাদেরকে তোমরা বর্ধিত করো। (ঋক-৭/৮৪/৩)।।

ঋগ্বেদে এ-জাতীয় বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা গেলেও বলা বাহুল্য, বৈদিক সমাজে সভা বা বিদথের কর্মসূচি ঠিক কী ছিলো তা ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যে যে বৈদিক কবিরা এ-জাতীয় কবিতা বা গান রচনা করেননি। কেননা ঋগ্বেদে সংকলিত কাব্যের উদ্দেশ্য আর যাই হোক সমাজ সংগঠন বর্ণনা করা নয়। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যেই এ-সাহিত্য রচিত হোক না কেন– এরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত থেকে বৈদিক সমাজের স্বরূপ অনুমান করতে হবে। তবে সায়ণ প্রমুখ ভাষ্যকাররা ঋগ্বেদে উদ্ধৃত ‘সভা’ ‘বিদথ’ শব্দগুলিকে মূলত সচেতনভাবে যজ্ঞ-কর্মের পরিভাষায় রূপান্তর করে শ্লোকগুলির প্রতীকী অর্থ তৈরি করায় মনে হতে পারে সেকালের কবিরা বুঝি এরকম চিন্তা থেকেই গানগুলি রচনা করেছেন। কিন্তু সত্যি কি তাই? একালের উন্নত চিন্তা ও ভাব দিয়ে সেকালের ভাবনাকে আরোপ করা কতোটা যুক্তিযুক্ত তা প্রশ্নসাপেক্ষ বৈকি।

মূলত গবেষকদের স্বীকৃতি অনুসারে বৈদিক সভাই ছিলো বৈদিক সমাজের রাজনৈতিক কার্যনির্বাহক সংগঠন। ট্রাইবাল সমাজ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যানুযায়ী বোঝা যায় ট্রাইবাল সমাজের রাজনৈতিক কাজ বলতে একটি প্রধান কাজ অবশ্যই সর্দার, মোড়ল প্রভৃতি নির্বাচন। বৈদিক সমাজে এই নির্বাচিত প্রতিনিধিকে কী বলতো? কোনো কোনো বেদবাদীর মতে বৈদিক সমাজে যে রাজশাসন ছিলো এ-বিষয়ে প্রধান প্রমাণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেন ঋগ্বেদে ‘রাজা’ বা ‘রাজন্’ শব্দের বহুল উল্লেখ। তার মানে আধুনিক গবেষকেরা বৈদিক মানুষদের প্রসঙ্গে ‘ট্রাইব’ শব্দ যত অনায়াসেই ব্যবহার করুন না কেন বেদবাদীরা বারবার এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে চেয়েছেন যে বৈদিক ট্রাইবগুলি আধুনিক অর্থে রাজা বা সম্রাট-শাসিত ছিলো। কিন্তু বৈদিক সমাজ-বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে– উপনিষদের যুগে, ব্রাহ্মণের যুগে, এমনকি ঋগ্বেদ রচনার শেষাশেষি পর্যায়েও– আধুনিক অর্থে রাজশক্তির সুস্পষ্ট আবির্ভাব সত্ত্বেও এ-কথা কল্পনা করার কোনো কারণ নেই যে বৈদিক সমাজ-

ইতিহাসের আগাগোড়াই রাজ-শাসন বা সম্রাটশাসনের নজির আছে। বস্তুত, বৈদিক সমাজের প্রাচীনতর পর্যায়কে প্রকৃত ট্রাইব্যাল সংগঠন আখ্যাই দিতে হবে। আধুনিক অর্থে রাজ-শাসন রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচায়ক এবং ট্রাইব্যাল সমাজের ধ্বংসস্তুপের উপরই তার আবির্ভাব সম্ভব। অতএব বৈদিক যুগে রাজ-শাসিত বা সম্রাট-শাসিত ট্রাইব্যাল-সমাজের কথা বললে বৈদিক সমাজ সংক্রান্ত ধারণা সুস্পষ্ট হয় না। এখন প্রশ্ন হলো, ঋগ্বেদে ‘রাজা’ শব্দের অর্থ কী? এ-প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদের বক্তব্য অনুসরণ করা যেতে পারে–

‘এ-কথা অবশ্যই সুবিদিত যে শব্দার্থের তুলনায় শব্দের পরিবর্তন অনেক মন্থর; শব্দের অর্থ-পরিবর্তন সত্ত্বেও শব্দটি অক্ষুণ্ন বা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তাই সমাজ পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতি বা ঘটনার উদ্ভব হলেও অনেক ক্ষেত্রে তার জন্য সম্পূর্ণ নতুন শব্দের সৃষ্টি হয় না– পুরানো কালের ভিন্ন অর্থের ব্যবহৃত শব্দের অর্থ-পরিবর্তন করে এই নতুন পরিস্থিতি বা ঘটনা বোঝবার আয়োজন করা হয়। অনুমান হয়, বৈদিক সাহিত্যে ‘রাজা’ শব্দটির ক্ষেত্রেও এ-জাতীয় ঘটনাই ঘটেছিল।
উত্তরকালে রাজা বলতে অবশ্যই আধুনিক অর্থে রাষ্ট্র-অধিপতিই...বুঝিয়েছেন। কিন্তু ঋগ্বেদের সাক্ষ্য বিচার করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে আদিতে শব্দটির অর্থান্তর ছিল। দশম মণ্ডলের বিখ্যাত অক্ষ-সূক্ত থেকে এ-বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক নজির উদ্ধৃত করা যায়। “যো বঃ সেনানীর্মহতো গণস্য, রাজা ব্রাতস্য প্রথমো বভুব”...: যিনি তোমাদের মহৎ গণের সেনানী (দলপতি?) এবং ব্রাতের শ্রেষ্ঠ রাজা হইলেন... (ঋগ্বেদ-১০/৩৪/১২)। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে ‘গণে’র সেনানী এবং ‘ব্রাতে’র রাজা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষ্যে সায়ণ বলছেন, ‘গণ’ এবং ‘ব্রাত’-র মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই এবং এ-বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে উভয় শব্দই ট্রাইব বা ট্রাইব-গত যৌথ জীবন– বুঝিয়েছে। অতএব এ-ক্ষেত্রে গণের সেনানী বা ব্রাতর রাজা বলতে ট্রাইবের সর্দার ছাড়া অন্য কিছু বোঝার অবকাশ স্বল্পই।’- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৩৭)

ঋগ্বেদে এই ‘রাজা’র বৈশিষ্ট্য বুঝতে ঋগ্বেদেরই অন্য একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। ওষধিগণের একত্রিত হবার বর্ণনায় জনৈক কবি একটি চিত্তাকর্ষক উপমা ব্যবহার করেছেন, যেমন–

‘যত্রৌষধীঃ সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব।
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্রক্ষোহামীবচাতনঃ’।। (ঋগ্বেদ-১০/৯৭/৬)।
অর্থাৎ : রাজাগণ যেমন সমিতিতে একত্রিত হন সেরূপ যে ব্যক্তির নিকট ওষধিগণ মিলিত হয় অর্থাৎ যে ওষধী জানে সে বুদ্ধিমান ভিষক ব্যক্তিকে চিকিৎসক বলে, সে রোগদের ধ্বংস করে।

এখানে রাজা শব্দের বহুবচন-ব্যবহার নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ– সমিতিতে সমাগত রাজা বলতে এক নয়, বহু। স্বভাবতই এখানে ‘রাজা’-কে আধুনিক অর্থে রাষ্ট্র-অধিপতি অর্থে গ্রহণে বাধা

ওঠে। কিন্তু সমিতিতে বহু রাজার পক্ষে সমবেত হবার তাৎপর্যই বা কী? এর উত্তর ট্রাইব্যাল সমাজের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। ট্রাইব্যাল সংগঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ট্রাইবের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্লান থেকে নির্বাচিত যুদ্ধ-সর্দারদের একটি উচ্চতর পঞ্চায়েৎ থাকে এবং তার প্রধানতম কাজ যুদ্ধবিষয়ক। অতএব, বৈদিক সমিতির সঙ্গে যুদ্ধ-পরিচালনামূলক কাজের সম্পর্ক থাকলে এই অনুমানই স্বাভাবিক হবে যে উক্ত সমিতিও যুদ্ধ-সর্দারদের পঞ্চায়েৎ জাতীয় কোনো সংগঠন ছিলো। এবং, দেবীপ্রসাদের মতে, এ-জাতীয় সম্পর্কের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সত্যিই পাওয়া যায়। নিঘণ্টু-মতে (নিঘণ্টু-২/১৭) সমিতি শব্দ একটি সংগ্রাম-নাম বা যুদ্ধ-বাচক শব্দ। বেদের ভাষ্যকার সায়ণও বহু দৃষ্টান্তে 'সমিতি' শব্দের অর্থ করেছেন 'যুদ্ধ'। আর সমিতি যদি যুদ্ধ-পরিচালনার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ-সর্দারদের সংগঠন না হয়, তাহলে সমিতি মানেই যুদ্ধ কী করে হতে পারে?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমিতি শব্দটির ব্যবহার প্রধানতই ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গবেষক জয়সওয়াল অনুমান করতে চেয়েছেন, বৈদিক সমাজ-বিবর্তনের উচ্চতর পর্যায়েই এ-জাতীয় সংগঠন গড়ে ওঠা স্বাভাবিক; কেননা সমিতি যে-গণতান্ত্রিক চেতনার পরিচায়ক তা সমাজ-বিবর্তনের উচ্চতর পর্যায়েই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা বিপরীত বলেই মনে হয়, কেননা–
'প্রাচীন ইতিহাসে চূড়ান্ত গণতন্ত্রের পরিচয় প্রকৃত ট্রাইব্যাল সমাজেই। অপরপক্ষে, অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে– বিশেষত পশুপালনমূলক অর্থনীতির বিকাশের ফলে– ট্রাইবগুলি যতই যুদ্ধ-পরায়ণ হয়ে ওঠে ততই ধ্বংস পায় ওই প্রাচীন ট্রাইব্যাল গণতন্ত্র এবং তারই ধ্বংসস্তুপের উপর আবির্ভাব হয় রাজশক্তির, তথা রাষ্ট্রশক্তির। বৈদিক ট্রাইবগুলি যে ক্রমশই একান্ত যুদ্ধ-পরায়ণ হয়ে উঠেছিল এ-কথা সুবিদিত; তারই ফলে ঋগ্বেদে অন্য সব দেবতার গৌরব ম্লান করে ক্রমশ যুদ্ধ-দেবতা ইন্দ্রের প্রায় ঐকান্তিক গৌরব কীর্তিত হয়েছে। এবং এই দিক থেকে ঋগ্বেদের শেষ পর্যায়ে সমিতির ওই গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন গণতন্ত্রের– তথা আদিম সাম্যজীবনের– অবসানই সূচনা করেছে।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৩৯)

এই পরিণতির ফলে বৈদিক সমাজ-বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে আর্যদের প্রাচীনতম সংগঠন সেই 'সভা', 'বিদথ' ও এমনকি 'সমিতি'রও গুরুত্ব প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হতে দেখা যায়। অনেককাল পরের মহাভারতেও সভার উল্লেখ আছে; কিন্তু সভা বলতে তখন প্রায় যে-কোনো রকম সম্মেলন। জনসাধারণের সভা তখন আর জনসাধারণের নেই– অভিজাতদের সভা। জনসাধারণের সামরিক ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে তখন রাজার করায়ত্ত। মহাভারতের প্রকৃত আখ্যানভাগে সমস্ত সর্বজনীন ব্যাপারেই পুরোহিতেরা প্রায় নীরব, এবং জনসাধারণ সম্পূর্ণ অবদমিত।
তবে মনে রাখতে হবে, জনসাধারণের সভা-সমিতিকে– তথা রাজনৈতিক অধিকারকে– সম্পূর্ণভাবে অবদমিত করে রাজ-শক্তির এই যে চূড়ান্ত বিকাশ মহাভারতে প্রকট হয়েছে, এর সূত্রপাত কিন্তু মহাভারতের যুগে নয়। ঋগ্বেদেই দেখা যায়, যুদ্ধ-নায়ক ইন্দ্রের

বাধাবন্ধনহীন স্বৈরাচারী শক্তির স্তুতিতে বৈদিক কবিরা ক্রমশই মুখর হয়ে উঠেছেন। আধুনিক গবেষকরা দেখিয়েছেন, ইন্দ্রের এ-গৌরব ঋগ্বেদের প্রাচীন পর্যায়ের পরিচায়ক নয়; প্রকৃত প্রাচীন পর্যায়ে মহত্তম বৈদিক দেবতা বলতে বরুণ; এবং এই বরুণ সখ্যের প্রতীক, ন্যায়ের প্রতীক, সাম্যের প্রতীক; এবং কালক্রমে ঋগ্বেদে এই বরুণের গৌরবকেই ধূলিসাৎ করে ইন্দ্রের গৌরব প্রবল হয়ে উঠেছে।

‘বৈদিক কবিদের কল্পনায় দেবতা-জগতের এই বিপর্যয়ের মধ্যে এক গভীর সমাজ-বিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে এবং তার মূল কথা হলো, প্রাচীন যৌথজীবনের ধ্বংসস্তুপের উপর ক্ষাত্র-শক্তি শাসিত ও ব্রাহ্মণ-শক্তি সমর্থিত সুস্পষ্ট শ্রেণী-সমাজের আবির্ভাব। পরবর্তী কালের শ্রেণী-শাসিত– প্রধানত ক্ষত্রিয়-শ্রেণী শাসিত– বৈদিক সমাজের পরিচয় অবশ্যই সুবিদিত। ‘ব্রাহ্মণ’-সাহিত্যে (যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ) এ-সমাজের রূপ অত্যন্ত প্রকট হয়েছে; এমনকি ঋগ্বেদের শেষ পর্যায়েই (যেমন অর্বাচীন দশম মণ্ডলের সুবিখ্যাত ‘পুরুষ-সূক্তে’ বর্ণ-ভেদের উদ্ভব) ক্ষাত্র-শক্তি ও ব্রাহ্মণ-শক্তির প্রাদুর্ভাব সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়।’- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৪১)

...

৩.২ : বৈদিক-সাহিত্যে পার্থিব সম্পদের কামনা

ভারতীয় আস্তিক দর্শনশাস্ত্রের সবকটি সম্প্রদায়ের বক্তব্যে বেদকেই সকল জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হলেও প্রধান ও প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্য ঋগ্বেদ-সংহিতার বিশ্লেষণ কিন্তু এরকম কিছু বলে না। বস্তুত সমগ্র ঋগ্বেদ জুড়েই দেখা যায় কেবল একান্তই পার্থিব কামনার অভিব্যক্তি– অন্নের কামনা, পশুর কামনা, ধনের কামনা, বলবীর্যের কামনা, সন্তানের কামনা, নিরাপত্তার কামনা। আমাদের গ্রামাঞ্চলে মুখে মুখে রচিত ব্রতের গানে যেরকমটা দেখি, অনেকটা সেরকমই। ঋগ্বেদের কোথাও মোক্ষের কথা নেই, এমনকি 'মোক্ষ' বলে শব্দটিরই উল্লেখ নেই– যদিও পরবর্তীকালে বৈদিক ঐতিহ্যে এই মোক্ষই পরম-পুরুষার্থ বলে ঘোষিত। এই মোক্ষকেই ঘিরেই সমস্ত আস্তিক্য দর্শন তাদের ডালপালার বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। অথচ ঋগ্বেদ– অন্তত ঋগ্বেদের প্রধানতম অংশ– পার্থিব সম্পদের কামনায় এমনই ভরপুর যে এ-সাহিত্যে আধুনিক অর্থে আধ্যাত্মিক চিন্তার পরিচয় অন্বেষণ করাই অনেকাংশে অবান্তর মনে হয়। এ-ব্যাপারে ঋগ্বেদে প্রচুর নজির দেখানো যায়।

তবে ঋগ্বেদের ঋষিরা যখনও লিপির ব্যবহার শেখেননি তখনও মুখে মুখে গান রচনার প্রয়োজন সম্পর্কে বলছেন–

মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জন্য ইব ততনঃ। গায় গায়ত্রমুক্থ্যম্'।। (ঋগ্বেদ-১/৩৮/১৪)।
বন্দস্ব মারুতং গণং ত্বেষং পনস্যুমর্কিণং। অস্মে বৃদ্ধা অসন্নিহ।। (ঋগ্বেদ-১/৩৮/১৫)।
অর্থাৎ :
মুখে মুখে শ্লোক রচনা করো, পর্জন বা মেঘের মতো তাকে বিস্তার করো, গায়ত্রী ছন্দে উক্থ্য গান করো। (ঋক-১/৩৮/১৪)।। দীপ্তিমান স্তুতিযোগ্য এবং অর্চনোপেত মরুৎগণকে বন্দনা করো, আমাদের এ কার্যে যেন তাঁরা বর্ধনশীল হন। (ঋক-১/৩৮/১৫)।।

মুখে মুখে গান রচনার কথা থেকেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তখনও ঋগ্বেদের ঋষিরা লিপির ব্যবহার শেখেননি। কিন্তু মেঘের মতো বিস্তার করবার উপমা কেন? গানের সঙ্গে মেঘের কি কোনো সাদৃশ্য আছে? এই ঋকের ভাষ্যে সায়ণ বলেন,–

'যথা মেঘো বৃষ্টিং বিস্তারয়নি তদ্বৎ'
অর্থাৎ, মেঘ যেমন বৃষ্টি বিস্তার করে, সেইরকম।

তাহলে কিসের বৃষ্টি? বেদবিদেরা বলেন, এ হলো কামনা-সাফল্যের বৃষ্টি। কেননা, বেদের গান কামবর্ষী– কামনা সফল করার গান। এটি প্রাচীনদের এক সুগভীর বিশ্বাস। বেদের গান যে কামবর্ষী এই সুপ্রাচীন বিশ্বাসের পরিচয় ছান্দোগ্য উপনিষদে বারবার পাওয়া যায় (ছান্দোগ্য-১/১/৪-৮, ১/২/১৩-১৪, ১/৭/৮, ২/২২/২ ইত্যাদি)। যেমন–

'কতমা কতমর্ক্ কতমৎ সাম কতমঃ কতম উদ্গীথ ইতি বিমৃষ্টং ভবতি'।। (ছান্দোগ্য-১/১/৪)।। বাগেব ঋক্ প্রাণঃ সামোমিত্যেতৎ অক্ষরম্ উদ্গীথঃ। তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চ ঋক্ চ সাম চ।। (ছান্দোগ্য-১/১/৫)।। তদেতন্মিথুনম্ ওমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে

সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্ ।।
(ছান্দোগ্য-১/১/৬)।। আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরম্ উদ্গীথম্
উপাস্তে।।' (ছান্দোগ্য-১/১/৭)।।
অর্থাৎ :
এখন জিজ্ঞাস্য– ঋক্ কী? সাম্ কী? উদ্গীথই বা কী? (ছান্দোগ্য-১/১/৪)।। বাক্যই হলো ঋক্, প্রাণ হলো সাম এবং উদ্গীথ হলো ওম্ এই অক্ষর। বাক্ ও প্রাণ বা ঋক্ ও সাম্– এরা যুগল বা মিথুন। (ছান্দোগ্য-১/১/৫)।। এই মিথুনই ওম্ । বাক্ ও প্রাণ ওম্ অক্ষরে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়। নারী ও পুরুষ যেমন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে পরস্পরের কামনা পূর্ণ করে, বাক্ ও প্রাণের এই মিলনও ঠিক তেমনই।
(ছান্দোগ্য-১/১/৬)।। 'ওম্'ই সবকিছুর আশ্রয়– এইভাবে যিনি 'ওম্'কে উদ্গীথরূপে উপাসনা করেন, তিনি যা যা পেতে চান তাই লাভ করেন। (ছান্দোগ্য-১/১/৭)।।
কিংবা–
'অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানীত্যাগায়েৎ স্বধাং পিতৃভ্য আশাং মনুষ্যেভ্যস্তৃণোদকং পশুভ্যঃ স্বর্গং লোকং যজমানায়ান্নমাত্মন আগায়ানীত্যেতানি মনসা ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ স্তুবীত'।।
(ছান্দোগ্য-২/২২/২)।।
অর্থাৎ : এই সংকল্প নিয়ে গাওয়া উচিত : 'দেবদেবীদের জন্য অমরত্ব, পিতৃপুরুষদের জন্য নৈবেদ্য, মানবজাতির জন্য আশা, অর্থাৎ প্রার্থিত বস্তু, পশুদের জন্য খাদ্য এবং পানীয়, যাঁরা যজ্ঞ করছেন তাঁদের জন্য স্বর্গলোক এবং আমার নিজের জন্য অন্ন– এ সমস্তই আমি গান গেয়ে অর্জন করবো'। এই বিষয়গুলি চিন্তা করে, শান্তমনে, গলা খুব না চড়িয়ে গান গাওয়া উচিত।

অতএব, ঋগ্বেদ জুড়ে যে পার্থিব কামনার ভরপুর উচ্ছ্বাস এটি সে-সময়কার জীবন-চর্চায় বিশ্বাসে অস্বাভাবিক নয়। বিদ্বানদের গবেষণা থেকে জানা যায়, নিঘণ্টু-মতে (নিঘণ্টু-২/৭) ঋগ্বেদে ২৮টি অন্নবাচক শব্দ আছে; এগুলির উল্লেখ মোট ৩০০০ বারেরও বেশি এবং সর্বত্রই তা অন্নকামনা বা অন্ন-গরিমার অঙ্গীভূত। গো-বাচক শব্দ ৯টি (নিঘণ্টু-২/১১)– শুধু গো এবং তজ্জাত শব্দই সহস্রাধিকবার– এবং সর্বত্রই গো-কামনা বা গো-গরিমার অঙ্গ হিসেবে উল্লিখিত। উদক বা জল-বাচক শব্দ ১০১টি (নিঘণ্টু-১/১২), বল-বাচক শব্দ ২৮টি (নিঘণ্টু-২/৯), ধন-বাচক শব্দ ২৮টি (নিঘণ্টু-২/১০), অপত্য-বাচক শব্দ ১৫টি
(নিঘণ্টু-২/২); ইত্যাদি। আর ঋগ্বেদে এগুলির কামনা যে মোট কত সহস্রবার হয়েছে তার হিসাব করা খুবই দুঃসাধ্য।
তবে নমুনা হিসেবে ঋগ্বেদের একটি সূক্তের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। যেমন, নিঘণ্টু-মতে (নিঘণ্টু-২/৭) অন্নবাচক একটি বৈদিক শব্দ হলো 'পিতু'। এই পিতু বা অন্নকে জনৈক দেবতা হিসেবেও ঋগ্বেদে স্তুতি করা হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত একটি সূক্ত
(ঋগ্বেদ-১/১৮৭)–
পিতুং নু স্তোষং মহো ধর্মাণং তবিষীম্ । যস্য ত্রিতো ব্যোজসা বৃত্রং বিপর্বমর্দয়ৎ।। ১

স্বাদো পিতো মধ্বো পিতো বয়ং ত্বা ববৃমহে। অস্মাকমবিতা ভব।। ২
উপ নঃ পিতবা চর শিবঃ শিবাভিরূতিভিঃ। ময়োভুরদ্বিষেণ্যঃ সখা সুশেবো অদ্বয়াঃ।। ৩
তব ত্যে পিতো রসা রজাংস্যনু বিষ্ঠিতাঃ। দিবি বাতা ইব শ্রিতাঃ।। ৪
তব ত্যে পিতো দদতস্তব স্বাদিষ্ঠ তে পিতো। প্র স্বাদ্মানো রসানাং তুবিগ্রীবা ইবেরতে।। ৫
ত্বে প্রিতো মহানাং দেবানাং মনো হিতম্ । অকারি চারু কেতুনা তবাহিমবসাবধীৎ।। ৬
যদদে পিতো অজগন্বিবস্ব পর্বতানাম্ । অত্রা চিন্নো মধো পিতোহরং ভক্ষয় গম্যাঃ।। ৭
যদপ্যমোষধীনাং পরিংশমারিশামহে। বাতাপে পীব ইদ্ভব।। ৮
যত্তে সোম গবাশিরো যবাশিরো ভজামহে। বাতাপে পীব ইদ্ভব।। ৯
করম্ভ ওষধে ভব পীবো বৃক্ক উদারথিঃ। বাতাপে পীব ইদ্ভব।। ১০
তং ত্বা বয়ং পিতো বচোভির্গাবো ন হব্যা সুষুদিম।
দেবেভ্যস্ত্বা সধমাদমস্মভ্যং ত্বা সধমাদম্ ।। ১১
অর্থাৎ :
আমি ত্বরান্বিত হয়ে মহান, সকলের ধারক ও বলাত্মক পিতুকে স্তব করি। তাঁরই সামর্থ্যে ত্রিত বৃত্রের সন্দিচ্ছেদ করে বধ করেছিলেন। ১।। হে স্বাদু পিতু ! হে মধুর পিতু ! আমরা তোমার সেবা করি, তুমি আমাদের রক্ষা করো। ২।। হে পিতু ! তুমি মঙ্গলময়, তুমি কল্যাণকর আশ্রয়দান দ্বারা আমাদের নিকট এসে আমাদের সুখ উৎপাদন করো। তোমার রস যেন আমাদের অপ্রিয় না হয়, তুমি আমাদের সখা ও অদ্বিতীয় সুখকর হও। ৩।। হে পিতু ! বায়ু যেরূপ অন্তরীক্ষে আশ্রয় করে আছে, সেরূপ তোমার রস সমস্ত জগতের অনুকূলে ব্যাপ্ত রয়েছে। ৪।। হে স্বাদুতম পিতু ! যে সকল লোক তোমাকে প্রার্থনা করে, তারা ভোক্তা। হে পিতু ! তোমার অনুগ্রহে তারা তোমাকে দান করে। তোমার রসাস্বাদী ব্যক্তিগণের গ্রীবা উন্নত হয়। ৫।। হে পিতু ! মহৎ দেবতারা তোমাতেই মন নিহিত করেছেন। হে পিতু ! তোমার চারু প্রজ্ঞা ও আশ্রয়দ্বারাই অহিকে বধ করেছিলে। ৬।। হে পিতু ! যখন মেঘগণের প্রসিদ্ধ উদক আসে, তখন হে মধুর পিতু ! তুমি আমাদের সম্পূর্ণরূপে ভোজনের জন্য সন্নিহিত হও। ৭।। যেহেতু আমরা প্রভূত জল ও ওষধি ভক্ষণ করি; অতএব হে শরীর ! তুমি স্থূল হও। ৮।। হে সোম ! তোমার দুগ্ধাদি মিশ্রিত ও যবাদি মিশ্রিত অংশ ভক্ষণ করি; অতএব হে শরীর ! তুমি স্থূল হও। ৯।। হে করম্ভ ওষধি ! তুমি স্থূলতাসম্পাদক, রোগনিবারক ও ইন্দ্রিয়োদ্দীপক হও। হে শরীর ! তুমি স্থূল হও। ১০।। হে পিতু ! ধেনুগণের নিকট যেরূপ হব্য গৃহিত হয়, সেরূপ তোমার নিকট আমরা স্তুতিদ্বারা রস গ্রহণ করি। ঐ রস কেবল দেবতাগণের নয় আমাদেরও হৃষ্ট করে। ১১।।

এই সূক্তের ধুয়াটিও চিত্তাকর্ষক– 'বাপাতে পীব ইৎ ভব'– হে শরীর, তুমি স্থূল হও। দেহাতীত কোন আত্মার কল্পনা নয়, লোকোত্তর কোনো পুরুষার্থের কামনা নয়। কেবলই দেহের কথা, পুষ্টির কামনা। অথচ উত্তরকালে বৈদিক ঐতিহ্যেই এ-জাতীয় কথা, এ-জাতীয় কামনা গর্হিত ও নিন্দিত হতে দেখা যায়। আর লোকায়ত চার্বাকদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। তবে এর থেকেই বোঝা যায়, কালক্রমে বৈদিক ঐতিহ্য যতো চূড়ান্ত

অধ্যাত্মবাদীই হোক না কেন, ঋগ্বেদ– অন্তত ঋগ্বেদের প্রধানতম অংশ– একান্ত পার্থিব কামানয় এমনই বিভোর যে তাকে প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী আখ্যা দেয়াই যৌক্তিক হবে। এবং এই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী চেতনার ধ্বংসস্তূপের উপরই কালক্রমে বৈদিক অধ্যাত্মবাদের আবির্ভাব ঘটেছিলো বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। এখানে হয়তো প্রশ্ন উঠবে বৈদিক দেবতা এবং বৈদিক যজ্ঞ নিয়ে। কেননা প্রধানত এই দুটি বিষয়ের নজির থেকেই ঋগ্বেদকে অধ্যাত্মবাদী সাহিত্য বলে গ্রহণ করবার প্রবণতা তৈরি হতে পারে। তাই এ দুটি বিষয়েও আমাদের আলোচনা প্রসারিত করা প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত সূক্তের দেবতা হিসেবে যে অন্ন বা পিতু দেবতার স্তুতি গাওয়া হয়েছে তাঁর বৈশিষ্ট্য কী? তিনি স্বাদু, সুখ-উৎপাদনকারী; তাঁর গন্ধে রসাস্বাদী ব্যক্তিদের গ্রীবা উন্নত হয়; তিনি স্তোতাদের পূর্ণতৃপ্তিদায়ক ভোজনের জন্য সন্নিহিত হন এবং অবশ্যই তাদের শরীর সুপুষ্ট করেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এখানে অন্ন-কামনা এবং অন্ন-প্রশংসাই মুখ্য এবং তারই অঙ্গ হিসেবে পিতু বা অন্নের এই দেবত্ব-গৌরব। অর্থাৎ, নামে দেবতা হলেও অন্তত এই বৈদিক দেবতাটির আধুনিক অর্থে বিশেষ কোনো আধ্যাত্মিক চেতনার পরিচয় অন্বেষণ করা অবান্তর বলেই মনে হয়। তবে অবশ্যই দেবতা হিসেবে ঋগ্বেদে পিতুর স্থান নেহাতই গৌণ। তাই বৈদিক দেবতাদের সম্বন্ধে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে ঋগ্বেদের প্রধান দেবতাদের পরিচয় সম্বন্ধে অবগত হওয়া আবশ্যক।

৩.৩ : বৈদিক দেবতা

বৈদিক দেবতার সংখ্যা মোট কতো এ বিষয়ে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে। এ-বিষয়ে বৈদিক কবি বা ঋষিদের সাক্ষ্যও সর্বত্র সমান নয়। একটি প্রাচীন ঋকে (ঋগ্বেদ-৩/৯/৯) দেখা যায় দেবসংখ্যা ৩৩৩৯ বলে উল্লেখ করা আছে। অবিকল এই একই শ্লোকই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেও (ঋগ্বেদ-১০/৫২/৬) উক্ত হয়েছে–

ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্ ।
ঔক্ষণৃ ঘৃতৈরস্তৃণন্বর্হিরস্মা আদিদ্বোতারং ন্যসাদয়ন্ত।। (ঋগ্বেদ-৩/৯/৯)।
অর্থাৎ :
তিন সহস্র তিনশত ত্রিশ ও নব সংখ্যক দেবতা অগ্নির পরিচর্যা করেছেন; তাঁকে ঘৃতদ্বারা অভিষিক্ত করেছেন এবং তাঁর জন্য কুশ বিস্তার করে দিয়েছেন এবং তাঁকে হোতারূপে কুশোপরি উপবেশন করিয়েছেন। (ঋক-৩/৯/৯)।।

দেখা যায়, ঋগ্বেদের প্রতিটি সূক্ত সম্বন্ধেই একজন দেবতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদের সকল সূক্তে যাঁদের দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের সকলকে ধরলেও এই সংখ্যা পাওয়া যায় না। এদিকে উক্ত ঋকের ভাষ্যে সায়ণ বলছেন, দেবসংখ্যা আসলে ৩৩; কিন্তু তাঁদের মহিমা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এ-ভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়েছে। এ-যুক্তির গুরুত্ব যাই হোক না কেন, সায়ণের সিদ্ধান্তের পক্ষে ঋগ্বেদে অবশ্য এমন নজিরও রয়েছে যেখানে নানা জায়গায় দেবসংখ্যা ৩৩ বলেই বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভি র্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা।
প্রায়ুস্তারিষ্টং নী রপাংসি মৃক্ষতং সেধতং দ্বেষো ভবতং সচাভুবা।। (ঋগ্বেদ-১/৩৪/১১)।
শ্রুষ্টীবানো হি দাশুষে দেবা অগ্নে বিচেতসঃ।
তান্রোহিদশ্ব গির্বণস্ত্রয়স্ত্রিংশতমা বহ।। (ঋগ্বেদ-১/৪৫/২)।
যে দেবাসো দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যা মধ্যেকাদশ স্থ।
অপ্সুক্ষিতো মহিনৈকাদশ স্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/১৩৯/১১)।
যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্ । বিদন্নহ দ্বিতাসনন্ ।। (ঋগ্বেদ-৮/২৮/১)।
যুবাং দেবাস্ত্রয় একাদশাসঃ সত্যাঃ সত্যস্য দদৃশে পুরস্তাৎ।
অস্মাকং যজ্ঞং সবনং জুষাণা পাতং সোমমশ্বিনা দীদ্যগ্নী।। (ঋগ্বেদ-৮/৫৭/২)।
অর্থাৎ :
হে নাসত্য অশ্বিদ্বয় ! ত্রিগুণ একাদশ (তেত্রিশ) দেবগণের সাথে মধুপানার্থে এখানে এসো, আমাদের আয়ু বর্ধন করো; পাপ খণ্ডন করো; বিদ্বেষীদের প্রতিষেধ করো; আমাদের সঙ্গে অবস্থান করো। (ঋক-১/৩৪/১১)।। হে অগ্নি ! বিশিষ্ট প্রজ্ঞাসম্পন্ন দেবগণ হব্যদাতাকে ফলদান করেন; হে অগ্নি ! তোমার রোহিত নামক অশ্ব আছে এবং তুমি স্তুতিভাজন, তুমি সে ত্রয়স্ত্রিংশ (তেত্রিশ) দেবগণকে এ স্থানে নিয়ে এসো। (ঋক-১/৪৫/২)।। যে দেবগণ, স্বর্গে

একাদশ, পৃথিবীর উপরেও একাদশ, যখন অন্তরীক্ষে বাস করেন তখনও একাদশ, তাঁরা নিজ মহিমায় যজ্ঞ সেবা করেন। (ঋক-১/১৩৯/১১)।। ত্রিংশতির পর তিন সংখ্যাযুক্ত (তেত্রিশ) যে দেবগণ বর্হিতে উপবেশন করেছিলেন; তাঁরা আমাদের জানুন এবং দু'প্রকার ধন প্রদান করুন। (ঋক-৮/২৮/১)।। দেবগণের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশ, তাঁরা সত্য, তাঁরা যজ্ঞের সম্মুখে দৃষ্ট হন। হে দীপ্তমান অগ্নিবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! তোমরা আমার এ সোম যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে পান কর। (ঋক-৮/৫৭/২)।।

আবার ঋগ্বেদের অন্য ঋকে দেবসংখ্যা আরো কম দেখা যায়। যেমন ঋগ্বেদের একটি অত্যন্ত অর্বাচীন ঋকে মাত্র তিন দেবতার স্তুতি করা হয়েছে–

সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ। অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/১৫৮/১)।
অর্থাৎ :
সূর্য আমাদের স্বর্গের উপদ্রব হতে, বায়ু আকাশের উপদ্রব হতে এবং অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব হতে রক্ষা করুন।

তার মানে, দ্যুলোক বা স্বর্গের দেবতা সূর্য, অন্তরীক্ষ বা আকাশের দেবতা বায়ু, পৃথিবীর দেবতা অগ্নি। আবার দৃষ্টান্তবিশেষে মনে হয় কোনো কোনো বৈদিক কবি প্রাচীনকালে বহু দেবতাকে একই দেবতার বিভিন্ন বিকাশ বলে কল্পনা করতে চেয়েছেন। যেমন–

ইন্দ্রং মিত্রং বরুমগ্নিণত্বা মাহূরথো দিবাঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্ ।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১৬৪/৪৬)।
অর্থাৎ :
এ আদিত্যকে মেধাবীগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলে থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষ বিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হলেও একে বহু বলে বর্ণনা করে। একে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে।

পরবর্তীকালের ব্যাখ্যাকাররাও দেবসংখ্যা বিষয়ে একমত নন। নিরুক্তকার যাস্ক'র মতে দেবতা মাত্র তিনটি–

'তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা। অগ্নিঃ পৃথিবী স্থানো বায়ুরিন্দ্রো বাহন্তরীক্ষ স্থানঃ সূর্যো দ্যুঃস্থান'।। (নিরুক্ত)।
অর্থাৎ : দেবতা মাত্র তিনটি। পৃথিবীলোকের দেবতা অগ্নি, আকাশ বা অন্তরীক্ষলোকের দেবতা বায়ু বা ইন্দ্র এবং স্বর্গ বা দ্যুলোকের দেবতা সূর্য।

কিন্তু 'যাজ্ঞিক-সম্প্রদায়ে'র দাবি হলো, দেবতা আসলে অসংখ্য– তাঁদের যত নাম তত সংখ্যা। আবার 'আত্মবিদ্'-দের মতে– 'এক মহান আত্মাই তাঁহার অপরিমেয় ঐশ্বর্যবলে বিভিন্ন আকৃতি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, বিভিন্ন ভাবে স্তুত হন', বিভিন্ন দেবদেবী একই পরমাত্মার রূপান্তরমাত্র।

তবে প্রসঙ্গত, এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, ঋগ্বেদ একজনের রচনা নয় বা এককালের রচনাও নয়। সুদীর্ঘ যুগ ধরে বহু কবি বা ঋষি এই সুবিশাল সাহিত্য রচনা করেছিলেন; যাদের সকলের দেবদেবী সংক্রান্ত ধারণা সমান নয় বা সমান ছিলো না। তাই সামগ্রিকভাবে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে কোনো অদ্বিতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রচেষ্টাও অবান্তর হবে। তবুও ঋগ্বেদের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে অন্তত এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, পরবর্তীকালের কবি-বিশেষের রচনায় এমনকি এক অদ্বিতীয় দেবতার আভাস থাকলেও ঋগ্বেদের প্রধানতম অংশে বহু কবি বহুভাবে বহু দেবতারই স্তুতি করেছেন। তবে এতো দেবতার মধ্যে অনেকের স্থান এতোটাই গৌণ যে, তাদেরকে স্বভাবতই প্রধান বৈদিক দেবতা বলে ভাবা অবশ্যই ভুল হবে। যেমন ঋগ্বেদে পর্বত (ঋগ্বেদ-৩/৫৪/২০), ওষধি (ঋগ্বেদ-সূক্ত-১০/৯৭), বনস্পতি (ঋগ্বেদ-৭/৩৪/২৩, ১০/৬৪/৮), অরণ্যানী (ঋগ্বেদ-সূক্ত-১০/১৪৬), সোম-নিষ্কাশনের পাথর (গ্রাবন্ ও অদ্রি) (ঋগ্বেদ-সূক্ত-১০/৭৬), এবং এমনকি তীর ধনুক প্রভৃতি নানা আয়ুধও (ঋগ্বেদ-সূক্ত-৬/৭৫) দেবতা বলে স্তুত হয়েছে। এ-বিষয়ে পুরো সূক্ত উল্লেখ না করে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ঋকের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে–

শৃন্বন্তু নো বৃষণঃ পর্বতাসো ধ্রুবক্ষেমাস ইলয়া মদন্তঃ।
আদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শৃণোতু যচ্ছন্তু নো মরুতঃ শর্ম ভদ্রম্ ।। (ঋগ্বেদ-৩/৫৪/২০)।
ওষধীঃ প্রতি মোদধ্বং পুষ্পবতীঃ প্রসূবরীঃ।
অশ্বা ইব সজিত্বরীর্বীরুধঃ পারয়িষ্ণ্বঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/৯৭/৩)।
তন্নো রায়ঃ পর্বতাস্তন্ন আপস্তদ্রাতিষাচ ওষধীরুত দ্যৌঃ।
বনস্পতিভিঃ পৃথিবী সজোষা উভে রোদসী পরি পাসতো নঃ।। (ঋগ্বেদ-৭/৩৪/২৩)।
অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ বা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী।। (ঋগ্বেদ-১০/১৪৬/১)।
অপ হত রক্ষসো ভঙ্গুরাবতঃ স্কভায়ত নির্ঋতিং সেধতামতিম্ ।
আ নো রয়িং সর্ববীরং সুনোতন দেবাব্যং ভরত শ্লোকমদ্রয়ঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/৭৬/৪)।
ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম।
ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম।। (ঋগ্বেদ-৬/৭৫/২)।
অর্থাৎ :
অভীষ্টবর্ষী মরুৎগণ এবং নিশ্চল পর্বতগণ হব্যদ্বারা হৃষ্ট হয়ে আমাদের স্তুতি শুনুন। আদিত্যগণের সাথে অদিতি আমাদের স্তুতি শুনুন। আমাদের কল্যাণকর সুখ দান করুন। (ঋক-৩/৫৪/২০)।। হে পুষ্পবতী ফলপ্রসবকারিণী ওষধিগণ ! তোমরা রোগীর প্রতি সন্তুষ্ট হও। তোমরা ঘোটকের ন্যায় জয়শীল মৃত্তিকাতে জন্ম গ্রহণ করো, রোগীকে রক্ষা করো। (ঋক-১০/৯৭/৩)।। পর্বতগণ আমাদের সে ধন পালন করুন। জল সকল আমাদের সে ধন পালন করুন। দানদক্ষা দেবপত্নীগণ তা পালন করুন। ওষধিগণ ও দ্যুলোক পালন করুন। বনস্পতিগণের সাথে অন্তরীক্ষ তা পালন করুন। দ্যাবাপৃথিবী আমাদের রক্ষা করুন। (ঋক-৭/৩৪/২৩)।। হে অরণ্যানি ! তুমি যেন দেখতে দেখতে অন্তর্হিত হয়ে যাও। তুমি

কেন গ্রামে যাবার পথ জিজ্ঞাসা করো না? তোমার কি একাকী থাকতে ভয় হয় না? (ঋক-১০/১৪৬/১)।। হে প্রস্তরগণ ! কর্মবিঘ্নকারী রাক্ষসাদিকে নষ্ট করো, নির্ঋতিকে রুদ্ধ করো, দুর্মতি দূর করো, আমাদের ধন ও জন সম্পাদন করে দাও। দেবতাদের প্রীতিকর শ্লোকের স্ফূর্তি করে দাও। (ঋক-১০/৭৬/৪)।। আমরা ধনুদ্বারা গাভী জয় করবো, ধনুদ্বারা যুদ্ধ জয় করবো, ধনুদ্বারা তীব্র মদোন্মত্ত শত্রুসেনা বধ করবো। ধনু শত্রুর কামনা নষ্ট করুক, আমরা ধনুদ্বারা সকল দিক জয় করবো। (ঋক-৬/৭৫/২)।।

অথর্ববেদের (অথর্ব-১১/৭) এক অত্যদ্ভূত দেবতার নাম উচ্ছিষ্ট। আবার ঋগ্বেদের শেষ পর্যায়ে একদিকে শ্রদ্ধা (ঋগ্বেদ-সূক্ত-১০/১৫১), জ্ঞান (ঋগ্বেদ-সূক্ত-১০/৭১) প্রভৃতি অমূর্ত ধারণাও দেবতা বলে স্তুত এবং অন্যদিকে গর্ভরক্ষণ (ঋগ্বেদ-সূক্ত-১০/১৬২), যক্ষ্মারোগ-নাশ (ঋগ্বেদ-সূক্ত-১০/১৬৩), দুঃস্বপ্ন-নাশ (ঋগ্বেদ-সূক্ত-১০/১৬৪) প্রভৃতি দৈনন্দিন পার্থিব কামনাও দেবতা বলে কল্পিত। যেমন–
প্রিয়ং শ্রদ্ধে দদতঃ প্রিয়ং শ্রদ্ধে দিদাসতঃ।
প্রিয়ং ভোজেষু যজস্বিদং ন উদিতং কৃধি।। (ঋগ্বেদ-১০/১৫১/২)।
হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু যৎ-ব্রাহ্মণাঃ সংর্যজন্তে সখায়ঃ।
অত্রাহ ত্বং বি জহুর্বেদ্যাভিরোহব্রহ্মাণো বি চরন্ত ত্বে।। (ঋগ্বেদ-১০/৭১/৮)।
যস্তে গর্ভমমীবা দুর্ণামা যোনিমাশয়ে।
অগ্নিষ্টং ব্রহ্মণা সহ নিষ্ক্রব্যাদমনীনশৎ।। (ঋগ্বেদ-১০/১৬২/২)।
অঙ্গাদঙ্গাল্লোম্নো লোম্নো জাতং পর্বণি পর্বণি।
যক্ষ্মং সর্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বি বৃহামি তে।। (ঋগ্বেদ-১০/১৬৩/৬)।
অপেহি মনসম্পতেহপ ক্রাম পরশ্চর।
পরো নির্ঋত্যা আ চক্ষ্বহুধা জীবতো মনঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/১৬৪/১)।
অর্থাৎ :
হে শ্রদ্ধা ! যে দান করে তুমি তার প্রিয়কার্যের অনুষ্ঠান করো, যে দান করতে ইচ্ছা করেছে, তাকেও সন্তুষ্ট করো। যারা ভোজন করায়, যজ্ঞ করে, তারা প্রীতি লাভ করুক। হে শ্রদ্ধা ! আমার এ কথাটি রক্ষা করো। (ঋক-১০/১৫১/২)।। যখন অনেক স্তোতা একত্র হয়ে মনের ভাব সমস্ত হৃদয়ে আলোচনা পূর্বক অবধারিত করতে প্রবৃত্ত হন তখন কোন কোন ব্যক্তির কিছুই জ্ঞান জন্মে না। কেউ কেউ স্তোত্রজ্ঞ বলে পরিচিত হয়ে সর্বত্র বিচরণ করেন। (ঋক-১০/৭১/৮)।।
হে নারি ! যে মাংসভোজী রাক্ষস অথবা যে রোগ বা উপদ্রব তোমার যোনি আক্রমণ করে, রাক্ষসনিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সাথে মিলিত হয়ে সে সমস্ত বিনাশ করুন। (ঋক-১০/১৬২/২)।। প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক লোম, শরীরের প্রত্যেক সন্ধি স্থান, তোমার সর্বাঙ্গের মধ্যে যে কোন স্থানে যক্ষ্মা-ব্যাধি জন্মেছে, আমি তথা হতে তাকে তাড়াচ্ছি। (ঋক-১০/১৬৩/৬)।। হে দুঃস্বপ্নদেবতা ! তুমি মনকে অধিকার করেছো; তুমি সরে যাও, পালাও, দূর স্থানে গিয়ে বিচরণ করো। অতিদূরে যে নির্ঋতি দেবতা আছেন, তাঁকে গিয়ে

বলো, যে জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ অতএব তিনি কেন মনোরথ ভঙ্গ করেন। (ঋক-১০/১৬৪/১)।।

অতএব দেবজ্ঞানে এসব প্রাকৃতিক বিষয়ের স্তুতি থাকলেও স্বভাবতই প্রধান বৈদিক দেবতা বললে এদের কথা ভাবা খুবই ভুল হবে। এক্ষেত্রে প্রাচীন আচার্যদের শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করেই আধুনিক বিদ্বান-গবেষকরা ঋগ্বেদের প্রধান দেবতাদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন– (ক) দ্যুলোক বা স্বর্গের দেবতা, (খ) অন্তরীক্ষ বা আকাশের দেবতা এবং (গ) পৃথিবীর দেবতা।

এখানে বলে রাখা আবশ্যক, বৈদিক সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে বৈদিক সাহিত্যের বেশ কিছু তথ্য নির্দেশসহ বৈদিক দেবতাদের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে আকর্ষণীয় পর্যালোচনা করেছেন। বর্তমান বৈদিক দেবতা সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর ধারা অনুসরণ বিষয় পর্যালোচনায় অনেকটা সহায়ক হতে পারে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আমরা সে-চেষ্টাও করবো।
…

(ক) দ্যুলোক বা স্বর্গের দেবতা
দ্যুলোকের প্রাচীনতম দেবতা বলতে যাঁর নাম আসে তিনি হলেন দ্যু বা দ্যৌস্, অর্থাৎ আকাশ। তাঁর সম্বন্ধে ঋগ্বেদে কোন পৃথক সূক্ত নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি পিতা হিসেবে দ্যৌস্পিতা বলে স্তুত। এবং তাঁর সঙ্গে মাতা পৃথিবীকে যুক্ত করে গুটি দুয়েক সূক্ত পাওয়া যায়। তাতে উভয়ে একত্রে দ্যাবাপৃথিবী বলে উল্লিখিত। যেমন–

উভ মন্যে পিতুরদ্রুহো মনো মাতুর্মহি স্বতবস্তদ্ধবীমভিঃ।
সুরেতসা পিতরা ভূম চক্রতুরুরু প্রজায়া অমৃতং বরীমভিঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১৫৯/২)।
তে সূনবঃ স্বপসঃ সুদংসসো মহী যজ্ঞুর্মাতরা পূর্বচিত্তয়ে।
স্থাতুশ্চ সত্যং জগতশ্চ ধর্মণি পুত্রস্য পাথঃ পদমদ্বয়াবিনঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১৫৯/৩)।
অর্থাৎ :
আমি দ্রোহ রহিত পিতৃস্থানীয় দ্যুলোকের উদার এবং সদয় মন আহ্বান মন্ত্রদ্বারা জেনেছি। মাতৃস্থানীয় পৃথিবীর মনও জেনেছি। পিতামাতা দ্যাবাপৃথিবী নিজ সামর্থ্য দ্বারা পুত্রগণকে বিশেষরূপে রক্ষা করে প্রভূত, বিস্তীর্ণ অমৃত প্রদান করুন। (ঋক-১/১৫৯/২)।। তোমাদের পুত্র, সুকর্মা, সুদর্শন প্রজাগণ, তোমাদের পূর্ব অনুগ্রহ স্মরণ করে, তোমাদের মহৎ ও মাতা বলে জানেন; পুত্রভূত স্থাবর ও জঙ্গমগণ দ্যাবাপৃথিবী ভিন্ন আর কাকেও জানে না, তোমরা তাদের রক্ষার নিমিত্ত অবাধ স্থান প্রদান কর। (ঋক-১/১৫৯/৩)।।

অর্থাৎ, আকাশই আদি-পিতা, পৃথিবীই আদি-জননী; উভয়ের মিলনেই সমস্ত কিছুর জন্ম। বিশ্বের পিতামাতা হিসেবে তাঁদের যুক্তভাবে গুণকীর্তন এবং তাঁদের কাছে অনেক ধরনের স্তুতি নিবেদিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, আকাশ ও পৃথিবীর মিলন থেকেই যে বিশ্ব-সংসারের জন্ম এ-জাতীয় পৌরাণিক কল্পনা শুধুমাত্র বৈদিক ঋষি বা কবিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; অন্যান্য নানা দেশে নানা মানবদলের মধ্যেও একই ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় বলে গবেষকেরা মন্তব্য করেছেন।
দ্যুলোকের অন্যান্য প্রসিদ্ধ দেবতারা হলেন– বরুণ, মিত্র, সবিতা, পূষা, বিষ্ণু, বিবস্বৎ, আদিত্য-গণ, ঊষা ও অশ্বিদ্বয়। এঁদের মধ্যে বরুণই প্রধান এবং প্রাচীনতম দেবতা। অনুষঙ্গ বিবেচনায় বরুণ প্রসঙ্গে পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার দাবি রাখে। বাকিদের পরিচয় দেখা যাক।

.
মিত্র দেবতা :
দেবতা হিসেবে ঋগ্বেদে মিত্রের উল্লেখ প্রায় ক্ষেত্রেই বরুণের সঙ্গে সংযুক্ত; এমনকি বহু দৃষ্টান্তে উভয়ে একত্রে মিত্রাবরুণ বলে স্তুত। এই মিত্রের বৈশিষ্ট্য কী? তিনি পৃথিবী ও দ্যুলোককে ধারণ করে আছেন। তিনি অনিমেষ নেত্রে সকলের দিকে চেয়ে আছেন (ঋগ্বেদ-৩/৫৯/১)। তিনি নিজ মহিমায় দ্যুলোক অভিভূত করেছেন (ঋগ্বেদ-৩/৫৯/৭)। প্রত্যুষে সূর্যোদয় হলে মিত্র লৌহকীলক সমন্বিত সুবর্ণ নির্মিত রথে আরোহণ করেন

(ঋগ্বেদ-৫/৬২/৮)। দ্যুতিমান সূর্য মিত্র ও বরুণের চক্ষুস্বরূপ (ঋগ্বেদ-৭/৬৩/১) ইত্যাদি। যেমন–

হিরণ্যরূপমুষসো ব্যুষ্টাবয়ঃস্থূণমুদিতা সূর্যস্য।
আ রোহথো বরুণ মিত্র গর্তমতশ্চক্ষাথে অদিতিং দিতিং চ।। (ঋগ্বেদ-৫/৬২/৮)।
উদ্বেতি সুভগো বিশ্বচক্ষাঃ সাধারণঃ সূর্যো মানুষাণাম্ ।
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্য দেবশ্চর্মেব যঃ সমবিব্যক্তমাংসি।। (ঋগ্বেদ-৭/৬৩/১)।
অর্থাৎ :
হে মিত্র ও বরুণ ! তোমরা প্রত্যুষে সূর্যোদয় হলে লৌহকীলক সমন্বিত সুবর্ণ ঘটিত রথে আরোহণ করো এবং সেখান হতে অদিতি ও দিতিকে অবলোকন করো। (ঋক-৫/৬২/৮)।। সুভগ, সর্বদর্শী, মনুষ্যগণের সাধারণ, মিত্র ও বরুণের চক্ষুস্বরূপ, দ্যুতিমান সূর্য উদিত হচ্ছেন। ইনি চর্মের ন্যায় তমোরাশি সংবেষ্টিত করেন। (ঋক-৭/৬৩/১)।।

তবে সমগ্র ঋগ্বেদে স্বতন্ত্রভাবে মিত্রের স্তুতি মাত্র একটি সূক্তে (ঋগ্বেদ-৩/৫৯) পাওয়া যায়। উদ্ধৃতিযোগ্য এই সূক্তটি থেকেই বোঝা যায় অন্যান্য বৈদিক দেবতার মতোই ঋগ্বেদের নানা জায়গায় এই বৈদিক দেবতাটিকে কেন্দ্র করে বিচিত্র পৌরাণিক কল্পনার সমাবেশ হলেও মূলত পার্থিব কামনা সফল করবার আশাতেই বৈদিক কবিরা মিত্রের স্তুতি করেছিলেন। ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রী ছন্দে রচিত সূক্তটির কবি হিসেবে বিশ্বামিত্র ঋষি'র নাম উল্লিখিত হয়েছে (ঋগ্বেদ-সূক্ত-৩/৫৯)–

মিত্রো জনান্যাতয়তি ব্রুবাণো মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্ ।
মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভি চষ্টে মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত।। ১
প্র স মিত্র মর্তো অস্তু প্রযস্বান্যস্ত আদিত্য শিক্ষতি ব্রতেন।
ন হন্যতে ন জীয়তে ত্বোতো নৈনমংহো অশ্নোত্যন্তিতো ন দূরাৎ।। ২
অনমীবাস ইলয়া মদন্তো মিতজ্ঞবো বরিমন্না পৃথিব্যাঃ।
আদিত্যস্য ব্রতমুপক্ষিয়ন্তো বয়ং মিত্রস্য সুমতৌ স্যাম।। ৩
অয়ং মিত্রো নমস্যঃ সুশেবো রাজা সুক্ষত্রো অজনিষ্ট বেধাঃ।
তস্য বরং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম।। ৪
মহা আদিত্যো নমসোপসদ্যো যাতযজ্জনো গৃণতে সুশেবঃ।
তস্মা এতৎ পন্যতমায় জুষ্টমগ্নৌ মিত্রায় হবিরা জুহোত।। ৫
মিত্রস্য চর্ষনীধৃতোহবো দেবস্য সাননি। দ্যুম্নং চিত্রশ্রবস্তমম্ ।। ৬
অভি যো মহিনা দিবং মিত্রো বভূব সপ্রথাঃ। অভি শ্রবোভিঃ পৃথিবীম্ ।। ৭
মিত্রায় পঞ্চ যেমিরে জনা অভিষ্টিশবসে। স দেবান্বিশ্বান্ বিভর্তি।। ৮
মিত্রো দেবেষ্বায়ুষু জনায় বৃক্তবর্হিষে। ইষ ইষ্টব্রতা অকঃ।। ৯
অর্থাৎ :
মিত্র স্তুত হয়ে লোক সকলকে কার্যে প্রবর্তিত করছেন। মিত্র পৃথিবী এবং দ্যুলোক ধারণ

করে আছেন; মিত্র অনিমেষনেত্রে লোক সকলের দিকে চেয়ে আছেন। মিত্রের উদ্দেশে ঘৃতবিশিষ্ট হব্য প্রদান কর। ১।। হে আদিত্য মিত্র ! যে মনুষ্য ব্রতানুসারে তোমাকে হব্য প্রদান করে, সে অন্নবান হোক। তুমি যাকে রক্ষা কর, তাকে কেউ বিনাশ করতে বা অভিভব করতে পারে না। পাপ দূর হতে অথবা নিকট হতে সে ব্যক্তিকে স্পর্শ করতে পারে না। ২।। আমরা রোগবর্জিত ও অন্নলাভে হৃষ্ট হয়ে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ প্রদেশে জানু পেতে সর্বত্রগামী আদিত্যের ব্রতের নিকট অবস্থিতি করছি। মিত্র যেন আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। ৩।। এ মিত্র প্রাদুর্ভূত হয়েছেন, ইনি নমস্কারযোগ্য সুন্দর মুখবিশিষ্ট রাজা ও অত্যন্ত বলবিশিষ্ট এবং সকলের বিধাতা। ইনি যজ্ঞার্হ; আমরা যেন এর অনুগ্রহ ও কল্যাণকর বাৎসল্য লাভ করতে পারি। ৪।। আদিত্য মহান, তিনি সকল লোকের প্রবর্তক, নমস্কার দ্বারা তাঁর উপাসনা করা উচিত। তিনি স্তুতিকারীর প্রতি প্রসন্নমুখ। স্তুতিযোগ্য মিত্রের প্রীতিকর এ হব্য অগ্নিতে অর্পণ কর। ৫।। মনুষ্যগণের পালক মিত্রদেবের অন্ন ও ভজনীয় ধন অত্যন্ত কীর্তিযুক্ত। ৬।। যে মিত্র নিজ মহিমায় দ্যুলোক অভিভূত করছেন, তিনি কীর্তিযুক্ত হয়ে পৃথিবীকে প্রচুর অন্নবিশিষ্টা করেছেন। ৭।। পঞ্চজন, শত্রুজয়ক্ষম বলবিশিষ্ট মিত্রের উদ্দেশে হব্য প্রদান করেছেন, তিনি সমস্ত দেবগণকে ধারণ করছেন। ৮।। মিত্র, দেব ও মনুষ্যদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি কৃশচ্ছেদ করেছে, তাকে কল্যাণকর অন্ন প্রদান করেন। ৯।।

ঋগ্বেদের অন্যান্য নজির থেকে কোনো কোনো বিদ্বান গবেষক অনুমান করতে চেয়েছেন যে, বৈদিক কবিদের কল্পনায় মিত্র আসলে সৌরদেবতা– মিত্রের স্তুতি আসলে সূর্যেরই স্তুতি। যদিও মূর্ততম সূর্যদেবতা হিসেবে ঋগ্বেদের দশটি পূর্ণাঙ্গ সূক্তে সূর্যেরই স্তুতি আছে, তা ছাড়াও বহু জায়গায় সূর্যের স্তুতি দেখা যায়, তবুও এটা উল্লেখ্য যে, ঋগ্বেদের সর্বত্রই সূর্য প্রকৃত দেবতা বলে কল্পিত নয়; বরং বহু দৃষ্টান্তেই বৈদিক কবিরা আকাশের মূর্ত সূর্যটিকে নিয়েই বহু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। যেমন–

ন তে অদেবঃ প্রদিবৌ নি বাসতে যদেতশেভিঃ পতরৈ রথর্যসি।
প্রাচীনমন্যদনু বর্ততে রজ উদন্যেন জ্যোতিষা যাসি সূর্য।। (ঋগ্বেদ-সূর্যসূক্ত-১০/৩৭/৩)।
যেন সূর্য জ্যোতিষা বাধসে তমো জগচ্চ বিশ্বমুদিয়র্ষি ভানুনা।
তেনাস্মদ্বিশ্বামনিরামনাহুতিমপামীবামপ দুঃস্বপ্ন্যাং সুব।। (ঋগ্বেদ-১০/৩৭/৪)।
দিবো রুক্ম উরুচক্ষা উদেতি দূরে অর্থস্তরণির্ভ্রাজমানঃ।
নূনং জনাঃ সূর্যেণ প্রসূতা অয়ন্নর্থানি কৃণবন্নপাংসি।। (ঋগ্বেদ-৭/৬৩/৪)।
অর্থাৎ :
হে সূর্যদেব ! যখন তুমি বেগবান ঘোটক রথে যোজনাপূর্বক আকাশ পথে গমন কর তখন কোনও দেবরহিত জীব তোমার নিকটে আসতে পায় না। তোমার সে চিরপরিচিত অসাধারণ জ্যোতি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যায়, সে অসাধারণ জ্যোতি ধারণপূর্বক তুমি উদয় হও। (ঋক-১০/৩৭/৩)।। হে সূর্যদেব ! যে জ্যোতির দ্বারা তুমি অন্ধকার নষ্ট কর এবং যে কিরণের দ্বারা সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ কর, তার দ্বারা আমাদের সর্বপ্রকার দারিদ্র্য নষ্ট কর;

আমাদের পাপ ও রোগ ও দুঃস্বপ্ন দূর কর। (ঋক-১০/৩৭/৪)।। এই দূরগামী, ত্রাণকর্তা, দীপ্তিমান সূর্য শোভমান ও প্রভূত তেজবিশিষ্ট হয়ে অন্তরিক্ষ হতে উদিত হচ্ছেন। প্রাণিগণ নিশ্চয়ই সূর্যকর্তৃক প্রসূত হয়ে অনুষ্ঠেয় কর্ম করে থাকে। (ঋক-৭/৬৩/৪)।।

সূর্যের কিরণ বিস্তার নিয়ে নানা রকম উচ্ছ্বসিত বর্ণনা ঋগ্বেদে দেখা যায়, সূর্যের প্রভাবে অন্ধকার কীভাবে বিদূরিত হয় সে বিষয়েও নানা উপমা চোখে পড়ে। যেমন–
বহিষ্ঠেভি র্বিহরন্যাসি তন্তুমবব্যয়ন্নসিতং দেব বস্ম।
দবিধুতো রশ্ময়ঃ সূর্যস্য চর্মেবাবাধুস্তমো অপ্সন্তঃ।। (ঋগ্বেদ-৪/১৩/৪)।
উদু ত্যচ্চক্ষুর্মহি মিত্রয়োরা এতি প্রিয়ং বরুণয়োরদব্ধম্ ।
ঋতস্য শুচি দর্শতমনীকং রুক্মো ন দিব উদিতা ব্যদ্যৌৎ।। (ঋগ্বেদ-৬/৫১/১)।
অর্থাৎ :
হে দ্যুতিমান সূর্য ! তুমি তন্তুরূপরশ্মি সমূহ বিস্তার করে কৃষ্ণবর্ণা রাত্রিকে তিরোহিত করে অত্যন্ত বহন সমর্থ অশ্বে আরোহণ পূর্বক গমন করছ। কম্পনযুক্ত সূর্যরশ্মিসমূহ অন্তরীক্ষ মধ্যে চর্মের ন্যায় স্থিত অন্ধকার দূর করে। (ঋক-৪/১৩/৪)।। সূর্যের প্রসিদ্ধ, প্রকাশক, বিস্তৃত, মিত্র ও বরুণের প্রিয়, অপ্রতিহত, নির্মল ও মনোজ্ঞ দীপ্তি প্রকাশিত হয়ে অন্তরীক্ষের ভূষণবৎ শোভা পাচ্ছে। (ঋক-৬/৫১/১)।।

সূর্যকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত এ-জাতীয় কবিত্বের মধ্যে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার পরিচয় অন্বেষণ করা নিশ্চয়ই অবান্তর। এবং বলা বাহুল্য, আকাশের ওই পরমাশ্চর্য তেজোময় বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি প্রাচীন বৈদিক কবিদের কাছে প্রত্যাশাও করা যায় না; অতএব তাঁরা সূর্য নিয়ে অনেক রকম কল্পনা করেছেন, যার সবই পৌরাণিক কাহিনী মাত্র। যেমন–
যত্রা চক্রুরমৃতা গাতুমস্মৈ শ্যেনো ন দীয়ন্নন্বেতি পাথঃ।
প্রতি বাং সূর উদিতে বিধেম নমোভির্মিত্রাবরুণোত হব্যৈঃ।। (ঋগ্বেদ-৭/৬৩/৫)।
উদপপ্তদসৌ সূর্যঃ পুরু বিশ্বানি জূর্বন্ ।
আদিত্যঃ পর্বতেভ্যো বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা।। (ঋগ্বেদ-১/১৯১/৯)।।
বিভ্রাড়বৃহৎ পিবতু সোমং মধ্বায়ুর্দধদ্যজ্ঞপতাববিহ্রুতম্ ।
বাতজূতো যো অভিরক্ষতি ত্বনা প্রজাঃ পুপোষ পুরুধা বি রাজতি।। (ঋগ্বেদ-১০/১৭০/১)।
বিভ্রাড়বৃহৎসুভৃতং বাজসাতমং ধর্মন্দিবো ধরুণে সত্যমর্পিতম্ ।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহন্তমং জ্যোতির্জজ্ঞে অসুরহা সপত্নহা।। (ঋগ্বেদ-১০/১৭০/২)।
অর্থাৎ :
মরণরহিত দেবগণ যে স্থলে এ সূর্যের জন্য পথ করেছিলেন, উড়ন্ত ক্ষীপ্রগামী শ্যেন পক্ষি বা গৃধ্রের ন্যায় সে পথ অন্তরীক্ষকে অনুগমন করে। হে মিত্র ও বরুণ ! সূর্য উদিত হলে নমস্কার ও হব্যদ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করবো। (ঋক-৭/৬৩/৫)।। সূর্য প্রচুর পরিমাণে সমস্ত বিষ নাশ করে উদয় হচ্ছেন। সর্বদর্শী, অদৃষ্টদের বিনাশক আদিত্য জীবলোকের মঙ্গলের জন্য উদিত হচ্ছেন। (ঋক-১/১৯১/৯)।। অতি দীপ্তিশালী সূর্যদেব মধুতুল্য সোমরস

পান করুন, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির প্রকৃষ্ট পরমায়ু বিধান করুন। তিনি বায়ু দ্বারা প্রেরিত হয়ে প্রজাদের স্বয়ং রক্ষা করেন, প্রজাবর্গের পুষ্টি বিধান করেন এবং অশেষ প্রকারে শোভা পান। (ঋক-১০/১৭০/১)।। সূর্যরূপ আলোকময় পদার্থ উদয় হচ্ছে; এই প্রকাণ্ড অতিদীপ্তিশালী, উত্তমরূপে সংস্থাপিত, এর মত অন্নদান কেউ করে না; এ আকাশের অবলম্বনের উপর যথাযোগ্যরূপে সংস্থাপিত হয়ে আকাশকে আশ্রয় করে আছে। এ শত্রুনিধন করে, বৃত্রকে বধ করে, দস্যুদের প্রধান নিধনকারী, অসুরদের বধকারী, বিপক্ষদের সংহারকারী। (ঋক-১০/১৭০/২)।।

সূর্যের জন্ম নিয়েও বৈদিক কবিদের অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা রয়েছে; কিন্তু তাও সবই পৌরাণিক কাহিনীই।

.
সবিতৃ দেবতা :
ঋগ্বেদের আর একটি সৌর-দেবতার নাম সবিতৃ বা সবিতা। এগারোটি পূর্ণাঙ্গ সূক্তে তাঁর স্তুতি দেখা যায়। বৈদিক কবিদের বর্ণনায় তাঁর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল বা সুবর্ণময়ত্ব– অর্থাৎ তাঁর বাহু সুবর্ণময়, জিহ্বা সুবর্ণময়, চক্ষু সুবর্ণময়, এমনকি তাঁর রথও সুবর্ণময়। ঋগ্বেদের কোন ঋকে বলা হয়েছে সবিতা সূর্যের কিরণে কিরণযুক্ত এবং উজ্জ্বল কেশবিশিষ্ট। যেমন–

সূর্যরশ্মির্হরিকেশঃ পুরস্তাৎ সবিতা জ্যোতিরুদয়া অজস্রম্ ।
তস্য পূষা প্রসবে যাতি বিদ্বান্ত্ সম্পশ্যন্বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/১৩৯/১)।
উত যাসি সবিতস্ত্রীণি রোচনোত সূর্যস্য রশ্মিভিঃ সমুচ্যসি।
উত রাত্রীমুভয়তঃ পরীয়স উত মিত্রো ভবসি দেব ধর্মভিঃ।। (ঋগ্বেদ-৫/৮১/৪)।
অর্থাৎ :
দেবসবিতা সূর্যের কিরণে কিরণযুক্ত, উজ্জ্বল কেশবিশিষ্ট, তিনি পূর্বদিকে ক্রমাগত আলোকের উদয় করতে থাকেন। তাঁর জন্ম হলে পূষাদেব অগ্রসর হন, ইনি জ্ঞানী, সমস্ত ভুবন দর্শন ও রক্ষা করেন। (ঋক-১০/১৩৯/১)।। হে সবিতা ! তুমি তিন দীপ্ত ভুবন পরিভ্রমণ কর। অথবা সূর্যের রশ্মিদ্বারা সঙ্গত হও। কিংবা তুমি উভয় পার্শ্বের রাত্রির মধ্য দিয়ে যাও। অথবা হে দেব ! তুমি তোমার কার্যদ্বারা মিত্র হও। (ঋক-৫/৮১/৪)।।

সূর্যের সঙ্গে সবিতার পার্থক্য বর্ণনা করে ভাষ্যকার সায়ণ (ঋক-৫/৮১/৪) ভাষ্যে বলেন, উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি তাই সবিতা, আর উদয় হতে অস্তগমন পর্যন্ত যে মূর্তি তাই সূর্য। আবার ঋগ্বেদের একটি সূক্তে (ঋগ্বেদ-সূক্ত-২/৩৮) অস্তমান সূর্যই সবিতা বলে স্তুত হয়েছে, এবং এই সূক্তেই সবিতার কর্মের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে–

উদু ষ্য দেবঃ সবিতা সবায় শশ্বত্তমং তদপা বহ্নিরস্থাৎ।
নূনং দেবেভ্যো বি হি ধাতি রত্নমথাভজদ্বীতিহোত্রং স্বস্তৌ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৮/১)।

বিশ্বস্য হি শ্রুষ্টয়ে দেব ঊর্ধ্বঃ প্র বাহবা পৃথুপাণিঃ সিসর্তি।
আপশ্চিদস্য ব্রত আ নিমৃগ্রা অয়ং চিদ্বাতো রমতে পরিজ্মন্ ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৮/২)।
আশুভিশ্চিদ্যান্বি মুচাতি নূনমরীরমদতমানং চিদেতোঃ।
অহ্যর্ষূণাং চিন্ন্যয়া অবিষ্যামনু ব্রতং সবিতু র্মোক্যাগাৎ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৮/৩)।
পুনঃ সমব্যদ্বিততং বয়ন্তী মধ্যা কর্তো র্ন্যধাচ্ছক্ম ধীরঃ।
উৎসংহায়াস্থাদ্ব্যতূ রদর্ধররমতিঃ সবিতা দেব আগাৎ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৮/৪)।
অর্থাৎ :
দ্যুতিমান জগৎবাহক সবিতা জগৎ প্রসবের জন্য প্রতিদিন উদয় হন; এটাই তাঁর কর্ম। তিনি স্তোতাগণকে রত্ন প্রদান করেন এবং সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট যজমানকে মঙ্গলভাগী করেন। (ঋক-২/৩৮/১)।। বিস্তীর্ণ হস্তবিশিষ্ট দ্যুতিমান সবিতা জগতের আনন্দের জন্য উদিত হয়ে বাহু প্রসারিত করেন। তাঁর কর্মের জন্য অত্যন্ত পাবন জলসমূহ প্রবাহিত হয় এবং এ বায়ুও সর্বতোব্যাপী অন্তরীক্ষে বিহার করে। (ঋক-২/৩৮/২)।। গমন করতে করতে সবিতা যখন শীঘ্রগামী রশ্মি কর্তৃক বিমুক্ত হন, তখন তিনি নিরন্তর পথগামী ব্যক্তিকেও গমন হতে বিরত করেন। যারা শত্রুর বিরুদ্ধে যায় তাদেরও গমনেচ্ছা নিবৃত্ত করেন। সবিতার কর্মের পর রাত্রি আসেন। (ঋক-২/৩৮/৩)।। বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর ন্যায় রাত্রি পুনর্বার আলোককে সম্যকরূপে বেষ্টন করছেন, প্রজ্ঞাবান লোক যে কর্ম করছিল, তা করতে সক্ষম হলেও মধ্যস্থলে রেখে দিচ্ছে। বিরামরহিত ও ঋতুর বিভাগকর্তা দ্যোতমান সবিতা যখন পুনরায় উদিত হন, তখন লোক শয্যা ত্যাগ করে ওঠে। (ঋক-২/৩৮/৪)।।

আরেকটি ঋকে বলা হচ্ছে, সবিতা প্রতিদিবসে জগৎকে স্ব স্ব কার্যে স্থাপন করেন। যেমন–
আপ্রা রজাংসি দিব্যানি পার্থিবা শ্লোকং দেবঃ কৃণুতে স্বায় ধর্মণে।
প্র বাহু অস্রাক্-সবিতা সবীমনি নিবেশয়ন্ প্রসুবন্নক্তুভির্জগৎ।। (ঋগ্বেদ-৪/৫৩/৩)।
অর্থাৎ :
সবিতাদেব তেজদ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবী লোককে পরিপূর্ণ করেন এবং স্বীয় কার্যের প্রশংসা করেন। তিনি প্রতিদিবস জগৎকে স্ব স্ব কার্যে স্থাপন ও প্রেরণ করে সৃজনকার্যে বাহু প্রসারিত করেন।

এবং ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সূর্য-স্তুতিমূলক একটি সূক্তে (ঋগ্বেদ-সূক্ত-১০/১৫৮) দেখা যায়, সূর্যদেবতাকে কখনও সূর্য বলা হয়েছে, কখনও সবিতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই সূক্তের কবি হলেন চক্ষু ঋষি। যেমন–
সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ। অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ।। ১
জোষা সবিতর্ষস্য তে হরঃ শতং সবা অর্হতি। পাহি নো দিদ্যুতঃ পতন্ত্যাঃ।। ২
সুসন্দৃশং ত্বা বয়ং প্রতি পশ্যেম সূর্য। বি পশ্যেম নৃচক্ষসঃ।। ৫
অর্থাৎ :
সূর্য আমাদের স্বর্গের উপদ্রব হতে, বায়ু আকাশের উপদ্রব হতে এবং অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব

হতে রক্ষা করুন। ১।। হে সবিতা ! আমাদের পূজা গ্রহণ কর। তোমার যে তেজ, তার উদ্দেশে একশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত, শত্রুদের যে সকল উজ্জ্বল অস্ত্র এসে পড়ছে, তা হতে আমাদের রক্ষা কর। ২।। হে সূর্য ! তোমাকে যেন আমরা অতি উৎকৃষ্টরূপে দর্শন করতে পারি আর মনুষ্যগণ যা দেখতে পায়, তা যেন আমরা বিশেষ ভাবে দর্শন করতে পারি। ৫।।

.

পূষা দেবতা :

পূষন্ বা পূষাকেও বিদ্বান গবেষকরা সৌরদেবতা বলেই বিবেচনা করেন। দৃষ্টান্ত বিশেষে তাঁর বর্ণনায় যে-সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সূর্যের বর্ণনাতেও প্রায় হুবহু সেই শব্দগুলি পাওয়া যায়। যেমন–

শুক্রং তে অন্যদ্যজতং তে অন্যদ্বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি।
বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবো ভদ্রা তে পুষন্নিহ রাতিরস্তু।। (ঋগ্বেদ-৬/৫৮/১)।
অজাশ্বঃ পশুপা বাজপস্ত্যো ধিয়ংজিন্বো ভুবনে বিশ্বে অর্পিতঃ।
অষ্ট্রাং পূষা শিথিরামুদ্বরীবৃজৎসংচক্ষাণো ভুবনা দেব ঈয়তে।। (ঋগ্বেদ-৬/৫৮/২)।
অর্থাৎ :
হে পূষা ! তোমার এরূপ দিবা শুক্লবর্ণ ও অন্যরূপ রাত্রি কেবল যজনীয়। এরূপে দিবা ও রাত্রির রূপ বিভিন্ন প্রকার। তুমি সূর্যের ন্যায় প্রকাশক, কারণ তুমি অন্নদাতা ও সর্বপ্রকার জ্ঞান ধারণ কর, সম্প্রতি তোমার কল্যাণকর দান প্রকাশিত হোক। (ঋক-৬/৫৮/১)।। যিনি ছাগবাহন ও পশুপালক, যাঁর গৃহ অন্নপূর্ণ, তিনি স্তোতৃবর্গের প্রীতিপ্রদ। যিনি অখিল ভুবনের উপর স্থাপিত, সে দেব পূষা সূর্যরূপে ভূতজাতকে প্রকাশিত করে নিজহস্তে প্রতোদ উত্তোলন করে নভোমণ্ডলে গমন করছেন। (ঋক-৬/৫৮/২)।।

এখানে দেখা যাচ্ছে, পূষার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর রথে অশ্বের পরিবর্তে অজ বা ছাগল নিযুক্ত; অর্থাৎ তিনি ছাগবাহন। একটি ঋকে পূষার সঙ্গে সূর্য্যার (সূর্য-পত্নীর?) বিবাহ কাহিনী পাওয়া যায়। যেমন–

পূষা সুবন্ধুর্দিব আ পৃথিব্যা ইলস্পতির্মঘবা দস্মবর্চাঃ।
যং দেবাসো অদদুঃ সূর্যায়ৈ কামেন কৃতং তবসং স্বঞ্চম্ ।। (ঋগ্বেদ-৬/৫৮/৪)।
অর্থাৎ :
পূষা স্বর্গ ও পৃথিবীর শোভন বন্ধুস্বরূপ, অন্নের অধিপতি, ঐশ্বর্যশালী ও মনোজ্ঞ মূর্তি। তিনি বলশালী, স্বেচ্ছাপ্রদত্ত পশ্বাদি দ্বারা প্রসাদযোগ্য ও শোভন গমনকারী তাঁকে দেবগণ সূর্য পত্নীর নিকট সমর্পণ করেছিলেন।

অন্যত্র আবার পূষার সঙ্গে স্বীয় মাতার এবং স্বীয় ভগিনীরও এ-জাতীয় প্রণয়ী সম্পর্ক পরিকল্পিত হতে দেখা যায়। যেমন–

পূষণং ন্বজাশ্বমুপ স্তোষাম বাজিনং। স্বসুর্যো জার উচ্যতে।। (ঋগ্বেদ-৬/৫৫/৪)।
মাতুর্দিধিষুমব্রবং স্বসুর্জারঃ শৃণোতু নঃ ! ভ্রাতেন্দ্রস্য সখা মম।। (ঋগ্বেদ-৬/৫৫/৫)।
অর্থাৎ :
অদ্য আমরা ছাগবাহন, অন্নসম্পন্ন সে পূষার স্তব করছি, যাঁকে লোকে তাঁর ভগিনী অর্থাৎ ঊষার জার বা প্রণয়ী বলে থাকে। (ঋক-৬/৫৫/৪)।। রাত্রিরূপ মাতার পতিদেব পূষার স্তব করছি। তাঁর ভগিনীর জার (প্রণয়ী বা উপপতি) পূষা আমাদের স্রোত্র শুনুন। ইন্দ্রের সহোদর পূষা যেন আমাদের মিত্র হন। (ঋক-৬/৫৫/৫)।।

স্বীয় মাতা ও ভগিনীর সাথে পতি বা প্রণয়ীর সম্পর্ক-জাতীয় অজাচার-মূলক কল্পনা বৈদিক কবিদের আদিম অবস্থারই পরিচয় বহন করে। অবশ্য ঋগ্বেদে অগ্নি এবং সূর্য প্রসঙ্গেও এ-জাতীয় কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন–
কৃষ্ণাং যদেনীমভি বর্পসা ভূজ্জনয়ন্যোষাং বৃহতঃ পিতুর্জাম্ ।
উর্ধ্বং ভানুং সূর্যস্য স্তভায়ন্ দিবো বসুভিররতির্বি ভাতি।। (ঋগ্বেদ-১০/৩/২)।
ভদ্রো ভদ্রয়া সচমান আগাৎ স্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।
সুপ্রকেতৈর্দ্যুভিরগ্নির্বিতিষ্ঠন্রুশদ্ভির্বর্ণৈরভি রামমস্থাৎ।। (ঋগ্বেদ-১০/৩/৩)।
সূর্যো দেবীমুষসং রোমোনাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পাচাৎ।
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/১১৫/২)।
অর্থাৎ :
এ অগ্নি পলায়নোদ্যত কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে পরাভব করলেন, সেই বৃহৎ পিতা অর্থাৎ সূর্যের পত্নী উষাদেবীকে জন্ম দান করলেন। তিনি উর্ধ্বে আলোক বিস্তার করে সূর্যের কিরণ আচ্ছাদনপূর্বক গগনবিসারী নিজ তেজের দ্বারা সুশোভিত হয়েছেন। (ঋক-১০/৩/২)।। অগ্নি নিজে সুরূপ, সুরূপা দীপ্তির সাথে সমাগত হয়ে আসছেন, তিনি উপপতির ন্যায় ঊষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাচ্ছেন। উজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে তিনি আপনার শ্বেতবর্ণ কিরণসহকারে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারকে পরাভব করছেন। (ঋক-১০/৩/৩)।। মানুষ যেরূপ নারীর পশ্চাৎ গমন করে, সূর্য সেরূপ দীপ্তিমান ঊষার পশ্চাতে আসছেন; এ সময়ে দেবতাকাঙ্ক্ষী মানুষগণ বহুযুগ প্রচলিত যজ্ঞকর্ম বিস্তার করেন, সুফলার্থে কল্যাণ কর্ম সম্পন্ন করেন। (ঋক-১/১১৫/২)।।

আবার একটি ঋক-স্তুতিতে পূষার কাছে সুশ্রী নারী পাবার কামনাও ব্যক্ত হয়েছে। যেমন–
অবিতা নো অজাশ্বঃ পূষা যামনিয়ামনি। আ ভক্ষৎকন্যাসু নঃ।। (ঋগ্বেদ-৯/৬৭/১০)।
অর্থাৎ :
পূষা নামক যে দেবতা যিনি ছাগ বাহনে গমন করেন, তিনি যেন, যখন যখন আমরা যাত্রা করি তখনই আমাদের রক্ষা করেন। তাঁর প্রসাদে যেন আমরা সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই।

তবে পূষার উদ্দেশে বৈদিক ঋষিরা যে-সব কামনা ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে একটি

প্রধানতম কামনা হলো যাত্রাপথের নিরাপত্তা। এ-প্রেক্ষিতে পূষা-স্তুতিমূলক একটি স্বতন্ত্র সূক্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এ-সূক্তের কবি হলেন ঘোর-পুত্র কণ্ব ঋষি (ঋগ্বেদ-সূক্ত-১/৪২)–

সং পূষন্নধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাৎ। সক্ষ্বা দেব প্র ণস্পূরঃ।। ১
যো নঃ পূষন্নবো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি। অপ স্ম তং পথো জহি।। ২
অপ ত্যং পরিপন্থিনং মুষীবাণং হুরশ্চিতং। দূরমধি স্রুতেরজ।। ৩
ত্বং অস্য দ্বয়াবিনোহঘশংসস্য কস্য চিৎ। পদাভি তিষ্ঠ তপুষিম্ ।। ৪
আ তত্তে দস্র মন্তুমঃ পূষন্নবো বৃণীমহে। যেন পিতৃনৃচোদয়ঃ।। ৫
অধা নো বিশ্বসৌভগ হিরণ্যবাশীমত্তম। ধনানি সুষণা কৃষি।। ৬
অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ।। ৭
অভি সূযবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ।। ৮
শগ্ধি পূর্ধি প্র যংসি চ শিশীহি প্রাস্যুদরম্ । পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ।। ৯
ন পূষণং মেথামসি সূক্তৈরভি গৃণীমসি। বসুণি দসামীমহে।। ১০

অর্থাৎ :

হে পূষা ! পথ পার করিয়ে দাও, (বিঘ্নহেতু) পাপ বিনাশ কর; হে মেঘপুত্র দেব ! আমাদের অগ্রে যাও। ১।। হে পূষা ! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী যে কেউ আমাদের (বিপরীত পথ) দেখিয়ে দেয়, তাকে পথ হতে দূর করে দাও। ২।। সেই মার্গ প্রতিবন্ধক তস্কর কুটিলাচারীকে পথ হতে দূরে তাড়িয়ে দাও। ৩।। যে কেউ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ই হরণ করে এবং অনিষ্টসাধন ইচ্ছা করে, হে পূষা ! তার পরসন্তাপক দেহ তোমার পদের দ্বারা দলিত কর। ৪।। হে শত্রুবিনাশী ও জ্ঞানবান পূষা ! যেরূপ রক্ষণাদ্বারা পিতৃগণকে উৎসাহিত করেছিলে, তোমার সে রক্ষণা প্রার্থনা করছি। ৫।। হে সর্বধনসম্পন্ন, অনেক সুবর্ণায়ুধযুক্ত লোকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূষা ! তুমি অনন্তর ধনসমূহ দানে পরিণত কর। ৬।। বিঘ্নকারী শত্রুদের অতিক্রম করে আমাদের নিয়ে যাও, সুখগম্য শোভনীয় পথদ্বারা আমাদের নিয়ে যাও; হে পূষা ! তুমি এ পথে আমাদের রক্ষণের উপায় কর। ৭।। শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদের নিয়ে যাও, পথে যেন নতুন সন্তাপ না হয়। হে পূষা ! তুমি এ (পথে) আমাদের রক্ষণের উপায় কর। ৮।। (আমাদের অনুগ্রহ করতে) সক্ষম হও, আমাদের গৃহ ধনে পরিপূর্ণ কর, অভীষ্টবস্তু দান কর; আমাদের তীক্ষ্ণতেজা কর, আমাদের উদর পূরণ কর; হে পূষা ! তুমি এ পথে আমাদের রক্ষণের উপায় কর। ৯।। আমরা পূষাকে নিন্দা করি না, সূক্ত দ্বারা স্তুতি করি, আমরা দর্শনীয় পূষার নিকট ধন যাচঞা করি। ১০।।

.

বিষ্ণু দেবতা :

দ্যুলোকের আর একটি দেবতার নাম বিষ্ণু। পরবর্তীকালে এই দেবতাটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করলেও ঋগ্বেদে তাঁর স্থান কিন্তু অবশ্যই গৌণ। তবে বিষ্ণু প্রসঙ্গে বৈদিক কবিদের প্রধানতম কল্পনা হলো তাঁর পদক্ষেপ। যেমন–

দ্বে ইদস্য ক্রমণেস্বর্দৃশোহভিখ্যায় মর্ত্যো ভুরণ্যতি।

তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি ধয়শ্চন পতয়ন্তঃ পতত্রিণঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১৫৫/৫)।
ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমুলহমস্য পাংসুরে।। (ঋগ্বেদ-১/২২/১৭)।
ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণু র্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্মাণি ধারয়ন্ ।। (ঋগ্বেদ-১/২২/১৮)।
প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরোগিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা।। (ঋগ্বেদ-১/১৫৪/২)।
অর্থাৎ :
মনুষ্যগণ স্বর্গদর্শী বিষ্ণুর দুই পাদক্ষেপ কীর্তন করে প্রাপ্ত হয়। তাঁর তৃতীয় পাদক্ষেপ মনুষ্যগণ ধারণা করতে পারে না, উড্ডীয়মান পক্ষবিশিষ্ট পক্ষীগণও প্রাপ্ত হয় না। (ঋক-১/১৫৫/৫)।। বিষ্ণু এ জগৎ পরিক্রমা করেছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করেছিলেন, তাঁর ধূলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হয়েছিল। (ঋক-১/২২/১৭)।। বিষ্ণু রক্ষক, তাঁকে কেহ আঘাত করতে পারে না, তিনি ধর্ম সমুদয় ধারণ করে তিন পদ পরিক্রমা করেছিলেন। (ঋক-১/২২/১৮)।। যেহেতু বিষ্ণু তিন পদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে অতএব ভয়ঙ্কর, হিংস্র, গিরিশায়ী আরণ্য জন্তুর ন্যায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে। (ঋক-১/১৫৪/২)।।

বেদে বিষ্ণুর এই তিন প্রকার পদবিক্ষেপ কী? এ-প্রেক্ষিতে প্রায় সকল বিদ্বান ও গবেষকেরা অনুমান করতে চেয়েছেন, বৈদিক কবিরা সূর্যের গতিকেই এইভাবে বিষ্ণুর পদক্ষেপ বা ত্রিপাদগমন বলে কল্পনা করেছেন। এই ত্রিপাদ অর্থে সম্ভবত সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহণ অর্থাৎ সূর্যের উদয়, মধ্য আকাশে স্থিতি অর্থাৎ মধ্যাহ্নপ্রখরতা এবং অস্তাচলে অস্তগমন। যদিও অন্যরা অনুমান করেন কবিরা এইভাবে সূর্যের ত্রিলোক-ভ্রমন কল্পনা করেছিলেন। পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থে বিষ্ণুর এই ত্রিপাদ-ভ্রমণ সংক্রান্ত প্রাচীন কল্পনা নানা আখ্যায়িকা ও অনুষ্ঠানের সংযুক্ত হয়ে পল্লবিত ও জটিল রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু বিষ্ণু যে সূর্যেরই সমস্থানীয় দেবতা কিংবা ঋতুর নিয়ামক দেবতা সূর্যই, তা ঋগ্বেদের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত থেকে অনুমিত হয়–

চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্কভির্যুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/১৫৫/৬)।
অর্থাৎ :
বিষ্ণু গতিবিশেষ দ্বারা বৎসরের চতুর্নবতি দিবস চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করেছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট ও স্তুতিদ্বারা পরিমেয়, তিনি নিত্য তরুণ ও অকুমার, তিনি আহবে গমন করেন।

পণ্ডিতেরা ‘চতুর্ভিঃ নবতিং’ অর্থে চারগুণ নব্বই অর্থাৎ বৎসরের ৩৬০ দিন করেছেন। অর্থাৎ বিষ্ণু বৎসরের চারটি নবতি বা নব্বই দিবস সমষ্টিকে বৃত্তাকারে পরিচালিত করেন। সম্ভবত তখন চারটি ঋতু স্বীকার করা হতো। প্রতি ঋতুর স্থায়িত্ব নব্বই দিবস করে। এরকম চারটি নব্বই দিবসের সমষ্টি নিয়ে বৎসরের চক্র। কাজেই বিষ্ণু ঋতুর নিয়ামক দেবতা। এদিক

থেকে দেখলে তিনি সূর্য কিংবা সূর্যেরই সমস্থানীয় হয়ে দাঁড়ান। তাই পরবর্তীকালের বিষ্ণুকে নিয়ে যতো পৌরাণিক কল্পনাই পল্লবিত হোক না কেন, মনে রাখা দরকার, সূর্যের গতি বহুবিধ পার্থিব কামনা সফল করে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই প্রকৃত প্রাচীন কবিরা বিষ্ণুর ওই পদক্ষেপ সংক্রান্ত অমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। যেমন–

যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চিদ্বিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়।
তস্য তে শর্মন্নুপদদ্যমানে রায়া মদেম তন্বাহতনা চ।। (ঋগ্বেদ-৬/৪৯/১৩)।
তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসীনস্য ত্রাতুরবৃকস্য মীড়্হুষঃ।
য পার্থিবানি ত্রিভিরিদ্বিগামভিরুরুক্রমিষ্টোরুগায়ায় জীবসে।। (ঋগ্বেদ-১/১৫৫/৪)।
ইন্দ্রাবিষ্ণু তৎপনয়ায্যং বাং সোমস্য মদ উরূ চক্রমাথে।
অকৃণুতমন্তরিক্ষং বরীয়োহপ্রথতং জীবসে নো রজাংসি।। (ঋগ্বেদ-৬/৬৯/৫)।
ইন্দ্রাবিষ্ণু হবিষা বাবৃধানাগ্রাদ্বানা নমসা রাতহব্যা।
ঘৃতাসুতী দ্রবিণং ধত্তমস্মে সমুদ্রঃ স্থঃ কলশঃ সোমধানঃ।। (ঋগ্বেদ-৬/৬৯/৬)।
অর্থাৎ :
যে বিষ্ণু উপদ্রুত মনুর নিমিত্ত ত্রিপাদ বিক্রম দ্বারা পার্থিব লোক পরিমাণ করেছিলেন, সে তোমার দেওয়া গৃহে অবস্থানপূর্বক আমরা যেন ধন, দেহ ও পুত্রদ্বারা আনন্দ অনুভব করি। (ঋক-৬/৪৯/১৩)।। আমরা সকলের স্বামী, পালন কর্তা, শত্রু রহিত ও সেচন সমর্থ বিষ্ণুর পৌরুষের স্তুতি করি। তিনি প্রশংসনীয় লোক রক্ষার নিমিত্ত ত্রিসংখ্যক পদবিক্ষেপদ্বারা পার্থিব লোক সকল বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রম করেছিলেন। (ঋক-১/১৫৫/৪)।। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু ! সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হলে তোমরা বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রমণ কর, তোমরা অন্তরীক্ষকে অত্যন্ত বিস্তীর্ণ করেছ এবং লোকসমূহকে আমাদের জীবনের জন্য প্রথিত করেছ। তোমাদের সে কর্মসমূহ স্তুতিযোগ্য। (ঋক-৬/৬৯/৫)।। হে ঘৃতান্নবিশিষ্ট ইন্দ্র ও বিষ্ণু ! তোমরা সোমদ্বারা বর্ধিত হয়ে থাক এবং সোমাগ্র ভোজন করে থাক; যজমানগণ নমস্কার পূর্বক তোমাদের হব্য দান করে, তোমরা আমাদের ধন দান করা। তোমরা উদধির ন্যায়, তোমরা সোমনিধান কলস স্বরূপ। (ঋক-৬/৬৯/৬)।।

.

দেবতা আদিত্যগণ :
বৈদিক সাহিত্যে তথা ঋগ্বেদে আদিত্যগণের পরিকল্পনা বেশ চিত্তাকর্ষক। প্রথমত, একটি দেবতা নয়– একাধিক দেবতার সমষ্টিকে এই নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কবির কল্পনায় তাঁদের সংখ্যা ছয় (ঋগ্বেদ-২/২৭/১), কোনো কবির কল্পনায় সাত (ঋগ্বেদ-৯/১১৪/৩), আবার কারো কল্পনায় আট (ঋগ্বেদ-১০/৭২/৮)। যেমন–

ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নুঃ সনাদ্রাজভ্যো জুহ্বা জুহোমি।
শৃণোতু মিত্রো অর্যমা ভগো নস্তুবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ।। (ঋগ্বেদ-২/২৭/১)।
সপ্ত দিশো নানাসূর্যাঃ সপ্ত হোতার ঋত্বিজঃ।
দেবা আদিত্য যে সপ্ত তেভিঃ সোভাভি রক্ষ ন ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।। (ঋগ্বেদ-৯/১১৪/৩)।

অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্যে জাতাস্তন্ব স্পরি।
দেবা উপ প্রৈৎসপ্তভিঃ পুরা মার্তান্ডমাস্যৎ।। (ঋগ্বেদ-১০/৭২/৮)।।
অর্থাৎ :
আমি জুহুদ্বারা সর্বদা শোভমান আদিত্যগণের উদ্দেশে ঘৃতস্রাবী স্তুতি অর্পণ করছি। মিত্র, অর্যমা, ভগ, বহুব্যাপী বরুণ, দক্ষ ও অংশ আমার স্তুতি শুনুন। (ঋক-২/২৭/১)।। অনেক সূর্যের অধিষ্ঠানস্বরূপ যে সাত দিক আছে এবং হোমকর্তা যে সাতজন পুরোহিত আছেন এবং সাতজন যে আদিত্যগণ আছেন, হে সোম ! তাদের সাথে আমাদের রক্ষা কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। (ঋক-৯/১১৪/৩)।। অদিতির দেহ হতে আট পুত্র জন্মেছিলেন, তিনি তন্মধ্যে সাতটি নিয়ে দেবলোকে গেলেন কিন্তু মার্তণ্ড নামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করলেন। (ঋগ্বেদ-১০/৭২/৮)।।

অদিতির সন্তান হিসেবে এই দেবগণের নাম হয়েছে আদিত্য। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে আদিত্যগণের সংখ্যা নিয়ে যেমন ভিন্নতা দেখা যায়, তেমনি এই দেবগোষ্ঠির অন্তর্গত দেবতাদের নামের তালিকাও সর্বত্র সমান নয়। শতপথ ব্রাহ্মণে এবং পুরাণ ও মহাভারতে দ্বাদশ আদিত্যের নাম আছে। ঋগ্বেদের উপরে উল্লিখিত ঋকে (ঋক-২/২৭/১) তালিকায় আদিত্যগণের নাম হলো- মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। কিন্তু অথর্ববেদে (অথর্ব-৮/৯/২১) আটজন আদিত্যের নাম উল্লিখিত হয়েছে– মিত্র, বরুণ, অর্যমা, অংশ, ভগ, ধাতৃ, ইন্দ্র ও বিবস্বৎ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আটজন আদিত্যের উল্লেখ রয়েছে, যথা– ধাতা, অর্যমা, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্ । আবার শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের কথা উল্লেখ রয়েছে, এবং সেই দ্বাদশ মাস, যেমন–

'কতমে আদিত্যা ইতি। দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।' (শতপথ ব্রাহ্মণ-১১/৬/৩/৮)
অর্থাৎ : আদিত্য কারা? সংবৎসরের দ্বাদশ মাস হলো দ্বাদশ আদিত্য (মুক্ত-তর্জমা)।

ঋগ্বেদে ছয় বা সাতজন আদিত্যের নাম উল্লেখ করা হলেও অবশ্য ঋগ্বেদের অন্যত্র সূর্য (ঋগ্বেদ-১০/৮৮/১১), সবিতৃ (ঋগ্বেদ-৮/১৮/৩), ইন্দ্র (ঋগ্বেদ-৭/৮৫/৪) প্রভৃতিকেও আদিত্য বলা হয়েছে। যেমন–

যদেদেনমদধুর্যজ্ঞিয়াসো দিবি দেবাঃ সূর্যমাদিতেয়ম্ ।
যদা চরিষ্ণু মিথুনাবভূতামাদিৎ প্রাপশ্যন্ ভুবনানি বিশ্বা।। (ঋগ্বেদ-১০/৮৮/১১)।
তৎসু নঃ সবিতা ভগো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
শর্ম যচ্ছন্তু সপ্রথো যদীমহে।। (ঋগ্বেদ-৮/১৮/৩)।
স সুক্রতুর্ঋতচিদস্তু হোতা য আদিত্য শবসা বাং নমস্বান্ ।
আববর্তদবসে বাং হবিষ্মানসদিৎস সুবিতায় প্রযস্বান্ ।। (ঋগ্বেদ-৭/৮৫/৪)।
অর্থাৎ :
যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা যখন এ অগ্নিকে আর অদিতি-পুত্র সূর্যকে আকাশে স্থাপন করলেন,

যখন তাঁরা উভয়ে যুগ্মরূপী হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন তখন সকল প্রাণিবর্গ তাঁদের দেখতে পেল। (ঋক-১০/৮৮/১১)।। আমরা যে বিস্তীর্ণ সুখ যাচঞা করি, সবিতা, ভগ, মিত্র, বরুণ ও অর্যমা (এই আদিত্যগণ) আমাদের সে সুখ প্রদান করুন। (ঋগ্বেদ-৮/১৮/৩)।। হে আদিত্যদ্বয় (ইন্দ্র ও বরুণ) ! তোমরা বলশালী, যে নমস্কারযুক্ত হয়ে তোমাদের পরিচর্যা করে, সে শোভনকর্মবিশিষ্ট হোতা ঋতজ্ঞ হোন। যে হব্যযুক্ত ব্যক্তি তৃপ্তির জন্য তোমাদের আবর্তিত করে, সে অন্নবান হয়ে একান্ত প্রাপ্তব্য ফল লাভ করে। (ঋক-৭/৮৫/৪)।।

পরবর্তীকালে যদিও আদিত্য বলতে প্রধানতই সূর্য; কিন্তু ঋগ্বেদে আদিত্য মানে অদিতির পুত্র। মিত্র ও বরুণের মতো প্রাচীন এবং ইন্দ্রের মতো প্রধান বৈদিক দেবতাও তাঁরই পুত্র হিসেবে কল্পিত হয়েছেন দেখে অনুমান হয় এই অদিতি কোনো সুপ্রাচীন পর্যায়ের প্রধানা দেবী ছিলেন, যদিও ঋগ্বেদ রচনার কালে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও গরিমা বহুলাংশে ম্লান হয়েছে দেখা যায়।
এখানে উল্লেখ্য, ব্যুৎপত্তিগতভাবে অদিতির অর্থ হলো, যা অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসীম, তাই অদিতি। অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি, সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী এবং নিরুক্তকার যাস্ক তাঁকে 'আদিমা দেবমাতা' বলেছেন। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে তাঁর উল্লেখ খুব একটা চোখে পড়ে না; পুত্র আদিত্যগণের সঙ্গেই তিনি প্রধানত উল্লিখিত হয়েছেন এবং এই উল্লেখের মধ্যে তাঁর মাতৃত্বই প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলে অনুমিত হয়– যেমন তিনি মিত্র ও বরুণের জননী, এবং অর্যমারও জননী, রাজাদের জননী, অভিলষিত পুত্রদের জননী, বীর পুত্রদের জননী, ইত্যাদি ইত্যাদি–
তা মাতা বিশ্ববেদসাসূর্যায় প্রমহসা। মহী জজনাদিতির্ঋতাবরী।। (ঋগ্বেদ-৮/২৫/৩)।
অদিতির্ন উরুষাত্বদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু।
মাতা মিত্রস্য রেবতোহর্যমণো বরুণস্য চানেহসো ব ঊতয়ঃ সুউতয়ো ব ঊতয়ঃ।।
(ঋগ্বেদ-৮/৪৭/৯)।
পিপর্তু অদিতী রাজপুত্রাতি দ্বেষাংস্যর্যমা সুগেভিঃ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য শর্মোপ স্যাম পুরুবীরা অরিষ্টাঃ।। (ঋগ্বেদ-২/২৭/৭)।
আ যাহ্যগ্নে সমিধানো অর্বাঙিন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেভিঃ।
বর্হি র্ন আস্তামদিতিঃ সুপুত্রা স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্ ।। (ঋগ্বেদ-৩/৪/১১)।
যুবোর্হি মাতাদিতির্বিচেতসা দ্যৌর্ন ভূমিঃ পয়সা পুপূতনি।
অব প্রিয়া দিদিষ্টন সূরো নিনিক্ত রশ্মিভিঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/১৩২/৬)।
অর্থাৎ :
মহতী সত্যবতী অদিতি, সর্বধনবিশিষ্ট ও তেজস্বী, সে মিত্র ও বরুণকে অসূর্য তেজের জন্য উৎপাদন করেছেন। (ঋক-৮/২৫/৩)।। অদিতি আমাদের রক্ষা করুন, অদিতি আমাদের সুখ প্রদান করুন। তিনি ধনবান, মিত্র, বরুণ ও অর্যমার মাতা। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। (ঋক-৮/৪৭/৯)।। রাজমাতা অদিতি শত্রুগণকে অতিক্রম করে আমাদের অন্য দেশে নিয়ে যান, অর্যমা সুগমপথে আমাদের নিয়ে যান।

আমরা বহুবীরবিশিষ্ট এবং হিংসারহিত হয়ে মিত্র ও বরুণের সুখ লাভ করব।
(ঋক-২/২৭/৭)।। হে অগ্নি ! তুমি দীপ্তিযুক্ত হয়ে ইন্দ্র ও ত্বরান্বিত দেবগণের সাথে একরথে আমাদের অভিমুখে এস। সুপুত্রবিশিষ্টা অদিতি আমাদের কুশে উপবেশন করুন। নিত্য দেবগণ অগ্নিরূপ স্বাহাকারযুক্ত হয়ে তৃপ্তিলাভ করুন। (ঋক-৩/৪/১১)।। হে বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মিত্র ও বরুণ ! অদিতিই তোমাদের মাতা, দ্যুলোক ও ভূলোককে জলের দ্বারা পরিষ্কার কর, এ নিম্নলোকে উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও, সূর্যকিরণদ্বারা সমস্ত ভুবন পবিত্র কর।
(ঋক-১০/১৩২/৬)।।

আদিত্যদের মধ্যে বৈদিক দেবতা হিসেবে মিত্র, বরুণ প্রমুখের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। ইতঃপূর্বেই মিত্র দেবতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বরুণ দেবতাকে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবেই আলোচনা করা যাবে। অপেক্ষাকৃত গৌণ কিন্তু বেশ চিত্তাকর্ষক অন্য আদিত্যদের পরিচয় দেখা যাক। অর্যমা মানে বন্ধু, সখা; এবং এই সখ্যভাবই দেবতাটির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। আর আদিত্যদের মধ্যে আরও চিত্তাকর্ষক দেবতা বলতে অবশ্যই ভগ এবং অংশ। ইতঃপূর্বেই দেখেছি, এগুলির পিছনে সুপ্রাচীন সমবণ্টন-প্রথার স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায় এই দুটি দেবতার কল্পনার পিছনে। এবং বৈদিক কবিদের পার্থিব সম্পদ-কামনা যে কতো তীব্র সে-বিষয়ে গুটিকয় নজির উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেমন–

ভগ প্রণেতর্ভগ সত্যরাধো ভগেমাং ধিয়মুদবা দদন্নঃ।
ভগ প্র ণো জনয় গোভিরশ্বৈর্ভগ প্র নৃভির্নৃবন্তঃ স্যাম।। (ঋগ্বেদ-৭/৪১/৩)।
উতেদানীং ভগবন্তঃ স্যামোত প্রপিত্ব উত মধ্যে অহ্নাম্ ।
উতোদিতা মঘবন্‌ৎসূর্যস্য বয়ং দেবানাং সুমতৌ স্যাম।। (ঋগ্বেদ-৭/৪১/৪)।
ভগ এব ভগবা অস্তু দেবাস্তেন বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
তং ত্বা ভগ সর্ব ইজ্জোহবীতি স নো ভগ পুরএতা ভবেহ।। (ঋগ্বেদ-৭/৪১/৫)।
প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হুবেম বয়ং পুত্রমদিতের্যো বিধর্তা।
আধ্রশ্চিদ্যং মন্যমানস্তুরশ্চিদ্রাজা চিদ্যং ভগং ভক্ষীত্যাহ।। (ঋগ্বেদ-৭/৪১/২)।
অর্থাৎ :

হে ভগ ! তুমি প্রকৃষ্ট নেতা। হে ভগ ! তুমি সত্যধন। তুমি আমাদের অভিলষিত বস্তু প্রদান করে আমাদের স্তুতি সফল কর। হে ভগ ! তুমি আমাদের গো ও অশ্বদ্বারা প্রবৃদ্ধ কর। হে ভগ ! আমরা নেতাগণদ্বারা মনুষ্যবান হব। (ঋক-৭/৪১/৩)।। আরও আমরা যেন ইদানিং ভগবান হতে পারি, দিবসের প্রারম্ভে ও মধ্যেও যেন ভগবান হতে পারি। আরও হে মঘবন ! সূর্যের উদয়ে আমরা যেন ইন্দ্রাদির অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। (ঋক-৭/৪১/৪)।। হে দেবগণ ! ভগবান হোন। আমরা ভগের অনুগ্রহেই ভগবান হব। হে ভগ ! সকলেই তোমায় বার বার আহ্বান করেন। হে ভগ ! তুমি এ যজ্ঞে আমাদের অগ্রগামী হও।
(ঋক-৭/৪১/৫)।। যিনি জগতের ধারক, জয়শীল উগ্র অদিতির পুত্র সে ভগ-দেবতাকে প্রাতকালেই আহ্বান করব। দরিদ্র স্তোতা এবং ধনশালী রাজা উভয়েই ভগদেবকে স্তুতি করে, ‘আমায় ভজনীয় ধন দাও’ বলে যাচঞা করে। (ঋক-৭/৪১/২)।।

এখানে ভগবান শব্দের ব্যবহার অবশ্যই লক্ষণীয় যে, ঋগ্বেদে ভগ মানে ধন বা ধনের অংশ; এবং ভগবান মানে ধনবান বা অংশবান, কোনভাবেই ঈশ্বর জাতীয় কিছু নয়।

.

দেবতা অশ্বিদ্বয় :

ঋগ্বেদে দুটি যমজ (ঋগ্বেদ-৩/৩৯/৩) ও নিত্যসহচর (ঋগ্বেদ-৫/৭৮/১-২) দেবতা অশ্বিদ্বয় দেববৈদ্য (ঋগ্বেদ-৮/১৮/৮) রূপেই পরিকল্পিত। যেমন–

যমা চিদত্র ষমসূরসূত জিহ্বায়া অগ্রং পতদা হ্যস্থাৎ।
বপুংষি জাতা মিথুনা সচেতে তমোহনা তপুষো বুধ্ন এতা।। (ঋগ্বেদ-৩/৩৯/৩)।
অশ্বিনাবেহ গচ্ছতং নাসত্যা মা বি বেনতম্ । হংসাবিব পততমা সুতা উপ।।
(ঋগ্বেদ-৫/৭৮/১)।
অশ্বিনা হরিণাবিব গৌরারিবানু যবসম্ । হংসাবিব পততমা সুতা উপ।। (ঋগ্বেদ-৫/৭৮/২)।
হারিদ্রবেব পতথো বনেদুপ সোমং সুতং মহিষেবাব গচ্ছথঃ।
সজোষসা ঊষসা সূর্যেণ চ ত্রির্বর্তির্যাতমশ্বিনা।। (ঋগ্বেদ-৮/৩৫/৭)।
উত ত্যা দৈব্যা ভিষজা শং নঃ করতো অশ্বিনা। যুযুযাতামিতো রপো অপ স্রিধঃ।।
(ঋগ্বেদ-৮/১৮/৮)।
অর্থাৎ :
যমক পুত্রের মাতা যমক পুত্রদ্বয় অশ্বিদ্বয়কে প্রস্রব করল, তাদের প্রশংসা করবার জন্য আমার জিহ্বার অগ্রভাগ চঞ্চল হয়েছে। অন্ধকারনাশক দিবসের আদিতে আগত মিথুন জন্মিবামাত্র স্তোত্রে মিলিত হচ্ছে। (ঋক-৩/৩৯/৩)।। হে অশ্বিদয় ! তোমরা এ যজ্ঞে এস। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা স্পৃহাশূন্য হয়ো না, হংসদ্বয়ের ন্যায় তোমরা অভিষুত সোমরসের উপর অবতরণ কর। (ঋক-৫/৭৮/১)।। হে অশ্বিদ্বয় ! হরিণদ্বয় ও গৌরমৃগদ্বয় যেরূপ ঘাসের উপর পতিত হয়, সেরূপ তোমরা হংসদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমরসের উপর অবতরণ কর। (ঋক-৫/৭৮/২)।। যেমন হারিদ্রব পক্ষিদ্বয় বনে পতিত হয়, হে অশ্বিদ্বয় ! সেরূপ তোমরা অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও। মহিষদ্বয়ের ন্যায় তা অবগত হও, ঊষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে ত্রিমার্গে গমন কর। (ঋক-৮/৩৫/৭)।। প্রসিদ্ধ দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বয় আমাদের সুখ বিধান করুন, আমাদের পাপ হতে পৃথক করুন এবং শত্রুগণকে দূরীভূত করুন। (ঋক-৮/১৮/৮)।।

অশ্বিদ্বয়ের স্তুতির মূল উপাদানও পার্থিব সম্পদের কামনাই। যেহেতু এই যমজ দেবতাদ্বয় দেববৈদ্য রূপে কল্পিত, তাই তাঁদের কাছে রোগ-নিরাময়, জরা-অপসারণ ও যৌবনলাভ প্রভৃতির কামনা প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। ফলে দেখা যায়, অশ্বিদ্বয় আতুরের চিকিৎসা করেন (ঋগ্বেদ-৮/২২/১০), অন্ধকে দৃষ্টিদান করেন (ঋগ্বেদ-১/১১৬/১৬), মৃত্যুকে দূরে রাখেন (অথর্ববেদ-৭/৫৩/১), প্রসব-রহিত গাভীকে দুগ্ধবতী করেন (ঋগ্বেদ-১/১১২/৩),

ইত্যাদি (ঋগ্বেদ-১০/৩৯/৩-৪)। যেমন–

যাভিঃ পক্থমবথো যাভিরধ্রিগুং যাভির্বভ্রুং বিজোষসম্ ।
তাভির্নো মক্ষু তুয়মশ্বিনা গতং ভিষজ্যতং যদাতুরম্ ।। (ঋগ্বেদ-৮/২২/১০)।
শতং মেষান্বৃক্যে চক্ষদানমৃজ্রাশ্বং তং পিতান্ধং চকার।
তস্মা অক্ষী নাসত্যা বিচক্ষ আধত্তং দস্রা ভিষজাবনর্বন্।। (ঋগ্বেদ-১/১১৬/১৬)।
যুবং তাসাং দিব্যস্য প্রশাসনে বিশাং ক্ষয়থো অমৃতস্য মজ্মনা।
যাভির্ধেনুমস্বং পিন্বথো নরা তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/১১২/৩)।
অমাজুরশ্চিদ্ভবথো যুবং ভবোহনাশোশ্চিদবিতারাপমস্য চিৎ।
অন্ধস্য চিন্নাসত্যা কৃশস্য চিদ্যুবামিদাহুর্ভিষজা রুতস্য চিৎ।। (ঋগ্বেদ-১০/৩৯/৩)।
যুবং চ্যবানং সনয়ং যথা রথং পুনর্যুবানং চরথায় তক্ষথুঃ।
নিষ্টৌগ্রমূহথুরদ্ভ্যস্পরি বিশ্বেত্তা বাং সবনেষু প্রবাচ্যা।। (ঋগ্বেদ-১০/৩৯/৪)।
কুহ স্বিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ।
কো বাং শযুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ।। (ঋগ্বেদ-১০/৪০/২)।
অর্থাৎ :
হে অশ্বিদ্বয় ! যা দিয়ে পকথকে রক্ষা করেছিলে, যা দিয়ে অধ্রিগুকে রক্ষা করেছিলে, যা দিয়ে বভ্রু রাজাকে সোমপানে প্রীত করেছিলে, সে সমস্ত রক্ষার সাথে শীঘ্র ও সত্বর আমাদের নিকট এস। আর আতুরের চিকিৎসা কর। (ঋক-৮/২২/১০)।। যে ঋজ্রাশ্ব বৃকীকে শত মেষ খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছিলেন, তাকে তার পিতা দৃষ্টিহীন করেছিল; হে ভিষজ দস্র নাসত্যদ্বয় ! তার চক্ষুদ্বয় দর্শনে অসমর্থ হয়েছিল, তোমরা তার সে চক্ষুদ্বয় দর্শনসমর্থ করেছিলে। (ঋক-১/১১৬/১৬)।। হে নেতৃদ্বয় ! তোমরা স্বর্গীয় অমৃতলব্ধ বলদ্বারা সে ত্রিভুবননিবাসী সকল লোককে শাসন করতে সমর্থ। যে সকল উপায় দ্বারা তোমরা প্রসব রহিত গাভীকে দুগ্ধবতী করেছিলে, হে অশ্বিদ্বয় ! সে সকল উপায়ের সাথে এস। (ঋক-১/১১২/৩)।। পিতৃভবনে একটি স্ত্রীলোক বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছিল, তোমরা তার সৌভাগ্যস্বরূপ তার বর এনে দিলে। যার চলৎশক্তি নেই অথবা যে অতি নীচ, তোমরা তারও আশ্রয়স্বরূপ, তোমাদেরই অন্ধের ও দুর্বলের ও রোগের জ্বালায় রোরুদ্যমান ব্যক্তির চিকিৎসক বলে লোকে উল্লেখ করে। (ঋক-১০/৩৯/৩)।। যেমন পুরাতন রথকে কেউ নূতন করে নির্মাণপূর্বক তা দিয়ে গতিবিধি করে, সেরূপ তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবন ঋষিকে পুনর্বার যুবা বরে দিয়েছিলে। তোমরাই তুগ্রপুত্রকে জলে উপর নিরুপদ্রবে বহন করে তীরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলে। যজ্ঞের সময় তোমাদের দুজনের সে সমস্ত কার্য বিশেষরূপে বর্ণনা করবার যোগ্য। (ঋক-১০/৩৯/৪)।। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা দিবাভাগে, কি রাত্রিকালে কোথায় গতিবিধি কর? কোথায় বা কালযাপন কর? যেরূপ বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে, অথবা কামিনী নিজ কান্তকে সমাদর করে, যজ্ঞস্থলে সেরূপ সমাদরের সাথে কে তোমাদের আহ্বান করে? (ঋক-১০/৪০/২)।।

পার্থিব কামনার আতিশয্যে দেববৈদ্য হিসেবে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিতে প্রচুর পৌরাণিক কল্পনার

সমাবেশ ঘটলেও একটি অর্বাচীন কিন্তু আকর্ষণীয় ঋকে (ঋক-১০/৪০/২) বিধবা রমণী কর্তৃক শয়নকালে দেবরকে সমাদর করার নজির থেকে বৈদিক যুগের কোন এক পর্যায়ে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্বামীর ভ্রাতা বা দেবরকে বিবাহ করবার প্রচলিত প্রথাই এ ঋকে পরিলক্ষিত হয়।

.

দ্যুলোকের অন্যান্য দেবতারা :

দ্যুলোকের অন্যান্য গৌণ দেবতাদের মধ্যে রয়েছে ঊষা, রাত্রি, বিবস্বান্, ও যমও। ইতঃপূর্বে ঊষা ও রাত্রির কথা পূর্বতন অধ্যায়ে (সিন্ধু-সভ্যতা অধ্যায়ের বৈদিক-সাহিত্যের দেবীস্তুতি দ্রষ্টব্য) আলোচিত হয়েছে। রাত্রি একান্তই গৌণ দেবী। আর উষা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে অন্তত ঋগ্বেদের স্থান-বিশেষে ঊষার উপর ইন্দ্রের আক্রমণ-কাহিনী থেকে অনুমান হয়, এই ঊষা ছিলেন সিন্ধু-সভ্যতার পূজনীয়া প্রাচীন মাতৃদেবী। বিবস্বান্ বহু দৃষ্টান্তে মানবজাতির আদি-জনক বলে কল্পিত, কিন্তু বৈদিক দেবতা হিসেবে তাঁর গৌরব অবশ্যই গৌণ।

.

যম দেবতা :

যম সম্বন্ধে ঋগ্বেদে মাত্র দুটি সূক্ত রয়েছে। দুটিই অতি অর্বাচীন দশম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটি (ঋগ্বেদ-সূক্ত-১০/১০) যম ও যমীর কথোপকথন। যম ও যমী'র সম্বন্ধ ভ্রাতা ও ভগিনী। এখানে যমী যমের সাথে সহবাস কামনা করেছেন। কিন্তু যম প্রত্যাখ্যান করছেন এই বলে যে, সহোদরা ভগিনী অগম্যা, ভগিনীতে যে উপগত হয় সে পাপী। বৈদিক যুগের পূর্বাপর সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনার গুরুত্ব বিবেচনায় বৈদিক কবি-কল্পনাপ্রসূত এই আকর্ষণীয় সূক্তটি উদ্ধৃতিযোগ্য বলে মনে হয়। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে রচিত এই সূক্তের (ঋগ্বেদ-সূক্ত-১০/১০) দেবতা হলেন যম ও যমী এবং ঋষি বা কবি হিসেবে তাঁরাই উল্লিখিত–

ও চিৎসখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরূ চিদর্ণবং জগন্বান্ ।
পিতুর্নপাতমা দধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ।। ১।
ন তে সখা সখ্যং বষ্ট্যেতৎসলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপা ভবাতি।
মহস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরা দিবো ধর্তার উর্বিয়া পরি খ্যন্ ।। ২।
উশন্তি ঘা তে অমৃতাস এতদেকস্য চিত্ত্যজসং মর্তস্য।
নি তে মনো মনসি ধায্যস্মে জন্যুঃ পিতস্তন্ব মা বিবিশ্যাঃ।। ৩।
ন যৎপুরা চকৃমা বদ্ধ নূনমৃতা বদন্তো অনৃতং রপেম।
গন্ধর্বো অপ্সপ্যা চ যোষা সা নো নাভিঃ পরমং জামি তন্নৌ।। ৪।
গর্ভে নু নৌ জনিতা দম্পতী কর্দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ।
নকিরস্য প্র মিনন্তি ব্রতানি বেদ নাবস্য পৃথিবী উত দ্যৌঃ।। ৫।
কোন অস্য বেদ প্রথমস্যাহ্নঃ ক ঈং দদর্শ ক ইহ প্র বোচৎ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য ধাম কদ্ ব্রব আহনো বীচ্যা নৃন্ ।। ৬।

যমস্য মা যম্যং কাম আগন্ৎসমানে যোন্নৌ সহশেয্যায়।
জায়েব পত্যে তন্বং রিরিচ্যাং বি চিদ্বৃহেব রথ্যেব চক্রা।। ৭।
ন তিষ্ঠন্তি ন নি মিষন্ত্যেতে দেবানাং স্পশ ইহ যে চরন্তি।
অন্যেন মদাহনো যাহি তূয়ং তে বি বৃহ রথ্যেব চক্রা।। ৮।
রাত্রীভিরস্মা অহভির্দশস্যেৎ সূর্যস্য চক্ষুর্মুহুন্মিমীয়াৎ।
দিবা পৃথিব্যা মিথুনা সবন্ধূ যমীর্যমস্য বিতৃয়াদজামি।। ৯।
আ ঘা তা গচ্ছানুত্তরা যুগানি যত্র জাময়ঃ কৃণবন্নজামি।
উপ বর্বৃহি বৃষভায় বাহুমন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ।। ১০।
কিং ভ্রাতাসদ্যদনাথং ভবাতি কিমু স্বসা যন্নির্ঋতির্নিগচ্ছাৎ।
কামমূতা বহ্বে তদ্রপামি তন্বা মে তন্বং সং পিপৃগ্ধি।। ১১।
ন বা উ তে তন্বা তন্বং সং পপৃচ্যাং পাপামহুর্যঃ স্বসারং নিগচ্ছাৎ।
অন্যেন মৎপ্রমুদঃ কল্পয়স্ব ন তে ভ্রাতা সুভগে বষ্ট্যেতৎ।। ১২।
বতো বতাসি যম নৈব তে মনো হৃদয়ং চাবিদাম।
অন্যা কিল ত্বাং কক্ষ্যেব যুক্তং পরি ষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্ ।। ১৩।
অন্যমূ ষু ত্বং যম্যন্য উ ত্বাং পরি ষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্ ।
তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবাধা কৃণুষ্ব সংবিদং সুভদ্রাম্ ।। ১৪।
অর্থাৎ :
[যমী ও যম যমজ ভ্রাতৃভগিনী, তন্মধ্যে যমী যমকে বলছেন]– বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্তী এ দ্বীপে এসে এ নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী, কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করে রেখেছেন, যে তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদের পিতার এক সুন্দরনপ্তা (নাতি) জন্মিবে। ১।। [যমের উত্তর]– তোমার গর্ভসহচর তোমার সাথে এ প্রকার সম্পর্ক কামনা করেন না। যেহেতু তুমি সহোদরা ভগিনী অগম্যা। আর এস্থান নির্জন নহে, যেহেতু সে মহান অসুরের স্বর্গধারণকারী বীরপুত্রগণ পৃথিবীর সর্বভাগ দেখছেন। ২।। [যমীর উক্তি]– যদিচ কেবল মনুষ্যের পক্ষে এপ্রকার সংসর্গ নিষিদ্ধ তথাপি দেবতারা এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপূর্বক করে থাকেন। অতএব আমার যেরূপ ইচ্ছা হচ্ছে, তুমিও তদ্রূপ ইচ্ছা কর। তুমি পুত্রজন্মদাতা পতির ন্যায় আমার শরীরে প্রবেশ কর। ৩।। [যমের উত্তর]– এ কার্য পূর্বে কখন আমরা করিনি। আমরা সত্যবাদী, কখন মিথ্যা বলিনি। গন্ধর্ব আমাদের পিতা, আর আপ্যা ঘোষা আমাদের উভয়ের মাতা; সুতরাং আমাদের উভয়ের অতি নিকট সম্পর্ক। ৪।। [যমীর উক্তি]– নির্মাণকর্তা ও প্রসবিতা ও বিশ্বরূপ দেবত্বষ্টা, আমাদের গর্ভাবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্রীপুরুষবৎ করেছেন। তাঁর অভিপ্রায় অন্যথা করতে কারও সাধ্য নাই। আমাদের এ সম্পর্ক পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই জানেন। ৫।। [যমের উক্তি]– এই প্রথম দিন কে জানে? কে বা দেখেছে? কেই বা প্রকাশ করেছে? মিত্র ও বরুণের আবাসভূত এ বিশ্বজগৎ অতি প্রকাণ্ড। অতএব হে আহন ! তুমি নরদের এর কি বল? ৬।। [যমীর উক্তি]– তুমি যম, আমি যমী, তুমি আমার প্রতি অভিলাষযুক্ত হও, এস একস্থানে উভয়ে শয়ন করি। পত্নী যেমন পতির নিকট তদ্রূপ আমি তোমার নিকট নিজ

দেহ সমর্পণ করে দিই। রথ ধারণকারী চক্রদ্বয়ের ন্যায় এস আমরা এক কার্যে প্রবৃত্ত হই। ৭।। [যমের উক্তি]– এ যে সকল দেবতাদের গুপ্তচর, এদের সর্বত্র গতিবিধি, এরা চক্ষুঃ নির্মীলন করে না। হে ব্যথাদায়িনি যাও, শীঘ্র অন্যের নিকট গমন কর, রথধারণকারী চক্রদ্বয়ের ন্যায় তার সাথে এক কার্য কর। ৮।। [যমীর উক্তি]– কি দিবসে, কি রাত্রিতে, যজ্ঞের ভাগ যেন যমকে দান করা হয়, সূর্যের তেজ যেন পর পর আবির্ভূত হয়। দ্যুলোক ও ভূলোক স্ত্রীপুরুষবৎ সম্বন্ধ। যমী গিয়ে ভ্রাতা যমের আশ্রয় গ্রহণ করুক। ৯।। [যমের উক্তি]– ভবিষ্যতে এমন যুগ হবে যখন ভ্রাতা ভগ্নীর সাথে সহবাস করবে। হে সুন্দরি ! এক্ষণে আমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। তিনি যখন তোমাকে গ্রহণ করবেন তখন তাঁকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন কর। ১০।। [যমীর উক্তি]– সে কিসের ভ্রাতা, যদি সে থাকতেও ভগিনী অন্যথা হয়? সে কিসের ভগিনী, যদি সেই ভগিনী সত্ত্বেও ভ্রাতার দুঃখ দূর না হয়? আমি অভিলাষে মূর্ছিতা হয়ে এত করে বলছি, তোমার শরীরে আমার শরীর মিলিয়ে দাও। ১১।। [যমের উক্তি]– তোমার শরীরের সাথে আমার শরীর মিলাতে ইচ্ছা নেই। ভগিনীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, তাকে পাপী বলে। আমি ভিন্ন অন্য পুরুষের সাথে সুখ-সম্ভোগের চেষ্টা দেখ। হে সুন্দরি ! তোমার ভ্রাতার এরূপ অভিলাষ নেই। ১২।। [যমীর উক্তি]– হায় ! যম ! তুমি নিতান্ত দুর্বল পুরুষ দেখছি ! এ তোমার কি প্রকার মন, কি প্রকার অন্তঃকরণ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। রজ্জু যেরূপ ঘোটককে বেষ্টন করে কিংবা যেরূপ লতা বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, সেরূপ অন্য নারী অনায়াসেই তোমাকে আলিঙ্গন করে, অথচ তুমি আমার প্রতি বিমুখ। ১৩।। [যমের উত্তর]– হে যমি ! তুমিও অন্য পুরুষকে আলিঙ্গন কর। যেরূপ লতা বৃক্ষকে, তদ্রূপ অন্য পুরুষই তোমাকে আলিঙ্গন করুক। তারই মন তুমি হরণ কর, সেও তোমার মন হরণ করুক। তারই সহবাসের ব্যবস্থা স্থির কর, তাতেই মঙ্গল হবে। ১৪।।

সূক্তটি বৈদিক কবির অপূর্ব কাব্যসৃষ্টি নিঃসন্দেহে। তবে অপর সূক্তটিতে (ঋগ্বেদ-সূক্ত-১০/১৪) যম সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। যম পিতৃলোকের রাজা, তা স্বর্গে অবস্থিত। প্রেতাত্মাদের যমই পথ দেখিয়ে যেখানে নিয়ে যান, সে স্থান আলোকোজ্জ্বল। পিতৃলোকের দ্বারের পাহারা দিচ্ছে দুটি কুকুর। তাদের বর্ণ বিচিত্র এবং চারটি করে চক্ষু। যেমন–

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানম্ ।
বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য।। (ঋগ্বেদ-১০/১৪/১)।
যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্তবা উ।
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/১৪/২)।
সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্ ।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/১৪/৮)।
অপেত বীত বি চ সর্পতাতোহস্মা এতং পিতরো লোকমক্রন্ ।
অহোভিরদ্ভিরক্তুভির্ব্যক্তং যমো দদাত্যবসানমস্মৈ।। (ঋগ্বেদ-১০/১৪

অপেত বীত বি চ সর্পতাতোহস্মা এতং পিতরো লোকমক্রন্ ।
অহোভিরদ্ভিরক্তুভির্ব্যক্তং যমো দদাত্যবসানমস্মৈ।। (ঋগ্বেদ-১০/১৪/৯)।
অতি দ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা।
অথা পিতৃন্ৎসুবিদত্রা উপেহি যমেন যে সাধমাদং মদন্তি।। (ঋগ্বেদ-১০/১৪/১০)।
যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষৌ নৃচক্ষসৌ।
তাভ্যামেনং পরি দেহি রাজন্ৎস্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি।। (ঋগ্বেদ-১০/১৪/১১)।
অর্থাৎ :
হে অন্তঃকরণ ! তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়ে সেবা কর। তিনি সৎকর্মান্বিত ব্যক্তিদের সুখের দেশে নিয়ে যান, তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করে দেন, তাঁর নিকটই সকল লোকে গমন করে। (ঋক-১০/১৪/১)।। আমরা কোন পথে যাব, তা যমই প্রথমে দেখিয়ে দেন। সে পথ আর বিনষ্ট হবে না। যে পথে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা গিয়েছেন, সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে সে পথে যাবেন। (ঋক-১০/১৪/২)।। [যজ্ঞকর্তাব্যক্তির মৃত্যু হলে তাকে সম্বোধন করে উক্তি]– সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকদের সঙ্গে মিলিত হও, যমের সঙ্গে ও তোমার ধর্মানুষ্ঠানের ফলের সাথে মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগপূর্বক অস্ত নামক গৃহে প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর। (ঋক-১০/১৪/৮)।। [শ্মশানে দাহকালে উক্তি]– হে ভূতপ্রেতগণ ! দূর হও, চলে যাও সরে যাও, সরে যাও, পিতৃলোকেরা তাঁর জন্য এ স্থান প্রস্তুত করেছেন। এ স্থান দিবাদ্বারা, জলদ্বারা ও আলোকদ্বারা শোভিত, যম এ স্থান মৃতব্যক্তিকে দিয়ে থাকেন। (ঋক-১০/১৪/৯)।। [যমদ্বারবর্তী দুই কুক্কুরের বিষয়ে উক্তি]– হে মৃত ! এ যে দুই কুক্কুর, যাদের চার চার চক্ষু ও বর্ণ বিচিত্র এদের নিকট দিয়ে শীঘ্র চলে যাও। তারপরে যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সাথে সর্বদা আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়ে তাদের নিকট গমন কর। (ঋক-১০/১৪/১০)।। হে যম ! তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে যাদের চার চার চক্ষু, যারা পথ রক্ষা করে এবং যাদের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হতে হয় তাদের কোপ হতে এ মৃতব্যক্তিকে রক্ষা কর। হে রাজন ! একে কল্যাণভাগী ও নিরোগী কর। (ঋক-১০/১৪/১১)।।

ঋগ্বেদের এই যম পরবর্তীকালের পৌরাণিক যম নয়, কারণ ঋগ্বেদের যম পরকালের সুখের বিধাতা। যদিও যমের প্রহরী কুকুর মনুষ্যের ভয়ের পদার্থ, তবু পুণ্যাত্মা পূর্বপুরুষগণ স্বর্গলোকে যমের সাথে আমোদ আহ্লাদে বাস করেন এবং দেবগণের সঙ্গে যজ্ঞের ভাগী এরূপ বিশ্বাস ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশ রচনাকালে প্রচলিত ছিলো বলেই ধারণা করা যায়।
…

(খ) অন্তরীক্ষ বা আকাশের দেবতা
বৈদিক সাহিত্যে তথা ঋগ্বেদে অন্তরীক্ষের প্রধান দেবতারা হলেন ইন্দ্র, ত্রিত আপ্ত্য, অপাং নপাৎ, মাতরিশ্বা, অহিবুধ্ন্য, অজ একপাদ, রুদ্র, মরুৎগণ, বায়ু, বাত, পর্জন্য, আপঃ। তাঁদের মধ্যে ইন্দ্রের গৌরব অবশ্যই প্রধানতম। তবে ইন্দ্রের কথা পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা আবশ্যক বিধায় বাকিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেয়া যাক।

বৈদিক জল-দেবতা ত্রিত আপ্ত্য, অপাং নপাৎ ও আপঃ :
ঋগ্বেদে এই তিন দেবতাই জলের সাথে সম্পর্কিত বা জল-দেবতা। তবে ত্রিত আপ্ত্য নামে দেবতাটির বৈশিষ্ট্য ঋগ্বেদে অস্পষ্ট। আপ্ত্য শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার সায়ণ বলেছেন, অপাং পুত্র– অর্থাৎ জলের পুত্র। এ-থেকে কোনো সুপ্রাচীন পৌরাণিক কল্পনা অনুমিত হয়। যেমন–
যচ্চ গোষু দুঃস্বপ্ন্যং যচ্চাস্মে দুহিতর্দিবঃ।
ত্রিতায় তদ্বিভাবর্ষাপ্ত্যায় পরা বহানেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো বা ঊতয়ঃ।।
(ঋগ্বেদ-৮/৪৭/১৪)।
যথা কলাং যথা শফং যথ ঋণং সংনয়ামসি।
এবা দুঃস্বপ্ন্যং সর্বমাপ্ত্যে সং নয়ামস্যনেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ।।
(ঋগ্বেদ-৮/৪৭/১৭)।
অর্থাৎ :
হে স্বর্গের দুহিতা ঊষা ! আমাদের গোসমূহে যে দুঃস্বপ্ন আছে ও আমাদের যে দুঃস্বপ্ন হয়েছে, হে বিভাবরি ! আপ্ত্য ত্রিতের জন্য তা দূর করে দাও। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। (ঋক-৮/৪৭/১৪)।। (হে ঊষাদেবী !) যে প্রকারে যজ্ঞার্থ পশুর হৃদয়াদি এবং তার শৃঙ্গাদি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়, ঋণ যেমন ক্রমে ক্রমে শোধ করতে হয়, সেরূপ আপ্ত্য ত্রিতের সমস্ত দুঃস্বপ্ন ক্রমে ক্রমে দূর করব। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। (ঋক-৮/৪৭/১৭)।।

অন্যান্য দৃষ্টান্তে আপ্ত্য ত্রিত দেবতাটির প্রধান কীর্তি বৃত্র-ধ্বংস। কোথাও বা ত্রিত আপ্ত্য নিজেই বৃত্রকে ধ্বংস করছেন, কোথাও বা ইন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতায় তিনি এই কীর্তি সম্পাদন করছেন, কোথাও বা মরুৎগণ তাঁকে এ-কাজে সহায়তা করছেন। অবশ্যই ঋগ্বেদে বৃত্র-ধ্বংস মূলতই ইন্দ্রের কীর্তি; কিন্তু তারই সঙ্গে ত্রিত আপ্ত্যর সম্পর্ক থেকে অনুমান হয় এই অস্পষ্ট দেবতাটিও যুদ্ধ-দেবতা বলেই কল্পিত– যদিও যুদ্ধ-দেবতা হিসেবে ইন্দ্রের তুলনায় তাঁর স্থান অত্যন্ত গৌণ।

অপাং নপাৎ জল-দেবতা, ফলে জল এবং জল-নির্ভর উর্বরতার কামনাই তাঁর স্তুতির মূল উপাদান। যেমন–
উপেমসৃক্ষি বাজযুর্বচস্যাং চনো দধীত নাদ্যো গিরো মে।
অপাং নপাদাশুহেমা কুৎবিৎস সুপেশসস্করতি জ্যোষিষদ্ধি।। (ঋগ্বেদ-২/৩৫/১)।

সমন্যা যন্ত্যপ যন্ত্যন্যাঃ সমানমুর্বং নদ্য পৃণন্তি।
তমু শুচিং শুচয়ো দীদিবাংসমপাং নপাতং পরি তস্থূরাপঃ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৫/৩)।
অস্মৈ তিস্রো অব্যথ্যায় নারীর্দেবায় দেবী র্দিধিষন্ত্যন্নম্ ।
কৃতা ইবোপ হি প্রসর্স্রে অপ্সু স পীযুষং ধয়তি পূর্বসূনাম্ ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৫/৫)।
স ঈং বৃষাজনয়ত্তাসু গর্ভস ঈং শিশুর্ধয়তি তং রিহন্তি।
সো অপাং নপাদনভিন্লাতবর্ণোহন্যস্যেবেহ তন্বা বিবেষ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৫/১৩)।
অর্থাৎ :
আমি অন্নাভিলাষে এ স্তুতি উচ্চারণ করছি। শব্দকারী শীঘ্রগামী অপাং নপাৎ নামক দেবতা আমাদের প্রচুর অন্ন দান করুন ও সুন্দররূপবিশিষ্ট করুন, আমি তাঁর স্তুতি করছি, তিনি স্তুতি ভালবাসেন। (ঋক-২/৩৫/১)।। কোন কোন জল একত্র মিলিত হয়, অন্য জল তাদের সাথে মিলিত হয়; ওরা সকলে নদী হয়ে অনলকে প্রীত করে। বিশুদ্ধ জলসমূহ নির্মল দীপ্তিমান অপাং নপাৎ নামক দেবতার চারদিকে বেষ্টন করে থাকে। (ঋক-২/৩৫/৩)।। ইলা, সরস্বতী ও ভারতী নামক দেবীত্রয়, দুঃখরহিত অপাং নপাৎ দেবতার জন্য অন্ন ধারণ করেন। তাঁরা জলমধ্যে উৎপন্ন পদার্থের ন্যায় প্রসারিত হন। সেই অপাং নপাৎ নামক দেবতা সর্বাগ্রে উৎপন্ন জলের সারভূত সোম পান করেন। (ঋক-২/৩৫/৫)।। সেচনসমর্থ সে অপাং নপাৎ ঐ সমস্ত জলমধ্যে গর্ভ উৎপন্ন করেছেন। তিনিই আবার পুত্রস্বরূপ হয়ে জল পান করেন, জলসমূহ তাঁকেই লেহন করে। দীপ্তিযুক্ত সে অপাং নপাৎ এ পৃথিবীতে অন্য শরীরে ব্যাপ্ত হয়েছেন। (ঋক-২/৩৫/১৩)।।
.
তবে ঋগ্বেদে জল এবং জল-নির্ভর উর্বরতার কামনা আরও সুস্পষ্ট হয়েছে দেবতা আপঃ-র কল্পনায়। আপঃ বা জলগণ ঋগ্বেদে মূলতই মাতৃরূপে স্তুত হয়েছেন। যেমন–
আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপঃ পুনতু।
বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীরুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি।। (ঋগ্বেদ-১০/১৭/১০)।
অম্বযো যন্ত্যধ্বভির্জাময়ো অধ্বরীয়তাং। পৃঞ্চতীর্মধুনা পয়ঃ।। (ঋগ্বেদ-১/২৩/১৬)।
অমূর্যা উপ সূর্যে যাভি র্বা সূর্যঃ সহ। তা নো হিন্বন্ত্বধ্বরম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/২৩/১৭)।
অপো দেবীরূপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ। সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ।। (ঋগ্বেদ-১/২৩/১৮)।
অপ্ স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে। দেবা ভবত বাজিনঃ।। (ঋগ্বেদ-১/২৩/১৯)।
অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিং চ বিশ্বশংভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ।। (ঋগ্বেদ-১/২৩/২০)।
আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে।। (ঋগ্বেদ-১/২৩/২১)।
যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ।
সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু।। (ঋগ্বেদ-৭/৪৯/২)।
অর্থাৎ :
জলগণ আমাদের জননীস্বরূপ, আমাদের শোধন করুন, এঁরা যেন ঘৃত প্রবাহে প্রবহমান হচ্ছেন, সে ঘৃতের দ্বারা আমাদের মলাপনয়ন করুন। এ দেবীরা সকল পাপকে স্রোতে বয়ে

নিয়ে যান। এদের মধ্য হতে আমি শুচি ও পবিত্র হয়ে আসছি।
(ঋক-১০/১৭/১০)।। আমরা যজ্ঞ কামনা করি, আমাদের মাতৃস্থানীয় জল যজ্ঞ পথ দিয়ে যাচ্ছে; সে জল আমাদের হিতকারী বন্ধু এবং দুগ্ধকে মিষ্ট করছে। (ঋক-১/২৩/১৬)।। এই যে সমস্ত জল সূর্যের সমীপে আছে, অথবা সূর্য যে সমস্ত জলের সাথে আছেন, সে সমস্ত জল আমাদের যজ্ঞ প্রীতিকর করুক। (ঋক-১/২৩/১৭)।। যে জল আমাদের গাভীসকল পান করে, সে জলদেবীকে আহ্বান করি। যে জল নদীরূপে বয়ে যাচ্ছে, তাদের হব্য দেওয়া কর্তব্য। (ঋক-১/২৩/১৮)।। জলের ভিতর অমৃত আছে, জলে ঔষধ আছে, হে ঋষিগণ ! সে জলের প্রশংসায় উৎসাহী হও। (ঋক-১/২৩/১৯)।। সোম আমাকে বলেছেন জলের মধ্যে সকল ঔষধি আছে এবং জগতের সুখকর অগ্নি আছে, এবং সকল প্রকার ভেষজ আছে। (ঋক-১/২৩/২০)।। হে জল ! আমার শরীরের জন্য রোগ-নিবারক ঔষধি পরিপুষ্ট কর, যেন আমরা বহুকাল সূর্যকে দেখতে পাই। (ঋক-১/২৩/২১)।। যে আপসমূহ অন্তরিক্ষে উৎপন্ন হয়, অথবা যা প্রবাহিত হয়ে খননদ্বারা যাদের লাভ করা যায়, যা স্বয়ং উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, দীপ্তিযুক্ত পবিত্রকর সে আপদেবীসমূহ আমায় রক্ষা করুন। (ঋক-৭/৪৯/২)।।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, বৈদিক দেবলোক মূলতই পুরুষ-প্রধান; তাই দেবী ও জননীরূপে পরিকল্পিতা এই জল শেষতক পুরুষ দেবতাদেরই আজ্ঞাধীন। যেমন–
আবর্বৃততীরধ নু দ্বিধারা গোষুযুধো ন নিয়বং চরন্তীঃ।
ঋষে জনিত্রীর্ভুবনস্য পত্নীরপো বন্দস্ব সবৃধঃ সযোনীঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/৩০/১০)।
শতপবিত্রাঃ স্বধয়া মদন্তীর্দেবীর্দেবানামপি যন্তি পাথঃ।
তা ইন্দ্রস্য ন মিনন্তি ব্রতানি সিন্ধুভ্যো হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত।। (ঋগ্বেদ-৭/৪৭/৩)।
অর্থাৎ :
যে ইন্দ্র জলের নিমিত্ত যুদ্ধ করেন, তাঁর আজ্ঞায় জলগণ দু ধারায় অর্থাৎ নানা ধারায় বার বার পতিত হয়ে সোমের সাথে মিশ্রিত হয়, তারা ভুবনের জননীস্বরূপ, ভুবনের রক্ষাকর্ত্রীস্বরূপ। তারা সোমের সঙ্গে একত্রে স্ফীত হয়, তারা আত্মীয়স্বরূপ। হে ঋষি ! এতাদৃশ জলগণকে বন্দনা কর। (ঋক-১০/৩০/১০)।। বহু পবিত্র রূপবিশিষ্ট অশ্বদ্বারা লোকের হর্ষ উৎপাদক ও দ্যোতমান জল দেবগণের স্থানে প্রবেশ করেন। তাঁরা ইন্দ্রের কর্ম হিংসা করেন না। তোমরা সিন্ধুগণের উদ্দেশে ঘৃতযুক্ত হব্য হোম কর। (ঋক-৭/৪৭/৩)।।

.

মেঘ-দেবতা পর্জন্য :
জল-কামনার সঙ্গে সংযুক্ত আর একটি বৈদিক দেবতার নাম পর্জন্য। ঋগ্বেদে পর্জন্যের উদ্দেশ্যে মাত্র তিনটি সূক্ত রচিত হয়েছে। তিনি অন্তরীক্ষের পুত্ররূপে পরিকল্পিত। জলভরা মেঘকেই প্রাচীন কবিরা এই দেবতারূপে কল্পনা করেছিলেন। যেমন–
পর্জন্যায় প্র গায়ত দিবস্পুত্রায় মীড়্হুষে। স নো যবসমিচ্ছতু।। (ঋগ্বেদ-৭/১০২/১)।

প্র বাতা বান্তি পতয়ন্তি বিদ্যুত উদোষধী র্জিহতে পিন্বতে স্বঃ।
ইরা বিশ্বস্মৈ ভুবনায় জায়তে যৎ পর্জন্যঃ পৃথিবী রেতসাবতি।। (ঋগ্বেদ-৫/৮৩/৪)।
যস্য ব্রতে পৃথিবী নন্নমীতি যস্য ব্রতে শফবজ্জর্ভুরীতি।
যস্য ব্রত ওষধীর্বিশ্বরূপাঃ স নঃ পর্জন্য মহি শর্ম যচ্ছ।। (ঋগ্বেদ-৫/৮৩/৫)।
অর্থাৎ :
অন্তরীক্ষের পুত্র সেচনসমর্থ পর্জন্যদেবের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর। তিনি আমাদের অন্ন ইচ্ছা করুন। (ঋক-৭/১০২/১)।। যেকালে পর্জন্য বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবী রক্ষা করেন তখন প্রবল বায়ু বইতে থাকে, চারদিকে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয়, ওষধিসমূহ অঙ্কুরিত হয়, অন্তরীক্ষ বিগলিত হয় এবং পৃথিবী সমস্ত জীবের হিত সাধনে সমর্থ হয়। (ঋক-৫/৮৩/৪)।। হে পর্জন্য ! তোমারই কার্যবশত পৃথিবী অবনত হয়, খুরবিশিষ্ট গবাদি পুষ্টিলাভ করে এবং ওষধি সকল বিবিধরূপ ধারণ করে। তুমি আমাদের বিপুল সুখ প্রদান কর। (ঋক-৫/৮৩/৫)।।

এই বৃষ্টির মেঘ নিয়ে বৈদিক কবিদের উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই। তবে সমস্ত উচ্ছ্বাসের পিছনে একটি কথাই বার বার সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে– এই মেঘ এই বৃষ্টি পৃথিবীতে উদ্ভিদের জন্ম দেয়, পুষ্টিসাধন করে ইত্যাদি। যেমন–
অভি ক্রন্দ স্তনয় গর্ভমা ধা উদন্বতা পরি দীয়া রথেন।
দৃতিং সু কর্ষ বিষিতং ন্যঞ্চং সমা ভবন্তূদ্বতো নিপাদাঃ।। (ঋগ্বেদ-৫/৮৩/৭)।
মহান্তং কোশমুদচা নিষিঞ্চ স্যন্দন্তাং কূল্যা বিষিতাঃ পূরস্তাৎ।
ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী ব্যুন্ধি সুপ্রপাণং ভবত্বঘ্ন্যাভ্যঃ।। (ঋগ্বেদ-৫/৮৩/৮)।
তিস্রো বাচঃ প্র বদ জ্যোতিরগ্রা যা এতদ্দুহ্রে মধুদোঘমূধঃ।
স বৎসং কৃণ্বন্গর্ভমোষধীনাং সদ্যো জাতো বৃষভো রোরবীতি।। (ঋগ্বেদ-৭/১০১/১)।
ইদং বচঃ পর্জন্যায় স্বরাজে হৃদো অস্ত্বন্তরং তজ্জুজোষৎ।
ময়োভুবো বৃষ্টয়ঃ সন্ত্বস্মে সুপিপ্পলা ওষধীর্দেবগোপাঃ।। (ঋগ্বেদ-৭/১০১/৫)।
স রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাং তস্মিন্নাত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।
তন্ম ঋৃতং পাতু শতসারদায় যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ।। (ঋগ্বেদ-৭/১০১/৬)।
যো গর্ভমোষধীনাং গবাং কৃণোত্যর্বতাঃ। পর্জন্যঃ পুরুষীণাম্ ।। (ঋগ্বেদ-৭/১০২/২)।
তস্মা ইদাস্যে হবির্জুহোতা মধুমত্তমং। ইলাং নঃ সংযতং করৎ।। (ঋগ্বেদ-৭/১০২/৩)।
অর্থাৎ :
তুমি পৃথিবীর উপর শব্দ কর, গর্জন কর, বারিদ্বারা ওষধিসমূহের গর্ভবিধান কর, বারিপূর্ণ রথদ্বারা অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ কর, দৃঢ়বদ্ধ নিম্নমুখ ভস্ত্রা বারিপূর্ণ মেঘকে উন্মুক্ত কর। উচ্চ ও নিম্ন স্থান সকল যেন সমতল হয়। (ঋক-৫/৮৩/৭)।। হে পর্জন্য ! তুমি বিপুল কোশবৎ মেঘকে উর্ধ্বে উত্তোলন করা, এ হতে বারিবর্ষণ কর, নদীসকল অপ্রতিহত বেগে সম্মুখে প্রবাহিত হোক। বারিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে আর্দ্র কর এবং ধেনুগণের জন্য প্রচুর পানীয় উৎপন্ন হোক। (ঋক-৫/৮৩/৮)।। অগ্রভাগে জ্যোতিবিশিষ্ট যে তিন প্রকার বাক্য উদক উৎপাদক মেঘকে দোহন করে, সে বাক্য উচ্চারণ কর। তিনিও সহবাসী বৈদ্যুতাগ্নি প্রাদুর্ভুত

করে এবং ওষধিসমূহের গর্ভ উৎপাদন করে সদ্য উৎপন্ন হয়ে বৃষভের ন্যায় শব্দ করছেন। (ঋক-১/১০১/১)।। স্বায়ত্তদীপ্তিবিশিষ্ট সে পর্জন্যের উদ্দেশে এ স্তোত্র করছি। তিনি এ গ্রহণ করুন। এ তাঁর হৃদয়গ্রাহী হোক। আমাদের জন্য সুখকর বৃষ্টি পতিত হোক। পর্জন্য যাদের রক্ষক, সে ওষধিসমূহ সুফলযুক্ত হোক। (ঋক-৭/১০১/৫)।। সে পর্জন্য বৃষভের ন্যায় বহুতর ওষধিসমূহের প্রতি তেজ আধান করেন। স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা তাঁতেই বাস করে। তৎপ্রদত্ত জল শতবৎসরব্যাপী জীবনের জন্য আমাকে রক্ষা করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর। (ঋক-৭/১০১/৬)।। যে পর্জন্যদেব ওষধিসমূহের, গোসমূহের, অশ্বসমূহের ও নারীগণের গর্ভ উৎপাদন করেন। (ঋক-৭/১০২/২)।। তাঁরই উদ্দেশে দেবগণের আর্যর্ভূত অগ্নিতে অতিশয় রসবান হব্য হোম কর। তিনি আমাদের উদ্দেশে অন্ন নিশ্চিত করে দেন। (ঋক-৭/১০২/৩)।।

.

বায়ু-দেবতা বায়ু, বাত ও মাতরিশ্বা :

শুধু মেঘ আর জলই নয়, পার্থিব সম্পদের কামনায় বৈদিক কবিরা বাতাসেরও নানাভাবে স্তুতি করেছেন। ঋগ্বেদে প্রধানত যে তিনটি বায়ুদেবতার উল্লেখ রয়েছে, তাঁরা হলেন– বায়ু, বাত এবং মাতরিশ্বা।

বায়ু এবং বাত বৈদিক দেবতা হলেও ঋগ্বেদে তাঁদের বর্ণনা প্রায়শই মূর্ত প্রাকৃতিক বাতাসেরই বর্ণনা। যেমন ঋগ্বেদের একটি বায়ু-স্তুতিমূলক সূক্তে, যার কবি অনিল ঋষি, বলা হচ্ছে (ঋগ্বেদ-সূক্ত-১০/১৬৮)–

বাতস্য নু মহিমানং রথস্য রুজন্নেতি স্তনয়ন্নস্য ঘোষঃ।
দিবিস্পৃগ্যাত্যরুণানি কৃণ্বন্নুতো এতি পৃথিব্যা রেণুমস্যন্ ।। ১।
সং প্রেরতে অনু বাতস্য বিষ্টা ঐনং গচ্ছন্তি সমনং ন যোষাঃ।
তাভিঃ সযুক্সরথং দেব ঈয়তেহস্য বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা।। ২।
অন্তরিক্ষে পথিভিরীয়মানো ন নি বিশতে কতমচ্চনাহঃ।
অপাং সখা প্রথমজা ঋতাবা ক্ক স্বিজ্জাতঃ কুত আ বভূব।। ৩।
আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভো যথাবশং চরতি দেব এষঃ।
ঘোষা ইদস্য শৃণ্বিরে ন রূপং তস্মৈ বাতায় হবিষা বিধেম।। ৪।

অর্থাৎ :

যে বায়ু রথের ন্যায় বেগে ধাবিত হন, তাঁকে আমি বর্ণনা করব। এঁর শব্দ বজ্রের শব্দের ন্যায়, ইনি বৃক্ষাদি ভঙ্গ করতে করতে আসেন। ইনি চতুর্দিক রক্তবর্ণ করতে করতে আকাশ পথ অবলম্বনপূর্বক গমন করেন। এবং পৃথিবীর ধূলি বিকীরণ করতে করতে চলে যান। ১।। সুস্থির পদার্থ অর্থাৎ পর্বতাদি পর্যন্ত বায়ুর গতিবশে কম্পমান হতে থাকে। ঘোটকীরা যেমন যুদ্ধে যায় সেরূপ এ বায়ুর দিকে গমন করে। তিনি সে ঘোটকীদের সহায় পেয়ে রথে আরোহণপূর্বক এ সমস্ত ভুবনের রাজার ন্যায় চলে যান। ২।। ইনি আকাশপথে গতিবিধি করবার সময় কোন দিনই স্থির হয়ে বসে থাকেন না। ইনি জলের বন্ধু, জলের অগ্রে উৎপন্ন

হন, (অগ্রে বায়ু, পরে বৃষ্টি)। ইনি সত্যস্বভাব। বল দেখি, ইনি কোথায় জন্মেছেন? কোথা হতে এসেছেন? ৩।। এ বায়ুদেব দেবতাদের আত্মাস্বরূপ, ভুবনের সন্তানস্বরূপ, যথা ইচ্ছা বিহার করেন। এঁর শব্দই অনেক প্রকার শোনা যায়, এঁর রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। এস, হবি দিয়ে সে বায়ুর পূজা করি। ৪।।

তবে ঋগ্বেদের অন্যত্র আবার এই বায়ু-দেবতারা অপরাপর দেবতাদের সঙ্গেও একত্রে স্তুত হয়েছেন। যেমন–

তে নো রুদ্রঃ সরস্বতী সজোষা মীড়্হুষ্মন্তো বিষ্ণুমৃলন্তু বায়ুঃ।
ঋভুক্ষা বাজো দৈব্যো বিধাতা পর্জন্যাবাতা পিপ্যতামিষং নঃ।। (ঋগ্বেদ-৬/৫০/১২)।
পর্জন্যবাতা বৃষভা পৃথিব্যাঃ পুরীষাণি জিন্বতমপ্যানি।
সত্যাশ্রুতঃ কবয়ো যস্য গীর্ভির্জগতঃ স্থাতর্জগদা কৃণুধ্বম্ ।। (ঋগ্বেদ-৬/৪৯/৬)।
অর্থাৎ :
রুদ্র ও সরস্বতী, বিষ্ণু ও বায়ু, ঋভুক্ষা, বাজ ও দেব বিধাতা যেন তুল্যরূপ প্রসন্ন হয়ে আমাদের সুখী করেন। পর্জন্য ও বায়ু যেন আমাদের অন্ন বর্ধিত করেন। (ঋক-৬/৫০/১২)।। হে বর্ষণকারী পর্জন্য ও বাত ! তোমরা অন্তরীক্ষ হতে প্রাপ্য জল প্রেরণ কর। হে জ্ঞানসম্পন্ন, স্তোত্রশ্রবণকারী, জগৎ সংস্থাপক মরুৎগণ ! তোমরা যার স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন হও তার সমস্ত প্রাণিজাত সমৃদ্ধ কর। (ঋক-৬/৪৯/৬)।।

‘নিরুক্ত’কার যাস্ক-মতে ‘মাতরিশ্বা’ শব্দের অর্থও বায়ু; মাতরিশ্বন্ বায়ু-দেবতাই। কিন্তু ঋগ্বেদের অনেক জায়গায়ই দেখা যায় অগ্নিরই নাম মাতরিশ্বা। যেমন–

স মাতরিশ্বা পুরুবারপুষ্টির্বিদদ্গাতুং তনয়ায় স্বর্বিৎ।
বিশাং গোপা জনিতা রোদস্যোর্দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/৯৬/৪)।
উদু ষ্টুতঃ সমিধা যহেবা অদ্যৌদ্বর্ষ্মন্দিবো অধি নাভা পৃথিব্যাঃ।
মিত্রো অগ্নিরীড্যো মাতরিশ্বা দূতো বক্ষদ্যজথায় দেবান্ ।। (ঋগ্বেদ-৩/৫/৯)।
তং শুভ্রমগ্নিমবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানমুক্থ্যম্ ।
বৃহস্পতিং মনুষো দেবতাতয়ে বিপ্রং শ্রোতারমতিথিং রঘুষ্যদম্ ।। (ঋগ্বেদ-৩/২৬/২)।
অর্থাৎ :
সে অন্তরীক্ষস্থ মাতরিশ্বা অনেক বরণীয় পুষ্টি দান করেন। তিনি স্বর্গদাতা, সকল লোকের রক্ষক এবং দ্যাবাপৃথিবীর উৎপাদক। এ অগ্নি আমার তনয়কে গমনের পথ দেখিয়ে দিন। দেবগণ সে ধনদাতা অগ্নিকে দূতরূপে নিয়োগ করেছেন। (ঋক-১/৯৬/৪)।। আমাদের দ্বারা স্তুত ও দীপ্তিদ্বারা মহান অগ্নি পৃথিবীর নাভিতে অর্থাৎ বেদিতে অবস্থান করে অন্তরীক্ষ বিদ্যোতিত করেছেন। সকলের মিত্র, স্তুতিযোগ্য মাতরিশ্বা দেবগণের দূত হয়ে যজ্ঞে দেবগণকে আনুন। (ঋক-৩/৫/৯)।। আমরা আশ্রয় প্রাপ্তির জন্য এবং যজমানের যজ্ঞের জন্য সেই শুভ্র, বৈশ্বানর, মাতরিশ্বা, উকথযোগ্য, যজ্ঞপতি, মেধাবী, শ্রোতা, অতিথি ও ক্ষিপ্রগামী অগ্নিকে আহ্বান করি। (ঋক-৩/২৬/২)।।

বেদ-টীকাকার সায়ণের ব্যাখ্যায় অন্তরীক্ষরূপ মাতৃক্রোড়ে বিদ্যুৎরূপে গমনাগমন করেন বলে অগ্নির আর একটি নাম মাতরিশ্বা। ঋগ্বেদে কোথাও মাতরিশ্বাকে অগ্নি আবার কোথাও ঘর্ষণের সাহায্যে অগ্নির উৎপাদক হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। ঝড় উঠলে গাছে-গাছে লেগে দাবানল জ্বলে ওঠে– হয়তো এ জাতীয় ঘটনা লক্ষ্য করতে করতেই বৈদিক কবিরা মাতরিশ্বার সঙ্গে অগ্নির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কল্পনা করেছিলেন। যেমন–

মসৃবাংসমিব ত্মনাগ্নিমিত্থা তিরোহিতম্ ।
ঐনং নয়ন্মাতরিশ্বা পরাবতো দেবেভ্যো মথিতং পরি।। (ঋগ্বেদ-৩/৯/৫)।
নির্ষদীং বুধ্নান্মহিষস্য বর্পস ঈশানাসঃ শবসা ক্রন্ত সূরয়ঃ।
যদীমনু প্রদিবো মধ্ব আধবে গুহা সন্তং মাতরিশ্বা মথায়তি।। (ঋগ্বেদ-১/১৪১/৩)।
মথীদ্যদীং বিষ্টো মাতরিশ্বা হোতারং বিশ্বাপ্সুং বিশ্বদেব্যম্ ।
নি য়ং দধুর্মনুষ্যাসু বিক্ষু স্বর্ণ চিত্রং বপুষে বিভাবম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/১৪৮/১)।
মথীদ্যদীং বিভৃতো মাতরিশ্বা গৃহেগৃহে শ্যেতো জেন্যো ভূৎ।
আদীং রাজ্ঞে ন সহীয়সে সচা সন্না দূত্যং ভৃগবাণো বিবায়।। (ঋগ্বেদ-১/৭১/৪)।
অর্থাৎ :
পিতা যেরূপ স্বচ্ছন্দগামী পুত্রকে বলপূর্বক আনয়ন করেন, সেরূপ মাতরিশ্বা স্বেচ্ছাপূর্বক তিরোহিত ও মন্থনদ্বারা নিষ্পাদিত এ অগ্নিকে দেবতাগণের জন্য আনয়ন করেছিলেন। (ঋক-৩/৯/৫)।। যেহেতু মহাযজ্ঞের মূল হতে যজ্ঞের রূপসিদ্ধি করণে সমর্থ ঋত্বিকগণ বলপ্রয়োগ দ্বারা অগ্নিকে উৎপন্ন করছেন এবং অনাদিকাল হতে সুন্দররূপে প্রক্ষেপ করবার নিমিত্ত গুহাস্থিত অগ্নিকে মাতরিশ্বা চালন করছেন। (ঋক-১/১৪১/৩)।। মাতরিশ্বা প্রবেশ করে নানা রূপবিশিষ্ট সর্বদেবকার্যকুশল দেবগণের আহ্বানকর্তা অগ্নিকে প্রবুদ্ধ করেছেন। পূর্বে দেবগণ একে বিচিত্র দ্যুতিমান সূর্যের ন্যায় মানুষ ও ঋত্বিকগণের যজ্ঞ সমাধার জন্য স্থাপন করেছিলেন। (ঋক-১/১৪৮/১)।। মাতরিশ্বা মথিত অগ্নি শুভ্রবর্ণ হয়ে সকল যজ্ঞগৃহে প্রাদুর্ভূত হন; তখন সুহৃৎ রাজা প্রবল রাজার নিকটে যেরূপ স্বীয় লোককে দূত কর্মে নিযুক্ত করে, সেরূপ ভৃগু ঋষির ন্যায় যজ্ঞসম্পাদক যজমান অগ্নিকে দূত কর্মে নিযুক্ত করেন। (ঋক-১/৭১/৪)।।

ঋগ্বেদের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায়, অগ্নি দুটি কাষ্ঠের ঘর্ষণে জাত এবং মাতরিশ্বা মূলত বায়ু-দেবতা হলেও বৈদিক কবিদের কল্পনা অনুসারে তিনিই দেবতা ও মানবদের জন্য অগ্নি আনয়ন করেছিলেন। যেমন–

ঋতা বানং যজ্ঞিয়ং বিপ্রমুক্থ্যমা যং দধে মাতরিশ্বা দিবি ক্ষয়ম্ ।
তং চিত্রযামং হরিকেশমীমহে সুদীতিমগ্নিং সুবিতায় নব্যসে।। (ঋগ্বেদ-৩/২/১৩)।
বহ্নিং যশসং বিদথস্য কেতুং সুপ্রাব্যং দূতং সদ্যোঅর্থম্ ।
দ্বিজন্মানং রয়িমিব প্রশস্তং রাতিং ভরদ্ভৃগবে মাতরিশ্বা।। (ঋগ্বেদ-১/৬০/১)।
অর্থাৎ :

বলবান যজ্ঞার্হ মেধাবী, স্তুতিযোগ্য, দ্যুলোকবাসী যে অগ্নিকে মাতরিশ্বা দ্যুলোক হতে এনে পৃথিবীতে সংস্থাপিত করেছেন আমরা সে নানাবিধ গমনবিশিষ্ট, পিঙ্গলবর্ণ কিরণযুক্ত, দীপ্তিমান, অগ্নির নিকট নূতন ধন যাচঞ্ঞা করি। (ঋক-৩/২/১৩)।। অগ্নি হব্যবাহক ও যশস্বী, যজ্ঞপ্রকাশক এবং সম্যক রক্ষণশীল; তিনি দেবগণের দূত এবং সদাই দেবগণের নিকট হব্য নিয়ে গমন করেন, তিনি দুটি কাষ্ঠ হতে জাত এবং ধনের ন্যায় প্রশংসিত; মাতরিশ্বা এ অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় ভৃগুবংশীয়দের নিকট আনলেন। (ঋক-১/৬০/১)।।

এই পৌরাণিক কল্পনায় ভৃগুবংশীয়দের নিকট মাতরিশ্বা অগ্নিকে এনে দিয়েছিলেন এরই বা অর্থ কী? পণ্ডিত মিউয়্'র বিবেচনায় ভারতবর্ষে ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি কয়েকটি ঋষিবংশদ্বারা অগ্নির পূজা প্রচার হয়েছিলো।

.

অহি-বুধ্ন্য ও অজ-একপাদ :

অন্তরীক্ষের আরও দুই দেবতা হলেন অহি-বুধ্ন্য এবং অজ-একপাদ। কিন্তু এই দুই দেবতার প্রকৃতি ও পরিকল্পনা খুব স্পষ্ট নয়। ঋগ্বেদের কয়েকটি দৃষ্টান্তে উভয়েই একত্রে এবং প্রায় অভিন্নভাবে স্তুত হয়েছেন। তবে উভয়ের কল্পনাকে কেন্দ্র করেই বৈদিক কবিরা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পার্থিব-সম্পদের কামনাই ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

উত নো নক্তমপাং বৃষণ্বসূ সূর্যামাসা সদনায় সধন্যা।
সচা যৎসাদ্যেষাম্ অহির্বুধ্নেষু বুধ্ন্যঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/৯৩/৫)।
উত নোহহির্বুধ্ন্যঃ শৃণোত্বজ একপাৎ পৃথিবী সমুদ্রঃ।
বিশ্বে দেবা ঋতাবৃধো হুবানাঃ স্তুতা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা অবন্তু।। (ঋগ্বেদ-৬/৫০/১৪)।
অর্থাৎ :
যখন অহির্বুধ্ন্য জলের সাথে একত্র হয়ে উপবেশন করেন, তখন সূর্য ও চন্দ্র একত্র উপবেশনপূর্বক দিবারাত্র জলস্বরূপ ধন বর্ষণ করেন। (ঋক-১০/৯৩/৫)।। অহির্বুধ্ন্য, অজ-একপাদ, পৃথিবী ও সমুদ্র আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন। যজ্ঞের সমৃদ্ধি বিধায়ক, আমাদের দ্বারা আহূত ও স্তুত, মন্ত্রপ্রতিপাদ্য ও মেধাবী ঋষিগণ কর্তৃক স্তূয়মান বিশ্বদেবগণ আমাদের রক্ষা করুন। (ঋক-৬/৫০/১৪)।।

.

রুদ্র দেবতা :

রুদ্রও অন্তরীক্ষের দেবতা। রুদ্রকে উদ্দেশ্য করে ঋগ্বেদে মাত্র তিনটি স্বতন্ত্র সূক্ত রয়েছে। দেবতা হিসেবে ঋগ্বেদে তাঁর বিশেষ প্রাধান্য না থাকলেও রুদ্রের পরিকল্পনায় বিবিধ বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কোথাও তিনি উগ্র, ক্রোধপরায়ণ ও পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর, এবং এই রূপেই বিস্তীর্ণ জগতের রক্ষাকর্তা। যেমন–

হবীমভি র্হবতে যো হবির্ভিরব স্তোমেভী রুদ্রং দিষীয়।

ঋদূদরঃ সুহবো মা নো অস্যৈ বভ্রুঃ সুশিপ্রো রীরধন্মনায়ৈ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/৫)।
স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ।
ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভুরে র্ন বা উ যোষদ্রুদ্রাদসূর্যম্ ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/৯)।
অর্হন্ বিভর্ষি সায়কানি ধন্বার্হন্নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্ ।
অর্হন্নিদং দয়সে বিশ্বমভ্বং ন বা ওজীয়ো রুদ্রত্বদস্তি।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/১০)।
স্তুহি শ্রতং গর্তসদং যুবানং মৃগং ন ভীমমুপহত্নুমুগ্রম্ ।
মৃলা জরিত্রে রুদ্র স্তবানোহন্যং তে অস্মন্নি বপন্তু সেনাঃ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/১১)।
অর্থাৎ :
যে রুদ্র হব্য সম্বলিত আহ্বানদ্বারা আহুত হন, আমি স্তোত্রদ্বারা তাঁকে অপগত-ক্রোধ করব। কোমলোদর, শোভন আহ্বানবিশিষ্ট বভ্রুবর্ণ ও সুনাসিক রুদ্র আমাদের যেন তাঁর জিঘাংসাবৃত্তির বিষয়ীভূত না করেন। (ঋক-২/৩৩/৫)।। দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র ও বভ্রুবর্ণ রুদ্র দীপ্ত হিরণ্ময় অলঙ্কারে শোভিত হচ্ছেন। রুদ্র সমস্ত ভুবনের অধিপতি এবং ভর্তা, তাঁর বল পৃথককৃত হয় না। (ঋক-২/৩৩/৯)।। হে অর্চনার্হ ! তুমি ধনুর্বাণধারী; হে অর্চনার্হ ! তুমি নানারূপবিশিষ্ট ও পূজনীয় নিষ্ক ধারণ করেছ; হে অর্চনার্হ ! তুমি সমস্ত বিস্তীর্ণ জগৎকে রক্ষা করছ, তোমা অপেক্ষা অধিক বলবান আর কেউ নেই। (ঋক-২/৩৩/১০)।। হে স্তোতা ! প্রখ্যাত রথস্থিত, যুবা, পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর ও শত্রুদের বিনাশক, উগ্র রুদ্রকে স্তব কর। হে রুদ্র ! আমরা স্তব করলে তুমি আমাদের সুখী কর, তোমার সেনা শত্রুকে বিনাশ করুক। (ঋক-২/৩৩/১১)।।

আবার কোন কোন দৃষ্টান্তে রুদ্রের স্তুতি সুস্পষ্ট আতঙ্কজনিত বলেই প্রতীয়মান হয়। যেমন–
মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা না উক্ষিতম্ ।
মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১১৪/৭)।
মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্মা নো রুদ্রং ভামিতো বধী র্হবিষ্মন্তঃ সর্দামত্ত্বা হবামহে।। (ঋগ্বেদ-১/১১৪/৮)।
আরে তে গোঘ্নমুত পুরুষঘ্নং ক্ষয়দ্বীর সুম্নমস্মে তে অস্তু।
মৃলা চ নো অধি চ ব্রুহি দেবাধা চ নঃ শর্ম যচ্ছ দ্বিবর্হাঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১১৪/১০)।
অর্থাৎ :
হে রুদ্র ! আমাদের মধ্যে বৃদ্ধকে বধ করো না, বালককে বধ করো না, সন্তান জনয়িতাকে বধ করো না, গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করো না, আমাদের পিতাকে বধ করো না, মাতাকে বধ করো না, আমাদের শরীরে আঘাত করো না। (ঋক-১/১১৪/৭)।। হে রুদ্র ! আমাদের পুত্রকে হিংসা করো না; তার পুত্রকে হিংসা করো না, আমাদের অন্য মানুষকে হিংসা করো না, আমাদের গো ও অশ্ব হিংসা করো না। হে রুদ্র ! ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের বীরদের হিংসা করো না, কেননা আমরা হব্য নিয়ে সর্বদাই তোমাকে আহ্বান করি। (ঋক-১/১১৪/৮)।। হে বীরগণের ক্ষয়কারক ! তোমার কৃত গোহত্যা ও মানুষহত্যা দূরে থাকুক, আমরা যেন তোমার দত্ত সুখ পাই। আমাদের সুখী কর, হে দীপ্তিমান রুদ্র ! আমাদের পক্ষ হয়ে কথা বলো, তুমি

উভয় পৃথিবীর স্বামী, আমাদের সুখ দাও। (ঋক-১/১১৪/১০)।।

তবে রুদ্রের একটি কল্যাণের দিকও আছে। ঋগ্বেদে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভিষক রূপে খ্যাত। তাই তিনি শুধুই আতঙ্ক-নিরসনের আশায় নয়, পার্থিব কল্যাণ-কামনায়, বিশেষ করে রোগ-নিরাময়কারক ওষধি প্রভৃতির কামনায়ও স্তুত হয়েছেন। যেমন–

মূলা নো রুদ্রোত নো ময়স্কৃধি ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম তে।
যচ্ছং চ যোশ্চ মনুরায়েজে পিতা তদশ্যাম তব রুদ্র প্রণীতিষু।। (ঋগ্বেদ-১/১১৪/২)।
কুমারশ্চিৎ পিতরং বন্দমানং প্রতি নানাম রুদ্রোপয়ন্তম্ ।
ভূরে র্দাতারং সৎপতি গৃণীষে স্তুভস্ত্বং ভেষজা রাস্যস্মে।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/১২)।
যা বো ভেষজা মরুতঃ শুচীনি যা শন্তমা বৃষণো যা ময়োভু।
যানি মনুরবৃণীতা পিতা নস্তা শঞ্চ যোশ্চ রুদ্রস্য রশ্মি।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/১৩)।
ত্বাদত্তেভি রুদ্র শন্তমেভিঃ শতং হিমা অশীয় ভেষজেভিঃ।
ব্যস্মদ্দ্বেষো বিতরং ব্যংহো ব্যমীবাশ্চাতয়স্বা বিষূচীঃ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/২)।
অর্থাৎ :
হে রুদ্র ! তুমি সুখী হও, আমাদের সুখী কর; তুমি বীরদের ক্ষয়কারী, আমরা নমস্কারের সাথে তোমার পরিচর্যা করি। পিতা মনু যে রোগসমূহ হতে উপশম ও ভয়সমূহ হতে উদ্ধার পেয়েছিলেন, হে রুদ্র ! তোমার উপদেশ হতে যেন আমরা তা পাই। (ঋক-১/১১৪/২)।।
পিতা আশির্বাদ করবার সময় পুত্র যেরূপ তাঁকে নমস্কার করে, সেরূপ হে রুদ্র ! তুমি আসবার সময় আমরা তোমাকে নমস্কার করছি। হে রুদ্র ! তুমি বহুধনদাতা এবং সাধুলোকের পালক, আমরা স্তব করলে আমাদের ঔষধ প্রদান কর। (ঋক-২/৩৩/১২)।।
হে মরুৎগণ ! তোমাদের যে নির্মল ঔষধ আছে, হে অভীষ্টবর্ষিগণ, তোমাদের যে ঔষধ অত্যন্ত সুখকর ও সুখপ্রদ, যে ঔষধ আমাদের পিতা মনু মনোনীত করেছিলেন, রুদ্রের সে সুখকর ভয়হারী ঔষধ আমরা কামনা করছি। (ঋক-২/৩৩/১৩)।। হে রুদ্র ! আমরা যেন তোমার দত্ত সুখকর ওষধিদ্বারা শতবর্ষ জীবিত থাকতে পারি। তুমি আমাদের শত্রুগণকে বিনাশ কর, আমার পাপ একেবারে বিদূরিত কর এবং সর্বশরীরব্যাপী ব্যাধিপুঞ্জকে বিদূরিত কর। (ঋক-২/৩৩/২)।।

ঋগ্বেদের নানা জায়গায় রুদ্রের সঙ্গে মরুৎগণের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় ব্রুদের সঙ্গে মরুৎগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মরুৎগণও অন্তরীক্ষের দেবতা, তবে একটি দেবতা নন– একদল দেবতা, এবং সর্বত্রই দল হিসেবে তাঁদের উল্লেখ। এই কারণে তাঁদের নামের সঙ্গে ‘গণ’ শব্দ সংযুক্ত। বিভিন্ন সূক্তে রুদ্রকে মরুৎগণের পিতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এই পৌরাণিক কল্পনার মূলে যাই থাকুক না কেন, লক্ষণীয় বিষয় হলো পার্থিব সম্পদের কামনাই তাঁদের স্তুতির মূল উপাদান। যেমন–

উপ তে স্তোমান্ পশুপা ইবাকরং রাস্বা পিতর্মরুতাং সুম্মমস্মে।
ভদ্রা হি তে সুমতি র্মৃলয়ত্তমাথা বয়মব ইত্তে বৃণীমহে।। (ঋগ্বেদ-১/১১৪/৯)।

আ তে পিতর্মরুতাং সুম্নমেতু মা নঃ সূর্যস্য সন্দৃশো যুযোথাঃ।
অভি নো বীরো অর্বতি ক্ষমেত প্র জায়েমহি রুদ্র প্রজাভিঃ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৩/১)।
ইদং পিত্রে মরূতামুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্ধনম্ ।
রাস্বা নো অমৃত মর্তভোজনং ত্বনে তোকায় তনয়ায় মৃল।। (ঋগ্বেদ-১/১১৪/৬)।
অর্থাৎ :
পশুপালক যেরূপ সায়ংকালে পশুস্বামীদের তাদের পশু ফিরিয়ে দেয়, হে রুদ্র ! আমি সেরূপ তোমার স্তোত্র তোমাকে অর্পণ করছি। হে মরুৎগণের পিতা ! আমাদের সুখ দান কর, তোমার অনুগ্রহ অতিশয় সুখকর এবং কল্যাণকর, আমরা তোমার ক্ষণ প্রার্থনা করি। (ঋক-১/১১৪/৯)।। হে মরুৎগণের পিতা (রুদ্র) ! তোমার প্রদত্ত সুখ আমাদের নিকট আসুক, তুমি সূর্য দর্শন হতে আমাদের পৃথক করো না, আমাদের বীর পুত্রগণ শত্রুদের অভিভূত করুক। হে রুদ্র ! আমরা যেন পুত্র পৌত্রাদিতে অনেক হয়ে উঠি। (ঋক-২/৩৩/১)।। মধু হতেও অধিক মধুর এ স্তুতি বাক্য মরুৎগণের পিতা রুদ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত হচ্ছে, এতে (স্তোতার) বৃদ্ধি সাধন হয়। হে মরণরহিত রুদ্র ! মনুষ্যদের ভোজনরূপ অন্ন আমাদের প্রদান কর এবং আমাকে আমার পুত্রকে ও তার তনয়কে সুখ দান কর। (ঋক-১/১১৪/৬)।।

ঋগ্বেদের অন্যত্র রুদ্র-পুত্র অর্থে মরুৎগণকে 'রুদ্রাসঃ' বলা হয়েছে এবং কোথাও আবার 'রুদ্রিয়গণ' হিসেবে স্তুত হয়েছে। যেমন–
নহি বঃ শত্রু র্বিবিদে অধি দ্যবি ন ভূম্যাং রিশাদসঃ।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনা যুজা রুদ্রাশো নু চিদাধৃষে।। (ঋগ্বেদ-১/৩৯/৪)।
সত্যং ত্বেষা অমবন্তো ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ। মিহং কৃণ্বন্ত্যবাতাম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/৩৮/৭)।
চিত্রং তদ্বো মরুতো ষাম চেকিতে পৃশ্ন্যা যদুধরপ্যাপয়ো দুহুঃ।
যদ্বা নিদে নবমানস্য রুদ্রিয়াস্ত্রিতং জরায় জুরতামদাভ্যাঃ।। (ঋগ্বেদ-২/৩৪/১০)।
অর্থাৎ :
হে শত্রুহিংসক মরুৎগণ ! দ্যুলোকে তোমাদের শত্রু নেই, পৃথিবীতেও নেই। হে রুদ্রপুত্রগণ ! তোমরা একত্রিত হও, (শত্রুদের) ধর্ষণার্থে তোমাদের বল শীঘ্র বিস্তৃত হোক। (ঋক-১/৩৯/৪)।। দীপ্তিমান ও বলবান রুদ্রীয়গণ সত্যই মরুভূমিতেও বায়ুরহিত বৃষ্টি দান করেন। (ঋক-১/৩৮/৭)।। হে মরুৎগণ; তোমরা যখন পৃশ্নির উধঃ দোহন করেছিলে, যখন স্তুতিকারীর নিন্দুককে হিংসা করেছিলে এবং ত্রিতের শত্রুদের বধ করেছিলে, হে অহিংসনীয় রুদ্রপুত্রগণ ! সে সময়ে তোমাদের বিচিত্র ক্ষমতা সকলেই জেনেছিল। (ঋক-২/৩৪/১০)।।

আবার ঋগ্বেদের অন্যত্র এই মরুৎগণকে 'পৃশ্নিমাতরঃ' অর্থাৎ পৃশ্নি মাতার সন্তান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং কোথাও কোথাও মরুৎগণের মাতা পৃশ্নি উল্লেখও রয়েছে। যেমন–
বিশ্বান্দেবান্ হবামহে মরুতঃ সোমপীতয়ে। উগ্রা হি পৃশ্নিমাতরঃ।। (ঋগ্বেদ-১/২৩/১০)।
দ্যাবো ন স্তৃভিশ্চিতয়ন্ত খাদিনো ব্যভ্রিয়া ন দ্যুতয়ন্ত বৃষ্টয়ঃ।

রুদ্রো যদ্বো মরুতো রুক্মবক্ষসো বৃষাজনি পৃশ্ন্যাঃ শক্র ঊধনি।। (ঋগ্বেদ-২/৩৪/২)।
প্র যে মে বংধ্বেষে গাং বোচন্ত সূরয়ঃ পৃশ্নিং বোচন্তে মাতরম্ ।
অধা পিতরমিষ্মিণং রুদ্রং বোচন্ত শিক্বসঃ।। (ঋগ্বেদ-৫/৫২/১৬)।
অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাস এতে সংভ্রাতরো বাবৃধূঃ সৌভগায়।
যুবা পিতা স্বপা রুদ্র এষাং সুদুঘা পৃশ্নিঃ সুদিনা মরুদ্ভ্যঃ।। (ঋগ্বেদ-৫/৬০/৫)।
অর্থাৎ :
সমস্ত মরুৎ দেবগণকে সোমপানার্থে আহ্বান করি, তাঁরা উগ্র ও পৃশ্নির সন্তান। (ঋক-১/২৩/১০)।। হে সুবর্ণবক্ষ মরুৎগণ ! যেহেতু সেচন সমর্থ রুদ্র পৃশ্নির নির্মল উদরে তোমাদের উৎপন্ন করেছেন; অতএব আকাশ যেরূপ নক্ষত্রে শোভিত হয়, তোমরা সেরূপ স্বীয় আভরণে শোভিত হও। তোমরা শত্রভক্ষক ও জলপ্রেরক, তোমরা মেঘস্থ বিদ্যুতের ন্যায় শোভিত হও। (ঋক-২/৩৪/২)।। আমি তাদের উৎপত্তিক্রম অনুসন্ধান করায়, জ্ঞানী মরুৎগণ আমাকে এ উত্তর দিয়েছেন; তাঁরা বলেছেন পৃশ্নি তাদের জননী, বলশালী মরুৎগণ বলেছেন অন্নদাতা রুদ্র তাঁদের জনক। (ঋক-৫/৫২/১৬)।। এ সমস্ত মরুৎ এক সময়ে উৎপন্ন, সুতরাং পরস্পর জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠভাব বর্জিত হয়ে ভ্রাতৃভাবে ও সমৃদ্ধি সহকারে বর্ধিত হয়েছেন। নিত্যতরুণ, সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী মরুৎগণের পিতা রুদ্র ও জননী দোহনযোগ্যা পৃশ্নি মরুৎগণের নিমিত্ত দিন সকল অনুকুল করুন। (ঋক-৫/৬০/৫)।।

আবার ঋগ্বেদ অনুসারে পৃশ্নি একটি গরুর নাম। ফলে মরুৎগণকে ‘গোমাতরঃ’ বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন–
স বহ্নিঃ পুত্রঃ পিত্রোঃ পবিত্রবান্ পুনাতি ধীরো ভুবনানি মায়য়া।
ধেনুঞ্চ পৃশ্নিং বৃষভঃ সুরেতসং বিশ্বাহা শুক্রং পয়ো অস্য দুক্ষত।। (ঋগ্বেদ-১/১৬০/৩)।
গোভির্বাণো অজ্যতে সোভরীণাং রথে কোশে হিরণ্যয়ে।
গোবন্ধবঃ সুজাতাস ইষে ভুজে মহান্তো নঃ স্পরসে নু।। (ঋগ্বেদ-৮/২০/৮)।
অর্থাৎ :
আদিত্য পিতা মাতা স্বরূপ দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র। তিনি ধীর এবং ফলপ্রদায়ী তিনি স্বীয় প্রজ্ঞাদ্বারা সমস্ত ভূতগণকে প্রকাশ করছেন। তিনি পৃশ্নি ধেনু ও সেচন সমর্থ বৃষকে প্রকাশ করছেন ও দ্যুলোক হতে নির্মল জল দোহন করছেন। (ঋক-১/১৬০/৩)।। সোভরি ঋষিগণের শব্দদ্বারা হিরণ্ময় রথের মধ্যদেশে মরুৎগণের বাণ ব্যক্ত হচ্ছে। গোমাতৃক সুজন্মা, মহানুভব মরুৎগণ আমাদের অন্ন ভোগ ও প্রীতিপ্রদ হোন। (ঋক-৮/২০/৮)।।

কিন্তু মরুৎগণকে গোমাতৃক জাতীয় পৌরাণিক কল্পনার কারণ কী হতে পারে? ‘পৃশ্নি’ অর্থ হলো নানা বর্ণযুক্ত। তাহলে নানা বর্ণযুক্তা মরুৎগণের এই মাতা কে? বেদ-টীকাকার সায়ণের পৃশ্নি অর্থ পৃথিবী। আবার কোথাও তিনি ‘পৃশ্নি’ শব্দের অর্থ শুক্লবর্ণ করেছেন। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত অভিধান ‘নিঘণ্টু’ অনুযায়ী পৃশ্নি অর্থে আকাশ। তবে আধুনিক পণ্ডিত গবেষকরা অনুমান করতে চেয়েছেন, বৈদিক কবিরা এখানে আকাশের বৃষ্টিদায়িনী মেঘকে

দুগ্ধদায়িনী গরুর সঙ্গে তুলনা করেছেন, অতএব গোমাতৃক অর্থে মরুৎগণ প্রকৃতপক্ষে মেঘতনয় বলেই কল্পিত। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সুবিশাল ঋগ্বেদ সাহিত্যে বহু কবি বহুভাবে এই দেবতাদের নিয়ে বহু কল্পনা করেছেন; তাই মরুৎগণের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে কোন এক অদ্বিতীয় সিদ্ধান্তের সাহায্যে সমস্ত নজিরের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা পাওয়া সুকঠিন। কেননা, এই মরুৎগণই কোথাও 'সিন্ধু-মাতরঃ' বলে কল্পিত, আবার বর্ণনা-বিশেষে তাঁরা কোথাও 'স্বয়ং-উৎপন্ন' কিংবা কোথাও 'স্বর্গ-তনয়' হিসেবেও কল্পিত হয়েছেন। যেমন–

গ্রাবাণো ন সূরয়ঃ সিন্ধুমাতর আদর্দিরাসো অদ্রয়ো ন বিশ্বহা।
শিশুলা ন ক্রীলয়ঃ সুমাতরো মহাগ্রামো ন যামন্নুত ত্বিষা।। (ঋগ্বেদ-১০/৭৮/৬)।
বব্রাসো ন যে স্বজাঃ স্বতবস ইষং স্বরভিজায়ন্ত ধূতয়ঃ।
সহস্রিয়াসো অপাং নোর্ময় আসা গাবো বন্দ্যাসো নোক্ষশঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১৬৮/২)।
শ্রিয়ে মর্যাসো অঞ্জীরকৃণ্বত সুমারুতং ন পূর্বীরতি ক্ষপঃ।
দিবস্পুত্রাস এতা ন যেতির আদিত্যাসস্তে অক্রা ন বাবৃধুঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/৭৭/২)।
অর্থাৎ :
জল প্রেরণকারী মেঘের ন্যায় সিন্ধুমাতার সন্তানেরা (মরুৎগণ) নদী নির্মাণ করেন। বিদীর্ণকারী অস্ত্রশস্ত্রের ন্যায় সকলি তাঁরা ধ্বংস করেন। বৎসল মাতার শিশুদের ন্যায় তাঁরা ক্রীড়া করেন। বহুলোকসমূহের ন্যায় তাঁরা দীপ্তিসহকারে গমন করেন। (ঋক-১০/৭৮/৬)।। স্বয়ং-উৎপন্ন, স্বাধীনবল, কম্পনশীল মরুৎগণ যে মূর্তিমান হয়ে অন্ন ও স্বর্গের জন্য প্রাদুর্ভূত হচ্ছেন। অসংখ্য এবং প্রশংসনীয় ধেনু যেরূপ দুগ্ধদান করে, জলোর্মির ন্যায় তাঁরা সেরূপ হয়ে জলদান করেন। (ঋক-১/১৬৮/২)।। এ মরুৎগণ পূর্বে মনুষ্য ছিলেন, পুণ্যদ্বারা দেবতা হয়েছেন, এরা শরীর শোভার্থে অলঙ্কার ধারণ করেন। বিস্তর সৈন্য একত্র হয়েও মরুৎগণকে অতিক্রম করতে পারে না। আমরা এখনও স্তব করি নি বলে এ সকল দ্যুলোকের পুত্রগণ অর্থাৎ মরুৎগণ এখনও দেখা দেন নি, মহাবল পরাক্রান্ত এ সকল অদিতি সন্তানগণ এখনও বৃদ্ধিযুক্ত হন নি। (ঋক-১০/৭৭/২)।।

তবে বৈদিক কবিদের এই কল্পনা যত বিচিত্রই হোক না কেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এ-ক্ষেত্রে তাঁদের স্তুতিতে নানা পার্থিব সম্পদের কামনার মধ্যে জল-কামনা বা বৃষ্টি-কামনার প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়।

(গ) পৃথিবী স্থানের দেবতা
ঋগ্বেদে পৃথিবী স্থানের প্রধান দেবতারা হলেন অগ্নি, সোম, বৃহস্পতি এবং পৃথিবী। বৈদিক কবিদের কল্পনায় তাঁদের বর্ণনা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। এ-প্রেক্ষিতে এই দেবতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখা যাক।

.
অগ্নি দেবতা :
পৃথিবীর দেবতাদের মধ্যে প্রধানতম বলতে এই অগ্নি। ঋগ্বেদে শুধু তাঁর স্তুতিতেই দুইশত পূর্ণাঙ্গ সূক্ত রচিত হয়েছে। এছাড়াও বহু সূক্তে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে অজস্র পরিমাণে অগ্নির স্তুতি রয়েছে। বৈদিক কবিদের বর্ণনায় অগ্নি যজ্ঞের অবলম্বন; সেজন্য অগ্নিকে ঋত্বিক, পুরোহিত ও হোতা বলা হয়েছে। যেমন–
অগ্নিং বো দেবমগ্নিভিঃ সজোষা যজিষ্ঠং দূতমধ্বরে কৃণুধ্বম্ ।
যো মর্ত্যেষু নিধ্রুবির্ঋতাবা তপুর্মূর্ধা ঘৃতান্নঃ পাবকঃ।। (ঋগ্বেদ-৭/৩/১)।
হোতাজনিষ্ট চেতনঃ পিতা পিতৃভ্য ঊতয়ে।
প্রযক্ষঞ্জেন্যং বসু শকেম বাজিনো যমম্ ।। (ঋগ্বেদ-২/৫/১)।
স্বঃ স্বায় ধায়সে কৃণুতামৃত্বিগৃত্বিজম্ ।
স্তোমং যজ্ঞং চাদরং বনেমা ররিমা বয়ম্ ।। (ঋগ্বেদ-২/৫/৭)।
তবাগ্নে হোত্রং তব পোত্রমৃত্বিয়ং তব নেষ্ট্রং ত্বমগ্নিদৃতায়তঃ।
তব প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়সি ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে।। (ঋগ্বেদ-২/১/২)।
অর্থাৎ :
হে দেবগণ ! যিনি মর্তগণের মধ্যে অত্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করেন, যিনি যজ্ঞবান তাপক, তেজবিশিষ্ট, ঘৃতান্নযুক্ত ও পাবক, যিনি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ও অন্য অগ্নিসমূহের সাথে মিলিত, সে অগ্নিদেবকে তোমরা যজ্ঞে দূত করো। (ঋক-৭/৩/১)।। চৈতন্য স্বরূপ, পিতা স্বরূপ, হোতা অগ্নি পিতৃদের রক্ষার্থে উৎপন্ন হলেন। আমরা হব্যবিশিষ্ট হয়ে অত্যন্ত পূজনীয়, জেতব্য ও রক্ষিতব্য ধন লাভ করতে সমর্থ হব। (ঋক-২/৫/১)।। হে ঋত্বিকরূপ অগ্নি আপনার কর্মের জন্য ঋত্বিকের কর্ম সমাধান করুন। আমরাও তদনন্তর স্তোম ও যজ্ঞ করব এবং হব্য প্রদান করব। (ঋক-২/৫/৭)।। হে অগ্নি ! হোতার কর্ম তোমারই, পোতার কর্ম তোমারই, ঋত্বিকের কর্ম তোমারই, নেষ্টার কর্ম তোমারই। তুমি অগ্নীধ্র, তুমি যখন যজ্ঞ কামনা কর, তখন প্রশস্তার কর্ম তোমারই। তুমিই অধ্বর্যু, তুমিই ব্রহ্মানামক ঋত্বিক এবং তুমি আমাদের গৃহে গৃহপতি। (ঋক-২/১/২)।।

তবে এই বৈদিক দেবতাটির সাথে মূর্ত বা পার্থিব আগুনের মধ্যে প্রভেদও সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়। অগ্নিই তাঁর রথে করে দেবতাদের যজ্ঞে আনয়ন করেন। ঘৃত এবং সমিৎ বা কাষ্ঠ তাঁর অন্ন বা আহার্য। তরল হব্য তাঁর পানীয়। তিনি মেদ ও ঘৃতের বিন্দুসমূহ বিশেষরূপে ভক্ষণ করেন, তীক্ষ্ণীভূত দন্ত দ্বারা তিনি বনসমূহকে দহন করেন, তাঁর জিহ্বা-স্পর্শে বনানী অঙ্গার-

রূপ প্রাপ্ত হয়, তিনি সর্ব-ভক্ষক। যেমন–

দ্রন্ন সর্পিরাসুতিঃ প্রত্নো হোতা বরেণ্যঃ। সহসস্পুত্রো অদ্ভুতঃ।। (ঋগ্বেদ-২/৭/৬)।
বি যস্য তে পৃথিব্যাং পাজো অশ্রেত্তৃষু যদন্না সমবৃক্ত জম্ভৈঃ।
সেনেব সৃষ্টা প্রসিতিষ্ট এতি যবং ন দস্ম জুহ্বা বিবেক্ষি।। (ঋগ্বেদ-৭/৩/৪)।
ঘৃতমগ্নের্বধ্র্যশ্বস্য বর্ধনং ঘৃতমন্নং ঘৃতম্বস্য মেদনম্ ।
ঘৃতেনাহুত উর্বিয়া বি পপ্রথে সূর্য ইব রোচতে সর্পিরাসুতিঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/৬৯/২)।
ইমং নো যজ্ঞমমৃতেষু ধেহীমা হব্যা জাতবেদো জুষস্ব।
স্তোকানামগ্নে মেদসো ঘৃতস্য হোতঃ প্রাশান প্রথমো নিষদ্য।। (ঋগ্বেদ-৩/২১/১)।
ন যো বরায় মরুতামিব স্বনঃ সেনেব সৃষ্টা দিব্যা যথাশনিঃ।
অগ্নির্জম্ভৈস্তিগিতৈরত্তি র্ভবতি যোধো ন শত্রুন্ৎস বনা ন্যৃঞ্জতে।। (ঋগ্বেদ-১/১৪৩/৫)।
তমীলিষ্ব যো অর্চিষা বনা বিশ্বা পরিষ্বজৎ। কৃষ্ণা কৃণোতি জিহ্বয়া।। (ঋগ্বেদ-৬/৬০/১০)।
যুবানং বিশপতিং কবিং বিশ্বাদং পুরুবেপসম্ । অগ্নিং শুম্ভামি মন্মভিঃ।। (ঋগ্বেদ-৮/৪৪/২৬)।
অর্থাৎ :
সমিৎ যার অন্ন, যাতে সর্পিঃসিক্ত হয়, সে পুরাতন, হোমনিষ্পাদক, বরণীয়, বলের পুত্র অগ্নি অতি রমণীয়। (ঋক-২/৭/৬)।। যখন তুমি দন্তদ্বারা কাষ্ঠাদিরূপ অন্ন ভক্ষণ কর, তোমার তেজ পৃথিবীতে বিমিশ্রিত হয়। তোমার শিখা সোনার ন্যায় বিসৃষ্ট হয়ে গমন করে, হে দর্শনীয় অগ্নি ! তুমি শিখাদ্বারা যবের ন্যায় কাষ্ঠাদি ভক্ষণ কর। (ঋক-৭/৩/৪)।। বধ্রিঅশ্বের (সুমিত্রের পিতার) অগ্নি ঘৃতদ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, ঘৃতই তাঁর আহার, ঘৃতই তাঁকে স্নিগ্ধ করে। ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে তিনি বিশিষ্টরূপে বিস্তৃত হলেন। ঘৃত ঢেলে দেওয়াতে সূর্যের ন্যায় দীপ্তি পাচ্ছেন। (ঋক-১০/৬৯/২)।। হে জাতবেদা অগ্নি ! আমাদের এ যজ্ঞ অমরগণের নিকট সমর্পণ কর, আমাদের হব্য সেবা কর। হে হোতা ! উপবিষ্ট হয়ে সকলের প্রথমে মেদ ও ঘৃতের বিন্দুসমূহ বিশেষরূপে ভক্ষণ কর। (ঋক-৩/২১/১)।। যেমন বায়ুর শব্দ, প্রবল রাজার সেনা এবং দ্যুলোকোৎপন্ন অশনি কেউ নিবারণ করতে পারে না, সেরূপ যে অগ্নিকে কেউ নিবারণ করতে পারে না সে অগ্নি যোধদের ন্যায় তীক্ষ্ণীভূত দন্তদ্বারা শত্রুদের ভক্ষণ ও বিনাশ করেন এবং বনসমূহকে দহন করেন। (ঋক-১/১৪৩/৫)।। হে স্তবকারী ! যিনি শিখাদ্বারা সমগ্র বনসমূহকে আচ্ছন্ন করেন এবং জ্বালারূপ জিহ্বাদ্বারা তাদের কৃষ্ণবর্ণ করেন, তুমি সে অগ্নির স্তব কর। (ঋক-৬/৬০/১০)।। অগ্নি যুবা, লোকপতি, কবি, সর্বভক্ষক ও বহুকর্মা; তাঁকে স্তোত্রদ্বারা শোভিত করছি। (ঋক-৮/৪৪/২৬)।।

অগ্নি প্রতিদিন দুটি অরণি কাষ্ঠের সংঘর্ষে প্রজ্জ্বলিত হন। তারাই তাঁর পিতামাতা। জন্মের পর তিনি তাদের খেয়ে ফেলেন। এই অগ্নির নানা রূপ। কখনও তিনি জাতবেদ্য, কখনও রক্ষোহা, কখনও দ্রবিণোদা, কখনও তনূনপাৎ, কখনও নরাশংস, কখনও অপাংনপাৎ, এবং কখনও তিনি মাতরিশ্বন্ । যেমন–

তদ্বামৃতং রোদসী প্র ব্রবীমি জায়মানো মাতরা গর্ভো অত্তি।
নাহং দেবস্য মর্ত্যশ্চিকেতাগ্নিরঙ্গ বিচেতাঃ স প্রচেতাঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/৭৯/৪)।

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুধিতো গর্ভিণীষু।
দিবেদিব ঈড্যে জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভিঃ মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।। (ঋগ্বেদ-৩/২৯/২)।
তনূনপাদুচ্যতে গর্ভ আসুরো নরাশংসো ভবতি যদ্বিজায়তে !
মাতরিশ্বা যদমিমীত মাতরি বাতস্য সর্গো অভবৎসরীমণি।। (ঋগ্বেদ-৩/২৯/১১)।
অর্থাৎ :
হে দ্যাবাপৃথিবী ! আমি তোমাদের এ কথা সত্য বলছি, এ বালক জাতমাত্র আপনার দু মাতাকে গ্রাস করে অর্থাৎ অরণিদ্বয় হতে জন্মে তাদেরই দগ্ধ করে। আমি মনুষ্য, অগ্নি দেবতা এঁর বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, তিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন কি জ্ঞানহীন, তা আমি জানি না। (ঋক-১০/৭৯/৪)।। গর্ভিণীতে সুসংস্থাপিত গর্ভের ন্যায় জাতবেদা অগ্নি অরণিদ্বয়ে নিহিত আছেন। অগ্নি স্বকর্মে জাগরূক হর্বিযুক্ত মানুষদের প্রতিদিন পূজনীয়। (ঋক-৩/২৯/২)।। গর্ভস্থ অগ্নিকে তনূনপাৎ বলে। অগ্নি যখন প্রত্যক্ষ হন তখন তিনি আসুর নরাশংস হন। যখন অন্তরীক্ষে তেজবিকাশ করেন তখন মাতরিশ্বা হন। অগ্নি প্রসৃত হলে বায়ুর উৎপত্তি হয়। (ঋক-৩/২৯/১১)।।

স্বভাবতই, অগ্নির দীপ্তি এবং উজ্জ্বল শিখার প্রশংসায় বৈদিক কবিদের কল্পনা বিভোর হয়েছিলো, এবং এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সে-কল্পনা প্রায়ই পরমাশ্চর্য কবিত্বে পরিণত হয়েছিলো। যেমন–
শ্রুয়া অগ্নিশ্চিত্রভানুর্হবং মে বিশ্বাভির্গীর্ভিরমৃতো বিচেতাঃ।
শ্যাবা রথং বহতো রোহিতা বোতারুষাহ চক্রে বিভৃত্রঃ।। (ঋগ্বেদ-২/১০/২)।
অর্থাৎ :
মরণরহিত, বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত, বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত সে অগ্নি আমার সমস্ত স্তুতিযুক্ত আহ্বান শুনুন। শ্যামবর্ণ বা রোহিত অথবা অরুণ অশ্বদ্বয় অগ্নির রথ বহন করছে, তিনি নানা স্থানে নীত হচ্ছেন। (ঋক-২/১০/২)।।

এই পরমাশ্চর্য ও পরম সুখপ্রদ বস্তুটির জন্ম নিয়েও বৈদিক কবিদের কল্পনার অন্ত নেই। কোথাও তাঁকে দ্যাবা-পৃথিবীর পুত্র বলা হয়েছে, কোথাও বা সেই সঙ্গেই বলা হয়েছে জল থেকে তাঁর জন্ম, ত্বষ্টা তাঁর জন্ম দিয়েছেন, এবং কোথাও বা বলা হয়েছে শুধু ত্বষ্টাই তাঁর গর্ভ থেকে অগ্নির জন্ম দিয়েছেন। অন্যদিকে কোন কবির কল্পনায় ইন্দ্র মেঘদ্বয়ের মধ্যে অগ্নির জন্ম দিয়েছেন, কোন কবির কল্পনায় দেবতাগণ অগ্নির জন্ম দিয়েছেন, আবার অন্য কবির কল্পনায় যেন দেবতাগণ অগ্নি থেকেই জাত হয়েছেন। যেমন–
অহগ্ন দিবঃ সূনুরসি প্রচেতাস্তনা পৃথিব্যা ।
ঊত বিশ্ববেদা ঋধগ্দেবা ইহ যজা চিকিত্বঃ।। (ঋগ্বেদ-৩/২৫/১)।
যং ত্বা দ্যাবাপৃথিবী যং ত্বাপস্ত¡ষ্টা যং ত্বা সুজনিমা জজান।
পন্থামনু প্রবিদ্বাৎ পিতৃয়াণং দ্যুমদগ্নে সমিধানো বি ভাহি।। (ঋগ্বেদ-১০/২/৭)।
দশেমং ত্বষ্টুর্জনয়ন্ত গর্ভমতন্দ্রাসো যুবতয়ো বিভৃত্রম্ ।

তিগ্মানীকং স্বযশসং জনেষু বিরোচমানং পরি ষীং নয়ন্তি।। (ঋগ্বেদ-১/৯৫/২)।
যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্ত সিন্ধূন্যো গা উদাজদপধা বলস্য।
যো অশ্মনোরন্তরগ্নিং জজান সম্বৃক্ সমৎসু স জনাস ইন্দ্রঃ।। (ঋগ্বেদ-২/১২/৩)।
মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্ ।
কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ।। (ঋগ্বেদ-৬/৭/১)।
শুক্রঃ শুশুক্বা উষো ন জারঃ পপ্রা সমীচী দিবো ন জ্যোতিঃ।
পরি প্রজাতঃ ক্রত্বা বভুথ ভুর্বো দেবানাং পিতা পুত্রঃ সন্ ।। (ঋগ্বেদ-১/৬৯/১)।
অর্থাৎ :
হে অগ্নি ! তুমি সর্বজ্ঞ ও চিত্তবান, তুমি দ্যুদেবতার পুত্র ও পৃথিবীর তনয়। হে চেতনাবান অগ্নি ! তুমি দেবগণের এ যজ্ঞে পৃথক পৃথক যাগ কর। (ঋক-৩/২৫/১)।। দ্যাবাপৃথিবী হতে তোমার জন্ম, জল হতে তুমি জন্মেছ, যিনি উত্তম নির্মাণ করতে পারেন, সে ত্বষ্টা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। পিতৃলোকে যাবার কোন পথ তা তুমি জান; অতএব তুমি এরূপ ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর যাতে ঐ পথ আলোকময় হয়ে উঠে। (ঋক-১০/২/৭)।। দশ অঙ্গুলি একত্র হয়ে অবিরত কাষ্ঠ ঘর্ষণ করে ত্বষ্টার গর্ভস্বরূপ ও সর্বভূতে বর্তমান অগ্নিকে উৎপন্ন করে। সে অগ্নি তীক্ষ্নতেজা, যশস্বী ও সকল জনপদে দীপ্যমান। এ অগ্নিকে সকল স্থানে নিয়ে যায়। (ঋক-১/৯৫/২)।। হে মনুষ্যগণ ! যিনি অহিকে বিনাশ করে সপ্তসংখ্যক নদী প্রবাহিত করেছিলেন, যিনি বল কর্তৃক নিরুদ্ধ গোসমূহকে উদ্ধার করেছিলেন, যিনি মেঘদ্বয়ের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং যুদ্ধকালে শত্রুগণকে বিনাশ করেন, তিনিই ইন্দ্র। (ঋক-২/১২/৩)।। বৈশ্বানর অগ্নি স্বর্গের শিরোভূত, পৃথিবীর ব্যাপক যজ্ঞার্থ জাত, জ্ঞানসম্পন্ন, সম্যক দীপ্তিসম্পন্ন, মানবগণের অতিথিভূত, দেবগণের মুখস্বরূপ ও রক্ষাকারী। দেবগণ তাকে উৎপাদিত করেছেন। (ঋক-৬/৭/১)।। শুভ্রবর্ণ অগ্নি ঊষার প্রণয়ী সূর্যের ন্যায় সকল পদার্থে প্রকাশক এবং দ্যুতিমান সূর্যের জ্যোতির ন্যায় স্বতেজে (দ্যাবা পৃথিবী) একত্রে পরিপূরিত করেন। হে অগ্নি ! তুমি প্রাদুর্ভূত হয়ে কর্ম দ্বারা সমস্ত জগত পরিব্যাপ্ত কর; তুমি দেবগণের পুত্র হয়েও তাদে পিতা। (ঋক-১/৬৯/১)।।

তবে ঋগ্বেদে অন্য অনেক কবি কিন্তু এই প্রসঙ্গে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। পাষাণ ও অরণি কাষ্ঠ বলপূর্বক ঘর্ষণ করে অগ্নির জন্ম দেওয়া হয়, এবং দুটি অরণি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করে অগ্নি মথিত করবার কথা প্রায়ই পাওয়া যায়। যেমন–

যমাপো অদ্রয়ো বনা গর্ভমৃতস্য পিপ্রতি।
সহসা যো মথিতো জায়তে নৃভিঃ পৃথিব্যা অধি সানবি।। (ঋগ্বেদ-৬/৪৮/৫)।
অগ্নিং নরো দীধিতিভিরঃ অরণ্যোর্হস্তচ্যুতী জনরন্ত প্রশস্তম্ ।
দূরেদৃশং গৃহপতিমথর্যুম্ ।। (ঋগ্বেদ-৭/১/১)।
অমন্থিষ্টাং ভারতা রেবদগ্নিং দেবশ্রবা দেববাতঃ সুদক্ষম্ ।
অগ্নে বি পশ্য বৃহতাভি রায়েষাং নো নেতা ভরতাদনু দ্যূন্ ।। (ঋগ্বেদ-৩/২৩/২)।
অস্তীদমধিমন্থনমস্তি প্রজননং কৃতম্ ।

এতাং বিশপত্নীমা ভরাগ্নিং মন্থাম্ পূর্বথা।। (ঋগ্বেদ-৩/২৯/১)।
ষদী মন্থন্তি বাহুভির্বি রোচতেহশ্বো ন বাজ্যরুষো বনেষ্বা।
চিত্রো ন যামন্নশ্বিনোরনিবৃতঃ পরি বৃণক্ত্যশ্মনস্তৃণা দহন্ ।। (ঋগ্বেদ-৩/২৯/৬)।
অর্থাৎ :
তুমি যজ্ঞের গর্ভভূত। তোমাকে বসতীবরী অর্থাৎ সোমমিশ্রণার্থে জল, অভিষব পাষাণ ও অরণি কাষ্ঠ পোষণ করে। তুমি ঋত্বিকগণ কর্তৃক বলপূর্বক মথিত হয়ে পৃথিবীর অত্যুন্নত স্থানে অর্থাৎ দেবযজন দেশে প্রাদুর্ভূত হও। (ঋক-৬/৪৮/৫)।। প্রশস্ত, দূরে দৃশ্যমান, গৃহপতি ও গমনবিশিষ্ট অগ্নিকে নেতাগণ অরণিদ্বয়ে হস্তগতি ও অঙ্গুলিদ্বারা উৎপাদন করেন। (ঋক-৭/১/১)।। ভরতের পুত্র দেবশ্রবা ও দেবরাত সুদক্ষ ও ধনবান অগ্নিকে মন্থন দ্বারা উৎপন্ন করেছে। হে অগ্নি ! তুমি প্রভূত ধনের সাথে আমাদের দিকে দেখ এবং প্রত্যহ আমাদের অন্ন আন। (ঋক-৩/২৩/২)।। এ মন্থনের উপকরণ, এ অগ্নি উৎপত্তির উপকরণ, লোকের পালয়িত্রী অরণিকে আহরণ কর। আমরা পূর্বকালের ন্যায় অগ্নিকে মন্থন করব। (ঋক-৩/২৯/১)।। যখন হস্তদ্বারা মন্থন করা যায়, তখন কাষ্ঠ হতে অগ্নি অশ্বের ন্যায় শোভমান হয়ে ও দ্রুতগামী অশ্বিদ্বয়ের বিচিত্র রথের ন্যায় শীঘ্র গমনশীল হয়ে শোভা পান। কেউ তার গমনরোধ করতে পারে না। তিনি তৃণ ও উপল দগ্ধ করে সে স্থান পরিত্যাগ করেন। (ঋক-৩/২৯/৬)।।

এই অরণি বা কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তির এ-জাতীয় অভিজ্ঞতা এবং বনে-জঙ্গলে দাবনলের অভিজ্ঞতা থেকেও হয়তো বৈদিক কবিরা প্রায়ই কল্পনা করেছেন যে, কাষ্ঠ, ওষধি– এবং অতএব অরণ্যও– অগ্নির জনক। যেমন–

সূরো ন যস্য দৃশতিররেপা ভীমা যদেতি শুচতস্তে আ ধীঃ।
হেষস্বতঃ শুরুধো নায়মক্তোঃ কুত্রা চিদ্রণ্বো বসতি র্বনেজাঃ।। (ঋগ্বেদ-৬/৩/৩)।
বিষূচো অশ্বান্যুযুজে বনেজা ঋজীতিভী রশনাভির্গৃভীতান্ ।
চক্ষদে মিত্রো বসুভিঃ সুজাতঃ সমানৃধে পর্বভির্বাবৃধানঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/৭৯/৭)।
অর্থাৎ :
সূর্যের ন্যায় যাঁর দর্শন নিষ্পাপ, যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির জ্বালাসমূহ রাত্রির শব্দায়মান ধেনুগণের ন্যায় চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, সকলের আবাসভূত, বনজাত সে অগ্নি সর্বত্র মনোজ্ঞ মূর্তি হয়ে দৃষ্ট হন। (ঋক-৬/৩/৩)।। এ অগ্নি বনে জন্মে এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হচ্ছেন যেন সরল রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্বক দ্রুতগামী কতকগুলি ঘোটক রথে যোজনা করেছেন, এ বন্ধু কাষ্ঠস্বরূপ ধন পেয়ে বৃহৎ হয়ে উঠেছেন এবং সকলি চূর্ণ করছেন, ইনি বৃক্ষ গ্রাস করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিপুলমূর্তি হয়েছেন। (ঋক-১০/৭৯/৭)।।

কোথাও আবার অগ্নিকে ওষধির ভ্রূণ বলেও কল্পনা করা হয়েছে। যেমন–

ত্বমগ্নে দ্যুভিস্ত্বমাশুশুক্ষণিস্ত্বমদ্ ভস্ত্বমশ্মনস্পরি।
ত্বং বনেভ্যস্ত্বমোষধীভ্যস্ত্বং নৃণাং নৃপতে জায়সে শুচিঃ।। (ঋগ্বেদ-২/১/১)।

অপাং গর্ভং দর্শতমোষধীনাং বনা জজান সুভ্গা বিরূপম্ ।
দেবাসশ্চিন্মনসা সং হি জগ্মুঃ পনিষ্ঠং জাতং তবসং দুবস্যন্ ।। (ঋগ্বেদ-৩/১/১৩)।
স জাতো গর্ভো অসি রোদস্যোরগ্নে চারুর্বিভৃত ওষধীষু।
চিত্রঃ শিশুঃ পরি তমাংস্যক্তূৎপ্র মাতৃভ্যো অধি কনিক্রদদ্গাঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/১/২)।
অর্থাৎ :
হে মনুষ্যদের নরপতি অগ্নি ! তুমি যজ্ঞদিনে উৎপন্ন হও, তুমি দীপ্তিশালী হয়ে উৎপন্ন হও, তুমি শুচি হয়ে উৎপন্ন হও, তুমি জল হতে উৎপন্ন হও, তুমি প্রস্তর হতে উৎপন্ন হও, তুমি বন হতে উৎপন্ন হও, তুমি ওষধি হতে উৎপন্ন হও। (ঋক-২/১/১)।। সৌভাগ্যযুক্ত অরণি, দর্শনীয়, নানারূপবিশিষ্ট এবং জল ও ওষধি সকলের গর্ভভূত অগ্নিকে উৎপাদন করেছেন। সমুদয় দেবগণও স্তবনীয়, প্রবৃদ্ধ, সদ্যজাত অগ্নির নিকট স্তুতিযুক্ত হয়ে গমন করেছিলেন ও তাঁর পরিচর্যা করেছিলেন। (ঋক-৩/১/১৩)।। হে অগ্নি ! তুমি দ্যুলোক ও ভূলোকের সুশ্রী সন্তানস্বরূপ, তাঁদের হতেই তোমার উৎপত্তি, তুমি ওষধি অর্থাৎ কাষ্ঠের মধ্যে সঞ্চিত থাক। তুমি আশ্চর্য বালক, তোমার শত্রুস্বরূপ অন্ধকারকে দূর করে থাক, ওষধি অর্থাৎ কাষ্ঠ তোমার মাতা, তুমি শব্দ করতে করতে তোমার সে মাতৃবর্গের দিকে ধাবিত হও। (ঋক-১০/১/২)।।

এইভাবে ঋগ্বেদে বারবার কাষ্ঠ, ওষধি, বনস্পতি, অরণ্য প্রভৃতির সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক কল্পিত হতে দেখা যায়। বলাই বাহুল্য, এ-জাতীয় কল্পনার মূলে জাগতিক অভিজ্ঞতার এবং অবশ্যই কবি-কল্পনার পরিচয় থাকলেও এখানে কোনো সুস্পষ্ট অধ্যাত্মবাদী চেতনার নিদর্শন অনুমান করা নিষ্ফল হবে বলা যায়। বরং বৈদিক কবিরা এই যে এতোভাবে অগ্নির স্তুতি করেছেন, তার মূলেও প্রধানতম কারণ কিন্তু নানা প্রকার পার্থিব সম্পদ ও নিরাপত্তার কামনাই। যেমন–
অগ্নে জুষস্ব প্রতি হর্ষ তদ্বচো মন্দ্র স্বধাব ঋতজাত সুক্রতো।
যো বিশ্বতঃ প্রতাঙ্ঙসি দর্শতো রণ্বঃ সন্দৃষ্টৌ পিতুমা ইব ক্ষয়ঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১৪৪/৭)।
ত্বং দূতস্ত্বমু নঃ পরস্পাস্ত্বং বস্য আ বৃষভ প্রণেতা।
অগ্নে তোকস্য নস্তনে তনূনামপ্রযুচ্ছন্দীদ্যদ্বোধি গোপাঃ।। (ঋগ্বেদ-২/৯/২)।
যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মনামানোহমর্ত্যং মর্ত্যো জোহবীমি।
জাতবেদা যশো অস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাম্ ।। (ঋগ্বেদ-৫/৪/১০)।
ত্বয়া বয়ং সধন্যস্তোতাস্তব প্রণীত্যশ্যাম বাজান্ ।
উভা শংসা সূদয় সত্যতাতেহহষ্টুয়া কৃণুহ্যহ্রুয়াণ।। (ঋগ্বেদ-৪/৪/১৪)।
ইমং যজ্ঞং সহসাবন্ ত্বং নো দেবত্রা ধেহি সুক্রতো ররাণঃ।
প্র যংসি হোতর্বৃহতীরিষো নোহগ্নে মহি দ্রবিণমা যজস্ব।। (ঋগ্বেদ-৩/১/২২)।
অস্মে রায়ো দিবেদিবে সঙ্করন্তু পুরুস্পৃহঃ। অস্মে বাজাস ঈরত্যম্ ।। (ঋগ্বেদ-৪/৮/৭)।
অর্থাৎ :
হে অগ্নি ! তুমি হব্য সেবা কর, তোমার স্তোত্র শ্রবণ করতে ইচ্ছা কর। হে স্তুত্য, অন্নবান

যজ্ঞার্থ উৎপন্ন, সুক্রতু অগ্নি ! তুমি সমস্ত জগতের অনুকূল সকলের দর্শনীয়, তুমি আনন্দোৎপাদক এবং প্রভূত অন্নবান ব্যক্তির ন্যায় সকলের আশ্রয় স্থান। (ঋক-১/১৪৪/৭)।। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি ! তুমি আমাদের দূত হও। আমাদের আপদ হতে রক্ষা কর। আমাদের নিকট ধন প্রেরণ কর। তুমি প্রমাদরহিত ও দীপ্তিবিশিষ্ট হয়ে আমাদের ও আমাদের পুত্রের রক্ষক হও ও জাগরিত হও। (ঋক-২/৯/২)।। হে অগ্নি ! আমি মর্ত্য, তুমি অমর্ত্য। আমি স্তুতিযুক্ত হৃদয়ে স্তব করে তোমাকে বারবার আহ্বান করছি। হে জাতবেদা ! আমাদের সন্তান দান কর। হে অগ্নি ! আমি যেন সন্তানসমূহদ্বারা অমরত্ব লাভ করতে পারি। (ঋক-৫/৪/১০)।। হে অগ্নি ! তুমি গমনে লজ্জাশূন্য। আমরা তোমার অনুগ্রহে সমান ধনবিশিষ্ট ও তোমা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে তোমার অনুজ্ঞায় অন্ন লাভ করি। হে সত্য বিস্তারক পাপ নাশক ! উভয়বিধ শত্রুকে বিনাশ কর, যথাক্রমে সমস্ত কার্য কর। (ঋক-৪/৪/১৪)।। হে বলবান শোভনকর্মবিশিষ্ট অগ্নি ! তুমি সর্বদা বিহার করতে করতে আমাদের যজ্ঞ দেবগণের নিকট বহন কর। হে দেবগণের আহ্বানকারী ! তুমি আমাদের অন্ন দান কর। হে অগ্নি ! তুমি আমাদের মহৎধন দান কর। (ঋক-৩/১/২২)।। হে অগ্নি ! অতিশয় কাম্য ধনসমূহ আমাদের নিকট প্রতিদিন আসুক; অন্নসমূহ আমাদের কর্মের প্রেরণা দিক। (ঋক-৪/৮/৭)।।

এই অগ্নিকে উদ্দেশ্য করে ঋগ্বেদে এ-জাতীয় পার্থিব সম্পদের কামনা এতো অজস্রবার ব্যক্ত হয়েছে যে তার সংখ্যা নির্ণয় করাও দুরূহ শ্রমসাধ্য। এবং আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো, এই অজস্র দৈনন্দিন কল্যাণের সাথে সংযুক্ত বলেই হয়তো বহু দৃষ্টান্তে অগ্নিকে নিকট আত্মীয়ের মতো, বন্ধুর মতো, ভ্রাতার মতো ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় বিভূষিত হতে দেখা যায়। কখনো কখনো অগ্নিকে ভ্রাতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কখনো পিতা বলে, কখনো মাতা বলে, এমনকি পুত্র বলেও সম্বোধন করবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন–

উপসদ্যায় মীড়্হুষ আস্যে জুহুতা হবিঃ। যো নো নেদিষ্ঠমাপ্যম্ ।। (ঋগ্বেদ-৭/১৫/১)।
আ হি ষ্মা সূনবে পিতাপির্যত্যাপয়ে। সখা সখে বরেণ্যঃ।। (ঋগ্বেদ-১/২৬/৩)।
অগ্নে ভ্রাতঃ সহস্কৃত রোহিদশ্ব শুচিব্রত। ইমং স্তোমং জুষস্ব মে।। (ঋগ্বেদ-৮/৪৩/১৬)।
অগ্নিং মন্যে পিতরমগ্নিমাপিমগ্নিং ভ্রাত রং সদমিৎসখায়ম্ ।
অগ্নেরনীকং বৃহঃ সপর্যং দিবি শুক্রং যজতং সূর্যস্য।। (ঋগ্বেদ-১০/৭/৩)।
ত্বাং বর্ধন্তি ক্ষিতয়ঃ পৃথিব্যাং ত্বাং রায় উভয়াসো জনানাম্ ।
ত্বং ত্রাতা তরণে চেত্যো ভূঃ পিতা মাতা সদমিন্মানুষাণাম্ ।। (ঋগ্বেদ-৬/১/৫)।
ত্বামগ্নে পিতরমিষ্টিভির্নরস্ত্বাং ভ্রাত্রায় শম্যা তনূরুচম্ ।
ত্বং পুত্রো ভবসি যস্তেহবিধত্ত্বং সখা সুশেবঃ পাস্যাধৃষঃ।। (ঋগ্বেদ-২/১/৯)।
অর্থাৎ :
যিনি আমাদের আসন্নতম জ্ঞাতি বন্ধু, সে উপসদনীয়, অভীষ্টবর্ষী অগ্নির জন্য তাঁর মুখে হব্য প্রদান কর। (ঋক-৭/১৫/১)।। হে বরণীয় অগ্নি ! পিতা পুত্রের প্রতি যেরূপ, বন্ধু বন্ধুর প্রতি যেরূপ, সখা সখার প্রতি যেরূপ, তুমি আমার প্রতি সেরূপ দানশীল হও।

(ঋক-১/২৬/৩)।। হে ভ্রাত অগ্নি ! হে বলের দ্বারা উৎপাদিত ! হে রোহিত নামক অশ্বযুক্ত ! হে শুদ্ধকর্মা ! আমার স্তোত্র সেবা কর। (ঋক-৮/৪৩/১৬)।। অগ্নিকে আমি পিতা ও আত্মীয় জ্ঞান করি, অগ্নিই ভ্রাতা, অগ্নিই চিরকালের বন্ধু। যেমন আকাশস্থ শুভ্রবর্ণ সূর্যমণ্ডলকে লোকে আরাধনা করে সেরূপ আমি প্রকান্ড অগ্নির মূর্তিকেই সেবা করে থাকি। (ঋক-১০/৭/৩)।। হে অগ্নি ! পৃথিবীতে মনুষ্যগণ তোমাকে বর্ধিত করে। তুমি উভয়বিধ ধন মনুষ্যগণকে প্রদান কর, সেজন্য তারা তোমাকে বর্ধিত করে। হে দুঃখবিমোচনকারী অগ্নি ! তুমি স্তুতিভাজন হয়ে মানবগণের রক্ষক ও পিতৃমাতৃ স্থানীয় হও। (ঋক-৬/১/৫)।। হে অগ্নি ! লোকে যজ্ঞদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করে, যেহেতু তুমি পিতা। তোমার সৌভ্রাত্র লাভের জন্য কর্মদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করে, তুমি তাদের শরীর দীপ্ত করে দাও। যে তোমার পরিচর্যা করে তুমি তার পুত্র হও। তুমি সখা, শুভকারী ও শত্রুনিবারক হয়ে পালন কর। (ঋক-২/১/৯)।।

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই নিকটাত্মীয় সুলভ এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে অগ্নির যে-ঘরোয়া কল্যাণময় মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যায় কোন সুদূর ঐশী শক্তির আধার তথা আধুনিক অর্থে দেবতার মাতাত্ম্য আরোপ করা মনে হয় কষ্টকল্পনারই পরিচায়ক হবে।

.

সোম দেবতা :

পৃথিবীস্থানের দেবতা হিসেবে সোম-এর প্রাধান্যও কম নয়। ঋগ্বেদের সমগ্র নবম মণ্ডলের ১১৪টি সূক্ত ছাড়াও অন্যান্য মণ্ডলে ৬টি সূক্ত পবমান সোমের স্তুতিতে বিরচিত। পবমান অর্থ ক্ষরণশীল। অর্থাৎ সোমরসই এখানে দেবতা। এ-ছাড়াও সমগ্র ঋগ্বেদে অজস্রবার সোমের উল্লেখ ও প্রশংসা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অগ্নির মতোই তথা অগ্নির তুলনায় আরো স্পষ্টতরভাবে এই বৈদিক দেবতাটি মূর্ত পার্থিব বস্তুমাত্র।

সোম নামে এক শ্রেণীর লতা ছিলো, যা পার্বত্য-অঞ্চলে জন্মাতো। বৈদিক কবিরা সোম-লতার পার্বত্য আবাস ও মর্ত্যে আগমন নিয়ে, সোম-লতা সংগ্রহ করা, জল দিয়ে ধোয়ে পাথরের সাহায্যে তা নিষ্কাশন করা, নিষ্কাশিত হরিৎবর্ণের রস ভেড়ার লোমের ছাঁকনীতে ছেঁকে কাঠের কলসে ভরা, তাকে দুধের সঙ্গে মেশানো, দেবতাদের উদ্দেশে তার আহুতি দেওয়া এবং অবশ্যই তা নিজেরা পান করা– ইত্যাদি বিষয়ে ঋগ্বেদে এমন অসম্ভব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, প্রক্রিয়াগুলির খুঁটিনাটি নিয়ে আদিম কল্পনার এমন জটিল জাল বুনেছেন যে বর্তমান সময়ে তার সমস্ত তাৎপর্য স্পষ্টভাবে বোঝা হয়তো সম্ভব নয়। এই সোমলতার কোনও সন্ধান এখন পাওয়া যায় না। সরস্বতী নদীর মতো তা হয়তো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেবল তার স্মৃতি এবং অশেষ গুণের কথা ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে রক্ষিত হয়ে আছে। ঋগ্বেদের দৃষ্টান্তে দেখা যায়, অনেক সময় সোমকে অন্ন বলা হতো, কখনো পিতু, অন্ধস্ প্রভৃতি অন্ন-বাচক শব্দও সোম সম্বন্ধে প্রযুক্ত হতো। যেমন–

যদ্দধিষে প্রদিবি চার্বন্নং দিবেদিবে পীতিমিদস্য বক্ষি।
উত হৃদোত মনসা জুষাণ উশন্নিন্দ্র প্রস্থিতান্ পাহি সোমান্ ।। (ঋগ্বেদ-৭/৯৮/২)।
তং ত্বা বয়ং পিতো বচোভির্গাবো ন হব্যা সুষুদিম।
দেবেভ্যস্ত্বা সধমাদমস্মভ্যং ত্বা সধমাদম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/১৮৭/১১)।
তে অদ্রয়ো দশযন্ত্রাস আশবস্তেষামাধানং পর্যেতি হর্ষতম্ ।
ত ঊ সুতস্য সোম্যস্য অন্ধসোংহশোঃ পীয়ুষং প্রথমস্য ভেজিরে।। (ঋগ্বেদ-১০/৯৪/৮)।
সং মাতৃভির্ন শিশুর্বাবশানো বৃষা দধন্বে পুরুবারো অদ্ভিঃ।
মর্যো ন যোষামভি নিষ্কৃতং যন্ৎসং গচ্ছতে কলশ উস্রিয়াভিঃ।। (ঋগ্বেদ-৯/৯৩/২)।
অর্থাৎ :
হে ইন্দ্র ! পূর্বকালে যে চারু অন্ন ধারণ করতে, এখনও প্রত্যহ সে সোমপানের কামনা কর। হৃদয় ও মনে আমাদের কামনা করে হে ইন্দ্র ! সম্মুখে আনীত সোম পান কর। (ঋক-৭/৯৮/২)।। হে পিতু ! ধেনুগণের নিকট যেরূপ হব্য গৃহীত হয়, সেরূপ তোমার নিকট আমরা স্তুতিদ্বারা রস গ্রহণ করি। ঐ রস কেবল দেবতাগণের নয় আমাদেরও হৃষ্ট করে। (ঋক-১/১৮৭/১১)।। সে প্রস্তরগুলি দশটি অঙ্গুলিকে বন্ধ রজ্জুস্বরূপ পেয়ে শীঘ্র শীঘ্র কার্য করছে। তাদের উৎপাদিত সোমরস হরিদ্বর্ণ হয়ে আসছে। সোমের অংশু ডাঁটা নিষ্পীড়িত হয়ে অন্নরূপ ধারণপূর্বক অমৃত রস নির্গত করে, তার প্রথম যে অংশ এরাই পেয়ে থাকে। (ঋক-১০/৯৪/৮)।। যেমন মাতৃবৎসল শিশুকে জননীরা ধারণ করেন সেরূপ সর্বজনের রসবর্ষণকারী এ সোমরস জল দ্বারা ধাবিত হচ্ছেন। যেমন পুরুষ যুবতীর দিকে গমন করেন ইনি সেরূপ আপন স্থানে যাচ্ছেন, গিয়ে কলসের মধ্যে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন। (ঋক-৯/৯৩/২)।।

তবে সোম সম্বন্ধে এসব অন্নবাচক শব্দ প্রযুক্ত হলেও এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মৃদু-মাদকত্বের গুণেই বৈদিক কবিদের মুখে সোমের এমন অসম্ভব প্রশংসা বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে; সোম স্বর্গের শিশু এবং মাদকত্ব-দায়ী এ-জাতীয় বর্ণনা ঋগ্বেদে বারবার পাওয়া যায়। যেমন–
এষ স্য মদ্যো রসোহব চষ্টে দিবঃ শিশুঃ। য ইন্দুর্বারমাবিশৎ।। (ঋগ্বেদ-৯/৩৮/৫)।
ইযমূর্জং পবমানাভ্যর্ষসি শ্যেনো ন বংসু কলশেষু সীদসি।
ইন্দ্রায় মদ্বা মদ্যো মদঃ সুতো দিবো বিষ্টম্ভ উপমো বিচক্ষণঃ।। (ঋগ্বেদ-৯/৮৬/৩৫)।
পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা যং তে সুষাব হর্যশ্বাদ্রিঃ।
সোতুর্বাহুভ্যাং সুয়তো নার্বা।। (ঋগ্বেদ-৭/২২/১)।
অর্থাৎ :
এ মদ্যরস সকল পদার্থ দর্শন করছে। তিনি স্বর্গের শিশু, এ সোম দশাপবিত্রে প্রবেশ করছেন। (ঋক-৯/৩৮/৫)।। হে সোম ! তুমি অন্ন ও পরাক্রম উৎপাদন কর। শ্যেনপক্ষী যেমন আপনার বাসায় বসে, তেমনি তুমি কলসের মধ্যে উপবেশন কর। তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে ইন্দ্রের আনন্দ ও মত্ততা উপস্থিত কর, যেহেতু তুমি মাদকতাশক্তিসম্পন্ন। তুমি

দ্যুলোকের সমযোগ্য স্তম্ভস্বরূপ, তুমি চতুর্দিক দৃষ্টি কর। (ঋক-৯/৮৬/৩৫)।। হে ইন্দ্র ! সোম পান কর, সোম তোমায় মত্ত করুক। হে হরি-নামক অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র ! রশ্মিদ্বারা সংযত অশ্বের ন্যায় অভিষব-কর্তার হস্তদ্বয়ে পরিগৃহীত প্রস্তর, এ সোম অভিষব করছে। (ঋক-৭/২২/১)।।

সোমের এই মদশক্তির মহিমা বৈদিক কবিরা নানা ভাবে বর্ণনা করেছেন, এ নিয়ে তাঁদের কল্পনার আর উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই। যেমন–

আ প্যায়স্ব মদিন্তম সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ। ভবা নঃ সুশ্রবন্তমঃ সখা বৃধে।। (ঋগ্বেদ-১/৯১/১৭)।।
ত্বং সোম নৃমাদনঃ পবস্ব চর্ষণীসহে। সস্নির্যো অনুমাদ্যঃ।। (ঋগ্বেদ-৯/২৪/৪)।
শুচিঃ পাবক উচ্যতে সোম সুতসা মধ্বঃ। দেবাবীরঘশংসহা।। (ঋগ্বেদ-৯/২৪/৭)।
নূ নো রয়িমুপ মাস্ব নৃবন্তং পুনানো বাতাপ্যং বিশ্বশ্চন্দ্রম্ ।
প্র বন্দিতুরিন্দো তার্যায়ু প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ।। (ঋগ্বেদ-৯/৯৩/৫)।
কনিক্রদদনু পন্থামৃতস্য শুক্রো বি ভাস্যমৃতস্য ধাম।
স ইন্দ্রায় পবসে মৎসরবান্ হিন্বানো বাচং মতিভিঃ কবীনাম্ ।। (ঋগ্বেদ-৯/৯৭/৩২)।
ত্বয়া হি নঃ পিতরঃ সোম পূর্বে কর্মাণি চক্রুঃ পবমান ধীরাঃ।
বন্বন্নবাতঃ পরিধীরপোর্ণু বীরেভিরশ্বৈর্মঘবা ভবা নঃ।। (ঋগ্বেদ-৯/৯৬/১১)।
যথাপবথা মনবে বয়োধা অমিত্রহা বরিবোবিদ্ধবিষ্মান্ ।
এবা পবস্ব দ্রবিণং দধান ইন্দ্রে সং তিষ্ঠ জনয়ায়ুধানি।। (ঋগ্বেদ-৯/৯৬/১২)।
অর্থাৎ :
অত্যন্ত মদযুক্ত, হে সোম ! সমস্ত লতাবয়ব দ্বারা বর্ধিত হও, শোভন অন্নযুক্ত হয়ে তুমি আমাদের সখা হও। (ঋক-১/৯১/১৭)।। হে সোম ! তুমি মনুষ্যগণের মদকর। হে শত্রুগণের অভিভবকারী সোম ! তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। তুমিও স্তুতিযোগ্য। (ঋক-৯/২৪/৪)।। অভিষুত মদকর সোম শুদ্ধ ও শোধক বলে উক্ত হন, তিনি দেবগণের প্রীতিকর এবং শত্রুগণের বিনাশক। (ঋক-৯/২৪/৭)।। হে সোম ! তুমি শোধিত হচ্ছ, আমাদের লোকবল করে দাও এবং ধন মেপে দাও, সকলের আহ্লাদ উৎপাদন করে এরূপ জল আমাদের দাও। তোমাকে যে স্তব করে যেন তার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, তিনি যেন প্রাতঃকালে ধন দেবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হন। (ঋক-৯/৯৩/৫)।। হে শুভ্রবর্ণ সোম ! তুমি যজ্ঞের পথে শব্দ করতে করতে অমৃতের আধারের ন্যায় শোভা পাচ্ছ। তুমি মত্ততার জন্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হচ্ছ। তোমার স্তবের জন্য কবিদের বাক্য স্ফূর্তি হচ্ছে। (ঋক-৯/৯৭/৩২)।। হে ক্ষরণশীল সোম ! আমাদের সুবোধ পূর্বপুরুষেরা তোমাকে আশ্রয় করে পুণ্য কার্যের অনুষ্ঠান করতেন। তুমি দুর্ধর্ষভাবে বিপক্ষদের হিংসা করতে করতে রাক্ষসদের তাড়িয়ে দাও, আমাদের ঘোটক ও সৈন্য ও ধন প্রদান কর। (ঋক-৯/৯৬/১১)।। যেরূপ তুমি মনুর জন্য ক্ষরিত হয়েছিলে, অন্ন দিয়েছিলে, বিপক্ষ সংহার করেছিলে, অশেষ প্রকার কাম্যবস্তু দিয়েছিলে এবং হোমের দ্রব্য পেয়েছিলে, সেরূপ

এখন ক্ষরিত হও, ধন দান কর, ইন্দ্রকে আশ্রয় কর, যুদ্ধে অস্ত্রসমূহ উৎপাদন কর। (ঋক-৯/৯৬/১২)।।

ঋগ্বেদের সমগ্র নবম মণ্ডল জুড়ে বারবার এ-জাতীয় কথার অভাব নেই। এই মদশক্তির গুণেই সোম অমৃত বলে স্তুত হয়েছে এবং বৈদিক কবিরা বারবার কল্পনা করেছেন যে সোমপান করে অমরত্ব লাভ করা যায়, মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। যেমন–

এষ দেবো অমর্ত্যঃ পর্ণবীরিব দীয়তি। অভি দ্রোণান্যাসদম্ ।। (ঋগ্বেদ-৯/৩/১)।
যো ন ইন্দুঃ পিতরো হৃৎসু পীতোহমর্ত্যো মর্ত্যা আবিবেশ।
তস্মৈ সোমায় হবিষা বিধেম মৃলীকে অস্য সুমতৌ স্যাম।। (ঋগ্বেদ-৮/৪৮/১২)।
যাস্তে প্রজা অমৃতস্য পরস্মিন্ধামন্নৃতস্য।
মূর্ধা নাভা সোম বেন আভূষন্তীঃ সোমঃ বেদঃ।। (ঋগ্বেদ-১/৪৩/৯)।
ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্যং মদম্ ।
শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ধারা ঋতস্য সাদনে।। (ঋগ্বেদ-১/৮৪/৪)।
অর্থাৎ :
মরণরহিত এ সোমদেব দ্রোণকলসাভিমুখে উপবিষ্ট হবার জন্য পক্ষীর ন্যায় গমন করছেন। (ঋক-৯/৩/১)।। হে পিতৃগণ ! যে সোম পীত হলে মরণরহিত হয়ে, আমরা মর্ত্য, আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে, হব্যদ্বারা সে সোমের পরিচর্যা করব, অতএব এর অনুগ্রহ বুদ্ধিতে অনুগ্রহ লাভ করে সুখী হব। (ঋক-৮/৪৮/১২)।। হে সোম ! তুমি অমর ও উত্তম স্থান প্রাপ্ত, তুমি শিরঃস্থানীয় হয়ে যজ্ঞগৃহে তোমার প্রজাদের কামনা কর; যে প্রজাগণ তোমাকে বিভূষিত করে, তুমি তাদের জান। (ঋক-১/৪৩/৯)।। হে ইন্দ্র ! তুমি এ অতিশয় প্রশংসনীয় হর্ষকর ও অমর সোমপান কর। যজ্ঞগৃহে এ দীপ্তিমান সোমধারা তোমারই দিকে বয়ে যাচ্ছে। (ঋক-১/৮৪/৪)।।

যে অমৃতধারা পান করে অমর হওয়া যায়, স্বভাবতই, দেবগণ এই অমর পানীয়টি পান করে অমরত্ব লাভ করেছিলেন; ঋগ্বেদে বৈদিক কবিদের এ-জাতীয় কল্পনারও ঘাটতি নেই। যেমন–

ত্বং হ্যঙ্গ দৈব্যা পবমান জনিমানি দ্যুমত্তমঃ। অমৃতত্বায় ঘোষয়ঃ।। (ঋগ্বেদ-৯/১০৮/৩)।
তব দ্রপ্সা উদপ্রুত ইন্দ্রং মদায় বাবৃধুঃ। ত্বা দেবাসো অমৃতায় কং পপুঃ।।
(ঋগ্বেদ-৯/১০৬/৮)।
অর্থাৎ :
হে সোম ! তোমার ন্যায় উজ্জ্বল কিছুই নেই। তুমি যখন ক্ষরিত হও তখন দেবতাবংশজাত সকল ব্যক্তিকে অমরত্ব দেবার নিমিত্ত আহ্বান করতে থাক। (ঋক-৯/১০৮/৩)।। হে সোম ! তোমার রসগুলি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইন্দ্রের মত্ততা উৎপাদন করবার জন্য তাঁকে গিয়ে সম্ভাষণ করছে। দেবতাবর্গ অমরত্ব পাবার জন্য তোমার সুখকর রস পান করলেন। (ঋক-৯/১০৬/৮)।।

অতএব শুধু দেবতারাই নন, মানুষেরাও এই অত্যাশ্চর্য পানীয়টি পান করে অমরত্ব লাভ করবে, এ-জাতীয় কামনাও ঋগ্বেদে বিভিন্নভাবে বিধৃত হয়েছে। যেমন–

অপাম সোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্ ।
কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ কিমু ধূর্তিরমৃত মর্ত্যস্য।। (ঋগ্বেদ-৮/৪৮/৩)।
শং নো ভব হৃদ আ পীত ইন্দ্রো পিতেব সোম সূনবে সুশেবঃ।
সখেব সখ্য উরুশংস ধীরঃ প্র ণ আয়ুর্জীবসে সোম তারীঃ।। (ঋগ্বেদ-৮/৪৮/৪)।
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।। (ঋগ্বেদ-৯/১১৩/১১)।
অর্থাৎ :
হে অমৃত সোম ! আমরা তোমাকে পান করব ও অমর হব, পরে দ্যুতিমান স্বর্গে গমন করব ও দেবগণকে অবগত হব। শত্রু আমাদের কী করবে? আমি মনুষ্য, হিংসাকারী আমার কী করবে? (ঋক-৮/৪৮/৩)।। হে সোম ! পিতা যেমন পুত্রের সখা, সেরূপ আমরা তোমায় পান করলে তুমি হৃদয়ের সুখকর হও। হে অনেকের প্রশংসিত সোম ! তুমি বুদ্ধিমান, তুমি আমাদের জীবনার্থে আয়ু প্রবর্ধিত কর। (ঋক-৮/৪৮/৪)।। যেখানে বিবিধ প্রকার আমোদ আহ্লাদ আনন্দ বিরাজ করছে, যেখানে অভিলাষী ব্যক্তির সকল কামনা পূর্ণ হয় সেখানে আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। (ঋক-৯/১১৩/১১)।।

এই অত্যন্ত মদশক্তিযুক্ত সোমের প্রশংসায় বৈদিক কবিদের এমন উচ্ছ্বসিত হবার একটি প্রধান কারণ তাঁদের কল্পনায় যুদ্ধদেবতা ইন্দ্র সোমপান করে নেশায় উন্মত্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বলবীর্য প্রদর্শন করেন। ঋগ্বেদে এ-জাতীয় দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেমন–

অস্যেদিন্দ্রো মদেষ্বা বিশ্বা বৃত্রাণি জিঘ্নতে। শূরো মঘা চ মংহতে।। (ঋগ্বেদ-৯/১/১০)।
স্বাদুষ্কিলায়ং মথুমা উতায়ং তীব্রঃ কিলায়ং রসবা উতায়ম্ ।
উতো্ন্বস্য পপিবাংসমিন্দ্রং ন কশ্চন সহত আহবেষু।। (ঋগ্বেদ-৬/৪৭/১)।
যস্তে মদো যুজ্যশ্চারুরস্তি যেন বৃত্রাণি হর্যশ্ব হংসি।
স ত্বামিন্দ্র প্রভূবসো মমত্তু।। (ঋগ্বেদ-৭/২২/২)।
আ পাক্থাসো ভলানসো ভনন্তালিনাসো বিষাণিনঃ শিবাসঃ।
আ যোহনয়ৎ সধমা আর্যস্য গব্যা তৃৎসুভ্যো অজগন্যুধা নৃন্ ।। (ঋগ্বেদ-৭/১৮/৭)।
অর্থাৎ :
শূর ইন্দ্র এ সোমপানে মত্ত হয়ে সমস্ত শত্রু বিনাশ করেন এবং যজমানগণকে ধনদান করেন। (ঋক-৯/১/১০)।। এ অভিষুত সোম সুস্বাদু, মধুর, তীব্র ও সারবান। ইন্দ্র এ সোমরস পান করলে কেউই রণস্থলে তাঁকে সহ্য করতে সমর্থ হয় না। (ঋক-৬/৪৭/১)।। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত, প্রভূত ধনবান ইন্দ্র ! তোমার উপযুক্ত ও সম্যক প্রস্তুত সোম আছে; যা দিয়ে তুমি বৃত্রগণকে হনন করেছ, সে সোম তোমায় প্রমত্ত করুক। (ঋক-৭/২২/২)।। হব্যসমূহের পাচক, ভদ্রমুখ, অপ্রবৃদ্ধ ও বিষাণহস্ত মঙ্গলকর ব্যক্তিগণ ইন্দ্রের স্তুতি করে। ইন্দ্র

সোমপানে মত্ত হয়ে আর্যের গাভীসমূহ হিংসকগণ হতে এনেছেন, স্বয়ং লাভ করেছেন এবং যুদ্ধে মনুষ্যগণকে বধ করেছেন। (ঋক-৭/১৮/৭)।।

ঋগ্বেদের প্রায় সর্বত্রই ইন্দ্রের বলবীর্যের প্রশস্তি দেখা যায়। ইন্দ্রের এই বলবীর্য প্রদর্শন সোমপান-জনিত বলেই হয়তো ঋগ্বেদে কোথাও কোথাও সোমকে বলা হয়েছে, 'তুমিও যে, ইন্দ্রও সে'। যেমন–

অদদ্ধ ইন্দ্রো পবসে মদিন্তম আত্মেন্দ্রস্য ভবসি ধাসিরুত্তমঃ।
অভি স্বরন্তি বহবো মণীষিণো রাজানমস্য ভুবনস্য নিংসতে।। (ঋগ্বেদ-৯/৮৫/৩)।
অর্থাৎ :
হে সোম ! তুমি বিনা বাধায় ক্ষরিত হচ্ছ। তোমার তুল্য আনন্দবিধাতা কেউ নেই। তুমিও যে, ইন্দ্রও সে। তোমার মত আহার আর নেই। বিস্তর বিদ্বান লোক তোমাকে স্তব করছেন। তুমি এ ভুবনের রাজা। তাঁরা তোমার নিকটবর্তী হচ্ছেন। (ঋক-৯/৮৫/৩)।।

কোথাও বা সোমকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরম সহায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং ঋগ্বেদে অজস্রবার এই কথা পাওয়া যায় যে, বৃত্রকে ধ্বংস করার কাজে সোমই ইন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন, উদ্দীপিত করেছিলেন। যেমন–

ত্বং নো বৃত্রহন্তমেন্দ্রস্যেন্দো শিবঃ সখা।
যৎসীং হবন্তে সমিথে বি বো মদে যুধ্যমানাস্তোকসাতৌ বিবক্ষসে।। (ঋগ্বেদ-১০/২৫/৯)।
স পবস্ব য আবিথেন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে। বব্রিবাংসং মহীরপঃ।। (ঋগ্বেদ-৯/৬১/২২)।
'আ প্র দ্রব পরাবতোহর্বাবতশ্চ বৃত্রহন্ । মধ্বঃ প্রতি প্রভর্মণি।।
তীব্রাঃ সোমাস আ গহি সুতাসো মাদয়িষ্ণবঃ। পিবা দধৃগ্যথোচিষে।।
ইষা মন্দস্বাদু তেহরং বরায় মন্যবে। ভুবত্ত ইন্দ্র শং হৃদে।।' (ঋগ্বেদ-৮/৮২/১-৩)।
অর্থাৎ :
যখন ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমাদের সন্তানদের সে যুদ্ধে বলিদান দিতে হয়, যখন যুদ্ধকারী শত্রুগণ চতুর্দিক হতে আমাদের যুদ্ধার্থে আহ্বান করতে থাকে তখন, হে সোম ! তুমি ইন্দ্রের সহায় হও। তাঁর আপদ বিপদ রক্ষা কর, কারণ তোমার মত শত্রুসংহারকারী কেউ নেই। বিপদের প্রতি লক্ষ্য করে তুমি বৃদ্ধি পাচ্ছ। (ঋক-১০/২৫/৯)।। হে সোম ! যখন বৃত্র তাবৎ জলভাণ্ডার রোধ করে রেখেছিল সে সময়ে ইন্দ্রের বৃত্রসংহারস্বরূপ ব্যাপারের সময় তুমি ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলে। সেই তুমি এক্ষণে ক্ষরিত হও। (ঋক-৯/৬১/২২)।।
হে বৃত্রহন্ (ইন্দ্র) ! যজ্ঞস্থ মধুর জন্য দূরদেশ হতে ও সমীপদেশ হতে এস।। তীব্র মদকর সোম অভিষুত হয়েছে, এস, পান কর এবং মত্ত হয়ে তার সেবা কর।। সোমরূপ অন্নদ্বারা মত্ত হও। এ তোমার শত্রুনিবারক ক্রোধের জন্য পর্যাপ্ত হোক। তোমার হৃদয়ে সোম সুখকর হোক। (ঋক-৮/৮২/১-৩)।।

বৃত্র-বধের উদ্দীপনা লাভের উদ্দেশ্যে ইন্দ্র কী অসম্ভব পরিমাণ সোমপানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সে-বিষয়ে বৈদিক কবিদের কল্পনা ও অতিরঞ্জনের যেন অন্ত নেই। যেমন–

‘সখা সখ্যে অপচত্তূয়মগ্নিরস্য ক্রত্বা মহিষা ত্রী শতানি।
ত্রী সাকমিন্দ্রো মনুষঃ সারাংসি সুতং পিবদ্বৃত্রহত্যায় সোমম্ ।।
ত্রী যচ্ছতা মহিষানামঘো মাস্ত্রী সরাংসি মঘবা সোম্যাপাঃ।
কারং ন বিশ্বে অহ্বন্ত দেবা ভরমিন্দ্রায় যদহিং জঘান।।’ (ঋগ্বেদ-৫/২৯/৭-৮)।
বর্ধান্যং বিশ্বে মরুতঃ সজোষাঃ পচ্ছতং মহিষা ইন্দ্র তুভ্যম্ ।
পূষা বিষ্ণুস্ত্রীণি সরাংসি ধাবন্ বৃত্রহণং মদিরমংশুমস্মৈ।। (ঋগ্বেদ-৬/১৭/১১)।
অর্থাৎ :
ইন্দ্রের মিত্রভূত অগ্নি স্বীয়মিত্র ইন্দ্রের কার্যে সহায়তা করবার জন্য সত্বর তিনশত মহিষ পাক করলেন; এবং ইন্দ্র বৃত্রবধের জন্য মনুপ্রদত্ত তিন পাত্র সোমরস এককালে পান করলেন।। হে ইন্দ্র! যখন তুমি তিনশত মহিষের মাংস ভক্ষণ করেছিলে, যখন ঐশ্বর্যসম্পন্ন তুমি তিন পাত্র সোমরস পান করেছিলে; তখন তিনি বৃত্র সংহার করেছিলেন, তখন সমস্ত দেবতা সোমপানকারী ইন্দ্রকে ভৃত্যবৎ যুদ্ধস্থলে আহ্বান করেছিলেন। (ঋক-৫/২৯/৭-৮)।। হে ইন্দ্র! অখিল মরুৎগণ সম্প্রীতিভাজন হয়ে তোমাকে স্তোত্র দ্বারা বর্ধিত করে, তোমার জন্য পূষা ও বিষ্ণু শত মহিষ পাক করুন এবং মদকর শত্রুনাশক সোমপূর্ণ তিনটি নদী প্রবাহিত হোক। (ঋক-৬/১৭/১১)।।

আবার ঋগ্বেদের দৃষ্টান্তে অন্যান্য বৈদিক কবির কল্পনা অনুসারে জন্মগ্রহণের পর থেকেই ইন্দ্রকে তাঁর মাতা সোমপান করাতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

জজ্ঞানঃ সোমং সহসে পপাথ প্র তে মাতা মহিমানমুবাচ।
এন্দ্র পপ্রাথোর্বন্তরিক্ষং যুধা দেবেভো বরিবশ্চকর্থ।। (ঋগ্বেদ-৭/৯৮/৩)।
অস্য পিব যস্য জজ্ঞান ইন্দ্র মদায় ক্রত্বে অপিবো বিরপ্-শিন্ ।
তমু তে গাবো নর আপ্যে অদ্রিরিন্দুং সমহ্যৎপীতয়ে সমস্মৈ।। (ঋগ্বেদ-৬/৪০/২)।
অদ্রোঘ সত্যং তব তন্মহিত্বং সদ্যো যজ্জাতো অপিবো হ সোমম্ ।
ন দ্যাব ইন্দ্র তবসস্ত ওজো নাহা ন মাসাঃ শরদো বরন্ত।। (ঋগ্বেদ-৩/৩২/৯)।
ত্বং সদ্যো অপিবো জাত ইন্দ্র মদায় সোমং পরমে ব্যোমন্ ।
যদ্ধ দ্যাবাপৃথিবী অবিবেশীরথাভবঃ পূর্ব্যঃ কারুধায়াঃ।। (ঋগ্বেদ-৩/৩২/১০)।
যজ্জায়থাস্তদহরস্য কামেহংশোঃ পীয়ূষমপিবো গিরিষ্ঠাম্ ।
তং তে মাতা পরি যোষা জনিত্রী মহঃ পিতুর্দম অ্যাসিঞ্চদগ্রে।। (ঋগ্বেদ-৩/৪৮/২)।
অর্থাৎ :
হে ইন্দ্র! তুমি জন্ম গ্রহণ করেই বলের জন্য সোম পান করেছিলে। মাতা তোমার মহিমা বলেছেন। তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ পূর্ণ করেছ এবং দুগ্ধার্থে স্তোতৃগণের জন্যই ধন উৎপাদন করেছ। (ঋক-৭/৯৮/৩)।। হে মহেন্দ্র! তুমি উল্লাস ও বীরত্ব প্রকাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ মাত্রেই যে সোম পান করেছিলে, সে সোম পান কর। গোগণ, ঋত্বিগ্বর্গ বারিরাশি ও পাষাণ

সকলে তোমার পানার্থে এ সোম প্রস্তুত করতে সমবেত হয়। (ঋক-৬/৪০/২)।। হে দৌরাত্মরহিত ইন্দ্র! তোমার মহিমাই যথার্থ মহিমা। যেহেতু তুমি উৎপন্ন হয়েই সোম পান কর। তুমি বলবান, স্বর্গাদিলোক তোমার তেজ নিবারণ করতে পারে না। দিন, মাস ও বৎসরও নিবারণ করতে পারে না। (ঋক-৩/৩২/৯)।। হে ইন্দ্র! তুমি জাতমাত্র সর্বোচ্চ স্বর্গ প্রদেশে থেকেই সদ্য আনন্দের জন্য সোম পান করেছ, যখন তুমি দ্যাবাপৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছ তখনই তুমি পুরাতন সৃষ্টি বিধাতা হয়েছ। (ঋক-৩/৩২/১০)।। যে দিন (ইন্দ্র) তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, সে দিনেই সোম পানের ইচ্ছা হলে তুমি পর্বতস্থ সোমলতার রস পান করেছিলে! যেহেতু তোমার মাতা যুবতী অদিতি তোমার প্রসিদ্ধ পিতার গৃহে স্তন্যদানের পূর্বে তোমায় সোম দান করেছিলেন। (ঋক-৩/৪৮/২)।।

মোটকথা, সোম-পানের মাদকত্ব ছাড়া ইন্দ্রের কথা যেন ভাবাই যায় না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের গায়ত্রী ছন্দে রচিত একটি সমগ্র সূক্তেই ইন্দ্র স্বয়ং সোমপান-জনিত হর্ষে যেন স্বগতোক্তি করে চলেছেন, যেমন (ঋগ্বেদ-সূক্ত-১০/১১৯)–

ইতি বা ইতি মে মনো গামশ্বং সনুয়ামিতি। কুবিৎসোমস্যাপামিতি।। ১
প্র বাতা ইব দোধত উন্মা পীতা অযংসত। কুবিৎসোমস্যাপামিতি।। ২
উন্না পীতা অযংসত রথমশ্বা ইবাশবঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি।। ৩
উপমা মতিরস্থিত বাশ্রা পুত্রমিব প্রিয়ম্ । কুবিৎসোমস্যাপামিতি।। ৪
অহং তষ্টেব বন্ধুরং পর্যচামি হৃদা মতিম্ । কুবিৎসোমস্যাপামিতি।। ৫
নহি মে অক্ষিপচ্চনাচ্ছাংৎসুঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি।। ৬
নহি মে রোদসী উভে অন্যং পক্ষং চন প্রতি। কুবিৎসোমস্যাপামিতি।। ৭
অভি দ্যাং মহিনা ভুবমভী মাং পৃথিবীং মহীম্ । কুবিৎসোমস্যাপামিতি।। ৮
হন্তাহং পৃথিবামিনাং নি দধানীহ বেহ বা। কুবিৎসোমস্যাপামিতি।। ৯
ওষমিৎ পৃথিবীমহং জঙ্ঘনানীহ বেহ বা। কুবিৎসোমস্যাপামিতি।। ১০
দিবি মে অন্যঃ পক্ষো ধো অন্যমতীকৃষম্ । কুবিৎসোমস্যাপামিতি।। ১১
অহমস্মি মহামহোহভিনভ্যমুদীষিতঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি।। ১২
গৃহো যাম্যরংকৃতো দেবেভ্যো হব্যবাহনঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি।। ১৩
অর্থাৎ :
আমার মানসই এই যে, গো অশ্ব দান করি। আমি অনেকবার সোম পান করেছি। ১।। যেমন বায়ু বৃক্ষকে কম্পিত ও উন্নমিত করে সেরূপ সোমরস আমাকর্তৃক পীত হয়ে আমাকে উন্নমিত করেছে। আমি অনেকবার সোম পান করেছি। ২।। যেরূপ শীঘ্রগামী ঘোটকেরা রথকে উন্নমিত করে রাখে সেরূপ সোমরসগুলি আমা কর্তৃক পীত হয়ে আমাকে উন্নমিত করে রেখেছে। আমি অনেকবার সোম পান করেছি। ৩।। যেরূপ গাভী হাম্বারবে বৎসের প্রতি যায় সেরূপ স্তব আমার দিকে আসছে। আমি অনেকবার সোম পান করেছি। ৪।। যেরূপ ত্বষ্টা (ছুতার) রথের উপরিভাগ নির্মাণ করে সেরূপ আমি মনে মনে স্তব রচনা করেছি অর্থাৎ স্তোতার মনে স্তব উদয় করে দিই। আমি অনেকবার সোম পান করেছি। ৫।। পঞ্চ

জনপদের যে মনুষ্য আছে, তারা কেউ কখন আমার দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না। আমি অনেকবার সোম পান করেছি। ৬।। দুই দ্যাবাপৃথিবী মিলিত হয়ে আমার এক পার্শ্বেরও সমান হবে না। আমি অনেকবার সোম পান করেছি। ৭।। আমার মহিমা স্বর্গলোককে এবং এ বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করে। আমি অনেকবার সোম পান করেছি। ৮।। আমার এরূপ ক্ষমতা যে যদি বল, তবে এ পৃথিবীকে একস্থান হতে অন্য স্থানে সরিয়ে রাখতে পারি। আমি অনেকবার সোম পান করেছি। ৯।। এ পৃথিবীকে আমি দগ্ধ করতে পারি। যে স্থান বল সে স্থান ধ্বংস করতে পারি। আমি অনেকবার সোম পান করেছি। ১০।। আমার এক পার্শ্বদেশ আকাশে আছে আর এক পার্শ্বদেশ নীচের দিকে অর্থাৎ পৃথিবীতে রেখেছি। আমি অনেকবার সোম পান করেছি। ১১।। আমি মহতেরও মহৎ, আমি আকাশের দিকে উঠছি। আমি অনেকবার সোম পান করেছি। ১২।। আমাকে স্তব করে, আমি দেবতাদের নিকট হব্য বহন করি এবং আমি হব্য গ্রহণপূর্বক চলে যাই। আমি অনেকবার সোম পান করেছি। ১৩।।

এ জাতীয় দৃষ্টান্তে আদিম কাব্যশক্তির পরিচয় অবশ্যই উপেক্ষণীয় নয়। এবং সোমরসের হর্ষদায়ী মাদকত্ব গুণের পরিচয়ও নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট। কিন্তু সোম নামের এই বৈদিক দেবতাটির মধ্যে কোনো লোকোত্তর আধ্যাত্মিক লক্ষণ অন্বেষণ করা অবান্তর নয় কি ?

.

দেবতা বৃহস্পতি :

পৃথিবীস্থানের আর একটি উল্লেখযোগ্য দেবতা হলেন বৃহস্পতি। পরবর্তীকালের দার্শনিক প্রস্থানে চার্বাক আলোচনায় এই বৃহস্পতি নামটি নিশ্চয়ই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধানতম বিষয় হিসেবেই চিহ্নিত করা হলেও ঋগ্বেদে বৃহস্পতির কল্পিত দেবগরিমা সেমত মুখ্য নয়।

মনে হয় বৃহস্পতির সঙ্গে ব্রহ্মণস্পতির খুব ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, এবং উভয়েই একই দেবতা। ঋগ্বেদের সূক্ত-বিশেষে (ঋগ্বেদ-সূক্ত-২/২৩) উভয় নামই সমভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব ব্রহ্মন্ শব্দটির অর্থ-বিশ্লেষণ এই দেবনামের উপর আলোকপাতে সহায়ক হতে পারে। যদিও উপনিষদে 'ব্রহ্মণ' শব্দের অর্থ পরমসত্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ঋগ্বেদে মোটেও তা নয়। নিঘণ্টু-মতে জানা যায়, ব্রহ্মন্ মানে অন্ন (নিঘণ্টু-২/৭) বা ধন (নিঘণ্টু-২/১০)। হয়তো বা শব্দটির প্রাক্-ইতিহাস এমন এক আদিম পর্যায়ের পরিচায়ক যখন মানুষের ধনসম্পদ বলতে প্রধানতই অন্ন বা খাদ্যদ্রব্য। সেক্ষেত্রে প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে ব্রহ্মণ্ শব্দের অন্নবাচকত্ব অবশ্য-স্বীকার্য। নিঘণ্টুর ব্যাখ্যায় নিরুক্তকার যাস্কও এ-শব্দের অন্নবাচকত্ব নিষ্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে তৈত্তিরীয় উপনিষদ থেকে 'জাতানি অন্নেন বর্ধন্তে' ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের সংশ্লিষ্ট শ্রুতিতে বলা হয়েছে–

'অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীংশ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্ । তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে। সর্বং বৈ তেহন্নমাপ্লুবন্তি।

যেহন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্ । তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে। অন্নাদ্ ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে। অদ্যতেহত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি।'- (তৈত্তিরীয়-২/২/১)

অর্থাৎ :

এই জগতে যত প্রজা (প্রাণী) আছে সব অন্ন থেকে উৎপন্ন। অন্নেই জীবন ধারণ করে। আবার জীবন শেষে ঐ অন্নেই বিলীন হয়। কারণ অন্নই হল সবার বড়। বস্তুর মধ্যে সর্বপ্রথম অন্নের জন্ম। তাই অন্নই হল সর্বৌষধি। যাঁরা অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে তাঁরা যাবতীয় অন্নই প্রাপ্ত হয়। অন্ন থেকেই যাবতীয় ভূতের জন্ম। অন্নের জন্ম তারও আগে। অন্ন দ্বারাই জীব পুষ্ট হয়। অন্ন যেমন প্রাণীদের খাদ্য তেমনি প্রাণীরাও অন্নের অন্ন। সেজন্যই অন্নকে (খাদ্যকে) বলা হয় অন্ন। (তৈত্তিরীয়-২/২/১)

অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করার– স্তুতি করার– উপনিষদীয় ভাবনাটির উৎসে যে ব্রহ্মন্ শব্দের আদি-তাৎপর্যই প্রতিফলিত তা অনস্বীকার্য। তাই স্বীকার করতেই হয় যে প্রকৃত বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে শব্দটির প্রাথমিক অর্থ অন্ন। বেদ-ভাষ্যকার সায়ণাচার্যও বহু দৃষ্টান্তে ব্রহ্মন্ শব্দকে 'স্তোত্র' অর্থে ব্যবহার করলেও সুপ্রাচীন অন্নবাচক অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করতে পারেননি। অতএব এই দেবতাটির নামকরণের মূলে সুস্পষ্ট পার্থিব সম্পদের কামনাই অনুমেয়।

'বৃহস্পতির জন্মবৃত্তান্ত, বর্ণনা, কীর্তিকলাপ এবং অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে বিবিধ পৌরাণিক ও কবিত্বময় কল্পনার নিদর্শন পাওয়া যায় এবং তাঁর প্রশংসায় বৈদিক কবিরা প্রায়ই এমন বিশেষণ ব্যবহার করেছেন যার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই– অর্থাৎ প্রায় সমস্ত প্রধান-প্রধান বৈদিক দেবতাদের প্রসঙ্গে একই বিশেষণ প্রযুক্ত। এবং বলাই বাহুল্য, অন্যান্য বৈদিক দেবতাদের মতোই এই বৃহস্পতিকে উদ্দেশ্য করে বারবার বিবিধ পার্থিব সম্পদের কামনাই ব্যক্ত হয়েছে।'- (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৫৭)। যেমন–

ত্রাতারং ত্বা তনূনাং হবামহেহবস্পর্তরধিবক্তারমস্ময়ুম্ ।
বৃহস্পতে দেবনিদো নি বর্হয় মা দুরেবা উত্তরং সুম্নমুন্নশন্ ।। (ঋগ্বেদ-২/২৩/৮)।
ত্বা বয়ং সুবৃধা ব্রহ্মণস্পতে স্পার্হা বসু মনুষ্যা দদীমহি।
যা নো দূরে তলিতো যা অরাতয়োহভি সন্তি জম্ভয়া তা অনপ্নসঃ।। (ঋগ্বেদ-২/২৩/৯)।
ত্বয়া বয়মুক্তমং ধীমহে বয়ো বৃহস্পতে পপ্রিণা সস্নিনা যুজা।
মা নো দুঃশংসো অভিদিপ্সুরীশত প্র সুশংসা মতিভিস্তারিষীমহি।। (ঋগ্বেদ-২/২৩/১০)।
অনানুদো বৃষভো জগ্মিরাহবং নিষ্টপ্তা শত্রু পৃতনাসু সাসহিঃ।
অতি সত্য ঋণয়া ব্রহ্মণস্পত উগ্রস্য চিন্দমিতা বীলুহর্ষিণঃ।। (ঋগ্বেদ-২/২৩/১১)।
স সন্নয়ঃ স বিনয়ঃ পুরোহিতঃ স সুষ্টুতঃ স যুধি ব্রহ্মণস্পতিঃ।
চাক্ষ্মো যদ্বাজং ভরতে মতী ধনাদিৎসূর্যস্তপতি তপ্যতুর্বথা।। (ঋগ্বেদ-২/২৪/৯)।

জনায় চিদ্য ঈবত উ লোকং বৃহস্পতির্দেবহূতৌ চকার।
ঘ্নন্ বৃত্রাণি বি পুরো দর্দরীতি জয়ঞ্ছত্রুঁরমিত্রাৎ পৃৎসু সাহন্ ।। (ঋগ্বেদ-৬/৭৩/২)।
অর্থাৎ :
হে বৃহস্পতি! তুমি লোক সকলকে উপদ্রব হতে রক্ষা কর, তুমি আমাদের পুত্রাদিকে পালন কর, আমাদের প্রতি মিষ্টবাক্য প্রয়োগ কর এবং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা তোমাকে আহ্বান করি। তুমি দেবনিন্দুকদের বিনাশ কর, দুর্বুদ্ধিগণ যেন উৎকৃষ্ট সুখ লাভ করতে না পারে। (ঋক-২/২৩/৮)।। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি আমাদের বর্ধিত করলে আমরা যেন মনুষ্যগণের নিকট হতে স্পৃহণীয় ধন প্রাপ্ত হই। দূরে বা নিকটে যে সকল শত্রু আমাদের অভিভব করে সেই যজ্ঞহীন শত্রুদের বিনাশ কর। (ঋক-২/২৩/৯)।। হে বৃহস্পতি! তুমি অভিলাষ পুরক ও পবিত্র, আমরা তোমার সহায়তা লাভ করে উৎকৃষ্ট অন্ন লাভ করব। যে দুরাত্মা আমাদের পরাভব করতে ইচ্ছা করে, সে যেন আমাদের অধিপতি না হয়, আমরা উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা পুণ্যবান হয়ে যেন উন্নতি লাভ করি। (ঋক-২/২৩/১০)।। হে ব্রহ্মণস্পতি! তোমার দানের উপমা নেই, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি যুদ্ধে গমন করে শত্রুদের সন্তাপ প্রদান কর এবং সংগ্রামে তাদের বিনাশ কর। তোমার পরাক্রমই সত্য, তুমি ঋণ পরিশোধ কর, তুমি উগ্র এবং মদোন্মত্ত ব্যক্তিদের দমন কর। (ঋক-২/২৩/১১)।। ব্রহ্মণস্পতি পুরোহিত, তিনি পদার্থ সকল একত্রিত ও পৃথককৃত করেন, তাঁকে সকলে স্তব করে, তিনি যুদ্ধে আবির্ভূত হন। সর্বদর্শী ব্রহ্মণস্পতি যখন অন্ন ও ধন ধারণ করেন তখনই সূর্য অনায়াসে দীপ্ত হন। (ঋক-২/২৪/৯)।। যে বৃহস্পতি যজ্ঞে স্তুতিকারী লোককে স্থান প্রদান করেন, তিনি বৃত্রগণকে বধ করেন, যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করেন, অমিত্রসমূহকে অভিভূত করেন এবং পুরী সকল বিশেষরূপে বিদীর্ণ করেন। (ঋক-৬/৭৩/২)।।

এখানে বৃহস্পতি কর্তৃক বৃত্রবধ, অমিত্রসমূহকে অভিভূত করা এবং পুরী সকল বিশেষরূপে বিদীর্ণ করার বর্ণনা থেকে মনে হয় তিনি ইন্দ্রের অনুরূপ আচরণ করেন। এখানে আরও উল্লেখ্য, বৃহস্পতি শুধুই যে এইভাবে স্তুত হয়েছেন তাই নয়, তিনি নিজেও স্তুতি রচনা করেছেন এবং স্তোত্র গান করেছেন। যেমন–

প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতি র্মন্ত্রং বদত্যুক্থ্যম্ ।
যস্মিন্নিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দেবা ওকাংসি চক্রিরে।। (ঋগ্বেদ-১/৪০/৫)।
দেবাশ্চিত্তে অসূর্য প্রচেতসো বৃহস্পতে যজ্ঞিয়ং ভাগমানশুঃ।
উস্রা ইব সূর্যো জ্যোতিষ্য মহো বিশ্বেষামিজ্জনিতা ব্রহ্মণামসি।। (ঋগ্বেদ-২/২৩/২)।
এন্দ্রো বর্হিঃ সীদতু পিন্বতামিলা বৃহস্পতিঃ সামভির্ঋক্বো অর্চতু।
সুপ্রকেতং জীবসে মন্ম ধীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে।। (ঋগ্বেদ-১০/৩৬/৫)।
অস্য শ্লোকো দিবীয়তে পৃথিব্যামত্যো ন যংসদ্যক্ষভৃদ্বিচেতাঃ।
মৃগাণাং ন হেতয়ো যন্তি চেমা বৃহস্পতেরহিমায়া অভি দ্যূন্ ।। (ঋগ্বেদ-১/১৯০/৪)।
হংসৈরিব সখিতির্বাবদদ্ভিরশ্মন্ময়ানি নহনা ব্যস্যন্ ।
বৃহস্পতিরভিকনিক্রদদ্গা উত প্রাস্তেঃদুচ্চ বিদ্বা অগায়ৎ।। (ঋগ্বেদ-১০/৬৭/৩)।

স সুষ্টুভা স ঋক্বতা গণেন বলং রুরোজ ফলিগং রবেণ।
বৃহস্পতিরুস্রিয়া হব্যসূদঃ কনিক্রদদ্বাবশতীরুদাজৎ।। (ঋগ্বেদ-৪/৫০/৫)।
অর্থাৎ :
ব্রহ্মণস্পতি নিঃসন্দেহই উক্থ্য (স্তুতি)-রূপ পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করেন। সে মন্ত্রে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা দেবগণ অবস্থিতি করেন। (ঋক-১/৪০/৫)।। হে অসূর্য প্রকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন বৃহস্পতি! দেবগণ তোমার যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত হয়েছেন। জ্যোতি দ্বারা পূজনীয় সূর্য যেরূপ কিরণ উৎপাদন করেন, সেরূপ তুমি সমস্ত মন্ত্র উৎপাদন কর। (ঋগ্বেদ-২/২৩/২)।। ইন্দ্র এসে কুশের উপর উপবেশন করুন, স্তুতিবাক্য বিশেষরূপে উচ্চারিত হোক, বৃহস্পতি ঋক ও সামের দ্বারা অর্চনা করুন, আমরা যেন উত্তম উত্তম কাম্যবস্তু লাভ করে দীর্ঘজীবী হই। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। (ঋক-১০/৩৬/৫)।। বৃহস্পতির শ্লোক দ্যুলোক ও ভূলোক ব্যাপ্ত হচ্ছে। বৃহস্পতি সূর্যের ন্যায় পূজিত হব্য ধারণ করেন, প্রাণীদের চৈতন্য সমুৎপাদন করেন ও ফল প্রদান করেন। বৃহস্পতির আয়ুধ মৃগয়াশীলগণের আয়ুধের ন্যায় গমন করে ও মায়াচারীদের অভিমুখে প্রত্যহ ধাবিত হয়। (ঋক-১/১৯০/৪)।। বৃহস্পতির সহায়কগণ হংসের ন্যায় কোলাহল করতে লাগল, তাদের সাহায্যে তিনি প্রস্তরময় দ্বার খুলে দিলেন। অভ্যন্তরে রুদ্ধ গাভীগণ চিৎকার করে উঠল। তিনি উৎকৃষ্টরূপে স্তব ও উচ্চৈস্বরে গান করে উঠলেন। (ঋক-১০/৬৭/৩)।। বৃহস্পতি স্তুতিযুক্ত ও দীপ্তিশালী গণের সাথে শব্দদ্বারা বলকে নাশ করেছিলেন। তিনি শব্দ করে ভোগপ্রদাত্রী ও হব্যপ্রেরিকা গাভীগণকে বার করেছিলেন। (ঋক-৪/৫০/৫)।।

এখানে ‘গণ’ শব্দটির উল্লেখ থেকে প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ঋগ্বেদে ‘গণ’ শব্দের অর্থ ট্রাইব বা ট্রাইবের যৌথ-জীবন। এ-প্রেক্ষিতে দেখা যায়, ঋগ্বেদের অন্যত্রও ব্রহ্মণস্পতিকে একাধারে গণপতি, শ্রেষ্ঠ কবি এবং শ্রেষ্ঠ অন্ন বলে প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন–
গণানাং ত্বাং গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্ ।
জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্ ।। (ঋগ্বেদ-২/২৩/১)।
অর্থাৎ :
হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি দেবগণের মধ্যে গণপতি, কবিগণের মধ্যে কবি, তোমার অন্ন সর্বোৎকৃষ্ট ও উপমানভূত। তুমি ব্রহ্মনদের (অন্নগুলির) মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজা। আমরা তোমাকে আহ্বান করি, তুমি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করে রক্ষাগুলির সাথে আমাদের গৃহে উপবেশন কর। (ঋক-২/২৩/১)।।

এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে স্তুত দেবতা এবং স্তোতা মানবদের সম্পর্ক এমনই ঘরোয়া ও ঘনিষ্ঠ যে, বৈদিক কবিদের অজস্র অতিশয়োক্তি সত্ত্বেও বৃহস্পতির পরিকল্পনায় আধুনিক অর্থে অধ্যাত্মবাদী চেতনা অন্বেষণ করা বাস্তবিকই দুরুহ প্রতীয়মান হয়।

.
পৃথিবী দেবতা :
পৃথিবীস্থানের আর একটি দেবতা বলতে পৃথিবীই। পৃথিবী এখানে মাতৃদেবী, এবং মাতৃদেবী হিসেবে বৈদিক সাহিত্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য যেমন খুবই স্বল্প, গৌরবও অতি গৌণ। ঋগ্বেদে প্রধানতই স্বর্গের দেবতা দ্যৌ-এর সঙ্গে সংযুক্তভাবে দ্যাবাপৃথিবী হিসেবে তিনি স্তুত হয়েছেন। নয়তো তাঁর স্বতন্ত্র স্তুতি বলতে মাত্র একটি ছোট্ট সূক্ত (ঋগ্বেদ-সূক্ত-৫/৮৪), যেমন–

‘বলিত্থা পর্বতানাং খিদ্রং বিভর্ষি পৃথিবি।
প্র যা ভূমিং প্রবত্বতি মহ্না জিনোষি মহিনি।। ১
স্তোমাসস্ত্বা বিচারিণি প্রতি ষ্টোভন্ত্যক্তুভিঃ।
প্র যা বাজং ন হেষন্তং পেরুমস্যস্যর্জুনি।। ২
দৃড়্হা চিদ্যা বনস্পতীন্ ক্ষয়া দর্ধর্ষ্যোজসা।
যত্তে অভ্রস্য বিদ্যুতো দিবি বর্ষন্তি বৃষ্টয়ঃ’।। ৩
অর্থাৎ :
হে পৃথিবী! ফলতঃ এস্থলে তুমি পর্বত সকলের খণ্ড ধারণ করছ। তুমি বলশালী ও শ্রেষ্ঠ কারণ তুমি মাহাত্ম্যদ্বারা পৃথিবীর প্রীতি বিধান কর। ১।। হে বিচিত্রগমনশালিনী পৃথিবী! স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন। হে অর্জুনি! তুমি শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় বারিপূর্ণ মেঘকে উৎক্ষিপ্ত কর। ২।। যে সময় দীপ্তিশালী অন্তরীক্ষ হতে তোমার মেঘের বৃষ্টি পতিত হয়, সে সময় তুমি দৃঢ় পৃথিবীর সাথে বৃক্ষ সকলকে বলপূর্বক ধারণ করে রাখ। ৩।।

এখানে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর এই স্তুতি বহুলাংশেই মূর্ত পৃথিবীর প্রশংসামাত্র। এখানে কোনরূপ অধ্যাত্ম খোঁজা নিরর্থক মাত্র।

এ-ছাড়া পৃথিবীস্থানের উল্লেখযোগ্য আর অন্যান্য দেবতা বলতে কয়েকটি নদী এবং প্রধানতই সরস্বতী। যেমন–

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ।। (ঋগ্বেদ-১/৩/১০)।।
মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা। ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি।। (ঋগ্বেদ-১/৩/১২)।।
শুচির্দেবেষ্বর্পিতা হোত্রা মরুৎসু ভারতী। ইলা সরস্বতী মহী বর্হিঃ সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১৪২/৯)।
অর্থাৎ :
পবিত্রা, অন্নযুক্তযজ্ঞবিশিষ্টা ও যজ্ঞফলরূপধনদাত্রী সরস্বতী আমাদের অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন। (ঋক-১/৩/১০)।। সরস্বতী প্রবাহিত হয়ে প্রভূত জল সৃজন করেছেন, এবং সকল জ্ঞান উদ্দীপন করেছেন। (ঋক-১/৩/১২)।। শুচি এবং দেবগণের মধ্যস্থা, হোমনিষ্পাদিকা ভারতী, ইলা এবং সরস্বতী যজ্ঞের উপযুক্তা হয়ে কুশের উপর উপবেশন করুন। (ঋক-১/১৪২/৯)।।

উল্লিখিত নদীগুলির স্তুতি যেরূপই হোক না কেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে দেবী হিসেবে নদীগুলির স্থান ঋগ্বেদে একেবারেই গৌণ এবং এগুলি মূলতই মূর্ত ও পার্থিব নদী হিসেবেই স্তুত।

৩.৪ : দেবতা ও মানব– ইন্দ্র, বরুণ ও মরুৎগণ

ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা বলতে অবশ্যই বরুণ ও ইন্দ্র। এবং প্রধানতম বলেই, বিদ্বান গবেষকদের মতে, এঁদের সূত্র অনুসরণ করে বৈদিক সমাজ ও বৈদিক চিন্তার অত্যন্ত মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং বিবর্তন বোঝবার সুযোগ হতে পারে। তবে বর্তমান আলোচনার প্রাসঙ্গিক হিসেবে বৈদিক দেবতাদের প্রকৃতি বোঝার আশায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিচার করা যেতে পারে। এবং পর্যালোচনার সুবিধার্থে এক্ষেত্রে আমরা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ‘ভারতীয় দর্শন’ গ্রন্থের আলোচনা-রীতির অনুসরণ করতে পারি।

ঋগ্বেদে মরুৎগণের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক কবিদের বর্ণনায় এঁদের একটি প্রধান কীর্তি বলতে যুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়তা। সেসব বর্ণনায়– মরুৎগণ যুদ্ধে ইন্দ্রকে বর্ধিত করেন এবং তাঁর সহায় হন, বৃত্র-সংহারে সাধারণত তাঁরাই ইন্দ্রের সহচর, শম্বর প্রমুখের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁরাই ইন্দ্রের সহায়ক। বস্তুত ইন্দ্রের প্রায় সমস্ত যুদ্ধমূলক কীর্তিতে মরুৎগণের সাহচর্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

যা আভজো মরুত ইন্দ্র সোমে যে ত্বামবর্ধন্নভবন্ গণস্তে।
তেভিরেতং সজোষা বাবশানোহগ্নেঃ পিব জিহ্বয়া সোমমিন্দ্র।। (ঋগ্বেদ-৩/৩৫/৯)।
উত ঋতুভির্ঋতুপাঃ পাহি সোমমিন্দ্র দেবেভিঃ সখিভিঃ সুতং নঃ।
যা আভজো মরূতো যে ত্বান্বহন্বৃত্র মদধূস্তুভ্যমোজঃ।। (ঋগ্বেদ-৩/৪৭/৩)।
যে ত্বাহিহত্যে মঘবন্নবর্ধন্যে শাম্বরে হরিবো যে গবিষ্টৌ।
যে ত্বা নূনমনুমদন্তি বিপ্রাঃ পিবেন্দ্র সোমং সগণো মরুদ্ভিঃ।। (ঋগ্বেদ-৩/৪৭/৪)।
বৃত্রেণ যদহিনা বিভ্রদায়ুধা সমস্থিথা যুধয়ে শংসমাবিদে।
বিশ্বে তে অত্র মরুতঃ সহ ত্মনাবর্ধন্নুগ্র মহিমানমিন্দ্রিয়ম্ ।। (ঋগ্বেদ-১০/১১৩/৩)।
অর্থাৎ :
হে ইন্দ্র! সোমপান কালে যে মরুৎগণকে সম্ভাবিত কর, যারা যুদ্ধে তোমাকে বর্ধিত করে ও তোমার সহায় হয়, সে সকল মরুৎগণের সাথে মিলিত হয়ে সোমপানাভিলাষী হয়ে অগ্নির জিহ্বা দ্বারা পান কর। (ঋক-৩/৩৫/৯)।। হে ঋতুপা ইন্দ্র! তুমি সখিভূত মরুৎগণের সাথে আমাদের অভিষুত সোম পান কর। তুমি যাদের যুদ্ধে সাহায্যার্থে গ্রহণ করেছিলে যাঁরা তোমাকে আনুকূল্য করায় তুমি বৃত্রকে বধ করেছিলে, সে মরুৎগণ তোমাকে পরাক্রম প্রদান করেছিলেন। (ঋক-৩/৪৭/৩)।। হে মঘবন ইন্দ্র! যাঁরা বৃত্র বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, হে অশ্ববান! যাঁরা শম্বর বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, যাঁরা ধেনুগণের জন্য যুদ্ধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, যাঁরা অদ্যাপি তোমাকে হৃষ্ট করেন, সে মরুৎগণের সাথে সোম পান কর। (ঋক-৩/৪৭/৪)।। হে উগ্রতেজা ইন্দ্র! যখন তুমি স্তবের বাসনাতে অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক দুর্ধর্ষ বৃত্রের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য অগ্রসর হলে তখন সমস্ত মরুৎগণ তোমার মহিমা বাড়িয়ে দিলে, নিজেও তারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন।
(ঋক-১০/১১৩/৩)।।

কিন্তু একটি ঋকে ঠিক একই প্রসঙ্গে মরুৎগণের পরিবর্তে নরগণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

স শ্রুধি যঃ স্মা পাতনাসু কাসু চিদ্দক্ষায্য
ইন্দ্র ভরহূতয়ে নৃভিরসি প্রতূর্তয়ে নৃভিঃ।
যং শূরৈঃ স্বঃ সনিতা যো বিপ্রের্বাজং তরুতা।
তমীশানাস ইরধন্ত বাজিনং পৃক্ষমত্যং ন বাজিনম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/১২৯/২)।
অর্থাৎ : হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধের নেতা, তুমি নরগণের সাথে প্রধান প্রধান যুদ্ধে স্পর্ধাপূর্বক শত্রুসংহারে সমর্থ, তুমি শূরগণের সাথে স্বয়ং সংগ্রাম সুখ অনুভব কর। ঋত্বিকগণ স্তব করলে তুমি তাদের অন্ন প্রদান কর, আমাদের স্তুতি শ্রবণ কর। অভ্যর্থনা সমর্থ ঋত্বিকগণ গমনশীল অন্নবান ইন্দ্রকে অশ্বের ন্যায় সেবা করে। (ঋক-১/১২৯/২)।।

প্রশ্ন হলো, এখানে নর বা মানবগণের সঙ্গে মিলিত হবার তাৎপর্য কী? উত্তরে টীকাকার সায়ণ বলছেন, 'নরগণের সাথে' অর্থে 'মরুৎগণের সাথে' বোঝায়, কেননা–

'নৃভিঃ মনুষ্যৈরেব সদ্ভিঃ পশ্চাদ্দেবত্বমাপন্নৈর্মরুদ্ভিঃ'। (সায়ণভাষ্য)
অর্থাৎ : এই মরুৎগণ আগে মানুষই ছিলেন এবং পরে তাঁরা দেবতাদের পর্যায়ে ওঠেন।

সায়ণের এই ব্যাখ্যাকে যদি প্রকৃত বৈদিক ঐহিত্য-প্রতিষ্ঠিত বলে গ্রহণ করা হয় তাহলে বৈদিক দেবতা হিসেবে মরুৎগণের একটি চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতে হবে যে–মরুৎগণ বলতে আগে কোনো এক মানবদল বোঝাতো, ক্রমশ তাঁরাই দেবত্বগৌরবে বিভূষিত হন। বস্তুত, মর্ত্যের মানবদের পক্ষেই দেবত্ব-গৌরবে উন্নীত হবার কথা। শুধুমাত্র মরুৎপণ প্রসঙ্গেই নয়, ঋভুগণ নামের আর এক দেবগোষ্ঠি সম্বন্ধেও সায়ণ মন্তব্য করেছেন–

'ঋভবো হি মনুষ্যাঃ সন্ত স্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তঃ'। (সায়ণভাষ্য)
অর্থাৎ : ঋভুগণ মানুষ ছিলেন, তপস্যা দ্বারা তাঁরা দেবত্ব প্রাপ্ত হন।

সায়ণের এ-জাতীয় ব্যাখ্যাকে বৈদিক ঐতিহ্যসম্মত বলে স্বীকার করতে হলে ঋগ্বেদের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যর মধ্যে সমতুল্য দৃষ্টান্ত থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে অন্তত ঋভুগণের দৃষ্টান্তে ঋগ্বেদের সাক্ষ্য বিরল নয়। যেমন–

আভোগয়ং প্র যদিচ্ছন্ত ঐতনাপাকাঃ প্রাঞ্চো মম কে চিদাপয়ঃ।
সৌধন্বনাসশ্চরিতস্য ভূমনাগচ্ছত সবিতুর্দাশুষো গৃহম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/১১০/২)।
তৎ সবিতা বোহমৃতত্বমাসুবদগোহ্যং যচ্ছ্রবয়ন্ত ঐতেন।
তাং চিচ্চমসমসুরস্য ভক্ষণমেকং সন্তমকৃণুতা চতুর্বয়ম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/১১০/৩)।
বিষ্ট্বী শমী তরণিত্বেন বাঘতো মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ।
সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ সম্বৎসরে সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১১০/৪)।
অর্থাৎ :
হে ঋভুগণ! তোমরা আমার জ্ঞাতি, তোমাদের জ্ঞান যখন অপরিপক্ক ছিল, সেই পূর্বকালে

তোমরা উপভোগ্য সোমরস ইচ্ছা করে গিয়েছিলে। হে সুধন্বার পুত্রগণ! তখন তোমাদের কর্মের মহত্ত্ব দ্বারা দানশীল সবিতার গৃহে এসেছিলে। (ঋক-১/১১০/২)।। যখন তোমরা প্রকাশমান সবিতাকে তোমাদের (সোমপানের) ইচ্ছা জানিয়ে এসেছিলে এবং অসুর ত্বষ্টার নির্মিত সেই একটি সোমপাত্রকে চারখানা করেছিলে, তখন সবিতা তোমাদের অমরত্ব দান করেছিলেন। (ঋক-১/১১০/৩)।। তাঁরা শীঘ্র কর্ম সাধন করেছেন বলে এবং ঋত্বিকদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন বলে মানুষ হয়েও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখন সুধন্বার পুত্র ঋভুগণ সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান হয়ে সাংবৎসরিক যজ্ঞসমূহের হব্যভাজন হলেন। (ঋক-১/১১০/৪)।।

এখানে বেদের কবি জ্ঞাতি ঋভুগণকে সুধন্বার পুত্রগণ বলে সম্বোধন করছেন। নিরুক্তমতে (নিরুক্ত-১১/১৬) ঋভু, বিভু এবং বাজ– এই তিনজন ছিলেন সুধন্ব নামের জনৈক অঙ্গিরার পুত্র। অতএব ঋভুদের পূর্বপুরুষ বলতে অঙ্গিরস্‌গণ। এবং ঋগ্বেদের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বিচার করলে দেখা যায়, এই অঙ্গিরস্‌গণও ঋভুগণের মতোই আদিতে মানবমাত্র ছিলেন এবং ক্রমশ তাঁরা দেবত্ব-গৌরবে উন্নীত হন। উইন্টারনিটস্‌ প্রমুখ আধুনিক বিদ্বান গবেষকদের মতে অঙ্গিরস্‌গণ ছিলেন প্রাচীনকালের পুরোহিত, বা পুরোহিত-জাদুকর। ঋগ্বেদের কবিরা তাঁদের বারবার প্রাচীন পিতৃগণ বলে সম্বোধন করেছেন। যেমন–

য উদাজন্‌-পিতরো গোময়ং বস্বৃতেনাভিন্দন্‌ পরিবৎসরে বলম্‌ ।
দীর্ঘায়ুত্বমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/৬২/২)।
বীলু চিন্দৃড়্হা পিতরো ন উকথৈরদ্রিং রজন্নঙ্গিরসো রবেণ।
চক্রুর্দিবো বৃহতো গাতৃমস্মে অহঃ স্বর্বিবিদুঃ কেতুমুস্রাঃ।। (ঋগ্বেদ-১/৭১/২)।
অর্থাৎ :
হে অঙ্গিরাগণ ! তোমরা আমাদের পিতাস্বরূপ, তোমরা গোধন তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলে। তোমরা এক বৎসরকাল যজ্ঞ করে গোধনের অপহরণকারী বল নামক শত্রুকে নিধন করেছিলে। তোমরা দীর্ঘায়ু হও। আমি মানব এসেছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর। (ঋক-১০/৬২/২)।। অঙ্গিরা নামক আমাদের পিতৃগণ মন্ত্র দ্বারা অগ্নির স্তুতি করে বলবান ও দৃঢ়াঙ্গ পণি (নামক অসুরকে) স্তুতি-শব্দ দ্বারাই বিনাশ করেছিলেন এবং আমাদের নিমিত্ত মহৎ দ্যুলোকের পথ করেছিলেন। পরে তাঁরা সুখকর দিবস, আদিত্য ও গো-সমূহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। (ঋক-১/৭১/২)।।

এবং অন্যত্রও তাঁরা প্রাচীন কবি এবং সুস্পষ্টভাবেই মানব হিসেবে সম্বোধিত হয়েছেন–

দধ্যঙ্‌ হ মে জনষং পূর্বো অঙ্গিরাঃ প্রিয়মেধঃ কন্বো অত্রির্মনুবিদুস্তে
মে পূর্বে মনু র্বিদু। তেষাং দেবেষ্বায়তিরস্মাকং তেষু নাভয়ঃ।
তেষাং পদেন মহ্যা গিরেন্দ্রাগ্নী আ নমে গিরা।। (ঋগ্বেদ-১/১৩৯/৯)।
অর্থাৎ : প্রাচীন দধীচি, অঙ্গিরা, প্রিয়মেধ, কন্ব, অত্রি এবং মনু আমার জন্ম কথা জানেন। এ পূর্বকালীন ঋষিগণ ও মনু আমার পূর্বপুরুষগণকে জানেন। কারণ মহর্ষিগণের মধ্যে তাঁরা

দীর্ঘায়ু এবং আমার জীবনের সাথে তাঁদের সম্বন্ধ আছে। আমি তাঁদের মহৎপদ হেতু তাঁদের স্তুতি করি ও নমস্কার করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে স্তুতি করি ও নমস্কার করি। (ঋক-১/১৩৯/৯)।।

কিন্তু মানব হলেও ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং নিবিড় সহযোগিতার বিবরণ অবশ্যই চিত্তাকর্ষক। যেমন–

অস্য সুবনস্য মন্দিনস্ত্রিতস্য ন্যর্বুদং বাবৃধানো অস্তঃ।
অবর্তয়ৎ সূর্যো ন চক্রং ভিনদ্বলমিন্দ্রো অঙ্গিরস্বান্ ।। (ঋগ্বেদ-২/১১/২০)।
তব ক্রত্বা তব তদ্দংসানাভিরামাসু পক্কং শচ্যা নিদীধঃ।
ঔর্ণোর্দুর উস্রিয়াভ্যো বি দৃড়হোদুর্বাদ্গা অসৃজো অঙ্গিরস্বান্ ।। (ঋগ্বেদ-৬/১৭/৬)।
ভিনদ্বলমঙ্গিরোভির্গৃণানো বি পর্বতস্য দৃংহিতান্যৈরৎ।
রিণগ্রোধাংসি কৃত্রিমাণ্যেষাং সোকস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার।। (ঋগ্বেদ-২/১৫/৮)।
অর্থাৎ :
এ হর্ষযুক্ত সুরান ত্রিতদ্বারা বর্ধিত হয়ে ইন্দ্র অর্বুদকে বিনাশ করেছিলেন। সূর্য যেরূপ রথচক্র ঘূর্ণিত করেন, সেরূপ ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের সাহায্য লাভ করে বজ্র ঘূর্ণিত করেছিলেন এবং বলকে বিনাশ করেছিলেন। (ঋক-২/১১/২০)।। হে ইন্দ্র! তুমি নিজ জ্ঞান, কার্য ও শক্তি দ্বারা অপরিণত গোসমূহে পরিণত দুগ্ধ অর্পণ করেছ। তুমি অঙ্গিরাগণের সাথে সমবেত হয়ে গোষ্ঠ হতে ধেনুবৃন্দ উন্মুক্ত করেছ। (ঋক-৬/১৭/৬)।। অঙ্গিরসগণের সহায়তায় ইন্দ্র বলকে বিদীর্ণ করেছিলেন, পর্বতের দৃঢ়ীকৃত দ্বার উদ্ঘাটিত করেছিলেন, কৃত্রিম রোধসকলও উদ্ঘাটিত করেছিলেন। ইন্দ্র সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হলে এ সকল কর্ম করেছিলেন। (ঋক-২/১৫/৮)।।

এবং এমনকি ইন্দ্র অঙ্গিরসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা অগ্রগণ্য হিসেবে 'অঙ্গিরস্তমঃ' বলেও বর্ণিত হয়েছেন। যেমন–

অবিন্দদ্দিবো নিহিতং গুহা নিধিং বের্ন গর্ভং পরিবীতমশ্মন্যনন্তে অন্তরশ্মনি।
ব্রজং বজ্রী গবামিব সিষাসন্-অঙ্গিরস্তমঃ।
অপাবৃণোদিষ ইন্দ্রঃ পরীবৃতা দ্বার ইষঃ পরীবৃতাঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১৩০/৩)।
অর্থাৎ : পক্ষীগণ যেরূপ (দুর্গম স্থানে শাবক রক্ষা করে) তা প্রাপ্ত হয়, সেরূপ ইন্দ্র অতি গোপনীয় স্থানে স্থাপিত এবং অনন্ত ও অতিমহান প্রস্তর রাশিতে পরিবেষ্টিত সোমরস স্বর্গ হতে লাভ করলেন। অঙ্গিরাগণের অগ্রগণ্য বজ্রধারী ইন্দ্র সোমপানের অভিলাষে পূর্বে যেরূপ গোব্রজকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেরূপ সোমরস প্রাপ্ত হলেন। (ঋক-১/১৩০/৩)।।

আরো মজার বিষয় হলো, ঋগ্বেদের অন্যান্য দৃষ্টান্তে দেখা যায়, গো-ধন লাভ বা গো-ধন অপহরণ সংক্রান্ত কীর্তির গৌরব অঙ্গিরসদের উপরই অর্পিত হচ্ছে, ইন্দ্র যেন তখন তাঁদের সহচরমাত্র। যেমন–

ইন্দ্রেণ যুজা নিঃ সৃজন্ত বাঘতো ব্রজং গোমন্তমশ্বিনম্ ।

সহস্রং মে দদতো অষ্টকর্ণ্যঃ শ্রবো দেবেষ্বকৃত।। (ঋগ্বেদ-১০/৬২/৭)।
অর্থাৎ : তাঁরা (অঙ্গিরাগণ) ইন্দ্রের সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে কর্মানুষ্ঠান করতে করতে অশ্বযুক্ত ও গোধনযুক্ত গোষ্ঠ উদ্ধার করেছেন, তাঁরা বিস্তীর্ণ কর্ণযুক্ত একসহস্র গাভী আমাকে দান করে দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞীয় অন্ন উৎসর্গ করেছেন। (ঋক-১০/৬২/৭)।।

দেবীপ্রসাদের মন্তব্য অনুযায়ী, প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ 'ম্যাকডোনেল'-এর মতে, ইন্দ্রের বিশিষ্ট গৌরব অঙ্গিরসগণের উপর সরে আসবার একটা মাঝামাঝি অবস্থার পরিচয় এই দৃষ্টান্তে পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য দৃষ্টান্তে দেখা যায়, গৌরবটি সরাসরি অঙ্গিরসগণের উপরই অর্পিত। অঙ্গিরাগণ গো-ধন তাড়িয়ে আনছেন ও বলকে নিধন করছেন, যজ্ঞপ্রভাবে তাঁরা এমনকি সূর্যকে আকাশে আরোহণ করিয়েছেন এবং সকলের জননীভূতা পৃথিবীকে সুবিস্তীর্ণ করেছেন। যেমন–
য উদাজন্-পিতরো গোময়ং বস্বৃতেনাভিন্দন্ পরিবৎসরে বলম্ ।
দীর্ঘায়ুত্বমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/৬২/২)।
য ঋতেন সূর্যমারোহয়ন্ দিব্যপ্রথয়ন্ পৃথিবীং মাতরং বি।
সুপ্রজাস্ত্বমঙ্গিরসো বা অস্তু প্রতি গৃভণীত মানবং সুমেধসঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/৬২/৩)।
অর্থাৎ :
হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা আমাদের পিতাস্বরূপ, তোমরা গোধন তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলে। তোমরা এক বৎসরকাল যজ্ঞ করে গোধনের অপহরণকারী বল নামক শত্রুকে নিধন করেছিলে। তোমরা দীর্ঘায়ু হও। আমি মানব এসেছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর। (ঋক-১০/৬২/২)।। যে তোমরা যজ্ঞ প্রভাবে আকাশে সূর্যকে আরোহণ করিয়েছ এবং সকলের জননীভূতা পৃথিবীকে সুবিস্তীর্ণ করেছ, সে তোমরা উৎকৃষ্ট সন্তানসন্ততি সম্পন্ন হও। আমি মানব এসেছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর। (ঋক-১০/৬২/৩)।।

স্বভাবতই এ-ক্ষেত্রে অঙ্গিরস্গণকে আর শুধু মানুষ বলা যায় না; ঋগ্বেদের কবি তাই বলছেন–
বিরূপাস ইদৃষয়স্ত ইদ্গম্ভীরবেপসঃ।
তে অঙ্গিরসঃ সূনবস্তে অগ্নেঃ পরি জজ্ঞিরে।। (ঋগ্বেদ-১০/৬২/৫)।
যে অগ্নেঃ পরি জজ্ঞিরে বিরূপাসো দিবস্পরি।
নবগ্বো নু দশগ্বো অঙ্গিরস্তমঃ সচা দেবেষু মংহতে।। (ঋগ্বেদ-১০/৬২/৬)।
অর্থাৎ :
সে সমস্ত অঙ্গিরা ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিধারী, তাঁদের ক্রিয়াকলাপ গম্ভীর, অর্থাৎ কেউ সন্ধান পায় না। সে অঙ্গিরাগণ অগ্নির পুত্র, তাঁরা চতুর্দিকে আবির্ভূত হলেন। (ঋক-১০/৬২/৫)।। তাঁরা অগ্নির চতুর্দিকে আবির্ভূত হলেন, নানা মূর্তিতে গগনের চতুর্দিকে উদয় হলেন। কেউ নবগ্ব অর্থাৎ নয় মাস যজ্ঞের পর গো-ধন পেয়েছেন, কেউ দশগ্ব অর্থাৎ দশ মাস যজ্ঞ করে গো-

ধন পেয়েছেন। যিনি অঙ্গিরাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতাদের সাথে একত্র অবস্থিতি করে আমাকে ধনদান করছেন। (ঋক-১০/৬২/৬)।।

কিন্তু শুধুমাত্র দেবতাদের সঙ্গে একত্র অবস্থিতি করার কথাই নয়; বস্তুত অঙ্গিরস্গণ দেবত্বগৌরবেই উন্নীত হয়েছিলেন। তাই ঋগ্বেদের কবির উক্তি–

যে যজ্ঞেন দক্ষিণয়া সমক্তা ইন্দ্রস্য সখ্যমমৃতত্বমানশ।
তেভ্যো ভদ্রমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/৬২/১)।
অর্থাৎ : হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা যজ্ঞীয়দ্রব্য ও দক্ষিণা সংগ্রহ করে ইন্দ্রের বন্ধুত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছ। অতএব তোমাদের মঙ্গল হোক। হে মেধাবিগণ ! আমি মানব এসেছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর। (ঋক-১০/৬২/১)।।

আর দেবমাহাত্ম্যে অন্যদের সঙ্গে তাঁর সমতুল্য হয়েছিলেন বলেই বৈদিক কবিদের পক্ষে বারবার বৃহস্পতি, অগ্নি প্রভৃতি প্রধান বৈদিক দেবতাদেরও অঙ্গিরস্ আখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছিলো। যেমন–

যো অদ্রিভিৎপ্রথমজা ঋতাবা বৃহস্পতিরাঙ্গিরসো হবিষ্মান্ ।
দ্বিবর্হজ্মা প্রাঘর্মসৎপিতা ন আ রোদসী বৃষভো রোরবীতি।। (ঋগ্বেদ-৬/৭৩/১)।
ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষি র্দেবো দেবানামভবঃ শিবঃ সখা।
তব ব্রতে কবয়ো বিদ্মনাপসোহজায়ন্ত মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ।। (ঋগ্বেদ-১/৩১/১)।
অর্থাৎ :
যে বৃহস্পতি অদ্রি ভেদ করেন, যিনি প্রথমে জাত হয়েছেন, যিনি সত্যবান, অঙ্গিরস ও যজ্ঞভাগী, যিনি লোকদ্বয়ে সুন্দররূপে গমন করেন, যিনি দীপ্তস্থানে বর্তমান এবং যিনি আমাদের পিতা, সে বৃহস্পতি বর্ষক হয়ে দ্যাবাপৃথিবীতে গর্জন করেন। (ঋক-৬/৭৩/১)।।
হে অগ্নি! তুমি অঙ্গিরা ঋষিদের আদি ঋষি ছিলে, দেব হয়ে দেবগণের মঙ্গলময় সখা হয়েছ; তোমার কর্মে মেধাবী, জ্ঞাতকর্মা ও উজ্জ্বলায়ুধ মরুৎগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
(ঋক-১/৩১/১)।।

বৈদিক সংস্কৃতিতে যজ্ঞে সোমরস আহুতি দেয়া হয় দেবতার উদ্দেশ্যেই কেবল। সেক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, দৃষ্টান্ত-বিশেষে অঙ্গিরসগণের উদ্দেশে এমনকি সোম আহুতি দেবার কথাও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়–

অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম।। (ঋগ্বেদ-১০/১৪/৬)।
অর্থাৎ : অঙ্গিরা নামক অথর্বন নামক এবং ভৃগু নামক আমাদের পিতৃলোকগণ এ মাত্র এসেছেন, তাঁরা সোমরস পাবার অধিকারী, সে যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকগণ যেন আমাদের শুভানুধ্যান করেন, যেন আমরা তাদের প্রসন্নতা লাভ করে কল্যাণভাগী হই।
(ঋক-১০/১৪/৬)।।

অতএব অনুমান করতে হয় যে, মরুৎগণ ও ঋভুগণের মতোই এই অঙ্গিরস্গণও আসলে মানবমাত্রই ছিলেন এবং তাঁদের গৌরব-কীর্তনের উৎসাহে বৈদিক কবিরা তাঁদের দেবতা আখ্যা দিয়েছেন।
এ-প্রসঙ্গে আরো একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আগেই দেখেছি, দ্যুলোকের দুটি বিখ্যাত যমজ দেবতার নাম অশ্বিদ্বয়। ঋগ্বেদে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, মনোহর কর্মদ্বারা তাঁরা ইন্দ্রলোকে দেবতা হয়ে উঠেছিলেন–
মহত্তদ্বঃ কবয়ঃ চারু নাম যদ্ধ দেবা ভবথ বিশ্বে ইন্দ্রে।
সখ ঋভুভিঃ পুরুহূত প্রিয়েভিরিমাং ধিয়ং সাতয়েতক্ষতা নঃ।। (ঋগ্বেদ-৩/৫৪/১৭)।
অর্থাৎ : হে নাসত্যদ্বয় কবি দেবগণ! তোমাদের সে মহৎ কর্ম মনোহর, যে কর্ম দ্বারা তোমরা সকলে ইন্দ্রলোকে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছ। হে পুরুহূত ইন্দ্র! তুমি ঋভুগণের সাথে সখ্য ভাবাপন্ন। তোমরা এ স্তুতি আমাদের ধন লাভের জন্য স্বীকার কর। (ঋক-৩/৫৪/১৭)।।

তাঁদের এই দেবত্বপদে উন্নীত হবার কল্পনা থেকে স্বভাবতই অনুমান হয়, শুরুতে তাঁরা দেবতা ছিলেন না। কোন কবি তাই এই দেবদ্বয়কে সম্বোধন করে বলেছেন–
আ নো দেবেভিরূপ যাতমর্বাক্সজোষসা নাসত্যা রথেন।
যুবোর্হি নঃ সখ্যা পিত্র্যাণি সমানো বন্ধুরুত তস্য বিত্তম্ ।। (ঋগ্বেদ-৭/৭২/২)।
অর্থাৎ : হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা দেবগণের সাথে প্রীতিযুক্ত হয়ে রথারোহণে আমাদের নিকট উপস্থিত হও। তোমাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব পিতৃক্রমাগত, বন্ধুত্ব সম্পর্কে তোমরা আমাদের সমান। তোমাদের এবং আমাদের পিতৃগণকে এক বলে জেনো, ধনও এক। (ঋক-৭/৭২/২)।।

অতএব, স্বীকার করতে হবে,– 'উত্তরকালে দেবতা বলতে আমরা যা বুঝতে অভ্যস্ত হয়েছি প্রাচীন কালের কবিরা ঠিক তা বুঝতেন না। বস্তুত, মহান মানব এবং দেবতার মধ্যে প্রভেদ তাঁদের কাছে সবসময় সুস্পষ্ট নয়। তাই একদিকে যেমন মানবদের পক্ষে দেবত্ব-গৌরবে উন্নীত হবার কথা অপরদিকে আবার ঋগ্বেদের প্রধানতম দেবতাদেরও বারবার সুস্পষ্টভাবেই নর বা নরশ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করবার অভ্যাস দেখা যায়।'- (ভারতীয় দর্শন, দেবীপ্রসাদ, পৃষ্ঠা-১৬১)

ঋগ্বেদে এরকম প্রচুর নজির রয়েছে যেখনে ইন্দ্রকে সরাসরি নর বা মানব বলা হয়েছে, কোথাও তিনি নরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর ইত্যাদি, যেমন–
অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবিপ্রতিং নরং।
ষং তে পূর্বং পিতা হুবে।। (ঋগ্বেদ-১/৩০/৯)।
সমিন্দ্রো গা অজয়ৎ সং হিরণ্যা সমশ্বিয়া মঘবা যো হ পূর্বীঃ।
এভি র্নৃভি নৃতমো অস্য শাকৈ রায়ো বিভক্তা সম্ভরশ্চ বস্বঃ।। (ঋগ্বেদ-৪/১৭/১১)।

নৃণামু ত্বা নৃতমং গীর্ভিরুকথৈরভি প্র বীরমর্চতা সবাধঃ।
সং সহসে পুরুমায়ো জিহীতে নমো অস্য প্রদিব এক ঈশে।। (ঋগ্বেদ-৩/৫১/৪)।
অর্থাৎ :
ইন্দ্র বহুলোকের নিকট গমন করেন, পুরাতন আবাস হতে আমি সে মানবকে আহ্বান করি, যাঁকে পিতা পূর্বে আহ্বান করেছিলেন। (ঋক-১/৩০/৯)।। যে ধনবান ইন্দ্র গাভী জয় করেছিলেন, হিরণ্য জয় করেছিলেন, অশ্ব সমুদয় জয় করেছিলেন, বহুতর শত্রুসেনা জয় করেছিলেন; সামর্থ্য দ্বারা নরশ্রেষ্ঠ সে নেতা এ স্তোতৃগণ কর্তৃক স্তুত হয়ে মানবগণের সঙ্গে মিলে তিনি ধন-বিভাগে রত হোন। (ঋক-৪/১৭/১১)।। হে ইন্দ্র ! তুমি মনুষ্যগণের নেতা ও বীর, বাধাপ্রাপ্ত ঋত্বিকগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা ও উকথদ্বারা বিশেষরূপে অর্চনা করে। বহু কর্মবিশিষ্ট ইন্দ্র বলের জন্য গমনোদ্যম করেন, পুরাতন একমাত্র ইন্দ্র এ অন্নের ঈশ্বর, তাঁকে নমস্কার। (ঋক-৩/৫১/৪)।।
ইন্দ্রকে উদ্দেশ করে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে–
প্রতি ধানা ভরত তুয়মস্মৈ পুরোলাশং বীরতমায় নৃণাম্ ।
দিবোদিবো সদৃশীরিন্দ্র তুভ্যং বর্ধন্তু ত্বা সোমপেয়ায় ধৃষ্ণো।। (ঋগ্বেদ-৩/৫২/৮)।
ত্বং তা ইন্দ্রোভয়া অমিত্রান্দাসা বৃত্রাণ্যার্যা চ শূর।
বধী র্বনেব সুধিতেভিরৎকৈরা পৃৎসু দর্ষি নৃণাং নৃতম।। (ঋগ্বেদ-৬/৩৩/৩)।
অর্থাৎ :
এঁকে শীঘ্র ভৃষ্ট যব প্রদান কর। ইনি মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠবীর, এঁকে পুরোডাশ প্রদান করা। হে অভিভবিতা ইন্দ্র! তোমার উদ্দেশে প্রত্যহ একবিধ স্তুতি করা হয়ে থাকে, এ সোম পানের জন্য তোমাকে প্রোৎসাহিত করুক। (ঋক-৩/৫২/৮)।। হে বীর ইন্দ্র! তুমি কি দস্যু, কি আর্য, উভয়বিধ শত্রুই সংহার করেছ। হে নরশ্রেষ্ঠ! কাষ্ঠছেদক যেরূপ বৃক্ষসকল ছেদন করে সেরূপ তুমি সংগ্রামে সুনিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহদ্বারা শত্রুগণকে বিদারিত কর।
(ঋক-৬/৩৩/৩)।।

ঋগ্বেদের আরও বহু দৃষ্টান্তে ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ নর– নৃতমঃ– বা নরদিগের শ্রেষ্ঠ নর– নৃণাং নৃতমঃ– বলে উল্লেখ করবার পরিচয় পাওয়া যায়।
কিন্তু শুধু ইন্দ্র নন। ঋগ্বেদে অগ্নিকেও নৃতমঃ, নৃণাং নৃতমঃ, নৃণাং নৃপতে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন–
স নো নৃণাং নৃতমো রিশাদা অগ্নির্গিরোহবসা বেতু ধীতিম্ ।
তনা চ যে মঘবানঃ শবিষ্ঠা বাজপ্রসূতা ইষয়ন্ত মন্ম।। (ঋগ্বেদ-১/৭৭/৪)।
অর্থাৎ : অগ্নি মানবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নেতা ও শত্রুগণের বিনাশকারী। অগ্নি আমাদের স্তুতি ও অন্নযুক্ত যজ্ঞ কামনা করুন এবং যে ধনশালী ও বলশালী যজমানগণ অন্ন প্রদান করে অগ্নির মননীয় স্তোত্র ইচ্ছা করে, অগ্নি তাঁদেরও স্তুতি কামনা করুন। (ঋক-১/৭৭/৪)।।

এভাবে আরো অন্যান্য দেবতাকেও কখনো নরশ্রেষ্ঠ, কখনো বা মানবদলের সাথে মিলিত

হয়ে সোমরস পানের জন্য আহ্বান জানানোর দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদে অনেক আছে। বৈদিক দেবতারা প্রায়ই এইভাবে মানব বা মানব-শ্রেষ্ঠ হিসেবে পরিকল্পিত বলেই বৈদিক মানুষদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কও প্রায়ই একান্ত সহযোগিতা ও সখ্যের সম্পর্ক। এ বিষয়েও অজস্র নজির রয়েছে ঋগ্বেদে। যেমন–

দুরো অশ্বস্য দুর ইন্দ্র গোরসি দুরো যবস্য বসুন ইনস্পতিঃ।
শিক্ষানরঃ প্রদিবো অকামকর্শণঃ সখা সখিভ্যস্তমিদং গৃণীমসি।। (ঋগ্বেদ-১/৫৩/২)।
অর্থাৎ : হে ইন্দ্র! তুমি অশ্ব দান কর, গো দান কর, যবাদি ধান্য দান কর এবং তুমি নিবাস হেতুভূত ধনের প্রভু ও পালক। তুমি শিক্ষার নেতা, তুমি বহুদিনের পুরাতন দেব, তুমি কামনা ব্যর্থ কর না, তুমি সখাদের মধ্যে সখা। তাঁরই উদ্দেশে আমরা এ স্তুতি পাঠ করি। (ঋক-১/৫৩/২)।।

এইভাবে বহুবার অগ্নিকেও সখা হিসেবে উল্লেখ করতে দেখা যায়। তাছাড়া অন্যান্য দেবতাদের সম্পর্কেও অনুরূপ বন্ধুত্ব সম্পর্কের নজির চোখে পড়ে। অশ্বিদ্বয় প্রসঙ্গেও একই কথা। তেমনি সোম, ব্রহ্মণস্পতি, সবিতৃ, বরুণ, মিত্র অর্যমন্ প্রমুখ দেবতাদের সঙ্গেও বৈদিক কবি ও তাঁদের জ্ঞাতিদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের উল্লেখ ঋগ্বেদে বিরল নয়। তাই আধুনিক বিদ্বান গবেষকেরা মন্তব্য করেন যে, স্বভাবতই এই একান্ত সৌহার্দ-পূর্ণ বৈদিক দেবতাগুলির উপর আধুনিক অর্থে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। এ-প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন–

‘বৈদিক দেবতাদের নজির দেখিয়ে ঋগ্বেদে আধ্যাত্মিক চেতনার পরিচয় অন্বেষণ করার বিরুদ্ধে আরও একটি যুক্তি এখানে উল্লেখ করা যায়।... এই প্রাচীন সাহিত্যটির প্রধানতম বিষয়বস্তু বলতে পার্থিব সম্পদের কামনাই, যদিচ ওই অনুন্নত পর্যায়ে পার্থিব সম্পদ বলতে নেহাতই অন্ন, গো, স্বাস্থ্য, সন্তান, নিরাপত্তা, ইত্যাদিই। অতএব, বৈদিক কবিদের কাছে পুরুষার্থ বলতে এ-জাতীয় সম্পদ উপভোগই; অন্তত পরবর্তী কালে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে যা পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকৃত– অর্থাৎ মোক্ষ– ঋগ্বেদে সে-বিষয়ে চেতনার ঐকান্তিক অভাব অবশ্য স্বীকার্য। বৈদিক দেবতাদের প্রসঙ্গেও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ওই পার্থিব সম্পদের কামনাই ঋগ্বেদের দেবকল্পনার একটি প্রধানতম উপাদান।’- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৬৩)

প্রসঙ্গত, ঋগ্বেদের একটি ঋকে ইন্দ্রকে ‘কৌশিক’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন–

আ তু ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব।
নব্যমায়ুঃ প্র সূ তির কৃধী সহস্রসামৃষিম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/১০/১১)।
অর্থাৎ : হে ইন্দ্র! শীঘ্র আমাদের নিকট এস; হে কৌশিক! হৃষ্ট হয়ে অভিষুত সোম পান কর; নব্য আয়ুঃ সম্যকরূপে বর্ধন কর, এ ঋষিকে সহস্রধনোপেত কর। (ঋক-১/১০/১১)।।

টীকাকার সায়ণ এই ‘কৌশিক’ অর্থের ব্যাখ্যায় বলেছেন ‘কুশিকস্য পুত্র ইন্দ্র’। কিন্তু তিনি

হয়তো স্পষ্টই অনুভব করেছেন, এই সরল ব্যাখ্যাকে এমন সহজে গ্রহণ করায় বাধা ওঠে। কেননা, ঋগ্বেদে 'কৌশিক' বা কুশিক-পুত্র হিসেবে বিখ্যাত বলতে ঋষি বা কবি বিশ্বামিত্র। অতএব সায়ণ বলছেন–

'যদ্যপি বিশ্বামিত্রঃ কুশিকস্য পুত্রস্তথাপি তদ্রূপেন ইন্দ্রস্যৈবোৎপন্নত্বাৎ কুশিকপুত্রত্বমবিরুদ্ধম্'। (সায়ণভাষ্য)
অর্থাৎ : যদিও বিশ্বামিত্রই কুশিকের পুত্র তবুও সেইরূপ ইন্দ্রের উৎপন্নত্ব-হেতু কুশিক-পুত্রত্বও অবিরুদ্ধ।

নজির হিসেবে সায়ণ সর্বানুক্রমণী উদ্ধৃত করে বলছেন,– ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভের জন্য কুশিক ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন, তাই তিনি যজ্ঞে ইন্দ্রকেই পুত্ররূপে লাভ করেন। কিন্তু সহজেই বোঝা যায়, এ-জাতীয় কাহিনী কোন এক সুপ্রাচীন স্মৃতির ব্যাখ্যায় উদ্ভাবন করা হয়েছিলো। কেননা–
'কৌশিক' আসলে একটি সুপ্রাচীন গোত্র-নাম এবং ঋগ্বেদের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকেই (ঋক-৩/৩৩/৫) বোঝা যায়, সেই গোত্রেই বিশ্বামিত্র (বা বিশ্বামিত্রদের) জন্ম। কিন্তু 'কুশিক' মানে 'পেঁচা'; অতএব অনুমান হয়, এই গোত্রটির পিছনে কোন-এক আদিম টোটেম-ক্লানের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। এই ঋগ্বেদের সাক্ষ্য অনুসারে ইন্দ্র যদি 'কৌশিক' হন তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, এই সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক দেবতাটিরও আসলে মানব-বংশেই জন্ম; অতএব আদিতে তিনি মানব-মাত্রই ছিলেন।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৬২)

ঋগ্বেদের আরেকটি চিত্তাকর্ষক বিষয় হলো বিভিন্ন দেবতাদের পক্ষে বিশেষণ প্রয়োগ। যেমন, সরস্বতীর দেহ রত্ন-দাতা (রত্নধা) এবং রত্নজ্ঞ (বসুবিৎ) (ঋক-১/১৬৪/৪৯) ঋভুগণ রত্নদাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ– রত্নধাতমঃ (ঋক-১/২০/১)। অগ্নি প্রসঙ্গেও একই কথা (ঋক-১/১/১)। ইন্দ্র অন্নদাতা বা বাজদা (ঋক-৩/৩৬/৫), উষস্ বাজ-প্রসূতা (ঋক-১/৯২/৮)। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ জাতীয় বর্ণনা দেবতা ও মানব প্রসঙ্গে প্রায় নির্বিশেষে ব্যবহৃত। নরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর অগ্নি তাদের ধনবান (মঘবানঃ) অন্ন-উৎপাদক (বাজপ্রসূতাঃ) এবং অন্ন-কারী (ইষয়ন্ত) করেন (ঋক-১/৭৭/৪)। অগ্নি নিজেও ধনের পতি (রয়ীণাম্ পতিঃ) এবং অন্নের ভর্তাঃ (বাজম্ভরঃ) (ঋক-১/৬০/৫)। অগ্নি অন্ন তৈরি করেন (বাজয়তে) (ঋক-৪/৭/১১) এবং ইন্দ্র অন্ন-উৎপাদকদের বন্ধু (শ্রবয়ৎ সখা) (ঋক-৮/৪৬/১২)। ইন্দ্র (ঋক-৩/৬০/৬) ও অশ্বিদ্বয় (ঋক-৮/৩৫/১৫) অন্নপূর্ণ (বাজবান, বাজবন্ত)। অগ্নি রত্নগুলির মধ্যে (রয়িপতিঃ রয়ীণাম্) রত্ন-পতি (ঋক-১/৬০/৪)। অগ্নি অন্ন বর্ধন করেন (অন্ন-বৃধঃ) এবং অন্নের সাথে (প্রতি চরন্তি অন্নৈঃ) সঞ্চরণ করেন (ঋক-১০/১/৪)।

তবে এ-জাতীয় বর্ণনার মধ্যে বৈদিক কবিরা যেগুলি তাঁদের দেবতা ও তাঁদের জ্ঞাতি উভয়ের প্রসঙ্গেই নির্বিচারে ব্যবহার করেছেন, সেগুলিই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। যেমন একটি

শব্দ 'অর্কিন্– অন্নবান বা অন্নযুক্ত। মরুৎগণকে (ঋক-১/৩৮/১৫) অর্কিন্ বলে সম্বোধন করা হয়েছে এবং মানবগোষ্ঠির বর্ণনাতেও অর্কিন্ (ঋক-১/৭/১, ১/১০/১) শব্দ ব্যবহৃত।
এ-জাতীয় আর একটি শব্দ 'বাজরত্ন'– অন্নে রমণীয় বা রমণীয় অন্নযুক্ত। অশ্বিদ্বয় (ঋক-৪/৪৩/৭) ও ঋভুগণ (ঋক-৪/৩৪/২, ৪/৩৫/৫) বাজরত্না- বিশেষণে বিভূষিত; বৈদিক কবিরা আবার সেই সঙ্গেই বলছেন, 'আমরা যেন অন্নযুক্ত হয়ে বাজরত্নাঃ হতে পারি' (ঋক-৫/৪৯/৪)। 'ইন্দ্র যেন আমাদের জ্ঞানগুলিকে (বা কর্মগুলি– ধিয়ঃ) বাজরত্ন করেন' (ঋক-৬/৩৫/১)–

কদা ভুবনথ্রক্ষয়াণি ব্রহ্ম কদা স্তোত্রে সহস্রপোষ্যং দাঃ।
কদা স্তোমং বাসয়োহস্য কদা ধিয়ঃ করসি বাজরত্নাঃ।। (ঋগ্বেদ-৬/৩৫/১)।
অর্থাৎ : হে ইন্দ্র! আমার স্তোত্র সকল কবে রথারূঢ় তোমার নিকট উপস্থিত হবে? কবে তুমি তোমার উপাসক আমাকে সহস্র পোষ্য পোষণ করবার উপায় প্রদান করবে? কবে তুমি এ স্তবকারী আমার স্তোত্র ধনদ্বারা পুরস্কৃত করবে? কবেই বা তুমি যজ্ঞীয় কার্যে সকলকে অন্নোৎপাদক (বাতরত্নাঃ) করবে?

এরকম আর একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত 'বাজয়ন্' অর্থাৎ অন্ন তৈরি করতে বা উৎপাদন করতে করতে। দেব-প্রসঙ্গে এই শব্দের ব্যবহার বিরল নয়। যেমন, বলাভিলাষী ইন্দ্রের উদ্দেশে 'বাজয়ন্তম্' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে (ঋক-৮/৯৮/১২), সোম-এর বর্ণনায় বাজয়ন্ শব্দ পাওয়া যায় (ঋক-৯/৬৮/৪); অন্নযুক্ত ঋভুদের সঙ্গে বাজয়ন্ ইন্দ্রকে যজ্ঞাভিমুখে যাবার অনুরোধ করা হয়েছে (ঋক-৩/৬০/৭)। 'অন্ন উৎপাদন করতে করতে (বাজয়ন্ত) আমরা, হে ইন্দ্র, তোমাকে সোম দ্বারা সেচন করি (ঋক-১/৩০/১); 'যজ্ঞে অন্ন উৎপাদন করতে করতে আমরা ইন্দ্রকে আহ্বান করি (ঋক-১/১৩২/১)। অনেক দৃষ্টান্তে দেখা যায়, অন্ন-উৎপাদন করবার সময় ইন্দ্রের স্তুতি করা হয়েছে। যেমন– 'হে ইন্দ্র, অন্ন-উৎপাদন কালে আমরা তোমার স্তুতি করি' (ঋক-৬/১৯/৪), 'অন্ন উৎপাদন করতে করতে অন্ন-লাভের জন্য আমরা ইন্দ্র ও বায়ুকে আহ্বান করি' (ঋক-৭/৯০/৭), 'ইন্দ্রের প্রতি অন্ন-উৎপাদক শব্দগুলি প্রেরণ করা হয়' (ঋক-৮/৩/১৫), 'হে ইন্দ্র, অন্ন-উপৎপাদ আমাদের রক্ষা কর' (ঋক-৫/৩৫/৭)। কিন্তু বিশেষ চিত্তাকর্ষক কথা হলো, এমনকি ঋগ্বেদের যুগেও কোনো কবির মনে হয়েছে, অন্ন-উৎপাদনের জন্য জনগণের প্রচেষ্টাই পর্যাপ্ত, অতএব এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রের স্তুতি অবান্তর মাত্র–

'প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শকমভিষ্টবাম।।' (ঋগ্বেদ-৮/১০০/৩)।
অর্থাৎ : হে সংগ্রামেচ্ছুগণ! অন্ন-উৎপাদনরত (বাজয়ন্তঃ) তোমরা ইন্দ্রকে স্তুতিপূর্ণ কর, যেন ইন্দ্র সত্যিই বর্তমান আছেন; (কিন্তু) নেম ঋষি বলেন ইন্দ্র বলে কেউ নেই; কে তাকে দেখেছে? অতএব আমরা কার স্তুতি করবো? (ঋক-৮/১০০/৩)।।

এই সূক্তটি ভৃগুগোত্রীয় নেম ঋষির রচনা। পরবর্তী ঋক-এ অবশ্য ইন্দ্র নেম-এর সামনে

অভির্ভূত হয়ে তাঁর সংশয় দূর করেছেন–
অয়মস্মি জরিতঃ পশ্য মেহ বিশ্বা জাতন্যাভ্যস্মি মহ্না।
ঋতস্য মা প্রদিশো বর্ধয়ন্ত্যাদর্দিরো ভুবনা দর্দরীমি।। (ঋগ্বেদ-৮/১০০/৪)।
অর্থাৎ : হে স্তোতা! এ আমি তোমার নিকট এসেছি, আমাকে দর্শন কর, সমস্ত ভুবনকে আমি মহিমাদ্বারা অভিভূত করি। যজ্ঞের প্রদেষ্টৃগণ আমাকে বর্ধিত করে, আমি বিদারণশীল, আমি ভুবন বিদীর্ণ করি। (ঋক-৮/১০০/৪)।।

এ-জাতীয় আরও অজস্র দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদের প্রায় সর্বত্রই ছড়ানো রয়েছে। বস্তুত, এ-কথা বললে অতিশয়োক্তির আশঙ্কা থাকে না যে ধন, অন্ন প্রভৃতি পার্থিব সম্পদের কামনা চরিতার্থতাই যেহেতু কবিদের কাছে প্রায় এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষার্থ ছিলো সেই হেতু তাঁদের কল্পনায় এমন কোনো দেবতার স্থানই হয়নি যিনি কিনা অত্যন্ত নিবিড় এবং প্রত্যক্ষভাবে সে-কামনার সঙ্গে জড়িত নন। এ-প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি এক্ষেত্রে অবশ্যই উদ্ধৃতিযোগ্য–

‘বৈদিক কবিদের উপর আমরা পাছে অসতর্কভাবে পরবর্তী কালের আধ্যাত্মিক চেতনা আরোপ করে বসি তাই জন্য এখানে একটি কথা পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন। শব্দার্থের তুলনায় শব্দ-পরিবর্তন অনেক মন্থর; নতুন পরিস্থিতিতে নতুন অর্থ বোঝাবার জন্য প্রায়ই পুরনো কালে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত শব্দ সংরক্ষিত হয়ে থাকে। ঋগ্বেদ যে প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম জ্ঞানের আধার– এ-জাতীয় সংস্কারের মূলে উক্ত ঘটনার প্রভাব যে বাস্তবিকই কতখানি তা বিচার করা প্রয়োজন। কেননা, ঋগ্বেদে এমন বহু শব্দ পাওয়া যায় পরবর্তীকালে যেগুলির তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবেই আধ্যাত্মিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদে সেগুলির তাৎপর্য আদপেও আধ্যাত্মিক নয়। এক কথায়, শব্দগুলির আদি-তাৎপর্য কালক্রমে বিপরীতে পর্যবসিত হয়েছে। সবচেয়ে সহজ দৃষ্টান্ত ‘ভগবান’ শব্দ। ঋগ্বেদে ‘ভগ’ মানে পার্থিব সম্পদ (ধন) বা তার অংশ (ভাগ); ভগবান মানে ধনবান বা অংশবান। শব্দটির বৈদিক প্রয়োগের মধ্যে তাই উত্তরকালের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অন্বেষণ করা অবান্তর হবে।
আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ‘ঈশ্বর’ শব্দ। নিঘণ্টু-মতে (নিঘণ্টু-২/২২) তার চারটি প্রতিশব্দ আছে: রাষ্ট্রী, অর্য, নিযুত্বৎ এবং ইন। কিন্তু কোনটিরই আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নেই। বিস্তার বা বৃদ্ধি-কর্ম-পরায়ণ অর্থে এগুলি ব্যবহৃত। কিসের বিস্তার বা বৃদ্ধি? যে-প্রসঙ্গে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা বিচার করলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে তা প্রধানতই ধন, অন্ন প্রভৃতি পার্থিব সম্পদেরই বিস্তার বা বৃদ্ধি। এ-বিষয়ে অনেক নজির উদ্ধৃত করা যায়, কিন্তু তার তালিকা ক্লান্তিকর হবে। পাদ-টীকায় (ঋক-১/৩৩/৩; ১/৫৩/২; ১/৭০/১-২; ১/৭১/৩; ১/৮১/৬; ১/১৩৫/৪; ১/১৪৯/১; ইত্যাদি ইত্যাদি) মাত্র কয়েকটি নিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া গেল।
কিন্তু সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত ‘ব্রহ্মন্’ শব্দ। বেদান্ত বা উত্তর-মীমাংসা দর্শনে ব্রহ্মন্ মানে চিন্ময় পরমসত্তা। কিন্তু ঋগ্বেদে এ-তাৎপর্যের ঐকান্তিক অভাব লক্ষণীয়। শব্দটির আদি-অর্থ

অন্ন বা ধন। ব্রহ্মন্ শব্দের এই অর্থ-বিপর্যয়ের ইতিহাস পরে বিচার করতে হবে।'-
(ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৬৪-৫)

বৈদিক দেবতাদের নজির দেখিয়ে ঋগ্বেদে অধ্যাত্মবাদী চেতনা প্রমাণ করা যায় কিনা, এ-বিষয়ে আর একটি যুক্তি উল্লেখ করে দেবীপ্রসাদ বলেন–
'ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পূর্ব-মীমাংসাকে নিঃসংশয়ে আস্তিক বা বেদপন্থী বলে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই পূর্ব-মীমাংসায় শুধুই যে জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্ভাবনা সুবিস্তৃত যুক্তি-তর্কের সাহায্যে খণ্ডিত হয়েছে তাই নয়, এমনকি ঋগ্বেদের সুবিখ্যাত দেবতাগুলির গৌরবও সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়েছে। মীমাংসকেরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বৈদিক যজ্ঞে এমনকি যজ্ঞ-ফল উৎপাদনের ব্যাপারেও বৈদিক দেবতাদের কোনো কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য নেই; যজ্ঞফলের জন্য প্রধান বা প্রায়োজক বলতে আসলে যজ্ঞকর্মই (মীমাংসাসূত্র-৯/১/৯-১০, বিশেষত শবরভাষ্য দ্রষ্টব্য)।... মীমাংসকাচার্যদের মতো একান্ত বেদপন্থী দার্শনিকেরাও ঋগ্বেদের দেবগরিমাকে এই অর্থে গ্রহণ করেননি যে বৈদিক কবিদের বিশ্বাস অনুসারে ওই দেবতাগুলির উপাসনা করে তাঁদের দয়া বা দান হিসেবে কামনার সাফল্য লাভ করা যায়, বা কামনার সাফল্য এই দেবতাদের ইচ্ছাধীন। পূর্ব-মীমাংসা দর্শনের ব্যাখ্যায় প্রভাকর ও কুমারিল প্রবর্তিত দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা মৌলিক বিষয়ে গভীর পার্থক্য সত্ত্বেও এই নির্দিষ্ট বিষয়টিতে উভয়ে সম্পূর্ণ একমত।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৬৫)

পূর্ব-মীমাংসার এই চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য পরবর্তীতে মীমাংসা-দর্শনের আলোচনায় প্রয়াস করা যাবে। তবে আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ বৈদিক দেবতা 'বরুণ'-এর কিছুটা পরিচিতি দেয়া না-হলে বৈদিক দেবতার আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

.
দেবতা বরুণের ইতিবৃত্ত :
ঋগ্বেদের ঋষিদের কাছে বরুণ হলেন স্বর্গস্থানের দেবতা। আধুনিক বিদ্বান ও বেদ-গবেষকেরা অনুমান করেন, আদিপর্বে এই বরুণই ছিলেন বৈদিক দেবলোকের মধ্যে প্রধান; কালক্রমে তাঁর গৌরব ইন্দ্রের গৌরবের নিচে চাপা পড়েছিলো।
ঋগ্বেদে দেখা যায় এই বরুণই দ্যাবা-পৃথিবীকে পরস্পর থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করেছিলেন–

ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা।
দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা।। (ঋগ্বেদ-৬/৭০/১)।
ধীরা ত্বস্য মহিনা জনূংষি বি যস্তস্তম্ভ রোদসী চিদুর্বী।
প্র নাকমৃষ্বং নুনুদে বৃহন্তং দ্বিতা নক্ষত্রং পপ্রথচ্চ ভূম।। (ঋগ্বেদ-৭/৮৬/১)।
যঃ শ্বেতা অধিনির্ণিজশ্চক্রে কৃষ্ণা অনুব্রতা।

স ধাম পূর্ব্যং মমে যঃ স্কন্তেন বি রোদসী
অজো ন দ্যামধারয়ৎ নভ্যন্তামন্যকে সমে।। (ঋগ্বেদ-৮/৪১/১০)।
অর্থাৎ :
হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা উদকবতী, ভূতসমূহের আশ্রয়ণীয়া, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা, মধুদুঘা, স্বরূপবিশিষ্টা। দৌ ও পৃথিবী বরুণের ধর্মদ্বারা এবং প্রভূত বলের দ্বারা চিরকাল পৃথক হয়ে আছে। (ঋক-৬/৭০/১)।। তাঁর (বরুণের) জন্ম মহান এবং ধীর, ইনি পৃথিবী ও স্বর্গকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপিত করেছিলেন। ইনি বৃহৎ আকাশ ও দর্শনীয় নক্ষত্রকে দ্বিধা প্রেরণ করেন। ইনি ভূমিকেও বিস্তীর্ণ করেছেন। (ঋক-৭/৮৬/১)।। যিনি (বরুণ) নিজ রশ্মিসমূহকে শ্বেতবর্ণ করেন এবং কৃষ্ণবর্ণ করেন, তাঁর কর্মের উদ্দেশে দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোক নির্মিত হয়েছে। আদিত্য যেরূপ দ্যৌ বা দ্যুলোক ধারণ করেন, সেরূপ তিনি (বরুণ) দ্যৌ ও পৃথিবীকে পৃথকরূপে ধারণ করেছিলেন। (ঋক-৮/৪১/১০)।।

এবং ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে ঋষিদের যে পার্থিব কামনা তা বরুণের উদ্দেশে স্তুতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত–

ইরাবতীর্বরুণ ধেনবো বাং মধুমদ্বাং সিন্ধবো মিত্র দুহ্রে।
ত্রয়স্তস্থুর্বৃষভাসস্তিসৃণাং ধিষণানাং রেতোধা বি দ্যুমন্তঃ।। (ঋগ্বেদ-৫/৬৯/২)।
বৃষ্টিদ্যাবা রীত্যাপেষস্পতী দানুমত্যাঃ। বৃহন্তং গর্তমাশাতে।। (ঋগ্বেদ-৫/৬৮/৫)।
আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্ । মধ্বা রজাংসি সক্রতূ।। (ঋগ্বেদ-৩/৬২/১৬)।
সং যা দানূনি যেমথুর্দিব্যাঃ পার্থিবীরিয়ঃ। নভস্বতীরা বাং চরন্তু বৃষ্টয়ঃ।। (ঋগ্বেদ-৮/২৫/৬)।
অর্থাৎ :
হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদের আজ্ঞাক্রমে ধেনুগণ দুগ্ধবতী হয়, নদী সকল সুমধুর বারি প্রদান করে এবং দীপ্তিমান তিনটি বারিবাহক ও বারিবর্ষক অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য স্ব স্ব উচিত তিন স্থানে অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে অবস্থান করে। (ঋক-৫/৬৯/২)।। বারিবর্ষণকারী যে গতিযুক্ত দ্যুলোক, হে অন্নের অধিপতি, তোমাদের (মিত্র ও বরুণ) দানশীলতার জন্যই তাহা শ্রেষ্ঠ; তোমরা মহৎ গর্তকে আশ্রয় কর। (ঋক-৫/৬৮/৫)।। হে শোভনকর্মকারী মিত্রাবরুণ! আমাদের গোষ্ঠ ঘৃতপূর্ণ কর, আমাদের বাসস্থান মধুর রসপূর্ণ কর। (ঋক-৩/৬২/১৬)।। হে মিত্রাবরুণ! তোমরা আমাদেরকে দানের উপযোগী ধন এবং পার্থিব অন্ন দান কর; তোমাদের জলবতী বৃষ্টি আমাদের মধ্যে সঞ্চরণ করুক। (ঋক-৮/২৫/৬)।।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, অন্যান্য বৈদিক দেবতাদের ক্ষেত্রে কবিদের মধ্যে যেভাবে জ্ঞাতি বা সখার পরিকল্পনা দেখা যায়, বরুণের ক্ষেত্রে ঠিক সেরকমটা চোখে পড়ে না। তবে ঋগ্বেদে বরুণের চরিত্রে যে সবচেয়ে মহান ঐশ্বর্যময় দিক সেটি হলো তাঁর নৈতিক গৌরবের দিক। ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে দেখা যায় নৈতিক নিয়মের চূড়ান্ত দায়িত্ব বরুণেরই উপর। যেমন–

পরি স্পশো বরুণস্য স্মদিষ্টা উভে পশ্যন্তি রোদসী সুমেকে।
ঋৃতাবানঃ কবয়ো যজ্ঞধীরাঃ প্রচেতসো য ইষয়ন্ত মন্ম।। (ঋগ্বেদ-৭/৮৭/৩)।

অর্থাৎ : বরুণের অনুচরগণ মঙ্গল-উদ্দেশ্যে স্বর্গ ও পৃথিবী পরিদর্শন করে, তাঁরই ভয়ে ঋতযুক্ত, ক্রান্তদর্শী যজ্ঞধীর বিজ্ঞগণ তাঁর উদ্দেশে স্তুতি প্রেরণ করেন। (ঋক-৭/৮৭/৩)।।

অনৃত বা মিথ্যার বিরুদ্ধে বরুণের কঠোর বিধান ঋগ্বেদে দেখা যায়–
যুবং বস্ত্রাণি পীবসা বসাথে যুবোরচ্ছিদ্রা মন্তবো হ সর্গাঃ।
অবাতিরতমনৃতানি বিশ্ব ঋতেন মিত্রাবরুণা সচেথে।। (ঋগ্বেদ-১/১৫২/১)।
ইমে চেতারো অনৃতস্য ভুরের্মিত্রো অর্যমা বরুণো হি সন্তি।
ইম ঋৃতস্য বাবৃধূর্দুরোণে শগ্মাসঃ পুত্রা অদিতেরদব্ধাঃ।। (ঋগ্বেদ-৭/৬০/৫)।
অর্থাৎ :
হে মিত্রাবরুণ! তোমরা (তেজরূপ) স্থূল বস্ত্রদ্বারা আচ্ছন্ন কর; তোমাদের সৃষ্টি ছিদ্রহীন ও মননযুক্ত। তোমরা সমস্ত অনৃত বিনাশ করে বিশ্বকে ঋতের সাথে যুক্ত করেছিলে। (ঋক-১/১৫২/১)।। মিত্র, অর্যমা ও বরুণ প্রভূত অনৃত বা পাপের হন্তা; অদিতির অহিংসিত সুখকর পুত্রগণ গৃহে ঋতকে বর্ধিত করেছিলেন। (ঋক-৭/৬০/৫)।।

বরুণ শুধু অনৃত-হন্তা নন, ঋতের পালক, ঋতের বর্ধক। বস্তুত ঋতের সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্কের দিক থেকেই বরুণের নৈতিক গৌরবের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। তাই তাঁর কাছে বৈদিক কবিদের আর্তি–
শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্বী গভীরা সুমতিষ্টে অস্তু।
বাধস্য দূরে নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ।। (ঋগ্বেদ-১/২৪/৯)।
ঋতেন যাবতাবৃধাবৃতস্য জ্যোতিষস্পতী। তা মিত্রাবরুণা হুবে।। (ঋগ্বেদ-১/২৩/৫)।
অর্থাৎ :
হে বরুণরাজ! তোমার শত ও সহস্র ঔষধি আছে, তোমার সুমতি বিস্তীর্ণ ও গভীর হোক। নির্ঋতিকে পরাঙ্মুখ করে আমাদের থেকে দূরে রাখ, কৃত পাপের মোহ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করো। (ঋক-১/২৪/৯)।। যাঁরা ঋত দ্বারা ঋতকে বর্ধিত করেন, যাঁরা ঋতের প্রকাশকর্তা, সেই মিত্রাবরুণকে আহ্বান করি। (ঋক-১/২৩/৫)।।

ঋতের যা বিপরীত তারই নাম নিঃঋতি বা নির্ঋতি। মানে ঋতহীনত্ব। যখনি ঋতহীনতার আশঙ্কা জাগে তখন মনে পড়ে অতীতের এই বরুণই ছিলেন ঋতের পালক, ঋতের রক্ষক। ঋতের প্রসঙ্গে পরবর্তীতে আলোকপাতের চেষ্টা করা হবে। তবে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে দেবীপ্রসাদের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে–
‘অধ্যাপক রথ্ অনুমান করছেন যে, ঋগ্বেদ রচিত হবার যুগেই বৈদিক কবিদের কল্পনায় ইন্দ্রের গৌরব বরুণের চেয়ে অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ আগে বরুণই ছিলেন বৈদিক মানুষদের প্রধানতম দেবতা এবং তাঁরই গৌরব সর্বাধিক। যতোই দিন গিয়েছে ততোই বরুণের গৌরব ম্লান হয়েছে এবং তারই জায়গায় ইন্দ্রের গৌরব চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে– এ-পরিবর্তন ঋগ্বেদ রচিত হবার সুদীর্ঘ যুগটির মধ্যেই সাধিত হয়েছে। এই মতের পক্ষে একটি

প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়েছে যে, ঋগ্বেদের সবচেয়ে অর্বাচীন অংশে– দশম মণ্ডলে– বরুণের গৌরব-বর্ণনায় একটিও সূক্ত নেই; অপরপক্ষে পঁয়তাল্লিশটি সূক্ত ইন্দ্রের মহিমায় মুখর। কিন্তু অথ্যাপক ম্যাকডোন্যাল বলছেন, সূক্তসংখ্যা-নির্ভর এ-জাতীয় যুক্তির মূল্য খুব বেশি নয়। কেননা সামগ্রিকভাবে ঋগ্বেদে বরুণের তুলনায় ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে রচিত সূক্ত অনেক বেশি : তৃতীয় মণ্ডলেও বরুণের উদ্দেশ্যে কোনো সূক্ত নেই, কিন্তু ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে বাইশটি সূক্ত আছে; দ্বিতীয় মণ্ডলে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে তেইশটি সূক্ত, তুলনায় বরুণের উদ্দেশ্যে মাত্র একটি।
অধ্যাপক ম্যাকডোন্যাল-এর এ-যুক্তি নিশ্চয়ই স্বীকার্য : সূক্তসংখ্যার দিক থেকে বৈদিক দেবতাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করবার প্রচেষ্টা নির্ভরযোগ্য নয়। তবুও আমরা বৈদিক সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকেই অধ্যাপক রথ্-এর এই মতবাদটির পক্ষেই কিছু সমর্থন পেতে পারি।’- (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৬১৬-৭)

এই আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যটা কী? ঋগ্বেদে বলা হয়েছে–
তং ব ইন্দ্রং ন সুক্রতুং বরুণমিব মায়িনম্ ।
অর্যমণং ন মন্দ্রং সৃপ্রভোজসং বিষ্ণুং ন স্তষ আদিশে।। (ঋগ্বেদ-৫/৪৮/১৪)।
অর্থাৎ : (হে মরুৎগণ), তোমরা ইন্দ্রকে শোভন যজ্ঞ বিশিষ্ট মায়াযুক্ত বরুণের ন্যায় (দেখবে), স্তুতি করবে; তিনি অর্যমার ন্যায় বুদ্ধিমান ও বিষ্ণুর ন্যায় দানশীল। (ঋক-৫/৪৮/১৪)।।

এখানে ‘মায়া’র প্রসঙ্গ এসেছে, তা পরে আলোচনা করা যাবে। দেবীপ্রসাদ বলেন, আপাতত প্রশ্ন হলো, উপরের উদ্ধৃতি থেকে কি এই কথাই অনুমান করা যায় না যে, ইতিপূর্বে বরুণকে যে-চোখে দেখা হতো ইন্দ্রকেও সেই চোখে দেখবার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে– অর্থাৎ বরুণের অতীত গৌরবই ইন্দ্রের উপর আরোপ করার আয়োজন হচ্ছে? অন্যত্রও এ-জাতীয় আভাস পাওয়া যায়–
ত্বং শর্ধায় মহিনা গৃণান উরু কৃধি মঘবঞ্ছগ্ধি রায়ঃ।
ত্বং নো মিত্রো বরুণো ন মায়ী পিত্বো ন দস্ম দয়সে বিভক্তা।। (ঋগ্বেদ-১০/১৪৭/৫)।
অর্থাৎ : (হে ইন্দ্র!) বল পাবার জন্য তোমাকে বিশিষ্টরূপে স্তব করা হয়; তুমি বিপুল বল প্রদান কর, ধনও দাও। হে প্রিয়দর্শন! মিত্র ও বরুণের ন্যায় মায়াযুক্ত হয়ে তুমি আমাদের অন্নের বিভক্তা ও দাতা হও। (ঋক-১০/১৪৭/৫)।।

এর থেকে অনুমান করা যায় যে, এককালে মিত্র ও বরুণই মায়াযুক্ত হয়ে অন্নের দাতা ও বিভক্তা ছিলেন; এই ঋকটির রচনাকালে ইন্দ্রকেও সেই গৌরবে গৌরবান্বিত করে তোলবার আয়োজন হচ্ছে। কিন্তু কেন এ আয়োজন? এর ব্যাখ্যা কী হতে পারে?
ইন্দ্রের পক্ষে এইভাবে বরুণের গৌরবময় স্থান অধিকার করবার পিছনে একটা ঐতিহাসিক কারণও থাকা স্বাভাবিক বা সম্ভব। কেননা, পশুপালন-নির্ভর ট্রাইবের পক্ষে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দিকে যে-অগ্রগতি, তার একটি প্রধানতম অঙ্গ হলো যুদ্ধের উৎসাহ-বৃদ্ধি। প্রাচীন

গোষ্ঠিগত সমষ্টির কামনা পরিবর্তিত হয়ে ব্যষ্টিস্বার্থের আবির্ভাবে লুণ্ঠন ও লোভের প্রভাবে সে-সমাজে ভাঙন ধরবার আভাস ঋগ্বেদেই পরিলক্ষিত হয়–

ঋষভং মা সমানানাং সপত্নানাং বিষাসহিম্ ।
হন্তারং শত্রূণাং কৃধি বিরাজং গোপতিং গবাম্ ।। (ঋগ্বেদ-১০/১৬৬/১)।
অভিভূরহমাগমং বিশ্বকর্মেণ ধাম্না।
আ বশ্চিত্তমা বো ব্রতমা বোহহং সমিতিং দদে।। (ঋগ্বেদ-১০/১৬৬/৪)।
যোগক্ষেমং ব আদায়াহং ভূয়াসমুত্তম আ বো মূর্ধানমক্রমীম্ ।
অধস্পদান্ম উদ্বদত মন্ডূকা ইবোদকান্মন্ডূকা উদকাদিব।। (ঋগ্বেদ-১০/১৬৬/৫)।
অর্থাৎ :
(হে ইন্দ্র!) আমাকে সমানদের বা সমকক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর, শত্রুদের পরাজয়িতা কর, শত্রুদের হন্তা এবং সর্বোপরিবর্তী করে গরুদের মধ্যে গোপতি কর। (ঋক-১০/১৬৬/১)।। আমার তেজ সকল কর্মের জন্যই উপযুক্ত। সে তেজ দিয়ে আমি শত্রুদের অভিভূত করতে এসেছি; তোমাদের সমস্ত চিত্ত, কর্ম এবং সমিতিকে আমি অপহরণ করলাম। (ঋক-১০/১৬৬/৪)।। তোমাদের (সপত্নদের) প্রাপ্ত ধনের অধিকারী হয়ে এবং আত্মসাৎ করে আমি তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েছি এবং তোমাদের মস্তকে উঠেছি। পদতল হতে তোমরা ভেকের ন্যায় চিৎকার করতে থাকো। (ঋক-১০/১৬৬/৫)।।

এখানে শুধুই যে শত্রুদের পদদলিত করবার কামনা ফুটে উঠেছে তাই নয়,– ‘আমাদের’ কথাকে পদদলিত করে ‘আমাকে’, সামগ্রিক স্বার্থকে ধূলিসাৎ করে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে চূড়ান্ত মর্যাদা দেওয়ার পরিচয়ও অস্পষ্ট নয়। কেননা, শত্রুজয় এবং শত্রুধন অপহরণ করবার প্রসঙ্গ ঋগ্বেদে বিরল নয়; কিন্তু আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি, যেখানে প্রাচীন পর্যায়ের সমান-জীবনের স্মৃতি ম্লান হয়নি সেখানে ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে, অগ্নিকে উদ্দেশ্য করে সেই জিত-ধনের অংশ বণ্টন করে দেবার কামনাই জানানো হয়েছে।

তাই ইন্দ্রের পক্ষে বরুণের গৌরবময় স্থান অধিকার করবার পিছনের ঐতিহাসিক কারণ ব্যাখ্যায় যুক্তি দেখাতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ বলেন–
‘বৈদিক মানুষদের জীবনে যতোই লুণ্ঠন ও লোভের প্রভাব বর্ধিত হয়েছে,– যতোই বর্ধিত হয়েছে যুদ্ধের উদ্দীপনা– ততোই তাদের দেবলোকেও ওই যুদ্ধের দেবতা, লুণ্ঠনের দেবতা, বীর ইন্দ্রের গৌরব বেড়ে চলা স্বাভাবিক। এই ইন্দ্রের গৌরবই যদি সামগ্রিকভাবে ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে তাহলে অনুমান করতে হবে পশুপালনমূলক অর্থনীতির বিকাশের ওই পর্যায়টির বৈশিষ্ট্যই সামগ্রিকভাবে ঋগ্বেদ সংহিতার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।
কিন্তু অতীতের স্মৃতি হিসেবেই হোক বা বাস্তবিক পক্ষে প্রাচীন রচনার পরিচায়ক হিসেবেই হোক, ঋগ্বেদ সংহিতাতেই এমন একটি দেবতার অতীত গৌরবের আভাস পাওয়া যাচ্ছে যাঁর মহিমার প্রধান কথা ওই লুণ্ঠন-অপহরণ-মূলক যুদ্ধ নয়– তার বদলে যিনি ছিলেন

অন্নের বিভক্তা, অনৃতের হন্তা, ঋতের পালক। তাঁর নাম বরুণ। এবং কালক্রমে, বৈদিক ঋষিরা যতোই যুদ্ধকে মহত্তম যুক্তি বলে সম্মান করতে শিখেছিলেন ততোই তাঁদের সাহিত্যে বরুণের মহিমাকে অবদমিত করে ইন্দ্রের মহিমা প্রধান হয়ে উঠেছে।'- (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৬১৮)

বৈদিক মানবদের এই মানসিক পরিবর্তনের আশ্চর্য দৃষ্টান্তও ঋগ্বেদে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এভাবে–
এভির্ন ইন্দ্রাহভির্দশস্য দুর্মিত্রাসো হি ক্ষিতয়ঃ পবন্তে।
প্রতি যচ্চষ্টে অনৃতমনেনা অব দ্বিতা বরুণো মায়ী নঃ সাৎ।। (ঋগ্বেদ-৭/২৮/৪)।
অর্থাৎ : হে ইন্দ্র! দুষ্ট মিত্ররূপী বাধাদানকারী মানবদল আসছে; তাদের কাছ থেকে ধন কেড়ে নিয়ে আমাদেরকে এই পুণ্য দিনে দান কর। মায়াবী বরুণ আমাদের মধ্যে যে অনৃত দেখেন তুমি তা দ্বিধাবিভক্ত করে অপনোদন কর। (ঋক-৭/২৮/৪)।।

এই লোভ, এই লুণ্ঠন, এই যুদ্ধকে বরুণ তখনো অসত্য বা অনৃত হিসেবেই দেখছেন। অর্থাৎ অমোঘ ন্যায়ের পালক বরুণের স্মৃতির সঙ্গে এই লোভ ও লুণ্ঠনের সামঞ্জস্য থাকছে না। তাই লুণ্ঠনের নেতা ইন্দ্রের কাছে কামনা জানানো হচ্ছে, অতীতকালের অমোঘ ন্যায়ের মানদণ্ডে যা আজ অন্যায়, অনৃত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে সেই অনৃতবোধকে দ্বিধাবিভক্ত করো, অপনোদন করো।

অতএব, দেবীপ্রসাদ বলছেন,– 'বৈদিক মানুষেরা যখন এই কামনা করতে শিখেছেন তখন তাঁরা শ্রেণী সমাজের কতোখানি কাছাকাছি এসে পড়েছেন বেদবিদেরা তার আলোচনা করবেন। আপাতত আমাদের দ্রষ্টব্য হলো, বৈদিক সমাজের এই পরিবর্তনটির ফলে শুধুই যে অতীত দেবতার স্থানে নতুন দেবতার গৌরব ফুটে উঠছে তাই নয়, অতীতের দেবতার চরিত্রেরও বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে।
কেননা, মানব-ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের সামনে এমনকি বৈদিক দেবতারাও অসহায়ের মতো। তাঁদের চরিত্রের প্রধানতম উপকরণ বলতে এই মরলোকের মানুষদেরই ধ্যানধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা– শেষ পর্যন্ত যার উৎস হলো প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আর মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। অতএব, ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে মানুষের মৌলিক অভিজ্ঞতায় পরিবর্তন দেখা দিলে, তাদের ধ্যানধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় বিপর্যয় ঘটলে, দেবতার চরিত্রেও বিপর্যয় ঘটা অসম্ভব নয়।'- (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৬১৯)।

৩.৫ : ঋত
অথর্বন্-দের সঙ্গে যে-অঙ্গিরস্-দের নাম থেকে অথর্ববেদের আদি-নামকরণ, ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশের কবিরাও তাঁদের সুদূর অতীতের অসীম শক্তিশালী জাদুকর বলে স্মরণ করেছেন এবং সেই সঙ্গেই স্মরণ করেছেন যে তাঁরা ছিলেন ঋত-বান বা ঋত-যুক্ত। যেমন–

ত ইন্দেবানাং সধমাদ আসন্নৃতাবানঃ কবয়ঃ পূর্ব্যাসঃ।
গূঢ়হং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ববিন্দনৎসত্যমন্ত্রা অজনয়ন্নুষাসম্ ।। (ঋগ্বেদ-৭/৭৬/৪)।
সমান ঊর্বে অধি সঙ্গতাসঃ সং জাততে ন যতন্তে মিথস্তে।
তো দেবানাং ন মিনন্তি ব্রতান্যমর্ধন্তো বসুভির্যাদমানাঃ।। (ঋগ্বেদ-৭/৭৬/৫)।
অর্থাৎ :
যে ঋতবান অঙ্গিরাগণ কবি, পূর্বকালীন পিতা ও যাঁরা গূঢ় জ্যোতি লাভ করেছিলেন এবং অবিতথ মন্ত্রদ্বারা ঊষাকে প্রাদুর্ভূত করেছিলেন, তাঁরাই দেবগণের সঙ্গে একত্রে প্রমত্ত হতেন। (ঋক-৭/৭৬/৪)।। তাঁরা সাধারণ গো-সমূহের জন্য সঙ্গত হয়ে একবুদ্ধি (পরস্পর সমান) হয়ে ছিলেন। তাঁরা কি পরস্পর যত্ন করেন নি? তাঁরা দেবগণের কর্ম হিংসা করেন না। তাঁরা হিংসারহিত বাসপ্রদ কিরণের দ্বারা গমন করেন। (ঋক-৭/৭৬/৫)।।

এখন প্রশ্ন হলো, ঋত মানে কী? এ-প্রশ্নের সহজ উত্তর দেওয়া কঠিন। কোন এক আদিম ধ্যানধারণার পরিচায়ক বলেই আধুনিক প্রতিশব্দের সাহায্যে ঋত-র সম্যক পরিচয় সম্ভব নয় বলে বিদ্বানেরা মনে করেন। তবুও বৈদিক চিন্তা-চেতনার ইতিহাসে ধারণাটির গুরুত্ব প্রায় অপরিসীম। কেননা ঋগ্বেদের কবিদের কাছে এই ঋতই ছিলো সেই প্রাচীন অবিভক্ত সমাজের আদিম নীতিবোধ। নীতিবোধের চেতনার দিক থেকে প্রাচীন সমাজের সঙ্গে আধুনিক সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আমাদের আধুনিক চেতনায় প্রাকৃতিক নিয়ম, জীবন সংগ্রাম, কর্তব্য, দায়িত্ব প্রভৃতির ধারণা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে; আদিম সমাজে তা ছিলো না। নৈতিক জীবনের নিয়মও প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই অমোঘ। এ-প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন–
‘আগেই দেখেছি, প্রাচীন বৈদিক কবিরা মূলতই পার্থিব সম্পদের কামনায় বিভোর; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তাঁরা কোনো অমূর্ত চেতনায় একান্তই উপনীত হতে পেরে থাকেন, যদি তাঁরা বিশ্বের সামগ্রিক রহস্য উপলব্ধির একান্তই কোনো পরিচয় দিয়ে থাকেন, যদি তাঁদের রচনায় বিশ্বসংসারের সঙ্গে মানবসত্তার সম্পর্কমূলক কোনো বোধ একান্তই প্রতিফলিত হয়ে থাকে, –সংক্ষেপে, ঋগ্বেদের প্রাচীন পর্যায়ে প্রকৃত দার্শনিক চেতনার কোনো আভাস যদি সত্যিই স্বীকৃত হয়– তাহলে তার মূলসূত্র এই ঋত-র মধ্যেই সন্ধান করতে হবে।’- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৮৫)

প্রাচীন সমাজের এই আদিম অখণ্ড নৈতিক চেতনার দিক থেকে ঋগ্বেদের ঋত বলতে অনেক কিছুই বোঝায়– ঋত মানে সত্য, ঋত মানে যজ্ঞ, ঋত মানে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম,

ঋত মানে অমোঘ নৈতিক নিয়ম– আরো অনেক কিছু। ঋত-র বর্ণনায় অধ্যাপক কীথ্ (Keith) বলছেন (দেবীপ্রসাদের তর্জমায়),–

'(ঋগ্বেদে) বারবার প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার নাম ঋত।... বৈদিক ভারতে শব্দটি ত্রি-অর্থবাচক : বিশ্বের নিয়মানুবর্তিতা, যজ্ঞের বিধি, পৃথিবীতে নৈতিক জীবনের নিয়মানুবর্তিতা।... ঋত অনুসারেই প্রভাতে উষাদের আবির্ভাব হয় : ঋত অনুসারেই পিতৃগণ আকাশে সূর্যকে স্থাপন করেছেন, সূর্য ওই ঋতেরই উজ্জ্বল মুখ এবং গ্রহণের অন্ধকার সেই ঋতেরই বিপরীত। সংবৎসর হলো দ্বাদশ অর-বিশিষ্ট ঋতের রথচক্র। নব-গাভীর ধারোষ্ণ দুগ্ধ হলো ঋতের দ্বারা বর্ধিত গাভীর ঋত। জল ও ওষধির মধ্যে লুকোনো আগুন (অগ্নি) অরণি কাষ্ঠের ঘর্ষণে ঋতজাত ও ঋতের অঙ্কুর। ঋতের আদেশ অনুসারেই নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক স্তর থেকে সহজেই ঋতের ধারণা নৈতিক ও যজ্ঞ-সম্পর্কীয় ধারণায় পর্যবসিত হয়।'- (সূত্র: লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৬২৩)

এগুলি যে কোন এক আদিম পর্যায়ের চিন্তাধারা, সন্দেহ নেই। তাই তার সঙ্গে নানা রকম পৌরাণিক কল্পনারও সংমিশ্রণ। কিন্তু এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে ঋত প্রসঙ্গে বৈদিক কবিদের এ-জাতীয় উচ্ছ্বাসের মূলে প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতার পর্যবেক্ষণ এবং হয়তো বা প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতার বোধ-জনিত এক আদিম বিস্ময়। তবে এটা মনে করা বোধকরি সঙ্গত হবে যে, বৈদিক কবিদের কাছে ঋতর পরিকল্পনা কোনো নির্লিপ্ত জ্ঞান-আহরণের পরিচায়ক নয়; প্রাচীন পৌরাণিক কল্পনার সঙ্গে অনিবার্যভাবেই জড়িত হলেও আসলে তা জীবন-সংগ্রামের মূল সমস্যা ও তৎসংশ্লিষ্ট নানাবিধ পার্থিব কামনার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ঋগ্বেদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই তা বোঝা যাবে, যেমন–

প্র সা ক্ষিতিরসুর যা মহি প্রিয় ঋতাবানাবৃতমা ঘোষথো বৃহৎ।
যুবং দিবো বৃহতো দক্ষমাভুবং গাং ন ধূর্যুপ যুঞ্জাথে অপঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১৫১/৪)।
যুবাং যজ্ঞৈঃ প্রথমা গোভিরঞ্জত ঋতাবানা মনসো ন প্রযুক্তিষু।
ভরন্তি বাং মন্মনা সংযতা গিরোহদৃপ্যতা মনসা রেবদাশাথে।। (ঋগ্বেদ-১/১৫১/৮)।
উরো মহা অনিবাধে ববর্ধাপো অগ্নিং যশসঃ সং হি পূর্বীঃ।
ঋতস্য যোনাবশয়দ্দমূনা জামীনামগ্নিরপসি স্বসৃণাম্ ।। (ঋগ্বেদ-৩/১/১১)।
অগ্নি র্নেতা ভগ ইব ক্ষিতীনাং দেব ঋতুপা ঋৃতাবা।
স বৃত্রহাসনয়ো বিশ্ববেদাঃ পর্ষদ্বিশ্বাতি দুরতা গৃণন্তম্ ।। (ঋগ্বেদ-৩/২১/৪)।
যুবোর্ঋৃতং রোদসী স্যমস্ত মহে ষুণং সুবিতায় প্র ভূতম্ ।
ইদং দিবে নমো অগ্নে পৃথিব্যৈ সপর্যামি প্রয়সা যামি রত্নম্ ।। (ঋগ্বেদ-৩/৫৪/৩)।
অর্থাৎ :

হে মিত্রাবরুণ! হে অসুরদ্বয়! তোমরা ঋতযুক্ত, তোমরা উচ্চস্বরে ঋত ঘোষণা কর এবং আমাদের গো ও জলযুক্ত কর। বৃহৎ দ্যুলোকের অগ্রভাগে দেবতাগণের আনন্দোৎপাদনে সমর্থ তোমাদের প্রিয়তর যজ্ঞভূমি উত্তমরূপে সম্পাদিত হয়েছে। (ঋক-১/১৫১/৪)।। হে মিত্রাবরুণ ! তোমরা দুজনে ঋতযুক্ত, এবং তোমরা যজ্ঞকে গো-সমৃদ্ধ করায় অগ্রণী;

যজমানেরা তোমাদের আসক্ত চিত্তে স্তুতি করছে, তোমরা মনে দর্প না করে আমাদের সমৃদ্ধ কার্যে উপস্থিত হও। (ঋক-১/১৫১/৮)।। মহান অগ্নি অসম্বাধ ও বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে বর্ধিত হন, কারণ বহু অন্নবান জল অগ্নিকে সম্যকরূপে বর্ধিত করে এবং ঋত-র জন্মস্থানে তিনি ভগিনী স্থানিয়া স্রোতস্বিনীগণের সখা হন। (ঋক-৩/১/১১)।। ঋত-র পালক এবং ঋতযুক্ত অগ্নি ভগর ন্যায় মনুষ্যগণের নেতা। তিনি বৃহহন্তা, সনাতন, সর্বজ্ঞ ও দ্যুতিমান, তিনি স্তুতিকারীকে সমস্ত দুরিত অতিক্রম করিয়ে পারে নিয়ে যান। (ঋক-৩/২১/৪)।। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদের ঋত যথার্থ হোক যেন আমরা অন্নযুক্ত ধন লাভ করতে পারি। হে অগ্নি! দ্যুলোক ও পৃথিবীকে নমস্কার। তোমরা আমাদের মহৎ যজ্ঞসমাপ্তি কার্যে সমর্থ হও। (ঋক-৩/৫৪/৩)।।

এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো যায়, যেমন–
আমাদের শ্রেষ্ঠ, পুরাতন পিতৃগণ (অঙ্গিরসগণ) যেমন ঋতকে বিস্তৃত করেছিলেন সেইরূপ তাঁরা অরুণবর্ণা গো-সমূহকে অপাবৃত করেছিলেন (ঋক-৪/২/১৬)। পুরাকাল থেকে ঋত-র অনেক জল আছে, ঋত-র ধী-সমূহ বর্জনীয় পাপগুলিকে বিনাশ করে; ঋত-র শ্লোকসমূহ বধিরদের কর্ণ উন্মোচন করেছিল (ঋক-৪/২৩/৮)। ঋত'র ধারণাগুলি দৃঢ়, ঋত-র রূপগুলি মনোহর; স্তোতাগণ ঋত-র নিকট প্রভূত অন্ন কামনা করে এবং ঋত-র দরুন গাভীগুলি সংগৃহীত হয় এবং গাভীগুলি ঋততে প্রবেশ করে (ঋক-৪/২৩/৯)। পুরাকালে ঊষাগণ ঋতজাত সত্য ছিলেন, যাঁদের নিকট গমনমাত্রই ধনদান করতেন এবং উক্থ্য দ্বারা স্তুতি করলে তাঁদের কাছ থেকে অচিরে ধনলাভ ঘটতো (ঋক-৪/৫১/৭)। তোমরা (বরুণ প্রভৃতিরা) ঋত-র সংরক্ষক, ঋত হতে তোমাদের জন্ম এবং তোমরা ঋত-র বর্ধক, অনৃতের প্রবল শত্রু; আমরা এবং অন্যান্য বীরেরা যেন তোমাদের আবাসস্থলে অন্নযুক্ত হয়ে সুখে থাকতে পারি (ঋক-৭/৬৬/১৩)। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এগুলিকে অবশ্যই দার্শনিক চিন্তার নমুনা বলা যাবে না। তবে এগুলি যে সুস্পষ্টভাবেই ঋত-র গরিমা সংক্রান্ত প্রাচীন কবিদের উচ্ছ্বাসমাত্র তা বোধকরি অস্বীকার করা যাবে না। এবং এই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আদিম জীবন-সংগ্রামের সম্পর্ক সুস্পষ্ট। প্রাচীন কবিরা হয়তো মনে করেছিলেন, বিশ্বব্যাপী এই অমোঘ নিয়মানুবর্তিতার প্রভাবেই তাঁদের পক্ষে জল, অন্ন, পশু প্রভৃতি জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি লাভ করা সম্ভব। অতএব এই ঋত-র পরিকল্পনার মধ্যে কোনো অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী চিন্তার বীজ আবিষ্কার করা যুক্তিসঙ্গত হবে না বলে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন।

বৈদিক কবিরা অবশ্যই তাঁদের দেবতাদের গরিমা-বর্ণনায় বহু উচ্ছ্বাস ও অতিশয়োক্তি করেছেন এবং এগুলি থেকে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, তাঁদের ধারণায় প্রাকৃতিক ঘটনাবলী বুঝি এই দেবতাদেরই ইচ্ছাধীন। কিন্তু যে-দেবতা প্রসঙ্গে এ-জাতীয় অতিশয়োক্তি সর্বাধিক– সেই দেবতা বরুণের দৃষ্টান্তে দেখা যায়, বরুণের শক্তি এমনই অপরিসীম যে

উড্ডীয়মান পক্ষিগণ তাঁর বল, তাঁর পরিক্রম, তাঁর ক্রোধ স্পর্শ করতে পারে না; জল ও বায়ুর গতি তাঁর বেগ অতিক্রম করতে পারে না–

নহি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যুং বয়শ্চনামী পতয়ন্ত আপুঃ।
নেমা আপো অনিমিষং চরন্তী র্ন যে বাতস্য প্রমিনন্ত্যভ্-বম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/২৪/৬)।
অর্থাৎ : হে বরুণ! এ উড্ডীয়মান পক্ষিগণ তোমার ন্যায় বল, তোমার ন্যায় পরাক্রম, তোমার ন্যায় ক্রোধ প্রাপ্ত হয় নি; এ অনিমিষ-বিচারী জল ও বায়ুর গতি তোমার বেগ অতিক্রম করে না। (ঋক-১/২৪/৬)।।

বরুণ বলবান, নেতা ও বহু লোককে পরিদর্শন করেন (ঋক-১/২৫/৫); তিনি অন্তরীক্ষগামী পক্ষিদের পথ জানেন, তিনি সমুদ্রে নৌকাসমূহের পথ জানেন (ঋক-১/২৫/৭); তিনি বিস্তীর্ণ, কমনীয় ও মহৎ বায়ুর পথ জানেন (ঋক-১/২৫/৯); জ্ঞানবান লোক তাঁর প্রসাদে সকল অদ্ভুত ঘটনা, যা সম্পাদিত হয়েছে বা হবে, সমস্তই দেখতে পান (ঋক-১/২৫/১১)। জগতের ধারক অদিতির পুত্র (বরুণ) প্রকৃষ্টরূপে জল সৃষ্টি করেছেন; বরুণের মহিমায় নদীসকল প্রবাহিত হয়, তারা বিশ্রাম করে না, নিবৃত্ত হয় না; তারা পক্ষিদের ন্যায় বেগে ভূমিতে গমন করে (ঋক-২/২৮/৪)। এমনকি সকলের চোখের প্রতিটি পলকই বরুণের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (অথর্ববেদ-৪/১৬/২,৫) এবং সে-নিয়ম দেবতাগণও অতিক্রম করতে পারেন না (ঋক-৫/৬৩/৭, ৫/৬৯/৪ ইত্যাদি)। স্বভাবতই বরুণকে বারবার রাজা ও সম্রাট বলে উল্লেখ করা হয়েছে–

ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্তাঃ।
শতং নো রাস্ব শরদো বিচক্ষেহশ্যামায়ংষি সুধিতানি পূর্বাঃ।। (ঋগ্বেদ-২/২৭/১০)।
অর্থাৎ : হে অসুর বরুণ! তুমি, দেবতাই হোক বা মানুষই হোক, তুমি সকলের রাজা। আমাদের শতবর্ষ অবলোকন করতে দাও যেন আমরা প্রাচীনদের উপভুক্ত আয়ু লাভ করতে পারি। (ঋক-২/২৭/১০)।।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি– বরুণকে অসুর সম্বোধন করা– এ-বিষয়ে পরে আলোকপাত করা যাবে। বস্তুত ঋগ্বেদে ইন্দ্রাদি দেবতাদের গৌরব-প্রসঙ্গে বহু পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া গেলেও বরুণের দৃষ্টান্তে তা পাওয়া যায় না– বরং তাঁর গৌরব-বর্ণনায় বৈদিক কবিরা প্রধানতই জাগতিক ও নৈতিক নিয়মের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন। উপরিউক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ওই অসীম শক্তিশালী দেবতাটিরই আজ্ঞাধীন বা ইচ্ছাধীন বলে পরিকল্পিত হয়েছিলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। মনে রাখা দরকার, সমগ্র বৈদিক দেবলোকে ঋত-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক বলতে বরুণেরই, যদিও অবশ্যই বরুণের সঙ্গে প্রায়ই মিত্রও উল্লেখিত। এবং ঋত নামে বিশ্বব্যাপী এক অমোঘ নিয়মানুবর্তিতা, এই ঋত কি বরুণের ইচ্ছাধীন বা আজ্ঞাধীন? মোটেও তা নয়। বস্তুত রাজা বরুণ যে অমন অসীম শক্তিশালী তার কারণ তিনি ঋত-র পালক, ঋত-র ধারক, অনুগামী। (মিত্র ও) বরুণ ঋত-র প্রকাশক, ঋত-র বর্ধক; কিন্তু ঋত-

র সাহায্যেই তাঁদের পক্ষে উক্ত কার্যাবলী সম্ভব–

ঋতেন যাবতাবৃধাবৃতস্য জ্যোতিষস্পতী। তা মিত্রাবরুণা হুবে।। (ঋগ্বেদ-১/২৩/৫)।
ঋৃতেন ঋৃতমপিহিতং ধ্রুবং বাং সূর্যস্য যত্র বিমুচন্ত্যশ্বান্ ।
দশ শতা সহ তস্থুস্তদেবং দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষামপশ্যম্ ।। (ঋগ্বেদ-৫/৬২/১)।
অর্থাৎ :
যাঁরা ঋত দ্বারা ঋতকে বর্ধিত করেন, যাঁরা ঋতের প্রকাশকর্তা, সেই মিত্রাবরুণকে আহ্বান করি। (ঋক-১/২৩/৫)।। হে মিত্র ও বরুণ! আমি ঋতদ্বারা আচ্ছাদিত তোমাদের আবাসভূত ধ্রুব ও ঋত সূর্যমণ্ডল দর্শন করেছি। সে স্থানে অবস্থিত অশ্বগণকে উপাসকগণ স্তোত্রদ্বারা বিমুক্ত করেন। সে স্থানে সহস্র সংখ্যক রশ্মি সমবেত হয়ে অবস্থিতি করে। দেবমূর্তিসমূহের মধ্যে সে এক শ্রেষ্ঠ মূর্তি আমি দেখেছি। (ঋক-৫/৬২/১)।।

এবং শুধু বরুণই নন। অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গেও ঋত-র যে-সম্পর্ক পরিকল্পিত হয়েছে তা থেকেও স্পষ্টই বোঝা যায় যে ঋত তাঁদের আজ্ঞাধীন বা আয়ত্তাধীন নয়, বরং তাঁরাই ঋত-র উপর নানাভাবে নির্ভরশীল। যেমন–

সহস্রধারং বৃষভং পরোবৃধং প্রিয়ং দেবায় জন্মনে।
ঋৃতেন য ঋৃতজাতো বিবাবৃধে রাজা দেব ঋৃতং বৃহৎ।। (ঋগ্বেদ-৯/১০৮/৮)।
অশ্বিনা পরি বামিষঃ পুরূচীরীষুর্গীভি র্যতমানা অমৃধ্রাঃ।
রথো হ বাম্ ঋতজা অদ্রিজূতঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যাতি সদ্যঃ।। (ঋগ্বেদ-৩/৫৮/৮)।
অগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী ষধস্থা তিস্রস্তে জিহ্বা ঋতজাত পূর্বীঃ।
তিস্র উ তে তশ্বো দেববাস্তাভির্নঃ পাহি গিরো অপ্রযুচ্ছন্ ।। (ঋগ্বেদ-৩/২০/২)।
কো বেদ নূনমেষাং যত্রা মদন্তি ধূতয়ঃ। ঋৃতজাতা অরেপসঃ।। (ঋগ্বেদ-৫/৬১/১৪)।
ঋৃতধীতয় আ গত সত্যধর্মাণো অধ্বরং। অগ্নেঃ পিবত জিহ্বয়া।। (ঋগ্বেদ-৫/৫১/২)।
অর্থাৎ :
যিনি (সোম) রসসেচনকারী এবং সহস্রধারায় ক্ষরিত হয়ে থাকেন, যিনি জলের সহযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দেবতামাত্রের প্রীতিপ্রদ হন, সেই রাজা ও দেবতা (সোম) ঋত হতে জাত, তিনি ঋতের দ্বারা ঋতকে বৃহৎরূপে বর্ধিত করেন। (ঋক-৯/১০৮/৮)।। হে অশ্বিদ্বয়! প্রচুর হবি তোমাদের নিকট গমন করছে, দোষশূন্য কর্মকুশল স্তোতৃগণ স্তুতিদ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করছে। তোমরা ঋত হতে জাত, তোমাদের জলপ্রদ-রথ সদ্য দ্যাবাপৃথিবীর অভিমুখে যাচ্ছে। (ঋক-৩/৫৮/৮)।। হে অগ্নি! তোমার অন্ন তিন প্রকার, তোমার স্থান তিন প্রকার, তোমার দেবতাদের উদর পূরক তিনটি জিহ্বা, পূর্বকালে তুমি ঋত হতে জাত হয়েছিলে। তোমার তিন প্রকার শরীর দেবতাগণের অভিলষিত; তুমি প্রমাদরহিত হয়ে সে তিন শরীর দ্বারা আমাদের স্তুতি পালন কর। (ঋক-৩/২০/২)।। তাঁদের (মরুৎগণের) বাসস্থান কেই বা জানে? সেখানে শত্রুদের ত্রাসকারীগণ আনন্দে থাকেন, তাঁরা ঋত হতে জাত বলেই নিষ্পাপ। (ঋক-৫/৬১/১৪)।। হে ঋতকর্মযুক্ত সত্যধর্মা বিশ্বদেবগণ! তোমরা যজ্ঞে এসেছো, অগ্নির জিহ্বাদ্বারা তোমরা পান কর। (ঋক-৫/৫১/২)।।

এ-জাতীয় উদ্ধৃতিযোগ্য আরো বহু দৃষ্টান্ত আছে; তবে এগুলি থেকেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ঋত– বা বিশ্বব্যাপী ওই অমোঘ নিয়মানুবর্তিতা– দেবতাদের আজ্ঞাধীন বা আয়ত্তাধীন নয়। বরং দেবতারাই ঋত-র উপর নির্ভরশীল এবং ঋত-র অনুগামী। কিন্তু এবার যে মৌলিক প্রশ্নটির অবতারণা হয় তা হলো, এই ঋত-র পরিকল্পনার উৎস কী? এ-প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদ বলেন–

'এমনকি ভাববাদী ব্যাখ্যাকারদের পক্ষেও এ-কথা অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি যে প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতার পর্যবেক্ষণ থেকে বৈদিক কবিরা ঋত-র পরিকল্পনায় উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু শুধু এটুকু বললেই সমস্যাটির সমাধান হয় না। কেননা আমরা আগেই দেখেছি, ঋত-র অর্থ শুধু প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতাই নয়; কোনো এক অমোঘ নৈতিক নিয়মানুবর্তিতাও। এই নৈতিক নিয়মানুবর্তিতার বোধকে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

ঋত-র এই নৈতিক তাৎপর্য সংক্রান্ত বহু নজিরের প্রয়োজন নেই। আধুনিক বিদ্বানেরা প্রায় সকলেই তার ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সাধারণত তাঁদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঋত-র পরিকল্পনায় ওই প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতামূলক উপাদানটিই আদিম; তার থেকেই কবিরা ক্রমশ নৈতিক নিয়মানুবর্তিতার চেতনাতেও উপনীত হয়েছিলেন।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৮৯-৯০)

তবে এ-জাতীয় সিদ্ধান্তের পক্ষে বৈদিক সাহিত্যের কোনো অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা কারুর পক্ষেই সম্ভব হয়নি। হয়তো বৈদিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই এমন যে এ-জাতীয় কোনো সুস্পষ্ট সাক্ষ্য সংগ্রহের সুযোগ নেই। অতএব অনুমান হয়, আধুনিক বিদ্বানেরা একটি সাধারণ প্রকল্পের উপর নির্ভর করেই এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন। এই সাধারণ প্রকল্পটি কী? তা হলো– বিচার-বিশ্লেষণের দিক থেকে নৈতিক নিয়মের চেতনা জাগতিক নিয়মের চেতনার পরবর্তী হতে বাধ্য; অতএব ঋত-র পরিকল্পনাতেও উভয় উপাদানের মধ্যে নৈতিক নিয়মের চেতনাই পরবর্তী।

ঋগ্বেদে আদিম যৌথজীবনের নানা স্মারক থেকে যেহেতু অনুমান হয় বৈদিক মানুষেরাও প্রাচীন পর্যায়ে এই যৌথ-জীবন যাপন করতেন সেই হেতু তাঁদের চেতনাতেও ওই আদিম যৌথ-জীবনের এক আদিম অলঙ্ঘনীয় স্বতঃস্ফূর্ত ও অমোঘ নৈতিক বোধ– তথা ঋত-র ধারণা– অনুমিত হতে পারে। তা নাহয় মানা গেলো। তাহলে প্রশ্ন হলো, ঋত-র মূলে যদি আদিম যৌথ-জীবনের সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত নীতিবোধই অনুমিত হয় তাহলে সেই যৌথ-জীবন ধূলিসাৎ হবার ফলে বৈদিক কবিদের চেতনা থেকেও ঋত-র কথা ক্রমশই বিলীন হওয়াই স্বাভাবিক। ঋগ্বেদের অন্তর্গত সাক্ষ্য কি তার স্বীকৃতি দেয়?

এর উত্তরে দেবীপ্রসাদের একটি নাতিদীর্ঘ মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে–

'বৈদিক সাহিত্যের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হলো, বৈদিক কবিদের চেতনা থেকে ঋত-র পরিকল্পনা

ক্রমশ মুছে যায়। ঋত-র দেবতা বরুণের সুপ্রাচীন গৌরবও। কেননা, আগেই দেখেছি, বৈদিক দেবতাদের মধ্যে বরুণের সঙ্গেই ঋত-র সম্পর্ক মুখ্য বা প্রধান। ঋত-র এই ক্রম-বিলুপ্তি এবং তারই সঙ্গে বরুণের মহিমা হ্রাস অবশ্যই আকস্মিক বা অকারণ ঘটনা হতে পারে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই বৈদিক চিন্তা-চেতনার এই উল্লেখযোগ্য বিবর্তনটিকে প্রায় উপেক্ষাই করেছেন। কীথ্-ই বোধহয় একমাত্র লেখক যিনি এই ঘটনার একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াস করেছেন।

ঋত-র ধারণা যে বাস্তবিকই কত প্রাচীন তা দেখাবার জন্য কীথ্ ঋগ্বেদের সঙ্গে প্রাচীন ইরাণীয় সাহিত্য আবেস্তার তুলনা করেছেন : আবেস্তা-তেও বিশ্বব্যাপী অমোঘ নিয়মানুবর্তিতার পরিকল্পনা পাওয়া যায় এবং সেই পরিকল্পনা-বাচক শব্দটির সঙ্গে বৈদিক শব্দ-ব্যবহারের নিকট-সাদৃশ্য থেকে অবশ্যই অনুমান হয় সুদূর ইন্দো-ইরাণীয় যুগেই পরিকল্পনাটির সূত্রপাত :

In the physical world there rules a regular order, `rita', which is observed respectedly, and which is clearly an inheritance from the Indo-Iranian period, since the term `asa'(urta) is found in the `Avesta', and has there the same triple sense as in Vedic India, the physical order of the universe, the due order of the sacrifice, and the moral law in the world......the identity of the Vedic and Avestan expressions is proved beyond possibility of doubt by the expression `spring of rita', whick is verbally identical in the `Avesta' and the `Rigveda'.

শুধু ঋত-র পরিকল্পনাই নয়। কীথ্ আরও বলেছেন, "বৈদিক বরুণ এবং আবেস্তার অহুর মাস্দা– এই দুটি দেবপরিকল্পনার মধ্যেও পার্থক্য করা যায় না; ঋগ্বেদেও বরুণকে অসুর বলা হয়েছে, যদিও পরবর্তী সংহিতায় অসুর শব্দটি দেবতাদের শত্রুবাচক এবং নিন্দাসূচক; অহুরের মতোই বরুণও ঋত-র পালক এবং অহুরের সঙ্গে মিথ্রর যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বরুণের সঙ্গেও সেই রকম মিত্রর সম্পর্ক। কিন্তু এ-জাতীয় সাদৃশ্যের কথা ছাড়াও উভয় দেবতারই অমন নৈতিক গরিমার একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে উভয়েই এক আদি-পরিকল্পনার পরিণাম। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে বরুণের ইতিহাস বলতে এই নৈতিক গরিমার ক্রম-বিলোপ। এ-ঘটনর একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে দেবতা হিসেবে তাঁর পরিকল্পনা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল এবং এখানের প্রতিকূল পরিবেশে তাঁর নৈতিক বৈশিষ্ট্য ক্রমশই বিলীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জরথুস্ত্রীয় বিশ্বাসে অহুরই ক্রমশ মহান এবং অদ্বিতীয় দেবতারূপে পরিণত হন; এ থেকেই বোঝা যায় ইরাণীয় জনসাধারণের মধ্যে পরিকল্পনাটি আগে থেকেই প্রচলিত ছিল এবং তাই-ই সংস্কৃত রূপ লাভ করে।"

অতএব কীথ্ সংক্ষেপে মন্তব্য করেন, ..."ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে বরুণের নৈতিক গরিমার মতোই ঋত-র ধারণারও কোন ভবিষ্যৎ নেই; এ থেকে অনিবার্যভাবেই বোঝা যায় ধারণাটি ভারতবর্ষীয় সৃষ্টি নয়, তার বদলে এটি একটি উত্তরাধিকার মাত্র এবং নতুন পরিস্থিতিতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই ধারণাটি টিকে থাকতে পারে নি।"

কিন্তু ঋত এবং বরুণের এই ইন্দো-ইরাণীয় উৎস স্বীকার করলেও প্রশ্ন থাকে, ভারতবর্ষে– অর্থাৎ ওই তথাকথিত নতুন পরিস্থিতিতে– দেবতাটির নৈতিক গরিমা এবং ঋত-র ধারণা টিকতে পারল না কেন? ভারতবর্ষীয় পরিবেশে এমন কী বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে যা অনিবার্যভাবেই নৈতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী? বৈদিক মানুষদের চিন্তা-চেতনায় এমন প্রকাণ্ড পরিবর্তনকে দেশের জল-হাওয়া ভৌগোলিক লক্ষণের দিক থেকে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা নেহাত স্থূল বস্তুবাদের পরিচায়ক হবে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, সাধারণভাবে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার প্রতি তীব্র বিমুখতা সত্ত্বেও কীথ্ এ-জাতীয় একটি ব্যাখ্যাই উদ্ভাবন করেছেন। সংক্ষেপে তাঁর মত : ইরাণের জীবন-সংগ্রাম সমস্যা সুকঠিন; কৃষিকাজ অবিরাম শ্রমের উপর নির্ভরশীল, তাছাড়া সর্বদাই ভ্রাম্যমান মানব-দলের আক্রমণ-সম্ভাবনাও। কিন্তু ভারতবর্ষের "জল-হাওয়া, জীবনধারণ এবং জাতি-সংমিশ্রণমূলক" ভিন্ন পরিস্থিতিতে জীবনকে ভাল-মন্দের সংগ্রাম হিসেবে না দেখে চিন্তাধারা কর্ম-বিমুখ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানাভিলাষী হয়েছে এবং অগ্রসর হয়েছে অদ্বৈত ব্রহ্মের পরিকল্পনায় উপনীত হওয়া– ভাল-মন্দ, চেতন-অচেতন সবই তার অন্তর্ভুক্ত। এই বিকাশেরই সমান্তরালভাবে ম্লান হয়েছে বরুণের শক্তি; যোদ্ধা ও জনসাধারণের দেবতা ইন্দ্রই শক্তিশালী ও জনপ্রিয় দেবতা হয়ে থেকেছেন। এবং একইভাবে ব্রহ্মন্ পরিকল্পনার সামনে মুছে গিয়েছে ঋত-র চেতন।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৯২-৩)

এ বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ নেই যে বৈদিক চিন্তাবিবর্তনের পরিণাম হিসেবে দেখা যায় নীতি ও ন্যায়ের প্রতীক প্রাচীন দেবতা বরুণের পরিবর্তে যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের দেবতা ইন্দ্রের গরিমা প্রবল হয়ে উঠেছে, ক্রমশই লুপ্ত হয়েছে ঋত-র চেতনা, ক্রমশই নিন্দিত হয়েছে কর্ম এবং প্রশংসিত হয়েছে জ্ঞান এবং এ-সমস্তরই চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে শেষ পর্যন্ত বৈদিক চিন্তাশীলেরা এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের পরিকল্পনায় উপনীত হয়েছেন। ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি পশুপালন-মূলক অর্থনীতির ক্রম-বিকাশের ফলে সমষ্টিস্বার্থের বদলে ব্যাষ্টিস্বার্থের প্রবণতা বেড়ে কীভাবে বৈদিক মানুষদের মধ্যে যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের তাগিদ ক্রমশই বেড়ে যায় এবং তারই চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে অবসান ঘটে আদিম যৌথ-জীবনের। এই নতুন পরিস্থিতির মধ্যেই ঋত-র বিলোপ সংক্রান্ত সমস্যার মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আর নতুন ঋত-হীন পরিস্থিতির শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্রের অনেক কীর্তি ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। অন্য কীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য–

কস্তে মাতরং বিধবামচক্রচ্ছয়ুং কস্তামজিঘাং সচ্চরন্তম্ ।
কস্তে দেবো অধি মার্ডীক আসীদ্যৎপ্রাক্ষিণাঃ পিতরং পাদগৃহ্য।। (ঋগ্বেদ-৪/১৮/১২)।
অর্থাৎ : হে ইন্দ্র! তুমি ভিন্ন কে আপন মাতাকে বিধবা করেছে? তুমি যখন শয়ান থাকো অথবা সঞ্চরণ করতে থাকো, তখন কে তোমাকে বধ করতে ইচ্ছা করেছে? কোন্ দেবতা সুখদান বিষয়ে তোমার থেকে বড়? যেহেতু তুমি তোমার পিতার পদদ্বয় গ্রহণ করে পিতাকে বধ করেছো।

ইন্দ্র দ্বারা তাঁর পিতার হত্যা সম্বন্ধে টীকাকার সায়ণ কোন বিবরণ দেন নি, তবে তৈত্তিরীয়

সংহিতার (তৈত্তিরীয়-৬/১/৩/৬) বিবরণ থেকে অনুমান হয়, ইন্দ্র যে স্বীয় পিতাকে এইভাবে আছাড় মেরে হত্যা করেন তার কারণ সোমরস লাভের আকাঙ্ক্ষাই। ঊষাকে ধর্ষণের বিষয় আগে বলা হয়েছে। এমনকি ঋষি-পত্নী অহল্যাকে প্রতারণা করে ব্যভিচারে লিপ্ত হতেও দেবতাটির কোন দ্বিধা নেই। বিভিন্ন পুরাণ-শাস্ত্রে এসব ব্যাপারে দেবরাজ ইন্দ্রের যে প্রচুর নামডাক রয়েছে সে-ব্যাপারও অবিদিত নয়।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, বৈদিক যুগের কোনো কোনো কবি নতুন ঋতহীন পরিস্থিতিকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাঁরা নবজন্মের জন্য আকুতি প্রকাশ করেছেন। এ-জাতীয় জনৈক কবির নাম কুৎস। বৈদিক সাহিত্যে তাঁর সম্বন্ধে নানা রকম পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া যায় এবং ঋগ্বেদের একটি ঋক থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি ইন্দ্রকে বেঁধে রেখেছিলেন–

স্ববৃজং হি ত্বামহমিন্দ্র শুশ্রবানানুদং বৃষভ রধ্রচোদনম্ ।
প্র মুঞ্চস্ব পরি কুৎসাদিহা গহি কিমু ত্বাবান্মুষ্কয়োর্বদ্ধ আসতে।। (ঋগ্বেদ-১০/৩৮/৫)।
অর্থাৎ : হে ইন্দ্র! তুমিই তোমার ভক্তদের উৎসাহযুক্ত কর, তোমাকে আবার কে উৎসাহিত করবে? আমরা জানি, তুমি আপনিই আপনার বন্ধন ছেদন করতে সমর্থ। অতএব কুৎসের হস্ত হতে আত্মমোচন করো এবং এ স্থানে এসো। তোমার মতো ব্যক্তি কেন মুষ্কদ্বয়ের বন্ধন সহ্য করছে।

এই ঘটনাটির থেকেই অনুমান হয়, নতুন পরিস্থিতির ওই শ্রেষ্ঠ দেবতাটির বিরুদ্ধে– তার মানে নতুন পরিস্থিতির বিরুদ্ধেও– তাঁর বিক্ষোভ ছিলো। সে বিক্ষোভেরই সুস্পষ্ট পরিচয় ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে সংকলিত তাঁরই (কুৎসের) রচনায়–

যজ্ঞং পৃচ্ছাম্যবমং স তদ্দূতো বি বোচতি।
ক্ক ঋতং পূর্ব্যং গতং কস্তদ্বিভর্তি নূতনো বিত্তং মে অস্য রোদসী।। (ঋগ্বেদ-১/১০৫/৪)।
অমী যে দেবাঃ স্থন ত্রিষ্বা রোচনে দিবঃ।
কদ্ব ঋতং কদনৃতং ক্ক প্রত্না ব আহুতির্বিত্তং মে অস্য রোদসী।। (ঋগ্বেদ-১/১০৫/৫)।
কদ্ব ঋতস্য ধর্ণসি কদ্বরুণস্য চক্ষণম্ ।
কদর্যম্ণো মহস্পথাতি ক্রামেম দূঢ্যো বিত্তং মে অস্য রোদসী।। (ঋগ্বেদ-১/১০৫/৬)।
ত্রিতঃ কূপেহবহিতো দেবান্ হবত ঊতয়ে।
তচ্ছুশ্রাব বৃহস্পতিঃ কৃণ্বন্নংহূরণাদুরূ বিত্তং মে অস্য রোদসী।। (ঋগ্বেদ-১/১০৫/১৭)।
অর্থাৎ :
সর্বদেবের আদিভূত সেই যজ্ঞকে আমি প্রশ্ন করছি। তার দূতেরা সঠিকভাবে কথা বলুক। অতীতের সেই ঋত কোথায় গমন করেছে? কে সেই 'নূতন' যিনি তাকে ধারণ করেন? আমার এই কথা অবগত হও, হে দ্যাবাপৃথিবী। (ঋক-১/১০৫/৪)।। ত্রিলোকে অবস্থানকারী দেবগণ, তোমাদের ঋত কোথায় অবস্থান করে? অনৃতই বা কেন? অতীতের মতো তোমাদের আহুতিই বা কোথায়? আমার এই কথা অবগত হও, হে দ্যাবাপৃথিবী।

(ঋক-১/১০৫/৫)।। দেবগণ, কোথায় গেলো ঋত-র সেই ধারণ? কোথায় গেলো বরুণের রাগ? কোথায় গেলো অর্যমার ইচ্ছাপূরক কর্মের পথ? অতএব আমরা দুঃখে পতিত হয়েছি। আমার এই কথা অবগত হও, হে দ্যাবাপৃথিবী। (ঋক-১/১০৫/৬)।। দুঃখ-নিবারক অন্ন-কারী বরুণকে আমি বলছি– আমি দৃঢ় হৃদয়ে বলছি– নূতন করে ঋত-র জন্ম হোক। আমার এই কথা অবগত হও, হে দ্যাবাপৃথিবী। (ঋক-১/১০৫/১৭)।।

ঋত-কে ফিরে পাবার এই আকুতি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, কেননা যৌথ-জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত নিয়মানুবর্তিতার চেতনাতেই বৈদিক ঋত-র উৎস।

৩.৬ : যজ্ঞ

ঋগ্বেদে অবশ্যই যজ্ঞ, যজমান, ঋত্বিক প্রভৃতির প্রচুর উল্লেখ রয়েছে; এমন কি এতে উত্তর-সাহিত্যে– যজুর্বেদ এবং ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে– বর্ণিত কোনো কোনো বিশিষ্ট যজ্ঞের পরিচয়ও পাওয়া যায়। যেমন, অধ্যাপক কীথ্ বলছেন– ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬২ ও ১৬৩ সূক্ত অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। মূলত ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের উল্লিখিত সূক্তগুলিরই পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় তৈত্তিরীয়-সংহিতা বা কৃষ্ণযজুর্বেদের চতুর্থ কাণ্ডের ষষ্ঠ প্রপাঠকের মন্ত্রগুলিতে, যেগুলি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে পঠিত হয়। কিন্তু উত্তর-সাহিত্যে অর্থাৎ যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে বৈদিক যজ্ঞকে যে-জটিল ও পল্লবিতরূপে দেখা যায় ঋগ্বেদে নিশ্চয়ই তার পরিচয় নেই। এর থেকে অনুমান করা হয় যে, ঋগ্বেদের যুগে যজ্ঞ পরবর্তীকালের মতো ছিলো না। তার মানে, বিদ্বান গবেষকদের দৃষ্টিতে, যজ্ঞের আদি-রূপ ও উত্তর-রূপ এক নয়। অর্থাৎ, পরবর্তী কালে যজ্ঞ বলতে আমরা যা বুঝতে অভ্যস্ত হয়েছি আদিতে যজ্ঞ বলতে ঠিক তা বোঝাতো না।

তাহলে আমাদের অভ্যস্ততায় পরবর্তীকালের যজ্ঞ কী রকম? তা হলো– যজমানের কোনো কামনা সফল করবার উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ, কিন্তু এই যজ্ঞকর্ম সম্পাদনের ভার যজমানের উপর নয়। তার জন্য যজমান ঋত্বিক, হোতা, অধর্যু প্রভৃতি পুরোহিত নিযুক্ত করবেন, তাঁর স্বার্থে যজ্ঞকর্ম করে দেবার জন্য পুরোহিতদের উপযুক্ত দক্ষিণা দেবেন এবং অবশ্যই যজ্ঞকর্মের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনিই বহন করবেন। বলা বাহুল্য, উপনিষদ্ প্রভৃতিতে যজমানের এই চিত্রই পাওয়া যায়। যেমন, (ইতঃপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে) ছান্দোগ্য-উপনিষদের একটি উপাখ্যান এরকম (ছান্দোগ্য-১/১০/১–১/১১/৩)–

‘মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা সহ জায়য়োষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদাণক উবাস। (ছান্দোগ্য-১/১০/১)।।...... স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ যদ্বতান্নস্য লভেমহি লভেমহি ধনমাত্রাং রাজাহসৌ যক্ষ্যতে স মা সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈর্বৃণীতেতি। (ছান্দোগ্য-১/১০/৬)।।...... ভগবাংস্ত্বেব মে সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈরিতি তথেত্যথ তর্হ্যতে এব সমতিসৃষ্টাঃ স্তুবতাং যাবত্ত্বেভ্যো ধনং দদ্যাস্তাবন্মম দদ্যা ইতি তথেতি হ যজমান উবাচ’। (ছান্দোগ্য-১/১১/৩)।।

আখ্যানটির অংশ-বিশেষের সংক্ষিপ্ত তর্জমা :

‘একবার কুরুদেশ যখন শিলাবৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হয়েছিলো তখন উষস্তি চাক্রায়ণ (জনৈক পুরোহিত) ‘ইভ্য’-গ্রামে আপন পত্নীকে নিয়ে অত্যন্ত দুর্দশায় পড়েছিলেন।’ ভিক্ষালব্ধ উচ্ছিষ্ট মাষকলাই খেয়ে তিনি রাত কাটালেন; পরদিন সকালে স্ত্রীকে বললেন, ‘হায়, যদি কিঞ্চিৎ অন্ন পেতাম তাহলে কিছু অর্থলাভ হতো। ঐ রাজা যজ্ঞ করবেন; ঋত্বিকগণের সমুদয় কার্য-সম্পাদনের জন্য তিনি আমাকে বরণ করতেন।’ স্ত্রী পূর্ব-দিবসের ভিক্ষালব্ধ মাষকলাই সঞ্চয় করে রেখেছিলেন, স্বামীকে খেতে দিলেন। তাই খেয়ে তিনি প্রারব্ধ যজ্ঞে গমন করলেন এবং ইতোমধ্যে রাজা যে পুরোহিতদের যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত করেছিলেন উষস্তি তাঁদের প্রত্যেককে জ্ঞান-দ্বন্দ্বে আহ্বান করলেন। অনন্তর যজমান তাঁকে বললেন, ‘আমি আপনাকে জানতে ইচ্ছা করি।’ উষস্তি বললেন, ‘আমি উষস্তি চাক্রায়ণ।’ যজমান বললেন, ‘এই সমুদয় ঋত্বিক-কর্মের

জন্য আমি সর্বত্র আপনার অন্বেষণ করেছিলাম; আপনার সন্ধান পাই নি বলেই অন্য সমুদয় লোককে বরণ করেছিলাম। আপনিই আমার সমস্ত ঋত্বিক-কার্যের ভার গ্রহণ করুন। উষস্তি বললেন, 'তাই হোক। এখন এরাই আমার অনুমতিতে স্তুতিগান করুক। আপনি এদের যে-পরিমাণ অর্থ দেবেন আমাকেও সেই পরিমাণ অর্থ দেবেন।' যজমান বললেন, 'তাই দেব।'

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, যজমান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে এই চিত্রের সঙ্গতি নেই। যজ + শানচ্ = যজমান। এখানে আত্মনেপদ (শানচ্) ব্যবহৃত হয়েছে। এই আত্মনেপদ (শানচ্) ব্যবহারের ইঙ্গিত কী? ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে–
'স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে'। (পাণিনি-সূত্র-১/৩/৭২)
অর্থাৎ : ক্রিয়ার ফল যখন কর্তার অভিপ্রায় সিদ্ধ করে তখন ধাতুর আত্মনেপদ হয় এবং অতএব আত্মনেপদ (শানচ্) ব্যবহৃত হয়।

অতএব, যজমান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো, যিনি নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যজ্ঞকর্ম করেন। তাহলে যজমান শব্দটিকে আমরা বাস্তবভাবে যে অর্থে নিযুক্ত হতে দেখি তার সঙ্গে এর তফাত কোথায়? সেখানেও অর্থাৎ উত্তরকালেও যজমানই যজ্ঞ-ফলভোগী; কিন্তু তিনি যজ্ঞ-সম্পাদনায় অংশগ্রহণ করছেন না– তার পরিবর্তে অর্থব্যয় করে পেশাদার যজ্ঞ-সম্পাদনকারী পুরোহিত নিযুক্ত করছেন। স্বভাবতই অনুমান হয়, যজমান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থটির মধ্যে সেই সুপ্রাচীন কালের স্মৃতি টিকে থেকেছে, যখন যজমান অর্থব্যয় করে পুরোহিত নিয়োগের পরিবর্তে নিজেই যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করতেন। কিন্তু এ-অনুমানের সমর্থনে বৈদিক সাহিত্যের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য পাওয়া যায় কি?

ঋগ্বেদের বহু দৃষ্টান্তে দেখা যায়, সোমসবন, হবিঃ-প্রদান প্রভৃতি যজ্ঞকর্মের নানা সুবিখ্যাত অঙ্গ যজমানের উপরই ন্যস্ত হয়েছে। যজমান হবিসমূহের দ্বারা (আয়ু) শাসন করেন (ঋক-১/২৪/১১); কর্মনির্বাহক নররূপ যজমানগণ কর্তৃক প্রদত্ত হবিযুক্ত অন্ন শোভন অন্নের ইচ্ছায় ইন্দ্র ভক্ষণ করেন (ঋক-১/১৩৮/৪); হে ইন্দ্র, তুমি সোমসবনকারী যজমানকে তোমার প্রভূত ধন সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে থাকো (ঋক-১/৮১/২); ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন–
ঈলে চ ত্বা যজমানো হবির্ভিরীলে সখিত্বং সুমতিং নিকামঃ।
দেবৈরবো মিমীহি সংজরিত্রে রক্ষা চ নো দম্যেভিরনীকৈঃ।। (ঋগ্বেদ-৩/১/১৫)।
অধি দ্বয়োরদধা উক্থ্যং বচো যতস্রুচা মিথুনা যা সপর্যতঃ।
অসংযত্তো ব্রতে তে ক্ষেতি পুষ্যতি ভদ্রা শক্তি র্যজমানায় সুন্বতে।। (ঋগ্বেদ-১/৮৩/৩)।
তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ।
অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ।। (ঋগ্বেদ-১/২৪/১১)।
অর্থাৎ :
(হে অগ্নি!) যজমান আমরা হব্যদ্বারা তোমার স্তুতি করছি, সম্যক্ বুদ্ধি লাভ করবার অভিলাষে তোমার সাথে বন্ধুত্ব প্রার্থনা করছি। তুমি দেবতাগণের সাথে স্তুতিকারী আমাদের পশু প্রভৃতি

রক্ষা কর ও দুর্দমনীয় তেজদ্বারা আমাদেরর রক্ষা কর। (ঋক-৩/১/১৫)।। যে হব্য ও ধান্য যজ্ঞপাত্রে তোমাকে অর্পিত হয়েছে, হে ইন্দ্র! তুমি তাতে মন্ত্রবচন সংযুক্ত করেছ। যজমান যুদ্ধে গমন না করে তোমার কার্যে রত থাকে এবং পুষ্টিলাভ করে, কেননা সোমাভিষবদাতা উৎকৃষ্ট বল লাভ করে। (ঋক-১/৮৩/৩)।। আমি স্তোত্র দ্বারা স্তব করে তোমার নিকট সে পরমায়ু যাচঞা করি, যজমান হব্যদ্বারা তাই প্রার্থনা করে। হে বরুণ! তুমি এ বিষয়ে অনাদর না করে মনোযোগ কর, তুমি বহুলোকের স্তুতিভাজন, আমার আয়ু নিও না।
(ঋক-১/২৪/১১)।।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে ঋগ্বেদের সর্বত্রই যজমান এইভাবে যজ্ঞকর্মে অংশগ্রহণকারী বলে বর্ণিত। নানান দৃষ্টান্তে যজমান এবং যজ্ঞ-সম্পাদনকারী পুরোহিতদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের সূচনাও দেখা যায়। যেমন–
বি জানীহ্যার্যানো চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্ ।
শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন।। (ঋগ্বেদ-১/৫১/৮)।
শংসাবাধ্বর্যো প্রতি মে গৃণীহীন্দ্রায় বাহঃ কৃণবাব জুষ্টম্ ।
এদং বর্হি য জমানস্য সীদাথা চ ভূদুক্থমিন্দ্রায় শস্তম্ ।। (ঋগ্বেদ-৩/৫৩/৩)।
সুতম্ভরো যজমানস্য সৎপতির্বিশ্বাসামুধঃ স ধিয়ামুদঞ্চনঃ।
ভরদ্ধেনূ রসবচ্ছিশ্রিয়ে পয়োহনুব্রুবাণো অধ্যেতি ন স্বপন্ ।। (ঋগ্বেদ-৫/৪৪/১৩)।
অর্থাৎ :
হে ইন্দ্র! কারা আর্য এবং কারা দস্যু তা অবগত হও। কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদের শাসন করে বশীভূত কর। তুমি শক্তিমান, অতএব যজ্ঞ-সম্পাদকদের সহায় হও। আমি তোমার হর্ষজনক যজ্ঞে তোমার সেই কর্ম প্রশংসা করতে ইচ্ছা করি। (ঋক-১/৫১/৮)।। হে অধ্বর্যু ! আমরা দুজনে স্তুতি করবো, তুমি আমাকে উত্তর দান কর। তুমি যজমানের কুশের উপর উপবেশন কর। ইন্দ্রের উদ্দেশে উক্থ প্রশস্ত হোক। (ঋক-৩/৫৩/৩)।। সন্তম্ভর যজ্ঞের হোতা হয়ে সমস্ত যজ্ঞকার্য উর্ধ্বে উন্নীত করছেন। ধেনু সুরস দুগ্ধ প্রদান করছে, ঐ দুগ্ধ বিতরিত হচ্ছে, এ সমস্ত ক্রমানুসারে ঘোষণা করে অবৎসার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক অধ্যয়ন করছেন। (ঋক-৫/৪৪/১৩)।।

এ-জাতীয় আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো যায়। কিন্তু আকর্ষণীয় বিষয় হলো, ঋগ্বেদের এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে জনৈক কবি বলছেন, অসিক্লী-তীরে যজমানই যেন হোতা–
অসিক্ল্যাং যজমানো ন হোতা।। (ঋগ্বেদ-৪/১৭/১৫)।
অর্থাৎ : অসিক্লী-তীরে যজমানই যেন হোতা।

এখানে 'ন' বা যেন শব্দের ব্যবহার চিত্তাকর্ষক। এতে বেদবিদ গবেষকরা অনুমান করেন, বৈদিক মানুষদের মধ্যেও সর্বত্রই যজমান এবং পুরোহিতের পার্থক্য একই সঙ্গে সমান প্রকট হয়নি। কবির নিজের অভিজ্ঞতায় যজমান এবং হোতার মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট হলেও অসিক্লী

(বা চেনাব্ নদীর) তীরবর্তীদের মধ্যে তখনো প্রাচীন প্রথাটি টিকে থেকেছে। যজমান এবং পুরোহিতের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য ওঠার ফলে যজ্ঞকর্মের বাস্তব দায়িত্বমুক্ত যজমানটিকে শেষ পর্যন্ত শুধু নিশ্চেষ্টই নয়, সম্বিৎহীন বা চেতনাহীন ব্যক্তিমাত্রে পরিণত হতে দেখা যায়। ঋগ্বেদে বলা হচ্ছে–

যমৃত্বিজো বহুধা কল্পয়ন্তঃ সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি।
যো অনূচানো ব্রাহ্মণো যুক্ত আসীৎকা স্বিত্তত্র যজমানস্য সম্বিৎ।। (ঋগ্বেদ-৮/৫৮/১)।
অর্থাৎ :
যাঁকে বহুরূপে কল্পনা করে ঋত্বিকগণ এই যজ্ঞকে সচেতনভাবে বহন করে থাকেন বা সম্পাদন করেন এবং যিনি বেদবিদ্যাপারঙ্গম ব্রাহ্মণ দ্বারা যুক্ত– সেখানে আর যজমানের জ্ঞান বা চেতনার কী প্রয়োজন? (ঋক-৮/৫৮/১)।।

এই ঋকটি ঋগ্বেদের বালখিল্য সূক্তের অন্তর্গত। এ-প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন,– 'অষ্টম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তকে বালখিল্য আখ্যা দেওয়া হয়; এগুলি এমনই অর্বাচীন যে সায়ণাচার্যও ঋগ্বেদ-ভাষ্যে এগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু অমন অর্বাচীন বলেই এই ঋকটির সাক্ষ্য আমাদের বর্তমান যুক্তির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ : এখানে যজমানকে যে-ভাবে যজ্ঞ-ব্যাপারে অজ্ঞ ও সম্বিতহীন বলে কল্পনা করা হয়েছে তার সঙ্গে পূর্বোক্ত ঋকগুলির তুলনা করলে বোঝা যায় যে, যজমানের ভূমিকায় ইতিমধ্যে অনেক তফাত হয়ে গিয়েছে।'- (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৬০০)
এবং আমাদেরকে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, উত্তরকালের সাহিত্যে আমরা বৈদিক যজ্ঞের যে-রূপ দেখছি, তা-ই যজ্ঞের আদিরূপ নয় এবং এই রূপ-পরিবর্তন বলতে শুধুমাত্র এটুকু বোঝায় না যে, কালক্রমে যজ্ঞ অত্যন্ত জটিল ও পল্লবিত হয়েছিলো; তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, পরবর্তীকালে যজ্ঞের উদ্দেশ্য এবং চরিত্রও মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। যজমান শব্দটির উপরিউল্লিখিত বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও সাক্ষ্য থেকে প্রাপ্ত– যজমান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং বাস্তব অর্থের মধ্যে যে-বিরোধ– তার ইঙ্গিত থেকে এটা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে, অধ্যাত্মবাদের আবির্ভাব এই মৌলিক পরিবর্তনেরই পরিণাম।

.
এই যে বৈদিক ইতিহাসে কালক্রমে যজমানের ভূমিকায় ব্যাপক পরিবর্তন, সেই পরিবর্তনের আর একটি দিক বিচার করা যেতে পারে। যেমন, ঋগ্বেদের নানা জায়গায় শুধু যজমান শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত তাই নয়, এই যজমানগণ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

যজিষ্ঠং ত্বা যজমানা হুবেম জ্যেষ্ঠমঙ্গিরসাং
বিপ্র মন্মাভির্বিপ্রেভিঃ শুক্র মন্মভিঃ।
পরিজমানমিব দ্যাং হোতারং চর্ষণীনাম্ ।
শোচিষ্কেশং বৃষণং যমিমা বিশঃ প্রাবন্তু জুতয়ে বিশঃ।। (ঋগ্বেদ-১/১২৭/২)।

মা তে হরী বৃষণা বীতপৃষ্ঠা নি রীরমন্ যজমানাসো অন্যে।
অত্যায়াহি শশ্বতো বয়ং তে অরং সুতেভিঃ কৃণবাম সোমৈঃ।। (ঋগ্বেদ-৩/৩৫/৫)।।
অর্থাৎ :
হে অগ্নি! যজনীয়দের শ্রেষ্ঠ তোমাকে আমরা যজমানগণ আহ্বান করি। হে অঙ্গিরাগণের জ্যেষ্ঠ বিপ্র! জ্বালাময় জনন ও মন্ত্রসমূহের দ্বারা, সূর্যের ন্যায় চতুর্দিকে গমনকারী, হে মনুষ্যগণের মুখপাত্র, তোমাকে সেই স্বর্গে প্রবেশকামী যজমানগণ প্রীত করুক; হে জ্বালাময় কেশযুক্ত অগ্নি, তুমি অভীষ্টবর্ষী। (ঋক-১/১২৭/২)।। হে ইন্দ্র! তোমার কোমল পৃষ্ঠযুক্ত অশ্ব দুটি অন্য যজমানদের প্রীতির কারণ যেন না হয়; তাদের অতিক্রম করে তুমি এস, আমরা তোমার রথের অরদণ্ডগুলিকে অভিষুত সোমের দ্বারা মসৃণ করে দেবো। (ঋক-৩/৩৫/৫)।।

দ্রষ্টব্য হলো, যজমান এখানে ব্যক্তিবিশেষ নন; মিত্রযুক্ত ও বহু। তাঁরা নিজেরাই সমবেতভাবে হবিযুক্ত অন্ন প্রদান করছেন– যজ্ঞফল অভিলাষী কোনো এক যজমানের দ্বারা অর্থবিনিময়ে নিযুক্ত হয়ে ঋত্বিকেরা যজ্ঞ করে দিচ্ছেন না। ঋগ্বেদে বহুবচনে এবং নিজেরাই যজ্ঞ-সম্পাদনকারী অর্থে যজমান শব্দের ব্যবহার বিরল নয়; এবং এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর রয়েছে। যজমান শব্দের এ-ধরনের ব্যবহার থেকে কি অনুমান করা যায় যে যজ্ঞ বলতে এককালে যৌথ-অনুষ্ঠান বোঝাতো যদিও উত্তরকালে তা বোঝায়নি? উত্তরকালের বৈদিক সাহিত্যের– যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির– সাক্ষ্য বিচার করে প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

.
উত্তরকালের বৈদিক-সাহিত্যের সাক্ষ্য :
যজুর্বেদ নামটির মধ্যে অতীত এবং যৌথ-সম্পাদন– উভয়েরই ইঙ্গিত আছে বলে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন।
‘যজুঃ + বেদ। যজুঃ = যজ্ + লিট্ উস্, অর্থাৎ, যজ্ঞ করিয়াছিল (বহুবচনে)। এবং আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে যাঁরা বৈদিক যজ্ঞের শুধুমাত্র পরবর্তী রূপটির উপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্ত করছেন যে যজমান বলতে ধনী ব্যক্তি-বিশেষ ছাড়া কিছুই বোঝা উচিত নয়, এমনকি তাঁরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে সত্র নামের যজ্ঞ এ-কথার ব্যতিক্রম এবং সম্ভবত এই সত্র-যাগের মধ্যে প্রাচীনকালের যৌথ-সম্পাদন প্রথার পরিচয় টিকে থেকেছে। অতএব এখানে এই সত্রযাগের বৈশিষ্ট্য বিচার করা প্রাসঙ্গিক হবে।’- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৬৭)

এই সত্র-যজ্ঞের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য কী? বলা হচ্ছে–
‘সত্রে কর্তা অর্থাৎ যজমান একজন নহে, কিন্তু বহুলোকেই উহার কর্তা। কারণ, ‘আসীরন্, উপেয়ুঃ’ ইত্যাদি পদ সত্রের বিধায়ক। আর উহাতে বহুবচনের প্রয়োগ রহিয়াছে বলিয়া ঐ বিধির দ্বারা যে কর্ম বিহিত হইতেছে তাহার বহুকর্তৃকত্ব একপদশ্রুতি দ্বারা বোধিত হয়।’- (জৈমিনি-সূত্র-১০/৬/৪৬-এর শবরভাষ্য। তর্জমা ভূতনাথ সপ্ততীর্থ)।
প্রশ্ন উঠতে পারে, বহুবচনের ব্যবহার থেকে বহুব্যক্তির পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদনের তাৎপর্য

অসম্ভব নয়। উত্তরে বলা হয়েছে,–
‘সত্রে যে কর্তার বহুত্ব অপেক্ষিক, তাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অগ্নিসকলের সন্নিবাপ অর্থাৎ একত্র সমাবেশ হইতেও অবগত হওয়া যায়। ...যদি বহু ব্যক্তি সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনুষ্ঠান করে তবেই এই প্রকারের সন্নিবাপ-বচন সঙ্গত হয়। ইহা হইতেও জানা যায় যে, সত্রে বহুব্যক্তিরই মিলিতভাবে অধিকার।’- (শবরভাষ্য-১০/৬/৪৯)।
তাছাড়া,–
‘সত্রে যজমান যদি একজনমাত্রই হইত তাহা হইলে শ্রুতি মধ্যে সত্রপ্রকরণে ‘যো বৈ বহুনাং যজমানানাং গৃহপতিঃ’ এইভাবে যজমানের যে বহুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়িত। ...অতএব বহুব্যক্তি সঙ্ঘবদ্ধভাবে সত্রের অধিকারী...।’- (শবরভাষ্য-১০/৬/৫০)।
কিন্তু যজমান-বহুত্ব প্রতিপাদনের পরও প্রশ্ন ওঠে,–
‘সত্রে যজমান ছাড়া অন্য ব্যক্তিরা কি ঋত্বিক (পুরোহিত) হইবে, অথবা, যজমানেরাই ঋত্বিক হইবে?’- (শবরভাষ্য-১০/৬/৫১)।
সিদ্ধান্ত করা হয়েছে,–
‘সত্রে যাহারা যজমান, তাহারাই ঋত্বিক হইবে। কারণ সত্রে ঋত্বিকদিগকে দীক্ষিত করিবার বিধি আছে। আর দীক্ষাপদের অর্থ যজমানের সংস্কার।’- (শবরভাষ্য-১০/৬/৫২)। সংক্ষেপে, ‘সত্রে যাহারা যজমান তাহারাই ঋত্বিক।’- (শবরভাষ্য-১০/৬/৫৩)।

স্বভাবতই এই সত্রযাগে ‘বরণ’ এবং ‘ক্রয় বা পরিক্রয়ের’ প্রশ্ন ওঠে না। ঋত্বিক নিয়োগ করাবার সময়ে তাঁর কাছে যজমানের যে প্রার্থনা তারই নাম ‘বরণ’ : যেমন বরণীয় ভাবী পুরোহিতের কাছে যজমান বলবেন, আমি অমুক যজ্ঞ করবো, তাতে এতো দক্ষিণা দেব, আপনি পুরোহিত হতে সম্মত হোন। এবং–
‘সেই যজ্ঞে দেয় দক্ষিণা নিরূপিত হইলে ব্রাহ্মণ সেই যজ্ঞের কর্মশেষে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হন। ইহাকেই ক্রয় বা পরিক্রয় বলা হয়।’। কিন্তু সত্রযাগে ‘বরণ’ বা ‘ক্রয়ের’ কথা ওঠে না। ‘কারণ, সত্রে যাঁহারা যজমান তাঁহারাই ঋত্বিক বলিয়া সত্রের ফল অন্যগামী নহে। আর নিজেকে নিজের কাজে দক্ষিণা দিয়া পরিক্রয় করিতে কাহাকেও কোথাও দেখা যায় না। অতএব সত্রে যেরূপ বরণ করণীয় নহে সেইরূপ পরিক্রয়ও কর্তব্য নহে।’-
(শবরভাষ্য-১০/২/৩৫। তর্জমা ভূতনাথ সপ্ততীর্থ)

এখানে দ্রষ্টব্য হলো, ‘যজমান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যেই বৈদিক যজ্ঞের প্রাক্-ইতিহাস সংক্রান্ত যে-ইঙ্গিত পাওয়া যায়– এবং ঋগ্বেদের নানা দৃষ্টান্তে যে-ইঙ্গিতের সুস্পষ্ট সমর্থন বর্তমান– সত্রযাগের মধ্যেও তারই স্মারক অনুমান করা অসম্ভব নয়; সুদূর অতীতে যজমানগণই যজ্ঞকর্মে অংশগ্রহণ করতেন, তাই যজমান বলতে তখনো ধনী ব্যক্তিবিশেষ নয়, যিনি কিনা অর্থাদি দান করে যজ্ঞসম্পাদনার্থে পেশাদার পুরোহিত নিয়োগ করবেন। বস্তুত, বৈদিক যজ্ঞ অত্যন্ত সুপ্রাচীন,– যদিও যজ্ঞের সেই আদিরূপ ও উত্তররূপ এক নয়।’-
(ভারতীয় দর্শন, দেবীপ্রসাদ, পৃষ্ঠা-১৬৮)

যজ্ঞের আদিরূপ ও উত্তররূপ যে এক নয়– একথা আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যেও স্বীকৃত। তাছাড়া এ-বিষয়ে উত্তরকালের বৈদিক ব্রাহ্মণ-সাহিত্যেরই অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য আছে। এক্ষেত্রে আমরা 'ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে'র সহায়তা নিতে পারি। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বারবার কিন্তু একটি কথা পাওয়া যায়, যেমন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর তর্জমায়–

'যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন; (দেবগণ) তাঁহাকে ইষ্টিসমূহ দ্বারা অন্বেষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যে-হেতু ইষ্টি দ্বারা অন্বেষণ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই ইষ্টির ইষ্টিত্ব। (পরে দেবগণ) যজ্ঞকে পাইয়াছিলেন।'- (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-১/২)।।

.

'যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন; (তখন) সেই দেবগণ কোনও (যজ্ঞাদি) করিতে পারিতেন না এবং জানিতে পারিতেন না। (তৎপরে) তাঁহারা অদিতিকে বলিলেন, তোমার প্রসাদে আমরা এই যজ্ঞকে প্রকৃষ্টরূপে জানিব; তিনি (অদিতি) বলিলেন, তাহাই হউক; (কিন্তু) সেই (আমি অদিতি) তোমাদের নিকট বরপ্রার্থনা করিতেছি। (দেবগণ কহিলেন) প্রার্থনা কর; তিনি (অদিতি) এই বর চাহিলেন– যজ্ঞসকল মৎপ্রায়ণ (আমাকে লইয়া আরব্ধ) হউক এবং মদুদয়ন (আমাকে লইয়া অবসান) হউক। (দেবগণ কহিলেন) তাহাই হইবে।'- (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-১/৭)।।

.

'যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রৈষদ্বারা সেই যজ্ঞকে প্রৈষ (আহ্বান) করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই প্রৈষের প্রৈষত্ব। দেবগণ পুরোরুক্-সমূহ দ্বারা সেই যজ্ঞকে রুচিসম্পন্ন করিয়াছিলেন; পুরোরুক্দ্বারা যজ্ঞের রুচি সম্পাদন করিয়াছিলেন, উহাই পুরোরুকের পুরোরুকত্ব। সেই যজ্ঞকে বেদিতে অনুবেদন (অনুকূল ভাবে লাভ) করিয়াছিলেন; বেদিতে যে অনুবেদন করিয়াছিলেন, তাহাই বেদির বেদিত্ব। সেই যজ্ঞ (বেদিতে) লব্ধ হইলে পর উহাকে গ্রহ দ্বারা (উপাংশু প্রভৃতি দ্বারা) গ্রহণ করিয়াছিলেন; লব্ধ হইলে পর গ্রহ দ্বারা যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহাই গ্রহ সকলের গ্রহত্ব। তাহাকে লাভ করিয়া নিবিৎসমূহের দ্বারা নিবেদন করিয়ছিলেন; লাভের পর নিবিৎসমূহ দ্বারা নিবেদন করিয়াছিলেন, ইহাই নিবিৎসমূহের নিবিৎত্ব।

নষ্ট দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা করিয়া, কেহ বা অধিক পাইতে ইচ্ছা করে, কেহ বা অল্প পাইতে ইচ্ছা করে। উভয়ের মধ্যে যে অধিক পাইতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে ভাল ইচ্ছা করে। সেইরূপ যে-ব্যক্তি এই প্রৈষমন্ত্রসকলকে দীর্ঘ বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তি তাহা ভাল জানে; কেননা, এই যে এতদ্বারাই নষ্টযজ্ঞের অন্বেষণ হয়। সেইজন্য (মৈত্রাবরুণ) মাথা নোয়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রৈষমন্ত্র পাঠ করিবেন।'- (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-৩/৯)।।

এ-জাতীয় ব্যাখ্যায় এখানে প্রকট কৃত্রিমতা অবশ্যই লক্ষণীয়। তবে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন,– 'বস্তুত, সমগ্র ব্রাহ্মণ সাহিত্যেই ব্যাখ্যা-প্রচেষ্টা মাত্রই সমজাতীয় কৃত্রিমতার পরিচায়ক। কিন্তু সমস্ত কৃত্রিমতার পিছনের একটি মূল ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তার তাৎপর্য

উপেক্ষণীয় নয়। বৈদিক ঐতিহ্যেই কালক্রমে যজ্ঞের আদি রূপটি বিস্মৃত হয়েছিল: 'যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন'। কিন্তু যজ্ঞের আদি রূপটি বিস্মৃত হলেও তার নানা বৈশিষ্ট্য, নানা আচরণ, উত্তরকালেও প্রথাগতভাবে টিকে থাকাই স্বাভাবিক; স্বভাবতই ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারেরা নিজেদের ধ্যানধারণার উপর নির্ভর করে এই বৈশিষ্ট্যগুলিরই ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করবার প্রয়াস করেছিলেন।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৬৯)

তবে এই ব্যাখ্যায় এখানে একটা বিষয় হয়তো স্পষ্ট বোঝানো হচ্ছে যে, যজ্ঞ চলে যাবার ফলে দেবতারা বিচলিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, দেবতারা কেন অমন বিচলিত হয়েছিলেন? কেন তাঁরা ফিরে পেতে চেয়েছিলেন সেই অতীত যজ্ঞকে?
'ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে'রই নানা উক্তি থেকে এ-প্রশ্নের একটি চিত্তাকর্ষক উত্তর পাওয়া যায়– অতীতে যজ্ঞই ছিলো ভক্ষ্য-অন্ন-লাভের উপায়, অতএব যজ্ঞ অন্তর্হিত হওয়া মানেই ভক্ষ্য-অন্ন লাভের সংকট উপস্থিত হওয়া। যেমন ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে আছে–
'যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে, "আমি তোমাদের অন্ন হইব না", ইহা বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। দেবতারা বলিলেন, "না, তুমি আমাদের অন্নই হইবে"। দেবতারা তাঁহাকে (যজ্ঞকে) হিংসা করিয়াছিলেন। হিংসিত হইয়াও তিনি দেবগণের নিকট (অন্নরূপ) প্রভূত হন নাই। তখন দেবগণ বলিলেন, "এইরূপ হিংসিত হইয়াও ইনি যখন আমাদের অন্ন হইলেন না, অহো, তখন আমরা এই (প্রবর্গ্য) যজ্ঞের সম্ভার (আয়োজন) করিব।" "তাহাই হউক", বলিয়া তাঁহারা যজ্ঞের সম্ভার করিয়াছিলেন।
সেই যজ্ঞের সম্ভাব করিয়া (দেবতারা) বলিলেন, "হে অশ্বিদ্বয়, (আমাদের কর্তৃক পীড়িত) এই যজ্ঞের চিকিৎসা কর। (কেননা) অশ্বিদ্বয়ই দেবগণের ভিষক্ । (আবার) অশ্বিদ্বয়ই অধ্বর্য্যু; সেইজন্য অধ্বর্য্যুদ্বয় ঘর্মের (প্রবর্গের) সম্ভার আয়োজন করেন।'- (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-১/১৮)।।
.
'একদা যজ্ঞ ভক্ষ্য-অন্ন সমেত দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। দেবগণ বলিলেন, "যজ্ঞ ভক্ষ্য-অন্ন সমেত আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এই যজ্ঞের অনুসরণ করিয়া আমরা অন্নেরও অন্বেষণ করিব"। তাঁহারা বলিলেন, "কীরূপে অন্বেষণ করিব? ব্রাহ্মণ-দ্বারা ও ছন্দোদ্বারা (অন্বেষণ) করিব"। এই বলিয়া তাঁহারা (যজমানরূপী) ব্রাহ্মণকে ছন্দোদ্বারা দীক্ষিত করিয়াছিলেন ও তাঁহার (দীক্ষণীয়েষ্টি) যজ্ঞকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন; অপিচ (দেব) পত্নীগণের সংযোগ করিয়াছিলেন। সেইহেতু এখনও দীক্ষণীয়া ইষ্টিতে যজ্ঞকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয় ও (দেব-) পত্নীগণেরও সংযোগ করা হয়। (দেবগণ কৃত) সেই কর্মের অনুসরণ করিয়া (মনুষ্যেরাও) তদ্রূপ করিয়া থাকে।
তারপর তাঁহারা প্রায়ণীয় কর্মের বিস্তার করিয়াছিলেন।... (তৎপরে) তাঁহারা আতিথ্য কর্মের বিস্তার করিয়াছিলেন; আতিথ্য দ্বারা তাঁহারা যজ্ঞকে অত্যন্ত নিকটে আনিয়া তাহা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।... (তৎপরে) তাঁহারা উপসৎ-সমূহের বিস্তার করিয়াছিলেন; উপসৎসকল দ্বারা সেই যজ্ঞকে অত্যন্ত নিকটে আনিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।... এইরূপে উত্তরোত্তর সারবান্

কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণ সেই যজ্ঞকে পাইয়াছিলেন...
সেই যজ্ঞকে পাইয়া দেবগণ বলিলেন, "(অহে যজ্ঞ), তুমি আমাদের ভক্ষণীয় অন্নের জন্য অবস্থান কর"। যজ্ঞ বলিলেন, "না। কেন আমি তোমাদের জন্য অবস্থান করিব?" এই বলিয়া যজ্ঞ দেবগণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণদ্বারা ও ছন্দোদ্বারা সংযুক্ত হইয়া তুমি ভক্ষণীয় অন্নের জন্য অবস্থিতি কর"। (যজ্ঞ বলিলেন), "তাহাই হইবে"। সেইহেতু অদ্যপি যজ্ঞ ব্রাহ্মণদ্বারা ও ছন্দোদ্বারা সংযুক্ত হইয়া দেবগণের নিকট হব্য বহন করিয়া থাকেন।'- (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-৩/৪৫)।।

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে অন্তত দুটি বিষয়ের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট বলে দেবীপ্রসাদ মনে করেন। তাঁর মতে,– 'প্রথমত, বৈদিক ঐতিহ্যেই কালক্রমে সুপ্রাচীন যজ্ঞের রূপটি বিস্মৃত হয়েছিল এবং উত্তরকালে তারই পুনর্গঠন প্রয়াস দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, যজ্ঞের আদি রূপটিও ভক্ষ্য অন্ন লাভের উপায় বলেই বিবেচিত ছিল : যা চলে গেলে ভক্ষ্য অন্নও চলে যায়, যাকে ফিরে পাবার মধ্যেই ভক্ষ্য অন্নকে ফিরে পাবার পরিকল্পনা, তাকে অন্ন লাভের কোন এক উপায় ছাড়া আর কী মনে করা যেতে পারে? প্রসঙ্গত, উদ্ধৃত উক্তিগুলিতে যজ্ঞের আদি-রূপ সংক্রান্ত যেটুকু আভাস পাওয়া যায় তার মধ্যে এ-ইঙ্গিতও নেই যে যজ্ঞ জনৈক ধনী যজমানের ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত এবং এ-অনুষ্ঠানের বাস্তব দায়িত্ব পেশাদার পুরোহিত শ্রেণীর উপর। বস্তুত, এই পুরোহিত শ্রেণীর সঙ্গে যজ্ঞের সম্পর্ক যে উত্তরকালেই উদ্ভাবন সে-বিষয়েও ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি চোখে পড়ে।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৭০)

এই স্বীকৃতি কীরকম? ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই বলা হচ্ছে (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর তর্জমায়)–
'প্রজাপতি যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; যজ্ঞ সৃষ্টির পর ব্রহ্ম ও ক্ষত্রের সৃষ্টি করিলেন এবং ব্রহ্মক্ষত্রের পর এই দ্বিবিধ প্রজার সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মের অনুরূপ হুতাদ এবং ক্ষত্রের অনুরূপ অহুতাদ সৃষ্টি করিলেন। এই যে ব্রাহ্মণগণ, ইঁহারাই হুতাদ (হুতশেষভোজী) প্রজা; আর রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র, ইঁহারাই অহুতাদ। যজ্ঞ তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল; ব্রহ্ম ও ক্ষত্র যজ্ঞের অনুগমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মের যেসকল আয়ুধ, তাহার সহিত ব্রহ্ম এবং ক্ষত্রের যেসকল আয়ুধ তাহার সহিত ক্ষত্র,– তাহার অনুগমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞের যে-সকল আয়ুধ– তাহাই ব্রহ্মের আয়ুধ; আর অশ্বযুক্ত রথ, কবচ ও বাণযুক্ত ধনু,– ইহাই ক্ষত্রের আয়ুধ। ক্ষত্রের আয়ুধে ভয় পাইয়া যজ্ঞ না ফিরিয়া পালাইতে লাগিল; ক্ষত্র তাহাকে ধরিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্ম তাহার অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ও তৎপরে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার গতি (পথ) রোধ করিলেন। এইরূপে (পথ) রুদ্ধ হইলে যজ্ঞ দাঁড়াইল এবং ব্রহ্মের নিকট আপনারই আয়ুধসকল দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সেই হেতু অদ্যপি যজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।
তখন ক্ষত্র সেই ব্রহ্মের অনুগমন করিয়া তাহাকে বলিলেন, " আমাকে এই যজ্ঞে আহ্বান কর"। ব্রহ্ম বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে; কিন্তু তুমি আপনার আয়ুধসকল ফেলিয়া দিয়া

ব্রহ্মের আয়ুধ লইয়া ব্রহ্মের রূপ ধরিয়া ব্রহ্মসদৃশ হইয়া যজ্ঞের নিকট উপস্থিত হও"। "তাহাই হউক", বলিয়া ক্ষত্র আপন আয়ুধ ফেলিয়া ব্রহ্মের আয়ুধ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের রূপ ধরিয়া ব্রহ্মসদৃশ হইয়া যজ্ঞের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই হেতু অদ্যপি ক্ষত্রিয় যজমান আপন আয়ুধ ফেলিয়া ব্রহ্মের আয়ুধ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের রূপ ধরিয়া ব্রহ্মসদৃশ হইয়া যজ্ঞের নিকট উপস্থিত হন।'- (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-৭/১৯)

মনে রাখা দরকার, পরবর্তী কালের ব্যক্তি-যজমান বলতে ক্ষত্রিয়ই। উপনিষদেই এ-কথার বহু নজির আছে, এবং আমরা ইতঃপূর্বে তা কিছু কিছু দৃষ্টান্তে দেখেছিও। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপরোদ্ধৃত উক্তি থেকে স্পষ্টই অনুমান হয়, ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যের মতোই ক্ষত্রিয়ের যজমানত্ব বৈদিক যজ্ঞের আদি পর্যায়ের পরিচায়ক নয়। বস্তুত, বৈদিক সমাজে সুস্পষ্ট রাজশক্তির– এবং অতএব রাজশক্তির অধিকারী ক্ষত্রিয়শ্রেণীর– আবির্ভাব 'ব্রাহ্মণে'র যুগেই প্রকট হয়েছে; এ-বিষয়ে আধুনিক বিদ্বান গবেষকেরা বিভিন্নভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
তবে পরবর্তী যুগে পুনর্গঠিত ওই যজ্ঞের সঙ্গে শ্রেণীসমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি 'ঐরতেয়-ব্রাহ্মণে'র সামাজিক পটভূমিতে কীভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভেদাদি প্রকট হয়ে পড়েছিলো তারও কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেমন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর তর্জমায়)–
'ব্রহ্ম ক্ষত্রের পূর্ববর্তী; ব্রহ্ম পূর্ববর্তী থাকিলে ক্ষত্রিয় যজমানের রাষ্ট্রও উগ্র হইয়া অন্যের নিকট ব্যথা পায় না।'- (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, ৪৬৭)
'ক্ষত্র নিশ্চয়ই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মও ক্ষত্রে প্রতিষ্ঠিত।'- (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, ৪৬৯)
'ব্রহ্ম ক্ষত্রের পূর্ববর্তী; ব্রহ্ম পূর্বে থাকিলে যজমানের রাষ্ট্র উগ্র হইবে না এবং অপরের নিকট ব্যথা পাইবে না। সপ্তদশ স্তোম বৈশ্যস্বরূপ এবং একবিংশ স্তোম শূদ্রবর্ণের অনুরূপ। এতদ্বারা বৈশ্যকে ও শূদ্রবর্ণকে ক্ষত্রিয়ের বর্ত্মানুগামী করা হয়।'- (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, ৪৭০-১)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যুগে যে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব ঘটেছিলো, এ-বিষয়ে আধুনিক বিদ্বানেরা অবশ্যই নিঃসন্দেহ বলেই মনে হয়, যদিও সেগুলি খণ্ড ও সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রমাত্র। কিন্তু এই রাষ্ট্রশক্তি যে প্রাক্-বিভক্ত প্রাচীন সমাজের ধ্বংসস্তুপের উপরই আবির্ভূত হয়– এ-বিষয়টি স্বীকার না করলে বৈদিক যজ্ঞের ইতিহাসটুকুও আমাদের কাছে অস্পষ্টই থেকে যাবে। তাই দেবীপ্রসাদ বলেন,– 'আমাদের যুক্তি অনুসারে, বৈদিক সমাজে রাষ্ট্রশক্তির এই আবির্ভাব এবং বৈদিক যজ্ঞের উপরোক্ত রূপান্তর, উভয়ই হলো বৈদিক মানুষদের জীবনে একটি মূল পরিবর্তনের দ্বিবিধ পরিণাম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচনাকালে এই মূল পরিবর্তনটি প্রকট হয়েছিলো, কেননা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা ওই দ্বিবিধ পরিণামেরই সুস্পষ্ট পরিচয় পাই।'- (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৬০৫)

দেবীপ্রসাদের প্রতিধ্বনি করেই বলতে পারি, ঋগ্বেদের সাক্ষ্য অনুসারে অনুমান করা যায়, অতীতে বৈদিক মানুষেরাও সমাজ-বিকাশের প্রাক্-বিভক্ত পর্যায়ে– আদিম সাম্যাবস্থায়– জীবন-যাপন করতেন। তখনো তাঁরা লেখার হরফ আবিষ্কার করেননি; মুখেমুখে গান রচনা করতেন। পার্থিব সুখ-সম্পদের কামনাই সে-গানের প্রাণবস্তু। এ-সম্পদ কিন্তু একার জন্য নয়– সকলের জন্য, সমষ্টির জন্য– 'আমার' নিজের জন্য চাওয়া নয়, 'আমাদের' সকলের জন্য চাওয়া। এবং এ-সম্পদ কারুর একার নয় বলেই তাতে সকলের সমান অধিকার– সমান অংশ, সমান ভাগ, সমান ভগ। অতএব এ-পর্যায়ে সমবণ্টন বা অংশবণ্টনের প্রসঙ্গও স্বাভাবিক। কোথাও কোথাও দেখা যায় মানুষেরা নিজেরাই অংশবণ্টনের কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন; কিন্তু প্রধানত দেবতাদের উপরই তার দায়িত্ব ছিলো। কিন্তু বৈদিক দেবতাদের তখনো আধুনিক আধ্যাত্মিক অর্থে দেবত্বপ্রাপ্তি ঘটেনি। তাই প্রায়ই তাঁদের 'সখা' বলে এবং কখনো বা 'নরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং আদিম সাম্যসমাজের পরিচায়ক হিসেবে শুধুই যে ঋগ্বেদের মানুষেরাই পরস্পরের সঙ্গে সমান তাই নয়, দেবতারাও পরস্পরের সঙ্গে সমান; এমনকি অতীতে দেবতারাও যে মানুষের সঙ্গে সমান ছিলেন বা মানুষেরাও দেবতাদের সঙ্গে সমান হয়েছিলেন– তার স্মৃতিটুকুও ঋগ্বেদ থেকে বিলুপ্ত হয়নি। স্বভাবতই, দেবতারাও মানুষের মতো সচেতনভাবে একত্র তাঁদের ভাগ গ্রহণ করতেন এবং সভায় গমন করতেন। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই সভা বা বিদথই ছিলো ধন-বিভাগ বা অংশ-বণ্টনের স্থান। অতএব ঋগ্বেদের অন্তত প্রাচীনতর অংশগুলিতে রাষ্ট্রশাসনের উল্লেখ অস্বাভাবিক হবে। এবং সে-উল্লেখ দেখা যায় না।
অন্যদিকে, ঋগ্বেদোত্তর সাহিত্যে সভা, সমিতি ও বিদথের এই অতীত গৌরব ম্লান হয়েছে এবং মহাভারত ইত্যাদি পুরাণে তা বিলুপ্ত। কিন্তু তার মাঝামাঝি ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায়, সভা-সমিতির মহিমার পরিবর্তে জেগে উঠছে ব্রহ্ম-সমর্থিত ও ক্ষত্র-শাসিত রাষ্ট্রশক্তির মহিমা। এ-রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো কী করে? ঐতিহাসিক বিবর্তনের সাধারণ নিয়ম হিসেবে আমরা জানি, জ্ঞাতিভিত্তিক প্রাক্-বিভক্ত সমাজের ধ্বংসস্তুপের উপরই রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়। এই নিয়মে বৈদিক মানুষদেরও প্রাক্-বিভক্ত প্রাচীন জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজ কালক্রমে ভেঙে গিয়েছিলো এবং তারই ধ্বংসস্তুপের উপর আবির্ভূত হয়েছিলো শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। 'ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে'র পরিভাষায় নবপর্যায়ের শাসক-শ্রেণী বলতে প্রধানতই ক্ষত্র এবং শাসন-যন্ত্রের নাম রাষ্ট্র– যদিও ওই ক্ষত্র ব্রহ্ম-সমর্থিত বা ব্রাহ্মণ-সমর্থিত।

বৈদিক মানুষদের জীবনে এই মৌলিক পরিবর্তনটিরই আর-এক পরিণাম হলো বৈদিক যজ্ঞের রূপান্তর। সে-রূপান্তরের মূল কথা কী? সংক্ষেপে, অতীতে অনুষ্ঠান-নির্ভরতা সত্ত্বেও যা ছিলো লোকায়তিক কামনা-চরিতার্থতার– অন্ন-লাভের– যৌথ পদ্ধতি, কালক্রমে তা শুধুই যে লোকোত্তরের কল্পনায় অনুষ্ঠান-মাত্রে পরিণত হলো তাই নয়, সামগ্রিক স্বার্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থে নিযুক্ত বলেও কল্পিত হলো। কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, ব্রাহ্মণ-সাহিত্য রচনার যুগেই ক্ষত্রিয়শ্রেণীর এই রাজশক্তির বা রাষ্ট্রশক্তির পাশাপাশিই

ব্রাহ্মণশ্রেণীর অধ্যাত্মশক্তি বা পৌরোহিত্য শক্তি সুস্পষ্টভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং উত্তরকালের বৈদিক সমাজের শাসন-শক্তি বলতে এই দ্বিবিধ শক্তির মধ্যে আপোসও, অর্থাৎ পরস্পর-সমর্থিত। এ-বিষয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণেরই ইঙ্গিত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বিনষ্ট বা বিস্মৃত (অতীত) যজ্ঞের পুনঃপ্রাপ্তি প্রসঙ্গেই 'ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে' উক্ত হয়েছে (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর তর্জমায়)–

'এবিষয়ে আরাঢ়ের পুত্র সৌজাত বলিয়াছিলেন, এই যে দুই আহুতির বিষয় বলিতেছি, ইহা অজিতপুনর্বণ্য, অর্থাৎ নষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিহেতু। যে যজমান সেই সৌজাতের কথিত অনুশাসন পালন করিতে চাহেন, তিনি যাহা কামনা করেন তদুদ্দেশে ঐরূপ করিবেন। তিনি এই দুই আহুতি দিবেন:– "ব্রহ্ম প্রপদ্যে ব্রহ্ম মা ক্ষত্রাদ্ গোপায়তু ব্রহ্মণে স্বাহা"– এই হোমমন্ত্রের তাৎপর্য এই যে, যে যজমান যজ্ঞ আরম্ভ করে সে ব্রহ্মেরই শরণ লয়; কেননা যজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপ; যে দীক্ষিত হয় সে যজ্ঞ হইতেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে; ব্রহ্মের শরণাপন্ন সেই যজমানকে ক্ষত্র হিংসা করিতে পারে না। আর "ব্রহ্ম মা ক্ষত্রাদ্ গোপায়তু"– এই মন্ত্রাংশ বলিলে ব্রহ্ম সেই যজমানকে ক্ষত্র হইতে রক্ষা করেন। "ব্রহ্মণে স্বাহা"– বলিলে ব্রহ্মকে প্রীত করা হয়; ব্রহ্ম প্রীত হইয়া তাহাকে ক্ষত্র হইতে রক্ষা করেন।

অপিচ অনুবন্ধ্য পশুর সমিষ্ঠযজুর্মন্ত্রপাঠের পর "ক্ষত্রং প্রপদ্যে ক্ষত্রং মা ব্রহ্মণো গোপায়তু ক্ষত্রায় স্বাহা"– এই মন্ত্রে আহুতি দিবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্র লাভ করে, সে ক্ষত্রে শরণ লয়; রাষ্ট্রই ক্ষত্রস্বরূপ; ক্ষত্রের শরণাপন্ন সেই যজমানকে ব্রহ্ম হিংসা করিতে পারেন না। আর ক্ষত্র তাহাকে ব্রহ্ম হইতে রক্ষা করিবে, এই উদ্দেশে "ক্ষত্রং মা ব্রহ্মণো গোপায়তু"– বলা হয়; আর "ক্ষত্রায় স্বাহা"– বলিলে ক্ষত্রকে প্রীত করা হয়; ক্ষত্র প্রীত হইয়া তাহাকে ব্রহ্ম হইতে রক্ষা করেন।

এই যে আহুতিদ্বয়, ইহাই ক্ষত্রিয় যজমানের পক্ষে ইষ্টপূর্তের অবিনাশহেতু; অতএব এই দুই আহুতিই হোম করিবে।'- (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-৭/২২)।।

নষ্ট বা বিস্মৃত যজ্ঞের পুনঃপ্রাপ্তি বা পুনর্গঠন প্রসঙ্গে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই উক্তিগুলির মধ্যে বৈদিক যজ্ঞের উত্তররূপ বা রূপান্তর বোঝবার মূল-সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে বলে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন। 'ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের– ব্রহ্মশক্তির ও ক্ষত্রশক্তির– এক সুস্পষ্ট আপোসের উপরই যজ্ঞের উত্তর-রূপটি প্রতিষ্ঠিত। তাই উত্তরকালের যজ্ঞে যজমান বলতে সাধারণত জনৈক ধনী ক্ষত্রিয় বা রাজাই; যজ্ঞ ফলের অধিকারী বলতে তিনিই, কিন্তু যজ্ঞকর্ম সম্পাদনার বাস্তব দায়িত্ব তাঁর নয়; এই উদ্দেশে যজমান ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের 'বরণ' করবেন এবং সেই যজ্ঞে দেয় দক্ষিণা নিরূপিত করবেন বা 'ক্রয়' করবেন। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণের স্বীকৃতি অনুসারেই যজ্ঞের আদিরূপটি বৈদিক সমাজে ব্রহ্মশক্তি ও ক্ষত্রশক্তি আবির্ভাবের চেয়েও অনেক প্রাচীন– 'প্রজাপতি যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যজ্ঞসৃষ্টির পর ব্রহ্ম ও ক্ষত্রের সৃষ্টি করিলেন।... যজ্ঞ তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল; ব্রহ্ম ও ক্ষত্র যজ্ঞের অনুসরণ করিয়াছিলেন।' ইত্যাদি। এবং শেষপর্যন্ত লুপ্ত যজ্ঞের যে-রূপটি পুনর্গঠিত হলো তা সুস্পষ্টভাবেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। এইভাবে শ্রেণী-স্বার্থ

জড়িত হয়ে উত্তরকালে যজ্ঞের প্রকৃতিতে নানা পরিবর্তন ঘটাই স্বাভাবিক।'

কিন্তু প্রশ্ন হলো,– যজ্ঞের সেই অতীত বা আদি-রূপ বলতে কী ছিলো এবং কেমন করেই বা আমরা তার সাধারণ পরিচয় জানতে পারি? এর উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে হয়তো আদিম-পর্যায়ের মানুষদের জাদু-বিশ্বাসের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

.

বৈদিক যজ্ঞকর্ম ও মানুষের আদিম জাদু-অনুষ্ঠান :

বৈদিক যজ্ঞের উত্তর-রূপে পরিবর্তনের পর্যায়ের আগে যে যজ্ঞের একটি আদিরূপ ছিলো সে সম্বন্ধে ঋগ্বেদের উত্তরকালের যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণ-সাহিত্য থেকে একটা মোটামুটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু সেই আদি-রূপ বলতে কী ছিলো তার সাধারণ পরিচয় জানতে হলে আমাদেরকে বৈদিক মানুষদের সমাজ ও নৃতাত্ত্বিক পরিক্রমণের বিষয়টিকে স্বীকার করতে হবে। সেটি কী? তার প্রতিপাদ্য হলো, অন্যান্য আদিম মানুষের মতোই বৈদিক মানুষেরাও আদিম পর্যায়ে ম্যাজিক বা জাদুর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করতেন এবং বৈদিক যজ্ঞের আদি-রূপ বলতে তাঁদের সুপ্রাচীন জাদু-অনুষ্ঠানই।

ইতঃপূর্বে বৈদিক সাহিত্যের সাধারণ পরিচয়ে আমরা দেখেছি যে, বৈদিক সাহিত্যে আদিম জাদু-র বহু স্মৃতি টিকে থেকেছে; এবং বৈদিক যজ্ঞ আদিতে জাদু-অনুষ্ঠানই ছিলো কিনা এ-বিষয়ে আধুনিক বিদ্বানদেরও বেশ কিছু মতামতও রয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে আদিম জাদুর বৈশিষ্ট্য কী তার সুস্পষ্টতার প্রয়োজনে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলছেন–

'প্রথমত, জাদু আর ধর্ম এক নয়। ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য, ঈশ্বরে বা দেবতায় বিশ্বাস এবং প্রার্থনা-উপাসনা ইত্যাদি। এই প্রার্থনা-উপাসনার সাহায্যে ঈশ্বরকে তুষ্ট করা যাবে এবং তাঁরই ইচ্ছায় বা চেষ্টায় প্রার্থিত বস্তু লাভ করা যাবে। যথা : আকাশে বৃষ্টি নেই, ঈশ্বর বা দেবতার কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা জানানো হলো, পুজো-উপচার প্রভৃতির সাহায্যে তাঁকে সন্তুষ্ট করা হলো, সন্তুষ্ট হয়ে তিনি বৃষ্টি দান করলেন। অতএব, ধর্ম-বিশ্বাসের মূল কথা হলো, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন বা আয়ত্তাধীন : ধর্ম-বিশ্বাসের উচ্চতর পর্যায়ে তাই ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, ইত্যাদি রূপে পূজিত। জাদু-বিশ্বাসের মূল কথা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ হিসেবে কোনো ঈশ্বর বা দেবতার কর্তৃত্ব বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন ওঠে না; তার বদলে জাদু-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষেরই কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানকে প্রাকৃতিক ঘটনার একমাত্র কারণ বলে বিবেচনা করবার পরিচয়; অর্থাৎ অমুক অনুষ্ঠানটি নির্ভুলভাবে করতে পারলে অমুক ঘটনা প্রকৃতিতে অনিবার্যভাবেই ঘটবে। এ-জাতীয় অনুষ্ঠান সাধারণত অনুকরণ মূলক। যথা : আকাশে বৃষ্টি নেই; আদিম মানুষেরা এমন একটি অনুষ্ঠান করল যা আসলে মেঘ-বৃষ্টির অনুকরণ মাত্র– হয়তো মেঘ ঘনিয়ে আসার নকল, মেঘের ডাকের নকল, আকাশে জলের ছিটে ছড়িয়ে বৃষ্টিপাতের নকল, ইত্যাদি। এবং তাদের বিশ্বাস, এই অনুষ্ঠান

নির্ভুলভাবে করতে পারলেই বৃষ্টিপাত হবে। অতএব বৃষ্টিপাত নামের প্রাকৃতিক ঘটনাটি কোনো ঈশ্বর বা দেবতার বা কারুরই ইচ্ছাধীন নয়; তার পরিবর্তে একান্তভাবেই মানবীয় অনুষ্ঠানেরই অধীন। আদিম জাদুর দৃষ্টান্তে অনেক সময় অনুষ্ঠানের সঙ্গে মন্ত্রের (Spell) সম্পর্ক থাকে; কিন্তু এই মন্ত্র বা 'Spell' প্রার্থনা-উপাসনা জাতীয় নয়, তার বদলে আদেশমাত্র– মন্ত্রের সাহায্যে যেন প্রকৃতিকে আদেশ করা হলো, বাঞ্ছিত ঘটনাটি ঘটাতে প্রকৃতি বাধ্য হবে। সংক্ষেপে, জাদু-বিশ্বাসের মূল কথা হলো অনুষ্ঠানটি নির্ভুলভাবে সম্পাদিত হলে, আদেশমূলক মন্ত্র নির্ভুলভাবে উচ্চারিত হলে বাঞ্ছিত ফল অনিবার্যভাবে ফলবে। অতএব জাদু-বিশ্বাসের মূলে প্রাকৃতিক কার্যকারণ সম্পর্ক সংক্রান্ত একটি আদিম ও অস্ফুট বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এইদিক থেকেই মন্তব্য করা হয়েছে যে আদিম জাদু-বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মের বদলে বরং বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসেরই সাদৃশ্য অনুমেয়।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৭৩)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নিরীশ্বর মীমাংসা দর্শনে এই আদিম জাদু বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত মূল সূত্রগুলিরই এমনভাবে দার্শনিক রূপ দেবার আয়োজন করা হয়েছে যে, সেই কারণে পূর্বমীমাংসকাচার্যেরা বেদপন্থী চূড়ান্ত আস্তিক হয়েও এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন যাকে চূড়ান্ত অর্থেই অধ্যাত্মবাদ-বিরোধী এবং ভাববাদ-বিরোধী আখ্যা দিতে হবে। প্রসঙ্গত, পূর্ব-মীমাংসার নামান্তর কর্ম-মীমাংসা; কেননা ক্রিয়াকর্ম বা যাগযজ্ঞই তার মূল আলোচ্য। অতএব, এক্ষেত্রে দেবীপ্রসাদের মন্তব্য হলো, 'মীমাংসকেরা যদি যজ্ঞ-প্রসঙ্গে আদিম জাদুর অন্তর্নিহিত মূল সূত্রগুলিরই দার্শনিক রূপ দেবার প্রয়াস করে থাকেন তাহলে অনুমানের অবকাশ হয় যে অন্তত তাঁরা জাদু অর্থেই যজ্ঞকে বুঝতে চেয়েছিলেন।'

সে যাক, আমাদের মনে রাখতে হবে, 'অতি-প্রাকৃত বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসের অভাব এবং প্রাকৃতিক কার্য-কারণ সম্পর্কের উপর সহজাত ও অস্ফুট আস্থা সত্ত্বেও জাদুবিশ্বাস আদিম অজ্ঞতারও পরিচায়ক। যে-সাদৃশ্যমূলকতা জাদুর ভিত্তি তা সুদূরপরাহত হতে পারে; বস্তু বহু ক্ষেত্রে তা এমনই সুদূরপরাহত যে আধুনিক মনের কাছে একান্তই অবাস্তব ও আজগুবি বলে প্রতীত হবার কথা। যেমন, বৃষ্টি-জাদুর ক্ষেত্রে হয়তো গাছের উপর এক টুকরো কালো চামড়া টাঙিয়ে তার দিকে তীর ছোঁড়বার আয়োজন : চামড়ার টুকরোটা মেঘের মতো, বাণবিদ্ধ মেঘ বৃষ্টি দিতে বাধ্য হবে। বলাই বাহুল্য, অন্তর্নিহিত মূলসূত্রের দিক থেকে বিজ্ঞানের সঙ্গে সাদৃশ্য সত্ত্বেও আদিম জাদু অবশ্যই বিজ্ঞান নয় এবং এ-জাতীয় কাল্পনিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে প্রকৃতিকে সরাসরি বশ করবার বা বাধ্য করবার কোনো বাস্তব সম্ভাবনা নিশ্চয়ই নেই। তবুও আদিম মানুষের জীবন-সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষায় এই জাদু সম্পূর্ণ নিরর্থক বা নিষ্ফলও নয়।' তাই প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ টমসন (Thomson) বলেছেন– 'It is an illusory technique complementary to the deficiencies of the real technique.' অর্থাৎ, জাদু হলো– বাস্তব কলাকৌশলের অসম্পূর্ণতার পরিপূরক কাল্পনিক কলা-কৌশল।

এ-প্রেক্ষিতে টমসন্ বলতে চেয়েছেন যে, ‘আদিম মানুষের বাস্তব কলাকৌশল অত্যন্ত অনুন্নত; প্রকৃতির উপর তার দখল যৎসামান্য, প্রকৃতি সংক্রান্ত তার জ্ঞানও সেই অনুপাতে নগণ্য। অতএব, এই অবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রয়োজনও অনেক বেশি; তারই অন্তত কিছুটা জোগান জাদুর মধ্যে। কেননা, একমাত্র আদিম যৌথ-জীবনের পটভূমিতেই আদিম জাদুর আদি-তাৎপর্য বুঝতে পারা যাবে : এ-অনুষ্ঠান ব্যক্তি স্বার্থ-প্রণোদিত হতে পারে না, কেননা আদিম সমাজে তার সুযোগ নেই। এবং জাদুর সাহায্যে কামনা সফল হবার– প্রকৃতিকে জয় করবার– যে চিত্র ফুটিয়ে তোলবার আয়োজন তা দলের মধ্যে সঞ্চারিত হলে পুরো দলটির পক্ষে মেতে ওঠবার– অনুপ্রাণিত হবার কথা : শিকারে বেরুবার আগে আদিম শিকারীর দল শিকার-নৃত্যের মাধ্যমে শিকার সফল হবার একটি নকল বা অনুকরণ সৃষ্টি করতে পারলে শিকারী হিসেবে অনেক বেশি দৃঢ়চিত্ত– অতএব সার্থক– হতে পারে। তাই প্রকৃতিকে জয় করবার কৌশল হিসেবে আদিম জাদু একান্ত কাল্পনিক হলেও সম্পূর্ণ নিষ্ফল নয়। এবং তার মূল কারণ হলো, আদিম মানুষের যৌথ-জীবন।’

‘কিন্তু উৎপাদন-কৌশলের অগ্রগতির ফলে আদিম যৌথ জীবনের অবসান হলেও জাদু-বিশ্বাসের রেশ সম্পূর্ণভাবে মুছে যায় না; কিন্তু তখন তার আদি-তাৎপর্য বিপরীতে পর্যবসিত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আদিম জাদু-বিদ্যা ক্রমশই শ্রেণী-স্বার্থ প্রণোদিত শাসক-শ্রেণীর গুহ্য-বিদ্যায় রূপান্তরিত হয় এবং ক্রমশই তা পুরোহিত শ্রেণীর অলৌকিক শক্তি বলে প্রচারিত হয়। এইভাবে প্রাচীন ধর্ম-বিশ্বাসের ও ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে আদিম জাদু-বিশ্বাস ও জাদু-অনুষ্ঠানের বহু পরিচয় টিকে থাকে; কিন্তু ধর্মের অঙ্গ হিসেবে তা একান্তভাবেই অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে জীর্ণ আদিম জাদুর স্মারকমাত্র।’

জাদু সংক্রান্ত এই সাধারণ আলোচনাটুকু বিবেচনায় রেখেই যজ্ঞ-প্রসঙ্গে বৈদিক যজ্ঞের কিছু কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিচার করা যায়।

ইতঃপূর্বে সত্রযাগের কতা উল্লিখিত হয়েছে। এ-অনুষ্ঠান হয় দীর্ঘদিন-ব্যাপী; শেষদিনের আগের দিনটিতে মহাব্রত করা হয়। শাস্ত্রমতে মহাব্রত মানে ‘অন্ন’; অতএব অনুমান হয়, অনুষ্ঠানটি প্রধানতই অন্নকামনা-মূলক ছিলো। মহামহোপাধ্যায় কানে (Kane) এই মহাব্রতের এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। তবে আমাদের এ বর্ণনায় যাবার দরকার নেই। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, মহাব্রতর বৈশিষ্ট্য বলতে কয়েকটি অত্যদ্ভূত এবং সুস্পষ্টভাবেই আদিম অনুষ্ঠান। বর্তমানকালের বিবেচনায় কোন কোন অংশকে– নারী-পুরুষের যৌন-সঙ্গম জনিত অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তিতে– চূড়ান্ত পর্যায়ের আদিরসাত্মক বলেও ভ্রম হতে পারে। কিন্তু বৈদিক যজ্ঞে এ-জাতীয় আপাত-অদ্ভূত অনুষ্ঠান কেন? মহামহোপাধ্যায় কানে মন্তব্য করেছেন,– ‘মহাব্রতর এই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকেই বোঝা যায়, এটি ছিল আদিম অতীতে কোন এক গণ-উৎসব এবং যজ্ঞের ক্লান্তিকর দিনগুলি বা মাসগুলির শেষে শ্রান্তি-বিনোদনের উদ্দেশ্যে পবিত্র বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে এটিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।’

কিন্তু এ-জাতীয় যুক্তির সঙ্গে না আছে প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গতি, না আধুনিক নৃতত্ত্বের। কেননা, দেবীপ্রসাদ এ-প্রসঙ্গে বলেন,– 'ব্রাহ্মণ-সাহিত্য ও সূত্র-সাহিত্য থেকে শুরু করে সুবিশাল মীমাংসা-সাহিত্যের কোথাওই এমন ইঙ্গিতটুকুও নেই যে যজ্ঞানুষ্ঠানের শেষে নাচ-গান জাতীয় কোনো রকম শ্রান্তি-বিনোদনমূলক আয়োজনের অবকাশ থাকতে পারে। বরং যজ্ঞ-প্রসঙ্গে বৈদিক সাহিত্যের মূল কথাই হলো, অনুষ্ঠানের প্রতিটি খুঁটিনাটিরও বিশেষ তাৎপর্য আছে উদ্দেশ্য আছে, গুরুত্ব আছে। পক্ষান্তরে এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে মহাব্রতর আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে কোনো আদিম অতীতের স্মারক বলেই গ্রহণ করতে হবে। এবং যদি তাই হয় তাহলে আদিম মানুষ বা মানুষের আদিম পর্যায় সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে পারা তথ্যের পটভূমিতেই– অর্থাৎ নৃতত্ত্বের আলোতেই– এগুলি ব্যাখ্যা অন্বেষণ করতে হবে। এবং এই অনুষ্ঠানগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই যে আদিম জাদু-অনুষ্ঠানের সুপরিচিত অঙ্গ হওয়াই স্বাভাবিক– আধুনিক নৃতত্ত্ববিদেরা সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবেন না।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৭৬-৭)

এ-ক্ষেত্রে একটি সহজ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, বৈদিক মানুষেরাও অন্যান্য মানুষদের মতোই আদিম অবস্থার নিম্নতম স্তর থেকে শুরু করে ক্রমশ সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং বৈদিক সাহিত্য অমন সুপ্রাচীন বলেই তাঁদের সেই আদিম অবস্থার বহু স্মারক এ-সাহিত্যে টিকে থেকেছে। আধুনিক পৃথিবীতেও যে-সব মানবদল সমতুল্য আদিম অবস্থায় আটকে আছে তাদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে পারা তথ্যের আলোতেই এই স্মারকগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব বলে নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন।
সেক্ষেত্রে অবশ্যই মহাব্রত আদিম জাদু-অনুষ্ঠান নয়। কিন্তু তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যদি আদিম অতীতের স্মারক বলেই বিবেচিত হয় এবং সেগুলিকে যদি নৃতত্ত্বে সুবিদিত আদিম জাদু-অনুষ্ঠান বলেই সনাক্ত করা যায় তাহলে যজ্ঞটির প্রাক্-ইতিহাস হিসেবে আদিম জাদুই অনুমিত হওয়া স্বাভাবিক– পরবর্তী সাহিত্যে তার রূপ যতই পল্লবিত হোক না কেন এবং যতই পরিবর্তিত হোক না কেন তার আদি-তাৎপর্য।

অন্যান্য বৈদিক যজ্ঞের বেলাতেও যে একই কথা প্রযোজ্য তা কয়েকটি সুবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন যজ্ঞকে বিচার করলেই বোঝা যায়।
যেমন, প্রাচীনতম একটি যজ্ঞের নাম অশ্বমেধ। মহামহোপাধ্যায় কানের রচনাতে এই যজ্ঞটির একটি সাধারণ বিবরণী জানা যায়। তবে ঋগ্বেদের রচনাকালেই তা অতীতের অনুষ্ঠান বলে বিবেচিত হয়েছে (ঋগ্বেদ-১/১৬২ ও ১/১৬৩)। পরবর্তীকালের সাহিত্যে (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-৮/২১-২৩ এবং শতপথ-ব্রাহ্মণ-১৩/৫/৪) ঘোষিত হয়েছে, একমাত্র সার্বভৌম সম্রাটই এ যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারবেন এবং অবশ্যই যজ্ঞটির আয়োজনের জন্য এমন বিরাট বিশাল ব্যবস্থাদি উল্লিখিত হয়েছে যে রাজরাজড়া ছাড়া কারুর পক্ষে তা সম্ভব নয়। এই যজ্ঞ সম্পাদনে হাতি থেকে শুরু করে মৌমাছি পর্যন্ত মোট ৬০৯-টি গৃহপালিত ও

বন্য পশু বধের নির্দেশও আছে। কিন্তু এই যজ্ঞানুষ্ঠানেরই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে আদিম অতীতের পরিচায়ক। অধ্যায়ান্তরে প্রাসঙ্গিকভাবে এই যজ্ঞের সেরূপ অনুষ্ঠানের কিছু দৃষ্টান্তের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, যা অবশ্যই অনেকটা পূর্বোক্ত মহাব্রত অনুষ্ঠানের মতোই। কিন্তু অনুষ্ঠানগুলিকে যদি প্রকৃতপক্ষে কোন এক আদিম অতীতের স্মারক বলেই স্বীকার করা হয় তাহলে একমাত্র আদিম মানুষ বা মানুষের আদিম অবস্থা সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে পারা তথ্যের ভিত্তিতেই– অর্থাৎ তুলনামূলক নৃতত্ত্বের পটভূমিতেই– এগুলির ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা সম্ভব হতে পারে। অনেক বিদ্বান গবেষকই এরকম প্রচেষ্টা থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে চেয়েছেন যে পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে যজ্ঞটির রূপান্তর যেমন হোক না কেন, তার পিছনে নৃতত্ত্বে সুবিদিত জাদু-অনুষ্ঠানের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

আর একটি সুপ্রাচীন বৈদিক যজ্ঞের নাম বাজপেয়। যদিও পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ অনুসারে সাম্রাজ্য-কামনায় রাজরাজড়াদের পক্ষেই এই যজ্ঞের আয়োজন, তবুও যজ্ঞটির নামেই প্রকাশ যে অন্ন-কামনাই তার আদি-উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব। বাজপেয় মানে অন্ন ও পানীয়। এবং দেবীপ্রসাদ বলেন,– 'যজ্ঞটির নানা বৈশিষ্ট্য থেকে সহজেই অনুমান হয় যে আদিতে তা জনসাধারণেরই অনুষ্ঠান ছিলো। অন্যান্য সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত বৈদিক যজ্ঞকে বিচার করলেও দেখা যায় যে ব্রাহ্মণাদি পরবর্তী সাহিত্যে সেগুলির রূপান্তর যেমনই হোক না কেন, তা থেকে আদিম জাদুর স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি। বস্তুত, ব্রাহ্মণ সাহিত্যেও যজ্ঞের যে-রূপ সংরক্ষিত হয়েছে তা প্রায়ই আদিম জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৭৯)

.

যজ্ঞের প্রসঙ্গে বিদ্বানদের মধ্যে আরেকটি বিতর্ক হলো– বৈদিক সাহিত্যে আগে জাদু না আগে ধর্ম? সংক্ষেপে কীথ্, ম্যাকডোনেল প্রমুখরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, যজ্ঞের আদি-রূপ ছিলো উপহার-উপচার মূলক, কালক্রমে তা জাদু অনুষ্ঠান মাত্রে পরিণত হয় এবং ব্রাহ্মণ-সাহিত্যই এ-পরিণতির চূড়ান্ত পরিচায়ক। অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আগে ধর্ম, পরে জাদু– ধর্মেরই অবনতি ঘটতে ঘটতে ক্রমশ তা জাদুমাত্রে পরিণত হয়।
স্বভাবতই এখানে নৃতত্ত্ব-স্বীকৃত একটি সাধারণ সত্যকে বর্জন করবার আয়োজন দেখা যায়। দেবীপ্রসাদ এই প্রবণতার প্রতিবাদ করে বলছেন,– 'পৃথিবীর সর্বত্রই যদি ধর্মচেতনা অনিবার্যভাবেই জাদুর পরবর্তী হয় তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার কোনো এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রমকে– শুধু ব্যতিক্রম নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা– সাধারণ মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করে বৈদিক চিন্তা-চেতনার ইতিহাসকে বোঝবার আশা অবশ্যই ক্ষীণ।'

আমরা বরং বৈদিক চিন্তা-চেতনার ইতিহাস প্রসঙ্গে শেষপর্যন্ত যে যৌক্তিক সিদ্ধান্তটি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচ্য বলে মনে করি তা হলো,– 'ধর্ম ও জাদু এক নয়। জাদু-বিশ্বাস প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী চেতনারই পরিচায়ক; তার মূল উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনা এবং যত

অস্ফুট ও অচেতনভাবেই হোক না কেন তার অন্তর্নিহিত বিশ্বাস প্রকৃতির অমোঘ নিয়মানুবর্তিতাই। জাদুর ক্ষেত্রে ঈশ্বরের পরিকল্পনা নেই, প্রকৃতির উপর অলৌকিক শক্তিশালী দেবতাদের কোনো কর্তৃত্ব স্বীকৃত নয়, স্বীকৃত নয় লোকোত্তরের পরিকল্পনা। যজ্ঞের নজির থেকেও বৈদিক চিন্তা-চেতনার আদি-পর্যায়কে অধ্যাত্মবাদী আখ্যা দেবার সুযোগ নেই।'

...

৩.৭ : ব্রহ্মন্ ও মায়া

ঋত-র আলোচনায় আমরা দেখেছি, ঋগ্বেদের প্রাচীন দেবতা বরুণ হলেন ঋত বা সত্য ও ন্যায়ের রক্ষক। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক কবিদের রচনায় বরুণ শুধু ঋত-যুক্ত ও ঋত-র পালকই নন, তিনি মায়া-যুক্ত বা মায়াবীও। স্বভাবতই, এই মায়ার সঙ্গে ঋত-র সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় বলেই অনুমান হয়। ঋগ্বেদে বলা হচ্ছে, চন্দ্রালোকের ঔজ্জ্বল্য যেমন দ্যাবাপৃথিবীর সর্বত্র প্রবেশ করে মিত্রাবরুণের মায়াও সেইরূপ ঋত-র মূলে প্রবেশ করে। যেমন–

ঋৃতস্য বুধ্নঃ ঊষসামিষণ্যন্বৃষা মহী রোদসী আ বিবেশ।
মহীমিত্রস্য বরুণস্য মায়া চন্দ্রেব ভানুং বি দথে পুরুত্রা।। (ঋগ্বেদ-৩/৬১/৭)।
ধর্মণা মিত্রাবরুণা বিপশ্চিতা ব্রতা রক্ষেথে অসুরস্য মায়য়া।
ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বি রাজথঃ সূর্যমা ধত্থো দিবি চিত্র্যং রথম্ ।। (ঋগ্বেদ-৫/৬৩/৭)।
অর্থাৎ :
ঊষাগুলিকে প্রেরণ করতে ইচ্ছুক হয়ে ঋতের মূল বৃষ্টির সাহায্যে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করেছিল; মিত্র ও বরুণের মহতী মায়া চন্দ্রের ন্যায় নিজপ্রভা বহুলভাবে প্রসারিত করেছিল। (ঋক-৩/৬১/৭)।। হে প্রাজ্ঞ মিত্রাবরুণ! তোমরা ধর্মদ্বারা ও অসুরের মায়াদ্বারা যজ্ঞসমূহ রক্ষা কর, ঋতদ্বারা এই বিশ্বভুবনকে দীপ্যমান কর; সুর্যকে তার বিচিত্র রথসহ ধারণ করে থাক। (ঋক-৫/৬৩/৭)।।

এমনকি ইন্দ্রের প্রসঙ্গেও ঋগ্বেদে ঋত-র সঙ্গে মায়ার নিকট সম্পর্ক উল্লিখিত, ঋতবা বা ঋত-যুক্ত ইন্দ্র বারবার মায়া প্রয়োগ করেন–

রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরি স্বাম্ ।
ত্রির্যদ্দিবঃ পরি মুহূর্তমাগাৎ স্বৈর্মন্ত্রৈরনৃতুপা ঋৃতাবা।। (ঋগ্বেদ-৩/৫৩/৮)।
অর্থাৎ :
মঘবা (ইন্দ্র) স্বকীয় শরীর হতে মায়ার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। তিনি ঋতবান হলেও অঋতুতে সোম পান করেন। তিনি স্বকীয় স্তুতি দ্বারা আহূত হয়ে স্বর্গলোক হতে মুহূর্তমধ্যে সবনত্রয়ে যান। (ঋক-৩/৫৩/৮)।।

তবে অবশ্যই ইন্দ্রের এই গরিমা-বর্ণন যে প্রাচীন বরুণের অনুকরণমাত্র, ঋগ্বেদের অন্যত্র তা স্পষ্টই উক্ত হয়েছে–

ত্বং শর্ধায় মহিনা গৃণান উরু কৃধি মঘবঞ্ছগ্ধি রায়ঃ।
ত্বং নো মিত্রো বরুণো ন মায়ী পিত্বো ন দস্ম দয়সে বিভক্তা।। (ঋগ্বেদ-১০/১৪৭/৫)।
অর্থাৎ :
বল পাবার জন্য তোমাকে বিশিষ্টরূপে স্তব করা হয়, তুমি বিপুল বল প্রদান কর; হে প্রিয়দর্শন ইন্দ্র! মিত্রাবরুণের ন্যায় মায়া-যুক্ত হয়ে তুমি আমাদের ধন দাও, আমাদের অন্নদাতা ও অন্নের বিভাগকর্তা হও। (ঋক-১০/১৪৭/৫)।।

ঋত ও বরুণের সঙ্গে মায়ার এ-জাতীয় সম্পর্ক থেকে স্বভাবতই অনুমান করা হয়, ঋত-হীন নতুন পরিস্থিতিতে বরুণের গরিমা-অবসানের সঙ্গে মায়ারও অর্থবনতি ও নিন্দা সুপরিস্ফুট হওয়াই স্বাভাবিক। এবং এই যুক্তিতে, বৈদিক সমাজ-ইতিহাসে যে-মৌলিক পরিবর্তনের পরিণামে বৈদিক চিন্তাক্ষেত্রে এই পরিবর্তন, তারই মধ্যে বৈদিক ঐতিহ্যে ভাববাদের উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ, বস্তুত ঋগ্বেদে মায়ার এই ইতিহাসকে অনুসরণ করেই বৈদিক ঐতিহ্যে ভাববাদের আবির্ভাব অনুধাবন করা যেতে পারে। তবে এ-ইতিহাস বোঝবার পক্ষে প্রথমে ঔপনিষদিক বা বৈদান্তিক চিন্তাক্ষেত্রে খুব সংক্ষেপে মায়ার তাৎপর্য বিচার করে পরে ঋগ্বেদের সাক্ষ্যগুলিতে প্রত্যাবর্তন করলে আলোচনাটা সুবিধাজনক হতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনা-রীতি অনুসরণ করতে পারি।

.

মায়া :

উপনিষদ্ বা বেদান্তর উপর একান্ত নির্ভরশীল দার্শনিক সম্প্রদায়ের নাম বেদান্ত বা উত্তর-মীমাংসা। উত্তর-মীমাংসার নানা উপসম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বৈত-বেদান্তই সর্ব-বিখ্যাত এবং শঙ্করাচার্যই তার প্রকৃষ্টতম ব্যাখ্যা দিয়েছেন বলে তাকে প্রায়ই শঙ্কর-মত নামে উল্লেখ করা হয়। এই শঙ্কর-মতের সর্ববিদিত নামান্তর হলো 'মায়া-বাদ'। শঙ্কর-মতের মূল বক্তব্যটা হচ্ছে–

'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'।। (শাঙ্করভাষ্য)।
অর্থাৎ : ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মস্বরূপ।

এ-মতবাদের প্রধানতম প্রতিপাদ্য হলো, এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং এই ব্রহ্মণ্ বিশুদ্ধ 'অহং' বা আত্মনের সঙ্গে অভিন্ন। স্বভাবতই, সাধারণ অভিজ্ঞতায় জানা পরিদৃশ্যমান জগৎ সত্য হতে পারে না। অতএব শঙ্কর-মতে তা অবিদ্যা বা অজ্ঞানেরই ফল– রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো বা শুক্তিতে রজতভ্রমের মতো অজ্ঞানের ফলেই আত্মান্ বা ব্রহ্মন্-এ জগৎ-ভ্রম হয়। অবিদ্যা বা অজ্ঞানেরই নামান্তর মায়া।

যদিও শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সমস্ত দার্শনিক দাবি করেন, উক্ত মত একান্তভাবেই উপনিষদ-প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আধুনিক বিদ্বানেরা প্রশ্ন তুলেছেন, এ-দাবি কি সত্যিই বস্তুনিষ্ঠ? উপনিষদ্-গুলিতে কি বাস্তবিকই এই মায়া-বাদই প্রস্তাবিত হয়েছে?
এই প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ হলো, উপনিষদ্-গুলি আধুনিক অর্থে দার্শনিক রচনা নয়; নানা প্রসঙ্গে নানা রকম দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা থাকলেও সে আলোচনাকে সুসংবদ্ধ যুক্তি-তর্ক প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক রূপ দেবার পরিচয় নেই। বিভিন্ন উপনিষদে– এমনকি একই উপনিষদে সংকলিত বিভিন্ন অংশে– সে যুগের বিভিন্ন চিন্তাশীল প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন তত্ত্বই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এইসঙ্গেই মনে রাখা দরকার, সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, এ-জাতীয় সমস্ত তত্ত্বের উপরই সমান গুরুত্ব আরোপিত হয়নি। অর্থাৎ, ওই বহুবিধ এবং

বিচিত্র তত্ত্বের মধ্যে তত্ত্ব-বিশেষের উপরই বারবার এবং নানাভাবে গুরুত্ব আরোপণের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এ-জাতীয় তত্ত্ব-বিশেষ বলতে প্রধানতই ব্রহ্মন্ ও আত্মন্-এর অভিন্নত্ব।

কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, উত্তর-মীমাংসা সম্প্রদায়ের প্রত্যেক দার্শনিকই সামগ্রিক বা অখণ্ডভাবে উপনিষদ্-সাহিত্যকে অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত বলে দাবি করেছেন এবং প্রমাণ করতে চেয়েছেন তাঁর নিজস্ব প্রতিপাদ্য তত্ত্বই প্রকৃতপক্ষে ঔপনিষদিত তত্ত্ব। অর্থাৎ, উপনিষদের কোথাও তত্ত্বান্তরের স্থান নেই। বলা বাহুল্য, এ-রকম দাবি অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়; কেননা– বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত উপনিষদ্-বাক্যকেই এক অভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের প্রতিপাদক বলে প্রমাণ করবার দাবি– বাস্তবিকই অসম্ভব।
থিব (Thibaut) প্রমুখ কারও কারও মতে, বড় জোর দু'একটি উপনিষদ্-বাক্যের সংশয়মূলক ব্যাখ্যার মধ্যে এই মায়াবাদের আভাস আবিষ্কার করা সম্ভব, যদিও জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার চূড়ান্ত অদ্বৈতমূলক তত্ত্ব উপনিষদে সরল, সুস্পষ্ট ও অবধারিতভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। তার মানে, তাঁরা বলতে চান, উপনিষদে মায়াবাদের পরিচয় নেই, কিন্তু অবধারিতভাবেই দেখানো হয়েছে জীবাত্মা ও পরমাত্মার– বা, আত্মন্ ও ব্রহ্মন্-এর– অদ্বৈত। কিন্তু এ-রকম মন্তব্য দার্শনিক বিচারে স্বীকারযোগ্য হতে পারে না। কেননা, উক্ত আত্মন্-ব্রহ্মন্ এর অদ্বৈতমূলক তত্ত্বের অনিবার্য অনুসিদ্ধান্ত আলোচ্য মায়াবাদই।

অতএব, দেবীপ্রসাদের মতে,– 'যদি স্বীকার করা হয় উপনিষদে ব্রহ্মন্-আত্মন্-এর অদ্বৈতমূলক তত্ত্ব অবধারিত ভাবেই প্রতিপাদিত হয়েছে তাহলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে শঙ্করাচার্য উক্ত তত্ত্বের অনিবার্য অনুসিদ্ধান্তটির– অর্থাৎ, মায়াবাদের– ব্যাখ্যা করে উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য প্রধানতম দার্শনিক তত্ত্বরই পূর্ণাঙ্গ পরিণতি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ উপনিষদে মায়াবাদের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকলেও অন্তত মায়াবাদের মূল দার্শনিক শর্ত– মায়াবাদের বীজ– অবশ্য স্বীকার্য। তাই উপনিষদে মায়াবাদ নেই, এ-জাতীয় মন্তব্য অতিসারল্যেরই পরিচায়ক হবে।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-১৯৮)

প্রাসঙ্গিকভাবেই এবার ঋগ্বেদে এই মায়া'র প্রাক্-ইতিহাসটুকু পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

প্রাচীন বৈদিক কবিরা যে অবশ্যই মায়া শব্দটির সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, বলা বাহুল্য, বৈদান্তিক অর্থে মায়াবাদ তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বস্তুত,– 'মায়া শব্দটির প্রাক্-ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায় যে তা জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়-মূলক কোনো সুপ্রাচীন ধারণারই পরিচায়ক। শব্দটির আদি-অর্থ বিচারে অবশ্যই আমাদের প্রধান সহায় নিঘণ্টু। নিঘণ্টু-মতে (নিঘণ্টু-৩/৯) মায়া একটি প্রজ্ঞা-বাচক শব্দ; মায়া মানে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা বলতে আমরা সাধারণত বুঝি জ্ঞান। কিন্তু এ-বিষয়ে নিঘণ্টু থেকে আরও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা নিঘণ্টু-মতে প্রজ্ঞার আর একটি প্রতিশব্দ বলতে ধী (নিঘণ্টু-৩/৯) এবং এই

ধী শব্দটি কর্মনামেরও অন্তর্গত (নিঘণ্টু-২/১); ধী মানে কর্মও। স্বভাবতই অনুমান হয়, প্রাচীন বৈদিক কবিরা আধুনিক অর্থে কর্ম-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞানবলে কোনো কিছুর প্রশংসা শেখেননি; কঠোর জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন এই কবিদের কাছে সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান যা কিনা কর্মনির্বাহর বা কর্মপরিচালনার সহায়ক। নিঘণ্টু-তেই এ-অনুমানের আরো সমর্থন পাওয়া সম্ভব। কর্মের আর একটি প্রতিশব্দ ক্রতু (নিঘণ্টু-২/১); এই শব্দটিই আবার প্রজ্ঞা-নাম তালিকার অন্তর্ভুক্ত (নিঘণ্টু-৩/৯)। তেমনি শচী শব্দটি প্রজ্ঞা-নাম (নিঘণ্টু-৩/৯) এবং কর্ম-নাম (নিঘণ্টু-২/১) উভয়ই। শব্দ-ব্যবহারের এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্য উপেক্ষণীয় নয়; প্রাচীন কবিদের চেতনায় জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি; অতএব প্রজ্ঞা-বাচক মায়া শব্দটির মধ্যেও জ্ঞান ও কর্মের কোনো আদিম সমন্বয় অনুমেয়। এবং জ্ঞান ও কর্মের আদিম সমন্বয়-মূলক বলেই মায়া শব্দের মধ্যে আদিম জাদুর ইঙ্গিত থাকাও স্বাভাবিক।’- (ভারতীয় দর্শন, দেবীপ্রসাদ, পৃষ্ঠা-১৯৮)

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ঋগ্বেদেই ‘মায়া’ শব্দের একটি ইতিহাস চোখে পড়ে এবং সে-ইতিহাসের মূলকথা হলো একদা-গরিমা-মণ্ডিত প্রজ্ঞা-কর্ম সূচক ওই প্রাচীন ধারণার ক্রমাধঃপতন। এই ইতিহাসটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। কীরকম?
নিঘণ্টুর ব্যাখ্যায় নিরুক্তে (নিরুক্ত-৩/৯) বলা হয়েছে, মান বা পরিমাণ করা অর্থে মাঙ্ ধাতু থেকে মায়া শব্দের নিষ্পত্তি; এবং–
‘মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তে অনয়া পদার্থাঃ’। (নিরুক্ত-৩/৯)
অর্থাৎ : যার সাহায্যে পদার্থদের পরিচ্ছন্ন রূপদান করা হয় তাইই মায়া।
এবং এই অর্থে মায়ার ব্যবহার হিসেবে নিরুক্তকার ঋগ্বেদের নিম্নোক্ত নজির উদ্ধৃত করেছেন–
‘মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিঃ।’
বিদুষ্টে তস্য মেধিরাস্তেষাং শ্রবাংস্যুত্তির।।- (ঋগ্বেদ-১/১১/৭)।
‘ইমামূ নু কবিতমস্য মায়াং মহীং দেবস্য নকিরা দধর্ষ।’
একং যদুদ্না ন পৃণন্ত্যেনীরাসিঞ্চন্তীরবনয়ঃ সমুদ্রম্ ।।- (ঋগ্বেদ-৫/৮৫/৬)।
অর্থাৎ :
‘হে ইন্দ্র, তুমি তোমার মায়াসকলের দ্বারা মায়াবী শুষ্ম-কে হত্যা করেছিলে।’ মেধাবীগণ তোমার মহিমা জানে, তাদের অন্ন বর্ধন কর। (ঋক-১/১১/৭)।। ‘কবিশ্রেষ্ঠ (কবিতমঃ) বরুণের মহান মায়াকে কেউ হিংসা বা খণ্ডন করতে পারে না।’ তাঁরই কারণে শুভ্র, বারিমোক্ষণকারী নদীসমূহ বারিদ্বারা একমাত্র সমুদ্রকে পরিপূর্ণ করতে পারে না। (ঋক-৫/৮৫/৬)।।

ঋক্-দুটিতে উদ্ধৃতি-চিহ্নর মাধ্যমে নিরুক্তকারের উদ্ধৃতি চিহ্নিত করা হয়েছে। ঋক্-দুটির পূর্ণাঙ্গ তাৎপর্য যাই হোক না কেন, এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এখানে মায়া শব্দ ব্যবহারের মধ্যে পরবর্তীকালের অবিদ্যা বা অজ্ঞান অর্থে নিন্দিত তাৎপর্যের আভাসও নেই। এভাবে

অন্যান্য বহু দৃষ্টান্তেও দেখা যায় বৈদিক কবিদের সমস্ত পৌরাণিক কল্পনা সত্ত্বেও ওই প্রাচীন প্রজ্ঞা-কর্মবাচক ধারণাটি নিয়ে করিরা কতো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। যেমন–

অগ্নে ভূরীণি তব জাতবেদা দেব স্বধাবোহমৃতস্য নাম।
যাশ্চ মায়া মায়িনাং বিশ্বমিন্ব তে পূর্বীঃ সন্দধুঃ পৃষ্টবন্ধো।। (ঋগ্বেদ-৩/২০/৩)।
স প্রাচীনান্ পর্বতা দৃংহদোজসাধরাচীনম্ অকৃণোদপামপঃ।
অধারয়ৎ পৃথিবীং বিশ্বধায়সমস্তভ্নান্ মায়য়া দ্যামবস্রসঃ।। (ঋগ্বেদ-২/১৭/৫)।
যো বো মায়া অভিদ্রুহে যজত্রাচ পাশা আদিত্যা রিপবে বিচৃত্তাঃ।
অশ্বীব তা অতি যেষং রথেনারিষ্টা উরাবা শর্মন্ত্স্যাম।। (ঋগ্বেদ-২/২৭/১৬)।
স বহ্নিঃ পুত্রঃ পিত্রোঃ পবিত্রবান্ পুনাতি ধীরো ভুবনানি মায়য়া।
ধেনুঞ্চ পৃশ্নিং বৃষভং সুরেতসং বিশ্বাহা শুক্রং পয়ো অস্য দুক্ষত।। (ঋগ্বেদ-১/১৬০/৩)।
হোতা দেবো অমর্ত্যঃ পুরস্তাদেতি মায়য়া। বিদথানি প্রচোদয়ন্ ।। (ঋগ্বেদ-৩/২৭/৭)।
অর্থাৎ :
হে দ্যোতমান, জাতবেদা, মরণরহিত, অন্নবান অগ্নি! দেবতাগণ তোমাকে অনেক তেজ প্রদান করেছেন। হে বিশ্বের তৃপ্তিকারী, প্রার্থিত ফলদায়ী অগ্নি! মায়াবীগণের প্রাচীন মায়া সমস্ত তোমাতেই আছে। (ঋক-৩/২০/৩)।। ইন্দ্র মায়াবলে ইতস্তত গমনকারী পর্বতসমূহকে অচল করেছেন, মেঘস্থিত জলরাশি অধোমুখে প্রেরণ করেছেন, বিশ্বধাত্রী পৃথিবীকে ধারণ করেছেন এবং দ্যুলোককে পতন হতে রক্ষা করেছেন। (ঋক-২/১৭/৫)।। আদিত্যগণের মায়া তাঁদের পাশকে দ্রোহকারী শত্রুদের প্রতি প্রসারিত করে; আমি যেন অশ্বারোহী পুরুষের ন্যায় তা অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারি। (ঋক-২/২৭/১৬)।। (দ্যাবাপৃথিবী স্বরূপ) পিতামাতার পুত্র বহ্নি (অগ্নি) পবিত্র, ধীর; তিনি মায়ার দ্বারা ভুবনসমূহকে পবিত্র করেন; তিনি চিরকাল ধরে শুক্লবর্ণ গাভী এবং শোভন রেতঃযুক্ত বৃষভ হতে শুক্র এবং দুগ্ধ দোহন করেন। (ঋক-১/১৬০/৩)।। দেবতা অগ্নি, যিনি হোতা ও অমর, তিনি মায়াগুলির সাথে বিচরণ করেন এবং বিদথগুলিকে অনুপ্রাণিত করেন। (ঋক-৩/২৭/৭)।।

শুধু দেবতাই নয়, পার্থিব বস্তুর প্রসঙ্গেও ঋগ্বেদে এই মায়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন–

ন যে দিবঃ পৃথিব্যা অন্তমাপু র্ন মায়াভি র্ধনদাং পর্ষভূবন্ ।
যুজং বজ্রং বষৃভশ্চক্র ইন্দো নির্জ্যেতষা তমসো গা অদুক্ষৎ।। (ঋগ্বেদ-১/৩৩/১০)।
অর্থাৎ :
যখন জল মায়াগণের সাহায্যে (মায়াভিঃ) পৃথিবীর অন্ত প্রাপ্ত হলো না এবং ধনপ্রদ ভূমির উপর বিস্তৃত হলো না তখন বর্ষণকারী ইন্দ্র হস্তে বজ্র ধারণ করলেন এবং দ্যুতিমান (বজ্র) দ্বারা অন্ধকার রূপ (মেঘ) হতে পতনশীল (জল) নিঃশেষিতরূপে দোহন করলেন। (ঋক-১/৩৩/১০)।।

এই ঋকের ‘ভাষ্যে টীকাকার সায়ণ বলছেন, “ধনদাম্” মানে “ধনপ্রদাং ভূমিং”; স্বভাবতই এখানে আকাশের জলে জমির উর্বরতা-প্রাপ্তি উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো,

বৈদিক কবিদের কল্পনায় জলের এই উর্বরতা-দায়িনী শক্তিও আসলে জলের মায়া। সায়ণ তাই এখানে ‘মায়াভিঃ’ শব্দের অর্থ করেছেন– ‘শস্যোপকারাদিভিঃ কর্মভিঃ’, শস্যের উপকারী কর্মসমূহের দ্বারা। অতএব এই দৃষ্টান্তটি থেকেই অনুমান হয় প্রাচীন কবিরা মায়া বলতে এমনকি প্রাকৃতিক কর্মশক্তিকেও বুঝতে দ্বিধা করেন নি; সর্বকর্মের মূলেই মায়া, অতএব জলের ওই উর্বরতা-দায়িনী শক্তিও জলের মায়া বলে বিবেচিত।’- (ভারতীয় দর্শন, দেবীপ্রসাদ, পৃষ্ঠা-১৯৯)

কিন্তু আগেও বলা হয়েছে, ঋগ্বেদে এ-জাতীয় নানা প্রসঙ্গে মায়ার প্রশংসা পাওয়া গেলেও এই মায়া মূলতই বরুণ– বা মিত্রাবরুণের– বিশেষ শক্তি বলেই কল্পিত। যেমন–
ইমামূ ষ্বাসুরস্য শ্রুতস্য মহীং মায়াং বরুণস্য প্র বোচম্ ।
মানেনেব তস্থিবা অন্তরীক্ষে বি যো মমে পৃথিবীং সূর্যেণ।। (ঋগ্বেদ-৫/৮৫/৫)।
মায়া বাং মিত্রাবরুণা দিবি শ্রিতা সূর্যো জ্যোতিশ্চরতি চিত্রামায়ুধম্ ।
তমভ্রেণ বৃষ্ট্যা গূহথো দিবি পর্জন্য দ্রপ্সা মধুমন্ত ঈরতে।। (ঋগ্বেদ-৫/৬৩/৪)।
রেবদ্বয়ো দধাথে বেবদাশাথে নরা মায়াভিরিত উতি মাহিনম্ ।
ন বাং দ্যাবো হভির্নোত সিন্ধবো ন দেবত্বং পণয়ো নানাশুর্মঘম্ ।। (ঋগ্বেদ-১/১৫১/৯)।
অর্থাৎ :
প্রসিদ্ধ অসুর বরুণের সেই সুমহতী মায়ার কথা বলছি, যার সাহায্যে তিনি সূর্যদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ করেছিলেন। (ঋক-৫/৮৫/৫)।। হে মিত্রাবরুণ, তোমদের মায়া স্বর্গকে আশ্রয় করেছে এবং সূর্যরূপে বিচিত্র আয়ুধ হয়ে তা অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করছে। তোমাদের ইচ্ছাক্রমে মেঘ ও বৃষ্টিদ্বারা সুমধুর বারিবিন্দু সকল পতিত হয়। (ঋক-৫/৬৩/৪)।। হে ধনবিশিষ্ট অন্নপ্রদানকারী মিত্রাবরুণ, তোমাদের ধনবিশিষ্ট অন্ন প্রচুর এবং তা মায়া দ্বারা রক্ষিত। দিবস বা রাত্রি তোমার দেবত্ব প্রাপ্ত হয়নি, নদীগণও তোমার দেবত্ব প্রাপ্ত হয়নি, পণিরাও প্রাপ্ত হয়নি; তারা তোমার দানও প্রাপ্ত হয়নি। (ঋক-১/১৫১/৯)।।

এমন দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদে আরও প্রচুর আছে। বৈদিক কবিরা যে কোন-এক কালে জ্ঞান-কর্মের সমন্বয়মূলক ওই আদিম ধারণাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করেছিলেন, উপরোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিই তার প্রমাণ হিসেবে পর্যাপ্ত। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, বৈদিক ঐতিহ্যেই এই মায়ার গৌরব ক্রমশ ম্লান হতে দেখা যায় এবং এমনকি ঋগ্বেদের রচনাকালেই মায়া শেষ পর্যন্ত বন্ধ্যা ও নিষ্ফল বলে নিন্দিত হয়েছে! ঋগ্বেদের দর্শম মণ্ডলেই দেখা যায় মায়া যেন বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে– যে-মায়া দেবতাদের প্রধানতম কর্ম-কৌশল ছিলো, সেই মায়াই নিষ্ফল ও বন্ধ্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যেমন–
উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু।
অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবা অফলামপুষ্পাম্ ।। (ঋগ্বেদ-১০/৭১/৫)।
অর্থাৎ :
(হে বৃহস্পতি) তুমি এই সখ্যে স্থির নিশ্চয় হয়েছো, কেউ আর সংগ্রামে তার অনুগমন করে

না। সে ব্যক্তি ধেনুহীন হয়ে মায়ার দ্বারা বিচরণ করে, সে নিষ্ফল পুষ্পবিহীন বাক্য শ্রবণ করে। (ঋক-১০/৭১/৫)।।

এই ঋকটি ঋগ্বেদের একটি অতি অর্বাচীন সূক্তের অন্তর্গত এবং এতোটা অর্বাচীন বলেই আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তও বটে। কেননা এর সাহায্যে বৈদিক চিন্তা-বিবর্তনের প্রসঙ্গে মায়ার যে ইতিহাস উপেক্ষিত তা গ্রন্থিত হতে পারে। এ-প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ বলেন,– 'আমাদের যুক্তি হলো, যে-মূল সমাজ-বিবর্তনের পটভূমিতে আমরা বৈদিক চিন্তা-বিবর্তন বোঝবার প্রস্তাব করেছি তারই মধ্যে মায়ার এই অত্যাশ্চর্য ইতিহাসটিকেও বোঝবার মূলসূত্র পাওয়া যাবে এবং সেই মূলসূত্র অনুসারেই বৈদিক ঐতিহ্যে ভাববাদের আবির্ভাব ব্যাখ্যাত হতে পারে।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-২০০)

.
ভাববাদের আবির্ভাব :
ভাববাদ হলো চেতনকারণ-বাদ। এই ভাববাদ বা চেতনকারণবাদের মূল কথা কী? চিন্তা বা ধারণা বা জ্ঞান– বা সংক্ষেপে, কোনো এক চেতন-পদার্থই– পরম সত্য বা চরম সত্তা। যা কিছু বাস্তব তা এই চেতনার উপর নির্ভরশীল হিসেবে,– চেতনার দাবি মিটিয়ে– তবেই বাস্তব; চেতন-নিরপেক্ষ অর্থে কিছুই সত্য নয়। যদিও অবশ্যই দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ বা চেতনকারণবাদের রূপ সর্বত্র এক নয়, কিন্তু আলোচ্য যুক্তি চেতনকারণবাদী মাত্রেরই সাধারণ স্বীকৃতি; তারই কাঠামোর ভিতর বিভিন্ন ভাববাদী বিভিন্নভাবে তাঁদের মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন।

বোঝাই যায়, এই মতবাদ অনুসারে চেতনাই সর্বশক্তিমান, স্রষ্টার মতো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মানুষের মাথায় বা চিন্তায় এ-জাতীয় ধারণার উদ্ভবের বাস্তব শর্ত কী? দেবীপ্রসাদ বলছেন– 'জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছেদ বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রশংসা ও কর্ম বা শ্রমের নিন্দা। কেননা কর্ম বস্তুতন্ত্র; কর্মের মধ্যে বহির্বাস্তবের অবধারিত যাথার্থ্যের অনিবার্য স্বীকৃতি। তাই কর্ম-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞান বহির্জগতের যথার্থ্য– স্বীকৃতির– দায়মুক্ত; তার কাছে চেতনাই সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা, চরম সত্য।
আদিম যৌথ-জীবনের পর্যায়ে এ-জাতীয় ধ্যানধারণার আবির্ভাব সম্ভব নয়। কেননা তার মূলে উৎপাদন-শক্তির দৈন্য, সকলের মিলিত প্রচেষ্টাতেই সমগ্র গোষ্ঠীর জীবন-ধারণ সম্ভব। সংক্ষেপে, সকলে অনিবার্যভাবেই যৌথ শ্রমের অংশীদার। তাই এ-অবস্থায় কারুর পক্ষেই শ্রম-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ চিন্তার বা জ্ঞানের সুযোগ নেই; বস্তুত জ্ঞান বলতে যেটুকু তাও জীবন-সংগ্রামেরই অঙ্গ। কিন্তু উৎপাদন-শক্তির ক্রমোন্নতির ফলে ক্রমশ সুস্পষ্ট হয় শ্রম-বিভাগ এবং শ্রম-বিভাগ বিকাশের একটি পর্যায়ে মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বিচ্ছেদ দেখা দেয়। কেননা মানবসমাজ ক্রমশ শাসনভুক্ত হয় এক উদ্বৃত্তজীবী শ্রেণীর– কায়িক শ্রমের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তার উপর নেই; কিন্তু তারই পরিকল্পনা– চিন্তা-চেতনা– অনুসারে সমগ্র

সমাজ পরিচালিত। পক্ষান্তরে কায়িক শ্রমের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব যে শ্রেণীর উপর সে-শ্রেণী সামাজিকভাবে মর্যাদা-শূন্য,– দাস বা ক্রীতদাস বা শূদ্র। অতএব এই পর্যায়ে শুধু যে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে বিভেদ সুস্পষ্ট হয় তাই নয়– সুপরিস্ফুট হয় জ্ঞানের গৌরব ও কর্মের নিন্দা; সংক্ষেপে ভাববাদ আবির্ভাবের শর্ত।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-২০০)

ভাববাদ প্রসঙ্গে এই মূলগুলি মনে রেখে এবার বৈদিক সাহিত্যের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বিচারে প্রত্যাবর্তন করা যেতে পারে।
ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে একটি অর্বাচীন সূক্ত (ঋগ্বেদ-১০/৭১) সংকলিত হয়েছে। এর রচয়িতা হিসেবে উল্লেখ আছে বৃহস্পতি ঋষি। কিন্তু সূক্তটি কোন্ দেবতার স্তুতিতে রচিত? সূক্তটির দেবতা ব্যাখ্যায় টীকাকার সায়ণাচার্য বলছেন, এই সূক্তের সাহায্যে ঋষি পরমপুরুষার্থ সাধক পরব্রহ্মজ্ঞানের স্তুতি করেছেন। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি 'বৃহদ্দেবতা' উদ্ধৃত করে বলছেন, এই সূক্তে বৃহস্পতি সেই জ্ঞানের স্তুতি করেছেন যা সুজ্যোতি : পরব্রহ্মের ন্যায় যোগের সাহায্যে সর্ব-উদ্ভাসক। এবং সর্বানুক্রমণীতেও উক্ত হয়েছে, বৃহস্পতি নয়টি ঋকের এই সূক্তে বৃহস্পতির জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। স্বভাবতই, আধুনিক বিদ্বানেরা 'জ্ঞান'-কেই এ-সূক্তের দেবতা বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ, সমগ্র সূক্তটিই জ্ঞানেরই স্তুতিমাত্র। তাই হয়তো ঋগ্বেদ-সংহিতার মুদ্রিত গ্রন্থে এই সূক্তটির শীর্ষে স্তুত দেবতার নাম হিসেবে লেখা রয়েছে ব্রহ্মজ্ঞান দেবতা।

বলাই বাহুল্য, দেবতা হিসেবে এ-জাতীয় অমূর্ত ধারণার পরিকল্পনা থেকেই প্রমাণ হয় সূক্তটি কতো অর্বাচীন। দেবীপ্রসাদ বলছেন,– 'নিঘণ্টুর দেবতালিকায় এ-হেন কোনো অর্বাচীন দেব-পরিকল্পনার স্থান প্রত্যাশা করা যায় না এবং তা নেইও। অতএব সিদ্ধান্ত হয়, ঋগ্বেদে সংকলিত হলেও বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই প্রশস্তি পরবর্তী কালের চিন্তারই পরিচায়ক। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, সেই কালের কবিরা সুপ্রাচীন মায়া-র প্রতি কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন? নিম্নোক্ত ঋক্-টি থেকে এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে', যা ইতঃপূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে–
উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু।
অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবা অফলামপুষ্পাম্ ।। (ঋগ্বেদ-১০/৭১/৫)।
অর্থাৎ :
(হে বৃহস্পতি) তুমি এই সখ্যে স্থির নিশ্চয় হয়েছো, কেউ আর সংগ্রামে তার অনুগমন করে না। সে ব্যক্তি ধেনুহীন হয়ে মায়ার দ্বারা বিচরণ করে, সে নিষ্ফল পুষ্পবিহীন বাক্য শ্রবণ করে। (ঋক-১০/৭১/৫)।।
তবে অন্য কোন উৎস হতেই হয়তো দেবীপ্রসাদ উক্ত ঋক্-টির যে তর্জমা উপস্থাপন করেছেন, তা হলো–
'তুমি (হে জ্ঞান) অন্নসমূহে স্থিরসখ্য (লাভ করিয়াছ) এবং তোমাকে কেন হিংসা করে না। অন্যে (জ্ঞানহীন পুরুষ) ধেনুবিহীন এবং নিষ্ফল ও নিষ্পুষ্প ("অফলাম্ অপুষ্পাম") বচন শ্রবণ করিতে করিতে মায়ার সহিত বিচরণ করে।'- (ঋগ্বেদ-১০/৭১/৫)।।

কিন্তু দুটি ভিন্ন ভিন্ন তর্জমা হলেও তর্জমাগুলিতে ঋকটি সম্বন্ধে কোন অর্থগত বিরোধ তৈরি হয়নি, বরং বোঝবার জন্য সুবিধাই হয়েছে বলা যায়। সেক্ষেত্রে জ্ঞান ও মায়ার মধ্যে প্রভেদ– এমনকি বিরোধও– এই ঋকের বক্তব্যে সুস্পষ্ট। এবং জ্ঞানই সুপ্রতিষ্ঠিত, মায়া বৃথা ও বন্ধ্যা বলে নিন্দিত। এই ঋক্-এর 'অফলাম্ অপুষ্পাম্'-এর ব্যাখ্যায় টীকাকার সায়ণ বলছেন–

'যথা বন্ধ্যা পীনা গৌঃ কিং দ্রোণমাত্রং ক্ষীরং দোগ্ধীতি মায়ামুৎপাদয়ন্তী চরতি যথা বন্ধ্যো বৃক্ষোহকালে পল্লবাদিযুক্তঃ সন্ পুষ্প্যতি ফলতীতি ভ্রান্তিমুৎপাদয়ং-স্তিষ্ঠতি তথা'- (সায়ণভাষ্য-ঋগ্বেদ-১০/৭১/৫)

অর্থাৎ :

যেমন পীন বা স্থূল কিন্তু বন্ধ্যা গাভী এই ভ্রান্তি উদ্রেক করে যে তা থেকে অন্তত কিছু দুধ পাওয়া যাবে, কিংবা, কখনও পল্লব-সঞ্চার হয় বলে বন্ধ্যা বৃক্ষ এই ভ্রান্তি উদ্রেক করে যে তা পুষ্পিত হয়ে উঠবে,– সেইভাবেই উক্ত ব্যক্তি (বন্ধ্যা মায়ার সঙ্গে) বচন উচ্চারণ করতে করতে বিচরণ করে।

অতএব জ্ঞান-প্রশস্তির এই পটভূমিতে মায়া শুধু বন্ধ্যা নয়, ভ্রান্ত-সঞ্চারকও। এটুকু বিবেচনা করলে বলা যেতেই পারে, অদ্বৈত-বেদান্তের অনির্বচনীয় অবিদ্যার পরিকল্পনা হয়তো আর সুদূরপরাহত নয়। তবে অন্তত একটা বিষয় মনে হয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'উপনিষদ্'-এর শব্দার্থ গোপন বা গুহ্য জ্ঞান এবং ঋগ্বেদের আলোচ্য সূক্তে যে-জ্ঞানের প্রশস্তি তা ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর গোপন জ্ঞান বলেই ঘোষিত। যেমন এই সূক্তেরই একটি ঋক-এ বলা হচ্ছে–

হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু যদ্-ব্রাহ্মণাঃ সংর্যজন্তে সখায়ঃ।
অত্রাহ ত্বং বি জহুর্বেদ্যাভিরোহব্রহ্মাণো বি চরন্ত ত্বে।। (ঋগ্বেদ-১০/৭১/৮)।

অর্থাৎ :

সখ্যভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ যখন তীক্ষ্ণ মনে ('মনসো জবেষু') পরিতুষ্ট আলোচনার্থে সমবেত হন (তখন তাঁহার) সেই (অজ্ঞ) ব্যক্তিকে বেদি হইতে বহিষ্কার করেন এবং তাঁহারা বেদঞ্জন বলিতে বলিতে বিচরণ করেন। (ঋক-১০/৭১/৮)।।

তার মানে, এখানে গুহ্য-জ্ঞানের সংরক্ষক ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর আবির্ভাব সুস্পষ্ট। এবং মনে রাখা প্রয়োজন, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশে তার পরিচয় নেই। কিন্তু, দেবীপ্রসাদ বলেন, আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, বেদজ্ঞান আলোচনার জন্য সমবেত ওই ব্রাহ্মণেরা যে ব্যক্তিকে বেদি থেকে দূর করে দিলেন সেই ব্যক্তিটির পরিচয় কী বা অপসৃত হয়ে লোকটি কোথায় গেলো? যদি দেখা যায়, জ্ঞান-চর্চার পরিবেশ থেকে বহিষ্কৃত এই ব্যক্তিটি যাদের উপর কায়িক শ্রমের দায়িত্ব তাদেরই দলভুক্ত হচ্ছে তাহলে স্বীকার করতে হবে ঋগ্বেদের এই অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে আমাদের মূল যুক্তির অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সমর্থন পাওয়া সম্ভব। অতএব অব্যবহিত পরবর্তী ঋক্-টি বিচার করা যাক :

ইমে যে নার্বাঙ্ ন পরশ্চরন্তি ন ব্রাহ্মণাসো ন সুতেকরাসঃ।
ত এতে বাচমভিপদ্য পাপয়া সিরীঃ তন্ত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/৭১/৯)।
অর্থাৎ :
সেই অজ্ঞরা– যারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরিচরণ করে না, দেবতাদের সঙ্গে নয়, সোমসেবনকারীদের সঙ্গেও নয়– জ্ঞান-বিহীন তারা পাপময় বাক্য সৃষ্টি করে এবং 'সিরীঃ' হয়ে তন্ত্র বিস্তার করে ('তন্ত্রং তন্বতে')। (ঋক-১০/৭১/৯)।।

'সমগ্র ঋগ্বেদে এই একবার মাত্র "সিরীঃ" শব্দ পাওয়া যায় এবং এর অর্থ সুস্পষ্ট নয়। মনিয়ার-উইলিয়াম্স্ এবং ম্যাকডোনেল মনে করেন, শব্দটির অর্থ তন্তুবায় হতে পারে, যদিও অবশ্য তাঁরা এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত নন। কিন্তু উইল্সন্ "সিরীঃ"-র তর্জমা করেছেন, কৃষক। অনুমান হয়, তিনি এখানে সায়ণেরই অনুসরণ করেছেন : কেননা সায়ণ অর্থ করেছেন, "সীরিণো ভুত্বা"। এবং এই অর্থের সঙ্গেই "তন্ত্রং তন্বতে"-র সঙ্গতি পাওয়া যায়। কেননা, সায়ণমতে 'তন্ত্রং' কৃষিলক্ষণং 'তন্বতে' বিস্তারয়ন্তি কুর্বন্তি ইত্যর্থঃ। সোজা কথায়, তারা চাষ করে। ব্যাখ্যান্তরের দিক থেকেও অবশ্য এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তারা কায়িক শ্রমে অংশগ্রহণ করে।'- (ভারতীয় দর্শন, দেবীপ্রসাদ, পৃষ্ঠা-২০২)।
আর এজন্যেই হয়তো হরফ প্রকাশনী কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতা' গ্রন্থটিতে রমেশচন্দ্র দত্তের তর্জমা-কৃত এই ঋক্-এ বলা হচ্ছে–
'এ যে সকল ব্যক্তি যারা ইহকাল বা পরকাল কিছুই পর্যালোচনা করে না, যারা স্তুতি প্রয়োগ বা সোমযাগ কিছুই করে না, তারা পাপযুক্ত অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করে নির্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা করবার উপযুক্ত হয় অথবা তন্তুবায়ের কার্য করবার উপযুক্ত হয়।'- (ঋগ্বেদ-১০/৭১/৯)।।

অতএব, নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, জ্ঞান-প্রশস্তিমূলক এই অর্বাচীন-সূক্তে জ্ঞান ও কর্মের প্রভেদ– এবং বিরোধও– সুস্পষ্ট হয়েছে। ফলে, জ্ঞান প্রশংসিত, কর্ম নিন্দিত– সংক্ষেপে, ভাববাদী ধ্যানধারণা আবির্ভাবের শর্ত সুস্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে বৈকি।
'উপনিষদ্-সাহিত্যে এ-শর্ত আরও প্রকট, যে-কারণে উপনিষদের নামান্তর 'জ্ঞান-কাণ্ড' এবং যাগযজ্ঞমূলক ব্রাহ্মণ বা 'কর্মকাণ্ডে'র সঙ্গে তার বিরোধ। স্বভাবতই উপনিষদে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চরম প্রশংসা এবং ভাববাদী চিন্তারও সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। কেবল মনে রাখা দরকার বৈদিক সাহিত্যে প্রাচীনতর পর্যায়ে তা নয়। কেননা কর্মের নিন্দার উপর প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের গরিমা সেখানে নেই; পক্ষান্তরে, বরুণের সুপ্রাচীন শক্তি হিসেবে যে-মায়ার গরিমা তা একাধারে প্রজ্ঞাবাচক ও কর্মবাচক, দুইই; যদিচ উত্তরকালের জ্ঞান-প্রশস্তি প্রসঙ্গে এই মায়া বন্ধ্যা ও মিথ্যা বলে নিন্দিত।'- (ভারতীয় দর্শন, দেবীপ্রসাদ, পৃষ্ঠা-২০৩)

উপনিষদে এই ভাববাদের বিকাশ কীভাবে ঘটেছিলো, আধুনিক বিদ্বানেরা সে-বিষয়ে বহু আলোচনা করেছেন। সেগুলিতে না গিয়ে বরং এই ভাববাদী চিন্তার প্রাক্-ইতিহাসটুকুই

বিচার্য হিসেবে বর্তমান আলোচনায় আমাদের প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এ-ক্ষেত্রে যুক্তি হলো, কোন এক আদিম প্রাক্-ভাববাদী চিন্তার ধ্বংস-স্তুপের উপরই কালক্রমে এই ভাববাদের আবির্ভাব ঘটেছিলো। এবং আর একটি বৈদিক ধারণার ইতিহাস থেকে এ-যুক্তির সমর্থন পাওয়া যেতে পারে।

.

ব্রহ্মন্ :

ঔপনিষদিক ভাববাদের নামান্তর হচ্ছে ব্রহ্মবাদ। যার মূল বক্তব্য হলো, এক চিন্ময় ব্রহ্মই চরম সত্য বা পরম সত্তা। লক্ষণীয় বিষয় হলো, ঋগ্বেদেও ব্রহ্মন্ শব্দ বিরল নয়– বরং ব্রহ্মন্ ও তৎজাত শব্দ মোট ২৩২ বার উল্লিখিত হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু তার পরও ঋগ্বেদে ব্রহ্মবাদের পরিচয় নেই; ঋগ্বেদের ব্রহ্মন্ মানে কোন চিন্ময় পরম তত্ত্ব নয়।

আধুনিক বিদ্বানেরা ব্রহ্মন্ শব্দের আদি-তাৎপর্য বিচারে নানা চিত্তাকর্ষক মতবাদে উপনীত হয়েছেন। এবং মতবাদগুলির মূলে প্রধানত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানের বিচার। বলাই বাহুল্য, সে-বিচারের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে প্রশ্নটি উপেক্ষা করা যায় না– প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারেই ব্রহ্মন্ শব্দের আদি অর্থ কী? উত্তর পাবার জন্য–

'আমাদের পক্ষে অবশ্যই নিঘণ্টুর উপর নির্ভর করতে হবে। এবং নিঘণ্টু-মতে ব্রহ্মন্ মানে হয় অন্ন (নিঘণ্টু-২/৭) না হয় ধন (নিঘণ্টু-২/১০)। প্রথম অর্থটির ব্যাখ্যায় নিরুক্তকার বলছেন, "বুদ্ধি অর্থে বৃহ্ (বৃংহি) ধাতুর উপর মনিন্ প্রত্যয় করে ব্রহ্ম শব্দের নিষ্পত্তি হয়েছে। (অতএব ব্রহ্ম মানে), সমস্ত প্রাণী যাহা দ্বারা বৃদ্ধি পায়, সর্বদা ভক্ষিত হয়েও যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, যা স্বভাবতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সমগ্র জগৎকে ভরণ করে, বা, যার সাহায্যে সর্বভূতের বৃদ্ধি হয়। 'জাতানি অন্নেন বর্ধন্তে (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-২/২) ইতি শ্রুতিঃ।"- (ভারতীয় দর্শন, দেবীপ্রসাদ, পৃষ্ঠা-২০৩)

তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই উদ্ধৃতিটি নিরুক্তকারের ব্যাখ্যার পক্ষে চূড়ান্ত বিবেচিত হতে পারে। কেননা উপনিষদের এই স্থানে সুস্পষ্টভাবেই অন্নের প্রশংসা পাওয়া যায়। যেমন–

'অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে। সর্বং বৈ তেহন্নমাপ্নুবন্তি। যেহন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্টম্ । তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে। অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতানি অন্নেন বর্ধন্তে। অদ্যতেহত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যতে। ইতি।' (তৈত্তিরীয়-উপনিষদ-২/২/১)।।

অর্থাৎ :

পৃথিবীকে আশ্রয় করে আছে যত প্রজা (প্রাণী) সবার জন্ম অন্ন থেকে। অন্নেই জীবন ধারণ করে। আবার জীবন শেষে ঐ অন্নের মধ্যেই ফিরে যায়। কারণ অন্নই হলো সবার বা সকল

ভূতের জ্যেষ্ঠ। বস্তুর মধ্যে সর্বপ্রথম অন্নের জন্ম। তাই (অন্নময় এই জীবনের) অন্নই হলো সর্বৌষধি (ক্ষয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবার একমাত্র মাধ্যম)। অন্ন থেকে সকল প্রাণী জন্মে। জন্ম নিয়ে তারা অন্নদ্বারাই বর্ধিত হয়। যে অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে সে কাম্য বস্তু অন্ন বা দেহের উপভোগের যাবতীয় বস্তুই পায়। তা প্রাণীগণ কর্তৃক ভক্ষিত হয় এবং তা প্রাণীদিগকে ভক্ষণ করে। সেইজন্য অন্নকে অন্ন বলে; ইতি। (তৈত্তিরীয়-২/২/১)।।

উপনিষদের মধ্যে এ-জাতীয় ভাবধারার পরিচয় অবশ্যই অতি-অদ্ভূত মনে হতে পারে। কিন্তু দেখা যায়, উপনিষদ্-সাহিত্যে বাস্তবিকই এ-জাতীয় এক আদিম বস্তুবাদের স্মারক টিকে থেকেছে; সেই বস্তুবাদ অনুসারে অন্নই চরম সত্য, পরম সত্তা। বস্তুত উপনিষদের দার্শনিকেরা সচেতনভাবেই সেই বস্তুবাদ উত্তীর্ণ হয়ে সুস্পষ্ট-ভাববাদে উপনীত হবার আয়োজন করেছিলেন। অতএব তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ থেকে আলোচ্য উদ্ধৃতি অবধারিতভাবেই প্রমাণ করে যে, নিরুক্তকারের মতে ঋগ্বেদের ব্রহ্ম শব্দ অন্নবাচকই। এবং এই অর্থে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি নিম্নোক্ত ঋক্-টি উল্লেখকরেছেন :
ইন্দ্রা যাহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ। উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ।। (ঋগ্বেদ-১/৩/৫)।
অর্থাৎ : হে ইন্দ্র, যজমানগণের ধী এবং সোমযুক্ত ঋত্বিকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে অন্নসমূহের (ব্রহ্মাণি) নিকট আগমন কর। (ঋক-১/৩/৫)।।

আমরা আগেই দেখেছি, ঋগ্বেদের বিশেষত প্রাচীনতর অংশ এমন এক পর্যায়ের রচনা যখন মানুষের ধনসম্পদ বলতে প্রধানতই অন্ন বা খাদ্যদ্রব্য। হয়তো এই কারণেই নিঘণ্টুমতে ব্রহ্ম শুধু অন্নবাচক নয়, ধনবাচকও। এই অর্থটির ব্যাখ্যাতেও নিরুক্তে বৃদ্ধিমূলক ধারণার উপরই গুরুত্ব আরোপণ করে বলা হয়েছে : 'ভোগানাং বৃংহকম্', ভোগসমূহের বর্ধনকারী। এবং ঋগ্বেদে এই অর্থে ব্যবহৃত শব্দের দৃষ্টান্ত হিসেবে নিরুক্তকার নিম্নোক্ত ঋক্ উদ্ধৃত করেছেন :
আ বাং মিত্রাবরুণা হব্যজুষ্টিং নমসা দেবাববসা ববৃত্যাম্ ।
অস্মাকং ব্রহ্ম পৃতনাসু সহ্যা অস্মাকং বৃষ্টির্দিব্যা সুপারা।। (ঋগ্বেদ-১/১৫২/৭)।
অর্থাৎ : রক্ষানিমিত্ত, হে মিত্রাবরুণ, তোমাদেরকে প্রশংসা-যুক্ত হবি প্রদান করা হচ্ছে; সংগ্রামে আমাদের ধন (ব্রহ্ম) যেন অভিভূত করে, আকাশের বৃষ্টি যেন আমাদের পারয়িত্রী হয়। (ঋক-১/১৫২/৭)।।

এ-প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদ বলেন,– 'নিঘণ্টু এবং নিরুক্তর সাক্ষ্য নিশ্চয়ই সহজে উপেক্ষা করা যাবে না। অতএব, নিঘণ্টু-মতে যদি ব্রহ্ম শব্দ অন্নবাচক বা ধনবাচক হয় এবং নিরুক্ত-মতে যদি উপরোদ্ধৃত ঋক্-দুটিতে তারই নিদর্শন পাওয়া যায় তাহলে ঋগ্বেদের অন্যত্রও শব্দটির অর্থান্তর নির্ণয় করা যুক্তিসঙ্গত হবে না, যদি না অবশ্য ঋগ্বেদের এমন কোন অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থাকে যার ফলে অর্থান্তর-পরিকল্পনা অনিবার্য হয়। সায়ণ কিন্তু তবুও বার বার ব্রহ্ম শব্দের অর্থ করেছেন স্তোত্র। তিনি কোনো প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করেছেন বলে জানা নেই; স্বভাবতই অনুমান হয় নিজে বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের দার্শনিক ছিলেন বলেই ব্রহ্ম

শব্দকে অন্ন বা ধনের মতো স্থূল অর্থে গ্রহণ করতে তাঁর দ্বিধা হয়েছে। অর্থাৎ, এই অর্থান্তর-নির্ণয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিবর্তে তাঁর উপর সমসাময়িক ধ্যানধারণার প্রভাবই প্রবলতর। তবুও অন্তত কয়েকটি দৃষ্টান্তে তাঁর পক্ষেও ওই সুপ্রাচীন অর্থ পরিহার করা সম্ভব হয়নি। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, ব্রহ্মণস্পতি নামের ব্যাখ্যায় তিনি ব্রহ্মন্ শব্দকে অন্ন অর্থেই গ্রহণ করেছেন এবং অন্যত্রও তাঁর রচনায় এই অর্থস্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ''ব্রহ্মচোদনীং''-এর অর্থ করেছেন 'ব্রহ্মণোহন্নস্য প্রেরয়িত্রী' (ঋক-৬/৫৩/৮), ''ব্রহ্মকারাঃ''-র অর্থ করেছেন 'ব্রহ্মণঃ অন্নস্য হবির্লক্ষণস্য কর্তারঃ' (ঋক-৬/২৯/৪), ইত্যাদি। দ্বিতীয়, ব্রহ্ম শব্দ ব্যাখ্যায় যাস্ক বৃদ্ধি-র উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। অন্ন বা ধনের বৃদ্ধি– বা বৃদ্ধিমূলক কামনা– সহজে বোঝা যায়, বিশেষত যখন প্রায় সমগ্র ঋগ্বেদ জুড়ে এই কামনাই পায় অসংখ্য ও বিচিত্র প্রকাশ। কিন্তু স্তোত্র-বৃদ্ধি তাৎপর্য সুস্পষ্ট নয়– ঋগ্বেদে বারবার ব্রহ্মেরই বৃদ্ধি কামনা করা হয়েছে। প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে এ-জাতীয় দৃষ্টান্তগুলিকে অন্ন বা ধনবৃদ্ধির কামনামূলক বলেই গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত।
'ইন্দ্র পথ নির্মাণ করতে করতে ব্রহ্ম বৃদ্ধি করেছিলেন' (ব্রহ্ম তূতোৎ ইন্দ্রঃ গাতুম্ ইষ্ণন্)-(ঋক-২/২০/৫), 'যাহার ব্রহ্ম এবং যাহার সোম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়' (যস্য ব্রহ্ম বর্ধনম্ যস্য সোমঃ)- (ঋক-২/১২/১৪), 'মরুৎগণ যেন আমাদের অন্নযুক্ত সেই বস্তু দেন যা প্রতিদিন ব্রহ্ম বৃদ্ধি করে' (ব্রহ্মচিতয়ৎ)- (ঋক-২/৩৪/৭), 'অগ্নি বৃদ্ধি করুন' (ব্রহ্ম জোষি)-(ঋক-২/৩৭/৬), 'গৃৎসমদদের স্তোম ব্রহ্ম বর্ধন করে' (বর্ধনানি ব্রহ্ম)- (ঋক-২/৩৯/৮), 'ইন্দ্র ব্রহ্ম বর্ধন করিতে করিতে' (ব্রহ্ম জুষাণঃ) আমাদের দিকে আগমন করুন' (ঋক-৭/২৪/৪), ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত দৃষ্টান্তে সায়ণ ব্রহ্ম শব্দের অর্থ করেছেন স্তোত্র; কিন্তু নিঘণ্টু ও নিরুক্তর প্রাচীন নির্দেশ মেনে এখানে ব্রহ্ম অর্থে অন্ন বা ধন গ্রহণ করলেই ঋকগুলির তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয় এবং ঋগ্বেদের প্রধানতম বিষয়বস্তুর সঙ্গেও এগুলির সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়, কেননা দেখেছি, এই বিষয়বস্তু বলতে পার্থিব সম্পদের কামনাই।'-(ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-২০৪-৫)

অতএব দেখাই যাচ্ছে, ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে ব্রহ্মের গরিমা বিরল নয়, কিন্তু তার মধ্যে ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের আভাসও নেই। কেননা সেখানে ব্রহ্ম বলতে মূলতই অন্ন বা ধন, ব্রহ্ম-গরিমার অর্থ অন্ন-গরিমা বা ধন-গরিমা। বস্তুত অন্ন-গরিমা যে ঋগ্বেদের একটি প্রধান বিষয়বস্তু এ-বিষয়ে ইতঃপূর্বে পার্থিব সম্পদের কামনা প্রসঙ্গে বৈদিক পিতু-দেবতার স্তুতিমূলক একটি সূক্ত (ঋগ্বেদ-১/১৮৭) উদ্ধৃত করে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছিলো– যার মূল বক্তব্য ছিলো– সুস্বাদু এবং সুগন্ধি দেবতা পিতু শরীরকে স্থূল করেন, তাঁর মহিমার যেন অন্ত নেই। বলাই বাহুল্য, যে-দৃষ্টিভঙ্গির উপর এই অন্ন-গরিমা প্রতিষ্ঠিত, তাকে ভাববাদী আখ্যা দেবার সুযোগ নেই। বরং ওই প্রাক্-ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির যদি কোনো দার্শনিক বর্ণনা একান্তই সম্ভব হয় তাহলে তাকে আদিম বস্তুবাদই বলা যেতে পারে বলে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন।
কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, এমনকি উপনিষদের যুগেও এই আদিম বস্তুবাদের স্মৃতি সম্পূর্ণ

বিলুপ্ত হয়নি। কেননা মূলত ভাববাদের পরিচায়ক হলেও উপনিষদের স্থান-বিশেষে এই আদিম বস্তুবাদের স্মারক টিকে থেকেছে এবং উপনিষদের দার্শনিকেরা প্রায়ই সচেতনভাবে তা উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন। এ-ক্ষেত্রেও কিছু বৈদিক তথা ঔপনিষদিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

নিরুক্তে তৈত্তিরীয় উপনিষদের যে বাক্যটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছিলো– 'অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতানি অন্নেন বর্ধন্তে।...'– অর্থাৎ, 'অন্ন থেকে সকল প্রাণী জন্মে। জন্ম নিয়ে তারা অন্নদ্বারাই বর্ধিত হয়।...' এ-জাতীয় মতবাদ স্বভাবতই কোনো আদিম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক, এবং উপনিষদের ঋষি অন্নরসময় কোশ-এর ব্যাখ্যা থেকে শুরু করে আত্মার ক্রমশ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপটি উদ্ঘাটন করবার আয়োজন করেছেন তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে : অন্নরসময় কোশের পর প্রাণময় কোশ, প্রাণময় কোশের পর মনোময় কোশ, মনোময় কোশের পর বিজ্ঞানময় কোশ, এবং এই বিজ্ঞানময় কোশের পর আনন্দময় আত্মার স্বরূপ- আনন্দই আত্মা।

অধ্যায়ান্তরে চার্বাকী বস্তুবাদ প্রসঙ্গে এ-বিষয়টি আরো বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। তবে তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীতেও মোটের উপর একই দার্শনিক পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্য নজির হিসেবে এই উপনিষদীয় আখ্যানটির প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধকরি।

'ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত্ব।' (তৈত্তিরীয়-৩/১)।। 'অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত্ব।' (তৈত্তিরীয়-৩/২)।। 'প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং......স তপস্তপ্ত্ব।' (তৈত্তিরীয়-৩/৩)।। মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং......স তপস্তপ্ত্ব।' (তৈত্তিরীয়-৩/৪)।। 'বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং......স তপস্তপ্ত্ব।' (তৈত্তিরীয়-৩/৫)।। 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমনপ্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহানভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা।' (তৈত্তিরীয়-৩/৬)।।

অর্থাৎ :

বরুণের পুত্র ভৃগু একবার তাঁর পিতার কাছে গিয়ে বললেন, 'ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে শিক্ষা দিন।' পিতা পুত্রকে অন্ন, প্রাণ, চোখ, কান, মন এবং বাগিন্দ্রিয়ের কথা বললেন। তারপর বললেন, 'যা থেকে এই প্রাণীসমূহ জন্মে, জন্মের পর যাদ্বারা জীবনধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত যার মধ্যে ফিরে যায়, তাকে বিশেষভাবে জানবার চেষ্টা কর; তা-ই ব্রহ্ম।' এই উপদেশের উপর নির্ভর করে ভৃগু তপস্যা শুরু করলেন। তপস্যা করে–। (তৈত্তিরীয়-৩/১)।। তপস্যা করে ভৃগুর মনে হলো, অন্নই ব্রহ্ম। কেননা, অন্ন থেকে সকল প্রাণী জন্মে, অন্নের দ্বারাই জীবনধারণ করে আবার মৃত্যুর পরে অন্নেই ফিরে যায়। কিন্তু এ-উপলব্ধি পিতার কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি, পুত্রকে বললেন, 'পুনরায় তপস্যা করো, তপস্যার দ্বারাই ব্রহ্মকে জানবে।' দ্বিতীয়বার তপস্যা করে–। (তৈত্তিরীয়-৩/২)।। ভৃগু উপলব্ধি করলেন, প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণ থেকেই সকল ভূতবর্গ জন্মায়, প্রাণই তাদের ধারণ করে রাখে আবার মৃত্যুর পর প্রাণেই তাদের লয় হয়। কিন্তু এ-উপলব্ধিও পিতার কাছে অসন্তোষজনক প্রতিপন্ন হলো। ভৃগু বললেন, 'ভগবন্, ব্রহ্ম বিষয়ে আমাকে আরও উপদেশ দিন।' পিতা বললেন, 'পুনরায় তপস্যা করো।' তৃতীয়বার তপস্যার পর–। (তৈত্তিরীয়-৩/৩)।। ভৃগুর মনে হলো, মনই ব্রহ্ম। কারণ মন থেকেই সব বস্তুর উদ্ভব, মনই তাদের আশ্রয় এবং মৃত্যুর পর মনেই তাদের লয় হয়। এবারও এ-উপলব্ধি পিতার কাছে সন্তোষজনক প্রতীতি না হওয়ায় ভৃগু বললেন, 'ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিন।' পিতা বললেন, 'আবার তপস্যা করো, তপস্যাতেই জানতে পারবে।' চতুর্থবার তপস্যা করে–। (তৈত্তিরীয়-৩/৪)।। ভৃগুর মনে হলো, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। জগতে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সব বিজ্ঞান থেকে জন্মায়, জন্মাবার পর বিজ্ঞানই তাদের ধারণ করে রাখে এবং মৃত্যুর পর তারা বিজ্ঞানেই লয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পুত্রের এই উপলব্ধিও পিতার কাছে অসন্তোষজনক প্রতিপন্ন হলে ভৃগু বললেন, 'ভগবন্, আপনিই আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিন।' পিতা বললেন, 'পুনরায় তপস্যা করো। ঠিকই জানতে পারবে।' পুনর্বার তপস্যার পর–। (তৈত্তিরীয়-৩/৫)।। ভৃগুর উপলব্ধি হলো যে, আনন্দই ব্রহ্ম। কেননা আনন্দ থেকেই সকল প্রাণীর জন্ম হয়। জন্মের পর তারা আনন্দের দ্বারাই বর্ধিত হয় এবং যখন তার ধ্বংস হয়ে যায় তখন আনন্দেই ফিরে যায় এবং তাতেই লীন হয়। এই জ্ঞান ভৃগু লাভ করেছিলেন বরুণের কাছ থেকে এবং বরুণ তাঁকে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন। যিনি এইরূপে ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি প্রভূত অন্ন, প্রজাসন্ততি এবং অনেক পশুধনের অধিকারী ও ভোগের সামর্থ্য অর্জন করেন। (তৈত্তিরীয়-৩/৬)।।

এই দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, আত্মন্ বা ব্রহ্মন্-এর স্বরূপ উপলব্ধির জন্য সর্বপ্রথম যে দৃষ্টিভঙ্গি উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজন তা হলো অন্নই আত্মন্ বা অন্নই ব্রহ্মন্ । উপনিষদের যুগেও যে বাস্তবিকই এ জাতীয় একটি আদিম বস্তুবাদ প্রচলিত ছিলো– যে বস্তুবাদ অনুসারে অন্নই পরম সত্তা বা চরম সত্য– এবং উপনিদের ভাববাদী দার্শনিকেরা যে সচেতনভাবেই মতবাদটি প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলেন, বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ্ থেকেও তার অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

যেমন বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্-এ উক্ত হয়েছে,–

"কেহ কেহ বলেন, অন্নই ব্রহ্ম। উহা ঠিক নহে। কারণ প্রাণ না থাকলে অন্ন পচিয়া যায়। কেহ বলেন, প্রাণই ব্রহ্ম। উহাও ঠিক নহে। কারণ অন্নের অভাবে প্রাণ শুকাইয়া যায়। 'পরন্তু এই দুই (অন্ন ও প্রাণ) একীভূত হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়'– ইহা বিচার করিয়া প্রাতৃদ পিতাকে বলিয়াছিলেন, 'যিনি এরূপ জানেন আমি তাঁহার প্রতি কোন্ শুভকার্য করিতে পারি আর কোন্ অশুভকার্যই বা করিতে পারি?' পিতা তাঁহাকে হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া বলিলেন, "না প্রাতৃদ, ইহাদের সহিত একীভূত হইয়া কে আবার ব্রহ্মত্ব লাভ করে?"- (বৃহদারণ্যক-৫/১২)।।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, অন্নই যে ব্রহ্ম এ জাতীয় একটি মতবাদ উপনিষদের যুগে অবশ্যই প্রচলিত ছিলো। যেমন, ছান্দোগ্য উপনিষদে বিখ্যাত নারদ-সনৎকুমার সংবাদেও এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে দার্শনিক সনৎকুমার নারদের কাছে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে পরপর ব্রহ্ম বিষয়ে কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা বা নিম্নস্তরের জ্ঞান নিরসন করেছিলেন; তার মধ্যে একটি হলো অন্নই ব্রহ্ম :

'অন্নং বাব বলাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি দশ রাত্রীর্নাশ্নীয়াদ্ যদ্যু হ জীবেদথবাঃ অদ্রষ্টাঃ অশ্রোতাঃ অমন্তাঃ অবোদ্ধাঃ অকর্তাঃ অবিজ্ঞাতা ভবত্যথাঃ অন্নস্যায়ৈ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি অন্নম্ উপাস্স্ব ইতি।' (ছান্দোগ্য-৭/৯/১)।।
'সঃ যঃ অন্নম্ ব্রহ্মেতি উপাস্তেঃ অন্নবতো বৈ স লোকান্ পানবতো অভিসিধ্যতি যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যঃ অন্নং ব্রহ্মেতি উপাস্তেহস্তি ভগবো অন্নাদ্ভূয় ইত্যন্নাদ্বাব ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি। (ছান্দোগ্য-৭/৯/২)।।
অর্থাৎ :
বল অপেক্ষা অন্ন অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য যদি কেউ দশ দিন দশ রাত অন্নগ্রহণ না করে, সে যদি জীবিতও থাকে তাহলেও সে দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, চিন্তা করতে পারে না, বুঝতে পারে না, কাজ করতে পারে না বা কোন কিছুর অর্থ ধারণা করতে পারে না। কিন্তু অন্ন গ্রহণ করলে সে দর্শন করতে পারে, শ্রবণ করতে পারে, মনন করতে পারে, বুঝতে পারে, কাজ করতে পারে এবং জ্ঞানলাভ করতে পারে। অতএব অন্নের উপাসনা কর। (ছান্দোগ্য-৭/৯/১)।। যিনি অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্নযুক্ত ও পানযুক্ত লোকসমূহ লাভ করেন। যিনি অন্নকে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করেন, অন্নের গতি যতদূর, ততদূর তাঁর কামচরণ হয়ে থাকে। নারদ বললেন, 'ভগবন্, অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে?' সনৎকুমার বললেন, 'অবশ্যই অন্ন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।' নারদ বললেন, 'ভগবন্, তা আমাকে বলুন।' (ছান্দোগ্য-৭/৯/২)।।

তার মানে, উপনিষদের দার্শনিকেরা বারবার এইভাবে আদিম অন্ন-দর্শনটি প্রত্যাখ্যান করলেও উপনিষদ্-সাহিত্যেই মাঝে মাঝে তার অক্ষুণ্ন প্রভাব টিকে থেকেছে। যেমন,

তৈত্তিরীয় উপনিষদে ইতোমধ্যে ভৃগু-বরুণ সংবাদে অন্ন-ব্রহ্ম মতবাদ খণ্ডন করে আনন্দ-ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই– এবং সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবেই– উক্ত হয়েছে–

‘অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ ব্রতম্ । প্রাণো বা অন্নম্ । শরীরম্ অন্নাদম্ । প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্ । শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতং অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ । স য এতদ্ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবান্ অন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা।’ (তৈত্তিরীয়-৩/৭/১)।।

‘অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্-ব্রতম্ । আপো বা অন্নম্ । জ্যোতিরন্নাদম্ । অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্ । জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ । স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা।’ (তৈত্তিরীয়-৩/৮/১)।।

‘অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্-ব্রতম্ । পৃথিবী বা অন্নম্ । আকাশো অন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদ্ অন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ । স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা।’ (তৈত্তিরীয়-৩/৯/১)।।

অর্থাৎ :

অন্নকে কখনও নিন্দা করবে না। এটা তোমার ব্রত,– তোমার কর্তব্য-কর্ম। প্রাণই অন্ন আর শরীর অন্নভোক্তা। প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত। শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। এই অন্ন এভাবে আরেক অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এভাবে অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলে জানেন, তিনিই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন। সুপ্রচুর অন্নের মালিক হয়ে অন্নভোক্তা তো হনই, এমনকি পুত্রাদি, পশু, ব্রহ্মতেজ এবং কীর্তিতেও মহান হন। (তৈত্তিরীয়-৩/৭/১)।। অন্নকে পরিত্যাগ করবে না। তা ব্রত। জল অন্ন। জ্যোতিঃ অন্নভোক্তা। জলে জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতিতে জল প্রতিষ্ঠিত। এই অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলে জানেন তিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন, অন্নবান ও অন্নভোক্তা এবং পুত্রাদি, পশু ব্রহ্মতেজ ও কীর্তি বিষয়ে মহান্ হন। (তৈত্তিরীয়-৩/৮/১)।। অন্নকে বহু করবে। তা ব্রত। পৃথিবী অন্ন। আকাশ অন্ন-ভোক্তা। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত। এই অন্নে অন্ন প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলে জানেন তিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন, অন্নবান ও অন্নভোক্তা এবং পুত্রাদি, পশু, ব্রহ্মতেজ ও কীর্তি বিষয়ে মহান হন। (তৈত্তিরীয়-৩/৯/১)।।

যুক্তি বা বিচারে সামান্য পরিচয় থাকলেও অন্ন-গরিমা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কামনার দিক থেকে উপনিষদের এই অংশটি প্রাচীন বৈদিক কবিদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বস্তুত সেই আদিম কবিদের একটি গানেই– মূলত একটি সামগানেই– তৈত্তিরীয় উপনিষদের পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। এবং চিত্তাকর্ষক বিষয় হলো, অন্ন নিয়ে এক আদিম উচ্ছ্বাসই এ গানের মূল বিষয়বস্তু–

‘অহমন্নম্-অহমন্নম্-অহমন্নম্ । অহমন্নাদো ৩ হহমন্নাদো ৩ হহমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা ৩ স্য। পূর্বং দেবেভ্যোহমৃতস্য না ৩ ভায়ি।

যো মা দদাতি স ইদেব মা ৩ বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তম ৩ স্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবা ৩ ম্
। সুবঃ ন জ্যোতীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ। (তৈত্তিরীয়-৩/১০/৬)।।
অর্থাৎ :
আমি অন্ন... আমি অন্ন... আমি অন্ন। আমিই অন্ন গ্রহণ করি... আমিই অন্ন গ্রহণ করি।
আমিই শ্লোক রচনা করি... আমিই শ্লোক রচনা করি... আমিই শ্লোক রচনা করি। এই মূর্ত-
অমূর্ত জগতে আমিই সবার আগে প্রথম উৎপন্ন হয়েছি। দেবতাদেরও পূর্বে আমি জন্মেছি।
আমিই অমৃতের অধিষ্ঠান। যে অন্নস্বরূপ আমাকে অন্নপ্রার্থীর হাতে নির্দ্বিধায় তুলে দেয়, দান
করে, সে সেভাবেই আমাকে রক্ষা করে। আর অন্নার্থ যাকে বিমুখ করে অন্নদান না করে
নিজের উদরপূর্তি করে, সেই অসদাচারীকে আমিই ভক্ষণ করি। সূর্যের মতোই আমি
স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ময়। আমারই অভিব্যক্তি, আমারই প্রকাশ লোকালোক নিয়ে এই ভুবন। এই
জ্ঞান যার আয়ত্তে, সবকিছুই তার আয়ত্তে। এই রহস্য যে জেনেছে, তার সবই জানা
হয়েছে। এই হলো উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। (তৈত্তিরীয়-৩/১০/৬)।।

দেবীপ্রসাদ বলেন,– 'অন্ন-প্রশস্তিতে এ-ভাবে প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম অবশ্যই অত্যন্ত
আদিম পর্যায়ের পরিচায়ক। কিন্তু যে-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রশস্তি তাকে আর যাই হোক
অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী আখ্যা দেওয়া যায় না। বরং যদি তার কোনো ব্যাখ্যা একান্তই সম্ভব
হয় তাহলে তাকে আদিম ও প্রকৃত বস্তুবাদই বলা যেতে পারে। প্রাচীন বৈদিক কবিদের
দৃষ্টিভঙ্গি বলতে মূলতই তাই। এবং তারই ধবংসস্তুপের উপর বৈদিক ঐতিহ্যে কালক্রমে
ভাববাদী চিন্তার আবির্ভাব ঘটেছে– উপনিষদ্-সাহিত্যে সে-ভাববাদ সুস্পষ্টরূপ গ্রহণ
করেছে।'

৩.৮ : উপসংহার

বৈদিক সাহিত্যের এ-পর্যন্ত আলোচনা থেকে একটা বিষয় আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয় যে, প্রাচীনতর রচনাগুলিতে প্রাচীন কবিদের একান্ত বস্তুকেন্দ্রিক পার্থিব চাওয়া-পাওয়া ও নিরাপত্তার কামনাকে কেন্দ্র করেই তাতে আদিম যৌথ-জীবন ও তার সরল স্বীকারোক্তিমূলক উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। তাতে যুক্ত হয়েছে প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের আদিম জাদু-বিশ্বাস, অন্নচিন্তা-সর্বস্ব চেতনায় আদিম পৌরাণিক কল্পনা ও দেব-পরিকল্পনা, এমনকি আদিম সাম্য সম্পর্কের অমোঘ নিয়মানুবর্তিতার অনুরূপে বিশ্বের অমোঘ নিয়মানুবর্তিতার আভাস। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই এ-সবই চিন্তা-দৈন্যেরও পরিচায়ক। কেননা অতীতের ওই জীবন আদিম অভাবের জীবন এবং এই অভাব শুধুমাত্র জাগতিক সম্পদেরই অভাব নয়, চিন্তাচেতনারও চরম অভাবের জীবন। ইতিহাসের নিয়মেই উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতির ফলে আদিম জীবনের অবসান অনিবার্য। ফলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দিকে ধাবমান সমাজ-কাঠামোর আদিম সাম্যের ভঙ্গুর অবস্থাতে পুরনো অভ্যস্ততার মায়া সহজে কাটিয়ে ওঠাও কঠিন বৈকি। আর তাই ঋত-হীন এক নতুন পরিস্থিতি থেকে পুরনো এক ঋত-যুক্ত অতীতকে ফিরে পাবার আকুতিও পরবর্তীকালের প্রাচীন রচনায় পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সময় যেহেতু পেছনে গড়ায় না, সভ্যতার পরবর্তী স্তরে উন্নীত হবার ঐতিহাসিক মূল্য হিসেবে অবসান ঘটেছে সকল স্বতঃস্ফূর্ত নৈতিক চেতনারও। এই নিয়মে বৈদিক সমাজ-বিবর্তনের সাথে চিন্তা-চেতনার বিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী ছিলো। আর তাই এই বিবর্তনগুলি বোঝবার ক্ষেত্রে ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশে সংরক্ষিত বৈদিক সমাজ ও জীবন-যাত্রার স্মারকগুলিকে কোনভাবেই অবহেলা করা সমীচীন হবে না।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে ওই আদিম চিন্তাধারাকে বেদের দোহাই দিয়ে পরবর্তীকালে এক অমানবিক অসাম্যকে প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় শুরু হয় তথাকথিত ধর্মীয় বিধিবদ্ধতার নামে। এটি যে চরম স্বার্থবাদী রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এগুলিকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমাদের আলোচনা এগিয়ে যাবে। কিন্তু প্রাচীনতর বৈদিক সাহিত্যের উপাদানগুলি থেকে যে আধুনিক চিন্তাধারার সাপেক্ষে কোন ভাববাদপ্রসূত অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় না এটিই আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রতিপাদ্য। পরিশেষে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়েই এ অধ্যায়ের উপসংহার টানা যেতে পারে।

'ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশে সংরক্ষিত আদিম সমান-জীবনের স্মারকগুলি উপেক্ষণীয় নয়; বিশেষত মনে রাখা দরকার যে পরবর্তীকালে এবং সুদীর্ঘ যুগ ধরে এই বেদের দোহাই দিয়েই আমাদের দেশে তথাকথিত বর্ণাশ্রম-মূলক অসাম্যকে সুপ্রতিষ্ঠ এবং স্বীকারযোগ্য করাবার আয়োজন হয়েছে। কিন্তু সেই সমান-জীবনের অবসান অনিবার্য ছিল এবং ইতিহাসের বিচারে এই অবসান প্রকাণ্ড অগ্রগতিরই পরিচায়ক। অবশ্যই তার ফলে বৈদিক কবিদের চেতনা থেকে কালক্রমে ঋতর পরিকল্পনা বিলুপ্ত হয়েছে; তবুও মনে রাখা দরকার

সে-চেতনা মুক্তি পেয়েছে চরম অভাবের তাড়নায় অন্ন-চিন্তা-সর্বস্ব কামনার প্রায় অন্তহীন পুনরুক্তি থেকে। অব্যবহিত পরবর্তীকালে– উপনিষদ্-সাহিত্যে– যে-দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব দেখা যায় শুধুমাত্র তারই স্বকীয় মূল্য বিচারের উপর নির্ভর করেই এই চিন্তামুক্তির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে বিচার করা সম্ভব নয়। মনে রাখা দরকার, চিন্তার এই মুক্তি সম্ভব না হলে পরবর্তী কালের চিন্তাশীলদের ধ্যানধারণাও তৈত্তিরীয় উপনিষদের উপসংহারে উদ্ধৃত সামগানটির মতো "হাবু! হাবু! হাবু! অহম্ অন্নম্, অহম্ অন্নম্, অহম্ অন্নম্ । অহম্ অন্নাদঃ, অহম্ অন্নাদঃ অহম্ অন্নাদঃ" জাতীয় আদিম উচ্ছ্বাসের পর্যায়েই আবদ্ধ থাকত, যেমন আদিম সমান-জীবনের সরল নৈতিক গরিমাটিকে আঁকড়ে থাকতে হলে আবদ্ধ থাকতে হতো আদিম অভাবের পর্যায়েই। অবশ্যই সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে– উপনিষদে– কর্মের যে-নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান তারই ফলে অঙ্কুরিত হয়েছে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির বীজ; এবং এই বীজ কালক্রমে যে-বেদান্তদর্শনে পল্লবিত হয়েছে তা চরম অর্থে ইহলোক-বিমুখ বলেই ভারতীয় চিন্তা ইতিহাসের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রধানতম প্রতিবন্ধ হয়েছে। তবুও মনে রাখা দরকার, বৈদিক মানুষদের ইতিহাসে এই হলো সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট দার্শনিক ক্ষমতালাভের পরিচয় এবং যে-ক্ষমতা একদা অর্জিত হয়েছিল বলেই এই চরম ইহলোক-বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং সে-সংঘাত ভারতীয় চিন্তা-ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। উপনিষদের ঋষিদের দৃষ্টিভঙ্গিও যদি ঋগ্বেদের প্রাচীন ঋষিদের মতো শুধু অন্নের কামনা, পশুর কামনা, নিরপত্তার কামনা প্রভৃতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকত তাহলে সেই দৃষ্টিভঙ্গি ইহলোক-সর্বস্ব হলেও ভারতীয় চিন্তা-ইতিহাসকে সমৃদ্ধ হতে সহায়তা করত না। অবশ্যই সমগ্র মধ্যযুগ ধরে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এই ঔপনিষদিক বা বৈদান্তিক ইহলোক-বিমুখতার প্রচারে একে সনাতন বা শাশ্বত বলেও দাবি করা হয়েছে এবং তারই প্রতিষেধক হিসেবে ঋগ্বেদের প্রাচীনতর পর্যায়ের একান্ত ইহলৌকিক চিন্তার নিদর্শনগুলি মূল্যবান হতে পারে।'- (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-২০৮-৯)।

ভারতীয় দর্শনের বিকাশ ও বস্তুবাদী পটভূমি

চার্বাক-দর্শন ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন এবং একমাত্র বস্তুবাদী বা জড়বাদী দর্শন। কিন্তু বস্তুবাদের একমাত্র প্রতিনিধি হয়েও ভারতবর্ষের দর্শনসভায় চার্বাক সিদ্ধান্ত 'বস্তুবাদী' আখ্যার পরিবর্তে 'নাস্তিক' সংজ্ঞার মাধ্যমেই অধিকতর পরিচিত। এতেই বোঝা যায় যে, মূলধারার সবগুলি দর্শনের রোষানলের মধ্যে থেকেই চার্বাকদেরকে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে হয়েছে।

বলা হয়ে থাকে, চার্বাকদের নীতি প্রধানতঃ নেতিবাচক। ভারতীয় দর্শননীতির বিধানসভায় এঁরা অবতীর্ণ হয়েছেন বিরোধীপক্ষের ভূমিকা নিয়ে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'Lokayata' (লোকায়ত) গ্রন্থে বলেন– 'they have a few doctrines to defend but a lot to assail.' বস্তুবাদী মতকে সাধারণভাবে আশ্রয় করলেও চার্বাকপন্থীরা বস্তুবাদের খুঁটিনাটিকে তাঁদের উপজীব্য করেননি। তাঁদের মতে, ভারতীয় ঐতিহ্যের যে মূল ধারা ভারতের অধ্যাত্মচিন্তার বিভিন্ন খাতে প্রবহমান, তার অগ্রগতির পথে প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়াতেই এঁরা নানাভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। চার্বাক দর্শনের যে অংশ আমাদের জ্ঞানের গোচরীভূত তার মধ্যে এই প্রচেষ্টারই সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। তাই চার্বাক-মত সম্বন্ধে ধারণার প্রস্তুতি হিসেবে ভারতের দর্শনচিন্তার মূলগত ভাবধারা সম্পর্কেও সাধারণ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা এই ভাবধারার বিরোধিতার মধ্য দিয়েই চার্বাকীয় চিন্তার অগ্রগতি বলে মনে করা হয়। এবং চার্বাকেতর ভারতের অন্যান্য দার্শনিক-গোষ্ঠি সেই সাধারণ ভাবের দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

আর ভারতীয় দর্শনচিন্তার মূলগত ভাব সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের যেতে হবে এর উৎসমুখে– উপনিষদীয় বৈদিক চিন্তাধারার মধ্যে। তবে চার্বাকরা কেন ওই অধ্যাত্ম-ভাবধারার বিপক্ষে এমন বস্তুবাদী লোকায়তিক অবস্থান নিয়েছিলেন তার সামাজিক তাৎপর্যটা অনুধাবন করা না-গেলে এই দর্শনের মূল-স্পন্দনটাই আলোচনার বাইরে থেকে যাবে।

.

১.০ : চার্বাকমতের প্রাক্-পটভূমি

চার্বাক দর্শনের আরেকটি প্রসিদ্ধ নাম হলো লোকায়ত দর্শন। এই নামকরণের পিছনে নিশ্চয়ই কোন সুগভীর সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। দার্শনিক তাৎপর্যের দিক থেকে এই দর্শনকে বলা হয় ভূতচৈতন্যবাদ, কখনো কখনো দেহাত্মবাদও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই নাম দুটির পিছনে যে সে যুগের এক বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। বিরোধীপক্ষের দেয়া লোকায়ত নামের তাৎপর্যের মধ্যেই আসলে লুকিয়ে আছে এই দর্শনটির অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়টি।

একথা স্বীকার করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, সামাজিক বিন্যাসে বস্তুত উচ্চবর্ণের শ্রেণীস্বার্থকে আঘাত করেছিলো বলেই 'লোকায়ত' নামটির কিছু কুৎসিত অপব্যাখ্যা

অনেকদিন ধরে প্রচলিত, পরবর্তী অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এর কিছু নমুনা আমরা অবগত হবো। বলা হয়ে থাকে, চার্বাক দর্শন হলো–

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ।। (চার্বাক-ষষ্ঠি)
অর্থাৎ : যতদিন বেঁচে আছ সুখে বাঁচার চেষ্টা কর, ধার করেও ঘি খাবার ব্যবস্থা কর। লাশ পুড়ে যাবার পর আবার কেমন করে ফিরে আসবে?

তার মানে– 'খাও দাও ফুর্তি করো, জীবের জীবন আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসে না'– এজাতীয় স্থূল ভোগবিলাসবাদী জান্তব দর্শনই চার্বাক দর্শন। তাই সংসার-ভোগাসক্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে এ দর্শন সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এজন্যেই এর নাম হলো 'লোকায়ত' দর্শন। এই ভিত্তিতে 'বিষ্ণুপুরাণ'-এ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যে মায়ামোহের কাহিনীরও সৃষ্টি করা হয়েছে তা আর কিছুই নয়–

অসুররা বৈদিক ধর্মানুসারে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলো। দেবতারা প্রমাদ গুনলেন। তাহলে অসুররাই স্বর্গ ভোগ করবে। আমাদের কী উপায় হবে? তাই দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু বললেন, ভয় নেই। আমি ব্যবস্থা করছি। বিষ্ণু তাঁর শরীর থেকে মায়ামোহ সৃষ্টি করলেন। বললেন, হে মায়ামোহ! তুমি অসুরদের প্রলুব্ধ করো যাতে তারা বৈদিক ধর্মানুসারী তপস্যার পথ পরিত্যাগ করে ঐহিক ভোগসুখে মত্ত হয়ে পড়ে। মায়ামোহ তপস্যারত অসুরদের কাছে বেদ-বিরোধী পরলোক-বিরোধী ঐহিকভোগবিলাসবাদী বিপরীত দর্শনের মর্ম ব্যাখ্যা করলো। অসুররা মায়ামোহের কথায় প্রলুব্ধ হয়ে তপস্যার পথ পরিত্যাগ করে ভোগবিলাসের পিছনে ছুটলো। তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটলো। তখন দেবতারা অনায়াসে অসুরদের পরাস্ত করলেন। তাঁদের স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক হলো। (বিষ্ণুপুরাণ, অংশ-৩, অধ্যায়-১৭-১৮)

আর অধিকতর প্রচলিত কাহিনীটি হলো– স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতি অসুরদের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়ে দুর্বল করার জন্য ভোগবাদী দর্শন সৃষ্টি করে শিষ্য চার্বাকের মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন। সাংসারিক সুখভোগকামী অজ্ঞ সাধারণ মানুষ এতে নিজের কামনা-বাসনা-লালসা চরিতার্থ করার পিছনে দার্শনিক যুক্তির সমর্থন পাওয়ায় সহজেই এই দর্শন গ্রহণ করে। তাই এর নাম হলো 'লোকায়ত' দর্শন।

কিন্তু এসব তো পৌরাণিক কাহিনী-কথা। তার বাইরে চার্বাক-দর্শনের সুদূরপ্রসারী সামজিক তাৎপর্যের চমৎকার দার্শনিক ব্যাখ্যাটি পাওয়া যায় জৈন-দার্শনিক মণিভদ্রসূরি'র রচনায়। প্রসিদ্ধ জৈন-দার্শনিক হরিভদ্রসূরি'র বিখ্যাত গ্রন্থ 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়'-এ যেসব আলোচ্য দার্শনিক প্রস্থান ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে সেগুলি হলো– বৌদ্ধ, ন্যায়, সাংখ্য, জৈন, বৈশেষিক, জৈমিনীয় অর্থাৎ মীমাংসা। কিন্তু সবশেষে চার্বাকদর্শনও রয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে। তাতে দর্শনের প্রস্থান সংখ্যা দাঁড়ায় আসলে সাতটি। তাই তাঁর গ্রন্থের নাম হিসেবে 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়' নামটি কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর বটে। হয়তো হরিভদ্রসূরি চার্বাকদর্শনের ওপর

খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাননি বলে শেষে পরিশিষ্টাকারে সামান্য কিছু বলেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের টীকাকার মণিভদ্রসূরি চার্বাকদর্শনের সামাজিক তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে এই দর্শনের যথেষ্ট গুরুত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এবং বিস্ময়কর ব্যাপার হলো– হরিভদ্রসূরি (৬০০খ্রিস্টাব্দ) তাঁর গ্রন্থের কোথাও বেদান্তদর্শনের নামমাত্র উল্লেখ করেননি। তবে কি তিনি বেদান্তদর্শনকে দর্শন বলেই গ্রাহ্য করেননি! হয়তো তিনি শঙ্করাচার্যের (৮০০খ্রিস্টাব্দ) পরবর্তী হলে অদ্বৈতবাদকে নিশ্চয়ই আমল দিতেন। সে যাক্, মণিভদ্রসূরির ব্যাখ্যার উল্লেখযোগ্য বক্তব্যটুকু হলো–

‘কিং চ প্রত্যক্ষমপি অস্তিতয়া অভ্যুপগম্যতে চেৎ, জগদ্ অনুপহ্নুতমেব স্যাৎ। দরিদ্রে হি স্বর্ণরাশির্মে অস্তি ইতি অনুধ্যায় হেলয়ৈব দৌঃস্থ্যং দলয়েৎ। দাসোঽপি স্বচেতসি স্বামিতামবলম্ব্য কিঙ্করতাং নিরাকুর্যাৎ। ন কোঽপি স্বানভিমতমালিন্যম্ অশ্নুবীত। এবং ন কশ্চিৎ সেব্যসেবকভাবো দরিদ্রধনিভাবো বা স্যাৎ। তথা চ জগদ্ব্যবস্থাবিলোপপ্রসঙ্গ ইতি সুস্থিতম্ ইন্দ্রিয়গোচর এব প্রমাণম্’। (ষড়দর্শনসমুচ্চয়-এর মণিভদ্র কৃত টীকা ৮১ শ্লোক)

হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় কৃত তর্জমা :

‘যারা অস্পৃষ্ট, অনাস্বাদিত, অনাঘ্রাত, অশ্রুত, অদৃষ্ট, স্বর্গমোক্ষপ্রভৃতি সুখপিপাসায় চিত্ত সমর্পণ করে, দুঃসাধ্য তপস্যাদি জনিত ক্লেশ স্বীকার করে জীবন ক্ষয় করে তাদের এ ধরনের জীবনযাপন হল মহামূর্খতার দুঃসাহস মাত্র।

আরো একটা কথা– কী আছে কী নেই প্রত্যক্ষকেই তার একমাত্র নিরিখ বলে মেনে নিলে জগৎটাকে আর অস্বীকার করা যায় না (তাহলে জগতের অন্তর্গত আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সমাজব্যবস্থাকেও বাস্তব বলে স্বীকার করতে হয়)। তখন বঞ্চিত দরিদ্রও মনে করবে– দেশের স্বর্ণভাণ্ডারে আমারও অধিকার আছে। (এ অধিকার কায়েম করে) তখন সেও অনায়াসে নিজের দারিদ্র্যকে পদদলিত করবে। দাসও মনে প্রাণে স্বাধীনতা অবলম্বন করে দাসত্ব করতে অস্বীকার করবে। কেউ আর নিজের অনভিপ্রেত জীবনযাত্রার দৈন্য মেনে নেবে না।

এভাবে সমাজে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ বা ধনি-দরিদ্র সম্বন্ধ সম্বলিত শ্রেণীভেদ আর থাকবে না। তখন সংসারের বর্তমান সমাজব্যবস্থা বিলুপ্ত হবে। তাই প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ এই হল চার্বাকের সুস্থির সিদ্ধান্ত।... তাই ধর্মের ভেকধারী পরবঞ্চনাপ্রবণ ধূর্তের দল অনুমান, শাস্ত্রবাক্য প্রভৃতিকে প্রমাণ বলে প্রচার করছে; এসব প্রমাণের দ্বারা পাপপুণ্য, স্বর্গনরক প্রভৃতি অলীক কল্পনাকে সত্য বলে নির্ধারণ করার চেষ্টা করছে; মূঢ় বিভ্রান্ত ইতর জনসাধারণের মধ্যে ধর্মান্ধতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে।’- (চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১৪)

এর সারমর্ম হলো– ‘চার্বাক প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। কিন্তু কেন? কারণ, একমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে মেনে নিলে প্রত্যক্ষের অযোগ্য পরলোক, জন্মান্তর, অবিনশ্বর আত্মা, পূর্বজন্মের কর্মফল ও অদৃষ্টজনিত ইহলোকের দুঃখভোগ, পুণ্যকর্মের দ্বারা বা ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা স্বর্গলাভ বা মুক্তি– এ সমস্ত অন্ধ মূঢ় বিশ্বাস আর দুঃখ লাঞ্ছনার জন্য উচ্চবর্ণের কূটবুদ্ধি ও শ্রেণীস্বার্থকলুষিত ধর্মীয় সমাজব্যবস্থাকে দায়ী করবে। তারা মানুষের

বাঁচার অধিকারের দাবিতে বিদ্রোহ করবে। এই হলো চার্বাককর্তৃক প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করার সামাজিক তাৎপর্য।'

চার্বাকদর্শনের এই সুগভীর সামাজিক তাৎপর্য মনে রাখলে 'লোকায়ত' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে কষ্ট হবে না। তবে প্রসঙ্গত এটা মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই যে, জৈন দার্শনিকরা বুঝি চার্বাকের প্রতি প্রসন্নই ছিলেন। সেব্য-সেবক ধনী-দরিদ্র ভেদশূন্য সমাজব্যবস্থার প্রতি তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ বা সহানুভূতি ছিলো এরকম কোন বিশেষ নজির পাওয়া যায় না। বরং ষড়দর্শনসমুচ্চয়ের পরবর্তী শ্লোক ও তার টীকা থেকে শুরু করে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত কদর্থিত চার্বাকদর্শনের বিকৃত প্রচলিত ব্যাখ্যারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে– আত্মা নেই, পরলোক নেই, জন্ম-জন্মান্তর নেই, জীবের জীবন এ জন্মেই শুরু এবং মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হবে, আর ফিরে আসবে না। অতএব পিবত-খাদত-মোদত– অর্থাৎ সবাই মিলে পান করো, খাও দাও ফুর্তি করো– এই হলো চার্বাকদর্শনের শেষ কথা।
উল্লেখ্য, এ-প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, জৈনধর্মে বা জৈনদর্শনে যদিও ঈশ্বর বা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়নি, কিন্তু পারলৌকিক মুক্তি স্বীকার করা হয়েছে। সাধনার দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফল বন্ধন ছিন্ন হলে কর্মক্লেশ-ভারহীন আত্মা শেষ জন্মের পর নিতান্ত হাল্কা হয়ে মহাশূন্যে অন্তহীন উর্ধ্বে পাড়ি জমাবে। কোথায় পৌঁছাবে কেউ জানে না। এর নামই মুক্তি। তবে কি চার্বাকদর্শনের সামাজিক তাৎপর্য অনুধাবন করে জৈন দার্শনিকরাও বিব্রত ছিলেন?

চার্বাকদের দুর্নাম হলো চার্বাক বেদদ্রোহী, অতএব সমাজদ্রোহী, অতএব সনাতন বৈদিক সমাজের ক্ষমার অযোগ্য বিদ্রোহী দার্শনিক। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হলো, চার্বাক বেদের কোন অংশকে প্রধানত আক্রমণ করেছেন?
'আক্রমণ করেছেন বেদের কর্মকাণ্ডকে যেখানে বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া-কণ্টকিত যজ্ঞগুলির বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। এই যজ্ঞগুলির পৌরোহিত্যের ভার দেওয়া হয়েছে ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতা দ্বারা সুরক্ষিত এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ধনরাশির দ্বারা পরিপুষ্ট দক্ষিণার দাক্ষিণ্যে নিরাশঙ্ক নিরাপদ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের ওপর। অসাধারণ সাহিত্যিক উৎকর্ষে সমুজ্জ্বল, উদার ভাবৈশ্বর্যে সমৃদ্ধ ঋক্-সংহিতা ও অন্যান্য সংহিতার মন্ত্রগুলিকে চার্বাক আক্রমণ করেননি। বৈদিক যাগযজ্ঞের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে মূলত এবং প্রধানত যজুর্বেদ-এর তৈত্তিরীয় সংহিতা-য়।'- (হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১৫)।
যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞে বলিদানের জন্য আনীত অশ্বকে করুণাময় বৈদিক ঋষি সান্ত্বনাবাক্য শোনাচ্ছেন–

'ন বা উ এতন্ম্রিয়সে ন বিষ্যসি দেবা ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ।
হরী তে যুঞ্জা পৃষতী অভূতামুপাস্থাদ্বাজী ধুরি রাসভস্য'।। (কৃষ্ণযজুর্বেদ-৪/৬/৯/১০) /(শুক্লযজুর্বেদ-২৫/৪৪) /(ঋগ্বেদ-১/১৬২/২০)
'ন বা উ এতন্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবা ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ।

যত্রাসতে সুকৃতো যত্র তে যযুস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু।।' (বাজসনেয়ী বা শুক্লযজুর্বেদ-সংহিতা-২৩/১৬)
অর্থাৎ :
হে অশ্ব, তুমি এই ভেবে দুঃখ করো না যে বলিপ্রদত্ত তুমি সত্যিই মরে যাচ্ছো বা লোকে তোমাকে হিংসা করছে। তুমি অতি সহজ ও উত্তম পথে সুকৃত ব্যক্তিদের কাম্য দেবতাদের নিকট স্বর্গলোকে চলে যাবে। এমনকি তুমি স্বর্গে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হবে। ইন্দ্রের হরিনামক অশ্বদ্বয় এবং মরুৎগণের পৃষতীনামক বলবান ঘোড়া তোমার রথ টেনে নিয়ে যাবে। এই হীন জান্তব জীবনে তুমি ভারবাহী গর্দভের মতো প্রভুর ভার পৃষ্ঠে বহন করে চলেছো। কিন্তু স্বর্গে বলশালী স্বর্গীয় অশ্ব তোমাকে বহন করে চলবে। (সায়ণ ও মহীধর ভাষ্য)।

এই বিচিত্র আর্যদৃষ্টির মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে না পেরেই চার্বাকেরা প্রশ্ন তুলেছেন : আহা, অত সহজেই যদি স্বর্গে যাওয়া যায় তবে আর অবোধ পশুটাকে বলি দিচ্ছেন কেন? পশুর বদলে ঋষিবর নিজের বৃদ্ধ পিতাকেই কেন এই সহজ পথে স্বর্গে পাঠাবেন না?–
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে।। (চার্বাকষষ্ঠি-৫০)।।
অর্থাৎ : জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে নিহত পশুর যদি স্বর্গলাভ হয়, তবে যজ্ঞকারী যজমান কেন তার পিতাকে হত্যা করে না?

বেদবাদীদের প্রতি এ যে নির্মম বিদ্রূপ। তাই বেদভক্তদের কাছে এটি 'কুরুচিপূর্ণ উপহাস' সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিদ্রূপ সত্যদ্রষ্টা ঋষি ও তার মহিমা-কীর্তনীয়ার পক্ষে হজম না করে উপায় কী? সুতরাং তাদের পক্ষেও চার্বাককে বেসামাল গালিগালাজ দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তারপরও কেউ কেউ এর একটা উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন এভাবে– বেদে যাকে বলি দেবার বিধান নির্দিষ্ট রয়েছে তাকে বলি দিলেই সে স্বর্গে যাবে। বৃদ্ধ পিতাকে বলি দেবার কোনো নৈতিক বিধান নেই। তাই বলিপ্রদত্ত পিতা স্বর্গে যেতে পারবেন না। অতএব এটি বেদের মাধ্যমে বিধাতার উদারতারই নিদর্শন। উদারতা তো বটেই। কেননা গীতায় স্বয়ং ভগবানই বলেছেন–
'বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পন্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৫/১৮)।
অর্থাৎ : যাঁরা পণ্ডিত অর্থাৎ বেদোজ্জ্বল-বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁরা বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হাতি, কুকুর, চণ্ডাল সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন।

এই সমদৃষ্টির নমুনা বেদ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। ঋগ্বেদের সেই বিখ্যাত পুরুষ-সূক্ত স্মর্তব্য, যে সূক্তে বৈদিক সংহিতার শেষের যুগে উচ্চ-নীচ বর্ণবিশিষ্ট শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে। এই সূক্তে বিধাতার পা থেকে শূদ্রের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে–

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃহাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ।। (ঋগ্বেদ-১০/৯০/১)।
ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।। (ঋগ্বেদ-১০/৯০/১২)।
অর্থাৎ :
পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থিত থাকেন। (ঋক্-১০/৯০/১)।। এর (বিধাতা-পুরুষের) মুখ ব্রাহ্মণ হলো, দু বাহু রাজন্য হলো, যা উরু ছিলো তা বৈশ্য হলো, দু চরণ হতে শূদ্র হলো। (ঋক্-১০/৯০/১২)।।

যদি সহস্রশীর্ষ সহস্রপাদ সহস্রচক্ষু বিরাট বিধাতাপুরুষকে সমাজের সকল মানুষের সমন্বিত রূপের প্রতীকী কল্পনা বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে সূক্তটির তাৎপর্য দাঁড়াবে–
'সমাজের শ্রমজীবী ইতর জনসাধারণ, যারা শারীরিক শ্রমের দ্বারা উচ্চবর্গীয় মুরুব্বি মানুষের ভোগের উপকরণ তৈরি করছে, সমাজের ধনসম্পদ সৃষ্টি করছে, অথচ যে ধনসম্পদে তাদের কোনো অধিকার নেই, সমাজের ভারবাহী সেই মানুষরূপী পশুদলের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে সমাজের সকলের নীচে। এ বক্তব্যের পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে হলে আমাদের আবার তৈত্তিরীয় সংহিতা-র শরণাপন্ন হতে হবে।'- (চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১৬)। 'তৈত্তিরীয়-সংহিতা'র ঋষির এই তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যটি হলো–
'...অন্বসৃজ্যত বৈরাজং সাম শূদ্রো মনুষ্যাণামশ্বঃ পশুনাং তস্মাত্তৌ ভূতসংক্রামিণাবশ্বশ্চ শূদ্রশ্চ তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেহনবক্লপ্তো ন হি দেবতা অন্বসৃজ্যত তস্মাৎ পাদাবুপ জীবতঃ পত্তো হ্যসৃজ্যেতাং প্রাণা বৈ ত্রিবৃদর্দ্ধমাসাঃ পঞ্চদশঃ প্রজাপতিঃ সপ্তদশস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশ এতস্মিন্বা এতে শ্রিতা এতস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা য এবং বেদৈতাস্মিন্নেব শ্রয়ত এতস্মিন্ প্রতি তিষ্ঠতি।। (কৃষ্ণযজুর্বেদ-সংহিতা-৭/১/১)।
অর্থাৎ :
...শূদ্র ও অশ্ব বিধাতার পা থেকে জন্মেছে। সুতরাং অশ্ব যেমন ব্রাহ্মণাদি উচ্চ ত্রিবর্ণের ভার বহন করে, তাদের আদেশ পালন করে, শূদ্রও তেমনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের আজ্ঞাবহ দাসরূপে বিচরণ করবে। অর্থাৎ এরা সম্পূর্ণভাবে উচ্চবর্ণের অধীন। উচ্চবর্ণের সেবা করাই এদের একমাত্র ধর্ম। এজন্যই শূদ্রের বৈদিক ক্রিয়াকলাপে কোনো অধিকার নেই। (হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়-কৃত মন্ত্র ও সায়ণ-ভাষ্যের তর্জমা)

হিন্দু দার্শনিক ও ধর্মশাস্ত্রকাররা যে বেদকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখেননি তথা বেদের কোন্ অংশ পূর্ব যুগে রচিত আর কোন্ অংশ পরবর্তী যুগে রচিত এ সমস্যা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাননি তা বুঝা যায় তাঁদের মতে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যই ঈশ্বরের বাণী অথবা অনাদি অপৌরুষেয় বাণী হিসেবে সকল বিধানই তর্কাতীতভাবে মেনে নেয়ার অভ্যস্ততা থেকে। তাই

বেদবাণী অনুসরণ করেই ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানভাজন মনুসংহিতায় শূদ্রদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী নৃশংস বিধানসমূহ রচিত হয়েছে। চার্বাকদর্শনের সামাজিক তাৎপর্য অনুধাবনে বেদসম্মত সমাজসংগঠনে ব্রাহ্মণ্যবাদী গ্রন্থ মনুসংহিতার অন্তর্গত দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলেই কেন ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী লোকায়তিক চার্বাক-মত উত্থান অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো তা বুঝতে সহায়ক হবে।

…

মনুর ব্রাহ্মণ্যবাদ মনুসংহিতা :
পৃথিবীতে যতগুলো কথিত ধর্মগ্রন্থ রয়েছে তার মধ্যে মনে হয় অন্যতম বর্বর, নীতিহীন, শঠতা আর অমানবিক প্রতারণায় পরিপূর্ণ গ্রন্থটির নাম হচ্ছে 'মনুস্মৃতি' (Manu-smriti) বা 'মনুসংহিতা' (Manu-samhita)। ব্রাহ্মণ্যবাদের (Hinduism) আকর গ্রন্থ শ্রুতি বা 'বেদ'-এর নির্যাসকে ধারণ করে যেসব স্মৃতি বা শাস্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে কথিত, তার শীর্ষে অবস্থান করছে মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা। তাই মনুসংহিতা ও ব্রাহ্মণ্যবাদকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। মনুসংহিতা মানেই ব্রাহ্মণ্যবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ মানেই মনুসংহিতা। এটাকে তৎকালীন বৈদিক আর্য সমাজ ও প্রচলিত হিন্দু সমাজের অবশ্য পালনীয় পবিত্র সংবিধান বা সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ জীবনাচরণবিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বারোটি অধ্যায়ে প্রায় দুহাজার সাতশত শ্লোক সংবলিত এ গ্রন্থটির পাতায় পাতায় ধর্মীয় বিধানের নাম দিয়ে সংস্কৃত অক্ষরে অক্ষরে যে শ্লোকগুলো উৎকীর্ণ রয়েছে, অধিকাংশ শ্লোকের ভাবার্থকে যদি মনুষ্য সমাজে পালনীয় নীতি হিসেবে বিবেচনা করতে হয়, তাহলে মানুষের সমাজে কোন মানবিক বোধ আদৌ রয়েছে বা অবশিষ্ট থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করাটাই অবিশ্বাস্য মনে হয়। এ ব্যাপারে কোন বিস্তৃত ব্যাখ্যায় না গিয়ে বরং মনুসংহিতা থেকে অনুবাদ ও ভাবার্থসহ কিছু শ্লোকের নমুনা-উদাহরণ টানলেই বিষয়গুলো আমাদের সামনে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে।

এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে অতঃপর স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কি আদতে মানুষ সৃষ্টি করলেন, না কি কিছু বিভেদপূর্ণ বর্ণ (varnas) (জাতি) সৃষ্টি করলেন, মনুসংহিতা পাঠ করলে তা প্রশ্ন হিসেবেই থেকে যায়। তবে গোটা গ্রন্থে যেখানে যা কিছুই বলা হয়েছে জাতি হিসেবে ব্রহ্মাসৃষ্ট বর্ণগুলোকেই বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

সর্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহুরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্মাণ্যকল্পয়ৎ।। (মনুসংহিতা-১/৮৭)
অর্থাৎ : এই সকল সৃষ্টির অর্থাৎ ত্রিভুবনের রক্ষার জন্য মহাতেজযুক্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজের মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ– এই চারটি অঙ্গ থেকে জাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের পৃথক পৃথক কার্যের ব্যবস্থা করে দিলেন।
.
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ।। (মনুসংহিতা-১/৮৮)
অর্থাৎ : অধ্যাপন, স্বয়ং অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ (উপহার বা দান-সামগ্রি গ্রহণ)– এই ছয়টি কাজ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দেশ করে দিলেন।
.
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েস্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।। (মনুসংহিতা-১/৮৯)
অর্থাৎ : প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, নৃত্যগীতবনিতাদি-বিষয়ভোগে অনাসক্তি, এই

কয়েকটি কাজ ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়গণের জন্য সংক্ষেপে নিরূপিত করলেন।

.

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ।। (মনুসংহিতা-১/৯০)
অর্থাৎ : পশুদের রক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য (স্থলপথ ও জলপথ প্রভৃতির মাধ্যমে বস্তু আদান-প্রদান করে ধন উপার্জন), কুসীদ (বৃত্তিজীবিকা– টাকা সুদে খাটানো) এবং কৃষিকাজ– ব্রহ্মা কর্তৃক বৈশ্যদের জন্য নিরূপিত হল।

.

অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াদ্ ব্রাহ্মণস্ত্বেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ।। (মনুসংহিতা-১০/১)
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য– এই তিনবর্ণের লোকেরা দ্বিজাতি; এঁরা নিজনিজ কর্তব্য কর্মে নিরত থেকে বেদ অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণেরাই অধ্যাপনা করবেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণের পক্ষে অধ্যাপনা করা উচিত নয়।– এটাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

.

এতমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া।। (মনুসংহিতা-১/৯১)
অর্থাৎ : প্রভু ব্রহ্মা শূদ্রের জন্য একটি কাজই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন,– তা হলো কোনও অসূয়া অর্থাৎ নিন্দা না করে (অর্থাৎ অকপটভাবে) এই তিন বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষা করা।

উপরোক্ত শ্লোকগুলো থেকে আমরা এটা বুঝে যাই যে, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা গোটা বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন তো বটেই। তবে এই বিশ্ব-জগৎ সুষ্ঠুভাবে রক্ষাকল্পে তিনি আসলে কোন মানুষ সৃষ্টি করেন নি। চারটি বর্ণ সৃষ্টি করলেন– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের আবার দুটো ভাগ– প্রথম তিনটি উচ্চ বর্ণ, আর চতুর্থটি অর্থাৎ শূদ্র হচ্ছে নিম্নবর্ণ, যে কিনা উচ্চবর্ণীয়দের সেবাদাস। আবার ব্রাহ্মণ, যে কিনা কোন শারীরিক শ্রমের সাথে কোনভাবেই জড়িত নয়, সকল বর্ণের শীর্ষে। শুধু শীর্ষেই নয়, ক্ষমতার এতোটাই কল্পনাতীত উচ্চ অবস্থানে অবস্থিত যে, জগতের সবকিছুর মালিক বা প্রভণ্ডু হচ্ছে ব্রাহ্মণ। সন্দেহ তীব্র হলে নিচের শ্লোকগুলো দেখা যেতে পারে–

উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ।। (মনুসংহিতা-১/৯৩)
অর্থাৎ : ব্রহ্মার পবিত্রতম মুখ থেকে উৎপন্ন বলে, সকল বর্ণের আগে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হওয়ায়, এবং বেদসমূহ ব্রাহ্মণকর্তৃক রক্ষিত হওয়ার জন্য (বা বেদসমূহ ব্রাহ্মণেরাই পঠন-পাঠন করেন বলে)– ব্রাহ্মণই ধর্মের অনুশাসন অনুসারে এই সৃষ্ট জগতের একমাত্র প্রভু।

.

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে।। (মনুসংহিতা-১/৯৯)
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করা মাত্রই পৃথিবীর সকল লোকের উপরিবর্তী হন অর্থাৎ সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। কারণ, ব্রাহ্মণই সকলের ধর্মকোষ অর্থাৎ ধর্মসমূহ রক্ষার জন্য প্রভুসম্পন্ন হয়ে থাকেন।

.
সর্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্বং বৈ ব্রাহ্মণোহর্হতি।। (মনুসংহিতা-১/১০০)
অর্থাৎ : জগতে যা কিছু ধনসম্পত্তি সে সমস্তই ব্রাহ্মণের নিজ ধনের তুল্য; অতএব সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ব্রাহ্মণই সমুদয় সম্পত্তিরই প্রাপ্তির যোগ্য হয়েছেন।

.
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ।। (মনুসংহিতা-১/১০১)
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণ যে পরের অন্ন ভোজন করেন, পরকীয় বসন পরিধান করেন, পরের ধন গ্রহণ করে অন্যকে প্রদান করেন, সে সবকিছু ব্রাহ্মণের নিজেরই। কারণ, ব্রাহ্মণেরই আনৃশংস্য অর্থাৎ দয়া বা করুণাতেই অন্যান্য যাবতীয় লোক ভোজন-পরিধানাদি করতে পারছে।

.
ন তং স্তেনা ন চামিত্রা হরন্তি ন চ নশ্যতি।
তস্মাদ্রাজ্ঞা নিধাতব্যো ব্রাহ্মণেষবক্ষয়ো নিধিঃ।। (মনুসংহিতা-৭/৮৩)
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণকে যে ভূমি-অর্থ প্রভৃতি দান করা হয় তা এমনই নিধি (ন্যস্ত সম্পত্তি) যে, সেই নিধি চোরেরা অপহরণ করতে পারে না, শত্রুরা হরণ করতে পারে না, এবং তা নিজেও নষ্ট বা অদৃষ্ট হয় না। এই জন্য রাজার কর্তব্য হল, ব্রাহ্মণগণের কাছে এই অক্ষয় নিধি ন্যস্ত করা।

.
সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে।। (মনুসংহিতা-৭/৮৫)
অর্থাৎ : অব্রাহ্মণকে যে বস্তু দান করা হয় তার সমপরিমাণ ফল পাওয়া যায়, তার দ্বারা অতিরিক্ত ফল হয় না। ব্রাহ্মণব্রুবকে (অর্থাৎ যিনি জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন নন) দান করলে পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেছেন, তাঁকে দান করলে লক্ষগুণ ফল লাভ হয়; এবং যিনি সমস্ত বেদশাখাধ্যেতা বেদপারগ ব্রাহ্মণ, তাঁকে দান করলে অনন্ত ফল লাভ হয়।

বুঝাই যাচ্ছে, কথিত ব্রহ্মার পবিত্রতম মুখ হতে সৃষ্ট বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই জগদীশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অতএব কাউকে কর দিয়ে ব্রাহ্মণের চলার কথা নয়। এবং তা-ই

মনুসংহিতার পাতায় পাতায় খুব ভালোভাবে জানান দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
মনুশাস্ত্রে রাজার কর্তব্য হিসেবে নিরাপদে রাজ্য পরিচালনার প্রয়োজনেই প্রজাদের কাছ থেকে কর ধার্য্য ও গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে–

নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনো মূলং পরেষাঞ্চাতিতৃষ্ণয়া।
উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনো মূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ।। (মনুসংহিতা-৭/১৩৯)
অর্থাৎ : কর, শুল্ক প্রভৃতি গ্রহণ না করে রাজা নিজের মূলোচ্ছেদন করবেন না অর্থাৎ রাজকোষ শূন্য করবেন না; এবং অতিলোভবশতঃ বেশি কর নিয়ে প্রজাদেরও মূল নষ্ট করবেন না। কারণ, এইভাবে নিজের ও পরের মূলোচ্ছেদ ঘটালে নিজেকে এবং প্রজাবর্গকে উৎপীড়িত করা হয়।

অতএব কার কাছ থেকে কিভাবে কী পরিমাণ কর আদায় করা হবে তার বিস্তারিত শ্লোক-বয়ান মনুশাস্ত্রে উদ্ধৃত রয়েছে। তবে সাধারণসূত্রে বলা হচ্ছে–

যৎ কিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসংজ্ঞিতম্।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগজনম্।। (মনুসংহিতা-৭/১৩৭)
অর্থাৎ : যে সব 'পৃথগ্জন' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শ্রোত্রিয় ছাড়া অন্য লোক কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি কোনও একটি ব্যবহার অর্থাৎ বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের কাছ থেকে রাজা বার্ষিক যৎ কিঞ্চিৎ হলেও কর গ্রহণ করবেন।

যে ব্রাহ্মণ কল্পশাস্ত্রের সাথে এক বেদ অথবা ব্যাকরণ প্রভৃতি ছয়টি বেদাঙ্গের সাথে বেদশাখা অধ্যয়ন করেন এবং বেদাধ্যয়নাদি কাজে নিরত থাকেন, তাঁকে 'শ্রোত্রিয়' বলা হয়। উপরোক্ত ৭/১৩৭ সংখ্যক শ্লোকে এই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও শ্রোত্রিয়ের কাছ থেকে কোনরূপ কর গ্রহণকে নিরস্ত করা হয়েছে। তবে মনুসংহিতার ১০/১২৯ সংখ্যক শ্লোকের দ্বারা (পরবর্তীতে নিচে বর্ণিত হয়েছে) শূদ্রের ধন-সম্পদ অর্জনকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও শূদ্রের কাছ থেকে কর আদায় নিষিদ্ধ হয়নি। যেহেতু তার অর্জিত সম্পদ থাকার কথা নয়, তাই এই কর পরিশোধ হবে বাধ্যতামূলক শ্রমদানের মাধ্যমে–

কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ।। (মনুসংহিতা-৭/১৩৮)
অর্থাৎ : পাচক, মোদক প্রভৃতি কারুক এবং কাংস্যকার, লৌহকার, শঙ্খকার প্রভৃতি শিল্পী ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী শূদ্র– এদের দ্বারা রাজা প্রতি মাসে একদিন করে নিজের কাজ করিয়ে নেবেন।

কিন্তু পরধন অর্জনে মত্ত ব্রাহ্মণের কাছে কোনক্রমেই কর নেয়া যাবে না। অর্থাভাবে রাজা মরণাপন্ন হলেও ক্ষতি নেই, তবু কোন ব্রাহ্মণ যেন রাজার রাজ্যে ক্ষুধায় মরণাপন্ন না হন, এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে–

ম্রিয়মাণোহপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম্।

ন চ ক্ষুধাহস্য সংসীদেচ্ছ্রোত্রিয়ো বিষয়ে বসন্।। (মনুসংহিতা-৭/১৩৩)
অর্থাৎ : রাজা ধনাভাবে মরণাপন্ন হলেও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কখনও যেন কর গ্রহণ না করেন। রাজার রাজ্যে বাস করতে থেকে কোনও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ যেন ক্ষুধায় মরণাপন্ন না হন।

মনুসংহিতার পরতে পরতে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতা প্রদান আর নিম্নবর্ণ শূদ্রের নিচত্ব ও তাকে বঞ্চনা করার কৌশল বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন, রাজকার্যে ও বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়া-অনুষ্ঠানে সবাইকে উদ্ধারের নিমিত্তে ক্ষমতাসীন পরামর্শক ব্রাহ্মণের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। প্রয়োজনীয় গুণ ও যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক ব্রাহ্মণ হলেই হলো, এবং তা-ই হতে হবে। কিন্তু যত যোগ্যতা বা গুণের আধারই হোক শূদ্রকে কিছুতেই নিয়োগ মর্যাদা দেয়া যাবে না।–
জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাদ্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্মপ্রবক্তা নৃপতের্ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন।। (মনুসংহিতা-৮/২০)
অর্থাৎ : বিদ্যা ও গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের অভাব হলে রাজা জাতিমাত্রোপজীবী অর্থাৎ জাতিসর্বস্ব ব্রাহ্মণকে অথবা ক্রিয়ানুষ্ঠানবিহীন ব্রাহ্মণব্রুবকেও (অর্থাৎ নামে মাত্র ব্রাহ্মণকেও) নিজের ধর্মপ্রবক্তার পদে (শাস্ত্রীয় আইন বিশ্লেষক) নিযুক্ত করবেন, কিন্তু শূদ্র যদি সর্বগুণসম্পন্ন, ধার্মিক এবং ব্যবহারজ্ঞও হয়, তবুও তাকে ঐ পদে নিয়োগ করতে পারবেন না।

শাস্ত্র বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ব্রাহ্মণকেই ধর্মপ্রবক্তা করার বিধান থাকায় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকেই ঐ কাজে নিযুক্ত করতে হয়। কাজেই ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অন্য তিন বর্ণের লোককে ধর্ম নিরূপণের কাজে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ। তবুও এখানে শূদ্রকে ঐ কাজে নিয়োগ করতে নিষেধ করার তাৎপর্য হলো, ঐ কাজের জন্য উপযুক্ত বিদ্বান ব্রাহ্মণ পাওয়া না গেলে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে ঐ কাজে হয়তো নিয়োগ করা যেতে পারে, কিন্তু কিছুতেই শূদ্রকে নয়। এই ব্রহ্মবিধি ভঙ্গ হলে কী পরিণতি হবে তাও মনুশাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে–
যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্মবিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ।। (মনুসংহিতা-৮/২১)
অর্থাৎ : বিচারসভায় যে রাজার সাক্ষাতে শূদ্র ন্যায়-অন্যায় ধর্ম বিচার করে, সেই রাজার রাজ্য কাদায় নিমগ্ন গোরুর মতো দেখতে দেখতে নষ্ট হয়ে যায়।

.
যদ্রাষ্ট্রং শূদ্রভূয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমদ্বিজম্।
বিনশ্যত্যাশু তৎ কৃৎস্নং দুর্ভিক্ষব্যাধিপীড়িতম্।। (মনুসংহিতা-৮/২২)
অর্থাৎ : যে রাজ্য ধর্মাধিকরণে (বিবাদ নিরূপণের ব্যাপারে–) শূদ্রের প্রাধান্য ও নাস্তিকদের প্রভুত্ব, এবং যেখানে দ্বিজগণের (ব্রাহ্মণদের) অভাব, সেই রাজ্য দুর্ভিক্ষ ও নানারকম রোগে পীড়িত হয়ে অতি শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

অপরাধ সংঘটন হলে রাজার বিচারে দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে মনুসংহিতার ৮/৩৭৯ সংখ্যক শ্লোক অনুযায়ী শাস্ত্রের বিধান হলো- প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধেও ব্রাহ্মণের এই দণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদনাদি করা যাবে না। যদিও অন্যান্য বর্ণের পক্ষে বধাদি প্রাণদণ্ডই বিধেয়। এছাড়া মনুশাস্ত্রে আরো বলা হচ্ছে–

ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্বপাপেষ্বপি স্থিতম্।
রাষ্ট্রাদেনং বহিষ্কুর্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতম্।। (মনুসংহিতা-৮/৩৮০)
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণ যে কোনও পাপ বা অপরাধই করুক না কেন (যত কিছু অপরাধ আছে সে সবগুলি একসাথে অনুষ্ঠান করলেও) রাজা তাকে হত্যা করবেন না; পরন্তু সমস্ত ধনের সাথে অক্ষত শরীরে তাকে রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করবেন।
কারণ–
ন ব্রাহ্মণবধাদ্ ভূয়ানধর্মো বিদ্যতে ভুবি।
তস্মাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।। (মনুসংহিতা-৮/৩৮১)
অর্থাৎ : এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণবধের তুলনায় গুরুতর অধর্ম (অর্থাৎ পাপ) আর কিছুই নেই। এই কারণে ব্রাহ্মণকে বধ (এবং অঙ্গচ্ছেদনাদি) করার কথা রাজা কখনও মনে মনেও চিন্তা করবেন না।

.

মনুষ্য সমাজে সন্তান জন্ম নিলে তার একক পরিচিতির জন্যে একটি নামের প্রয়োজন হয়। অবশ্য পালনীয় বৈদিক বিধি মনুসংহিতায় তা অস্বীকার করা হয়নি। তবে বর্ণপ্রথার কঠিন নিগড় নামকরণ ব্যবস্থার মধ্যেও পরিয়ে দেয়া হয়েছে সুকৌশলে। বিধি অনুসারে এমনভাবে নামকরণ করতে হবে, নাম থেকেই যেন বুঝা যায় কে উচ্চবর্ণের প্রভুবংশীয় এবং কে নিম্নবর্গীয় দাসজাত শূদ্রবংশীয়।–

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্।। (মনুসংহিতা-২/৩১)
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণের নাম হবে মঙ্গলবাচক শব্দ ('মঙ্গল' শব্দের অর্থ 'ধর্ম'; সেই ধর্মের সাধক 'মঙ্গল্য'; ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাবাচক শব্দ বা ঋষিবাচক শব্দ মঙ্গলের সাধন, তাই 'মঙ্গল্য'; যেমন- ইন্দ্র, বায়ু, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি); ক্ষত্রিয়ের নাম হবে বলসূচক শব্দ (যেমন, প্রজাপাল, দুর্যোধন, নৃসিংহ প্রভৃতি); বৈশ্যের নাম হবে ধনবাচক অর্থাৎ পুষ্টিবৃদ্ধিসমন্বিত (যেমন ধনকর্মা, গোমান, ধনপতি প্রভৃতি) এবং শূদ্রের নাম হবে জুগুপ্সিত (নিন্দা বা হীনতাবোধক, যেমন- কৃপণক, দীন, শবরক ইত্যাদি)।

.

শর্মবদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্ রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্।। (মনুসংহিতা-২/৩২)
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণের নামের সাথে শর্মা এই উপপদ যুক্ত হবে (অর্থাৎ আগে মঙ্গলবাচক শব্দ তারপর 'শর্মা' এই উপপদ যুক্ত হবে; যেমন শুভশর্মা), ক্ষত্রিয়ের নামের সাথে 'বর্মা' বা

এইরকম কোনও রক্ষাবাচক উপাধি যুক্ত হবে; (যেমন বলবর্মা), বৈশ্যের নামের সাথে যুক্ত হবে 'বৃদ্ধ, গুপ্ত, ভূতি' প্রভৃতি পুষ্টিবোধক উপপদ (যেমন গোবৃদ্ধ, ধনগুপ্ত, বসুভূতি প্রভৃতি) এবং শূদ্রের নামের উপাধি হবে প্রৈষ্য (দাস বা ভৃত্য) বাচক শব্দ (যেমন দীনদাস, ব্রাহ্মণদাস, দেবদাস প্রভৃতি)।

সম্পদ অর্জন এবং তা নিজের অধিকারে রাখার প্রচেষ্টা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনেই এককালে ব্যক্তির উত্তরাধিকার তৈরি জরুরি হয়ে পড়ে। এবং এ কারণেই মানব সমাজে বিবাহপ্রথার সৃষ্টি হয় বলে সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত। বৈদিক সমাজে বিবাহকে অন্যতম ধর্মানুষ্ঠানের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানেও বৈষম্যবাদী বর্ণপ্রথার তীব্র উপস্থিতি। বিশেষ করে নিম্নবর্গীয় শূদ্রনারীকে উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা ভোগ করার ব্যবস্থা পাকা করা হলেও শূদ্রদের জন্য কোন মর্যাদা বা সুযোগ না রেখে সর্বতোভাবে বঞ্চিত করার কূটকৌশলী প্রয়াস মনুসংহিতার বিবাহ ব্যবস্থায় তীব্রভাবে লক্ষ্যণীয়।–

সবর্ণাহগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।। (মনুসংহিতা-৩/১২)
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য– এই দ্বিজাতিগণের দারপরিগ্রহব্যাপারে সর্বপ্রথমে (অর্থাৎ অন্য নারীকে বিবাহ করার আগে) সমানজাতীয়া কন্যাকেই বিবাহ করা প্রশস্ত। কিন্তু কামনাপরায়ণ হয়ে পুনরায় বিবাহে প্রবৃত্ত হলে (অর্থাৎ সবর্ণাকে বিবাহ করা হয়ে গেলে তার উপর যদি কোনও কারণে প্রীতি না জন্মে অথবা পুত্রের উৎপাদনের জন্য ব্যাপার নিষ্পন্ন না হলে যদি কাম-প্রযুক্ত অন্যস্ত্রী-অভিলাষ জন্মায় তাহলে) দ্বিজাতির পক্ষে বক্ষ্যমাণ নারীরা প্রশস্ত হবে। (পরবর্তী শ্লোকে তা বর্ণিত হয়েছে)

.

শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ।। (মনুসংহিতা-৩/১৩)
অর্থাৎ : একমাত্র শূদ্রকন্যাই শূদ্রের ভার্যা হবে; বৈশ্য সজাতীয়া বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করতে পারে; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সবর্ণা ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যা ও শূদ্রা ভার্যা হতে পারে; আর ব্রাহ্মণের পক্ষে সবর্ণা ব্রাহ্মণকন্যা এবং ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা ভার্যা হতে পারে।

অর্থাৎ এখানে 'অনুলোম' বিবাহের বিষয়টিকেই অনুমোদন করা হয়েছে। উচ্চবর্ণের পুরুষের সাথে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলে। এর বিপরীত বিবাহের নাম প্রতিলোম বিবাহ। প্রতিলোম বিবাহ সকল স্মৃতিকারদের দ্বারাই নিন্দিত। মনু মনে করেন, প্রথমে সজাতীয়া কন্যার সাথে বিবাহই প্রশস্ত। পুনর্বিবাহের ইচ্ছা হলে অনুলোম-বিবাহের সমর্থন দেয়া হয়েছে।
কিন্তু এখানেও অন্য ভার্যায় সমস্যা নেই, শূদ্রা ভার্যার ক্ষেত্রেই যত বিপত্তি।–

দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তং ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি।। (মনুসংহিতা-৩/১৮)

অর্থাৎ : শূদ্রা ভার্যা গ্রহণের পর যদি ব্রাহ্মণের দৈবকর্ম (দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ বা যে ব্রাহ্মণভোজনাদি হয়, তা), পিত্র্যকর্ম (পিতৃপুরুষের প্রতি করণীয় কর্ম যেমন শ্রাদ্ধ, উদক-তর্পণ প্রভৃতি) এবং আতিথেয় কর্ম (যেমন অতিথির পরিচর্যা, অতিথিকে ভোজন দান প্রভৃতি) প্রভৃতিতে শূদ্রা ভার্যার প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ ঐ কর্মগুলি যদি শূদ্রা স্ত্রীকর্তৃক বিশেষরূপে সম্পন্ন হয়, তাহলে সেই দ্রব্য পিতৃপুরুষগণ এবং দেবতাগণ ভক্ষণ করেন না এবং সেই গৃহস্থ ঐ সব দেবকর্মাদির ফলে স্বর্গেও যান না (অর্থাৎ সেই সব কর্মানুষ্ঠান নিষ্ফল হয়)।

অর্থাৎ শূদ্রা নারী ব্রাহ্মণের প্রথম পরবর্তী ভার্যা হয়ে ব্রহ্মভোগের বস্তু হলো ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর কোনো মর্যাদাই তার প্রাপ্য হয় না। আর যদি সে প্রথম বিয়ে করা স্ত্রী হয়?–

শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।। (মনুসংহিতা-৩/১৭)
অর্থাৎ : সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করে শূদ্রা নারীকে প্রথমে বিবাহ করে নিজ শয্যায় গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ অধোগতি (নরক) প্রাপ্ত হন; আবার সেই স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েন (অর্থাৎ সমানজাতীয়া নারী বিবাহ না করে দৈবাৎ শূদ্রা বিবাহ করলেও তাতে সন্তান উৎপাদন করা ব্রাহ্মণের উচিত নয়)।

এছাড়া ব্যভিচারের দণ্ডের ক্ষেত্রেও বৈষম্যবাদী বর্ণপ্রথা চোখে পড়ার মতো–

শূদ্রো গুপ্তমগুপ্তং বা দ্বৈজাতং বর্ণমাবসন্।
অগুপ্তমঙ্গসর্বস্বৈর্গুপ্তং সর্বেণ হীয়তে।। (মনুসংহিতা-৮/৩৭৪)
অর্থাৎ : কোনও দ্বিজাতি-নারী (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নারী) স্বামীর দ্বারা রক্ষিত হোক্ বা না-ই হোক্, কোনও শূদ্র যদি তার সাথে মৈথুন ক্রিয়ার দ্বারা উপগত হয়, তাহলে অরক্ষিতা নারীর সাথে সঙ্গমের শাস্তিস্বরূপ তার সর্বস্ব হরণ এবং লিঙ্গচ্ছেদনরূপ দণ্ড হবে, আর যদি স্বামীর দ্বারা রক্ষিতা নারীর সাথে সম্ভোগ করে তাহলে ঐ শূদ্রের সর্বস্বহরণ এবং মারণদণ্ড হবে।

অথচ উচ্চবর্ণিয়দের ক্ষেত্রে একই অপরাধের জন্য বিবিধ বিধানের মাধ্যমে মনুশাস্ত্রে বর্ণক্রমানুসারে বিভিন্ন মাত্রার কিছু অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে মাত্র।

.

বৈদিক শাস্ত্র মনুসংহিতায় বলা হচ্ছে যে, ব্রহ্মা তাঁর পা থেকে শূদ্রের সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ শূদ্রের জন্ম নিজে নিজে বা তার ইচ্ছায় হয়নি বা এ প্রক্রিয়ায় তার কোন কর্মদোষও জড়িত নেই। জড়িত কেবল স্রষ্টা ব্রহ্মার তীব্র বৈষম্যমূলক দৃষ্টি। অথচ মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি অন্য বর্ণকে যে অমানবিক আচরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা এককথায় ন্যাক্কারজনক।–

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।

ন চাস্যোপদিশেদ্ ধর্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ।। (মনুসংহিতা-৪/৮০)
অর্থাৎ : শূদ্রকে কোন মন্ত্রণা-পরামর্শ দেবে না। শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দান করবে না। যজ্ঞের হবির জন্য যা 'কৃত' অর্থাৎ সঙ্কল্পিত এমন দ্রব্য শূদ্রকে দেবে না; শূদ্রকে কোনও ধর্মোপদেশ করবে না এবং কোনও ব্রত বা প্রায়শ্চিত্ত করতেও উপদেশ দেবে না।

কেউ এ বিধান অমান্য করলে তার পরিণতি বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

যো হ্যস্য ধর্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোহসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি।। (মনুসংহিতা-৪/৮১)
অর্থাৎ : যে ব্যক্তি (কোন ব্রাহ্মণকে ব্যবধানে না রেখে) নিজে শূদ্রকে ধর্মোপদেশ দেন, বা প্রায়শ্চিত্তাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করতে আদেশ দেন, তিনি সেই শূদ্রের সাথে অসংবৃত নামক গহন নরকে নিমগ্ন হন।

আর তাই খুব সঙ্গত কারণেই ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিভূ ও শব্দ-প্রমাণক হিসেবে মহর্ষি বাদরায়ণও শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার প্রসঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত টেনে বেদান্তসূত্রে বলেছেন–

'শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেঃ চ'।। (ব্রহ্মসূত্র-১/৩/৩৮)।।
ভাবার্থ : যেহেতু স্মৃতি শাস্ত্রেও শূদ্রদের বেদের শ্রবণ, অধ্যয়ন এবং তদর্থজ্ঞান নিষিদ্ধ, তাই শূদ্রদের ব্রহ্মজ্ঞানলাভেরও অধিকার নাই।

উল্লেখ্য যে, মনুশাস্ত্রে শূদ্রের কোনরূপ সম্পদ অর্জনকেও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।–

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে।। (মনুসংহিতা-১০/১২৯)
অর্থাৎ : 'ধন অর্জনে সমর্থ হলেও শূদ্রকে কিছুতেই ধন সঞ্চয় করতে দেওয়া চলবে না, কেননা ধন সঞ্চয় করলে ব্রাহ্মণদের কষ্ট হয়। শাস্ত্রজ্ঞানহীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের পরিচর্যা না করে অবমাননা করতে পারে।'

এই যখন অবস্থা– সম্পদ অর্জন নয়, কোনরূপ খাবার সরবরাহও নয়, তাহলে শূদ্রদের বেঁচে থাকার উপায়? উপায় একটা রয়েছে বৈ কি। এক্ষেত্রে যেসব জন্মদাস শূদ্র ব্রাহ্মণ বা অন্য উচ্চবর্ণীয়দের সেবা শুশ্রূষায় কৃতপরায়ণ হবে তাদের প্রতি অবশ্য কিছুটা করুণা দেখানো হয়েছে। যেমন–

শূদ্রাণাং মাসিকং কার্যং বপনং ন্যায়বর্তিনাম্।
বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজনম্।। (মনুসংহিতা-৫/১৪০)
অর্থাৎ : ন্যায়চরণকারী শূদ্রগণ (অর্থাৎ সে সব শূদ্র ব্রাহ্মণ-শুশ্রূষা পরায়ণ) মাসে মাসে কেশ বপন (অর্থাৎ কেশমুণ্ডন) করবে এবং জননশৌচে ও মরণাশৌচে বৈশ্যের মত অশৌচ পালনের পর শুদ্ধ হবে এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করবে।

.

উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ।। (মনুসংহিতা-১০/১২৫)
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অন্ন, জীর্ণ-পরিত্যক্ত বস্ত্র, ধানের পুলাক অর্থাৎ আগড়া (অসার ধান) এবং জীর্ণ পুরাতন 'পরিচ্ছদ' অর্থাৎ শয্যা-আসন প্রভৃতি আশ্রিত শূদ্রকে দেবেন।

মনুসংহিতায় বর্ণিত সামাজিক বিচার ব্যবস্থায় দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বর্ণবৈষম্যের তীব্রতা লক্ষ করা যায়। অধমর্ণদের প্রতি উত্তমর্ণের খারাপ আচরণের দণ্ডের সাথে উত্তমর্ণের প্রতি অধমর্ণের খারাপ আচরণের দণ্ডে যথেষ্ট ভেদ রয়েছে। কিন্তু নিম্নবর্ণ শূদ্র ও অন্ত্যজদের প্রতি দণ্ড প্রয়োগের বিধি একেবারেই অমানবিকতায় পর্যবসিত হতে দেখা যায়।–
পঞ্চাশদ্ ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যে স্যাদর্দ্ধপঞ্চাশৎ শূদ্রে দ্বাদশকো দমঃ।। (মনুসংহিতা-৮/২৬৮)
অর্থাৎ : (উত্তমর্ণ) ব্রাহ্মণ যদি (অধমর্ণ অনুসারে) ক্ষত্রিয়ের প্রতি আক্রোশন বা গালিগালাজ করে তা হলে তার পঞ্চাশ দণ্ড হবে, বৈশ্যের প্রতি করলে পঁচিশ পণ এবং শূদ্রের প্রতি করলে বারো পণ দণ্ড হবে।

.
শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমর্হতি।
বৈশ্যোহ প্যর্দ্ধশতং দ্বে বা শূদ্রস্তু বধমর্হতি।। (মনুসংহিতা-৮/২৬৭)
অর্থাৎ : ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণকে গালাগালি দেয় তা হলে তার এক শ পণ দণ্ড হবে। এই একই অপরাধে বৈশ্যের দণ্ড হবে দেড় শ কিংবা দুই শ পণ; আর শূদ্র শারীরিক দণ্ড প্রাপ্ত হবে (এই দণ্ড অপরাধের তীব্রতা অনুযায়ী বধ পর্যন্ত হতে পারে)।
এই শারীরিক দণ্ড কেমন হবে তাও বিশদ ব্যাখ্যাকারে বর্ণিত হয়েছে–
যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেৎ শ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্।। (মনুসংহিতা-৮/২৭৯)
অর্থাৎ : শূদ্র কিংবা অন্ত্যজ ব্যক্তি (শূদ্র থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত নিকৃষ্ট জাতি) দ্বিজাতিগণকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) যে অঙ্গের দ্বারা পীড়ন করবে তার সেই অঙ্গ ছেদন করে দেবে, এটি মনুর নির্দেশ।
মনুশাস্ত্র অনুযায়ী–
একজাতি শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য- এইসব দ্বিজাতিকে দারুণ কথা বলে গালি দেয় তা হলে তার জিহ্বাছেদন কর্তব্য (মনুসংহিতা-৮/২৭০), যদি নাম ও জাতি তুলে আক্রোশন করে তবে তার মুখের মধ্যে দশ-আঙুল পরিমাণ জ্বলন্ত লৌহময় কীলক প্রবেশ করিয়ে দেবে (মনুসংহিতা-৮/২৭১), যদি ঔদ্ধত্যবশতঃ ব্রাহ্মণকে "তোমার এই ধর্ম অনুষ্ঠেয়, এখানে ধর্মানুষ্ঠানে তোমাকে এই সব কাজ করতে হবে" এইসব বলে ধর্মোপদেশ করে তা হলে রাজা তার মুখে ও কানে উত্তপ্ত তেল ঢেলে দেবেন (মনুসংহিতা-৮/২৭২), যদি হাত উঁচিয়ে কিংবা লাঠি উঁচিয়ে ক্রোধের সাথে উচ্চ জাতিকে প্রহার করে তবে তার হাত কেটে দেবে এবং পায়ের দ্বারা যদি ক্রোধের সাথে প্রহার করে তা হলে পা কেটে দেবে

(মনুসংহিতা-৮/২৮০), ঔদ্ধত্যবশতঃ ব্রাহ্মণের গায়ে থুতু-গয়ের প্রভৃতি দিলে রাজা অপরাধীর ওষ্ঠদ্বয় কেটে দেবেন, মূত্রাদি ত্যাগ করলে পুরুষাঙ্গ এবং পায়ুবায়ু ত্যাগ করলে মলদ্বার কেটে দেবেন (মনুসংহিতা-৮/২৮২)। (অপমান করার অভিপ্রায়ে কোনও শূদ্র যদি ঔদ্ধত্যবশতঃ) ব্রাহ্মণের চুল ধরে টানে, কিংবা পা, দাড়ি, গ্রীবা (গলা) কিংবা বৃষণ (অণ্ডকোষ) ধরে টানে তাহলে রাজা কোন রকম বিচার না করেই ঐ শূদ্রের দুটি হাতই কেটে দেবেন (মনুসংহিতা-৮/২৮৩)।

শুধু তা-ই নয়–
ব্রাহ্মণান্ বাধমানন্তু কামাদবরবর্ণজম্।
হন্যাচ্চিত্রৈর্বধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈর্নৃপঃ।। (মনুসংহিতা-৯/২৪৮)
অর্থাৎ : যদি কোনও শূদ্র ইচ্ছাপূর্বক ব্রাহ্মণকে শারীরিক বা আর্থিক পীড়া দেয়, তাহলে অতি কষ্টপ্রদ নানা উদ্বেগজনক-উপায়ে (যেমন শূলে চড়িয়ে, মস্তক ছেদন করে দীর্ঘকাল যন্ত্রণা ভোগ করিয়ে) সেই শূদ্রকে বধ করা উচিত।
তাছাড়া–
সহাসনমভিপ্রেপ্সু রুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্বাস্যঃ স্ফিচং বাহস্যাবকর্তয়েৎ।। (মনুসংহিতা-৮/২৮১)
অর্থাৎ : যদি কোন শূদ্রজাতীয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সঙ্গে এই আসনে বসে তা হলে তার কোমরে ছেঁকা লাগিয়ে দাগ দিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে কিংবা তার পাছা খানিকটা কেটে দেবে।

শূদ্রজন্ম যে প্রকৃত অর্থেই দাসজন্ম, এ বিষয়টা যাতে কারো কাছে অস্পষ্ট না থাকে সেজন্যে মনুশাস্ত্রে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে–
শূদ্রং তু কারয়েদ্ দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা।। (মনুসংহিতা-৮/৪১৩)
অর্থাৎ : ক্রীত অর্থাৎ অন্নাদির দ্বারা প্রতিপালিত হোক্ বা অক্রীতই হোক্ শূদ্রের দ্বারা ব্রাহ্মণ দাসত্বের কাজ করিয়ে নেবেন। যেহেতু, বিধাতা শূদ্রকে ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

.
ন স্বামিনা নিসৃষ্টোহপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তত্তস্য কস্তস্মাত্তদপোহতি।। (মনুসংহিতা-৮/৪১৪)
অর্থাৎ : প্রভু শূদ্রকে দাসত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেও শূদ্র দাসত্ব কর্ম থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। দাসত্বকর্ম তার স্বভাবসিদ্ধ কর্ম (অর্থাৎ জন্মের সাথে আগত)। তাই ঐ শূদ্রের কাছ থেকে কে দাসত্ব কর্ম সরিয়ে নিতে পারে ?

.
বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্মাণি কারয়েৎ।
তৌ হি চ্যুতৌ স্বকর্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ।। (মনুসংহিতা-৮/৪১৮)

অর্থাৎ : রাজা বিশেষ যত্ন সহকারে বৈশ্য এবং শূদ্রকে দিয়ে তাদের কাজ অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যাদি করিয়ে নেবেন। কারণ, তারা নিজ নিজ কাজ ত্যাগ করলে এই পৃথিবীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলবে।

অর্থাৎ শূদ্রকে তার নিজ কর্মের বাইরে বিকল্প জীবিকা গ্রহণের কোন সুযোগও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অথচ উচ্চবর্ণিয়দের জন্য প্রতিকুল সময়ে ভিন্ন জীবিকা গ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ এই মনুসংহিতায় বিশদভাবেই দেয়া হয়েছে।

ব্রাহ্মণদের প্রভূত্বকামী শাসনব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রধান অস্ত্রই হলো চতুবর্ণ প্রথা। অর্থাৎ সমাজে চারটি বর্ণের উপস্থিতি– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এই প্রথার মাধ্যমে গোটা জনগোষ্ঠিকে এক অদ্ভুত বর্ণবৈষম্যের মধ্য দিয়ে বিভাজিত করে যে ‘ভাগ করো, শাসন করো’ নীতি কায়েম করা হয়েছে, সেখানে স্বঘোষিত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের আধিপত্য প্রশ্নহীন করে রাখা হয়েছে। বর্ণ-মর্যাদার দিক থেকে এর পরই রাজদণ্ডধারী ক্ষত্রিয়ের অবস্থান। তার নিচে বৈশ্য এবং সর্বনিকৃষ্ট বর্ণ শূদ্র। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, সেখানে কোন মানুষের উল্লেখ নাই বললেই চলে। অর্থাৎ মানুষ সম্পর্কিত ধারণা বা মানব সমাজটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে আগ্রাসনবাদী বৈদিক সমাজের সর্বগ্রাসী বর্ণ-বিভেদের ছায়ায়। গোটা মনুসংহিতার কোথাও কোনভাবে মানুষ নামের কোন স্বতন্ত্র সত্তার বা মানব জাতির অস্তিত্ব প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে– চারটি বর্ণভিত্তিক ব্রাহ্মণ জাতি, ক্ষত্রিয় জাতি, বৈশ্য জাতি ও শূদ্র জাতি। তবে চতুর্বর্ণের বাইরে আরেকটি গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে– অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য। অর্থাৎ অস্তিত্ব থাকলেও সমাজ যাকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করে না।

যেহেতু চারটি বর্ণ নিয়ে সমাজ, তাই এই অস্পৃশ্যরা বর্ণ-বিভাগেরও বাইরে। মনুসংহিতায় এদেরকে ‘সঙ্করজাতি’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে এরা কি এই বৈদিক সমাজ বা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়? একটা অস্পষ্ট বিভ্রান্তি থেকে যায়–

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।। (মনুসংহিতা-১০/৪)

অর্থাৎ : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে উপনয়ন সংস্কারের বিধান থাকায় এরা ‘দ্বিজাতি’ নামে অভিহিত হয়। আর চতুর্থ বর্ণ শূদ্র উপনয়নসংস্কার বিহীন হওয়ায় দ্বিজাতি নয়, তারা হলো ‘একজাতি’। এছাড়া পঞ্চম কোনও বর্ণ নেই অর্থাৎ ঐ চারটি বর্ণের অতিরিক্ত যারা আছে তারা সকলেই সঙ্করজাতি।

প্রাসঙ্গিকভাবেই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত চারজাতীয় মানুষই হলো চারটি বর্ণ। এ ছাড়া বর্বর, কৈবর্ত প্রভৃতি অন্যান্য যে সব মানুষ আছে তারা সঙ্কীর্ণযোনি বা বর্ণসঙ্কর। চারটি বর্ণের মধ্যে তিনটি বর্ণ ‘দ্বিজাতি’ অর্থাৎ এদের দুবার জন্ম হয়; কারণ দ্বিতীয়-জন্ম উৎপাদক উপনয়ন-সংস্কার কেবল ঐ তিনটি বর্ণের পক্ষেই শাস্ত্রমধ্যে বিহিত

আছে। শূদ্র হলো একজাতি অর্থাৎ ওদের একবার মাত্র জাতি বা জন্ম হয়, কারণ শূদ্রের পক্ষে উপনয়ন-সংস্কারের বিধান নেই। অতএব অনিবার্যভাবে শূদ্ররা হলো নিম্নবর্ণ। ফলে এরা ব্রত যজ্ঞ অনুষ্ঠানাদি পালনের যোগ্য হতে পারে না।

এবার বর্ণসঙ্কর বিষয়ে মনুর বৈদিক অভিজ্ঞানশ্রুতি থেকে কিঞ্চিৎ ধারণা নিতে পারি।–
সর্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে।। (মনুসংহিতা-১০/৫)
অর্থাৎ : সকল বর্ণের পক্ষেই স্বপরিণীতা ও অক্ষতযোনি (অর্থাৎ প্রথমবিবাহিতা এবং যার সাথে আগে কোনও পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক হয় নি) সবর্ণ বা সমান জাতির নারীর গর্ভে সবর্ণ পতিকর্তৃক উৎপাদিত সন্তান পিতামাতার জাতি থেকে অভিন্ন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণকর্তৃক উৎপাদিত সন্তান 'ব্রাহ্মণ'হবে; ক্ষত্রিয়কর্তৃক এই রকম ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তান 'ক্ষত্রিয়' হবে; বৈশ্যকর্তৃক স্বপরিণীতা ও অক্ষতযোনি বৈশ্যার গর্ভে উৎপাদিত সন্তান 'বৈশ্য' এবং শূদ্রকর্তৃক ঐ রকম শূদ্রার গর্ভে উৎপাদিত সন্তান 'শূদ্র' হবে। এসব ছাড়া অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান জনকের সাথে সবর্ণ হয় না, নিশ্চয়ই জাত্যন্তর হবে।
.
স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্।। (মনুসংহিতা-১০/৬)
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজ বর্ণ-ত্রয়ের দ্বারা অনুলোমক্রমে অনন্তর অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্তী জাতীয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তানেরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণকর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন সন্তান এবং ক্ষত্রিয় কর্তৃক বৈশ্যানারীতে উৎপন্ন সন্তান এবং বৈশ্যকর্তৃক শূদ্রা নারীতে উৎপন্ন সন্তানগণ হীনজাতীয়া মাতার গর্ভে উৎপন্ন বলে পিতৃজাতি প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু উৎপাদকের (পিতার) জাতির সদৃশ হয়। এই সন্তানেরাই মূর্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণ নামে অভিহিত হয়। এরা মাতৃজাতির তুলনায় উৎকৃষ্ট কিন্তু পিতৃজাতির তুলনায় নিকৃষ্ট।
.
বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেহপসদাঃ স্মৃতাঃ।। (মনুসংহিতা-১০/১০)
অর্থাৎ : ব্রাহ্মণের পক্ষে তিনটি বর্ণের নারীতে (অর্থাৎ পরিণীতা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে) উৎপন্ন (মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ বা ভৃজ্যকণ্ঠ ও নিষাদ বা পারশব), ক্ষত্রিয় পুরুষের পক্ষে দুইটি বর্ণের নারীতে (অর্থাৎ বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে) জাত (মাহিষ্য ও উগ্র), এবং বৈশ্য পুরুষের পক্ষে একটি বর্ণের নারীতে (অর্থাৎ শূদ্রা স্ত্রীতে) জাত (করণ)– এই ছয় জাতীয় অনুলোমজ সন্তান অপসদ নামে অভিহিত হয় (অপসদ মানে পুত্রের যে প্রয়োজন তা থেকে এরা অপসারিত; সমান জাতীয় পুত্রের তুলনায় এরা অপসদ অর্থাৎ অপকৃষ্ট); এই অনুলোম-সঙ্করজাতির কথা স্মৃতিমধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, শাস্ত্রানুযায়ী পুত্রের প্রয়োজন হয় পিতৃপুরুষের আত্মার মুক্তি বা সদগতির লক্ষ্যে (স্বর্গারোহণ) শ্রাদ্ধাদিতে পিণ্ডদান করার জন্য। পিণ্ডদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে মূলত অন্যান্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। বৈদিক শাস্ত্রে পুত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায় নিম্নোক্ত শ্লোকটি থেকে–

সংস্থিতস্যানপত্যস্য সগোত্রাৎ পুত্রমাহরেৎ।
তত্র যদ্ রিক্থজাতং স্যাত্তত্তস্মিন্ প্রতিপাদয়েৎ।। (মনুসংহিতা-৯/১৯০)
অর্থাৎ : কোনও ব্যক্তি যদি অপুত্র অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার স্ত্রী গুরুজনদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে সগোত্র পুরুষের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করবে এবং মৃত ব্যক্তির যা কিছু ধনসম্পত্তি তা ঐ পুত্রকে অর্পণ করবে।

বৈদিক বিধান এমনই অলৌকিক শাস্ত্র যে সম্পদরক্ষায় পুত্রের প্রয়োজনে মনুসংহিতার ৫/১৫৭ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত বিধবার কর্তব্যও সাময়িক রদ হয়ে যায়। কী ছিলো বিধবার কর্তব্য?–

কামং তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু।। (মনুসংহিতা-৫/১৫৭)
অর্থাৎ : পতি মৃত হলে স্ত্রী বরং পবিত্র ফুল-ফল-মূলাদি অল্পাহারের দ্বারা জীবন ক্ষয় করবে, কিন্তু ব্যভিচারবুদ্ধিতে পরপুরুষের নামোচ্চারণও করবে না।

অর্থাৎ নারীর কোন জৈবিক চাওয়া-পাওয়া থাকতে পারে না। এই চাওয়া-পাওয়াকে পবিত্র মনুশাস্ত্রে স্বীকার করা হয়নি। তবে নারীর ক্ষেত্রে জৈবনিক চাহিদাকে স্বীকার করা না হলেও শাস্ত্রে পুরুষের কামচরিতার্থতার প্রয়োজনকে কিন্তু অস্বীকার করা হয়নি, বরং তা পূরণের জন্য পবিত্র বিধানও তৈরি করে দেয়া হয়েছে–

ভার্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেব চ।। (মনুসংহিতা-৫/১৬৮)
অর্থাৎ : (সুশীলা-) ভার্যা স্বামীর পূর্বে মারা গেলে তার দাহাদি অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে পুরুষ পুনরায় দারপরিগ্রহ ও অগ্ন্যাধ্যান করবে (যদি ধর্মানুষ্ঠান ও কামচরিতার্থতার প্রয়োজন থাকে, তবেই ঐ স্বামীর পুনরায় দারপরিগ্রহ করা উচিৎ। তা না হলে পত্নী নেই বলে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস অবলম্বন করতে পারে)।

যারা পবিত্র ধর্মগ্রন্থে নারী-পুরুষের সমতা খুঁজে বেড়ান, তারা আসলে কী যে খুঁজেন বোঝা দায়। তবে মনুশাস্ত্রে স্ত্রীর মর্যাদা কতটুকু তা এই শ্লোক থেকেও কিঞ্চিত অনুধাবন করা যেতে পারে–

ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যো ভ্রাতা চ সোদরঃ।
প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যু রজ্জ্বা বেণুলেন বা।। (মনুসংহিতা-৮/২৯৯)
অর্থাৎ : স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, শিষ্য এবং কনিষ্ঠ সহোদরভ্রাতা অপরাধ করলে সূক্ষ্ম দড়ির দ্বারা কিংবা বেতের দ্বারা শাসনের জন্য প্রহার করবে।

তবে প্রিয়জনকে প্রহার বলে কথা, তাই শাস্ত্র কি এতোটা নির্দয় হতে পারে! প্রহারের নিয়মও বলে দেয়া হয়েছে–

পৃষ্ঠতস্তু শরীরস্য নোত্তমাঙ্গে কথঞ্চন।
অতোহন্যথা তু প্রহরন্ প্রাপ্তঃ স্যাচ্চৌরকিল্বিষম্।। (মনুসংহিতা-৮/৩০০)
অর্থাৎ : রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা প্রহার যদি করতে হয়, তাহলে শরীরের পশ্চাদ্ভাগে প্রহার কর্তব্য; কখনো উত্তমাঙ্গে বা মাথায় যেন প্রহার করা না হয়; এই ব্যবস্থার অন্যথা করে অন্যত্র প্রহার করলে প্রহারকারী চোরের মতো অপরাধী ও দণ্ডনীয় হবে।

তারপরও এসব হচ্ছে শাস্ত্রবাক্য। আর শাস্ত্র কি উচিত কথা বলতে কার্পণ্য করতে পারে ? তাই বলা হচ্ছে–

ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ ধনম্।। (মনুসংহিতা-৮/৪১৬)
অর্থাৎ : স্মৃতিকারদের মতে ভার্যা, পুত্র ও দাস– এরা তিনজনই অধম (বিকল্পে অধন); এরা তিনজনেই যা কিছু অর্থ উপার্জন করবে তাতে এদের কোনও স্বাতন্ত্র্য থাকবে না, পরন্তু এরা যার অধীন ঐ ধন তারই হবে।

যেহেতু সম্পদরক্ষায় পুত্রের প্রয়োজন, সেজন্য পুত্র উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে নারীর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী। তবে তা কেবলই ক্ষেত্র হিসেবে, মানুষ হিসেবে নয়। তাও আবার যে-সে ক্ষেত্র নয়, কেননা সম্পদের উত্তরাধিকার ঠিকঠাক রাখতে হলে শাস্ত্র-নির্দেশনাও মানতে হবে বৈকি।

শাস্ত্র অনুযায়ী উপরে-উক্ত অনুলোমজ (উচ্চবর্ণ পিতার ঔরসে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণ মাতার গর্ভজাত) সন্তানেরা সবর্ণ পুত্রের সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও এরা বর্ণবহির্ভূত নয়। এরা মাতৃজাতির তুল্য অর্থাৎ মাতৃজাতির সংস্কারের যোগ্য হয়। কিন্তু প্রতিলোম-সঙ্করের (নিম্নবর্ণ পিতার ঔরসে অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণ মাতার গর্ভজাত সন্তানের) ক্ষেত্রেই যতসব শাস্ত্রীয় সমস্যা ও জটিলতার সূত্রপাত। এক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ মনু একের পর এক প্রতিলোমজ সঙ্করের উৎপত্তি ও পর্যায়ক্রমিক যে বহুবিধ জাতি-তালিকা তৈরি করতে থাকেন, রীতিমতো বিভ্রান্ত হবার মতো। এবং একটা পর্যায়ে এসে হঠাৎ করে আমরা কতকগুলো স্পর্শাদি-অযোগ্য অচ্ছ্যুৎ বা অস্পৃশ্য জাতির সন্ধান পেতে থাকি। যেমন প্রাথমিকভাবে সূত, মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব, ক্ষত্তা, চণ্ডাল নামের যে প্রতিলোমজ-সঙ্কর জাতি পাই, তাদের মধ্যে চণ্ডাল হলো অস্পৃশ্য। তবে আয়োগব ও ক্ষত্তা অস্পৃশ্য না হলেও এরা অপসদ বা নরাধম, অর্থাৎ পুত্রকাজ করার অযোগ্য। কারণ এরা শূদ্র পিতার ঔরসে প্রতিলোমজ-সঙ্কর। এক্ষেত্রে মনুসংহিতায় সুকৌশলে তৈরি বিধিবদ্ধ সূত্রগুলো কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করে নেয়া যায়–

একান্তরে ত্বানুলোম্যাদম্বষ্ঠোগ্রৌ যথা স্মৃতৌ।
ক্ষত্ত্বৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেহপি জন্মনি।। (মনুসংহিতা-১০/১৩)
অর্থাৎ : একান্তরে অর্থাৎ একটি মাত্র বর্ণের ব্যবধানে অর্থাৎ ব্রাহ্মণপুরুষের ঔরসে

বৈশ্যজাতীয় নারীর গর্ভে জাত অম্বষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়পুরুষের ঔরসে শূদ্রানারীর গর্ভে জাত উগ্র– এইসব অনুলোমজ সন্তান যেমন স্পর্শাদিযোগ্য হয়, সেইরকম প্রতিলোমক্রমে একান্তরিত অর্থাৎ একজাতি-ব্যবধানে উচ্চবর্ণের স্ত্রীতে জাত (যেমন, শূদ্রপুরুষ থেকে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন ক্ষত্তা এবং বৈশ্য পুরুষ থেকে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন বৈদেহ) দুই জাতি স্পর্শাদিযোগ্য হবে। (তবে যজনাদিক্রিয়াতে এদের তুল্যতা নেই।)

এই সূত্রানুযায়ী প্রতিলোমজগণের মধ্যে দুই বর্ণ-ব্যবধানে (অর্থাৎ শূদ্র পুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীতে) উৎপন্ন চণ্ডাল এই সূত্রে পড়ে না বলে শাস্ত্রানুযায়ী চণ্ডালই একমাত্র অস্পৃশ্য হয়ে যায়।

এখানে একটা সাধারণ সূত্র খেয়াল রাখতে হবে। চতুর্বর্ণ প্রথার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এরা বর্ণক্রমে দ্বিজজাতি। অর্থাৎ তাদের জন্য উপনয়ন-সংস্কারের বিধান থাকায় এরা উৎকৃষ্ট জাতি। তাই এই তিন বর্ণের নারীতে অনুলোমক্রমে উৎপাদিত সন্তানও দ্বিজ হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণপুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণজাতীয়া, ক্ষত্রিয়জাতীয়া ও বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীতে এবং ক্ষত্রিয়পুরুষ কর্তৃক ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা স্ত্রীতে এবং বৈশ্যপুরুষ কর্তৃক বৈশ্যনারীতে উৎপাদিত সন্তান দ্বিজ হবে। আর বাহ্যক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রতিলোমক্রমে অনন্তরবর্তী উচ্চবর্ণের স্ত্রীতে যেমন বৈশ্যপুরুষ কর্তৃক ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে এবং ক্ষত্রিয়পুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদিত হয় সেও তাদের আত্মা অর্থাৎ দ্বিজ হয়। এককথায় দ্বিজদের মধ্যে আন্তসম্পর্কক্রমে উৎপাদিত বর্ণসঙ্করর‍া দ্বিজজাতিই হবে।

কিন্তু সমস্যা হয়ে যায় এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোথাও শূদ্র নারী বা পুরুষের আবির্ভাব ঘটলে। শাস্ত্রীয় বিধানে দাসজাতি শূদ্রবর্ণের জন্য উপনয়ন-সংস্কারের বিধান নাই বলে এরা একজাতি। তাই তাদের মাধ্যমে সৃষ্ট বর্ণসঙ্করাও দ্বিজ হয় না। এক্ষেত্রে অনুলোম প্রক্রিয়ায় শূদ্রা স্ত্রী উচ্চবর্ণভোগ্যা হওয়া তার জন্য ভাগ্যের ব্যাপার বলে উৎপাদিত সন্তান দ্বিজ হয় না বটে, তবে মাতৃজাতি শূদ্র থেকে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু শূদ্রবর্ণের পুরুষের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ প্রতিলোম প্রক্রিয়ায় উচ্চবর্ণের স্ত্রীভোগ গুরুতর সামাজিক অপরাধ বা দূষণ হিসেবেই চিহ্নিত। তাই এ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত বর্ণসঙ্কর সন্তান তাদের পুত্র-অধিকার হারিয়ে নরাধম হয়ে যায়। আর এই অপরাধের মাত্রা বা দূষণপ্রক্রিয়া তীব্রতম হলে অর্থাৎ শূদ্রপুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণা স্ত্রী দূষিত হলে উৎপাদিত বর্ণসঙ্কর অস্পৃশ্য চণ্ডাল হয়ে যায়।

অতএব, শূদ্র পুরুষ যেখানে বর্ণসঙ্করে জড়িত সেখানে কি সমস্যা না হয়ে পারে?–
আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ।। (মনুসংহিতা-১০/১৬)
অর্থাৎ : শূদ্র পুরুষ থেকে প্রতিলোমক্রমে জাত অর্থাৎ শূদ্র পুরুষের ঔরসে বৈশ্যা স্ত্রীতে জাত আয়োগব, ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে জাত ক্ষত্তা এবং ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে জাত চণ্ডাল– এই তিন জাতি

পুত্রকাজ করার অযোগ্য। এই জন্য এরা অপসদ অর্থাৎ নরাধম বলে পরিগণিত হয়। এদের মধ্যে চণ্ডাল হলো অস্পৃশ্য।

.

চণ্ডালশ্বপচানাং তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দভম্।। (মনুসংহিতা-১০/৫১)
অর্থাৎ : চণ্ডাল, শ্বপচ প্রভৃতি জাতির বাসস্থান হবে গ্রামের বাইরে। এইসব জাতিকে ‘অপপাত্র’ করে দিতে হয়; কুকুর এবং গাধা হবে তাদের ধনস্বরূপ। (অপপাত্র হলো যে পাত্রে ভোজন করলে তা আর সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ করা চলবে না, তা পরিত্যাগই করতে হবে। অথবা তারা যে পাত্র স্পর্শ করে থাকবে তাতে অন্ন-শক্তু প্রভৃতি দেয়া চলবে না; কিন্তু পাত্রটি মাটির উপর রেখে দিলে কিংবা অন্য কোনও লোক তা হাতে করে ধরে থাকলে তার উপর ভাত-ছাতু প্রভৃতি দিয়ে মাটির উপর রেখে দিলে তারা ঐ খাদ্য গ্রহণ করবে। অন্য অর্থে ভাঙা পাত্রকে অপপাত্র বলে।)

.

বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ।। (মনুসংহিতা-১০/৫২)
অর্থাৎ : মৃত লোকের কাপড় এদের আচ্ছাদন (পোষাক) হবে; এরা ভাঙা পাত্রে ভোজন করবে; এদের অলঙ্কার হবে লৌহনির্মিত; এবং এরা সকল সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াবে। অর্থাৎ একই স্থানে বাস করবে না।

খুব সাধারণভাবে সঙ্কর জাতি থেকে সঙ্কর জাতিরই জন্ম হয়। আর শাস্ত্রানুযায়ী জন্মদোষ যেহেতু প্রজন্মক্রমেই স্থায়ী দোষ, যা থেকে বের হওয়ার কোনো রাস্তা নেই, তাই যেখানে নরাধম ও অস্পৃশ্যের ছোঁয়া পড়ে সেখানে পরবর্তী বংশ পরম্পরায় অস্পৃশ্য-সঙ্কর জাতিরই উৎপত্তি হতে থাকে। এভাবে ডাল-পালা বিস্তৃত করতে করতে সর্বজ্ঞ মনু তাঁর শঙ্করায়ন-শাস্ত্রকে এতোটাই জটিল পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে শেষপর্যন্ত শত শত অন্ত্যজ-অছ্যুৎ সম্প্রদায় বা জাতিগোষ্ঠির বিশাল এক জনগোষ্ঠিই সেখানে বাঁধা পড়ে যায়, যারা মূলত শ্রমজীবী। সমাজের গতিচক্রটিকে এরাই ধারণ করে অথচ এরাই হয়ে যায় বৈদিক সমাজের ব্রাত্য জনগোষ্টি– অছ্যুৎ, অস্পৃশ্য, দলিত বা নির্যাতিতও। মনুসংহিতায় এই ব্রাত্যজনগোষ্ঠির উৎপত্তি নির্ধারণক্রমে সৃষ্ট যে জালিকাবিন্যাস, এর সুদীর্ঘ তালিকা দেখলে রীতিমতো আঁৎকে ওঠতে হয়! প্রাসঙ্গিক হিসেবে দুয়েকটি উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য, যেমন–

যথৈব শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যাং বাহ্যং জন্তুং প্রসূয়তে।
তথা বাহ্যতরং বাহ্যশ্চাতু র্বর্ণ্যে প্রসূয়তে।। (মনুসংহিতা-১০/৩০)
অর্থাৎ : শূদ্র যেমন ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে বাহ্য অর্থাৎ নিকৃষ্ট চণ্ডাল নামক সন্তানের জন্ম দেয়, সেইরকম সূত (ক্ষত্রিয় পুরুষ থেকে ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে জাত সন্তান সূত) প্রভতি অন্যান্য বাহ্যজাতি (বৈদেহক, চণ্ডাল, মাগধ, ক্ষত্তা এবং আয়োগব) অর্থাৎ নিকৃষ্টজাতীয় পুরুষ চারবর্ণের নারীতে আরও বেশি বাহ্য অর্থাৎ নিকৃষ্টজাতীয় সন্তান উৎপাদন করে।

.
নিষাদো মার্গবৎ সূতে দাশং নৌকর্মজীবিনম্।
কৈবর্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্তনিবাসিনঃ।। (মনুসংহিতা-১০/৩৪)
অর্থাৎ : আয়োগবজাতীয় (শূদ্র পুরুষ থেকে বৈশ্যনারীর গর্ভজাত সন্তান হলো আয়োগব) নারীতে নিষাদজাতীয় পুরুষ (ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রা নারীতে জাত সন্তানকে নিষাদ বলে) 'মার্গব' নামক সঙ্কর সৃষ্টি করে থাকে। তাদের দাস বলা হয়; আর্যাবর্তনিবাসিগণ তাদের কৈবর্ত নামে অভিহিত করেন। তারা নৌকর্মের দ্বারা জীবিকার্জন করে। (নৌকর্ম হলো নৌকা চালান, তার দ্বারা জীবন ধারণ করা।)
.
কারাবরো নিষাদাত্তু চর্মকারঃ প্রসূয়তে।
বৈদেহিকাদন্ধ্রমেদৌ বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ৌ।। (মনুসংহিতা-১০/৩৬)
অর্থাৎ : নিষাদ পুরুষ থেকে 'বৈদেহী' নারীতে (বৈশ্য পুরুষ থেকে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তানকে বৈদেহ বলে) 'কারাবর' জাতি জন্মে; এরা চামড়ার কাজ করে। কারাবর এবং নিষাদজাতীয়া নারীতে 'বৈদেহিক' পুরুষ থেকে 'অন্ধ্র' এবং 'মেদ' এই দুই বর্ণসঙ্কর সৃষ্ট হয়; গ্রামের বাইরে এদের বাসস্থান।
.
চাণ্ডালৎ পাণ্ডুসোপাকস্তুক্সারব্যবহারবান্।
আহিণ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহ্যামেব জায়তে।। (মনুসংহিতা-১০/৩৭)
অর্থাৎ : চণ্ডালজাতীয় পুরুষ থেকে বৈদেহজাতীয় নারীতে 'পাণ্ডুসোপাক' নামক বণসঙ্করের উৎপত্তি; এরা বাঁশ থেকে ঝোড়া-চুব্ড়ী প্রভৃতি তৈয়ার করে জীবিকা নির্বাহ করে। নিষাদ পুরুষের ঔরসে ঐ 'বৈদেহী' নারীতেই 'আহিণ্ডিক' জাতির উৎপত্তি। (তাদেরও ঐ একই বৃত্তি।)
.
নিষাদস্ত্রী তু চাণ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্।
শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যানামপি গর্হিতম্।। (মনুসংহিতা-১০/৩৯)
অর্থাৎ : নিষাদজাতীয়া নারী চণ্ডালজাতীয় পুরুষ থেকে 'অন্ত্যাবসায়ী' নামক সন্তান প্রসব করে; সে শ্মশানের কাজে নিযুক্ত হয়; সে নিকৃষ্টজাতিরও নিন্দিত।

অন্ত্যজ জাতিগোষ্ঠির উৎপাদনরহস্য নিয়ে এরকম ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত-শ্লোক মনুসংহিতায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এই সঙ্করায়ন-প্রক্রিয়ায় অনন্তপ্রকার বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হতে পারে বলে খোদ শাস্ত্রকারই এ অভিমত ব্যক্ত করেন। তাই বাস্তবে এই অচ্ছ্যুৎ বর্ণসঙ্কর চেনার উপায় বা প্রক্রিয়া কী হবে, এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই আসতে পারে। হয়তো এসেছেও। নইলে পবিত্র মনুসংহিতায় এরকম শ্লোক আসতো কি?–
সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্মভিঃ।। (মনুসংহিতা-১০/৪০)

অর্থাৎ : পিতা-মাতার নাম নির্দেশপূর্বক এইসব হীন সঙ্করজাতির কথা বলা হলো; এছাড়া যাদের পিতা-মাতার নাম জানা যায় না, এমন যারা গুপ্তভাবে বা প্রকাশ্যভাবে বর্ণসঙ্কররূপে উৎপাদিত হয়, তাদের জাতিপরিচয় তাদের ক্রিয়াকলাপ থেকে জানতে হবে। কারণ-

.

পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্ব্বোভয়মেব বা।
ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি।। (মনুসংহিতা-১০/৫৯)
অর্থাৎ : জন্মগত দোষযুক্ত ব্যক্তি পিতার দুষ্ট স্বভাব অথবা মাতার নিন্দিত স্বভাব অথবা উভয়েরই স্বভাবের অনুবর্তী হয়। যে লোক দুর্যোনি অর্থাৎ বর্ণসঙ্করজাত নিন্দিত ব্যক্তি, সে কখনো নিজ জন্মের কারণ অর্থাৎ পিতামাতার স্বভাবকে গোপন করতে পারে না।

স্বার্থগৃধ্নতায় ক্ষমতাদর্পী বৈদিক ব্রাহ্মণ তথা স্বঘোষিত উচ্চবর্ণধারী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীটা কী জঘণ্য বর্ণবিদ্বেষী হতে পারে মনুসংহিতায় উদ্ধৃত উপরোক্ত অবশ্য-পালনীয় শ্লোকগুলো এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এরকম শত-সহস্র বর্ণবিদ্বেষী শ্লোক গোটা মনুসংহিতা জুড়ে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। মজার ব্যাপার হলো, বৈদিক বা আর্য-সভ্যতার বাইরে আর কোন দেশে বা সভ্যতায় বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব মনুসংহিতায় স্বীকার করা হয়নি। হয়তো এটাই মনুকৃত একমাত্র সত্যবাদিতা বা বাস্তবতা স্বীকার। তবে আর্য-সভ্যতার বাইরেও পৃথিবীতে যে আরো বহু দেশ রয়েছে বা থাকতে পারে তা হয়তো অস্বীকার করার উপায় ছিলো না। ফলে সেসব দেশেও শাসক সম্প্রদায় থাকবে এটাই স্বাভাবিক এবং তাদের অস্তিত্বকেও স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতার দম্ভে এরা এতোই একদেশদর্শী ছিলো যে, মনুসংহিতা অনুযায়ী শাসকশ্রেণী ক্ষত্রিয় হলেও সেসব দেশের শাসককে উচ্চবর্ণের ক্ষত্রিয় বলে গ্রহণ করা সংগত নয়। কারণ উপনয়নাদি-সংস্কার পালন না করা এবং ‘ব্রাহ্মণ’ নামক বেদাংশে বিহিত বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে ওরা শূদ্র হয়ে গেছে। মনুশাস্ত্র অনুযায়ী–

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ।। (মনুসংহিতা-১০/৪৪)
অর্থাৎ : পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শাক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ– এই সব দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়গণ তাদের কর্মদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

কী তাদের কর্মদোষ?–

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।। (মনুসংহিতা-১০/৪৩)
অর্থাৎ : ওই সমস্ত ক্ষত্রিয়জাতিগণ পুরুষানুক্রমে উপনয়নাদি, নিত্যাগ্নিহোত্র ও সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করায় এবং ‘ব্রাহ্মণ’ নামক বেদাংশে বিহিত বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করায় ক্রমে ক্রমে বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

ধর্মীয় মোড়কে সম্ভবত ব্রাহ্মণ্যবাদই পৃথিবীর প্রাচীনতম বর্ণবাদী দর্শন। এবং বেদ-নির্যাস হিসেবে স্বীকৃত মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা যদি এ দর্শনের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক ভিত্তিমূল হয়

তাহলেই বলতেই হয়, এটা কেন সম্পূর্ণ মানবতা-বিরোধী একটা অসভ্য দর্শন হবে না? একটা সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠিকে জঘণ্যতম বর্ণাশ্রমে বিভাজিত করা এবং একজন কাল্পনিক সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা'র নাম দিয়ে সমাজের উৎপাদনসংশ্লিষ্ট বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে ক্ষমতায় আসীন শাসক গোষ্ঠীর প্রতিভূ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নামের এক স্বার্থান্বেষী পরভোজী শ্রেণীর সেবাদাস বানিয়ে ফেলা যে একটা চতুর রাজনীতি, তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। এ রাজনীতির পেছনে যে গভীর ও সূক্ষ্ম কূটাভাষ লুকিয়ে আছে তা হলো নিকৃষ্টবর্ণ শূদ্রসংশ্লিষ্টতায় কতকগুলো বর্ণবহির্ভূত অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। বর্ণাশ্রমের মাধ্যমে চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করে গোটা জনগোষ্ঠিকে প্রথমে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলা হলো– উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী। ক্ষমতালিপ্সু শাসক বা ক্ষমতাসীনরা উৎকৃষ্ট বা উচ্চশ্রেণীভুক্ত আর্য, আর শ্রমজীবী শাসিতরা হলো নিকৃষ্ট বা নিম্নশ্রেণীর অনার্য শূদ্র। এই শ্রেণীবিভেদ তৈরি করেই ক্ষান্ত হয়নি এরা। যেহেতু শাসিতরাই সংখ্যাধিক্যে বিপুল, তাই সুকৌশলে এদের মধ্যে আবার তৈরি করা হলো বিষাক্ত বিভেদের এক ভয়ানক বিচ্ছিন্নতা। আজব এক সত্তার জন্ম দেয়া হলো– যার নাম অস্পৃশ্য (Untouchable)। মারাঠি ভাষায় যাকে বলা হয় 'দলিত', অর্থাৎ নির্যাতিত।

ধর্মের অলৌকিক মোড়কে ঘটানো এই রাজনৈতিক কূটচালে খুব স্বাভাবিকভাবে ধরাশায়ী হলো বিশাল এক জনগোষ্ঠি। লেখাপড়া বা শাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার থেকে চিরতরে বঞ্চিত করে তাদেরকে চিরকালের অন্ধ বানিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রও খুব ভালোভাবেই নিষ্পন্ন হলো। একটা প্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতার সামাজিক কাঠামোকে ভেঙেচুরে দুমড়েমুচড়ে তার জায়গায় ধীরে ধীরে কার্যকর করা হলো একটা তীব্র বর্ণবিদ্বেষী ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্যবাদ। যার নাম বৈদিক বা আর্য সভ্যতা। এভাবেই প্রাচীন ভারতবর্ষে বহিরাগত লুণ্ঠনকারী আর্যদের চাপিয়ে দেয়া ট্র্যাজিক অবদান ব্রাহ্মণ্যবাদ। এরপর শত সহস্র বছর ধরে প্রতিপালিত এই বিষাক্ত বর্ণদর্শন মিশে গেলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোর অবশ্যপালনীয় উপাচার ও সংস্কৃতির রক্তে। তা থেকে আর মুক্ত হতে পারেনি এই সমাজ। মুক্ত হওয়া এখনো যে সম্ভব হয়নি তার প্রমাণ বর্তমান বাংলা ও ভারতীয় হিন্দু সমাজের বর্ণবাদী ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষঙ্গগুলো। বিবাহে, প্রয়ানে, সামাজিক অনুষ্ঠানে এই বর্ণাশ্রমের বিষাক্ত থাবা আজো আদিরূপেই বর্তমান। যদিও তা দৃশ্যমান স্বরূপে ততোটা আক্রমণাত্মক নয়, কিন্তু অন্তর্গত অবস্থানে কোনভাবেই কম ক্রিয়াশীল নয়।

ব্রাহ্মণ্যবাদের ভিত্তিমূল যদি হয় এই মনুসংহিতা, তা অধ্যয়নে স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান খরচ করলেই এর তীব্র ফাঁকিটা ধরা পড়ে যায় খুব সহজেই। এমন মানববিদ্বেষী বিষাক্ত বিধান কোন স্রষ্টা নামীয় অলৌকিক মুখ থেকে নিঃসৃত হতে পারে কিনা তা সন্দেহ করা অযৌক্তিক হবে কি? চার্বাকেরা ঠিক ওই কাজটি করেছেন, কেবল সন্দেহই নয়, যুক্তি বিশ্লেষণ করে ব্রাহ্মণ্যবাদের এই জারিজুরিটুকু বুঝতে তাদের এতটুকু সমস্যা হয়নি। তাই একদিকে লোকায়তিক বিদ্রূপবাণে এই ব্রাহ্মণ্যবাদকে জর্জরিত করেছেন, অন্যদিকে চার্বাকীয় যুক্তির

তীক্ষ্ণতা দিয়ে দর্শনক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদের শক্তিশালী বিরুদ্ধপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

অন্যদিকে, কেউ কি ঈশ্বরকে স্বচক্ষে দেখেছে, না কি ঈশ্বরের নিঃসৃত বাণী স্বকর্ণে শুনেছে?– এমন সন্দেহ যে মোটেও অস্বাভাবিক নয় এই তাৎপর্যটুকু বুঝতে আমাদের সুবিখ্যাত অতিসম্মানিত বেদপন্থী দার্শনিকদেরও বুঝতে অসুবিধা হয়নি। তাই তাঁরা যে অভূতপূর্ব দার্শনিক কৌশলটি গ্রহণ করলেন তা আর কিছু নয়, এইসব বেদ ও বেদনির্ভর বক্তব্যগুলিকে আপ্তবাক্য নাম দিয়ে জ্ঞানের অন্যতম দার্শনিক প্রমাণ হিসেবে শব্দপ্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করে অভ্রান্ত সত্য হিসেবে ঘোষণা করলেন। আপ্ত মানে কী? যিনি ধর্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করেছেন অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য তাকেই বলে 'আপ্ত'। চার্বাক ছাড়া বাকি সবগুলি দর্শনই এই আপ্তবাক্যকে শিরোধার্য্য মনে করেন। যেমন অক্ষপাদ গৌতমের ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে–

'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ'। (ন্যায়সূত্র-১/১/৭)
অর্থাৎ : আপ্তপুরুষের বাক্যই শব্দপ্রমাণ এবং আপ্তবাক্য।

এই বিখ্যাত ন্যায়সূত্রটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদার ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন একজায়গায় বললেন–

'...ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্'...। (ন্যায়ভাষ্য)
অর্থাৎ : শব্দপ্রমাণের এই লক্ষণটি আর্য, ঋষি এবং ম্লেচ্ছপ্রভৃতির প্রসঙ্গে সমানভাবে প্রযোজ্য।

কিন্তু অতিসম্মানিত বেদবাদী 'সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র' বাচস্পতিমিশ্র বুঝিবা প্রমাদ গুনলেন। এ প্রসঙ্গে হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন (চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১৮)–

'সর্বনাশ! ভাষ্যকার শূদ্র-ম্লেচ্ছকে আর্যঋষিদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দিলেন! তাই বাচস্পতিমিশ্র ভাষ্যকার ও আর্যঋষিদের সম্মান রক্ষার জন্য ব্যাখ্যা করলেন :

ম্লেচ্ছরা নিরালা পথে পথিকের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিল। নিঃস্ব পথিক তখন অনুনয় করে বলল, সবই তো কেড়ে নিলে বাবারা, আমার বাড়ি ফেরার পথটা দেখিয়ে দাও। এবার কিন্তু ম্লেচ্ছ দস্যুরা পথিকের বাড়ির পথটা ঠিকই বলে দিল। এভাবে কখনো কখনো ম্লেচ্ছরাও আপ্ত হতে পারে।' (ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা)

এই ম্লেচ্ছ-শূদ্র আপ্ত হলে বেদবাদীদের জন্য সমস্যা তো বটেই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে আপ্ত হবেন তার সুকৌশলী ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে 'তাৎপর্যটীকা'কার বাচস্পতিমিশ্র বলছেন–

'সুদৃঢ়প্রমাণেনাবধারিতাঃ সাক্ষাৎকৃতা ধর্ম্মাঃ পদার্থা হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারার্থা যেন।'
অর্থাৎ : 'যে কোন সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা পদার্থের (ধর্ম্মের) নিশ্চয় হইলেই উহা সাক্ষাৎকারের তুল্য বলিয়া ভাষ্যকার (বাৎস্যায়ন) ঐ তাৎপর্য্যে "সাক্ষাৎকৃত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। যিনি অনুমান বা শব্দপ্রমাণের দ্বারা কোন তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া, সেই তত্ত্বের প্রতিপাদক বাক্য বলেন, তিনিও আপ্ত। কিন্তু 'সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা' হইয়াও যিনি সে বিষয়ে উপদেশ করিতে ইচ্ছা

করেন না অথবা বিপরীত উপদেশ করেন, তিনি আপ্ত নহেন।’- (মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত তর্জমা, ন্যায়দর্শন প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯০)

ফলে হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় এ-বিষয়ে অনুসিদ্ধান্ত করেন–

‘বাচস্পতিমিশ্রের সংকীর্ণ সমাজদৃষ্টির আর একটি পরিচয় ‘তাৎপর্যটীকা’-র প্রারম্ভেই পাওয়া যাবে। ন্যাভাষ্যের বার্তিকপ্রণেতা ভরদ্বাজ উদ্যোতকর গ্রন্থারম্ভের মঙ্গলশ্লোকে বললেন : মুনিপ্রবর অক্ষপাদ গৌতম জগতের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ন্যায়শাস্ত্র রচনা করলেন। বাচস্পতিমিশ্র এজাতীয় একটি নিতান্ত নিরীহ কথার মধ্যে বিপদের গন্ধ পেলেন। সমস্ত জগতের দুঃখনিবৃত্তি! শূদ্রও তো জগতের অন্তর্গত, তাহলে শূদ্রও উদ্ধার পেয়ে যাবে? তা হতে পারে না। সুতরাং মহর্ষি গৌতমের সম্মান রক্ষা পায়, আর শূদ্রও যাতে উদ্ধার না পায় এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। ব্যাখ্যাটি এইরূপ : মহর্ষি পরম করুণাময়। তিনি শূদ্রসহ নিখিল জগৎই উদ্ধার করতে চেয়েছেন। কে অধিকারী আর কে অনধিকারী করুণার আতিশয্যে তা বিবেচনা করেন নি, তাই শূদ্রকেও তিনি ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন করতে চেয়েছেন। মহর্ষিরা ব্যতিক্রম। অক্ষপাদ গৌতমের এতে কোনো দোষস্পর্শ হয় নি। মহর্ষিদের তপঃপ্রভাবে সব কিছু জীর্ণ হয়। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের কোনো তপঃপ্রভাব নেই। হাতি বটশাখা খেয়ে হজম করতে পারে। তাই বলে আমরা কি পারি? (সুতরাং আমরা শূদ্রকে ন্যায়শাস্ত্র পড়াতে পারব না)। উদয়নাচার্য আরও পরিষ্কার করে বললেন : বেদবিরোধী যুক্তি কুযুক্তি, অতএব অশ্রদ্ধেয় অগ্রাহ্য। কথাগুলি মনুসংহিতা অনুসরণ করে বলা হয়েছে। বেদজ্ঞানে শূদ্রের অধিকার নেই। অতএব কোন যুক্তি বেদের প্রতিকূল শূদ্রের পক্ষে তা বোঝা অসম্ভব। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্র পড়ে শূদ্র যদি যুক্তিতর্কে পারদর্শী হয়, তাহলে বেদের বিরুদ্ধে সে চার্বাকের মতো যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করতে পারে। প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা-ভিত্তিক ধর্মের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মন বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। তাই শূদ্রকে ন্যায়শাস্ত্র পড়ার অধিকার দেওয়া কোনো রকমেই উচিত হবে না। শূদ্র ন্যায়শাস্ত্রে ‘অনধিকৃত’। (চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১৮)

এই সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিভূমি হিসেবে উপনিষদীয় দর্শনসঞ্জাত বিভিন্ন তথ্য বিবেচনা করলে– চার্বাকদর্শনের মণিভদ্রসূরিকৃত চমকপ্রদ সামাজিক তাৎপর্য-ব্যাখ্যা অনুধাবন করলে– বুঝতে কষ্ট হবে না চার্বাকদর্শনের লোকায়ত নামটি কেন সার্থক। এবং ভূতচৈতন্যবাদ নামে পরিচিত চার্বাকের মূল দার্শনিক মতবাদ বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে, বোঝা যাবে চার্বাক কেন প্রাচীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী দার্শনিক, কেন তাঁরা বৈদিক বিধানের অনুসরণকারী যাগযজ্ঞের ধারক ও বাহক বেদানুসারী দার্শনিকদের ভণ্ড ও ধূর্ত বলেছেন। কেন হিন্দু জৈন বা বৌদ্ধ কোনো দার্শনিকই চার্বাককে ক্ষমার চোখে দেখেন নি। কিন্তু চার্বাকের বিদ্রোহী অবস্থানের কারণ হিসেবে এই সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় থাকলেও চার্বাকের দার্শনিক মতবাদ স্পষ্টতর হওয়ার নিমিত্তে ভারতের অধ্যাত্ম দর্শনচিন্তার মূলগত ভাবটিকে জানা আবশ্যক। এবং এরজন্য আমাদেরকে যেতে হবে তার উৎসমুখে– উপনিষদীয় চিন্তাধারার মধ্যে।

…

২.০ : উপনিষদীয় চিন্তাভূমি

বেদ বা বৈদিক সাহিত্য বলতে যে সাহিত্য-সম্ভাব বোঝায় তার শেষভাগ হলো বেদান্ত বা উপনিষদ। বৈদিক সাহিত্যে মূলত এই উপনিষদের মধ্যেই দার্শনিক চিন্তাধারার প্রাথমিক উন্মেষ পরিলক্ষিত হয় বলে উপনিষদকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। মানবসভ্যতার একটা পর্যায়ে এসে বস্তুত জগতের দুঃখবহুলতা উপনিষদের ঋষিকে ব্যাকুল করেছিলো বলে মনে হয়। বস্তুজগতের উপকরণ-সম্ভারের মাধ্যমে এই দুঃখ দূর করার চেষ্টা তাঁদের অন্তরকে নাড়া দিতে পারেনি হয়তো। দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধিতে বস্তুতান্ত্রিক সুখের স্থায়িত্ব দীর্ঘকালীন নয় বলেই হয়তো দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় মানুষ এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে না। ফলে বস্তুমুখী সুখে অতৃপ্ত মানবীয় মনে প্রশ্ন উঠেছিলো– পরমার্থ কী? জাগতিক বিষয়-বৈভব-বিত্ত-সম্পদ না অন্য কিছু? উপনিষদে এই প্রশ্নটি প্রথম উত্থাপিত হতে দেখা যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যক-২/৪)। এই অনবদ্য ‘যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ’ আখ্যায়িকায় দেখা যায়–

ব্রহ্মবিদ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম ছেড়ে চলে যাবে মনস্থির করে পত্নী মৈত্রেয়ীকে ডেকে বললেন– মৈত্রেয়ী, আমি এবার সংসার ছেড়ে চলে যাবো। যাবার আগে, আমার যা বিষয় সম্পত্তি আছে, তা তোমার আর আমার অন্যতম পত্নী কাত্যায়নীর মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়ে যেতে চাই। যাতে ভবিষ্যতে এ নিয়ে তোমাদের মধ্যে মনোমালিন্য না হয়। ঋষি স্বামীর কথা শুনে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন–

‘সা হোবাচ মৈত্রেয়ী– যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি। নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈব উপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ। অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি। (বৃহদারণ্যক-২/৪/২)।। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী– যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং? যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি। (বৃহদারণ্যক-২/৪/৩)।।

অর্থাৎ :

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন– এই সারা পৃথিবীটা যদি বিত্তসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে একেবারে আমার নিজস্ব হয় তাহলে কি আমি অমৃতত্ব পাবো? ঐ বিপুল ধন-সম্পদ কি আমায় পরমানন্দ দেবে? যাজ্ঞবল্ক্য অকপটে বললেন– না মৈত্রেয়ী। তুমি যে অমৃতত্বের, যে পরমানন্দের আশা করছো, এতে তোমার সে আশা পূর্ণ হবে না। ধন-সম্পদে সম্পদশালী মানুষের জীবন যেমনভাবে কাটে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমার জীবনও কাটবে সেইরকমভাবে। বিত্তসম্পদ সুখ দিতে পারে, কিন্তু অমৃত দিতে পারে না। দিতে পারে না পরমানন্দের স্নিগ্ধ প্রশান্তি। (বৃহদারণ্যক-২/৪/২)।। মৈত্রেয়ী সবিনয়ে স্বামীর ধন-সম্পদ প্রত্যাখ্যান করে বললেন– ভগবন্, যা দিয়ে আমি অমৃত হতে না পারবো, তা দিয়ে আমি কী করবো? চাই না আপনার ঐ ধন-সম্পদ। আপনি আমাকে সেই উপদেশ দিন, সেই বিত্তে বিত্তশালিনী করুন, যা দিয়ে আমি অমৃতের সন্ধান পেয়ে পরম আনন্দ লাভ করতে পারি।

(বৃহদারণ্যক-২/৪/৩)।।

এই জিজ্ঞাসার সূত্র ধরেই উপনিষদের ঋষির অমৃতত্বের সন্ধান ও অগ্রগতি এবং ধারণা করা যায় এই গতির পথেই অঙ্কুরিত হয়েছে তৎকালীন ভারতবর্ষের মাটিতে এক নতুন চিন্তার বীজ। কী সেই নতুন চিন্তার বীজ?–
আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতাব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ী, আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্'। (বৃহদারণ্যক-২/৪/৫)।। স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকম্ এবানুবিলীয়েত ন হ অস্য উদ্গ্রহণায় এব স্যাৎ। যতো যতস্ত্বাদদীত লবণম্ এবৈবং বা অর ইদং মহৎ ভূতং অনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি অরে ব্রবীমিতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। (বৃহদারণ্যক-২/৪/১২)।।
অর্থাৎ :
মৈত্রেয়ী, সর্বত্রই এই আত্মা। সকলকে ব্যাপ্ত করে রয়েছেন একই আত্মা। সেই আত্মাকেই দর্শন করতে হবে, শ্রবণ করতে হবে, মনন করতে হবে, নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করতে হবে। এই আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ঠিকমত প্রত্যয়ের সঙ্গে করতে পারলেই তার সব জানা হয়ে যাবে। অমৃতের মধুমাখা অনুভূতি নিয়ে অখণ্ড-সত্তায় তার প্রাণ ভরে উঠবে। আত্মজ্ঞান যার হয়, সবকিছুর সঙ্গে যে একাত্ম হতে পারে, তার কাছ থেকে কি অমৃত দূরে থাকতে পারে? (বৃহদারণ্যক-২/৪/৫)।। মৈত্রেয়ী এবার শোন– একটা নুনের ডেলা জলে পড়ে গেল। যদি বলি, ডেলাটাকে তুলে আনতে, পারবে? পারবে না। দেখবে জলের সঙ্গে সে মিশে একাকার হয়ে গেছে। জলটাই নোনতা হয়ে গেছে। যেখান থেকেই চুমুক দাও, সেই মিশে-যাওয়া নুনের স্বাদটুকু ছাড়া আর কিছু পাবে না। আমাদের এই মহান বস্তুটিও তেমনি অনন্ত, অপার, বিজ্ঞানময়। ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর থেকে শুরু করে দেবতা, মানুষ যত জঙ্গম দেখছ সবই অভিব্যক্ত হয়েছে ঐ মহান আত্মা থেকে। এক এক রূপ, এক এক নাম। যখন এদের সংজ্ঞা লোপ পায়, পরমায়ু শেষে মৃত্যু আসে, তখন সবই গিয়ে মিশে যায় তাঁর সঙ্গে। মৈত্রেয়ী, সেই মহান আত্মাই হল তত্ত্ব। তাঁকে জানলেই অমৃতত্বকে জানা হবে। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন– মৈত্রেয়ী, এই হল তত্ত্ব। (বৃহদারণ্যক-২/৪/১২)।।

জাগতিক নশ্বর সুখে চূড়ান্ত তৃপ্তি না পেয়ে বস্তুজগতের অতীত এক অমৃতলোকের সন্ধানে আবর্তিত হয়েছে উপনিষদীয় ভাবনা, এবং এরই রসধারায় একে একে পরিপুষ্টি লাভ করেছে ভারতীয় দর্শনের বিপুল কলেবর। যদিও মৌলিক তত্ত্বের রূপায়ণে সবগুলি দর্শনের আশ্রয় অবশ্যই তাদের নিজস্ব চিন্তা-পদ্ধতি, কিন্তু উপনিষদের এই মূল সুর সব সময়ই ধ্বনিত হয়েছে তাদের বিস্তারিত পরিধির কেন্দ্রবিন্দুতে। এজন্যেই ভিন্টারনিটস্ (Winternitz)-এর মতে– 'The pessimism of later Indian philosophy has its roots in the Upanisads'.

আমরা জানি, চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে ষড়দর্শন বা বেদ ও উপনিষদনুসারী ছ'টি দর্শন হলো– সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত। এছাড়াও অন্য দুটি প্রতিষ্ঠিত দর্শন বৌদ্ধ ও জৈন চিন্তাধারাও ভারতীয় দর্শনে যথেষ্ট প্রভাবশালী। কিন্তু ভারতীয় দর্শনগুলিকে বিচার করার সনাতনী প্রচেষ্টায় আস্তিকতার মানদণ্ডের বিচারে বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন আস্তিকতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি, এবং ভারতীয় দর্শনের ইতিবৃত্তকারদের মতে এদের স্থান নাস্তিক চার্বাকদের সঙ্গে একই সাধারণ পঙক্তিতে বিবেচিত হয়। যদিও 'সর্বদর্শনসংগ্র'কার মাধবাচার্য নাস্তিক চার্বাককে এঁদের মধ্যে অগ্রণীর আসন দিয়ে 'নাস্তিক শিরোমণি' আখ্যায়িত করেছেন। তবু ভারতীয় ঐতিহ্যের সাধারণ মূল্যবোধের স্বীকৃতির বিচারে অবশ্য অধ্যাত্মদর্শনের যে ধারা ষড়দর্শনের মধ্য দিয়ে প্রবহমান, সেই একই ধারা বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনকেও অভিসিঞ্চিত করেছে তা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। আর এই সবগুলির বিরোধিতার মাধ্যমে 'নাস্তিক' পঙক্তিতে কেবল চার্বাকের আসনই অবিসংবাদী।

তবে স্পষ্ট করে বললে, ষড়দর্শনের মধ্যে উপনিষদনুসারী দর্শন হিসেবে প্রধানতঃ পাঁচটি দর্শনের নাম করা যেতে পারে– বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক। যদিও ঔপনিষদিক ভাবধারার অবিকৃত রূপায়ণ একমাত্র বেদান্ত দর্শনেই পরিস্ফূট। বৈদিক সাহিত্যের অন্তিম অংশ হিসেবে উপনিষদ যেমন 'বেদান্ত' পদবাচ্যে পরিচিত, বেদান্ত দর্শনকেও এই 'বেদান্তের' অনুবৃত্তি বলা চলে। অবশ্য বিভিন্ন ভাষ্যকারদের বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যার মাধ্যমে বেদন্ত দর্শনও পরস্পর বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত। আর অন্যান্য দর্শনগুলিতে নিজস্ব স্বাধীন চিন্তার অন্তর্ভুক্তিজনিত কারণে সেগুলিতে ঔপনিষদিক ভাবধারার অনুকৃতি অনেকাংশেই ব্যাহত। কিন্তু এই দর্শনগুলির ব্যাখ্যাকারেরা উপনিষদেরই বাণীকে নানা ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করে উপনিষদের বাণীর মধ্যে তাঁদের এই পরিবর্তিত মূল দৃষ্টিভঙ্গির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করে থাকেন। কাজেই বহু ক্ষেত্রে বিভিন্নধর্মী মতবাদকে আশ্রয় করলেও তাঁদেরই ভাষ্য মতে মূলতঃ এঁরা সকলে উপনিষদের সঙ্গে অবিরুদ্ধ মতবাদের পোষক এবং সে-কারণে এঁদের দ্বারা প্রচারিত মতবাদকে সাধারণভাবে উপনিষদনুসারী বলা যেতে পারে। বস্তুত জাগতিক ভোগসুখের একান্ত নিবৃত্তি যেখানে সেই মোক্ষকে লক্ষ্য হিসেবে রেখেই এঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত নির্দেশ করেছেন। কারণ একমাত্র এই লক্ষ্যতেই তাঁদের মতে দুঃখেরও চরম নিবৃত্তি ঘটে। ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলির এ এক অভিন্ন লক্ষ্য বটে।

কিন্তু ষড়দর্শনের মধ্যে কেবল মীমাংসা দর্শনই উপনিষদের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে প্রভাবিত নয়। কারণ এটি বেদের ব্রাহ্মণভাগের উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল। যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি বৈদিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্বর্গলাভই এই দর্শনে চরম চরিতার্থতা। অন্তত স্বর্গলাভের অতিরিক্ত অন্য কিছুর প্রয়োজনীয়তা এই দর্শনের আদি পর্যায়ে অনুভূত হয়নি। যদিও সমসাময়িক অন্যান্য অধ্যাত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মীমাংসার অভীষ্ট লক্ষ্যকে ভিন্নরূপ দেবার প্রয়াস পরবর্তী ভাষ্যকারদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মীমাংসক প্রভাকরমিশ্র এবং কুমারিলভট্টের রচনায় যে

মোক্ষ চরম লক্ষ্য হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে তাতে ভিন্নমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই চোখে পড়ে। তারপরও সংসার বন্ধনের পরিসমাপ্তির রূপ নিয়ে তা এই দর্শনটিকে উপনিষদনুসারী অন্য দর্শনগুলির সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে।

অন্যদিকে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ষড়দর্শন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক গোষ্ঠিতে অন্তর্ভুক্তি লাভ করলেও ভাবগত ঐক্যের বিচারে এ দর্শন দুটিও মনে হয় উপনিষদীয় দর্শনগুলির সমপর্যায়ভুক্ত। কেননা যাগযজ্ঞ ইত্যাদি কামনাধর্মী বৈদিক ক্রিয়াবাহুল্যের ভারে ক্লিষ্ট যে প্রেরণা উপনিষদীয় দর্শনের সৃষ্টির মূলে, বৌদ্ধ এবং জৈন মতবাদের উদ্ভবের মূলেও সেই প্রেরণার কার্যকারিতা রয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। কীভাবে? এ প্রেক্ষিতে বৌদ্ধ এবং জৈন মতবাদের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার অনুসন্ধান করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হতে পারে।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ঐতিহাসিক কালপঞ্জিতে প্রায় সমসাময়িককালেই মহাবীর এবং গৌতমবুদ্ধের মাধ্যমে জৈন এবং বৌদ্ধ মতবাদ প্রায় একই সময়ে ভারতীয় চিন্তাজগতে আত্মপ্রকাশ করে। এই দুই মহামানবের আবির্ভাবের যুগকে ভারতীয় চিন্তারাজ্যে একটা অস্থিরতার যুগ হিসেবে মনে করা হয়। বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে যাগযজ্ঞাদি যখন তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, নিষ্প্রাণ এই অনুষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে বৈদিক প্রভাব তখনও পূর্ণমাত্রায় কার্যকরি। নানা ধরনের কুসংস্কারযুক্ত আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ লোক তখন সুখের সন্ধানে ব্যস্ত। আর বুদ্ধির বিচারে উন্নত কিছু লোক গতানুগতিকতার বন্ধন কাটিয়ে উপায়ান্তরের মাধ্যমে সুখকর পরিতৃপ্তির সন্ধানে মুখর। এরই ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যৎ যুগের দার্শনিক গোষ্ঠিগুলির পরিণত চিন্তাবৃক্ষের বীজস্বরূপ অঙ্কুরিত উপনিষদীয় ভাবনা তখন চিন্তারাজ্যে কিছুটা আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু তখনও ঐ ভাবনাধারা সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়া ও নাগালের বাইরে। এইসব অপরিণত দার্শনিক মতবাদের বিক্ষিপ্ত ভাবনা ও জিজ্ঞাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিভিন্ন বিশৃঙ্খল মতের উন্মেষগুলি যখনও জনজীবনে নীতিসম্মত কর্তব্যের বিধান হিসেবে জনগণের কাছে উপস্থাপিত হয়নি, এই অস্থিরতার যুগেই আবির্ভূত হন মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ। চিন্তারাজ্যের বিশৃঙ্খলা থেকে মানুষের নৈতিক জীবনে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিলো, সেই নৈরাজ্যের কবল থেকে এই দুই মহাপুরুষ ভারতের জনগণকে মুক্তির সন্ধান দেন।

বুদ্ধ প্রচার করলেন যে মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করতে পারে আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে, পুরোহিত বা ভগবানকে কেন্দ্র করে নয়। বৈদিক বিধানের নির্দেশনায় শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতি যে প্রাণহীন আনুগত্য ক্রমশঃ পল্লবিত হয়ে উঠছিলো তাকে তিনি অগ্রাহ্য করে চিত্তশুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। বুদ্ধের বাণীতে শুধু যে বৈদিক আচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল তা নয়, অস্থির দর্শন-চিন্তার অলস প্রবাহ উপযুক্ত কর্তব্যের পথে তার গতিকে প্রসারিত করার প্রয়াস পেল। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি

হলো, বৈদিক অনুষ্ঠানের বিরোধী হলেও দেশ ও কালের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সঙ্গে বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মের পূর্ণ সঙ্গতি ছিলো এবং প্রকৃতপক্ষে বৈদিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার যে প্রয়াস উপনিষদে কার্যকরি বৌদ্ধ দর্শনে তা অদৃশ্য হলেও বস্তুতপক্ষে উপনিষদীয় চিন্তারই এক নতুন প্রকাশ তাঁর বাণীর মধ্যে দেখা গেলো।

আর বৌদ্ধ দর্শনের মতো জৈন মতবাদও ভারতের প্রাচীনতর চিন্তাধারার আর এক নতুন প্রকাশ। কেননা জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরকে জৈন তীর্থঙ্কর বা ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে চব্বিশতম স্থান দেওয়া হয়ে থাকে, এবং তাঁর মাধ্যমে পূর্বসূরীদের মতগুলিই একত্র গ্রথিত হয়ে নতুনভাবে প্রচারিত হয়েছে বলে জৈনদের বিশ্বাস। এক্ষেত্রেও মানুষের দুঃখ অপনোদনের প্রচেষ্টায় জৈন তীর্থঙ্করদের এই ভাবনা যে উপনিষদীয় চিন্তার সমধর্মী নানাভাবে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাত্ম দর্শনগুলিতে এই দুঃখ অপনোদনের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে পরমার্থ বা মোক্ষের ধারণায়।

২.১ : পরমার্থ মোক্ষ

যেহেতু বৈদিক ষড়দর্শনগুলির নিজস্ব স্বীকৃতি অনুযায়ী এগুলি উপনিষদের অনুগামী, তাই ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের মূলগত ঐক্যের বীজের সন্ধানও প্রকৃতপক্ষে উপনিষদেই করা চলে। এবং আরও দেখা যায়, 'নাস্তিক' সংজ্ঞায় চিহ্নিত বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন দুটির মধ্যেও একই উপনিষদীয় চিন্তার প্রবাহ দুটি পৃথক ধারায় প্রবহমান। যেমন উপনিষদের অনুগামী সাংখ্যদর্শনের মধ্যে জাগতিক সব রকম দুঃখের কবল থেকে অব্যাহতির জন্য তীব্র ব্যাকুলতার প্রকাশ দেখা যায়–

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাহপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোহভাবাৎ।। (সাংখ্যকারিকা-১)
অর্থাৎ : ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাতের ফলে তার (অর্থাৎ সেই ত্রিবিধ দুঃখের) নিবৃত্তির (সাংখ্যশাস্ত্রীয়) উপায় বিষয়ে জিজ্ঞাসার উদয় হয়। লৌকিক উপায়ে দুঃখের অবশ্যম্ভাবী চিরনিবৃত্তি হয় না বলে (দুঃখ নিবৃত্তির) সেই (সাংখ্যশাস্ত্রীয়) উপায় বিষয়ে জিজ্ঞাসা ব্যর্থ হয় না।

.

'দুঃখানাং ত্রয়ং দুঃখত্রয়ং। তৎ খলু আধ্যাত্মিকং আধিভৌতিকং আধিদৈবিকং চঃ।' (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)
অর্থাৎ : দুঃখসমূহের ত্রয় দুঃখত্রয় বা ত্রিবিধ দুঃখ। এই ত্রিবিধ দুঃখ হলো আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।

.

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ। (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র-১/১)
অর্থাৎ : এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা অবসানই হলো চরম পুরুষার্থ।

দুঃখ থেকে অব্যাহতির জন্য এই ব্যাকুলতারই ভিন্নরূপে অভিব্যক্তি দেখা যায় বৌদ্ধদর্শনে। সাংসারিক ভোগের মধ্যে বুদ্ধ সুখের সন্ধান পাননি। তাই রাজপুত্র হয়েও তিনি সংসারত্যাগী হয়ে সেই পথেরই অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন যার অনুসরণে মানুষ এই দুঃখবহুল সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম। যদি ভারতীয় দর্শনগুলির একটি অভিন্ন লক্ষ্যকে চিহ্নিত করা হয় তাহলে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, সাংসারিক দুঃখের তীব্র জ্বালার অবসানকে কেন্দ্র করেই চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শনগুলি রূপায়িত। নির্বাণের মধ্যে বুদ্ধ এই দুঃখের অবসান দেখেছিলেন। অন্যান্য দর্শনগুলির মতে মোক্ষ বা মুক্তিতেই এর পরিসমাপ্তি। মোক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন বর্ণনা আছে। এমনকি তথাকথিত নাস্তিক জৈন দার্শনিক চিন্তাতেও মোক্ষের স্বীকৃতি আছে এবং এই মত অনুসারে মুক্ত পুরুষ নিজের পৃথক সত্তা রক্ষা করে অনন্তকাল ধরে অসীম শান্তি ভোগ করেন। যেমন–

'সংসারবীজভূতানাং কর্মণাং জরণাদিহ।
নির্জরা সম্মতা দ্বেধা সকামাকামনির্জরা।।

স্মৃতা সকামা যমিনামকামা ত্বন্যদেহিনাম্ ।’
অর্থাৎ : সংসারের সমস্ত কর্মের বিনাশ হতে নির্জরা লাভ হয়। তা দুই প্রকার- সকাম (ঔপক্রমিক) ও অকাম (যথাকাল)। যারা যম প্রভৃতি অভ্যাস করে তাদের সকাম নির্জরা এবং অন্য প্রাণীদের অকাম নির্জরা লাভ হয়।

.
‘বন্ধহেত্বভাবনির্জরাভ্যাং কৃৎস্নকর্মবিপ্রমোক্ষণং মোক্ষঃ’। (তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র-১০/২)
‘তদনন্তরমূর্ধ্বং গচ্ছত্যালোকান্তাৎ’। (তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র-১০/৫)
অর্থাৎ :
বন্ধের কারণের অভাব ও নির্জরার দ্বারা কর্মের নাশ ঘটে মোক্ষ লাভ হয় (তত্ত্বা-১০/২)। তারপর নিরন্তর উর্ধ্বগমন হয় (তত্ত্বা-১০/৫)।

সাংখ্য, যোগ এবং বেদান্ত দর্শন মুক্তিকালে চৈতন্যরূপী আত্মার শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিতিকে স্বীকার করে। বেদান্ত দর্শনের বহু স্থলে এই স্বরূপের সঙ্গে আনন্দরূপকে একাত্ম করা হয়েছে, কিন্তু এ ধরনের কোন উল্লেখ সাংখ্য ও যোগ দর্শনে নেই। বরং সেখানে দুঃখভোগের পরিসমাপ্তি কামনায় যে কৈবল্য বা মোক্ষকে লক্ষ্য হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে সেই মোক্ষের অবস্থাতে কেবল যে দুঃখই অনুপস্থিত তা নয়, ব্যবহারিক সংজ্ঞায় চিহ্নিত সুখেরও একান্ত অভাব। তা কেবলি এক শুদ্ধ অবস্থা। যেমন যোগসূত্রে বলা হয়েছে–
‘পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি’- (যোগসূত্র : ৪/৩৩)
অর্থাৎ : কৈবল্যে পুরুষের কিছু অবস্থান্তর হয় না, স্বরূপে অবস্থান হয় মাত্র, কিন্তু বুদ্ধি তথা গুণত্রয়ের প্রলয় হয়।

এখানে উল্লেখ্য, ‘যে মুক্তির মধ্যে জাগতিক সব রকম দুঃখের নিবৃত্তি রূপায়িত, সেই মুক্তি বা মোক্ষ ভারতীয় দার্শনিকদের বিচারে পরম পুরুষার্থ বা মানুষের বহু-আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হিসেবে গণ্য। সাধারণ মানুষ তার কাম্য বস্তুকে নেতিবাচক রূপে কখনই দেখতে চায় না। দুঃখের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি সে স্বাভাবিকভাবেই কামনা করে, এবং তার পরিবর্তে সে চায় জাগতিক সুখের আস্বাদন। কাজেই সাংখ্য ও যোগ যখন মোক্ষকে সুখ এবং দুঃখ উভয়েরই অভাবরূপে বর্ণনা করে তখন মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করতে অনেকেরই আপত্তি থাকতে পারে। সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁর সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে এই ধরনের আপত্তির সম্ভাবনাকে পরিহার করার চেষ্টা করেছেন। মানুষের মধ্যে তিনি শ্রেণীভেদ দেখিয়েছেন। জাগতিক সুখে একশ্রেণী মগ্ন থাকতে অভিলাষী। আবার অপর শ্রেণীর লোকেদের কাছে দুঃখের চরম নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। মুক্তি লক্ষ্য হিসেবে নির্দেশিত কেবল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের কাছে। সাধারণ বা প্রথম শ্রেণীর লোকের কাছে এর কোন আকর্ষণ নেই।’- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৪৭)

নৈয়ায়িকরাও দুঃখের চরম অবসানকে মুক্তির মধ্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। কিন্তু সাংখ্য, যোগ বা বেদান্ত মতের সঙ্গে তাঁদের মতের মূলগত পার্থক্য রয়েছে। মুক্ত অবস্থায় আত্মার যে চৈতন্যময় সত্তা সাংখ্য যোগ বা বেদান্তমতে স্বীকৃত, ন্যায়মতে মোক্ষে তার অস্তিত্ব নেই, এবং এইজন্যই মুক্তি সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদের ধারণাকে খুব স্পষ্ট বলা চলে না। ন্যায়সূত্র অনুসারে মুক্তির শব্দের অর্থ দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদ। যেমন–

দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানা-
নামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াপবর্গঃ। (ন্যায়সূত্র-১/১/২)।।
অর্থাৎ : দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি (ধর্ম ও অধর্ম), দোষ (রাগ ও দ্বেষ) এবং মিথ্যাজ্ঞানের (অর্থাৎ আত্মাদি প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে নানাপ্রকার ভ্রম জ্ঞানের) উত্তরোত্তর অপায় (অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে নিবৃত্তি) হলে তদনন্তর পদার্থের (অর্থাৎ উক্ত মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি পর পর পদার্থের অব্যবহিত পূর্বোক্ত দুঃখ পর্যন্ত পদার্থের) নিবৃত্তিপ্রযুক্ত অপবর্গ (নির্বাণ) হয়।
কিংবা–
‘বাধনালক্ষণং দুঃখম্’। (ন্যায়সূত্র-১/১/২১)
‘তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ’। (ন্যায়সূত্র-১/১/২২)
অর্থাৎ :
শরীর থেকে ফল পর্যন্ত সমস্ত প্রমেয়ই বাধনালক্ষণ অর্থাৎ দুঃখানুষক্ত দুঃখ (ন্যায়সূত্র-১/১/২১)। তার সাথে (পূর্বোক্ত মুখ্য গৌণ সবধরনের দুঃখের সাথে) অত্যন্ত মুক্তি হচ্ছে মোক্ষ বা অপবর্গ (ন্যায়সূত্র-১/১/২২)।

ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মোক্ষাবস্থায় সুখের অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন–

‘অপবর্গে–ভীষ্মং খল্বয়ং সর্ব্বকার্য্যোপরমঃ, সর্ব্ব বিপ্রয়োগেহপবর্গে বহু ভদ্রকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্ সর্ব্বসুখোচ্ছেদম্ অচৈতন্যমমুম্ অপবর্গং রোচয়েদিতি।’ (ন্যায়ভাষ্য-১/১/২)
অর্থাৎ :
অপবর্গ বিষয়ে যাতে–সর্বকার্যের নিবৃত্তি হয়, এমন এই অপবর্গ ভীষ্মই অর্থাৎ ভয়ানকই। যাতে সমস্ত অভীষ্ট পদার্থের বিয়োগ হয়, এমন অপবর্গ হলে বহু শুভ নষ্ট হয়– এজন্য কিভাবে বুদ্ধিমান মানব সর্বসুখের উচ্ছেদকর চৈতন্যহীন এই অপবর্গকে ভালো বোধ করবে?

তার মানে, চৈতন্যের অভাবের পটভূমিতে দুঃখ, সুখ ইত্যাদি সব কিছুরই অনুপস্থিতিতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় মূর্চ্ছাবস্থার সঙ্গে তার সাদৃশ্য কল্পনীয়। এই অবস্থার অনুরূপ মুক্তি কোন ব্যক্তির কাম্য হতে পারে না। তাই ন্যায়সূত্রানুসারী মুক্তি সম্বন্ধে এ ধরনের আশঙ্কার নিরসনকল্পে ন্যায়ভাষ্যকার মুক্তিকে পরম শান্তির অবস্থা রূপে বর্ণনা করে আরো বলেন–

‘অপবর্গে–শান্তঃ খল্বয়ং সর্ব্ববিপ্রয়োগঃ সর্ব্বোপরমোহপবর্গঃ, বহু চ কৃচ্ছ্রং ঘোরং পাপকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্ সর্ব্বদুঃখোচ্ছেদং সর্ব্বদুঃখাসংবিদম্ অপবর্গং ন রোচয়েদিতি।’ (ন্যায়ভাষ্য-১/১/২)

অর্থাৎ :
অপবর্গ বিষয়ে– যাতে সকল পদার্থের সাথে বিয়োগ হয়, যাতে সর্বকার্যের নিবৃত্তি হয়, এমন এই অপবর্গ শান্ত অর্থাৎ ভয়ানক নয় এবং এতে বহু কষ্টকর ঘোর পাপ নষ্ট হয়, সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদুঃখের উচ্ছেদকর, সর্বদুঃখের জ্ঞানরহিত অপবর্গকে কেন ভালবাসবে না।

অর্থাৎ দুঃখের চরম অভাবের মধ্যেই এই শান্তির বীজ নিহিত বলে তাঁর অভিমত। অবশ্য কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে মুক্তিতে জীবের আনন্দানুভূতি থাকে। তবে সে যাই হোক, দুঃখের আত্যন্তিক অবসানকে লক্ষ্য করেই যে ভারতীয় দর্শনে মুক্তি বা নির্বাণের পরিকল্পনা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মানুষ প্রাথমিক পর্যায়ে সুখের অভিলাষী। এই সুখের পথের প্রতিবন্ধক তার কাছে দুঃখ, এবং এই দুঃখের প্রতিকারের জন্য সে চেষ্টা করে সর্বজনস্বীকৃত লৌকিক পথকে অবলম্বন করে। কিন্তু এ দুঃখনিবৃত্তি এবং তার পরিণতিতে পাওয়া সুখ সাময়িক এবং সামগ্রিকভাবে বিচার করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃহত্তর দুঃখের প্রস্তুতি হিসেবে গণ্য হতে পারে। যেমন পতঞ্জলির যোগসূত্রে বলা হয়েছে–
পরিণামতাপসংস্কার দুঃখৈর্গুণবৃত্তি
বিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ। (যোগসূত্র-২/১৫)।।
অর্থাৎ : বর্তমান পরিতাপরূপ দুঃখ ভবিষ্যৎ সংস্কাররূপ দুঃখে পরিণত হয় দেখে, ত্রিগুণের পরস্পর বিরোধভাব দেখে, সুখের পরিণাম দুঃখ এবং দুঃখের পরিণাম সুখ দেখে বিবেকী মহাপুরুষেরা সমস্তই দুঃখ এবং দুঃখের কারণ বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু নিদারুণ মোহবশতঃ অবিবেকী ব্যক্তিদের ঐ প্রকার ধারণা হয় না।

এ-কারণেই ভারতীয় দার্শনিকেরা ক্ষণস্থায়ী সুখের প্রতি উদাসীন থেকে সংসারের দুঃখবহুলতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নির্বাণ বা মুক্তির মধ্যে সংসারবন্ধনের সমাপ্তি নির্দেশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু দুঃখের এই চরম নিবৃত্তি লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না দুঃখের মূল এবং সেই মূলোচ্ছেদের সঠিক উপায় অবধারণ করা যায়। কাজেই জাগতিক দুঃখের চরম নিবৃত্তির সম্ভাব্যতার ধারণার সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবেই জড়িত হয়ে পড়ে আরও কয়েকটি ধারণার স্বীকৃতি। বস্তুত এই স্বীকৃতিগুলিরই রূপায়ণ ঘটে বুদ্ধবর্ণিত চারটি আর্য-সত্যের মাধ্যমে– জগৎ দুঃখময়, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ থেকে পরিত্রাণ এবং এই পরিত্রাণের উপায়ও আছে।

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় নানা বিষয় নিয়ে নানারকম বিরোধ দেখা যায়। কিন্তু এই সব বিরোধের অন্তরালবর্তী কাঠামোটা যে বুদ্ধস্বীকৃত ‘চত্বারি আর্যসত্যানি’ বা এই আর্য-সত্যচতুষ্টয়ের ভাবনা দিয়ে গড়া, তা স্বীকার করাটা বোধ করি দোষণীয় হবে না। আর এই ভাবনার ভিত্তি হিসেবেই কতকগুলি সাধারণ ধারণা চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শনের সব শাখাতেই অনুমোদন লাভ করেছে। এবং এই ধারণাগুলিই প্রতিটি দর্শন-শাখার নিজস্ব যুক্তি ও ব্যাখ্যার আলোকে সংবদ্ধ হয়ে পরিপুষ্ট করেছে প্রতিটি মতবাদকে। এক্ষেত্রে প্রথম

ধারণাটি হলো দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই আত্মার ধারণা বস্তুত ঔপনিষদিক চিন্তাধারারই উত্তরাধিকার। ইতঃপূর্বেই এই আত্মা-বিষয়ক ঔপনিষদিক-ধারণার উদ্ভব প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বস্তুত ভারতীয় দর্শনচিন্তার মূল এই আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে বা অধ্যাত্মবাদেই নিহিত।

ইতোমধ্যেই আলোচিত দুঃখময় সংসারবন্ধনের পরিসমাপ্তি হিসেবে মোক্ষ বা নির্বাণ সম্বন্ধীয় ধারণার যে দার্শনিক-ভাবনার বহমানতা, মৃত্যুর পর দেহনাশের সঙ্গে জীবের অস্তিত্বের অবসান কল্পনা করলে এই আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কাজেই দেহসীমার বাইরেও দেহাতীত রূপে জীবের বর্তমানতা স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিবাদের সমর্থকদের স্বীকৃতি লাভ করেছে। 'আমি' এই অনুভূতিই আত্মার অস্তিত্বের সব চেয়ে বড় প্রমাণ বলে তাঁরা মনে করেন। মানুষের জীবিতকালে এই আত্মা তার দেহের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয় এবং স্থূল বিচারে আত্মাকে সে সময় দেহের অঙ্গীভূত বলে মনে হয়। কিন্তু আত্মা দেহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক– ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের এটাই অভিমত। যদিও দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের প্রচলন রয়েছে।

তবে চার্বাকেতর অন্যান্য দর্শনের সমধর্মী হয়েও বৌদ্ধ ধারণা এ ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য বহন করে। বৌদ্ধ দর্শনে অবিকারী স্থায়ী আত্মার কোন কল্পনা নেই। 'আত্মা' শব্দটি বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী দর্শনে কোন কোন ক্ষেত্রে স্থান লাভ করলেও শব্দটি সেখানে ভিন্ন অর্থের পরিচায়ক। বিজ্ঞানবাদীরা 'আত্মা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন সংসারদশায় বদ্ধ জীবের বিপর্যস্ত বিজ্ঞানকে বোঝাতে এবং 'নৈরাত্ম্য' তাঁদের কাছে এর বিপরীত অর্থের দ্যোতক। বৌদ্ধমতে সর্বজ্ঞ এই নৈরাত্ম্যের সাধনাতে নিজেকে মগ্ন করেন। বৌদ্ধমতে সুখ দুঃখের অনুভূতি, জ্ঞান ইত্যাদি সব কিছু ক্ষণিক ও প্রতীত্যসমুৎপন্ন। এই ক্ষণিক অনুভূতির প্রবাহে তাঁরা একধরনের জ্ঞাতৃত্ব আরোপ করেন, বৌদ্ধ পরিভাষায় যাকে বলা হয় বিজ্ঞান-প্রবাহ।

মানবমনে উদ্ভূত জ্ঞানের বিভিন্ন বিচিত্র প্রবাহে আত্মবাদী আচার্যেরা স্থির আত্মস্বরূপের বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ বলে মনে করেন। অন্যদিকে বৌদ্ধরা আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না। মানবমনের নিত্য পরিবর্তনশীল বিচিত্র অনুভূতির ব্যষ্টিরূপ তাঁদের কাছে ভোক্তৃত্বের মহিমায় মণ্ডিত। তবে কি নিত্য চৈতন্যের স্বীকৃতিতে উভয় পক্ষই এখানে সমধর্মী, পার্থক্য কেবল দৃষ্টিভঙ্গিতে? হয়তোবা। লতিকা চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়– 'বিভিন্নধর্মী পুষ্পের সমবায়ে গ্রথিত মালার অন্তর্গত কুসুমগুলিকে যেখানে বৌদ্ধরা পৃথকভাবে প্রাধান্য দেন, আত্মবাদী দার্শনিকদের কাছে সেখানে মালাটি তার অখণ্ড অস্তিত্বে প্রকাশমান। কাজেই দৃশ্যমান পার্থক্য সত্ত্বেও সামগ্রিক মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধ দর্শনকেও আমরা ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের সমধর্মী বলে ধরে নিতে পারি।' (চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৫০)

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন বিভাগে অনুমোদিত আরেকটি সাধারণ ধারণা হলো জন্মান্তরবাদ বা

দেহাতিরিক্ত আত্মার দেহ থেকে দেহান্তরে পরিক্রমা।

...

২.২ : কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ

যে মোক্ষ বা নির্বাণ ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে চরম লক্ষ্য হিসেবে নির্দেশিত, তাকে বিশেষ কোন জন্মমৃত্যুর পরিসরে আবদ্ধ জীবনে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। ফলে এই লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রস্তুতি হিসেবেই স্বীকৃত হয়েছে নির্দিষ্ট কোন জীবনের আগে এবং পরে জীবের আরও বিভিন্ন জন্ম-পুনর্জন্মের অস্তিত্ব। এই জন্মগুলিতে ভোগের মাধ্যমে প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় করে জীবকে যেতে হয় মোক্ষের দ্বারপ্রান্তে এবং জন্ম থেকে জন্মান্তরের এই সুদীর্ঘ পথের অতিক্রমণে যাত্রী হলো জীবের দেহাতীত সত্তা। এ প্রসঙ্গে কর্মফলবাদেরও উল্লেখ করতে হয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে জন্মান্তরবাদ এবং কর্মফলবাদ– এ দুটি ধারণা পরস্পরের পরিপূরক। এই জন্মান্তর আর কর্মফলের স্বীকৃতির ভিত্তির উপর ভারতীয় দর্শনের যে বিশাল সৌধ দণ্ডায়মান, তার প্রাথমিক ধারণার ঔপনিষদিক উন্মেষও ঘটেছিলো উপনিষদীয় ঋষির কোন এক কৌতুহল-মুহূর্তে। অবশ্যই উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে প্রথমকালের অন্যতম প্রাচীন উপনিষদ ছান্দোগ্যই সর্বপ্রথম পুনর্জন্ম বিষয়ক ধারণার অবতারণা করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রচারিত পুনর্জন্ম সম্বন্ধে সেই সর্বপ্রাচীন উক্তিটি হলো–

‘তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্ । ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়াযোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চন্ডালযোনিং বা।। (ছান্দোগ্য-৫/১০/৭)।।

অর্থাৎ :

তাদের মধ্যে যারা (পূর্বজন্মে) রমণীয় আচরণ বা পুণ্যকর্ম করে তারা দেহান্তরে শীঘ্রই ব্রাহ্মণযোনিতে বা ক্ষত্রিয়যোগিতে বা বৈশ্যযোনিতে জন্মলাভ করে। আবার যারা (পূর্বজন্মে) কপূয়াচরণ অর্থাৎ কুৎসিত বা অশুভ কর্ম করে তাদের শীঘ্রই কুকুরযোনিতে বা শূকরযোনিতে বা চণ্ডালযোনিতে পুনর্জন্ম হয়।

এ প্রেক্ষিতে এই নবোত্থিত ধারণার সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর দর্শন-দিগদর্শন গ্রন্থে যে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি করেছেন তার উদ্ধৃতি সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেছেন-

‘ঐ যুগের প্রথম প্রচারক সম্ভবত ভাবেননি, যে সিদ্ধান্ত তিনি প্রচার করছেন ভবিষ্যতে তা কত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে, এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হওয়ার শক্তিকে রুদ্ধ করে সমাজকে স্রোতহীন এক বদ্ধ জলায় পরিণত করবে। মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ লাভের প্রলোভন দেখানো দুঃখপীড়িত মানুষকে আশার কুহক দেখানো ছাড়া আর কিছু নয়। এর একমাত্র অভিসন্ধি হলো মানুষ যাতে তার দুরবস্থার জন্য দায়ী এই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মুখর না হয়ে ওঠে; একে সংযত রাখার জন্যই এই পুনর্জন্মের প্রলোভন। কিন্তু পুনর্জন্ম তো কষ্ট নিপীড়িত মানুষের কাছে আরও ভয়ঙ্কর। এখানে শুধু বর্তমানের দুঃখ ভুলে যেতে উপদেশ দেওয়া হয়নি, বরঞ্চ আরও বলা হয়েছে যে, সামাজিক বৈষম্য কিছু অন্যায় নয়, কেন না তোমারই গতজন্মের কর্মফলে আজ এই অবস্থা। সামাজিক বৈষম্য না থাকলে আজ যে কষ্ট তুমি করছ, পরজন্মে তার পুরস্কার পাবে কি করে?’- (দর্শন-দিগদর্শন-২, পৃষ্ঠা-৩০)।

বলার অপেক্ষা রাখে না, পুনর্জন্মের সাথে পুর্বজন্মের কর্মফল নামক এক অভূতপূর্ব কল্পনাকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যে অব্যর্থ ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন ছান্দোগ্যের প্রখ্যাত ঋষি উদ্দালক আরুণি, তারই অব্যর্থ প্রভাব অন্যান্য উপনিষদে তো বটেই, কালক্রমে সেটাই অপ্রতিরোধ্য গতিতে পল্লবিত হতে হতে পরবর্তীকালের গড়ে ওঠা দর্শনগুলোরও অবিচ্ছেদ্য তত্ত্বীয় অংশে পরিণত হয়েছিলো। ভারতীয় দর্শনগুলিতে এই জন্মান্তর ও কর্মফলের স্বীকৃতির অংশীদার কেবল বেদ ও উপনিষদনুসারী ষড়দর্শনই নয়, তার সম অংশীদার বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনও। কেননা বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুযায়ী গৌতম বুদ্ধ নিজেই বোধিসত্ত্ব রূপে বিভিন্ন জন্ম অতিবাহিত করার পর শাক্যবংশীয় অন্তিম জীবনে বুদ্ধত্ব বা বোধিজ্ঞানের অধিকারী হন।

চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শনচিন্তার অঙ্গীভূত কর্মফলবাদের এই মৌল অধ্যাত্মচিন্তার রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে একমাত্র জন্মান্তরবাদের পটভূমিকায়। কর্মফলবাদীদের মতে মানুষের অনুষ্ঠিত সব কর্মই সুনির্দিষ্ট পরিণতির অপেক্ষা রাখে এবং এই পরিণতির ভালো মন্দ, তারতম্য ইত্যাদি কৃতকর্মের গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল। মানুষ তার স্বকৃত কর্মের ফল নিজে ভোগ করতে বাধ্য। কিন্তু সব কাজের ফল এক জন্মে পাওয়া যায় না। যে জন্মমৃত্যুসীমানার মধ্যে একটি কাজের অনুষ্ঠান, অনেক সময় সেই সীমানার মধ্যেই কাজটি ফলবাহী হয়। আবার বহু ক্ষেত্রে সেই কাজের ফল অন্য জন্মে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কৃত কর্মের ছাপ আত্মার মধ্যে সংস্কারের আকারে সঞ্চিত থাকে এবং জন্ম থেকে জন্মান্তরে পরিচালিত হয়।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে এই সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত অদৃষ্ট। প্রতিটি জীবের কর্মফলভোগ তার নিজস্ব পাপপুণ্যের সমষ্টি বা ভাণ্ডার অনুযায়ীই হয়ে থাকে। এই কর্মফল-ভাণ্ডার বা সঞ্চিত পাপপুণ্যের সমষ্টি ন্যায়দর্শনে জীবের অদৃষ্ট বলে পরিচিত। এই অদৃষ্টকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়– ধর্ম ও অধর্ম। এগুলির উৎপত্তি যথাক্রমে শুভ ও অশুভ প্রবৃত্তি থেকে। যেমন ন্যায়সূত্র এবং তার বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্য ন্যায়ভাষ্যে বলা হয়েছে–
'পূর্ব্বকৃত-ফলানুবন্ধাৎ তদুৎপত্তিঃ'। (ন্যায়সূত্র-৩/২/৬০)।।
'পূর্ব্বশরীরে যা প্রবৃত্তির্ব্বাগ্ বুদ্ধিশরীরারম্ভলক্ষণা, তৎ পূর্ব্বকৃতং কর্ম্মোক্তং, তস্য ফলং তজ্জনিতৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ;' (ন্যায়ভাষ্য-৩/২/৬০)।
অর্থাৎ :
পূর্বকৃত কর্মফলের (ধর্ম ও অধর্ম নামক অদৃষ্টের) সম্বন্ধপ্রযুক্ত সেই শরীরের উৎপত্তি হয় (অর্থাৎ শরীর-সৃষ্টি আত্মার কর্ম বা অদৃষ্টনিমিত্তক, এটাই তত্ত্ব)। (ন্যায়সূত্র-৩/২/৬০)।।
ভাষ্য : পূর্বশরীরে বাক্য, বুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা আরম্ভ অর্থাৎ কর্মরূপে যে প্রবৃত্তি, তাই পূর্বকৃত কর্ম বলে চিহ্নিত, সেই কর্মজনিত ধর্ম ও অধর্ম তার ফল। (ন্যায়ভাষ্য-৩/২/৬০)।।

ন্যায়মতে মানুষের দেহত্যাগ, জন্মান্তরে নতুন দেহে প্রবেশ ইত্যাদি এই অদৃষ্টের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। নৈয়ায়িক আচার্য উদয়নও তাঁর 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে বলেছেন–

‘চিরধ্বস্তং ফলায়ালং য কর্ম্মাতিশয়ং বিনা।’- (কুসুমাঞ্জলি)
অর্থাৎ : অনেক কাল পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত কর্ম মধ্যবর্তী অতিশয় (অদৃষ্ট) ব্যতীত ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না।

তবে মীমাংসা দর্শনে তার নিজস্ব মতে বিশেষ ক্ষেত্রে এই শক্তিকে ‘অপূর্ব’ আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। বৈদিক যাগযজ্ঞে বিশ্বাসী এই দর্শন পরিণামে স্বর্গই তার লক্ষ্য। তাই শাবরভাষ্যে (২/১/৫) মীমাংসক শবরস্বামী বলছেন,–
‘যাগ ক্রিয়া-বিশেষ, ক্রিয়া আবার ক্ষণিক– উৎপত্তির পরক্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু যাগক্রিয়ার ফল ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয় না। অনেক পরে উৎপন্ন হয়। অতএব যাগক্রিয়াকেই কী ভাবে ফল-উৎপাদক বলা যায়? অথচ বিধি আছে ‘দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত’; তাই স্বীকার করতেই হবে দর্শপূর্ণমাস নামের যাগ স্বর্গফলের সাধন। কীভাবে তা সম্ভব হতে পারে ? ‘অপূর্ব’-র দরুন সম্ভব হয়। যাগক্রিয়া একটি অদৃশ্য শক্তি উৎপাদন করে, তারই নাম অপূর্ব। ক্রিয়া বিনষ্ট হলেও এই শক্তিটি কার্যকরি থাকে এবং এই শক্তিই শেষ পর্যন্ত ফল সৃষ্টি করে।’- (শাবরভাষ্য-মীমাংসাসূত্র-২/১/৫)

তার মানে, মীমাংসা-মতে যজ্ঞাদি ক্রিয়া ‘অপূর্ব’ নামে যে শক্তির সঞ্চার করে মৃত্যুর পরেও তা যজ্ঞাদির কর্তা মানুষের আত্মাকে আশ্রয় করে থাকে এবং উপযুক্ত সময়ে ফল প্রসব করে। মীমাংসা-মতে অপূর্বের ব্যাখ্যায় ‘তন্ত্রবার্ত্তিকে’ ভাট্টমীমাংসক ভট্টপদ কুমারিল বলেছেন–
‘কর্ম্মভ্যঃ প্রাগযোগ্যস্য কর্ম্মণঃ পুরুষস্য বা।
যোগ্যতা শাস্ত্রগম্য যা পরা সাহপূর্ব্বমিষ্যতে।।’- (তন্ত্রবার্ত্তিক)
অর্থাৎ : প্রধান কর্ম অনুষ্ঠানের পূর্বে অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি স্বর্গাদি ফল লাভের অযোগ্য থাকেন এবং অঙ্গ কর্মের অনুষ্ঠানের পূর্বে অনুষ্ঠেয় যাগাদি কর্মও ফল উৎপাদনের অযোগ্য থাকে। প্রধান কর্ম ও অঙ্গ কর্ম অনুষ্ঠিত হলেই অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি ও অনুষ্ঠিত কর্ম উভয়েরই যোগ্যতা জন্মে। অতএব অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি ও অনুষ্ঠিত কর্মে যে যোগ্যতা থাকে, তাকেই শাস্ত্রে অপূর্বাদি শব্দে অভিহিত করা হয়।

যোগশাস্ত্রেও কর্ম ও তার ফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। মানুষের কৃত কর্মের যে সংস্কার দেহ থেকে দেহান্তরে যাবার সময়েও আত্মার সঙ্গী হয়, যোগের পরিভাষায় তার নাম ‘কর্মাশয়’। আশয় হলো সংস্কার বা কর্মফল জন্য বাসনা। সংস্কার অর্থ এক্ষেত্রে পূণ্য কর্মজন্য অথবা পাপ কর্মজন্য সংস্কার। যোগসূত্রভাষ্যের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের ‘তত্ত্ববৈশারদী’ গ্রন্থে যোগভাষ্যের ব্যাখ্যায় এই ‘কর্মাশয়’কে ‘ধর্ম’ ও ‘অধর্ম’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।–
‘কর্মণামাশয়ো ধর্মাধর্মৌ’। (তত্ত্ববৈশারদী, যোগসূত্রভাষ্য-২/১২)
অর্থাৎ : কর্মের আশয় বা কর্মাশয় হলো ধর্ম ও অধর্ম বা তৎজনিত সংস্কার।

যোগ-মতে এই কর্মাশয় বা সংস্কারের মাধ্যমেই কৃত কর্ম উপযুক্ত সময়ে ফলাবহী হয়। যোগসূত্র অনুসারে এই কর্মাশয়ের বিপাক বা ফলে পরিণতি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত– জাতি, আয়ু ও ভোগ। যেমন–

ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। (যোগসূত্র-২/১২)।।
সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ। (যোগসূত্র-২/১৩)।।
অর্থাৎ :
ক্লেশই দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম প্রবৃত্তির কারণ। যে সকল ধর্মাধর্ম কর্ম জীবের বর্তমান জন্মে বেদনার কারণ হয়, তারাই দৃষ্টজন্মবেদনীয়। আর যারা ভবিষ্যৎ কোন জন্মে বেদনার কারণ হয়, তারাই অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। (যোগসূত্র-২/১২)।। ক্লেশ থাকলেই ক্লেশ থেকে উৎপন্ন কর্মাশয়ের জন্ম, মরণ, জাতি প্রভৃতি বিবিধ ফলও থাকবে। (যোগসূত্র-২/১৩)।।

তার মানে, বিশেষ পরিবেশে জন্ম বা জাতি, আয়ু বা জীবনের পরিধি এবং ভোগ বা সুখদুঃখময় সংসারজীবনের বিচিত্র অনুভূতি– সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত তার 'কর্মাশয়' অর্থাৎ পূর্বজন্ম কিংবা সেই জন্মেই অনুষ্ঠিত কর্মের সংস্কারের দ্বারা। মানুষের সঞ্চিত কর্মের সংস্কার যতদিন না ভোগের মাধ্যমে ক্ষীণ হয়, ততদিন মানুষ জন্ম থেকে জন্মান্তরের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরে দুঃখময় সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এই সংস্কারের সম্পূর্ণ অবসান হলেই কেবল মোক্ষ সম্ভব।

কিন্তু যেহেতু সম্পূর্ণ কর্মহীন অবস্থায় মানুষের কোন সময়ই থাকা সম্ভব নয়, ফলে দৈহিক কর্মে লিপ্ত না হলেও মানসিক চিন্তার মাধ্যমে তাকে কাজ করে যেতেই হয়। এখন যদি প্রত্যেক কাজ তার সংস্কার রেখে যায় এবং এই সংস্কার পরিণতি লাভ করে, তাহলে তো মানুষের পক্ষে জন্ম-জন্মান্তরের আবর্ত থেকে পরিত্রাণের কোন উপায়ই থাকে না। তাতে কি মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করা সম্ভব হবে? আর ভারতীয় দর্শনে তাহলে মোক্ষকে চরম লক্ষ্য হিসেবে নির্দেশ করারও কোন আকর্ষণ বা সার্থকতা থাকে কি? সমস্যাটা দার্শনিকদেরও ভাবিয়েছে নিশ্চয়ই। তাই এ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা হিসেবে ভারতীয় দর্শনগুলি কী উদ্যোগ নিয়েছে তা অনুসরণ করে দেখা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লতিকা চট্টোপাধ্যায়ের 'চার্বাক দর্শন' গ্রন্থে ভারতীয় দর্শনের পটভূমি বিশ্লেষণের রীতি অনুসরণ করবো।

...

২.৩ : অবিদ্যা
ইতোমধ্যেই আমরা যোগশাস্ত্রের পরিভাষায় অন্তর্ভুক্ত 'ক্লেশ' শব্দটির সাথে পরিচিত হয়েছি। যোগমতে একমাত্র এই ক্লেশের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমেই কৃত কর্মের ফলাবহী হওয়া সম্ভব। যোগসূত্র অনুযায়ী ক্লেশ পাঁচ রকম– অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। যেমন–

'অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।'- (যোগসূত্র-২/৩)
অর্থাৎ : অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশই পঞ্চপ্রকার ক্লেশের পঞ্চনাম।

রাগ বা আসক্তি এবং দ্বেষ বা হিংসা সকলের কাছে সুপরিচিত এবং উন্নততর জীবন লাভ করার পথে এগুলির উচ্ছেদের বিধান অনেকেই দিয়ে থাকেন। ন্যায়দর্শনে রাগ ও দ্বেষকে 'দোষ' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়েছে। যেমন–

প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ। (ন্যায়সূত্র-১/১/১৮)।।
প্রবর্ত্তনা প্রবৃত্তিহেতুত্বং, জ্ঞাতারং হি রাগাদয়ঃ প্রবর্ত্তয়ন্তি পুণ্যে পাপে বা, যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বেষাবিতি। (ন্যায়ভাষ্য-১/১/১৮)।।
অর্থাৎ :
প্রবর্ত্তণালক্ষণ অর্থাৎ প্রবৃত্তিজনকত্ব যাদের লক্ষণ এবং অনুমাপক, অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ, সেই সব হচ্ছে 'দোষ'। (ন্যায়সূত্র-১/১/১৮)।। প্রবর্ত্তনা বলতে বোঝায় প্রবৃত্তিজনকত্ব। রাগাদি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) আত্মাকে পুণ্য বা পাপ কর্মে প্রবৃত্ত করে। যে আত্মাতে মিথ্যাজ্ঞান (মোহ) জন্মে, সেই আত্মাতে রাগ (বিষয়ে অভিলাষ) ও দ্বেষ জন্মে। (ন্যায়ভাষ্য-১/১/১৮)।।

রাগ ও দ্বেষের সঙ্গে অপর তিনটি ক্লেশেরও সবিস্তার বর্ণনা যোগশাস্ত্রে আছে। এই পঞ্চক্লেশ যে বৃত্তিগুলির মধ্যে থাকে, তাদেরকেই বলা হয় ক্লিষ্টবৃত্তি। ক্লেশগুলি দুঃখদায়ক। এবং যোগমতে সব ক্লেশের মূলেই অবিদ্যা বর্তমান। যোগসূত্রে তাই বলা হয়েছে–

'অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারানাম্'।- (যোগসূত্র-২/৪)
অর্থাৎ :
অবিদ্যা থেকেই অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ উৎপন্ন হয়। এগুলি সকল সময় একভাবে থেকে কখনো প্রসুপ্ত, কখনো সূক্ষ্ম, কখনো বিচ্ছিন্ন এবং কখনো বা উদারভাবে চিত্তে বিরাজিত থাকে (পাতঞ্জল-২/৪)।

দেখাই যাচ্ছে, যোগশাস্ত্রে ক্লেশগুলির মধ্যে অবিদ্যাকে প্রধানতম বলে বিবেচনা করা হয়েছে। অবিদ্যা নিজে ক্লেশ এবং অন্যান্য ক্লেশের প্রসবভূমি। যে বস্তু যা নয়, তাকে সেইরূপে জানাই হলো অবিদ্যা। অনাত্মাতে আত্মার, অনিত্যতে নিত্যের জ্ঞান হলো অবিদ্যাপ্রসূত। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত যোগভাষ্যে এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–

'সর্ব এবামী ক্লেশা অবিদ্যাভেদাঃ, কস্মাৎ, সর্বেষু অবিদ্যৈবাভিপ্লবতে যদবিদ্যয়া বস্ত্বাকার্যতে'। (যোগভাষ্য-২/৪)।।

অর্থাৎ :
অবিদ্যার প্রভাবে প্রভাবিত জীব বিভিন্ন ধরনের ক্লেশের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সেইজন্য অবিদ্যাকে দূর করতে সমর্থ হলে স্বাভাবিকভাবেই সে অন্য ক্লেশের কবল থেকেও পরিত্রাণ পায়। (মুক্ততর্জমা)

কাজেই যোগশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী কর্মাশয়গুলির ফলবাহী হবার কারণ সাধারণভাবে 'অবিদ্যা'। ভারতীয় অধ্যাত্ম দার্শনিক সম্প্রদায় দুঃখময় জগতের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই অবিদ্যার দ্বারপ্রান্তেই এসে উপনীত হয়েছেন। 'বিদ্যা' বা সত্য জ্ঞানের বিপরীত মিথ্যা জ্ঞানের সংস্কারের অর্থে 'অবিদ্যা' ব্যবহৃত। অধ্যাত্মবাদীদের মতে, আমাদের আত্মস্বরূপ নিত্য, মুক্ত ও শুদ্ধ এবং দেহ বা মন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সংসারী জীব মিথ্যা জ্ঞানের প্রভাবে নিজেকে বিকারশীল বস্তুজগতের সঙ্গে একাত্ম করে দেখে এবং এই জ্ঞানেরই সংস্কারবশে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ঘুরে কৃত কর্মের সুখদুঃখময় ফল ভোগ করে চলে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? বলা হচ্ছে– 'অবিদ্যা' দূরীভূত হয় 'বিবেকখ্যাতি' বা সত্য জ্ঞানের মাধ্যমে; এবং এই জ্ঞান লাভ হলেই জীব মুক্তির পথে যাত্রা শুরু করে। যেমন–
'অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।'- (যোগসূত্র : ২/৫)
বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ। (যোগসূত্র-২/২৬)।।
'ইত্যেষ মোক্ষস্য মার্গো হানস্যোপায় ইত্যি'। (যোগভাষ্য-২/২৬)।।
অর্থাৎ :
অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, দুঃখকে সুখ এবং অনাত্মাকে আত্মাবোধ করা বা খ্যাতিই হলো অবিদ্যা (যোগসূত্র-২/৫)।। সত্যজ্ঞান প্রদায়িনী বিবেকপ্রসূত প্রজ্ঞাই অবিদ্যা ত্যাগের প্রধান উপায়। (যোগসূত্র-২/২৬)।। এই অবিদ্যা থেকে পরিত্রাণই মোক্ষ বা মুক্তির উপায় (মুক্ততর্জমা)। (যোগভাষ্য-২/২৬)।।

যোগশাস্ত্রে বর্ণিত এই 'অবিদ্যা' সাংখ্যে 'অবিবেক' বলে নির্দেশিত হয়েছে এবং সত্য বা বিবেক জ্ঞানের সাহায্যেই এই 'অবিবেক' দূর করার বিধান সাংখ্যদর্শনে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ 'সাংখ্যকারিকা'য় বলেন–
'দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ।।'- (সাংখ্যকারিকা-২)
অর্থাৎ :
বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপও লৌকিক উপায়ের মতো ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধনে অসমর্থ। সেই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ যেহেতু অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয়যুক্ত, সেহেতু যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের বিপরীত দুঃখ নিবৃত্তির সেই সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপায় ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান-ই শ্রেয়। কারণ ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ-এর বিবেকজ্ঞান থেকে দুঃখের অবশ্যম্ভাবী ও চির নিবৃত্তি হয়।

.

ধর্ম্মেণ গমনমূর্ধ্বং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ।।- (সাংখ্যকারিকা-৪৪)
অর্থাৎ :
ধর্মের দ্বারা (সূক্ষ্মশরীরের) উর্ধ্বগমন এবং অধর্মের দ্বারা (সূক্ষ্মশরীরের) অধোগমন হয়। (পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেকজ্ঞান অথবা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের) বিবেকজ্ঞান হলে পরম পুরুষার্থ অপবর্গ বা মোক্ষ লাভ হয়, এবং (বিবেকজ্ঞানের বিপরীত) অজ্ঞানবশত বন্ধন হয়– এটাই শাস্ত্রকারগণের অভিমত।

বেদান্ত মতবাদের এই ‘অবিদ্যা’কেই আবার বিশেষ ক্ষেত্রে ‘মায়া’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অদ্বৈতবাদীরা মূল সত্তা হিসেবে সাব্যস্ত করেছে আত্মা বা চৈতন্যকে। শঙ্করের অদ্বৈতবাদে এই মূল চেতনা বা ব্রহ্ম জগতের আকারে বিবর্তিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মের জগদাকারে প্রকাশটা মিথ্যা বা ভ্রান্তি। কারণ জগৎ বলে বস্তুত কিছু নেই, একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব আছে। যা নেই তাও ‘আছে’ বলে ভ্রান্ত প্রতীতি হয়। আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতের মতেও মূল সত্তা একমাত্র ব্রহ্ম। কিন্তু ব্রহ্মের জগদাকারে বিকাশধারা ভ্রান্ত নয়, সত্য; যদিও ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত জগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতও অনেকটা অদ্বৈতমতের অনুরূপ, কারণ মূল সত্তা ক্ষণিকবিজ্ঞান। বিজ্ঞানের বিষয়রূপে প্রতিভাত বহির্জগৎ ভ্রান্তিকল্পিত।
এখানে আরো উল্লেখ্য, অদ্বৈতমতের ব্যাখ্যায় জগত বস্তুত মিথ্যা হলেও তাঁরা কিন্তু সরাসরি তা স্বীকার করেন না। একটু ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বিষয়টার ব্যাখ্যা করেন তাঁরা। কীভাবে? সহজ করে বললে, হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়ে ভাষায়– ‘অদ্বৈতবাদীরা পারমার্থিক ব্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত একটি ব্যবহারিক সত্তার আমদানি করেছেন, যা আসলে মিথ্যা। এতে অদ্বৈতবাদের কোনো অঙ্গহানি হয় না। একে ‘আছে’ও বলা যাবে না, ‘নেই’ও বলা যাবে না, ‘আছে নেই’ও বলা যাবে না, ‘ভাব’ও বলা যাবে না, ‘অভাব’ও বলা যাবে না, ‘ভাবাভাব’ও বলা যাবে না সুতরাং অনির্বচনীয়। একেই বলে মিথ্যা; কিন্তু একেবারে ফেলনা নয়। কারণ এর দ্বারা লৌকিক ব্যবহারিক সংসারের প্রয়োজন মেটানো যায়। তাই প্রয়োজনবোধে অন্য দর্শনের মতো খণ্ডন করা যায়, সামাজিক স্বার্থের প্রয়োজনে শূদ্র বা শ্রমিক জনসাধারণকে উচ্চবর্ণের আধিপত্যের স্বার্থে সকলপ্রকার মানবিক অধিকার থেকে আইন করে বঞ্চিত করা যায়। যখন যেমন প্রয়োজন মনে হয় তখন তেমন কাজ করা যায়। সুতরাং ব্যবহারিক সত্তাটি অপরূপ বহুরূপী।... সবই তো মায়া মাত্র। তাই যখন যেমন তখন তেমন– একেই বলে ব্যবহারিক সত্তা।’- (চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৪৩)

যাই হোক, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্বপর্যন্ত এই মিথ্যা জগতকে জগতরূপে দেখাটা অদ্বৈতমতে অবিদ্যার কারণেই ঘটে থাকে। এই অবিদ্যা দূর না হলে মুক্তি সম্ভব নয়। দুঃখময় সংসারবন্ধন ছিন্ন করার জন্য ভারতীয় অন্যান্য দর্শনেও একই উপায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদিও প্রকাশভঙ্গি এবং পরিভাষা এক্ষেত্রে প্রত্যেক দর্শনেরই নিজস্ব। এই

সত্য জ্ঞানের উন্মেষ এক দিনে হয় না এবং এই জ্ঞান অর্জন করাও সহজ নয়। কিন্তু চরম দুঃখনিবৃত্তির জন্য অন্য কোন পথ নেই। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ করে যোগশাস্ত্রে এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণে এই পথের সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে, এই যে মুক্তি বা ভোগাত্মক সংসারের অবসানের পথ ধরে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের অগ্রগতি, কিন্তু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন বা ব্যবহারিক জীবনে এর আবেদন বা প্রভাব কতটুকু?
এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, মোক্ষ পরম পুরুষার্থ হিসেবে বিবেচিত একমাত্র সেই শ্রেণীর লোকদের কাছে যাঁরা দুঃখের পরিবর্তে জাগতিক সুখের অভিলাষী নন, অর্থাৎ জাগতিক সুখের নশ্বরতা যাঁরা উপলব্ধি করতে সমর্থ। মানুষের মুক্তিপথের সূচনা মূলত এই ধরনের উপলব্ধি থেকে, যার পূর্ব পর্যন্ত সাংসারিক সুখ তার একমাত্র কাম্য এবং মোক্ষের কোন আবেদনই তার কাছে থাকে না। সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মুক্তিপথের নির্দেশক ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনগুলি সাধারণ সংসারী মানুষের জীবনদর্শনে প্রয়োজনীয়তার কোন বার্তাই বয়ে আনতে পারে না। কিন্তু একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে মানুষের সংসারী জীবনও তলে তলে এই দর্শনের পরিধির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কীভাবে?

ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত কর্মফলবাদ অনুসারে ভালো বা মন্দ কাজ যথাক্রমে সুখ ও দুঃখের জনক হিসেবে নির্দেশিত। ফলে সংসারী মানুষ সুখের আশায় সৎ কাজের অনুষ্ঠানে প্রেরণা পায়। এবং অনিষ্টের আশঙ্কা থেকে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণেই মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। কাজেই মূলত আধ্যাত্মিক হলেও ভারতীয় দর্শন সংসারী মানুষের নৈতিক জীবনকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে বলা যায়। 'অদৃষ্ট', 'ধর্ম-অধর্ম', 'পাপ-পুণ্য' ইত্যাদি ধারণা জনজীবনে মূলত কর্মফলবাদের অবদান। তবু মানুষ নিজের অদৃষ্ট যে নিজেই তৈরি করে সেটা হয়তো সকলে ভেবে দেখে না, কিন্তু অন্যায় করলে তা ধর্মে সয় না এবং তাতে পাপ হয়– এ বিশ্বাস সাধারণ জনগণের মজ্জাগত। মূলত এই বিশ্বাসেরই ফলস্বরূপ এতদঞ্চলের জনজীবনে একটি নৈতিক মানদণ্ড বর্তমান। অতএব এ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না অবশ্যই।

অন্যদিকে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের বিভিন্ন শাখায় তার মূল লক্ষ্য দুঃখের একান্ত অবসানে উপনীত হবার পথের বর্ণনা নানাভাবে দেখা যায়। এই লক্ষ্য ও পথের বিস্তারের মধ্য দিয়েই ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানগুলি শাখায় শাখায় পল্লবিত হয়েছে। যদিও ভিতরের খুঁটিনাটি নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে, কারও আশ্রয় চরম অধ্যাত্মবাদ, আবার কেউ বা বস্তুবাদের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু উদ্দেশ্য সবারই এক।
যেমন মোক্ষ লাভ করার জন্য প্রয়োজন আত্মার প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি এবং এই

আত্মস্বরূপের নির্ণয়ে সাংখ্য যোগ এবং বেদান্ত সাধারণভাবে একমত। সাংখ্য-যোগ মতে প্রকৃতি ও পুরুষ, ভোগ্য ও ভোক্তা, এই দুই-এর সংযোগে জগৎ তৈরি। এই পরিবর্তনশীল বা পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রকৃতিরই বিভিন্ন বিকার, এবং এই পরিবর্তনের পটভূমিকায় পুরুষ বা আত্মা তার অপরিবর্তনীয় শাশ্বত অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান। সাংখ্যে প্রকৃতি ও পুরুষ একে অপরের পরিপুরক। প্রকৃতির মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা আছে, সেই অসম্পূর্ণতাকে দূর করার জন্যই যেন সাংখ্যে পুরুষের কল্পনা। আমাদের চির পরিচয়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ বিকারধর্মী এই জগতের কোন ছাপ পুরুষ বা আত্মার মধ্যে নেই। আত্মার এরূপ সম্বন্ধে সাংখ্য এবং বেদান্তের মতের সাদৃশ্য রয়েছে। এছাড়া ন্যায়-বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অন্য দার্শনিক গোষ্ঠীর ধারণা কিছুটা ভিন্ন হলেও এ বিষয়ে সকলেই অভিন্নমত যে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে হলে আমাদের লক্ষ্যকে একান্তভাবে অসম্পূর্ণ বস্তুজগতের বিপরীতমুখী করা উচিত। বুদ্ধের অনুগামীরা নির্বাণ বা শূন্যতার মধ্যে ভোগের অবসান খোঁজেন। স্থির আত্মস্বরূপ তাঁদের ধারণার গণ্ডির মধ্যে পড়ে না। আবার মীমাংসা দর্শন প্রধানত বেদানুগ হওয়ার ফলে ভারতীয় অন্য দার্শনিক গোষ্ঠীর সঙ্গে মীমাংসকদের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পার্থক্য রয়েছে। কাজেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এঁদের লক্ষ্য হলেও বৈরাগ্যাত্মক মুক্তির পরিষ্কার চেহারা তাঁদের রূপায়নে পাওয়া যায় না।

তবে মতভেদ যাই থাক, অধ্যাত্ম দর্শনগুলির লক্ষ্যের এই পরিসমাপ্তি যে বস্তুনিষ্ঠ সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়ের ধরাছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে– সেটি অধ্যাত্মবাদীরা সকলেই স্বীকার করেন। অতএব এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে– আমাদের ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধির ধারণার সীমাবহির্ভূত এই লক্ষ্যকে ভারতীয় দর্শনের গণ্ডির মধ্যে আনা কিভাবে সম্ভব হয়েছে? এ প্রশ্নের সমাধান পেতে হলে আমাদেরকে হয়তো ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রমাণের ব্যবহার প্রসঙ্গে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

...

২.৪ : দর্শনে যুক্তিবাদ বা প্রমাণমিতি

'প্রমাণ' সংজ্ঞায় জ্ঞানের মাধ্যমকে বোঝায়। মানুষের জ্ঞানের বিস্তীর্ণ রাজ্যে যে যে বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি, দার্শনিক বিচারের পরিসরে আসার যোগ্যতা একমাত্র সেগুলিরই। যে প্রবেশপথকে আশ্রয় করে মানুষের অন্তর্লোকে জ্ঞানের ভাণ্ডারে বিষয়গুলির ক্রমিক সঞ্চয়, তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'প্রমাণ' এই বিশেষ শব্দের দ্বারা। প্রমাণের বিচার বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকেরা বিশেষ তৎপর, কারণ তাঁরা মনে করেন যে জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ধারণের প্রস্তুতি রচিত হয় জ্ঞানের প্রবেশপথ বা প্রমাণের গুণাগুণ বিচারের মাধ্যমে। তাই যে প্রণালী দ্বারা প্রমা বা যথার্থজ্ঞান লাভ করা যায় তাকেই প্রমাণ বলা হয়।
ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় প্রমাণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। আবার প্রতিটি শ্রেণীকে বিশিষ্ট লক্ষণের সুনির্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে। তবে ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে প্রমাণের বিচার সর্বাধিক প্রাধান্যের দাবি রাখে ন্যায়দর্শন। এ কারণেই ভারতীয় দর্শন জগতে 'প্রমাণশাস্ত্র' হিসেবে ন্যায়ের পরিচিতি।

প্রমাণ বা জ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে সাধারণভাবে দুটি নাম উল্লেখ করা যেতে পারে– প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। চার্বাক এবং চার্বাকেতর, পরস্পরবিরোধী এই দুটি ভারতীয় দর্শনগোষ্ঠির মধ্যে সেতুবন্ধ রচিত হয়েছে এই প্রমাণ দুটি, বিশেষ করে প্রথমটির সাহায্যে। কারণ দ্বিতীয়টির আংশিক অনুমোদন লক্ষণীয় কেবলমাত্র চার্বাকের বিশেষ একটি শাখাগোষ্ঠির মধ্যে। প্রথমটির বিরোধিতা চার্বাকের একাংশে দেখা গেলেও চার্বাক নামের সঙ্গে এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বীকৃতির এক অচ্ছেদ্য যোগ সকলের কাছে সুপরিস্ফুট।

চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের সঙ্গে সরাসরি যোগের ফলে আমাদের যে জ্ঞান হয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণকে তার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়। মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে–

'ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপনং জ্ঞানম্ অব্যোপদেশ্য অব্যভিচারী ব্যবসায়ত্মকম্ প্রত্যক্ষম্'। (ন্যায়সূত্র: ১/১/৪)।
অর্থাৎ : ইন্দ্রিয় এবং অর্থের সন্নিকর্ষের ফলে যে অব্যাপদেশ্য (অশাব্দ), অব্যভিচারী (অভ্রান্ত) এবং ব্যবসায়াত্মক (নিশ্চয়াত্মক) জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই প্রত্যক্ষ।

আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয় পাঁচটি– চক্ষু বা দর্শনেন্দ্রিয়, কর্ণ বা শ্রবণেন্দ্রিয়, নাসিকা বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা বা স্বাদেন্দ্রিয়, ত্বক বা স্পর্শেন্দ্রিয়। তাই বাহ্য প্রত্যক্ষণও পাঁচ রকমের হয়। আবার ন্যায়মতে মন ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত অন্য করণ। অনুমানসিদ্ধ মনের অস্তিত্ব সাধনে ন্যায়সূত্র-এ বলা হয়েছে–

'যুগপৎ জ্ঞানানুৎপত্তিঃ মনসো লিঙ্গম্'। (ন্যায়সূত্র-১/১/১৬))।
অর্থাৎ : যুগপৎ বা একই সময়ে দুটি বিষয়ের জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়ায় মনের অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

আর অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহদীপিকা টীকায় মন-এর লক্ষণ দিয়েছেন–
‘স্পর্শরহিতত্বে সতি ক্রিয়াবত্ত্বং মনসো লক্ষণম্’। (তর্কসংগ্রহদীপিকা)।
অর্থাৎ : যা স্পর্শশূন্য, কিন্তু ক্রিয়াবান, তাই মন।

এই মনকে আন্তর-ইন্দ্রিয় হিসেবে গণ্য করে মনের বিভিন্ন অনুভূতিকে প্রত্যক্ষজ জ্ঞানের অন্তর্গত করা যেতে পারে। এই প্রত্যক্ষজ জ্ঞানেরই ভিত্তিতে উপযুক্ত মানসিক বিচারের সাহায্যে আমাদের জ্ঞানের রাজ্য আরও প্রসারিত হতে পারে এবং এক্ষেত্রে অনুমানের ভূমিকা স্বীকার্য। যুক্তি বা তর্ক এই অনুমানের আশ্রয়। আমাদের জ্ঞানের রাজ্যের অধিকাংশ উপাদানেরই সরবরাহের ব্যাপারে ‘প্রত্যক্ষ’ এবং ‘অনুমান’ এই প্রমাণ দুটির উপযোগিতার বিষয়ে সাধারণভাবে সকলেরই মতৈক্য দেখা যায়।

কিন্তু ‘শব্দ’ নামে অতিরিক্ত আর একটি প্রমাণ ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার করেছে। ‘শব্দ’ বৈদিক বচনের অর্থে ব্যবহৃত হলেও ‘শব্দ’ এই সংজ্ঞার দ্বারা আপ্তবাক্যকে অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য পুরুষের মুখনিঃসৃত শব্দকে সাধারণভাবে প্রামাণ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। ন্যায়সূত্র-এ মহর্ষি গৌতম শব্দের লক্ষণে বলেছেন–
‘আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ’। (ন্যায়সূত্র-১/১/৭)
অর্থাৎ : আপ্তব্যক্তির উপদেশবাক্যই শব্দ প্রমাণ।

ন্যায়মতে, ভ্রম (একটি বস্তুকে অন্যরূপে জানা), প্রমাদ (অসাবধানতা), বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনা করার ইচ্ছা) ও করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের ত্রুটি)– এই চারটি দোষশূন্য যথার্থ বক্তাই আপ্তব্যক্তি। অন্নংভট্টে মতে–
‘আপ্তঃ তু যথার্থবক্তা’। (তর্কসংগ্রহ)।
অর্থাৎ : আপ্তব্যক্তি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি যথার্থ বক্তা।
অদ্বৈত বেদান্তের প্রবক্তা শঙ্করাচার্য মনে করেন যে–
‘পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতাঃ’। (শাঙ্করভাষ্য-২/১/১১)।
অর্থাৎ : যুক্তি বা তর্কের মাধ্যমে কোন প্রশ্নের স্থায়ী সমাধান লাভ করা সম্ভব নয় বলে তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত। আপ্তপুরুষোক্তি প্রামাণ্য। (মুক্ততর্জমা)

তার মানে হলো, ‘যুক্তি বা তর্কের মূল মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তাধারার ভিতর। ব্যক্তিনিষ্ঠ এই প্রমাণ বিভিন্নমুখী হতে বাধ্য এবং এই বিভিন্নমুখী ভাবনাকে কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে ধরা যায় না। সেই কারণেই এর সাহায্যে চিরন্তন বা শাশ্বত কোন সত্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবিশেষ অতিমানস প্রত্যক্ষের দ্বারা যে সত্যের সন্ধান লাভ করেছেন, পরম্পরালব্ধ সেই জ্ঞান আপ্তবাক্যের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। ‘শব্দ’ বা ‘শ্রুতি’ এই সংজ্ঞাগুলি একই মাধ্যমের পরিচিতি বহন করে। জ্ঞানের এই মাধ্যম বা প্রমাণের প্রবেশপথ দিয়ে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে যে বিশেষ সম্পদের সঞ্চয় হয়, ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধির দ্বারপথে তা

কোনক্রমে সম্ভব নয়।’

‘শব্দ’ বা ‘শ্রুতি’ সাধারণভাবে বেদের অর্থই প্রযোজ্য। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণের বিচারে বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনে এই প্রমাণের অন্তর্ভুক্তি না থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ বেদবিরোধিতাকে কেন্দ্র করেই নাস্তিক হিসেবে প্রধানতঃ এদের পরিচিতি। কিন্তু বিশেষভাবে বৈদিক বচনের অনুগামী না হয়েও মহামানব বুদ্ধ বা জৈন তীর্থঙ্করদের বচনের অনুসরণ করে বৌদ্ধ এবং জৈনরা আপ্তবচনকে অন্যভাবে তাঁদের প্রমাণের অন্তর্গত করেছেন।
জৈনমতে প্রমাণ দুরকম– প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। তাই বলা হয়েছে–
‘বিজ্ঞানং স্বপরাভাসি প্রমাণং বাধবর্জিতম্ ।
প্রত্যক্ষং চ পরোক্ষং চ দ্বিধা মেয়বিনিশ্চয়াৎ।।’
অর্থাৎ : বিজ্ঞান নিজেকে ও অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে। তা যখন সমস্ত বাধারহিতভাবে উৎপন্ন হয় তখন তা নিশ্চিত জ্ঞান। এই নিশ্চিত জ্ঞানকেই প্রমাণ বলে। এবং প্রমেয় বিষয় যে প্রকারে জ্ঞানে প্রকাশিত হয় সে অনুসারে জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বলা হয়।
অনুমান এবং ‘শ্রুত’ শেষোক্ত পরোক্ষ প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার্য। এই ‘শ্রুত’ জ্ঞানকেই ক্ষেত্রবিশেষে শব্দ বা ‘আগম’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন, জৈন দার্শনিক মানিক্যনন্দীর ‘পরীক্ষামুখসূত্রে’ বলা হয়েছে–
‘আপ্তবচনাদিনিবন্ধম্ অর্থজ্ঞানম্ আগমঃ’।- (পরীক্ষামুখসূত্র-৩/৯৯)
অর্থাৎ : আপ্তবাক্য হস্তসঙ্কেত প্রভৃতি হতে উৎপন্ন বিষয়ের জ্ঞান হচ্ছে আগম।

আস্তিক দর্শনের ‘শ্রুতি’ বা বেদের মতো ‘শ্রুতি’ বা অঙ্গাদি শাস্ত্রকে জৈনরা বিশেষ প্রমাণের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। তবে বৌদ্ধ দর্শনে বুদ্ধের বাণী এভাবে ‘শ্রুত’ নামে পরিচিত না হলেও কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এই বাণীই বৌদ্ধদের কাছে চরম প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কাজেই আপ্তবাক্য অধ্যাত্মবাদীদের কাছে জ্ঞানের একটি প্রধান মাধ্যম।
কিন্তু নাস্তিক বৌদ্ধ এবং জৈনদের বাদ দিয়ে আস্তিকতার পঙক্তিতে যাদের স্থায়ী আসন সাধারণভাবে স্বীকৃত কেবল তাদের বেছে নিলেও ‘শব্দ’ বা বেদকে প্রমাণ হিসেবে প্রাধান্য দানের ব্যাপারে প্রচুর তারতম্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে বোধ হয় মীমাংসা-দর্শনই অগ্রণীর ভূমিকা দাবি করতে পারে। মীমাংসা মনে করে যে তার অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে বেদের প্রামাণ্যই একমাত্র বিচার্য। অর্থাৎ মীমাংসার মূল সুর হলো ধর্ম বা বেদার্থের বিচার। এ-প্রেক্ষিতে জৈমিনির দ্বিতীয় সূত্রটিই হলো–
‘চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্ম’।- (মীমাংসাসূত্র : ১/১/২)
অর্থাৎ : চোদনা লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন বা জ্ঞাপক যার সেই বিষয়ই ধর্ম।

‘চোদনা’ শব্দের মীমাংসাসম্মত অবিসংবাদিত অর্থ হলো প্রবর্তক বাক্য। তবে যে কোন

প্রবর্তক বাক্য নয়, প্রবর্তক বেদবাক্য দ্বারা সূচিত বিষয়ই ধর্ম। যদিও মীমাংসাদর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং অপর কয়েকটি প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে, এ আলোচনার উদ্দেশ্য এই শাস্ত্র মতে প্রধানতঃ নেতিবাচক-লক্ষ্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজনীয়তার অভাব প্রদর্শন। এক্ষেত্রে মীমাংসক শবরস্বামীর দ্বিধাহীন ভাষ্য–
‘প্রত্যক্ষপূর্বকত্বাচ্চানুমানোপমানার্থাপত্তীনামপ্যকারণত্বম্’।- (শাবরভাষ্য)
অর্থাৎ : প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অনুমান, উপমান এবং অর্থাপত্তিও অনিমিত্ত, অর্থাৎ ধর্মকে জানাতে অপারগ, যেহেতু তারা সকলেই প্রত্যক্ষপূর্বক। প্রত্যক্ষ যার নাগাল পায় না তারাও সেখানে ব্যর্থ।

ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের ক্ষেত্রে অবশ্য এই প্রমাণগুলির উপযোগিতা দেখানো হয়েছে; কিন্তু সেটা নেহাতই গৌণ, মুখ্য ভূমিকা এ বিষয়ে শব্দ প্রমাণের বা বেদের, মীমাংসাদর্শনে যা শাস্ত্র বা আগম বলেও পরিচিত। এবং এই বেদকে আশ্রয় করেই মীমাংসকরা তাঁদের চিন্তার প্রসারে উদ্যোগী। শব্দপ্রাধান্যবাদের এই অন্যতম উৎস হলো মীমাংসক শবরস্বামীর ভাষ্য–
‘চোদনা হি ভূতং ভবন্তং ভবিষ্যন্তং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবংজাতীয়কম্ অর্থং শক্নোত্যবগময়িতুম্, নান্যত্ কিঞ্চন, নেন্দ্রিয়ম্’। (শাবরভাষ্য)
অর্থাৎ : চোদনা অর্থাৎ প্রবর্তক বা বিধায়ক বাক্য অতীত, বর্তমান, ভাবী, সূক্ষ্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগম্য, ব্যবহিত অর্থাৎ স্থান এবং কালের দিক থেকে যার সঙ্গে ব্যবধান, দূরবর্তী এবং এজাতীয় অন্য অর্থকেও জানাতে পারে; যা অন্য কিছু করতে পারে না; এমনকি ইন্দ্রিয়ও নয়।

‘শব্দ’ বা বেদের প্রাধান্য ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনেও অনুমোদিত। কিন্তু প্রমাণের আসরে বৈদিক বচনের একক ভূমিকা মীমাংসার মতো এই দর্শনদ্বয়ের সমর্থন লাভ করেনি। বৈশেষিক দর্শনে শব্দের প্রামাণ্য স্বতন্ত্র রূপে গ্রাহ্য নয়। এটি অনুমানেরই এক অঙ্গ হিসেবে স্বীকার্য।
আর বৈদিক কর্মকাণ্ডের উপর সাংখ্য এবং যোগের বিরাগ নানাভাবেই লক্ষণীয়। আমরা ইতঃপূর্বেই দেখেছি ঈশ্বরকৃষ্ণের ‘সাংখ্যকারিকা’র দ্বিতীয় কারিকায় বলা হয়েছে–
‘দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ।।’- (সাংখ্যকারিকা-২)
অর্থাৎ : বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপও লৌকিক উপায়ের মতো ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধনে অসমর্থ। সেই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ যেহেতু অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয়যুক্ত, সেহেতু যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের বিপরীত দুঃখ নিবৃত্তির সেই সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপায় ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান-ই শ্রেয়। কারণ ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ-এর বিবেকজ্ঞান থেকে দুঃখের অবশ্যম্ভাবী ও চির নিবৃত্তি হয়।

স্থানবিশেষে বেদের মহিমাকীর্তনের মাধ্যমে আস্তিক দর্শনগুলির সঙ্গে ক্ষীণ সংযোগসূত্র রক্ষা

করতে সচেষ্ট হলেও এই দর্শন দুটি প্রধানত যুক্তিবাদী এবং 'শব্দ' বা বেদের তুলনায় প্রত্যক্ষ বা অনুমানই এখানে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী। যেমন এ প্রেক্ষিতে সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণের ষষ্ঠ কারিকার বক্তব্যটিতে তা অপ্রকাশ্য নয়–

'সামান্যতস্তু দৃষ্টাৎ অতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চ অসিদ্ধং পরোক্ষম্ আপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্ ।।'- (সাংখ্যকারিকা-৬)
অর্থাৎ : সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দ্বারা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অতীত (প্রকৃতি, পুরুষাদি) তত্ত্বের জ্ঞান হয়। সামান্যতোদৃষ্ট এবং শেষবৎ অনুমানের দ্বারা অতীন্দ্রিয় কোন তত্ত্ব অসিদ্ধ হলে সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব আপ্তবচনরূপ আগম বা শব্দ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়।

'শ্রুতি'র প্রতি সাংখ্য ও যোগের আনুগত্য উপনিষদীয় বচনের মারফৎ; বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমে নয়। তাই হয়তো বৈদিক প্রভাবপুষ্ট মীমাংসাদর্শনের অনুগামী কুমারিল ভট্টের কাছে (তন্ত্রবার্ত্তিক-১/৩/৪) সাংখ্য এবং যোগ বেদবিরোধিতার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ দর্শনের সমপর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। এমনকি বেদান্তবাদীরাও সাংখ্যকে বেদবিরোধী আখ্যায়িত করে বেদান্তদর্শনে সাংখ্যমত খণ্ডনেই প্রচুর শ্রম ব্যয় করেছেন। যেমন শঙ্করাচার্য্যরে ভাষ্যে মহর্ষি বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে–

'বিপ্রতিষেধাৎ চ অসমঞ্জসম্'।। (ব্রহ্মসূত্র-২/২/১০)।।
ভাবার্থ : শ্রুতি-স্মৃতির সাথে সাংখ্যের বহু বিরোধ আছে এবং সাংখ্যদর্শনের নিজের চিন্তার মধ্যেও স্ববিরুদ্ধভাব আছে। সুতরাং সাংখ্যের প্রধান গ্রহণযোগ্য নন।

এবং যোগদর্শনকে খণ্ডন করতে গিয়ে বেদান্তসূত্রে বাদরায়ণ বলেন–

'এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ'।। (ব্রহ্মসূত্র-২/১/৩)।।
ভাবার্থ : একই যুক্তিতে সাংখ্য মতানুসারী যোগ স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রামাণ্যকেও খণ্ডন করা হলো (ব্রঃ-২/১/৩)।

যাই হোক, 'শব্দ', 'শ্রুত' বা 'আপ্তবাক্য' যে নামেই অভিহিত হোক না কেন– প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের অতিরিক্ত এই বিশেষ প্রমাণটি যে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের সীমাবহির্ভূত এক বিশেষ জগতের পরিচয় এনে দিতে সাহায্য করেছে এতে সন্দেহ নেই। ভারতীয় চিন্তাধারায় এই আপ্তবাক্যের অন্তর্ভুক্তি থেকে যুক্তিতর্কবিহীন অন্ধ বিশ্বাসের প্রতি ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের সমর্থনের ইঙ্গিত আবিষ্কার করা অস্বাভাবিক নয়। ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন এভাবে প্রতিপক্ষের সমালোচনার বিষয়বস্তু হতেই পারে। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকেরা বিভিন্ন সিদ্ধান্তে যেভাবে উপনীত হয়েছে সেগুলি ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে তাঁদের অভূতপূর্ব বুদ্ধিদীপ্ততার দৃষ্টান্তই ভেসে উঠে।

যুক্তির প্রতি কোন কোন দর্শনের অনুরক্তি আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। আপ্তবচনমাত্রই ভারতীয় দর্শনে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। বিভিন্ন আপ্তবচনের মধ্যে কোনগুলি গ্রাহ্য তা বিচার করার ক্ষেত্রে যুক্তিই বহুলাংশে পদপ্রদর্শকের ভূমিকা রেখেছে। তবে যুক্তি বা

অনুমানের সমর্থন ছাড়াও আপ্তবচনের গ্রহণযোগ্যতার বিচারে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সাক্ষ্য ভারতীয় দর্শনে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। এটা বোধকরি বলা অসঙ্গত হবে না যে, ভারতীয় দর্শন প্রধানতঃ ব্যবহারিক দর্শন। ব্যবহারিকতার মাপকাঠির বিচারে যারা ছাড়পত্র পেয়েছে, একমাত্র সেই মতগুলিরই গ্রহণযোগ্যতা ভারতীয় দর্শনে সুনির্দিষ্ট। আপ্তবাক্য লব্ধ জ্ঞানকে ভারতীয় দার্শনিক অন্ধভাবে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকেননি। সাক্ষাৎ উপলব্ধির ভিত্তিতে তার উপযুক্ত মান নির্ধারণ করে তবেই তাকে জ্ঞান সংজ্ঞায় চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এ নিয়েও ভারতীয় দর্শন জগতে মতান্তরের শেষ নেই। তবে একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে যে এ জ্ঞান প্রকৃতই উপলব্ধিগম্য দৃঢ় প্রত্যয়ে তা ব্যক্ত করতে তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করেননি। এই জ্ঞানলাভের পথেরও সঠিক নির্দেশ করতে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবাক্য– এই তিনটির অতিরিক্ত উপমান, অর্থাপত্তি ইত্যাদিকে প্রমাণের পর্যায়ে অনেকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। যেমন নৈয়ায়িকেরা উপমানকে এই তিন প্রমাণের অতিরিক্ত অপর একটি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন। ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে–

‘প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি’।। (ন্যায়সূত্র-১/১/৩)
অর্থাৎ : প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ নামে প্রমাণপদার্থ চতুর্বিধ।

আবার উপমানের সঙ্গে অর্থাপত্তিকে যুক্ত করে মীমাংসকাচার্য প্রভাকর মিশ্র প্রমাণের সংখ্যা পাঁচ বলে মন্তব্য করেন। অন্যদিকে এই পঞ্চবিধ প্রমাণের সাথে কৌমারিল বা ভাট্ট-মীমাংসকেরা ষষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে জুড়ে দিয়েছেন অনুপলব্ধি বা অভাবপ্রমাণকে। অর্থাৎ ভাট্টমীমাংসক মতে প্রমাণ ছয় প্রকার- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে হয়তো এই অতিরিক্ত প্রমাণগুলির মধ্যে অনুমানকে খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় না। তবে আলোচিত প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ– এই তিনটিই প্রমাণই সাধারণভাবে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকমহলে প্রামাণ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে।

৩.১ : মীমাংসক কর্তৃক ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন

নিরীশ্বরবাদিতায় নাস্তিক দর্শনগুলোর অবস্থান আমাদের কাছে সহজেই অনুমেয়, এরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন। কিন্তু একান্ত বেদনির্ভর প্রচণ্ড আস্তিক দর্শন হয়েও মীমাংসক দার্শনিকেরা যে তাঁদের নিজস্ব যৌক্তিক অবস্থান থেকে কতোটা চরম নিরীশ্বরবাদী হতে পারেন তারই সামান্য কিছু নমুনা আমাদের বিবেচনাবোধকে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে পারি। এ প্রেক্ষিতে আমাদের এই আলোচনার উৎস হলো মহর্ষি জৈমিনির মীমাংসাসূত্রের প্রখ্যাত ভাষ্যকার শবরস্বামীর ভাষ্য এবং তার ব্যাখ্যাকার দার্শনিক প্রভাকর মিশ্র ও কুমারিল ভট্টের উত্থাপিত যুক্তি। তবে এ বিষয়টাতে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের পক্ষ-বিপক্ষ অবস্থান সাপেক্ষে তাঁদের স্ব-স্ব যুক্তি-বিস্তার এতো জটিল-সম্বন্ধযুক্ত ও বিশাল-বিস্তৃত যে, তা থেকে তুলে আনা গুটিকয় নমুনা দিয়ে ক্ষণিক স্বাদটুকু হয়তো আঁচ করা যেতে পারে, বিষয়ের গুরুত্ব ও গভীরতা পরিমাপ করা আদৌ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কৃত 'ভারতীয় দর্শন' এবং মহামহোপাধ্যায় হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়-কৃত 'বৈদিকধর্ম ও মীমাংসা-দর্শন' গ্রন্থ দুটিকে এ বিষয়ে আপাত সহায়কসূত্র হিসেবে নেয়া হয়েছে।

ঈশ্বর প্রসঙ্গে এ-জাতীয় কোনো স্রষ্টার কল্পনা যে অবাস্তব সে-বিষয়ে মীমাংসক শবরের যুক্তি হলো, তৎ-সম্বন্ধে প্রমাণাভাব- অর্থাৎ, কোনো প্রমাণের সাহায্যেই স্রষ্টার সত্তা সিদ্ধ হতে পারে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব সিদ্ধ নয়, কেননা এ-জাতীয় স্রষ্টারা প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নয় বলেই অন্য কোনো প্রমাণও তাঁর সত্তার প্রতিপাদক হতে পারে না, কারণ অপরাপর অনুমান উপমান ইত্যাদি প্রমাণ প্রত্যক্ষমূলক। কেননা, যুক্তিন্যায় মতে- 'সাধ্যের সাথে নিয়ত সম্বন্ধবিশিষ্ট কোনোও ধর্ম যদি প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য না হয়, তাহলে সেই সাধ্য প্রমাণান্তরের বিষয় হতে পারে না।'

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনার্থে ঈশ্বরবাদী নৈয়ায়িক দার্শনিকদের উপস্থাপিত যুক্তির মধ্যে প্রধান যুক্তি হলো, জগৎ-স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরের সত্তা অবশ্য-স্বীকার্য; কারণ মাটি, জল প্রভৃতি সমস্ত সংহত বা জটিল বস্তুই কার্যাত্মক, কেননা এগুলি অবয়বদ্বারা গঠিত; এবং কার্য বলেই এগুলির কারণ থাকতে বাধ্য এবং সেই কারণ কোনো বুদ্ধিমান কর্তা না হয়ে পারেন না। সহজ কথায়, অবয়ব দ্বারা গঠিত সমস্ত বস্তুই কার্য এবং কার্য বলেই কার্য-কারণ তত্ত্ব অনুযায়ী তার কারণও থাকবে। যেহেতু মাটি, জল প্রভৃতি পরমাণু নামের অবয়ব দ্বারা গঠিত সেহেতু এগুলিও কার্য। তাই পরমাণুপুঞ্জ থেকে সুসমঞ্জস্য ও নির্দিষ্ট আকারে ক্ষিতি বা মাটি, জল প্রভৃতি সংহত বা জটিল বস্তুগুলি কোনো বুদ্ধিমান কর্তার নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত উৎপন্ন হতে পারে না; অতএব এই বুদ্ধিমান কর্তা অর্থে জগতের নিমিত্তকারণ হিসেবে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অনুমেয়- তাঁরই নিয়ন্ত্রণে সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটে।
এর উত্তরে নিরীশ্বরবাদী মীমাংসক প্রাভাকররা বলেন, জাগতিক বস্তুগুলি অবশ্যই অবয়ব দ্বারা গঠিত, অতএব এগুলির উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। কিন্তু তাই বলে সামগ্রিকভাবে

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো সৃষ্টি বা প্রলয়ের কথা কল্পনামাত্র; অতএব জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিয়ন্ত্রণকর্তা ঈশ্বরের পরিকল্পনাও অবান্তর। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক বস্তুগুলির দৃষ্টান্তে সুস্পষ্টভাবেই অভিজ্ঞতা হয় যে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণেই সেগুলির জন্ম হচ্ছে- যেমন মানুষ ও জীবজন্তুর দেহ শুধুমাত্র তাদের পিতামাতার দরুনই উৎপন্ন হয়। এবং এ-জাতীয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে অতীত ও ভবিষ্যতের বস্তুগুলিরও উৎপাদন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অতএব, জাগতিক বস্তুগুলির স্রষ্টা হিসেবে কোনো অতি-প্রাকৃত নিয়ন্ত্রাতার কথা অনুমিত হয় না।

নৈয়ায়িকরা আরো দাবি করেছেন, ব্যক্তির ধর্মাধর্ম পরিচালনা করার জন্য সাধারণভাবে কোনো পরিচালক- অর্থাৎ ঈশ্বর- স্বীকারযোগ্য।
তার উত্তরে প্রাভাকররা বলেন, প্রথমত যার ধর্মাধর্ম সেই এ-জাতীয় পরিচালক হতে পারে, অতএব ঈশ্বর বলে স্বতন্ত্র পরিচালকের প্রসঙ্গ অবান্তর। দ্বিতীয়ত, একের ধর্মাধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান অপর কারুর পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়; অতএব তথাকথিত ঈশ্বরের পক্ষে কোনো মানবের ধর্মাধর্ম জানাই সম্ভব নয়।
প্রাভাকররা আরো বলেন, তথাকথিত ঈশ্বরের পক্ষে মানবাদির ধর্মাধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞানই যদি সম্ভব না হয় তাহলে তাঁর পক্ষে এই ধর্মাধর্মের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া, উক্ত জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকলেও ঈশ্বরের পক্ষে ধর্মাধর্ম পরিচালনা করা সম্ভব হতো না। কেননা, পরিচালনার জন্য সম্বন্ধ প্রয়োজন; কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাদির ধর্মাধর্মের কোনো সম্বন্ধ অসম্ভব। ন্যায়মতেই সম্বন্ধ মাত্র দুরকম হতে পারে– সংযোগ ও সমবায়। ঈশ্বরের সঙ্গে ধর্মাধর্মর সংযোগ সম্ভব নয়; কারণ ধর্মাধর্ম হলো গুণ এবং ন্যায়-মতেই শুধুমাত্র দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের সংযোগ সম্ভব। ঈশ্বরের সঙ্গে ধর্মাধর্মের সমবায়-সম্বন্ধও সম্ভব নয়; কারণ এই ধর্মাধর্ম মানবাদিরই গুণ, অতএব মানবাদির সঙ্গেই তার সমবায় হতে পারে– মানবাদির গুণের সঙ্গে ঈশ্বরের সমবায় অসম্ভব। কেননা ন্যায়মতে, কেবল সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের সঙ্গেই তার গুণের সমবায়-সম্বন্ধ সম্ভব।

এক্ষেত্রে নৈয়ায়িকরা সূত্রধর বা ছুতোরের উপমা দিতে পারেন। অবশ্যই দেহবিশিষ্ট বলে এই ছুতোরের সঙ্গে তার যন্ত্রপাতির এবং যন্ত্রপাতির সঙ্গে কাষ্ঠাদি বস্তুর সংযোগ সম্ভব; কিন্তু তথাকথিত ঈশ্বর দেহবিহীন বলেই পরিকল্পিত, অতএব তাঁর দৃষ্টান্তে এ জাতীয় প্রশ্ন ওঠে না।
প্রাভাকরা আরো বলেন, নৈয়ায়িকরা এ কথাও বলতে পারেন না যে পরমাণুসমূহ ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করে। কারণ এ-জাতীয় নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনার কোনো দৃষ্টান্তই অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, একমাত্র দেহস্থ আত্মাই দেহকে পরিচালনা করতে পারে; কিন্তু পরমাণুসমূহ বা মানবীয় ধর্মাধর্মও ঈশ্বরের দেহ নয়, অতএব ঈশ্বরের পক্ষে এগুলির পরিচালনাও সম্ভব নয়। আর যদিই বা তর্কের খাতিরে এগুলিকে ঈশ্বরের দেহ বলেই পরিকল্পনা করা হয় তাহলেও এগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা

এবং প্রচেষ্টার কথা স্বীকার করতে হবে এবং সে ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা যদি নিত্য হয় তাহলে পরমাণুসমূহের সৃষ্টিকার্যকেও, অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিকেও, নিত্য বা নিয়ত ঘটনা বলে স্বীকার করতে হবে।
ঈশ্বরবাদী ন্যায়-বৈশেষিকরা বলে থাকেন, মানবদেহ বুদ্ধিহীন বলেই তার নিয়ন্ত্রণের জন্য এক বুদ্ধিমান স্রষ্টা বা ঈশ্বর অনুমেয়।
উত্তরে নিরীশ্বরবাদী মীমাংসক প্রাভাকররা বলছেন, নিয়ন্ত্রণ-কার্য উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না; কিন্তু এই তথাকথিত নিয়ন্ত্রণের পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী হতে পারে? তাছাড়া, নৈয়ায়িকরা যে যুক্তিবলে বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণকর্তা প্রমাণ করতে চান সেই যুক্তি অনুসারেই উক্ত নিয়ন্ত্রণকর্তা দেহ-বিশিষ্ট বলেই প্রমাণিত হবেন। কেননা, কাষ্ঠাদি বস্তুর উপর সূত্রধর-এর নিয়ন্ত্রণ-কার্যর দৃষ্টান্ত অনুসারেই তাঁরা জগৎ-স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণ প্রমাণ করতে চান; কিন্তু সূত্রধর দেহবিশিষ্ট, তারই উপমান অনুসারে কল্পিত ঈশ্বরও দেহবিশিষ্ট বলে প্রমাণিত হবেন। কিন্তু দেহবিশিষ্ট কারুর পক্ষেই পরমাণু বা ধর্মাধর্মের মতো সূক্ষ্ম বিষয়কে বুদ্ধিসম্মত এবং কার্যকরিভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এবং যদিই বা তা সম্ভব হয় তাহলে দেহবিশিষ্ট বলেই তাঁর পরিচালনার জন্য আরো কোনো স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ-কর্তার কথা স্বীকৃত হতে বাধ্য, আবার এই স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ-কর্তার পরিচালনার জন্য অপর কোনো এক নিয়ন্ত্রণ-কর্তার কথা স্বীকৃত হতে বাধ্য– এবং এইভাবে অনবস্থা-দোষ ঘটবে।

এইভাবে প্রাভাকররা স্রষ্টা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন। এবং তাঁরা সৃষ্টি বা প্রলয় মানেন নি বলেই বিশ্বজগৎ তাঁদের কাছে নিয়ত পরিবর্তনশীল ঘটনাস্রোত বলেই প্রতীত হয়েছে। তবে স্বকীয় দার্শনিক গুরুত্বের দিক থেকে বিখ্যাত নিরীশ্বরবাদী মীমাংসক কুমারিল ভট্টের যুক্তিগুলি সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শনের পটভূমিতে প্রায় বৈপ্লবিক বলে প্রতীত হতে পারে। কুমারিল বস্তুত নিরীশ্বরবাদের সূচনা করেছেন সর্বজ্ঞতা-খণ্ডনের দ্বারা।

সর্বজ্ঞ মানে যিনি বিশ্বজগতের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবকিছু জানেন। কী করে জানেন ? আমরা মানুষ, তাই মানুষ যেভাবে জানে, সেভাবে জানার বাইরে অন্য কোনো অতিমানবিক উপায় যদি থাকে তা আমরা কী করে জানবো, আর না জানলে কী করে বলবো আমাদের মানববুদ্ধির অগোচরে এক সবজান্তা অতিমানব আছেন যিনি কোনো অতিমানবিক উপায়ে বিশ্বের প্রতিটি ধূলিকণা প্রতিটি অণুপরমাণু ও প্রতিটি বীজাণু পর্যন্ত আপন নখদর্পণে প্রত্যক্ষ করেন। জানার উপায়কে বলে প্রমাণ, যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপায় আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়, চোখ, কান, জিহ্বা প্রভৃতি। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে বলে প্রত্যক্ষপ্রমাণ যা দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমানগ্রাহী, যেমন চক্ষু শুধু বর্তমান বস্তুকেই গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অতিদূর স্থিত, অন্তরালিত, অতীত বা ভবিষ্যৎ বস্তুকে গ্রহণ করতে পারে না। এখন যদি কেউ সর্বজ্ঞ হন, তিনি কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু প্রত্যক্ষ করবেন?
মানুষের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা প্রকৃতির নিয়মে সীমাবদ্ধ। তাই কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বিশ্বের

সবকিছুই জানা সম্ভব নয়। ‘সব’ ইন্দ্রিয়ের ‘অবিষয়’ অর্থাৎ অগোচর– এটাই স্বভাবনিয়ম বা প্রাকৃতিক নিয়ম। কেউ সর্বজ্ঞ হলে তাকে হতে হবে এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম। আমরা কিন্তু ব্যতিক্রম নই। তাহলে আমরা কী করে বুঝবো যে এমন কোনো সত্তাপুরুষ আছেন যিনি স্বভাবনিয়মের ব্যতিক্রম? বুঝতে হলে আমাদেরও ব্যতিক্রম হতে হবে। তাই কুমারিল বিদ্রূপ করে বলেছেন (শ্লোকবার্তিক-২/১২২)– যিনি কোনো সর্বজ্ঞ পুরুষ আছে বলে কল্পনা করেন তিনি বোধহয় চোখ দিয়ে বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ চোখের দ্বারা দেখে, কানের দ্বারা শোনে, জিহ্বার দ্বারা রসগ্রহণ– এই প্রাকৃতিক নিয়মের উর্ধ্বে তিনি বিচরণ করেন। একথাই কুমারিল আরেকটি সাধারণ সূত্রাকারে উপস্থিত করেছেন– যে নিজে অসর্বজ্ঞ সে অন্য কাউকে সর্বজ্ঞ বলে সাব্যস্ত করতে পারে না। (শ্লোকবার্তিক- ২/১৩৫)

ঈশ্বরবিশ্বাসীরা কিন্তু ঈশ্বরকে আক্ষরিক অর্থেই সর্বজ্ঞ মনে করেন, অর্থাৎ তাদের মতে ঈশ্বর বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রত্যক্ষ করেন। যোগদর্শনে যোগভাষ্যকার বেদব্যাস ঈশ্বরানুমান প্রণালী প্রমাণ করেন বিচিত্রভাবে–
কেউ স্বল্পজ্ঞানী, কেউ তার তুলনায় অধিকতর জ্ঞানী, কেউ আরও অধিকতর জ্ঞানী; সুতরাং এমন একজন আছেন যিনি অধিকতম জ্ঞানী। ইনি হলেন নিরতিশয় জ্ঞানী, যার জ্ঞানের চেয়ে বেশি জ্ঞান আর সম্ভব নয়; সুতরং তিনি সর্বজ্ঞ। সবজান্তার ওপর আর কোনো জ্ঞানী থাকা সম্ভব নয়। এহেন সর্বজ্ঞ পুরুষই হলেন ঈশ্বর।– (যোগভাষ্য-১/২৫)
মানুষের জ্ঞানের তারতম্য থেকে ‘অমানুষ’ সর্বজ্ঞ পুরুষে পৌঁছানোর অনুমান-প্রণালীটি কুমারিলের দৃষ্টি এড়ায়নি। ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা যে প্রাকৃতিক নিয়মে সীমাবদ্ধ, স্বাভাবিক অবস্থায় তার ব্যত্যয় ঘটে না, সর্বজ্ঞত্ব-খণ্ডনে কুমারিল এই স্বভাবনিয়ম প্রয়োগ করেই বলেন-
দূরসূক্ষ্মাদি বস্তুদর্শনে কোনো ব্যক্তির যে জ্ঞানাধিক্য পরিলক্ষিত হয় তা কিন্তু জ্ঞান ও বিষয়ের সুনির্দিষ্ট স্বাভাবিক সম্বন্ধকে লঙ্ঘন করে না, যেমন কোনো সমধিক জ্ঞানী ব্যক্তিও কর্ণের দ্বারা বস্তুর রূপ গ্রহণ করে না।
এরপর কুমারিলের যুক্তি হলো, যদি বলেন সর্বজ্ঞ পুরুষ প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা নন, তিনি সব নিয়ম লঙ্ঘন করে সবকিছু দেখতে পান তা হলেও একটা দুরুত্তর প্রশ্ন থেকে যায়। সর্বজ্ঞ পুরুষ নাকি অন্তহীন ভবিষ্যৎকেও বর্তমানের মতো স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেন। এ ধরনের উদ্ভট দাবি কোনো অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারাও সমর্থিত হতে পারে না। যা এখন পর্যন্ত বিশ্বে কোথাও জন্মগ্রহণই করেনি, যা এখনও কোথাও নেই সেই না-থাকা বস্তুগুলিকেও এখনই কেউ আক্ষরিক অর্থে প্রত্যক্ষ করছে, কেবল কল্পনা করছে না– এরকমের বক্তব্য প্রমত্তের প্রলাপ ছাড়া আর কী হতে পারে? তাই কুমারিল বলছেন– ‘ভবিষ্যৎ বস্তুর জ্ঞানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিন্দুমাত্র সামর্থ্যও পরিদৃষ্ট হয় না’। (শ্লোকবার্তিক-২/১১৫)
কুমারিল আরো বলেন, যদি কোন সর্বজ্ঞ-বিশ্বাসী বলেন– সমগ্র ভবিষ্যৎ সর্বজ্ঞ পুরুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ধরা না পড়ুক, তিনি অনুমানের দ্বারা অনন্ত ভবিষ্যতের অনন্ত বস্তু জানতে পারেন, তবু কিন্তু সর্বজ্ঞতা সম্ভব নয়। অনুমান জ্ঞান হয় সামান্যাকারে। আমরা বিশ্বাস করি সকল মানুষ মরণশীল। এই সাধারণ সূত্র দেখে আমরাও অনুমান করতে পারি বর্তমানে

জীবিত কোনো ব্যক্তিবিশেষও অমর নয়, একদিন তাকে মরতেই হবে। ‘সকল মানুষ মরণশীল’ এই সাধারণ সূত্রটি যখন আমরা জানি তখন অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষের অনন্ত কোটি চিতার আগুন সারিবদ্ধভাবে একে একে আমাদের কল্পনার আকাশে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে না। তিনকালের কোন্ লোকটি কীভাবে কোথায় কখন মরেছে বা মরবে তা কিন্তু আমাদের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব। আমরা প্রত্যেকেই একদিন মরবো, কারণ আমরা মানুষ এবং মানুষমাত্রেই মরণশীল– এ ধারণাটা হয় সামান্যাকারে বা সাধারণভাবে। প্রত্যেকটি মানুষকে আলাদা করে একে একে গুনে গুনে হয় না, কে কোথায় কখন কীভাবে মরবে তাও জানা যায় না। সর্বজ্ঞ হতে হলে কিন্তু এসব কিছুই বিশেষভাবে, বিভক্তরূপে আলাদা আলাদা করে জানতে হবে। না হলে আমাদেরই বা সর্বজ্ঞ হতে বাধা কোথায়। একথাই কুমারিল সংক্ষেপে বলেছেন– ভবিষ্যৎ বস্তুর জ্ঞানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিন্দুমাত্র সামর্থ্যও পরিদৃষ্ট হয় না। বিশ্বের সকল বস্তু সম্বন্ধে অনুমান করার কোনো ‘হেতু’ বা সূচক চিহ্ন নেই। (শ্লোকবার্তিক-২/১১৫)

কুমারিলের এ সকল আপত্তির পিছনে রয়েছে আসলে ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানতত্ত্বের অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা। আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানা থেকে অজানার দিকে কতোটা উল্লম্ফন করা যুক্তিগত এই পরিমিতিবোধটুকু না থাকলে যে কোনো অসম্ভবকে সম্ভব বলে প্রতিপন্ন করার জন্য বল্গাহীন কল্পনার আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। যে কোনো আজব কল্পনাকে সজীব করে তোলা যেতে পারে। মানুষের জ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। কিন্তু এই উৎকর্ষ থেকে কোনো সর্বজ্ঞ পুরুষে পৌঁছানোর যৌক্তিক প্রয়োজন নেই। তাই সর্বজ্ঞতা খণ্ডনের দ্বারা পরোক্ষভাবে বা প্রকারান্তরে ঈশ্বরকেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, কারণ সর্বজ্ঞ পুরুষ না হলে ঈশ্বর ঈশ্বর হতে পারে না।
এরপরই কুমারিল যখন সরাসরি ঈশ্বর খণ্ডন করেছেন তখন আর তিনি আলাদা করে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা খণ্ডন করেন নি। সেখানে তিনি নতুন নতুন যুক্তির অবতারণা করেছেন, যে যুক্তির গুরুত্ব অসাধারণ।

কুমারিল বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির পরিকল্পনা নিয়ে নানা রকম বিদ্রূপ করেছেন। তিনি বলেন, যদি বলো কোনো এককালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিলো তাহলে প্রশ্ন করবো, সৃষ্টির আগে বিশ্বের অবস্থা কী ছিলো?
ঈশ্বরবাদী তখন হয়তো বলবেন, তৈত্তিরীয়-সংহিতায় বলা আছে– ‘সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতি একাই ছিলেন’-(তৈত্তিরীয়-সংহিতা-২/১/১)। আবার ঋগ্বেদের প্রজাপতি-সূক্তেও বলা হয়েছে– ‘সর্ব প্রথমে কেবল (প্রজাপতি) হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত মাত্রই সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হলেন। তিনি এ পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করলেন।’ (ঋগ্বেদ-১০/১২১/১)

কুমারিলের প্রশ্ন, সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বই যদি তখন না থাকে তাহলে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিই বা

কোথায় ছিলেন? তাঁর রূপই বা কী রকম ছিলো? থাকার জন্য কোনো অধিকরণ বা আশ্রয় প্রয়োজন। তা ছাড়া সৃষ্টির জন্য উপাদানগুলি তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? তিনি ছাড়া আর কিছুই তো ছিলো না।
কুমারিল বলেন, যদি বলো ঈশ্বর তার ইচ্ছাবলেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, দেহবিশিষ্ট চেতনপদার্থেরই ইচ্ছা থাকতে পারে। ঈশ্বর তো অশরীরী। যদি বলো ঈশ্বরেরও দেহ আছে, তবে শরীরের উপাদানগুলি কোথা থেকে এলো? তবে কি ঈশ্বরের দেহ তৈরি করার উপাদানগুলি আগে থেকেই ছিলো? অর্থাৎ ঈশ্বরের পূর্বেই জগৎ ছিলো? তাহলে বলতে হবে জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করেনি।

কুমারিল আবার প্রশ্ন করেন, সৃষ্টির পূর্বে তো কোনো মানুষেরই অবস্থান সম্ভব নয়; তাই তোমাদের মতে প্রজাপতি তখন যে উপস্থিত ছিলেন এ কথা কার পক্ষেই বা জানা সম্ভব? এবং কেই বা পরবর্তীকালে সৃষ্ট মানুষদের কাছে প্রজাপতির কথা পৌঁছে দিতে পারেন? যদি বলো, প্রজাপতির পক্ষে কোনো মানুষেরই প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের বিষয় হওয়া সম্ভব নয়, তাহলে প্রশ্ন করবো তাঁর যে একান্তই কোনো রকম অস্তিত্ব আছে সে কথাই বা জানা গেলো কীভাবে? তোমাদের মতে কোনো এককালে বিশ্বের সৃষ্টি বা শুরু হয়েছিলো; কিন্তু তা কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে? প্রজাপতির ইচ্ছায় সৃষ্টি শুরু হলো? কিন্তু সে-কথা তোমরা কী করে বলবে? কেননা, তোমাদের মতেই স্রষ্টা দেহ-বিশিষ্ট নন; এবং দেহ ছাড়া ইচ্ছা সম্ভবই নয়। তাই দেহহীন স্রষ্টার পক্ষে সৃষ্টি করার ইচ্ছাও অসম্ভব। যদি বলো, স্রষ্টার দেহ আছে, তাহলে সেই দেহটিকেও তো তাঁরই সৃষ্টি বলতে পারো না। অতএব তাঁর দেহ সৃষ্টির জন্য আর একটি স্রষ্টার কথা, আবার তাঁরও দেহ সৃষ্টির জন্য আর একটি স্রষ্টার কথা– এইভাবে অবিশ্রাম ভেবে যেতে হবে। স্রষ্টার দেহকে নিত্য বা অনাদিও বলতে পারো না, কেননা সৃষ্টির পূর্বে ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি দেহের উপাদান পঞ্চভূতই যখন নেই তখন কী দিয়ে তাঁর দেহ নির্মিত হতে পারে?
তাছাড়া, প্রাণীদের পক্ষে নানা রকম জ্বালা-যন্ত্রণায় পূর্ণ এই পৃথিবীটি সৃষ্টি করবার ইচ্ছেই বা তাঁর হলো কেন? এ-কথাও বলতে পারো না যে প্রাণীদের কর্মফলের দরুনই পৃথিবীতে এই সব জ্বালা-যন্ত্রণা। কেননা, সৃষ্টির পূর্বে এ জাতীয় কর্মফল সম্ভবই নয়। অতএব প্রাণীদের কর্মফল অনুসারে স্রষ্টার পক্ষে পৃথিবী সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়।

কুমারিল বলেন, উপকরণাদি ব্যতিরেকেও সৃষ্টি সম্ভব নয় এবং সৃষ্টির পূর্বে এ-জাতীয় উপকরণ বলে কিছুর অস্তিত্ব অসম্ভব। উর্ণনাভ বা মাকড়সার জালও উপাদানহীন সৃষ্টি নয়, কেননা ভক্ষিত পতঙ্গ থেকে মাকড়সার লালা উৎপাদন হয় এবং জালের উপাদান হিসেবে এই লালা ব্যবহৃত। আর এ কথাও বলা যায় না যে, করুণা বা দায় থেকেই স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন; কেননা, সৃষ্টির আগে কোনো প্রাণীই ছিলো না, অতএব করুণা বা অনুকম্পা দেখাবার মতো কোনো জীবই ছিলো না, কাকে অনুকম্পা দেখাবেন? যখন করুণার কোনো পাত্রই নেই তখন করুণাও সম্ভব নয়। তাছাড়া করুণা বা দয়া-পরবশ হয়ে সৃষ্টি করলে তিনি

শুধুমাত্র সুখী ব্যক্তিই সৃষ্টি করতেন। যদি বলো, কিছুটা দুঃখ না থাকলে জগতের সৃষ্টি বা স্থিতি সম্ভব নয়, তাহলে উত্তরে বলবো, তোমাদের মতে সবই তো স্রষ্টার শুধুমাত্র ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল, তাই তার পক্ষে আবার অসম্ভব কী হতে পারে? আর সৃষ্টির জন্য তাঁকেও যদি নিয়মাদির উপর নির্ভরশীলই হতে হয় তাহলে তাঁর আবার স্বাধীনতা কোথায়? তোমাদের মতে তাঁর মধ্যে সৃষ্টির ইচ্ছা জেগেছিলো; কিন্তু বলতে পারো কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য তাঁর এই ইচ্ছা জেগেছিলো– এমন কোন্ উদ্দেশ্যই বা সম্ভব হতে পারে যা কিনা সৃষ্টি-ব্যতিরেকে চরিতার্থ হওয়া অসম্ভব? নির্বোধও উদ্দেশ্যবিহীন কাজ করে না। অতএব তিনি যদি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে তাঁর বুদ্ধিকে নিষ্ফল বলতে হবে। যদি বলো, এই সৃষ্টি তাঁর লীলা– প্রমোদ বা বিলাসমাত্র, তাহলে তাঁকে আর সদানন্দ বা চিরসন্তুষ্ট বলতে পারো না, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে তিনি নিশ্চয়ই প্রমোদের অভাব অনুভব করেছিলেন, অতএব তখন তাঁর সন্তুষ্টির অভাব ছিলো। তাছাড়া সৃষ্টি-ব্যাপারে যে পরিমাণ দুর্ভোগ ও পরিশ্রম প্রয়োজন তার তুলনায় প্রমোদ আর কতটুকুই বা? আর সৃষ্টি যদি প্রমোদের জন্যই হয় তাহলে তোমরা যে প্রলয়ের কথা বলো তারই বা ব্যাখ্যা কী ? আর সর্বোপরি কথা হলো, কারুর পক্ষেই এ জাতীয় স্রষ্টাকে জানা সম্ভব নয়। যদিই মানা যায় যে তাঁর রূপ সংক্রান্ত অবগতি সম্ভব, তবুও তিনিই যে স্রষ্টা এ বিষয়ে জ্ঞান অসম্ভব। সৃষ্টির শৈশবে যে সব প্রাণীদের আবির্ভাব তাদের পক্ষে কতটুকুই বা বোধ সম্ভবপর? অতএব, কীভাবে তাদের জন্ম হলো এবং সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা কী ছিলো– এ সব কথা তাদের পক্ষে বুঝতে পারা অসম্ভব, অর্থাৎ বুঝতে পারা অসম্ভব যে প্রজাপতিই সৃষ্টি করেছিলেন। যদি বলো, প্রজাপতিই সেই প্রাণীদের বলে দিয়েছিলেন যে, তিনিই স্রষ্টা তাহলেও তাদের পক্ষে তাঁর কথায় আস্থা স্থাপন সম্ভব নয়; কেননা, এমনও তো হতে পারে যে, তিনি নিজের শক্তিসংক্রান্ত শুধু দম্ভই প্রকাশ করেছেন।

সাধারণ লোকের ধারণায়, প্রজাপতি যে স্রষ্টা এ-কথা বেদ-এ আছে। কিন্তু কুমারিল বলছেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আসলে কয়েকটি বিধির প্রশংসামূলক বাক্যের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা থেকে এ ধারণার উদ্ভব– কোনো একটি বাক্যের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে সঙ্গতি ব্যতিরেকে ব্যাখ্যা করতে গেলে এ জাতীয় ভ্রান্তির উদ্ভব হয়। কুমারিল আরো দাবি করছেন, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী থেকেও প্রমাণ হয় না যে, প্রজাপতিই স্রষ্টা। আসলে নিছক কাহিনী হিসেবে কোনো কাহিনীই সার্থক নয়; অতএব তথাকথিত কাহিনীগুলিকে নিছক কাহিনী হিসেবে না বুঝে প্রকৃতপক্ষে বিধি বা যজ্ঞকর্মের প্রশংসা বা অর্থবাদ হিসেবেই বুঝবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

ঈশ্বরবাদী ন্যায়-বৈশেষিকরা ঈশ্বরকে কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ বলে স্বীকার করেন। তাদের মতে, জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরের পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বনির্ভরতা নেই। জীবের কর্ম ও অদৃষ্টের ওপর ঈশ্বরকে নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া নিমিত্ত-কারণ কখনো উপাদান-কারণ হতে পারে না। ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা। কুম্ভকার মাটি দিয়ে ঘট তৈরি করে, কুম্ভকার

কখনো নিজেই মৃত্তিকা হতে পারে না। কুম্ভকার ঘটের নির্মাতা, মাটি উপাদান। জগতের উপাদান পরমাণু, ঈশ্বর পরমাণুর সাহায্যে জগৎ নির্মাণ করেন জীবের কর্ম ও অদৃষ্ট অনুসারে।
নিরীশ্বরবাদী কুমারিল এখানে বলেন, প্রথমত, বৈশেষিকরা যে মনে করেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় অকস্মাৎ সৃষ্টি হয় তা সম্ভব নয়; কেননা ঘট প্রভৃতি নির্মাণের দৃষ্টান্তে দেখা যায় একটি বস্তুর নির্মাণ ক্রমপদ্ধতি মাত্র। দ্বিতীয়ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় স্বীকার করা যায় না, কেননা তার কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া প্রলয়ের কথা স্বীকার করলে মানতে হবে যে ঈশ্বরের মনে প্রলয়ের ইচ্ছা জাগে; কিন্তু এ জাতীয় ইচ্ছায় লাভ কী? অর্থাৎ কোন বুদ্ধিমান স্রষ্টার পক্ষেই নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করবার ইচ্ছা জাগা সম্ভব নয়।

বৈশেষিকরা বলেন, প্রলয়কালে মানবাত্মার ধর্মাধর্ম নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কুমারিল বলছেন, তা কোনোমতেই সম্ভব নয়। প্রথমত কৃতকর্মের ফলাফল অবশ্যম্ভাবী; তাই এমন কোনো অবস্থা সম্ভবই নয় যখন কৃতকর্মের পরিণাম স্থগিত থাকবে। বৈশেষিকরা বলবেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা নামক কর্মটির দরুন বাকি সকলের কর্মফল এইভাবে স্থগিত থাকে; কিন্তু তাও সম্ভব নয়, কারণ একজনের একটি কর্মের ফলে বাকি সকলের কর্মফল স্থগিত থাকতে পারে না।
যদি বলা হয়, প্রলয়কালে সকলের ধর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহলে কুমারিল বলছেন, আর কখনো সৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকবে না, কেননা সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কর্মগুলিকে আবার কীভাবে সঞ্জীবিত করা যাবে?
বৈশেষিকরা যদি বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তা সম্ভব হতে পারে, তাহলে, কুমারিল বলছেন, শুধু এই ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলাই তো যথেষ্ট– বৈশেষিকরা আবার কেন সৃষ্টির জন্য ধর্মাধর্মের কথা তোলেন? তাছাড়া, ঈশ্বরের ইচ্ছাও সম্পূর্ণ অকারণ হতে পারে না; এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার কারণ হিসেবে যদি কিছু স্বীকার করা হয় তাহলে সেই কারণটির সাহায্যেই তো সৃষ্টির ব্যাখ্যা সম্ভব, তদুপরি ঈশ্বর মানার প্রয়োজন কী?

ন্যায়-বৈশেষিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে বলেন, গৃহাদির দৃষ্টান্তে দেখা যায় বিভিন্ন অবয়ব দ্বারা গঠিত বস্তুর উৎপত্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণব্যতীত সম্ভব নয়; অতএব অবয়ব-বিশিষ্ট মানবদেহের নিয়ন্তা বা নিয়ন্ত্রণ-কর্তা হিসেবেও বুদ্ধিমান ঈশ্বর অনুমেয়। কিন্তু কুমারিল বলছেন, এই বুদ্ধিমান নিয়ন্তা অর্থে ঈশ্বরের কথা বাহুল্য মাত্র। কেননা সকলেই জানে যে মানবাদি বুদ্ধিমান জীবের নিয়ন্ত্রণ ফলেই পৃথিবীতে যাবতীয় উৎপাদন সম্ভব হয়; অতএব তার জন্য ঈশ্বর মানবার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া বৈশেষিকরা যে বলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় আকস্মিকভাবে বা হঠাৎ জগৎ সৃষ্ট হয় তাও মানবার কারণ নেই; কেননা গৃহাদি নির্মাণের দৃষ্টান্তেই দেখা যায় কোনো কিছুই নির্মাণকর্তার ইচ্ছা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয় না।

বৈশেষিকরা বলেন, সকলের দেহই বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। কুমারিল বলছেন, কিন্তু এই যুক্তি অনুসারে ঈশ্বর-দেহের নিয়ন্ত্রণকর্তা কে হবেন? তথাকথিত ঈশ্বরের দেহও দেহ, এবং আমাদের দেহের মতোই অবয়ব-গঠিত; অতএব তারও কোনো নিয়ন্তা স্বীকার্য। যদি বলো, ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই নিয়ন্ত্রণের কারণ, তাহলে তোমাদের নিজেদেরই মূল যুক্তির বিরুদ্ধে যেতে হবে; কেননা তোমাদের মূল যুক্তি হলো, অবয়ব-গঠিত বস্তুর নিয়ন্তা হিসেবে স্বতন্ত্র কোনো বুদ্ধিমান অনুমেয়। তাছাড়া, ঈশ্বরেচ্ছার দ্বারাই বা কীভাবে তাঁর দেহ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে? কেননা, ঈশ্বর যদি তাঁর দেহ সৃষ্টি করতে চান তাহলে তাঁকে দেহীপূর্ব বা দেহবিহীন অবস্থাতেই এ প্রয়াস করতে হবে,– উক্ত প্রয়াসের পূর্বে তাঁর দেহের অস্তিত্বই সম্ভব নয়। এবং দেহবিহীন অবস্থায় ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়।

ঈশ্বরানুমানের জন্য বৈশেষিকরা কুম্ভকারের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেন– অবয়ব-বিশিষ্ট ঘট যেমন কুম্ভকারের সৃষ্টি, অবয়ব-বিশিষ্ট সমগ্র জাগতিক বস্তুও তেমনি ঈশ্বরের সৃষ্টি।
কিন্তু কুমারিল বলছেন, ঘটাদি যদি প্রকৃতপক্ষে কুম্ভকারের সৃষ্টি হয় তাহলে তা ঈশ্বরের সৃষ্টি হতে পারে না, অর্থাৎ সমস্ত জাগতিক বস্তুর স্রষ্টা ঈশ্বর হতে পারেন না; অপরপক্ষে যদি বলো, ঘটাদি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরই সৃষ্টি– অর্থাৎ কুম্ভকারের সৃষ্টি নয়, তাহলে যে দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে তোমরা ঈশ্বর অনুমান করো সেইটিই প্রত্যাখ্যান করতে হবে– অর্থাৎ ঈশ্বরানুমানের দৃষ্টান্তাভাব ঘটবে। তাছাড়া, ঘটাদির সৃষ্টি সাধারণত যেভাবে কুম্ভকারাদির কীর্তি বলে স্বীকৃত হয়, বৈশেষিকরাও যদি তা স্বীকার করেন তাহলে তাঁদের সিদ্ধান্তই খণ্ডিত হবে; কেননা, তাহলে মানতে হবে জীবদেহ প্রভৃতিও মরলোকের জীবদেরই সৃষ্টি– ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়।

উত্তরে বৈশেষিকরা বলবেন, ঈশ্বরের সৃষ্টিকাজ কুম্ভকারাদির মতো নয়; বস্তুত ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হয়ে পরমাণুসমূহই সৃষ্টিকাজ সম্পাদন করে।
এক্ষেত্রে কুমারিল বলছেন, এ কথাও যুক্তিযুক্ত হবে না; কারণ পরমাণুসমূহ জড় বা অচেতন, অতএব তাদের পক্ষে ঈশ্বরেচ্ছা অনুসারে কোনো কাজ করাই সম্ভব নয়; কেননা অচেতন পরমাণুর পক্ষে ঈশ্বরেচ্ছার অবগতিই সম্ভব নয়।

ঈশ্বর এবং সৃষ্টি-প্রলয় সংক্রান্ত ন্যায়-বৈশেষিক মত খণ্ডন করেই কুমারিল ক্ষান্ত নন; এই প্রসঙ্গে তিনি বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্বও খণ্ডন করতে অগ্রসর হয়েছেন এবং সাংখ্যমতেরও সমালোচনা করেছেন। তাছাড়া মীমাংসা দর্শনে কেবল ঈশ্বরই নয়, বৈদিক দেব-দেবীর অস্তিত্বও স্বীকৃত হয়নি স্রেফ দেবতার নামটুকুর উপস্থিতি ছাড়া। [আরো বিস্তারিতভাবে জানার জন্য মীমাংসা-দর্শন দ্রষ্টব্য– মীমাংসা-মতে ঈশ্বর এবং বৈদিক দেবতা প্রসঙ্গে মীমাংসা-মত।]

.

৪.০ : নাস্তিক্যবাদের উত্থান

চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শনগুলির উপনিষদীয় পটভূমির আলোচনায় অন্তত এটা প্রতীয়মান হয় যে, আত্মা, জন্মান্তর, কর্মফল, অদৃষ্ট, মোক্ষ, ঈশ্বর, শ্রুতি এবং অনুমান প্রমাণ ইত্যাদি যে সব বিষয় চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন ধারণার উৎস, সেগুলিই ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে দর্শনজগতকে বহুবিচিত্রভাবে পল্লবিত করে করে ভারতীয় জনমানসকে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বলা যায় রাজনৈতিকভাবেও প্রভাব বিস্তার করেছে। যার প্রভাবে তৈরি হয়েছে সাধারণ জনমানসে এক গভীর ধর্মীয় অমানবিক বৈষম্যের ট্র্যাজিক ইতিহাসও। আর সেই ধারণার উৎসগুলিরই প্রতিরোধের ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে চার্বাকীয় দর্শনের বিশাল সৌধ। আর এ-বিষয়টিতে দৃষ্টিপাত করতে হলে আমাদেরকে প্রথমে চার্বাক-সংশ্লিষ্ট ভারতীয় সাহিত্যের দিকেই মনোযোগ আকৃষ্ট করতে হবে।

১.০ : ভারতীয় সাহিত্যে চার্বাক

...

চার্বাক দর্শন সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় অন্তরায় হচ্ছে চার্বাকদের নিজস্ব রচনাসম্ভার বা সাহিত্য সৃষ্টির কোন নমুনা আমাদের বর্তমান জ্ঞানজগতের আয়ত্তে না-থাকা। সেগুলো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। ফলে সম্পূর্ণতই অন্যের রচনার উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে চার্বাক দর্শন সম্পর্কিত আমাদের ধারণার উৎস প্রধানত চার্বাক-বিরোধী তথা চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত চার্বাকী মতবাদের সমালোচনা- যেখানে চার্বাক সর্বদাই পূর্বপক্ষ হিসেবে উপস্থাপিত।

.

হয়তো চার্বাকী বক্তব্যের কেবল সেই অংশগুলিই অন্যের মারফৎ প্রচারিত হয়েছে যেগুলির বিরোধিতা বা খণ্ডনের নিমিত্তে অপরপক্ষ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে যুক্তি-বাণ মোকাবেলায় সক্ষম ছিলেন। ভারতীয় দর্শনের সব ক'টি বিভাগেই চার্বাক মত এভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে এখান থেকে আমরা হয়তো চার্বাকী দৃষ্টিভঙ্গিটা অনুমান করতে সক্ষম হই বটে, কিন্তু চার্বাক দর্শনের অবিকৃত পূর্ণাঙ্গ স্বরূপটা দৃশ্যের অন্তরালেই থেকে যায়।

.

ভারতীয় দর্শনমতের যে গ্রন্থগুলিতে কঠোর সমালোচনার সূত্র ধরে চার্বাক মতের অন্তর্ভুক্তি দেখা যায় তার মধ্যে নবম শতকের ন্যায়-দার্শনিক জয়ন্ত ভট্টের 'ন্যায়মঞ্জরী', অষ্টম শতকের দুই বৌদ্ধ আচার্য শান্তরক্ষিতের 'তত্ত্বসংগ্রহ' এবং কমলশীলের 'তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা', অষ্টম শতকের জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সুরীর 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়', সপ্তম শতকের অদ্বৈত বেদান্ত দার্শনিক শঙ্করাচার্যের 'সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ' ও ব্রহ্মসূত্রের (৩/৩/৫৩-৫৪) শাঙ্করভাষ্য, চতুর্দশ শতকের অদ্বৈত বেদান্তবাদী মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অজ্ঞাতনামা লেখকের 'সর্বমতসংগ্রহ', চতুর্দশ শতকের বিদ্যারণ্যমুনির 'বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ', দ্বাদশ শতকের শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' (সপ্তদশ সর্গ) প্রভৃতি গ্রন্থেও চার্বাক সিদ্ধান্তের কিছু বর্ণনা রয়েছে।

.

এসব গ্রন্থে চার্বাক দর্শনের যে বিশিষ্ট রূপের প্রকাশ, সেই রূপেরই প্রতিফলন দেখা যায় ভারতীয় সাহিত্যের অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে চার্বাক মতের বর্ণনায়। কোথাও 'লোকায়ত', কোথাও বা 'বার্হস্পত্য' সংজ্ঞায় পরিচিত, অনেক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কোন নামের স্বাক্ষর বহন না করেও বর্ণনাগুলি চার্বাকী মতের প্রতিফলন বহন করে। এই গ্রন্থগুলি ছাড়াও কৃষ্ণ মিশ্র রচিত একাদশ শতাব্দির 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক রূপক নাটকে সৃষ্ট চার্বাক চরিত্রের মাধ্যমেও চার্বাক মত সম্বন্ধে কিছুটা পরিচিত হওয়া যায়।
ভারতীয় দর্শন জগতে এই বিশেষ মতবাদ 'চার্বাক' সংজ্ঞার মাধ্যমে সুপরিচিত এবং চার্বাক দর্শন হিসেবে তা পরিজ্ঞাত।

.

তবে একটি মাত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় যেটাতে চার্বাক মতের সিদ্ধান্ত বিচার উত্তরপক্ষ রূপে করা

হয়েছে, তা হলো জয়রাশি ভট্ট (সম্ভাব্য ৭০০ খ্রী.) রচিত ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহ’। ১৯৪০ সালে বইটি মুদ্রিত আকারে প্রথম প্রকাশ করা হলে তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের তৈরি হয়। কেননা অন্যত্র সবখানেই চার্বাক দর্শনের যে ছবি আমরা দেখতে পাই, এ গ্রন্থে তার অন্যরূপ প্রতিফলন দেখা যায়। সমগ্র চার্বাক দর্শনের অংশমাত্রের পরিচায়ক হিসেবে ধারণা করা হয় বইটি হয়তো চার্বাকের কোন বিশেষ এক শাখার সিদ্ধান্ত, যাদেরকে কেউ কেউ বৈতণ্ডিক চার্বাক নামে আখ্যায়িত করেন।

.

কিন্তু কারো কারো মতে ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহ’ বইটি আদৌ চার্বাকী মতবাদী নয় বরং সর্বপ্রমাণবিরোধী সংশয়বাদের নিদর্শক গ্রন্থ বলে মন্তব্য করা হয়েছে। কারণ, বইটির প্রধানতম প্রতিপাদ্য হলো, প্রমাণমাত্রেরই খণ্ডন। ভারতীয় প্রতিটা দর্শনেই নিজ নিজ সিদ্ধান্তগুলিকে প্রমাণের নিমিত্তে নিজস্ব যুক্তির অনুকূলে ন্যায় বা তর্কশাস্ত্রীয় চর্চাটাকে খুবই গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এবং এসব যুক্তিশাস্ত্রে প্রমাণের স্বপক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রপঞ্চের আমদানি ঘটালেও প্রমাণ হিসেবে প্রত্যক্ষকে অতীব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ন্যায়দর্শনেই প্রমাণ নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা রয়েছে বলে ন্যায়দর্শন নামান্তরে প্রমাণশাস্ত্র হিসেবেই প্রসিদ্ধ। ন্যায়মতে প্রত্যক্ষই প্রমাণজ্যেষ্ঠ- অর্থাৎ প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষই হলো প্রথম বা সবচেয়ে সেরা বা সবচেয়ে মৌলিক। অন্যদিকে দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই একবাক্যে দাবি করেন যে, লোকায়ত বা চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। অথচ জয়রাশি ভট্ট প্রথমেই দেখাতে চেয়েছেন যে প্রত্যক্ষ বলে আসলে কোনো প্রমাণই হতে পারে না। অর্থাৎ এক তূণে তিনি সকল তত্ত্ব বা দর্শনকেই উড়িয়ে দিচ্ছেন। উল্লেখ্য, বইটির নাম ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহ’ এর অর্থ হচ্ছে সোজা বাংলায়- সিংহের মতো দর্পে তত্ত্বমাত্রকে- অর্থাৎ সবরকম দার্শনিক মতকে- উপপ্লব বা উৎখাত করে দেবার দাবি।

.

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চার্বাকেরা প্রত্যক্ষ-বাদী, সর্বপ্রমাণ-বিরোধী নয়। সর্বপ্রমাণ-বিরোধী হিসেবে যাঁরা ভারতীয় দর্শনে প্রসিদ্ধ তাঁরা আসলে চরম ভাববাদী, মোটেও বস্তুবাদী নন। এই চরম ভাববাদী দর্শনগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ দুটো হলো বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের (১৭৫ খ্রীস্টাব্দ) শূন্যবাদ এবং অদ্বৈত-বেদান্তী দার্শনিক শঙ্করাচার্যের (৭৮৮-৮২০ খ্রীস্টাব্দ) মায়াবাদ। এদিক থেকে দেখলে ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহ’-এর জয়রাশির অবস্থান আসলে বস্তুবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণযুক্ত অদ্বৈত-বেদান্ত ও বৌদ্ধ-শূন্যবাদের সঙ্গে একই পঙক্তিতে থাকার কথা। তাই জয়রাশি ভট্টের উদ্দেশ্য নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে অস্পষ্টতা ব্যাপক। এ প্রেক্ষিতে ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহ’ বইটি সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। ‘মনে রাখা দরকার, বইটির অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু থেকে সম্পাদকরা এটিকে প্রসিদ্ধ চার্বাক বা লোকায়ত মতের পরিচায়ক বলে দাবি করেননি। করা সম্ভবও নয়। শুরুতেই গ্রন্থকার বলছেন, সাধারণ লোকের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে যে মাটি, জল, আগুন, বাতাস- এগুলিই মূল সত্য। কিন্তু দার্শনিক বিচারের ধোপে তাও টেকে না ! তার মানে প্রসিদ্ধ চার্বাক মত বর্জন

থেকেই বই-এর শুরু। গ্রন্থশেষে জয়রাশি আস্ফালন করে বলেছেন, স্বয়ং দেবগুরু বা বৃহস্পতির মাথাতেও যা আসেনি তা এই পাষণ্ডদর্পচ্ছেদনের বইতে ব্যাখ্যা করা হলো। বৃহস্পতি-মতের কোনো প্রকৃত সমর্থকের পক্ষে এমন আস্ফালন সহজবোধ্য নয়, কেননা গুরুমারা বিদ্যের স্থান আর যেখানেই থাকুক না কেন, অন্তত ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে থাকতে পারে না। বরং, প্রতিটি দার্শনিক মতের প্রকৃত প্রবক্তারা পরের যুগে কোনো নতুন কথা বলার সময়ও যেন-তেন-প্রকারেণ কথাটা সম্প্রদায়-প্রবর্তকের প্রকৃত অভিপ্রায় বলেই প্রচার করতে চান। পাষণ্ডদর্পচ্ছেদনের ব্যাপারটাও উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কেননা ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে প্রচলিত রকমারি গালিগালাজের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের পাষণ্ড আখ্যা দিয়ে সন্তোষ লাভ করলেও, ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ উভয়ের পক্ষেই চার্বাককে সমস্বরে পাষণ্ডশিরোমণি হিসাবেই দেখবার কথা।
তাহলে বইটিতে চার্বাক-প্রবণতার পরিচয় শুরুতেও নেই, শেষেও নেই। আরো বড় কথা হলো, বইটির প্রধানতম প্রতিপাদ্য-বিষয়ের মধ্যেও নয়। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' অবশ্যই সহজপাঠ্য বই নয়; যুক্তিতর্ক-কণ্টকিত রীতিমতো কঠিন বই। তবুও সাধ্যমতো সহজ করে এবং সংক্ষেপে তার সারমর্ম বলে রাখা দরকার।
জয়রাশি কী করে দেখাতে চান যে কোনো রকম দার্শনিক মতই স্বীকারযোগ্য নয় ? সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য এই : যে-কোনো দার্শনিক মত বা তত্ত্ব হোক না কেন, স্বীকারযোগ্য হতে গেলে তার পক্ষে তো প্রমাণ থাকা দরকার। অথচ বিচার করলে বোঝা যায় যে, কোনো রকম তথাকথিত প্রমাণেরই প্রামাণ্য- বা প্রমাণ করার যোগ্যতা থাকতে পারে না। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান, প্রভৃতির প্রমাণ হিসেবে প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু জয়রাশি দেখাতে চান, সে-প্রসিদ্ধি আসলে অলীক, কেননা নামে প্রমাণ হলেও এগুলি সবই আসলে অসার; কোনোটিকেই প্রমাণ বলা যায় না। আর প্রমাণ বলেই যদি কিছু না থাকে তাহলে কোনো রকম দার্শনিক মত বা তত্ত্ব স্বীকার করার কারণও থাকতে পারে না। অতএব 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'- সিংহদর্পে সর্বতত্ত্বের উপপ্লব বা উৎখাত।' (সূত্র : ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-২৯)।

.

অতএব 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' গ্রন্থটিকে চার্বাক মতের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হবে কিনা তা প্রয়োজনীয় পর্যালোচনার দাবি রাখে হয়তো।

.

এছাড়া কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'র মতো কিছু প্রাচীন গ্রন্থে এবং প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত কিছু লোকগাথায় চার্বাক মতের বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাই চার্বাকমতের একটা পুনর্গঠিত রূপের ধারণা পেতে আমাদেরকে মূলত যেসব সাহিত্য-উপাদানের উপর নির্ভর করে আগাতে হয়, তা হলো-

(১) প্রামাণিক বিবেচনায় প্রাচীন গ্রন্থাবলি,
(২) সম্ভাব্য প্রামাণিক হিসেবে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত কিছু লোকগাথা, এবং

(৩) প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের চার্বাক বিরোধী পক্ষের রচনায় পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাক বা লোকায়ত বর্ণনাগুলি- যেখানে পরমত খণ্ডনের প্রথা অনুযায়ী প্রথমে পূর্বপক্ষ হিসেবে সে মতটা আসলে কী তা ব্যাখ্যা করে পূর্বপক্ষের সমর্থনে সম্ভাব্য সব যুক্তি দিয়ে তা যথাসম্ভব স্থাপন করে নেয়া হয়, যাতে পরবর্তীতে তা উত্তরপক্ষের যুক্তিবিস্তারে খণ্ডন করা হলে কেউ যেন ওটার সমর্থনে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

.

উল্লেখ্য, চার্বাকদের নিজস্ব রচনা বিষয়ক কোন বিশ্বস্ত দলিল প্রামাণ্য হিসেবে সুনির্দিষ্ট না থাকায় বিভিন্ন উপাদান নির্ভর অনুমানগুলোও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখা যায়। ফলে বিভিন্ন বিদ্বান ও দার্শনিকদের মধ্যেও চার্বাক নিয়ে মতান্তরের অন্ত নেই। আর এতোসব মতান্তরের কারণেই হয়তো চার্বাক দর্শন নিয়ে কোন কালেই কৌতুহলি গবেষকদেরও আগ্রহের কমতি দেখা যায়নি। রহস্যময় বিচিত্র বিভ্রমের তুঙ্গে থেকে সেই প্রাচীন কাল থেকে আজতক মুক্তচিন্তক ভাবুকদের জন্য চার্বাক দর্শন এক অনন্য সাধারণ দর্শন হিসেবে দার্শনিক চিন্তা জগতে ক্রমাগত ঢেউ তুলে যাচ্ছে। এই ঢেউগুলো তো এমনি এমনি তৈরি হয়নি। এর পেছনে রয়েছে বহু প্রশ্ন আর উত্তর খোঁজার এক দীর্ঘ ধারাক্রম। আর এই একই ধারায় এগিয়ে যেতে যেতে আমাদেরকেও জেনে নিতে হয় চার্বাক সংশ্লিষ্ট বেশ কতকগুলো বিষয়ে আপাত সিদ্ধান্তে— উপনীত হওয়ার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ও এর রূপরেখাসমূহ।

২.০ : চার্বাক নামের উৎস

...

ভারতীয় দর্শন সাহিত্যে বস্তুবাদী দর্শনটির নজির যত প্রাচীনই হোক-না কেন, এ মতবাদের চার্বাক নামকরণ সে তুলনায় অর্বাচীন। অষ্টম-নবম শতকের আগে দর্শন সাহিত্যে এ নামের কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন চোখে পড়ে না। প্রাচীনেরা এ মতটিকে প্রধানত লোকায়ত নামেই উল্লেখ করেছেন। ওই অষ্টম-নবম শতক থেকেই বস্তুবাদী অর্থে লোকায়ত বা চার্বাক মতের সমালোচনায় বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায় বিভিন্ন মতের দার্শনিকগণকে। এদের মধ্যে নবম শতকের ন্যায় দার্শনিক জয়ন্ত ভট্ট প্রধানতম। অন্যরা হলেন অষ্টম শতকের বৌদ্ধ আচার্যদ্বয় শান্তরক্ষিত ও কমলশীল এবং জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সূরী।

.

লোকায়ত নামে চার্বাক মতের প্রাচীনতম অন্তর্ভুক্তির নিদর্শন হরিভদ্র সূরীর 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়' গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য হলেও বস্তুবাদ অর্থে চার্বাক শব্দের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় কমলশীলের 'তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা' গ্রন্থে, যা কমলশীলের 'পঞ্জিকা' নামে খ্যাত। কমলশীলের এই বিশাল গ্রন্থ মূলত তাঁর গুরু শান্তরক্ষিত রচিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থের ব্যাখ্যা। শান্তরক্ষিত ভারতীয় দর্শনের প্রথা অনুসারে পরমত খণ্ডন করে স্বীয় মত স্থাপন করার লক্ষ্যে প্রচলিত দার্শনিক মতগুলো খণ্ডন করে স্বীয় বৌদ্ধ মতের সমর্থনে 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থটি রচনা করেন। কিন্তু ওখানেও লোকায়ত হিসেবে বস্তুবাদী মতের সমালোচনা থাকলেও চার্বাক শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু কমলশীলের 'পঞ্জিকা'য় এই বস্তুবাদ সুস্পষ্টভাবেই চার্বাক নামে অভিহিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি চার্বাকমতের প্রবক্তা হিসেবে পুরন্দর নামে জনৈক পূর্ববর্তী দার্শনিকের নামও উল্লেখ করেছেন। চার্বাকী সাধারণ ধারণার ব্যতিক্রম হিসেবে এই পুরন্দর লৌকিক অনুমানকে প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যদিও অলৌকিক কোন ধারণাকে এই অনুমানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতে তাঁর অসম্মতির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পুরন্দর রচিত কোন গ্রন্থের কথা আদৌ জানা যায় না।

.

চার্বাক মতের প্রধানতম সমালোচক নবম শতকের ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত প্রতিনিধি জয়ন্ত ভট্ট। জয়ন্ত ভট্টের পাণ্ডিত্য যেমন প্রগাঢ়, যুক্তি ও বিচার যেমন প্রখর, তেমনি তাঁর আশ্চর্য লেখার কায়দা বা রচনা কৌশলের বন্যায় যেন বিপক্ষমতকে একেবারে ভাসিয়ে নেবার মতো। স্বীয় মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি তাঁর রচিত 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে অন্যতম বিপক্ষ মত খণ্ডনে চরম বস্তুবাদী মত বোঝাতে সুস্পষ্টভাবে চার্বাক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং তার সঙ্গে রকমারি বিশেষণ যোগ করে মতটি নিয়ে তিনি হাসি-তামাশা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেও পিছপা হননি। কোথাও তিনি চার্বাককে হাবাগোবা অর্থে 'বরাক' বলে উল্লেখ করেছেন 'চার্বাকাস্তু বরাকাঃ' উদ্ধৃতি দিয়ে, কোথাও বা চার্বাককে তুখোড় প্রতারক অর্থে 'ধূর্ত' বলে বর্ণনা করেছেন। আবার কোথাও 'সুশিতিতরাঃ' বিশেষণও ব্যবহার করেছেন। জয়ন্ত ভট্টের এরকম বিচিত্র বিশেষণ ব্যবহার থেকে ঐতিহাসিকেরা চার্বাকদের বিভিন্ন প্রাচীন গোষ্ঠির উপস্থিতির অনুমানও করে থাকেন। তবে একাধিক গোষ্ঠি থাকলেও জয়ন্ত ভট্টের

লেখায় চার্বাক শব্দ চরম বস্তুবাদেরই নিদর্শক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

.

খ্রীস্টিয় অষ্টম শতকে রচিত জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সূরীর 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়' নামকরণেই বোঝা যায় সেকালের ছটি প্রখ্যাত দার্শনিক মতের বিচারমূলক পর্যালোচনা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। এই পর্যালোচনার ভিত্তিতে জৈন মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণই এর উদ্দেশ্য। সেকালের প্রখ্যাত ছটি দার্শনিক মতের অন্যতম ছিলো বস্তুবাদী লোকায়ত মত। হরিভদ্র কোথাও চার্বাক শব্দটি উল্লেখ না-করলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়' গ্রন্থে চার্বাক এবং লোকায়ত অভিন্ন। এই 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়' গ্রন্থের বিশদ ব্যাখ্যা হিসেবে আনুমানিক চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের প্রখ্যাত জৈন দার্শনিক গুণরত্ন রচনা করেন বিখ্যাত 'তর্করহস্যদীপিকা' টীকাগ্রন্থটি। এটারও উদ্দেশ্য ছিলো অন্যান্য দার্শনিক মত আরো বিশদভাবে বিচার করে জৈন মতই সবচাইতে সেরা এরূপ সিদ্ধান্ত করা। এই অন্যান্য মতের অন্যতম চরম বস্তুবাদেরও বিস্তৃত বিচার করা হয় এ গ্রন্থে এবং গুণরত্নের রচনায় এই বস্তুবাদ চার্বাক নামেই অভিহিত হয়েছে।
একইভাবে বেদব্যস বা বাদরায়ন রচিত 'ব্রহ্মসূত্র'-র প্রখ্যাত ভাষ্যকার রামানুজ একাদশ শতকে তাঁর রচিত ভাষ্যগ্রন্থে বস্তুবাদী দর্শনকে চার্বাক নামেই অভিহিত করেছেন।

.

তবে বিভিন্ন দার্শনিক মতের পর্যালোচনা হিসেবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি হলো চতুর্দশ শতকের অদ্বৈত বৈদান্তিক দর্শনকার সায়ণ মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'। অদ্বৈত বেদান্তই যে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মত- এটি প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই সেকালে প্রচলিত আরো পনেরোটি দার্শনিক মত বিচারমূলকভাবে খণ্ডন করার বিস্তৃত প্রয়াস এই গ্রন্থ। এ লক্ষ্যে তিনি সর্বপ্রথম যে মতটি খণ্ডন করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন তা হলো বস্তুবাদী দর্শন। এবং মাধবাচার্য তাকে চার্বাক নামেই উল্লেখ করেছেন। এজন্যেই তাঁর গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'চার্বাক-দর্শনম'।

.

চার্বাক বলতে যে এক প্রখর বস্তুবাদী দর্শনই বোঝায়- এ ধারণাই হয়তো পরবর্তীকালের ভারতীয় সাহিত্যে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে। এমন কি দার্শনিক সাহিত্য পেরিয়ে এই ধারণার প্রভাব যে নাট্যসাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে তার প্রমাণ একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কৃষ্ণমিশ্র রচিত রূপক নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'। এ নাটকের বস্তুবাদী দর্শনের প্রতীক চরিত্রটির নাম 'চার্বাক'।

.

চার্বাক নামের উৎস খুঁজতে গিয়ে বিভিন্নজন বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। 'নয়তে চার্বী লোকায়তে' এই কাশিকাবৃত্তিতে জানা যায় যে, লোকায়ত শাস্ত্রে চার্বী নামক আচার্য পদার্থের ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, বৃহস্পতির শিষ্য চার্বাক নামে কোন একজন প্রাচীন ঋষি এই দর্শনের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করেছেন। আবার কারো মতে চারু হচ্ছে বৃহস্পতির নাম। তাঁর উপদেশরূপ বাক্যকে অনুসরণ করায় চার্বাক নাম হয়েছে। এছাড়াও চার্বাক

নামের উৎস খুঁজতে গিয়ে চার্বাক শব্দটির আরো দু’রকম মানে দাঁড় করাবার চেষ্টাও চোখে পড়ে। যেমন, প্রথমতঃ কারো মতে ‘চর্ব’ (অর্থাৎ চর্বণ) ধাতু থেকে চার্বাক শব্দটি নিষ্পন্ন। এই দর্শনে মূল মন্ত্র হচ্ছে ‘খাও, পান করো ও আনন্দ করো’, খাওয়া-পান করাকে অত্যধিক জোর দেওয়ায় এই দর্শনকে চার্বাক নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ কারো মতে ‘চারু বাক্’ থেকে চার্বাক। ‘চারু (সুন্দর, মিষ্ট) বাক্ (বচন, বাক্য) যার’ এই বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাসে ‘চার্বাক’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। কেননা অদৃষ্ট অপেক্ষা দৃষ্ট সুখের জন্য বা দৃষ্ট দুঃখের নিবৃত্তির জন্য প্রাণিকূল সাধারণত প্রবৃত্ত হয়। স্বর্গসুখ প্রাপ্তির জন্য খুব কম ব্যক্তিই যজ্ঞাদি কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তেমনি নরকদুঃখ ভয়ে খুব কম লোকই পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়। সেকারণে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে কারো কথা শুনে যা অনায়াসে চারুরূপে (=মধুরভাবে) গৃহীত হয় তা হচ্ছে লোকায়ত চার্বাক। প্রতিপক্ষের কটাক্ষ বা বিদ্রূপ থেকেই এই মানে তৈরির প্রবণতা লক্ষ্যণীয় বলে কারো কারো ধারণা। কেননা ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম অনুসারে কোনটাই টেকে না বলে পণ্ডিতদের অভিমত।

.

খ্রীস্টিয় সপ্তম বা তার পরবর্তীকালে ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনে প্রখর জড়বাদী মতবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই ‘চার্বাক’ শব্দটি সুপরিচিতি লাভ করলেও প্রাচীন সাহিত্যে এ শব্দটি একেবারেই নিরব। বিশিষ্ট চিন্তাধারাকে স্বনামে পরিচিত করার উপযোগী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোন চার্বাকের অস্তিত্বের সমর্থনে কোন তথ্যের একান্তই অভাব বলে চার্বাক নামটির উৎস নিয়ে একটা অনুন্মোচিত রহস্যের জট থেকেই যায়। তবে প্রাচীন সাহিত্য হিসেবে মহাভারতের শান্তিপর্বে রাজধর্মানুশাসন প্রসঙ্গে চার্বাক নামে এক রাক্ষসের উপাখ্যান আছে (মহাভারত : ১২/৩৮/২২-৩৬)। ‘সাক্ষ্য, শিখী এবং ত্রিদণ্ডী’ ব্রাহ্মণরূপী এ রাক্ষস চার্বাক ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের পরম শত্র“ দুর্যোধনের সখা এবং প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যমতের তীব্র সমালোচক হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। মহাভারতকে আমরা বর্তমানে যে আকারে পাই তার রচনাকালের পূর্ব সীমা খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ এবং শেষ সীমা খ্রীস্টিয় চতুর্থ শতক বলে সাধারণত ধরে নেয়া হয়। আর মহাভারতের এই অংশের রচনাকাল আনুমানিক খ্রীস্টিয় চতুর্থ শতক। চার্বাক দর্শনের ইতিহাস বা চার্বাকের উৎস খুঁজতে গিয়ে আগ্রহী গবেষকদের দৃষ্টি মহাভারতের এই উপাখ্যানের দিকেই আকর্ষিত হয় স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু এখানে জড়বাদ বা নাস্তিক্যবাদ সম্বন্ধে কোন কথা নেই। বরং যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় এই চার্বাকের স্বল্পস্থায়ী উপস্থিতি রাজা যুধিষ্ঠিরকে অপমান করতেই ব্যয়িত হয়েছে, যার পরিণামে সভায় ক্রমাগত ব্রাহ্মণদের রোষাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। মহাভারতের উপাখ্যানটি এরকম-

‘পাণ্ডবগণের পুরপ্রবেশকালে সহস্র সহস্র পুরবাসী-প্রজা দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তথায় আগমন করিতে লাগিল। ...ঐ সময় সহস্র ব্রাহ্মণ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে ধর্মরাজকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণের মধ্যে দুর্যোধনের সখা দুরাত্মা চার্বাক রাক্ষস ভিক্ষুকরূপ ধারণ পূর্বক অবস্থান করিতেছিল। ঐ পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অপকার করিবার বাসনায় ব্রাহ্মণগণ নিস্তব্ধ হইলে তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না-করিয়াই নির্ভীকচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গর্বিতবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিল,-

.
চার্ব্বাক উবাচ।
ইমে প্রাহুর্দ্বিজাঃ সর্ব্বে সমারোপ্য বচো ময়ি।
ধিগভবন্তং কু-নৃপতিং জ্ঞাতিঘাতিনমস্তু বৈ।। (মহাভারত : ১২/৩৮/২৬)
কিং তে রাজ্যেন কৌন্তেয় ! কৃত্বেমং জ্ঞাতিসঙ্ক্ষয়ম্ ।
ঘাতয়িত্বা গুরূংশ্চৈব মৃতং শ্রেয়ো ন জীবিতম্ ।। (মহাভারত : ১২/৩৮/২৭)
ইতি তে বৈ দ্বিজাঃ শ্র“ত্বা তস্য দুষ্টস্য রক্ষসঃ।
বিব্যথুশ্চু ক্রুশুশ্চৈব তস্য বাক্যপ্রধর্ষিতাঃ।। (মহাভারত : ১২/৩৮/২৮)
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে স চ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্রীড়িতাঃ পরমোদ্বিগ্নাস্তুষ্ণীমাসন্ বিশাংপতে!।। (মহাভারত : ১২/৩৮/২৯)।
যুধিষ্ঠির উবাচ।
প্রসীদন্তু ভবন্তো মে প্রণতস্যাভিযাচতঃ।
প্রত্যাসন্নব্যসনিনং ন মাং ধিক্কর্ত্তুমর্হথ।। (মহাভারত : ১২/৩৮/৩০)
ততো রাজন্ ! ব্রাহ্মণাস্তে সর্ব্ব এব বিশাংপতে!।
ঊচুর্নৈষ দ্বিজোহস্মাকং শ্রীরস্তু তব পার্থিব!।। (মহাভারত : ১২/৩৮/৩১)
জজ্ঞুশ্চৈব মহাত্মানস্ততস্তং জ্ঞানচক্ষুষা।
ব্রাহ্মণা বেদবিদ্বাংসস্তপোভির্বিমলীকৃতাঃ।। (মহাভারত : ১২/৩৮/৩২)।
ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।
এষ দুর্য্যোধনসখা চার্ব্বাকো নাম রাক্ষসঃ।
পরিব্রাজকরূপেণ হিতং তস্য চিকীর্ষতি।। (মহাভারত : ১২/৩৮/৩৩)
ন বয়ং ব্রূম ধর্ম্মাত্মন্ ! ব্যেতু তে ভয়মীদৃশম্ ।
উপতিষ্ঠতু কল্যাণং ভবন্তং ভ্রাতৃভিঃ সহ।। (মহাভারত : ১২/৩৮/৩৪)
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে হুঙ্কারৈঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
নির্ভর্ৎসয়ন্তঃ শুচয়ো নিজঘ্নুঃ পাপরাক্ষসম্ ।। (মহাভারত : ১২/৩৮/৩৫)
স পপাত বিনির্দগ্ধস্তেজসা ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
মহেন্দ্রাশনিনির্দগ্ধঃ পাদপোহঙ্কুরবানিব।। (মহাভারত : ১২/৩৮/৩৬)
পূজিতাশ্চ যযুর্বিপ্রা রাজানমভিনন্দ্য তম্ ।
রাজা চ হর্ষমাপেদে পাণ্ডবঃ সসুহৃজ্জনঃ।। (মহাভারত : ১২/৩৮/৩৭)
.
অর্থাৎ :
চার্ব্বাক বলিল- ‘পাণ্ডুনন্দন! এই ব্রাহ্মণেরা সকলে আমার উপরে বাক্য স্থাপিত করিয়া বলিতেছেন, (আমার মুখে বলিতেছেন)- ‘আপনি জ্ঞাতিহত্যাকারী ঘৃণিত রাজা; সুতরাং আপনাকে ধিক্ । ২৬।
কুন্তীনন্দন! এইরূপ জ্ঞাতি ক্ষয় করিয়া এবং গুরুজনদিগকে বধ করাইয়া, আপনার রাজ্যদ্বারা কি হইবে। আপনার এখন মৃত্যুই ভাল- জীবন নহে’। ২৭।

তখন ব্রাহ্মণেরা সকলেই সেই দুষ্ট রাক্ষসের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া এবং তাহার পূর্ব্বোক্ত বাক্যে আক্রান্ত হইয়া ব্যথিত হইলেন ও আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ২৮।
তাহার পর সেই ব্রাহ্মণেরা সকলে ও সেই রাজা যুধিষ্ঠির লজ্জিত ও বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া, কিছুকাল নীরব থাকিলেন। ২৯।
তৎপরে যুধিষ্ঠির বলিলেন- 'ব্রাহ্মণগণ! আমি অবনত হইয়া, আপনাদের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা আমার উপরে প্রসন্ন হউন'। আমার মৃত্যু অতিনিকটবর্ত্তী; সুতরাং আমার উপরে ধিক্কার দেওয়া আপনাদের উচিত নহে'। ৩০।
তদনন্তর সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই একযোগে বলিলেন- 'রাজা ! এই ব্রাহ্মণটা আমাদের কেহই নহে। আপনি জীবন ধারণ করুন, আপনার রাজলক্ষ্মীও চিরস্থায়িনী হউক। ৩১।
তাহার পর বেদবিদ্বান্ ও তপোবলে নির্ম্মলচিত্ত সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা চার্ব্বাককে চিনিতে পারিলেন। ৩২।
ব্রাহ্মণেরা বলিলেন- 'মহারাজ ! দুর্য্যোধনের সখা চার্ব্বাকনামক এই রাক্ষস পরিব্রাজকরূপে দুর্য্যোধনেরই হিতসাধন করিবার ইচ্ছা করিতেছে। ৩৩।
ধর্ম্মাত্মা ! আমরা এরূপ কথা বলি নাই। অতএব আপনার এইরূপ নিন্দার ভয় তিরোহিত হউক এবং ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার মঙ্গল হউক। ৩৪।
তাহার পর সেই পবিত্র ব্রাহ্মণেরা সকলে ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া, ভর্ৎসনা করিতে থাকিয়া, হুঙ্কারদ্বারা সেই পাপাত্মা রাক্ষসটাকে মারিয়া ফেলিলেন। ৩৫।
তখন ইন্দ্রের বজ্রদগ্ধ অঙ্কুরযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় সেই রাক্ষসটা বেদবাদী ব্রাহ্মণগণের তেজে দগ্ধ হইয়া পতিত হইল। ৩৬।
তৎপরে সেই ব্রাহ্মণেরা বিশেষ সম্মানিত হইয়া, যুধিষ্ঠিরের অভিনন্দন করিয়া, যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও সুহৃজ্জনের সহিত আনন্দিত হইলেন। ৩৭।

.

এমন এক দুরাত্মা পাপী রাক্ষসের নামের সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শনটিকে জুড়ে দিলে সাধারণ পাঠকের মনে দর্শনটির প্রতি সহজেই আতঙ্ক ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত হবার কথা। এ কারণেই এই জড়বাদী দর্শনটিকে চার্বাক নামে উল্লেখ করার প্রথা গড়ে উঠেছিলো কিনা তা বিপ্রতীপ দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবনার বিষয় হতেই পারে। তবে চার্বাককে ব্রাহ্মণদের ক্রোধের বলি করে উপাখ্যানটি এই ব্রাহ্মণবেশী দুর্যোধনসখার মধ্যে ব্রাহ্মণবিরোধী এক মনোভাবের ইঙ্গিত দেয়। আর এ ইঙ্গিতটাকে স্পষ্টতর করে তোলে মহাভারতেরই অন্তর্গত অন্য এক উপাখ্যান, যার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার প্রসাদপুষ্ট অপর এক চার্বাকের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপাগত এই চার্বাকের অভিন্নতা প্রদর্শন করেন। (মহাভারত: ১২/৩৯/৩-১১) । উপাখ্যানটি এরকম-
বাসুদেব উবাচ।
ব্রাহ্মণাস্তাত ! লোকেহস্মিন্নর্চ্চনীয়াঃ সদা মম।
এতে ভূমিচরা দেবা বাগ্বিষাঃ সুপ্রসাদকাঃ।। (মহাভারত : ১২/৩৯/২)
পুরা কৃতযুগে রাজন্ ! চার্ব্বাকো নাম রাক্ষসঃ।
তপস্তেপে মহাবাহো ! বদর্য্যাং বহুবার্ষিকম্ ।। (মহাভারত : ১২/৩৯/৩)

বরেণ চ্ছন্দ্যমানশ্চ ব্রহ্মণা চ পুনঃ পুনঃ।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো বরয়ামাস ভারত !।। (মহাভারত : ১২/৩৯/৪)
দ্বিজাবমানাদন্যত্র প্রাসাদ্বরমনুত্তমম্ ।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদৌ তস্মৈ জগৎপতিঃ।। (মহাভারত : ১২/৩৯/৫)
স তু লব্ধবরঃ পাপো দেবানমিতবিক্রমঃ।
রাক্ষসস্তাপয়ামাস তীব্রকর্ম্মা মহাবলঃ।। (মহাভারত : ১২/৩৯/৬)
ততো দেবাঃ সমেতাশ্চ ব্রাহ্মাণমিদমব্রুবন্ ।
বধায় রক্ষসস্তস্য বলবিপ্রকৃতাস্তদা।। (মহাভারত : ১২/৩৯/৭)
তানুবাচ ততো দেবো বিহিতস্তত্র বৈ ময়া।
যথাস্য ভবিতা মৃত্যুরচিরেণেতি ভারত !।। (মহাভারত : ১২/৩৯/৮)
রাজা দুর্য্যোধনো নাম সখাস্য ভবিতা নৃষু।
তস্য স্নেহাববদ্ধোহসৌ ব্রাহ্মণানবমংস্যতে।। (মহাভারত : ১২/৩৯/৯)
তত্রৈনং রুষিতা বিপ্রা বিপ্রকারপ্রধর্ষিতাঃ।
ধক্ষ্যন্তি বাগ্বলাঃ পাপং ততো নাশং গমিষ্যতি।। (মহাভারত : ১২/৩৯/১০)
স এষ নিহতঃ শেতে ব্রহ্মদণ্ডেন রাক্ষসঃ।
চার্ব্বাকো নৃপতিশ্রেষ্ঠ ! মা শুচো ভরতর্ষভ !।। (মহাভারত : ১২/৩৯/১১)।
.
অর্থাৎ :
কৃষ্ণ বলিলেন- ‘মাননীয় রাজা ! এই জগতে ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই আমার পূজনীয়। কারণ, ইঁহারা পৃথিবীচারী দেবতাস্বরূপ এবং ইঁহাদের বাক্যই বিষ, আবার প্রসন্নতা উৎপাদন করাও সহজ। ২।
মহাবাহু রাজা ! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে এই রাক্ষস চার্ব্বাক বদরিকাশ্রমে বহু-বৎসর যাবৎ তপস্যা করিয়াছিল। ৩।
ভরতনন্দন ! তাহার পর ব্রহ্মা আসিয়া বর লইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিলে, চার্ব্বাক সমস্ত প্রাণী হইতেই নিজের অভয় বর প্রার্থনা করিয়াছিল। ৪।
তখন অপমানিত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সমস্ত প্রাণী হইতেই সর্ব্বোত্তম অভয় বর তাহাকে ব্রহ্মা দান করিয়াছিলেন। ৫।
তৎপরে অসাধারণ বিক্রমশালী, নিষ্ঠুর কার্য্যকারী, মহাবল ও পাপাত্মা চার্ব্বাক ব্রহ্মার নিকট সেই বর লাভ করিয়া, দেবগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিল। ৬।
তাহার পর একদা দেবতারা সেই চার্ব্বাক রাক্ষসের প্রভাবে নিপীড়িত হইয়া, ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া, চার্ব্বাকের বধের জন্য এই কথাই বলিলেন। ৭।
ভরতনন্দন ! তদনন্তর ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন- ‘যাহাতে অচিরকালমধ্যে চার্ব্বাক নিহত হয়, সে বিষয়ে আমি উপায় করিয়াছি। ৮।
মনুষ্যলোকে দুর্য্যোধননামে এক রাজা জন্মিবেন এবং তিনি চার্ব্বাকের সখা হইবেন।
কালক্রমে এই চার্ব্বাক সেই দুর্য্যোধনের সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, ব্রাহ্মণগণের অবমাননা

করিবে। ৯।
তখন বাক্শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা চার্ব্বাকের অবজ্ঞায় ক্রুদ্ধ হইয়া, ব্রহ্মতেজেই পাপাত্মাকে দগ্ধ করিবেন; তাহাতেই চার্ব্বাক বিনষ্ট হইবে'। ১০।
ভরতশ্রেষ্ঠ রাজপ্রধান ! সেই চার্ব্বাক রাক্ষসই এই ব্রাহ্মণের তেজে বিনষ্ট হইয়া শয়ন করিয়াছে। অতএব আপনি ব্রহ্মহত্যা হইয়াছে বলিয়া অনুতাপ করিবেন না। ১১।

.

যুধিষ্ঠিরের সভায় সমাগত চার্বাকের বিনাশের মূলে কার্যকর ব্রহ্মার অভিশাপ এবং ব্রাহ্মণদের বিরোধিতার মাধ্যমে অভিশাপটিকে ফলপ্রসূ করার দায়িত্ব স্বয়ং চার্বাকেরই। উপাখ্যানের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তকে দৃষ্টিপটে তুলে ধরার প্রয়াস এখানে স্পষ্ট।

.

চার্বাক নামে কোন ব্যক্তির কাহিনী মহাভারতের অন্যত্র বা অন্য কোন গ্রন্থেও আর দেখা যায় না। মহাভারতে চার্বাক নামের এই রাক্ষসের সামান্য উল্লেখ থেকে চার্বাক মতবাদের এরকম নামকরণের পক্ষে সুনিশ্চিত কোন যুক্তি বা সাক্ষ্য আদৌ আছে কিনা জানা নেই। তবে এটা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে চার্বাক এখানে বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী দর্শনের এক মূর্ত রূপ। তাই বিরোধী প্রখর জড়বাদী মতের প্রতি বৈদিক সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের তীব্র বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ এমন চার্বাক নামকরণের মধ্যে দিয়ে ঘটে যাওয়া অসম্ভব না-ও হতে পারে।

৩.০ : চার্বাক ও বৃহস্পতি

...

চার্বাক দর্শন সম্পর্কে যেটুকু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে এই মতবাদের সূচনার কাল বা 'চার্বাক' নামের সঙ্গে এর সংযুক্তির কাহিনী কিছুই সঠিকভাবে নির্ণয় করা এখনো সম্ভব নয়। তাছাড়া এই চিন্তাধারা চার্বাক দর্শন নামে পরিচিতি লাভ করলেও চার্বাক নামে কোন ব্যক্তিকে এর প্রবর্তক বলে স্বীকার করার কোন প্রমাণও এযাবৎ পাওয়া যায়নি। তবে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়', 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থে এই মতবাদের আদি প্রচারক হিসেবে বৃহস্পতির নাম উল্লেখ করা আছে। ব্যক্তিরূপী চার্বাক এসব গ্রন্থে স্বীকৃতি পেলেও তা উদ্ধৃত হয়েছে বৃহস্পতিশিষ্য হিসেবে।

যেমন চতুর্দশ শতকের মাধবাচার্য তাঁর 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ 'চার্বাক-দর্শনম'-এর শুরুর দিকে বলছেন-

'অথ কথং পরমেশ্বরস্য নিঃশ্রেয়স-প্রদত্বমভিধীয়তে ? বৃহস্পতি-মতানুসারিণা নাস্তিক-শিরোমণিনা চার্বাকেণ তস্য দুয়োৎসারিতত্বাৎ।' -(সর্বদর্শনসংগ্রহ, পৃষ্ঠা ০২)।
অর্থাৎ : আপনি কিভাবে পরমেশ্বরকে নিঃশ্রেয়সপ্রদ বলছেন ? বৃহস্পতির মতানুসারী নাস্তিক শিরোমণি চার্বাক কর্তৃক তিনি দূরোৎসারিত- দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন অর্থাৎ তাঁদের মতে ঈশ্বর নামক কোন পদার্থ নাই।

.

আর কৃষ্ণমিশ্র রচিত একাদশ শতকের রূপক নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-এ বলা হচ্ছে-

'লোকায়েতামেব শাস্ত্রং... ...বাচস্পতিনা প্রণীয় চার্বাকায় সমর্পিতম্ ।
তেন চ শিষ্যপ্রশিষ্যদ্বারেনাস্মিল্লোকে বহুলীকৃতং তন্ত্রম্ । -(প্রবোধচন্দ্রোদয়, পৃষ্ঠা-৬৪)।
অর্থাৎ : বাচস্পতি বা বৃহস্পতি প্রণীত এই লোকায়ত শাস্ত্রমতটিকে চার্বাক শিষ্য-প্রশিষ্যের মাধ্যমে চতুর্দিকে প্রচার করেন। (মুক্ত তর্জমা)।

.

অন্যদিকে অষ্টম শতকের জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সূরীর 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়' গ্রন্থের ব্যাখ্যা হিসেবে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে রচিত আরেক জৈন দর্শনকার গুণরত্নের ভাষ্যগ্রন্থ 'তর্করহস্যদীপিকা'য় 'যদুবাচ বাচস্পতিঃ' অর্থাৎ 'বাচস্পতি যা বলেন' উল্লেখ করে বাচস্পতি বা বৃহস্পতির উক্তি হিসেবে তিনটি সূত্র উদ্ধৃত করেন। সেগুলো হচ্ছে-

'অথাতস্তত্ত্বং ব্যাখ্যাস্যামঃ।' – (বৃহস্পতি সূত্র)
'পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরিতি তত্ত্বানি।' – (বৃহস্পতি সূত্র)।
অর্থাৎ : পৃথিবী (মাটি), জল, অগ্নি ও বায়ু- এই চারটিই তত্ত্ব।
'তৎসমুদায়ে শরীরেন্দ্রিয়সংজ্ঞা।' – (বৃহস্পতি সূত্র)
অর্থাৎ : এর (তত্ত্ব চতুষ্টয়) সমন্বয়ে শরীর, ইন্দ্রিয়, চৈতন্য ইত্যাদি সৃষ্ট।

.

লক্ষ্য করার বিষয় যে, সম্ভাব্য অষ্টম শতকের প্রথমদিকে রচিত জয়রাশি ভট্টের

‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহ’ গ্রন্থে রচয়িতার নাম উল্লেখ না করে এই তিনটি সূত্রই উদ্ধৃত হয়েছে বস্তুবাদী নিদর্শন হিসেবে। আবার বৌদ্ধ পণ্ডিত কমলশীলের (অষ্টম শতক) ‘তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা’য় লোকায়তসূত্র হিসেবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রেরই উদ্ধতি রয়েছে। যদিও সূত্র দুটি কমলশীলের উদ্ধৃতিতে সামান্য পরিবর্তিত আকারে দেখা যায়, যেমন- ‘পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরিতি চত্বারি তত্ত্বানি তেভ্যশ্চৈতন্যম্’ এবং ‘তৎসমুদায়ে’। এতে অবশ্য ভাবগত অর্থে শ্লোকগুলির মধ্যে খুব একটা পার্থক্য হয় না। যেমন বাংলা তর্জমায় সূত্র দুটির সমন্বিত অর্থ দাঁড়ায়- ‘পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু- এই চারটি তত্ত্বের সমন্বয়ে চৈতন্যের জন্ম ও অভিব্যক্তি হয়।’

.

অন্যদিকে উল্লেখিত প্রথম সূত্রটি (অথাতস্তত্ত্বং ব্যাখ্যাস্যামঃ)-কে জয়ন্ত ভট্টের (নবম শতক) ‘ন্যায়মঞ্জরী’তে চার্বাক দর্শনের আদি সূত্র হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। (ন্যায়মঞ্জরী ১, পৃঃ-৫৯)। অথচ সংকলিত বার্হস্পত্যসূত্রে এই সূত্রটির অন্তর্ভুক্তিই পাওয়া যায় না কোথাও। এসব দেখেশুনে মনে হয় যে চার্বাক গ্রন্থকাররা প্রত্যেকে তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির অনুকরণে এই আদি সূত্রে অন্তর্ভুক্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, যদিও প্রত্যেকেরই ধারণায় তাঁদের নিজ নিজ ব্যাখ্যাটি প্রকৃত সূত্রকারেরই অনুমোদন-সাপেক্ষ। সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে বিভিন্ন দার্শনিক গ্রন্থের ভাষ্যকারদের রচনায় এরকম প্রচুর সূত্রের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। এগুলির প্রচারক কখনও চার্বাক, কখনও লোকায়ত, আবার কখনও বা বার্হস্পত্য বিশেষণে বিশেষিত হয়েছে।

.

সায়ণ মাধবাচার্যের ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ গ্রন্থের চার্বাক দর্শনের বর্ণনায়ও এরকম কিছু শ্লোকের অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। মাধবাচার্যের মতে এগুলি চার্বাক সিদ্ধান্তের প্রবর্তক বৃহস্পতির উক্তি।
‘অর্থ-কামৌ এব পুরুষার্থৌ’- (অর্থাৎ : অর্থ ও কামই পুরুষার্থ)।
‘তত্র পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি।’- (অর্থাৎ : পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু- এই চারটি ভূতই চারটি তত্ত্ব।)
‘কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়তে।’- (অর্থাৎ : কিণ্ব বা বৃক্ষবিশেষ হতে মদশক্তির ন্যায় চৈতন্য জন্মে।)
‘ত্রয্যা ধূর্ত্তপ্রলাপমাত্রত্বেন’- (অর্থাৎ : বেদত্রয়ী ধূর্তের প্রলাপমাত্র।)
‘অগ্নিহোত্রাদের্জীবিকামাত্রপ্রয়োজনত্বাৎ।’- (অর্থাৎ : অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ কর্মের প্রয়োজন জীবিকামাত্র, অন্য কিছু নয়।)
‘লোক-সিদ্ধো রাজা পরমেশ্বরঃ।’- (অর্থাৎ : লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর।)
‘দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ।’- (অর্থাৎ : দেহের উচ্ছেদই মোক্ষ।)
ইত্যাদি।

.

এসব শ্লোকেরই অনুরূপ কিছু শ্লোক ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন পাতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে, কোথাও বা চার্বাক দর্শনের সাথে যুক্ত হয়ে, কোথাও অন্যভাবে দেখা যায়।

শ্লোকগুলির রচয়িতা প্রকৃতই বৃহস্পতি নামে কোন ব্যক্তি কিনা তা বলা কঠিন। তবে যথার্থ ইতিহাসের পর্যায়ে ফেলা না গেলেও চার্বাক মতবাদের সাথে বৃহস্পতির নামে যোগ বহন করে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে কয়েকটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

.

দেবতাদের গুরুর নাম বৃহস্পতি। কথিত চার্বাক আচার্য বৃহস্পতির প্রকৃত পরিচয় যা-ই হোক না কেন, তিনি যে ক্রমে এই দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছেন তা ওই উপাখ্যানগুলোর কাহিনী থেকে প্রতীয়মান হয়। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে চার্বাক মতের প্রচারক বৃহস্পতি যে এই দেবগুরুর সঙ্গে অভিন্ন এবং বাচস্পতি আখ্যায় অভিহিত, তা ইতঃপূর্বে সংশ্লিষ্ট শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে। বাচস্পতি শব্দের অর্থ বাক্যের অধিপতি এবং দেবগুরু বৃহস্পতি সাধারণত এই নামের সঙ্গে যুক্ত। এক্ষেত্রে বৃহদারণ্যক উপনিষদ স্মর্তব্য-

এষ উ এব বৃহস্পতি। বাগ্ বৈ বৃহতি, তস্যা এষ পতিঃ, তস্মাদ্ উ বৃহস্পতি।। ১/৩/২০।।
(বৃহদারণ্যক উপনিষদ)।
অর্থাৎ : প্রাণের আর-এক নাম বৃহস্পতি। বাক্যকে বলে বৃহতী। যেহেতু তিনি বাক্যের গতি, তাই বৃহস্পতি।

.

প্রচলিত বৈদিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে ধারণা এই চার্বাক মতবাদের মাধ্যমে প্রচারিত, দেবতাদের গুরুর সঙ্গে সে ধারণার মিল বা সংগতি খুঁজে পাওয়া কঠিন বৈকি। তাই হয়তো এ ক্ষেত্রে উভয়ের যোগের সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে কিছু কল্পনার মাধ্যমে। আর এই কল্পনা বিভ্রান্তি বা মায়ামোহের রূপ নিয়ে বিভিন্ন প্রাচীন উপাখ্যানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

.

বিষ্ণুপুরাণে (৩/১৭/১৪-২৬) বলা হয়েছে, অসুরদের মোহগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যেই মায়ামোহ তাঁদের মধ্যে এই মারাত্মক মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন। মায়ামোহের ওই উপদেশগল্পে বলা হয়েছে, প্রাচীনকালে নর্মদা নদীর তীরে কিছু দৈত্য শ্রুতিপ্রতিপাদিত পথে একাগ্র অন্তঃকরণে তপস্যা করছিলো। তাতে ভীত দেবগণ নারায়ণের শরণাপন্ন হন। তারপর নারায়ণ তাঁদেরকে সেমত অবস্থায় দেখে তাঁদের মনোব্যাথা দুর করার জন্য নিজ শরীর হতে মায়ামোহ নামে একজন পুরুষকে উৎপন্ন করে 'এই ব্যক্তি আপনাদের কার্য সম্পাদন করবে' বললেন। মায়ামোহ নিজের নাম অনুসারে নিজ প্রবৃত্তি প্রদর্শন করে নিজ মায়ায় দৈত্যদের মোহিত করে সন্মার্গ হতে ভ্রষ্ট করেছিলো। বৃহস্পতির প্রণীত সূত্রানুসারে মায়ামোহ উপদেশ শুনাতে শুনাতে তাদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে তপস্যা হতে নিবৃত্ত করেছিলো।
নাস্তিক মতের প্রচার করে মায়ামোহ যে উপদেশ দিয়েছিলো তা অনেক প্রকার। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সর্বসাধারণ। যেমন যজ্ঞাদি কর্ম ধর্ম নয়, একথা স্বীকার করতে হয়। কেননা সেখানে পশু সকল হত্যা করা হয়। আর অহিংসা হচ্ছে পরম ধর্ম। বেদ হচ্ছে ধূর্ত ব্যক্তিদের প্রলাপ। এরই মোহে পড়ে অসুরেরা বৈদিক জ্ঞানকে উপহাস করতে শিখলেন; অতএব

তাঁদের দারুণ অধঃপতন ঘটলো। সেই অবকাশে দেবতারা শক্তি সঞ্চয় করে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন এবং সহজেই অসুরদের পরাজিত করলেন।

.

এই মায়ামোহ যে মূলত দেবগুরু বৃহস্পতি তা স্পষ্ট হয় সম্ভাব্য বুদ্ধ-পরবর্তী কালে সৃষ্ট মৈত্রায়ণীয় উপনিষদের (৭,৮,৯) অন্তর্ভুক্ত অনুরূপ একটি পৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্যে। এই উপাখ্যান অনুযায়ী- দেবগুরু বৃহস্পতি অসুরগুরু শুক্রের ছদ্মবেশ ধারণ করে ইন্দ্রের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই অসুরদের মধ্যে এই মারাত্মক অবিদ্যা-মূলক মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন। সেই অবিদ্যার প্রভাবেই অসুরেরা অধর্মকে ধর্ম এবং ধর্মকে অধর্ম মনে করতে শুরু করে।

.

বেদ বিরোধী এই মতাদর্শ যে আসলে চার্বাক দর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যা বৃহস্পতির বচন হিসেবেই বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। এই উপাখ্যানের মাধ্যমে দেবগুরু বৃহস্পতির কুল রক্ষা করা গেলো বটে, তবে একই সাথে এই চার্বাক মতকে অমঙ্গলের প্রতীক অসুর মত হিসেবেও প্রচার করার প্রয়াসও দেখতে পাই আমরা। এই অসুর বলতে যাঁদেরকেই বোঝাক না কেন, তাঁদের সংস্কৃতি যে বেদবিরোধী ছিলো এ নিয়ে সন্দেহ নেই। ফলে বৈদিক ঐতিহ্যের বাহকেরা তাঁদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখেই দেখার চেষ্টা করেছিলেন। বৈদিক সংস্কৃতিতে এই অসুর মত যে একান্তই পরিত্যাজ্য সে সম্পর্কে যথোপযুক্ত প্রচারণার লক্ষ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু।। ১৬/৬।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)।
অর্থাৎ : হে পার্থ, এই জগতে দেবস্বভাব ও অসুরস্বভাব- এই দুই প্রকার মানুষ সৃষ্ট হয়েছে। দেবস্বভাবসম্পন্ন মানুষের কথা বিস্তৃতভাবে বলেছি। এখন অসুরস্বভাববিশিষ্ট মানুষের কথা আমার নিকট শ্রবণ কর।

.

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।। ১৬/৭।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)।
অর্থাৎ : অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ ধর্মবিষয়ে প্রবৃত্ত এবং অধর্মবিষয় হতে নিবৃত্ত হতে জানে না; তাদের শৌচ নাই, সদাচার নাই এবং সত্যও নাই।

.

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ।। ১৬/৮।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)।
অর্থাৎ : আসুরভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলে, এই জগৎ সত্যশূন্য; ইহা ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাহীন। ইহার কর্মফলদাতা ঈশ্বর নাই এবং কামবশতঃ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই ইহা উৎপন্ন; ইহার উৎপত্তির অদৃষ্ট ধর্মাধর্মাদি অন্য কারণ নাই।

.

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোহল্পবোদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ।। ১৬/৯।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)।
অর্থাৎ : এই লোকায়তিক মত আশ্রয়পূর্বক পারলৌকিক-সাধনচ্যুত ক্রূরকর্মা, অনিষ্টকারী ও অল্পবুদ্ধি আসুরপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ জগতের বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করে।

.

উল্লেখ্য, বেদের সারাংশকে উপনিষদ এবং 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'কে উপনিষদের সার বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' হচ্ছে মহাভারতের (আনুমানিক ৪০০খ্রীস্টপূর্ব-৪০০খ্রীস্টাব্দ) ভীষ্মপর্বের এক বিশিষ্ট অংশও। তাই গীতায় এ অসুর-মত বিষয়ক আরো শ্লোক উদ্ধৃত থাকলেও উল্লেখকৃত শ্লোক-ক'টি থেকেই কথিত অসুর মত সম্পর্কে একটা আপাত ধারণা তৈরি হয়ে যায়। বর্ণিত শ্লোক অনুযায়ী এই মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করার পাশাপাশি তথাকথিত ঈশ্বর প্রদত্ত কর্মফল তথা এতদসংশ্লিষ্ট জন্মান্তরবাদও অসার বলে ঘোষিত হয়েছে। অসুর মতের সৃষ্টিতত্ত্বে এই জগৎ যে স্ত্রী-পুরুষের মিলনজাত ও কামোদ্ভূত এবং এর পেছনে অদৃষ্ট নামের কোন ধর্ম-অধর্ম পাপ-পুণ্য বা স্বর্গ-নরক ও আত্মা এসব অলৌকিক অবাস্তব কোন কারণ নেই তাও এই শ্লোক থেকে ধারণা করতে পারি আমরা। এবং এ শ্লোক থেকে আরেকটি যে কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য পেয়ে যাই তা হলো, গীতায় এই অসুর মতকে লোকায়তিক মত হিসেবে আখ্যায়িত করার বিষয়টি। ফলে চার্বাক মতের আদি উৎস খুঁজতে গিয়ে বৃহস্পতির সম্পর্কসূত্রে শেষপর্যন্ত পৌঁছে যাই লোকায়ত মত নামের এক প্রাচীন ধারণার কাছাকাছি। তবে কি চার্বাক দর্শনের আদি রূপটি লুকিয়ে আছে প্রাচীন লোকায়ত মতের গভীরে কোথাও ? নিশ্চয়ই তা পর্যালোচনার দাবী রাখে। কিন্তু সে পর্যালোচনায় যাওয়ার আগে আরেকটি বিষয়ে দৃষ্টি-আকর্ষণ করা যেতে পারে।

.

বামাচার :

লোকায়ত-মত পর্যালোচনার আগে চার্বাক-বৃহস্পতি-লোকায়তের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের প্রসঙ্গে জৈন দর্শনকার গুণরত্নের ভাষ্যগ্রন্থ 'তর্করহস্যদীপিকা'য় বর্ণিত উদ্ধৃতাংশটি প্রণিধানযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে-

।। অথ লোকায়তমতম্।।
প্রথমম্ নাস্তিক স্বরূপমুচ্যতে। কাপালিকাঃ ভস্মোদ্ধূলনপরাঃ যোগিনঃ ব্রাহ্মণাদ্যন্ত্যজাতাশ্চ কেচন নাস্তিকা ভবন্তি। তে চ জীবপুণ্যপাপাদিকং ন মন্যন্তে। চতুর্ভূতাত্মকং জগদাচক্ষতে। কেচিত্তু চার্ব্বাকৈকদেশীয়া আকাশং পঞ্চমং ভূতমভিমন্যমানাঃ পঞ্চভূতাত্মকং জগদিতি নিগদন্তি। তন্মতে ভূতেভ্যো মদশক্তিবচ্চৈতন্যমুত্পদ্যতে। জলবুদ্বুদবজ্জীবাঃ। চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ ইতি। তে চ মদ্যমাংসে ভুঞ্জতে মাত্রাদ্যগম্যাগমনমপিকুর্বতে। বর্ষে বর্ষে কস্মিন্নপি দিবসে সর্বে সংভূয় যথানামনির্গমং স্ত্রীভিরভিরমন্তে। ধর্মং কামাদপরং ন মন্যতে। তন্নামানি চার্ব্বাকাঃ লোকায়তাঃ ইত্যাদীনি। গলচর্ব অদনে। চর্ব্বয়ন্তি ভক্ষয়ন্তি তত্ত্বতঃ ন মন্যন্তে পুণ্যপাপাদিকং পরোক্ষং বস্তুজাতমিতি চার্ব্বাকাঃ। ...লোকাঃ নির্ব্বিচারাঃ সামান্যাঃ

লোকাস্তদ্বদাচরন্তি স্মেতি লোকায়তা লোকায়তিকা ইত্যপি। বৃহস্পতিপ্রণীতমতত্বেন বার্হস্পত্যাশ্চ ইতি।
অর্থাৎ :
অনন্তর লোকায়ত। প্রথমে নাস্তিকদের কথা। কাপালিক :- ভস্ম আচ্ছাদিত যোগীগণ এবং অন্ত্যজ ব্রাহ্মণাদি কেহ কেহ নাস্তিক। তাহারা জীবগণের পুণ্য পাপ প্রভৃতির বিচার করে না। তাহারা জগতকে চতুর্ভূতাত্মক বলিয়া মনে করে। চার্বাক প্রভৃতি মতাবলম্বীদিগের কেহ কেহ আকাশকে পঞ্চম ভূত রূপে ধরিয়া জগতকে পঞ্চভূতাত্মক বলিয়া থাকে। তাহাদের মতে চৈতন্য মদশক্তির ন্যায় আবির্ভূত হয়। জীবগণ জলবুদবুদ্ তুল্য। পুরুষ চৈতন্যবিশিষ্ট শরীরমাত্র। তাহারা মদ্যপান ও মাংস ভোজন করিয়া থাকে এবং মাতা প্রভৃতি অগম্য নারী প্রভৃতিতেও গমন করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর কোনো একদিনে সকলে একত্র হইয়া যথাভিপ্রেত স্ত্রীগণের সহিত রমন করিয়া থাকে। কাম ব্যতীত ধর্ম নাই। এই জন্যই চার্বাকদিগকে লোকায়ত বলা হইয়া থাকে। পরোক্ষ বস্তুসমূহ হইতে জাত গলাধঃকরণ ও চর্বণ হেতুই চার্বাক বলা হইয়া থাকে। ...নির্বিচারে সাধারণ লোকের ন্যায় আচরণ করে বলিয়াই তাহাদিগকে লোকায়ত বা লোকায়তিকও বলা হইয়া থাকে। তাহাদের মত বৃহস্পতি প্রণীত বলিয়াই তাহাদের বার্হস্পত্যও বলে।

.

উদ্ধৃতিটিতে প্রাচীন তান্ত্রিক মত বামাচারের সাথে চার্বাক মতকে মিশিয়ে ফেলে তথ্য বিচ্যুতি ঘটানোর প্রবণতা অনুমান করা অস্বাভাবিক হবে না। তবে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন কৃষিভিত্তিক ধ্যানধারণায় প্রকৃতিস্বরূপা নারীযোনির আদিম জাদুবিশ্বাস সংশ্লিষ্ট প্রাচীন তান্ত্রিক আচারের সাথে চার্বাকী লোকায়ত মতাদর্শকে এক করে দেখানোর অন্যতম কারণ হয়তো উভয়ই বেদবহির্ভূত লোকায়তিক চিন্তা-চেতনা থেকে উদ্ভূত বলেই। কিন্তু এই তন্ত্র-সাধনার সাথে চার্বাক মতের সরাসরি পার্থক্যটাই হলো তান্ত্রিক আচার সুস্পষ্টভাবেই আধ্যাত্মিক লক্ষ্যনিষ্ট কিন্তু দেহাচারী স্বতন্ত্র সাধন-পদ্ধতি, অন্যদিকে চার্বাক মতাদর্শ সম্পূর্ণই দেহাত্মবাদী বস্তুতান্ত্রিক দর্শন। যার সাথে আধ্যাত্মিকতার কোনই সম্পর্ক নেই। তাই আধুনিক রুচি ও নীতিবোধের কাছে পঞ্চমকারপূর্ণ অর্থহীন তান্ত্রিক সাধনার বীভৎসতায় এর আদি-তাৎপর্য না খুঁজে কেবল লোকায়তিক আচারের দোহাই দিয়ে নির্দিষ্ট দর্শনদৃষ্টির সাথে মিশিয়ে ফেলাটা যথাযথ উপস্থাপন নয় বলেই মনে হয়। বিষয়টির কিঞ্চিৎ অনুধাবনের নিমিত্তে প্রাচীন তন্ত্র-সাধনার গূঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটন না-হলেও রহস্য-চিহ্নায়ক তন্ত্র-নির্দেশনার কিছু উদ্ধৃতি টানা যেতে পারে।

.

এক্ষেত্রে প্রাচীন ‘কুলার্ণব-তন্ত্র’-এ (সূত্র: লোকায়ত দর্শন / দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়) বলা হচ্ছে-

মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রামৈথুনমেবচ।
মকারপঞ্চকং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকম্ ।। (কুলার্ণব-তন্ত্র)।
অর্থাৎ : মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন- এই পাঁচটি বস্তুর নামের আদিতে ‘ম’ অক্ষরটি

থাকায় ইহাদের সংক্ষিপ্ত নাম মকার। এই পঞ্চমকার দেবতাদিগের জন্যও প্রীতিকারক।

.

মকারপঞ্চকং দেবি দেবানামপি দুর্লভং।
মদ্যৈর্মাংসৈস্তথা মৎসৈর্মুদ্রাভির্মৈথুনৈরপি।।
স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং মহাসাধুরর্চ্চয়েৎ জগদম্বিকা।
অন্যথা চ মহানিন্দা গীয়তে খণ্ডিতৈঃ সুরৈঃ।। (কুলার্ণব-তন্ত্র)।
অর্থাৎ : পঞ্চমকার তন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। পঞ্চমকার ব্যতীত তান্ত্রিকের কোনো কার্যেই অধিকার নাই। পঞ্চমকার দেবতাদিগেরও দুর্লভ ; মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা জগদম্বিকাকে পূজা করিতে হয়।

.

পঞ্চমেন বিনা দেবি চণ্ডিমন্ত্রং কথং জপেৎ। (কুলার্ণব-তন্ত্র)।
অর্থাৎ : পঞ্চমকার ব্যতীত চণ্ডিমন্ত্র কেমন করিয়া জপ হইতে পারে ?

.

যদিও তান্ত্রিক রিচ্যুয়াল বা আধ্যাত্মিক তন্ত্রবিশ্বাস মতে বলা হয়ে থাকে, পঞ্চমকারের তাৎপর্য অতি গূঢ়, সাধারণের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়, তবু একই প্রাকৃত উৎস থেকে উদ্ভূত এই আদিম তান্ত্রিক বিশ্বাস আর বার্হস্পত্য মতাদর্শের মধ্যে যে মাত্রাগত পার্থক্য তা বোধ করি বুঝতে অসুবিধা হয় না।
তন্ত্রসাধনায় যত গূঢ় রহস্যই থাকুক না কেন, এটা যে কামপ্রধান আচারই তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। যেমন-
কামেন মায়য়া চৈব পুটিতং কামবীজকম্ ।
তদা কামেশ্বরো মন্ত্রঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ।। (কুব্জিকাতন্ত্রম্ : ২/৩৫)
অর্থাৎ : কামবীজ (কীং) এবং মায়াবীজ (হ্রীং) দ্বারা কামবীজকে পুটিত করিলে, তাহা সর্ব্বকাম ফলপ্রদ কামেশ্বর মন্ত্র হয়। (কীং হ্রীং কীং হ্রীং কীং)।

.

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ-
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং নবেত্তি যঃ।
শতকোটিজপেনাপি তস্য বিদ্যা ন সিধ্যতি।। (সরস্বতীতন্ত্র : ১/১)
মহাদেব মহাদেব ইতি যৎ পূর্ব্বসূচিতম্ ।
এতত্তত্ত্বং মহাদেব কৃপয়া বদ শঙ্কর।। (সরস্বতীতন্ত্র : ১/২)।
অর্থাৎ :
পার্ব্বতী বলিলেন- হে মহাদেব ! যে জন মন্ত্রার্থ মন্ত্রচৈতন্য এবং যোনিমূদ্রা জানে না, শতকোটি যপের দ্বারাও তাঁহার বিদ্যা (ইষ্টমন্ত্র) সিদ্ধ হয় না। আপনি পূর্বে এইরূপ যে সূচনা করিয়াছিলেন, হে শঙ্কর ! এই তত্ত্ব কৃপাপূর্ব্বক বলুন। ১-২।

.

তবে চার্বাকরা বেদকে প্রামাণিক হিসেবে স্বীকৃতি না দিলেও তন্ত্রসাধকদের ধ্যান-ধারণায়

ব্রাহ্মণ্যবাদী বিশ্বাসের ছাপ পুরোদমেই বিদ্যমান দেখা যায়। যেমন-

অস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তশ্চ সাধকঃ।
একোচ্চারণমাত্রেণ অশ্বমেধাযুতং ফলম্ ।। (কুব্জিকাতন্ত্রম্ : ২/৪৯)
অর্থাৎ : কালিকামন্ত্র স্মরণমাত্রই সাধক জীবন্মুক্তি লাভ করে এবং একবার মাত্র উচ্চারিত হইলে অযুত অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদনের ফল লাভ হয়।

.

এই যাগযজ্ঞ বা বৈদিক বিশ্বাসের সাথে অবাধ কামাচারের মণি-কাঞ্চণ যোগের বৈধ সংকলকের ভূমিকায় তান্ত্রিকদের কালিকামন্ত্রের কার্যকর শক্তি যে কী বিপুল, তা তন্ত্রসাধনায় কুমারীতন্ত্রের ষষ্ঠ পটলের 'কুলাচার-কথন' উপাখ্যানের মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়-

শ্রীদেব্যুবাচ-
দেবদেব মহাদেব জগৎপ্রলয়কারকঃ।।
কুলাচারে তু মদ্যাদ্যৈঃ কথং সিদ্ধির্ভবেৎ প্রভো।
অর্ধমকারণং হ্যেতৎ সংশয়ং ছিন্দি মে প্রভো।। (কুমারীতন্ত্র : ৬/১)
শ্রীভৈরব উবাচ-
সাধু পৃষ্ঠো হি দেবেশি কথয়ামি শৃণুস্ব মে।
পুরা দারুবনে রম্যে মুনয়ো রাগমোহিতাঃ।। (কুমারীতন্ত্র : ৬/২)
পরস্ত্রিয়ং ধর্ষয়ন্তি মদ্যং পিবন্তি নিত্যশঃ।
তদ্দৃষ্টানুচিতং কর্ম্ম বিষ্ণুর্মাং সমুপস্থিতঃ।। (কুমারীতন্ত্র : ৬/৩)
দেবদেব মহাদেব সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকঃ।
প্রভো দারুবনে পাপা মদ্যপানরতাস্তথা।। (কুমারীতন্ত্র : ৬/৪)
পরস্ত্রিয়ং ধর্ষয়ন্তি মুনয়ো রাগমোহিতাঃ।
দিগম্বরাশ্চ মত্তাশ্চ কিং গতিশ্চ ভবিষ্যতি।। (কুমারীতন্ত্র : ৬/৫)
ইতি বিষ্ণুবচঃ শ্রুত্বা তমবাদমহং প্রিয়ে।
কালিকায়া মহাবিদ্যা অনিরুদ্ধঃ সরস্বতী।। (কুমারীতন্ত্র : ৬/৬)
বিদ্যারাজ্ঞীতি সা প্রোক্তা এতন্মন্ত্রপ্রজপকাঃ।
পরং মুক্তা ভবিষ্যন্তি তদ্গায়ত্রীং জপন্তি চ।। (কুমারীতন্ত্র¿ : ৬/৭)
কালিকায়াঃ প্রভাবেন সর্ব্বে দেবা বিমোহিতাঃ।
ভ্রুণহত্যা-মাতৃবধাৎ পরশুরামো বিমোচিতঃ।। (কুমারীতন্ত্র : ৬/৮)
দত্তাত্রেয়শ্চ ত্রিপুরঃ সুরাপানাদ্বিমোচিতঃ।
ব্রহ্মহত্যা-শিরচ্ছেদাদহং রুদ্রোহপি মোচিতঃ।। (কুমারীতন্ত্র : ৬/৯)
গৌতমস্ত্রীধর্ষণাচ্চ দেবেন্দ্রোহপি বিমোচিতঃ।
কন্যায়া ধর্ষণাদ্বাপি ব্রহ্মাবাচং বিমোচিতঃ।। (কুমারীতন্ত্র : ৬/১০)
চাণ্ডালীগমনাদ্বাপি বশিষ্ঠোহপি বিমোচিতঃ।
রাবণস্য বধাচ্চাপি রামচন্দ্রো বিমোচিতঃ।। (কুমারীতন্ত্র¿ : ৬/১১)

.

অর্থাৎ :
দেবী কহিলেন- হে দেবদেব মহাদেব। আপনি জগৎ প্রলয়কারক। হে প্রভু ! কুলাচারবিধি-নির্দ্দিষ্ট মদ্যাদি পঞ্চমকার অধর্ম্ম অর্থাৎ পাপ সৃষ্টির কারণ। সুতরাং তৎসমুদয় কিরূপে মন্ত্রসিদ্ধি-প্রদায়ক হইতে পারে প্রকাশ করিয়া আপনি আমার সন্দেহ দূর করুন। ১।
ভৈরব কহিলেন- দেবেশি ! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে মুনিগণ কামমোহিত চিত্তে রম্য দারুবনে নিয়ত মদ্যপান এবং পরস্ত্রী ধর্ষণকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। মুনিগণের এই সকল অন্যায় কার্য্য দর্শন করিয়া, বিষ্ণু আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। ২-৩।
তখন বিষ্ণু আমাকে বলিতে লাগিলেন, হে দেবদেব মহাদেব ! আপনি সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়ের কর্ত্তা। হে প্রভো ! দারুবনে কামমোহিত মদ্যপায়ী পাপাত্মা দিগম্বর ও পানমত্ত মুনিগণ পরস্ত্রী ধর্ষণ করিতেছে। ইহাদের কি গতি হইবে। ৪-৫।
হে প্রিয়ে ! তৎকালে বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম, কালিকা-নামক যে মহামন্ত্র এবং অনিরুদ্ধ যাহার সরস্বতী, যাহা মন্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ- এই সকল মুনিগণ সেই মহামন্ত্র জপ করে। সেই কালিকা গায়ত্রী জপ করিয়া ইহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ মুক্তি লাভ করিবে। ৬-৭।
কালিকাদেবীর প্রভাবে দেবতারাও বিমোহিত হইয়া থাকেন। কালিকাদেবীর প্রভাবে পরশুরাম ভ্রূণহত্যা ও মাতৃবধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ৮।
কালিকাদেবীর প্রভাবে দত্তাত্রেয় এবং ত্রিপুর সুরাপানের পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। আমি রুদ্রও স্বয়ং ব্রহ্মহত্যা বা ব্রহ্মার শিরচ্ছেদরূপ পাতক হইতে কালিকাদেবীর প্রভাবেই মুক্তিলাভ করিয়াছিলাম। ৯।
সুরপতি ইন্দ্রও কালিকাদেবীর প্রভাবে গুরুপত্নী গৌতমীতে ধর্ষণজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মাও কন্যাধর্ষণহেতু পাপ হইতে, বশিষ্ঠ চাণ্ডালীগমন পাপ হইতে এবং রামচন্দ্র রাবণবধজনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। ১০-১১।
.
এবং কালিকামন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কিভাবে কুলাচার পালন করতে হবে তারও বর্ণনা রয়েছে কুমারীতন্ত্রে-
ব্রাহ্মণস্তাম্রপাত্রে তু মধুমদ্যং প্রকল্পয়েৎ।
নটী কাপালিকা বেশ্যা রজকী-নাপিতাঙ্গনা।। (কুমারীতন্ত্র : ৬/২১)
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা।
মালাকারস্য কন্যা চ নবকন্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ।। (কুমারীতন্ত্র : ৬/২২)
এতাসু কাঞ্চিদানীয় ততস্ত যোনিমণ্ডলে।
পূজয়িত্বা মহাদেবীং ততো মৈথুনমাচরেৎ।। (কুমারীতন্ত্র : ৬/২৩)
.
অর্থাৎ :
ব্রাহ্মণ তাম্রপাত্রস্থিত মধুকেই মদ্যরূপে কল্পনা করিবে।
নটী, কাপালিকা, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপকন্যা এবং মালাকার

কন্যা- ইহারা নবকন্যা বা গ্রহণীয়া কুলযুবতী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ২১-২২।
এই সকল কুলযুবতী মধ্যে অন্যতমা কুলযুবতী গ্রহণ করিয়া তাহার শক্তিমণ্ডলে কালিকা দেবীর পূজা করিবে। তৎপর কুলযুবতীর মৈথুনে প্রবৃত্ত হইবে। ২৩।

.

বামাচারী তান্ত্রিক সাধনায় দেহজ কামের সাথে আধ্যাত্মিকতা মেশানো এই প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই শুদ্ধ বৈদিক আচার বা সামাজিক রুচি ও সদাচারের পরিপন্থী ছিলো। তাই হয়তো ব্রহ্মবাদীরা একে কদাচারের তুল্য হিসেবে বিবেচনা করতে কার্পণ্য করেননি। অন্যদিকে স্রেফ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত চার্বাক মতাদর্শকেও এই ব্রহ্মবাদীরা নিন্দনীয় দেহজ কামনা-বাসনার দর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করে গেছে সবসময়ই। ফলে এ দুটোকে এক করে দেখানোর প্রবণতা বোধ করি অস্বাভাবিক নয়। তার উপর এই বামাচারী তান্ত্রিক সাধনার নিমিত্তে যখন অতি সম্মান ও জ্ঞানীর আসনে বৃহস্পতির নাম উদ্ধৃত হয়, তখন আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। কেননা বৃহস্পতি তুল্য জ্ঞানবান হওয়ার যে প্রক্রিয়া এই তান্ত্রিক সাধনায় উক্ত হয়েছে, তা রীতিমতো লোমহর্ষক-

বৃহস্পতিসমো যস্তু ভবিতুং কাময়েন্নরঃ।
সর্ব্বো বৃহস্পতিসমো ভবেচ্চৈব ন সংশয়ঃ।। (কুমারীতন্ত্র : ৫/১৯)
সুন্দরীং যৌবনোন্মত্তাং নারীমানীয় নিত্যশঃ।
অষ্টোত্তরশতং জপ্তা কুলমামন্ত্র্য মন্ত্রবিৎ।। (কুমারীতন্ত্র : ৫/২০)
মৈথুনং যঃ করোত্যেব স তু সর্ব্বং ফলং লভেৎ।
তন্মুখে চ মুখং চ দত্ত্বা সহস্রং মানসং জপেৎ।। (কুমারীতন্ত্র : ৫/২১)
স ভবেৎ সর্ব্বসিদ্ধিদো নাত্র কার্য্যবিচারণা।
সর্ব্বেষাং সাধনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ স্যাৎ কুলসাধনম্ ।। (কুমারীতন্ত্র : ৫/২২)
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযতেœন সাধয়েৎ সুসমাহিতঃ।। (কুমারীতন্ত্র : ৫/২৩)।

.

অর্থাৎ :
যে ব্যক্তি বৃহস্পতি তুল্য জ্ঞানবান হইতে ইচ্ছা করে সে ব্যক্তি এই সাধনাপ্রভাবে বৃহস্পতিতুল্য জ্ঞানবান হইয়া থাকে, এতদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১৯।
প্রত্যহ সুন্দরী যৌবনোন্মতা কুলযুবতী আনয়নপূর্ব্বক প্রথমে কুলাগার অভিমন্ত্রিত করিবে। তৎপর মন্ত্রজ্ঞ সাধাক অষ্টোত্তর শতবার কালিকামন্ত্র জপ করিয়া ঐ কুলস্ত্রীর সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপে কুলস্ত্রীর সহিত রতিক্রিয়া সম্পন্ন করিলে সাধক পূর্ণফল লাভ করিয়া থাকে।
রতিকালে কুলযুবতীর মুখে মুখ প্রদান করিয়া এক-সহস্র সংখ্যক মানস জপ করিবে। ২০-২১।
যে ব্যক্তি এইরূপে কার্য্য করে সে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে বিচার বিতর্ক অনাবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার সাধন পদ্ধতির মধ্যে কুলাচারমতে সাধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে অত্যন্ত একাগ্রতার সহিত কুলাচার পদ্ধতিতে সাধন করিবে। ২২-২৩।

.
বৃহস্পতির তুল্য জ্ঞানী হওয়ার এই দেহাচারী তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির নমুনা থেকে প্রতীয়মান হয়, পরবর্তীকালের ভূতচৈতন্যবাদী চার্বাক দর্শনের আদিতে বৃহস্পতির নামেই এই দর্শনটিকে হয়তো নিচু ভোগবাদী মতাদর্শ হিসেবে প্রচারের প্রবণতা কার্যকর ছিলো। এবং তা হয়তো সফলও হয়েছিলো।

.
উল্লেখ্য, সহজ কথায় তান্ত্রিক মতের মূল চেতনা হলো- 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাই আছে দেহভাণ্ডে।' তান্ত্রিক সাধনার এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুরণন আমরা নির্ব্বাণতন্ত্রে দেখতে পাই এভাবে-

মহাব্রহ্মাণ্ডকে যদ্ যদ্ প্রকারং পরমেশ্বরি।
তত্তৎ সর্ব্বং হি দেবেশি বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যতঃ।। (নির্ব্বাণতন্ত্র : ১০/১৯)
তদ্রূপঞ্চ দেহমধ্যে ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
সৃষ্টিপ্রকারব্রহ্মাণ্ডে ভেদো নাস্তি সুনিশ্চিতম্ ।। (নির্ব্বাণতন্ত্র : ১০/২০)।
অর্থাৎ :
হে দেবাধীশ্বরি ! পরমেশ্বরি ! মহাব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যাহা যে প্রকারে রহিয়াছে বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেও সেই সকল সেইভাবে রহিয়াছে। ১৯।
সেইরূপ দেহমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন বর্ত্তমান। সৃষ্টিপ্রকার ব্রহ্মাণ্ডে কোন ভেদ নাই ইহা সুনিশ্চয়রূপে জানিবে। ২০।

.
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ সংস্করণ এই দেহভাণ্ডকে উপলক্ষ করে সাধনমার্গের মাধ্যমেই ব্রহ্মাণ্ডের যে সাধনা বিস্তার তান্ত্রিক বিশ্বাস-সম্মত, এর সাথে ইন্দ্রিয়াতীত কোন সত্তায় অবিশ্বাসী ভূতচৈতন্যবাদী চার্বাক মতের বিরাট দার্শনিক প্রভেদ বর্তমান। তবু হয়তো তাদের মধ্যকার অন্তর্গত সাদৃশ্য কেবল এখানেই যে, দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় উভয়ের লক্ষ্যই দেহপ্রত্যক্ষতা। ভাববাদী বা ব্রহ্মবাদীদের দৃষ্টিতে একটি অনাচারী, অন্যটি বেদবিদ্বেষী। ফলে প্রতিপক্ষ কর্তৃক বিরুদ্ধতার সমান্তরাল অবস্থানে উভয় মত হয়তো তাঁদের কাছে একই রেখায় মিশে গেছে একসময়। আর তাই প্রাচীন জড়বাদী লোকায়ত দর্শনের প্রতি অন্যান্য মতাবলম্বীদের দিক থেকে গুণরত্নের উপরিউক্ত বক্তব্যটি হয়তো এই সাধারণ প্রবণতারই লক্ষণ। চার্বাক মতের আদিরূপ সন্ধানে এই লক্ষণ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।
প্রসঙ্গক্রমে এটাও মনে রাখা আবশ্যক যে, জৈন দার্শনিক গুণরত্ন চার্বাক-বৃহস্পতি-লোকায়তের সাথে তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতিকে মিশিয়ে দিলেও আধুনিককালের অতি-প্রসিদ্ধ বিদ্বান-গবেষক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিন্তু এই লোকায়তের সাথে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের একাত্ম করে উত্তরকালের সহজিয়া সম্প্রদায়কে বৌদ্ধ-সহজযান হিসেবে উল্লেখ করে বৌদ্ধধর্মের অধঃপাতের ফল বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থে বলেছেন যে, নামান্তরের আড়ালে লোকায়তিক সম্প্রদায় আজো আমাদের দেশে টিকে রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তাহলে প্রশ্ন,

সহজিয়া বলতে ঠিক কী বোঝায়? কোত্থেকেই বা এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হলো? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলছেন, এই সহজিয়া সম্প্রদায় বা সহজযান আসলে হলো বৌদ্ধধর্মের অধঃপাতের ফল-

'যে পঞ্চকামোপভোগ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে চরিত্র-বিশুদ্ধি বৌদ্ধধর্মের প্রাণ, যে চরিত্রবিশুদ্ধির জন্য হীনযান হইতেও মহাযানের মহত্ত্ব, যে চরিত্র বিশুদ্ধির জন্য আর্যদেব 'চরিত্র বিশুদ্ধি প্রকরণ' নামে গ্রন্থই রচনা করিয়া গিয়াছেন, সহজযান সেই চরিত্রবিশুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিল। বৌদ্ধধর্ম সহজ করিতে গিয়া, সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম নেড়ানেড়ীর দলে গিয়া দাঁড়াইল। সহজযানীরা সন্ধ্যাভাষায় গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাভাষার অর্থ আলো-আঁধারী ভাষা। কানে শুনিবামাত্র একরকম অর্থ বোধ হয়, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহার গূঢ় অর্থ অতি ভয়ানক। তাঁহারা দেহতত্ত্বের গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন।... যে বোধিচিত্ত মহাযানমতে নির্বাণ পাইবার আশায় ক্রমেই আপনার উন্নতি করিতেছিলেন, দেহতত্ত্বের মধ্যে আসিয়া তাহার যে কী দশা হইল তাহা আর লিখিয়া জানাইব না। জানাইতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়।'
(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড/ বৌদ্ধধর্ম ৮/ পৃষ্ঠা-৩৭৩)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধধর্মের এই ভয়াবহ অধঃপতনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আরো বলছেন-

'বৌদ্ধধর্মে অনেকদিন হইতেই ঘুণ ধরিয়াছিল। বুদ্ধদেব নিজে যেদিন স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষা দিয়া ভিক্ষুণী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন- সেইদিন হইতেই তাঁহাকে সঙ্ঘের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অনেক কঠোর নিয়ম করিতে হইয়াছিল। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের এক বিহারে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ ছয় শত বৎসর পর হইতে ভিক্ষুরা ক্রমে বিবাহ করিতে লাগিল- ক্রমে একদল গৃহস্থ ভিক্ষু হইল। এইখান হইতেই ঘুণ ধরা আরম্ভ হইল।... ভিক্ষুর ছেলে- সে একেবারেই ভিক্ষু হইত।... আমাদের দেশে যেমন 'জাত বৈষ্ণব' বলিয়া একটা জাতি হইয়াছে- সেকালেও তেমনি 'জাত ভিক্ষু' বলিয়া একটা জাতির মত হইয়াছিল। উহাদের যত দলপুষ্টি হইতে লাগিল, আসল ভিক্ষুদের অবস্থা তত হীন হইতে লাগিল। গৃহস্থ ভিক্ষুরা কারিগরি করিয়া জীবন নির্বাহ করিত- ভিক্ষাও করিত- কেন বা রাজমজুর হইত, কেন বা স্যাকরা হইত, কেন বা ছুতার হইত- অথচ ভিক্ষাও করিত, ধর্মও করিত, পুজাপাঠও করিত। বৌদ্ধধর্মের পৌরহিত্যটা ক্রমে নামিয়া আসিয়া কারিগরদের হাতে পড়িল।... লেখাপড়া, বিদ্যাবুদ্ধির নামগন্ধ পর্যন্ত বৌদ্ধদের মধ্যে লোপ পাইল।' (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড/ বৌদ্ধধর্ম ৮/ পৃষ্ঠা-৩৭৯)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মহামহোপাধ্যয়ের এই অনুমান যদি নির্ভুল হয় তাহলে এ-থেকে ঠিক কী সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব? ওই তথাকথিত অধঃপতনের স্বরূপটিকে বিশ্লেষণ করে দেবীপ্রসাদ বলছেন-

'ওই 'অধঃপতিত' বৌদ্ধধর্মের রূপটিকে বিশ্লেষণ করে কি তার মধ্যে শুধুমাত্র স্থূলবুদ্ধি,

নির্বুদ্ধি এবং নিরক্ষরতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে? না, এমন কিছু কিছু নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান এবং বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে যার সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমাদের পরিচয় ঘটেছে? যদি প্রথম সম্ভাবনাটি ঠিক হয় তাহলে মানতে হবে, প্রাকৃতজনের সংস্পর্শে এসে বৌদ্ধধর্মের মহত্তর ও বৃহত্তর আদর্শগুলির স্থূল-ব্যাখ্যা শুরু হয়েছিলো। কিন্তু যদি দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি ঠিক হয়- যদি দেখা যায় বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং জাত-আলাদা কিন্তু সুনির্দিষ্ট কতকগুলি আদিম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান এই তথাকথিত অধঃপাতে-যাওয়া বৌদ্ধধর্মের প্রাণবস্তু হয়ে দাঁড়ালো- তাহলে স্বীকার করতে হবে, সমাজের নিচের মহলের মানুষদের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এসে পড়া সত্ত্বেও তাদের চিন্তাচেতনায় এই বৌদ্ধধর্ম কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। অর্থাৎ, সমাজের নিচের মহলের ওই মানুষদের বিশ্বাসাদির উপর যদিও কৃত্রিমভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রলেপ এসে পড়লো তবুও তারা আসলে তাদের আদিম বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান নিয়েই মেতে রইলো। এই সম্ভাবনা অনুসারে সহজিয়া-সম্প্রদায়কে অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের পরিচায়ক বলে মনে না করে কৃত্রিম বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচায়ক মনে করাই সঙ্গত হবে।’- (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/ লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৪৬০)

বস্তুত এটাই যৌক্তিক যে, সহজিয়া সম্প্রদায়ের উপর বৌদ্ধতত্ত্বের ওই প্রলেপটাই কৃত্রিম এবং অর্বাচীন। তাই একে বৌদ্ধধর্মের অধঃপাতের পরিচায়ক না বলে বরং আদিম জাদুবিশ্বাসের কৃত্রিম বৌদ্ধসংস্করণ মনে করাই ন্যায়সঙ্গত। এবং এই প্রভেদটা এইজন্যই তাৎপর্যপূর্ণ যে, দেবীপ্রসাদের মতে, কেননা, বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের পরিচায়ক হিসেবে গ্রহণ করলে এ-সম্প্রদায়ের মূল কথাগুলিকে বোঝবার সময় বৌদ্ধধর্মের মৌলিক তত্ত্বের উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে হবে এবং দেখতে হবে একদা-মহৎ কতকগুলি ধ্যানধারণা কীভাবে অশিক্ষিত ও মূর্খ মানুষদের চেতনায় স্থূল ও বিকৃত অর্থে প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ-পরিভাষায় কৃত্রিমভাবে সজ্জিত এক আদিম বিশ্বাসের পরিচায়ক বলে গ্রহণ করলে এই সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে ওই বৌদ্ধ-পরিভাষাগুলিই অপ্রাসঙ্গিক বলে স্বীকৃত হবে এবং সে-ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের স্বরূপ উপলব্ধির উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র পদ্ধতি গ্রহণ করবার প্রয়োজন হবে।

এখানে স্মর্তব্য যে, আমরা ইতঃপূর্বে সংশ্লিষ্ট অন্য অধ্যায়ে সিন্ধু-ধর্ম প্রসঙ্গে কৃষিকেন্দ্রিক উর্বরতামূলক আদিম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানে শক্তি-উপাসনার যে সুপ্রাচীন উপাদানগুলির পরিচয় পেয়েছি তার সাথে সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মূল তত্ত্বগুলির বিচার করলেই স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিৎ যে, সমাজ-বিকাশের পিছনদিককার পর্যায়ে আটকে পড়ে থাকা মানুষদের মধ্যেই সেই বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের স্পষ্টতর স্বাক্ষর রয়েছে। তাছাড়া শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনাতেও এমন ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন (বৌদ্ধধর্ম ১০৬), বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল? উত্তরে তিনিই বলছেন, প্রধানত মুসলমান আক্রমণের দরুনই বাংলা দেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয়। কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি। উড়িষ্যার জঙ্গলে, চট্টগ্রামের রাঙামাটিতে আজো ওই (অধঃপতিত) বৌদ্ধধর্মের জীবন্ত নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলগুলি যে প্রধানতই দেশের পিছিয়ে-পড়া মানুষদের অঞ্চল সে-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে দেবীপ্রসাদ প্রশ্ন রাখেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে-সব ধ্যানধারণাকে অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের পরিচায়ক বলে অনুমান করছেন সেগুলি টিকে থাকবার মতো স্বাভাবিক জমি কেন এই পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের মানুষদের মধ্যেই পেলো? এইদিক থেকেও, ওই পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের সঙ্গে এ-জাতীয় ধ্যানধারণার একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক অনুমান করা সঙ্গত নয় কি?

এ-প্রেক্ষিতে আরো বলা বাহুল্য হবে না যে, ওই সহজিয়া সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে গবেষক অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, এ-জাতীয় সম্প্রদায় একটি নয়, বহু। পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে নানান নামের অন্তরালে মূলত ওই একই সম্প্রদায়কে টিকে থাকতে দেখা যায় : কর্তাভজা, বাউল, বৈষ্ণব এবং আরো অনেক নাম। এবং শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই জাতীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে তত্ত্বগত সাদৃশ্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী-২/৩২৫)- 'সহজিয়া, বৈষ্ণব, শৈব, কিশোরীভজা, কর্তাভজা, পরকীয়া-সাধনা- সবই রিরংসার উপর প্রতিষ্ঠাপিত।'
আর নৃতাত্ত্বিক যুক্তি অনুসারে এই জাতীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াই স্বাভাবিক বলে দেবীপ্রসাদ মনে করেন। কেননা, উক্ত ধ্যানধারণার উৎসে যদি কৃষিকেন্দ্রিক জাদু-অনুষ্ঠানই বর্তমান থাকে এবং যদি বাংলাদেশের কৃষকদের উৎপাদন-পদ্ধতিতে খুব বড়ো রকমের মৌলিক উন্নতি দেখা না দিয়ে থাকে, তাহলে তাদের নানান দলের চেতনায় উক্ত ধ্যানধারণাগুলির প্রভাব নানান নামে প্রতিভাত হওয়াই সম্ভব এবং স্বাভাবিক।

যদিও অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন নিজেও এই সহজিয়া সম্প্রদায়কে বৌদ্ধধর্মেরই স্মারক বলে গ্রহণ করতে চেয়েছেন, তবুও তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, আধুনিক বিদ্বানদের এই সিদ্ধান্তটি সহজিয়াদের নিজেদের কাছেই অজ্ঞাত-
'The Sahajias would by no means confess that they were Buddhists, nor refer to any Buddhist texts whick would make it far easier to trace the doctrines to their genuine origin.... It is the duty of a historian and scholar to thrash out grains from the chaff and find out the true Buddhist elements in their views and practices.'
অর্থাৎ : সহজিয়ারা কিছুতেই স্বীকার করবে না যে তারা আসলে বৌদ্ধ। তারা কোনো বৌদ্ধ গ্রন্থেরও উল্লেখ করবে না- তাহলে তাদের মতের প্রকৃত উৎস খুঁজে পাওয়া সহজ হতো।... ঐতিহাসিক ও বিদ্বানের কর্তব্য হলো, ধানকুটে চাল বের করবার মতো করেই সহজিয়াদের মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠান থেকে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের অঙ্গগুলিকে খুঁজে বের করা। (তর্জমা-দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৩৬৩)

ধান কুটে চাল বের করার দৃষ্টান্তটি জুতসই বলা চলে। কেবল কোনটি চাল আর কোনটি

তুষ- এখানেই বিভেদ। দেবীপ্রসাদ বলেন, ওই বৌদ্ধধর্মের অঙ্গগুলিই তুষের মতো- সহজিয়ার স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে এই তুষই বাদ দিতে হবে। বাদ দিলে কী পড়ে থাকে? কৃষিকেন্দ্রিক জাদুঅনুষ্ঠান। আর এর সূত্রের মাথাটা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে সেই সুপ্রাচীন সিন্ধু-যুগের উর্বরতাকেন্দ্রিক আদিম জাদু-বিশ্বাসের মধ্যেই হয়তো। তাহলে আমাদের আলোচ্য লোকায়তিক দর্শনের সাথে ওই সহজিয়া-সম্প্রদায়গুলির সাদৃশ্য কোথায়? মৌলিক তত্ত্বের দিক থেকে হয়তো বা লোকায়তিকদের সঙ্গে এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের কোনভাবে সাদৃশ্য রয়েছে যা গভীর পর্যবেক্ষণের দাবী রাখে। তবে মোটাদাগে অন্তত একটা সাদৃশ্য খুবই দৃশ্যমান যে, সনাতন বেদপন্থীরা মূলত উভয় সম্প্রদায়কেই ঘৃণার চোখে দেখেছেন। আর তার ফলেই তাঁদের মধ্যে এই দুটিকে এক করে দেখা কিংবা উপস্থাপনের উৎসাহ ব্যাপক বলে মনে হয়।

কিন্তু এখানেও প্রশ্ন ওঠা উচিৎ যে, তথাকথিত অধঃপাত নির্ণয়ে বেদপন্থীদের এই উৎসাহ আসলে কতোটা প্রাসঙ্গিক? কেননা লোকায়তিক বা সহজিয়াদের ওই বামাচার বা কামাচার যদি তাঁদের কাছে অবৈদিক ও অধঃপাত হিসেবেই বিবেচিত হয় তাহলে বৈদিক সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত বামাচার বা কামাচার-সদৃশ উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্যগুলিকে বেদপন্থীরা কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

বৈদিক সাহিত্যে বামাচার :
বৈদিক সাহিত্যে বেদ-ত্রয়ীর অন্যতম যজুর্বেদের নিদর্শন দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। শুক্ল-যজুর্বেদ বা বাজসনেয়ী-সংহিতার ২৩/২১ থেকে ২৩/৩১ বেদমন্ত্রগুলিতে কিছু দৃশ্য ও সংলাপের বর্ণনা রয়েছে। কিসের সংলাপ? মৈথুনের। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, এই মৈথুন-দৃশ্যে ও মৈথুন-সংলাপে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা কেউই আজকালকার লম্পটের মতো লোক নন। বরং এরা হচ্ছেন পাঁচজন যজ্ঞীয় ঋত্বিক- অধ্বয্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা প্রমুখ। তার মধ্যে ২৩/২২-২৩ : অধ্বয্যু কুমারীকে অভিমেথন করছেন- দুটি মন্ত্রে অধ্বয্যু ও কুমারীর মধ্যে মৈথুন-সংলাপ। ২৩/২৪-২৫ : ব্রহ্মা মহিষীকে অভিমেথন করছেন- মন্ত্র দুটিতে ব্রহ্মা ও মহিষীর মধ্যে মৈথুন-সংলাপ। ২৩/২৬-২৭ : উদ্গাথা কুমারী বাবাতাকে অভিমেথন করছেন- মন্ত্র দুটিতে অনুরূপ সংলাপ। ইত্যাদি ইত্যাদি।
এক্ষেত্রে বলা আবশ্যক, হরফ প্রকাশনী কলকাতা থেকে প্রকাশিত শুক্লযজুর্বেদ-সংহিতার অনুবাদক ২৩/২০ মন্ত্রের পর আগেভাগেই টীকায় বলেছেন-
'এখান থেকে ৩১ কণ্ডিকা পর্যন্ত মহীধর ভাষ্যে অশ্লীল অর্থ করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক পবিত্র বৈদিক মন্ত্রে এ অশ্লীল অর্থ কেন, তা আমাদের বোধগম্য হয় না। ভাষ্যকার কারণ বলেছেন অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বের সংস্কারের জন্য তা করা হয়েছে। যাজ্ঞিক অর্থ সম্বন্ধে আমাদের বলবার কিছু নেই, তবে মন্ত্রসকলের অন্য অর্থও সম্ভব। আমরা এখানে ভাষ্য অনুযায়ী সাধারণ একটা অর্থ দিয়েছি।'
তার মানে, মন্ত্রের অশ্লীলতাটুকু বাদ দিয়ে ভাষ্যবিহীন সাধারণ একটা অর্থসহ শুক্লযজুর্বেদ-

সংহিতার আলোচ্য অংশটুকু (শুক্লযজুর্বেদ-২৩/২১-৩০) হলো-

উৎসক্থ্যা অবস্তদং ধেহি সমঞ্জিং চারয়া বৃষন্ । য স্ত্রীণাং জীবভোজনঃ।। ২১।। যকাহসকৌ শকুন্তিকাহহহলগিতি বঞ্চতি। আহন্তি গভে পস্যে নিগল্গলীতি ধারকা।। ২২।। যকোহসকৌ শকুন্তক আহলগিতি বঞ্চতি। বিবক্ষত ইব তে মুখমধ্বর্ষো মা নস্ত¡মভিভাষথাঃ।। ২৩।। মাতা চ তে পিতা চ তেহগ্রং বৃক্ষস্য রোহতঃ। প্রতিলামীতি তে পিতা গভে মুষ্টিমতংসয়ৎ।। ২৪।। মাতা চ তে পিতা চ তেহগ্রে বৃক্ষস্য ক্রীড়তঃ। বিবক্ষত ইব তে মুখং ব্রহ্মন্মা ত্বং বদো বহু।। ২৫।।
ঊর্ধ্বামেনামুচ্ছ্রাপয় গিরৌ ভারং হরন্নিব। অথাস্যৈ মধ্যমেধতাং শীতে বাতে পুনন্নিব।। ২৬।।
ঊর্ধ্বমেনমুচ্ছ্রয়তাদ্গিরৌ ভারং হরন্নিব। অথাস্য মধ্যমেজতু শীতে বাতে পুনন্নিব।। ২৭।।
যদস্যা অংহুভেদ্যাঃ কৃধু স্থূলমুপাতসৎ। মুষ্কাবিদস্যা এজতো গোশফে শকুলাবিব।। ২৮।।
যদ্দেবাসো ললামগুং প্রবিষ্টীমিনমাবিষুঃ। সক্থ্না দেদিশ্যতে নারী সত্যস্যাক্ষিভুবো যথা।।
২৯।। যদ্ধরিণো ববমত্তি ন পুষ্টং পশূ মন্যতে। শূদ্রা যদর্যজারা ন পোষায় ধনায়তি।। ৩০।।
অর্থাৎ :
হে বর্ষণকারী অশ্ব, তুমি বীর্য ধারণ কর, যা রমণীগণের জীবন ও ভোজন স্বরূপ। ২১/১।। ক্ষুদ্র পক্ষীর মত কুমারী হলে হলে শব্দ করে যাচ্ছে। ২২/১।। হে অধ্বর্যুগণ, পক্ষীর মত তোমাদের মুখই শব্দ করছে, আমাদের প্রতি এরূপ বলো না। ২৩/১।। তোমার মাতা ও পিতা কাষ্ঠময় মঞ্চকের অগ্রভাগ রোহন করেছিলেন। ২৪/১।। তোমার মাতা ও পিতা পূর্বে মঞ্চকের আগে ক্রীড়া করেছিল। তোমার মুখ যেন আরও বলতে চায়, হে ব্রাহ্মণ, আর বহু কথা বলো না। ২৫/১।।
পর্বতে ভারবাহী ব্যক্তি যেমন পর্বতের উপর ভার রেখে উপরে উঠে, সেরূপ একে উপরে তোল। ঠান্ডা বাতাসে কৃষক যেমন ধান ঝেরে ধান্যপাত্র উপরে রাখে, সেরূপ একে উপরে রাখ। ২৬/১।। পর্বতে ভারবাহী ব্যক্তি যেমন পর্বতের উপর ভার রেখে উপরে উঠে, সেরূপ হে নর, উদ্গাতাকে উর্ধ্বে রাখ। শীতল বায়ুতে কম্পমান লোকের মত একে কাঁপাও। ২৭/১।। জলপূর্ণ গাভীর খুরে মৎস্য যেমন কাঁপে, সেরূপে হ্রস্ব ও স্থূল শিশ্ন যোনি প্রাপ্ত হয়ে কাঁপে। ২৮/১।। যখন দেবগণ ক্রীড়া করে, তখন চোখে দেখা প্রত্যক্ষের মত নারীর উরু দেখা যায়। ২৯/১।। হরিণ ক্ষেত্রস্থ ধান্য ভক্ষণ করলে ক্ষেত্রপতি যেমন সুখী হয় না, সেরূপ শূদ্রা স্ত্রী বৈশ্যগামিনী হলে তার পতি সুখী হয় না। ৩০/১।।

বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় জোর করে এই সাধারণ অর্থ আরোপ থেকে বৈদিক-ভাষায় অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠক এতে কতটুকু কী বুঝবেন জানি না। বোঝার সুবিধার্থে মন্ত্রগুলির প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা-ভাষ্য জরুরি বৈকি। তাই আলোচনার প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় 'লোকায়ত দর্শন' গ্রন্থে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বোঝবার সুবিধার্থে শুক্লযজুর্বেদ-সংহিতার ২৩/২৬-২৭ মন্ত্র দুটির অর্থের সঙ্গে উবটভাষ্যও উদ্ধৃত করেছেন, যা প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়, যেমন-

ঊর্ধ্বামেনামুচ্ছ্রাপয় গিরৌ ভারং হরন্নিব।
অথাস্যৈ মধ্যমেধতাং শীতে বাতে পুনন্নিব।। ২৩/২৬।।
উবটভাষ্য :- উদ্গাতা বাবাতাম্ অভিমেথয়তি ঊর্ধ্বাম্ এনাম্ কম্ চিৎ পুরুষম্ আহ। ঊর্ধ্বম্ এনাম্ বাবাতাম্ উচ্ছ্রিতাম্ কুরু। কথম্ ইব। গিরৌ ভারম্ মধ্যে নিগৃহ্য হরেৎ এবম্ এনাম্ মধ্যে নৃগৃহ্য ঊর্ধ্বাম্ উচ্ছ্রাপয়। অথ যথা ইতি এতস্য স্থানে। তথাচ উচ্ছ্রাপয় যথা অস্যা বাবাতায়া মধ্যম্ যোনিপ্রদেশঃ এধতাম্ । 'এধ্ বৃদ্ধৌ' বৃদ্ধিম্ যায়াৎ অথ এনাম্ গৃহ্ণীয়াঃ। শীতে বাতে পুনন্ ইব। যথা কৃষীবলঃ ধ্যান্যম্ বাতে শুদ্ধম্ কুর্বন্ গ্রহনমোক্ষৌ ঝটিতি করোতি।
ঊর্ধ্বমেনমুচ্ছ্রয়তাদ্গিরৌ ভারং হরন্নিব।
অথাস্য মধ্যমেজতু শীতে বাতে পুনন্নিব।। ২৭।।
উবটভাষ্য :- বাবাতা প্রত্যাহ উদ্গাতারম্ । ভবতঃ অপি এতৎ এবম্ । ঊর্ধ্বম্ এনম্ । উদ্গাতারম্ উচ্ছ্রয়তাম্ উচ্ছ্রাপয়। অত্র স্ত্রী পুরুষায়তে। গিরৌ ভারম্ হরন্ ইব। অথ এবম্ ক্রিয়মাণস্য অস্য মধ্যম প্রজননম্ এজতু চলতু। অথ এনম্ নিগৃহীষ্ শীতে বাতে পুনন্ ইব যবান্ ।
তর্জমা-
২৩/২৬ : এই স্ত্রীকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরো। পর্বতে যেমন করিয়া ভার উত্তোলন করে। অনন্তর ইহার মধ্যদেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। বায়ুতে শুদ্ধ করিতে করিতে...
উবটভাষ্য : উদ্গাতা বাবাতাকে অভিমেথন করিলেন। কোনো পুরুষকে বলিলেন, এই বাবাতাকে উর্ধ্বে তুলিয়া উম্প্রিত করো। কেমন করিয়া? পর্বতে ভারবস্তুকে মধ্যস্থানে ধরিয়া যেমন ভাবে উত্তোলন করা হয় তেমনি ইহাকে মধ্যে ধরিয়া উত্তোলন করো। অনন্তর যাহাতে এই বাবাতার যোনিপ্রদেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেইভাবে ইহাকে ধরো। যেমন কৃষক বায়ুতে ধান্য শুদ্ধ করিতে করিতে গ্রহণ করে ও বপন করে...
২৩/২৭ : ঊর্ধ্বে এই পুরুষকে তুলিয়া ধরো। যেমন করিয়া পর্বতে ভারবস্তুকে উত্তোলন করা হয়। অনন্তর ইহার মধ্যপ্রদেশ চলিতে থাকুক। শীতল বায়ুতে যব শস্য শুদ্ধ করিতে করিতে...
উবটভাষ্য : প্রত্যুত্তরে বাবাতা উদ্গাতাকে বলিল, তোমা কর্তৃকও এই রকমই করা হউক। এই পুরুষকে, অর্থাৎ উদ্গাতাকে, উর্ধ্বে তুলিয়া ধরো। এইখানে স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় আচরণ করিতেছে। পর্বতে যেমন করিয়া ভার তোলে। অনন্তর এইরূপ ক্রিয়মান ইহার মধ্যপ্রদেশ চলিতে থাকুক, অর্থাৎ মৈথুন চলিতে থাকুক। অনন্তর ইহাকে চাপিয়া ধরো। যেমন কৃষক শীতল বায়ুতে যব শুদ্ধ করিতে করিতে ঝটিতে গ্রহণ এবং বপন করে...

সাধারণ পাঠক নিশ্চয়ই এই দুটি বেদমন্ত্রের আভাসিত অর্থ যাচাইয়ের মাধ্যমে পূর্ব-উদ্ধৃত অন্য মন্ত্রগুলির অন্তর্গত বিশেষ অর্থও অনুধাবনে সমর্থ হবেন আশা করি। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো মৈথুন-সংলাপের মধ্যে ক্ষেত্রে বীজ বপনের দৃষ্টান্তের ব্যবহার। তার মানে বামাচারের সঙ্গে বার্ত্তা-বিদ্যার সংযোগ শুধুমাত্র কাপালিক-লোকায়তিক সম্প্রদায়ের

মধ্যেই নয়, খোদ বৈদিক ঐতিহ্যেও একই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বেদপন্থীদের জন্য এখানে সমস্যা হলো রচনাটি খোদ বৈদিক ঋষিদেরই।
‘অবশ্যই, পরের যুগের বেদপন্থীরা এই মন্ত্রগুলি নিয়ে খুবই বিপদে পড়েছেন। তার কারণ, তাঁদের উত্তরযুগের রুচির সঙ্গে এগুলি কিছুতেই খাপ খায় না। তাই পরের যুগে এমনকি বিধান দেওয়া হয়েছে, এই বৈদিক মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করবার জন্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের মূলে নিশ্চয়ই পাপ-বোধ। অথচ, পুরাকালে বৈদিক ঋষিরা যদি সত্যিই একে পাপাচরণ মনে করতেন তাহলে নিশ্চয়ই তার জন্য পাঁচ-পাঁচজন যজ্ঞীয় ঋত্বিককে নিয়োগ করতে চাইতেন না। তাই তাঁদের কাছে পুরো ব্যাপারটাই যে একটি বৈদিক যজ্ঞ-বিশেষ সে-বিষয়ে কোনো রকম সন্দেহেরই অবকাশ নেই। বস্তুত, বেদের ছাত্রমাত্রই জানেন এই মন্ত্রগুলির সঙ্গে অশ্বমেধ যজ্ঞের কী রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।’- (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/ লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-১০৫)

কিন্তু প্রশ্ন হলো, মৈথুনের সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞের কী সম্পর্ক? বিষয়টা নিশ্চয়ই কৌতুহলজনক। তবে যজ্ঞ মানে যাই হোক না কেন, অনেক জায়গায় দেখা যায় প্রাচীনেরা মৈথুনকেও সরাসরি যজ্ঞের মতোই মনে করেছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের শেষের দিকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়-

‘এষাং বৈ ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপোহপাম্ ওষধয়, ওষধীনাং পুষ্পাণি, পুষ্পাণাং ফলানি, ফলানাং পুরুষঃ, পুরুষস্য রেত। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/১)।। সহ প্রজাপতিরীক্ষাঞ্চক্রে হন্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠাং কল্পয়ানীতি। স স্ত্রীয়ং সসৃজে। তাং সৃষ্টবাধ উপাস্ত; তস্মাৎ স্ত্রিয়মধ উপাসীত। স এতং প্রাঞ্চং গ্রাবাণমাত্মন এব সমুদপারয়ৎ। তেন এনাম অভ্যসৃজৎ। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/২)।। তস্যা বেদিরুপস্থো, লোমানি বর্হিশ্চর্মাধিষবণে, সমিদ্ধ্যো মধ্যতস্তৌ মুস্কৌ। স যাবান্ হ বৈ বাজপেয়ন যজমানস্য লোকে ভবতি, তাবানস্য লোকো ভবতি, য এবং বিদ্বান্ অধোপহাসং চরত্যাসাং স্ত্রিয়ঃ সুকৃতং বৃঞ্জতে। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/৩)।।
অর্থাৎ :
যাবতীয় ভূতের রস এই পৃথিবী। জল পৃথিবীর রস। ওষধি লতা-পাতা জলের রস। ফুল ওষধির রস। ফল ফুলের রস। ফলের সার পুরুষ। রেতঃ বা জীববীজ পুরুষের রস বা নির্যাস। এইভাবে ক্রমানুসারে পুরুষদেহে এলো সৃষ্টির বীজ- বীর্য। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/১)।। সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি সেই জীববীজকে দেখে চিন্তিত হলেন- এর উপযুক্ত আধার (পাত্র) কোথায়? অনেক ভেবে তিনি এর পাত্ররূপে সৃষ্টি করলেন নারীকে, স্ত্রীকে। সৃষ্টি করে, তিনি তাকে নিচে রেখে তার অধোদেশে মিলিত হয়ে মৈথুনকর্মের উপাসনা করেছিলেন। সেই কারণে, আজও পুরুষ স্ত্রীকে নিচে রেখেই তার অধোদেশে মৈথুনের উপাসনা করে আসছে। প্রজাপতি তাঁর সোমলতা পেষার পাষাণদণ্ড বা নোড়ার মতো সুকঠিন জননেন্দ্রিয় বা পুরুষাঙ্গ দিয়ে সেই স্ত্রী সংসর্গ করে তাকে গর্ভবতী করেছিলেন। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/২)।। তার (স্ত্রীলোকটির) উপস্থ অর্থাৎ নিম্নাঙ্গ বা নিতম্ব হলো যজ্ঞের বেদী, তার লোমরাজি কুশ বা

যজ্ঞ-তৃণ, তার চর্মাবরণ আশ্রয় বা অধিযবন (=সোমরস নিষ্কাশনের যন্ত্র), তার মধ্যস্থল প্রদীপ্ত অগ্নি, মুষ্কদ্বয় অর্থাৎ দুদিকের দুটি স্থূল মাংসপিণ্ড হোমকুণ্ডের দুদিকের দুই ফলক বা পাথরের আড়াল। বাজপেয় যজ্ঞ যারা করে তারা যে সুফল পায়, স্ত্রীর নিম্নাঙ্গকে যারা এইভাবে দেখে, তারাও সেই সুফল পায়। এটি জেনে যে 'অধোপহাস' অর্থাৎ মৈথুন কর্ম করে, সে স্ত্রী দ্বারা নিজে শক্তিমান হয়। আর যে এ তত্ত্ব না জেনে মৈথুন করে সে তার সুকৃতি স্ত্রীকে দেয়। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/৩)।।

এ-রকম প্রকট বামাচারী চিন্তা কিন্তু উপনিষদে মাত্র একবারই উঁকি দেয়নি, ছান্দোগ্য উপনিষদেও দেখা যায় ছান্দোগ্যের ঋষি বলছেন-

যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিদ্ যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চির্যদন্তঃ করোতি তেহঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ। (ছান্দোগ্য-৫/৮/১)।। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি। (ছান্দোগ্য-৫/৮/২)।।
অর্থাৎ :
হে গৌতম, স্ত্রীলোকই হলো যজ্ঞীয় অগ্নি। তার উপস্থই হলো সমিধ। ওই আহ্বানই হলো ধূম। যোনিই হলো অগ্নিশিখা। প্রবেশ-ক্রিয়াই হলো অঙ্গার। রতিসম্ভোগই হলো বিস্ফুলিঙ্গ। (ছান্দোগ্য-৫/৮/১)।। দেবতারা এই অগ্নিতে রেত বা শুক্র আহুতি দেন। সেই আহুতি থেকেই গর্ভ সম্ভব হয়। (ছান্দোগ্য-৫/৮/২)।।
এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদেও হুবহু এ-কথারই প্রতিধ্বনি দেখা যায়-

'যোষা বা অগ্নির্গৌতম। তস্যা উপস্থ এব সমিৎ, লোমানি ধূমো। যোনিরর্চিঃ। যদন্তঃ করোতি তেহঙ্গারা, অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি। তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সংভবতি। স জীবতি যাবজ্জীবত। অথ যদা ম্রিয়তে। (বৃহদারণ্যক-৬/২/১৩)।।
অর্থাৎ :
গৌতম, যোষা অর্থাৎ স্ত্রী যজ্ঞের অগ্নি। তার উপস্থদেশ হলো সেই অগ্নির সমিধ বা ইন্ধন। (উপস্থদেশের) লোমরাজি হলো সেই ইন্ধনের ধোঁয়া। যোনিদেশ হলো সেই অগ্নির শিখা। মৈথুন হলো অঙ্গার। আর শীৎকারাদি যে ক্ষণিক পুলক শিহরণ, তা হচ্ছে সেই যজ্ঞাগ্নির স্ফুলিঙ্গ। এই যজ্ঞাগ্নিতে দেবতারা সেই রেতঃ বা জীববীজ আহুতি দেন। তা থেকে উৎপন্ন হয় পুরুষ (প্রজাতি)। যতদিন প্রাণ থাকে, সেই সন্তান বেঁচে থাকে। তারপর মারা যায়। (বৃহদারণ্যক-৬/২/১৩)।।

অতএব বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উপনিষদের অতি প্রসিদ্ধ ঋষিরাই মৈথুন-ক্রিয়াকে খোলাখুলিভাবেই যজ্ঞ বলে উল্লেখ করেছেন। এবং কথায় কথায় সোমযাগ থেকে উপমা নেয়ার চেষ্টাটাও লক্ষ্য করবার মতো বলে দেবীপ্রসাদ তাঁর লোকায়ত দর্শন গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন। আমাদের আধুনিক রুচিতে এ-সব কথাবার্তা যতোই কদর্য লাগুক না কেন (যেমন

আধুনিককালের স্বামী লোকেশ্বরানন্দও তাঁর উপনিষদ গ্রন্থে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫/৮/১-২ শ্রুতির বাংলা তর্জমা প্রায় গোটাটাই ফাঁকা রেখে এড়িয়ে গেছেন), উপনিষদের ঋষিরা এই তত্ত্বটির প্রতিই যে কতোখানি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় নানান দিক থেকে। যেমন বৃহদারণ্যকের ঋষি এই তত্ত্ব বলবার পরই তিনজন প্রাচীন জ্ঞানীর নজির দেখিয়ে বলেছেন, বিদ্বান উদ্দালক আরুণি, বিদ্বান নাক মৌদ্গল্য ও বিদ্বান কুমারহারিত- এই তিনজনই নাকি এই তত্ত্ব জানতেন এবং সেই মর্মে উপদেশ দিয়েছেন। এবং এই তত্ত্বের অসাধারণ গুরুত্ব বিবেচনায় বৃহদারণ্যকের ঋষি আরো এগিয়ে উপদেশ প্রদান করতে করতে বলছেন-

এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ বিদ্বান্ উদ্দালক আরুণিয়াহ, এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ বিদ্বান্ নাকো মৌদ্গল্য আহৈতদ্ধ স্ম বৈ তৎ বিদ্বান্ কুমারহারিত আহ-বহবো মর্যা ব্রহ্মণায়না নিরিন্দ্রিয়া বিসুকৃৎতোহস্মাল্লোকাৎ প্রষন্তি য ইদম্ অবিদ্বাংসোহধোপহাসং চরন্তীতি বহু বা ইদং সুপ্তস্য বা জাগ্রতো বা রেতঃ স্কন্দতি। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/৪)।। অথ যদ্ উদক আত্মানং পশ্যেৎ তদভিমন্ত্রয়েত-মরি তেজ ইন্দ্রিয়ং যশো দ্রবিণং সৃকৃতমিতি শ্রীর্হ বা এষা স্ত্রীণাং যন্মলোৎবাসাঃ তস্মাৎ মলোৎবাসসং যশস্বিনীম্ অভিক্রম্য উপমন্ত্রয়েতে। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/৬)।। সা চেদস্মৈ ন দদ্যাৎ কামমেনাম্ অবক্রীণীয়াৎ। সা চেদস্মৈ নৈব দদ্যাৎ কামমেনাং যষ্ট্যা বা পামিনা বোপহত্যা অতিক্রামেৎ ইন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদদ ইতি। যশা এব ভবতি। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/৭)।। সা চেদস্মৈ দদ্যাৎ ইন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদধামীতি যশাস্বিনৌ এব ভবতঃ। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/৮)।। স যামিচ্ছেৎ কাময়েত মেতি তস্যাং অর্থং নিষ্ঠাং, মুখেন মুখং সন্ধ্যায় উপস্থমস্যা অভিমৃশ্য জপেৎ অঙ্গাদঙ্গাৎ সংভবসি, হৃদয়াৎ অধিজায়সে, স ত্বং অঙ্গকষায়োহসি দিগ্ধবিদ্ধামিব মাদয় ইমাম্ অমূং ময়ীতি। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/৯)।।
অর্থাৎ :
(বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠানের মতোই এই অধোপহাস অর্থাৎ মৈথুনকর্ম জেনে) বিদ্বান উদ্দালক আরুণি, মুদ্গল-তনয় নাক ঋষি, কুমারহারিত বলেছিলেন- নামেমাত্র ব্রাহ্মণ, এমন অনেকে আছে যারা এই বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান না জেনে স্ত্রীসংসর্গ এবং মৈথুনকর্ম করার ফলে বিকলেন্দ্রিয় হয়ে এবং সুকৃতি হারিয়ে মারা যায়। জাগ্রত কিংবা ঘুমন্ত, যে কোন অবস্থাতেই তাদের অনেক-অনেক বীর্যস্খলন ঘটে। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/৪)।। যদি কেউ জলে স্খলিত বীর্য হয়ে নিজের ছায়া দেখে তবে সে নিজের মঙ্গলের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা জানাবে-'ময়ি তেজ...সুকৃতম্' অর্থাৎ আমার তেজ, ইন্দ্রিয়শক্তি, যশ, ধন, সৌভাগ্য দেবতারা আমায় দান করুন। যে নারী মলোদ্বাসা অর্থাৎ ঋতুকালীন মলিন-বসন পরিত্যাগ করেছে সে নারীদের মধ্যে শ্রীযুক্তা বা লক্ষ্মীস্বরূপা। অতএব মলোদ্বাসা সেই সৌভাগ্যবতী নারীতে গর্ভাধান করার জন্য পুরুষ তাকে আমন্ত্রণ জানাবে, আহ্বান করবে। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/৬)।। যদি সেই নারী পুরুষকে কাম দিতে রাজী না হয়, তবে প্রথমে উপহার সামগ্রি দিয়ে তাকে নিজের বশে আনার চেষ্টা করবে। যদি তাতেও সে সাড়া না দেয় তবে সেই স্ত্রীকে হাত বা লাঠি দিয়ে প্রহার করে অভিভূত করে বলবে 'ইন্দ্রিয়েণ তে...আদদ' অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়শক্তিরূপ

যশ দিয়ে আমি তোমার যশ কেড়ে নিচ্ছি। এই বলে তাতে উপগত হবে। তখন সেই নারী বশে আসতে বাধ্য হবে। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/৭)।। আর আহ্বান-মাত্রেই যদি সে স্ত্রী পুরুষের কামনাকে চরিতার্থ করার জন্য নিজেকে দান করতে চায়, বলবে 'ইন্দ্রিয়েণ...আদধাম'- অর্থাৎ, আমার ইন্দ্রিয়রূপ যশ দিয়ে তোমাকে যশস্বী করছি। এতে নারী-পুরুষ, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যশস্বী হয়, সুখী হয়। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/৮)।। পুরুষ যদি নারীটিকে কামনাপরায়ণা করে তুলতে চায়, তবে সে স্ত্রী-অঙ্গে নিজের অর্থ অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ সংযোগ করে, মুখে মুখ রেখে বা মুখচুম্বন করে স্ত্রীর উপস্থ অর্থাৎ নিতম্ব ছুঁয়ে এই মন্ত্র জপ করবে-'অঙ্গাদঙ্গাৎ...ময়ীতি'- অর্থাৎ, হে রেতঃ, তুমি উৎপন্ন হয়েছো আমার প্রতিটি অঙ্গ হতে, তোমার জন্ম আমার হৃদয়ে। তুমি আমার সর্বাঙ্গের রস। বাণবিদ্ধা হরিণীর-মতো তুমি এই নারীকে বিদ্ধ করো। রসসিক্তা করে একে আনন্দে অধীরা করে তোলো। (বৃহদারণ্যক-৬/৪/৯)।।

বলাই বাহুল্য, আজকের দিনে এ-ধরনের উপদেশ দিতে গেলে ঋষির গৌরব পাবার বদলে কপালে কী ঘটবে ! কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঋষি মেয়েদের লাঠি-পিটে, কিলচড় লাগিয়ে কামভাব চরিতার্থ করতে দিতে বাধ্য করবার উপদেশ দিয়েও নাজেহাল হয়েছিলেন বলে কোথাও লেখা নেই। বরং তাঁর রচিত গ্রন্থকে প্রাচীনেরা জ্ঞানের আকর বলেই মনে করেছেন। আর তাতেই প্রমাণ হয় মৈথুন ও কাম সম্বন্ধে আজকের দিনের ধারণার সঙ্গে সেকালের মানুষদের ধারণার একেবারে আকাশ-পাতাল তফাত। এবং এ-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যখন দেখা যায় মহাভারতের যুগে এসেই এ-বিষয়ে পুরনো কালের ধ্যানধারণার সঙ্গে নতুন কালের ধ্যনধারণাগুলি আর মিল খাচ্ছে না। যেমন, মহাভারতের আদিপর্বের ১১৬ অধ্যায়ে বর্ণিত হচ্ছে (মহাভারত-আদিপর্ব-১১৬/৩-২১)-

অথ ত্বিদং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মতত্ত্বং নিবোধ মে।
পুরাণমৃষিভির্দৃষ্টং ধর্ম্মবিদ্ভির্মহাত্মভিঃ।। ৩।।
অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে!।
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি!।। ৪।।
তাসাং ব্যুচ্চরমাণানাং কৌমারাৎ সুভগে! পতীন্ ।
নাধর্ম্মোহভূদ্বরারোহে! স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।। ৫।।
তঞ্চৈব ধর্ম্মং পৌরাণং তির্য্যগ্-যোনিগতাঃ প্রজাঃ।
অদ্যাপ্যনুবিধীয়ন্তে কামদ্বেষবিবর্জিতাঃ।। ৬।।
প্রমাণদৃষ্টো ধর্ম্মোহয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ।
উত্তরেষু চ রম্ভোরু! কুরুষ্বদ্যাপি পূজ্যতে।
স্ত্রীণামনুগ্রহকরঃ স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।। ৭।।
অস্মিংস্তু লোকে নচিরান্মর্য্যাদেয়ং শুচিস্মিতে!।
স্থাপিতা যেন যস্মাচ্চ তন্মে বিস্তরতঃ শৃণু।। ৮।।

বভূবোদ্দালকো নাম মহর্ষিরিতি নঃ শ্রুতম্ ।
শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতঃ পুত্রস্তস্যাভবন্মুনিঃ।। ৯।।
মর্য্যাদেয়ং কৃতা তেন ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা।
কোপাৎ কমলপত্রাক্ষি! যদর্থং তন্নিবোধ মে।। ১০।।
শ্বেতকেতোঃ কিল পুরা সমক্ষং মাতরং পিতুঃ।
জগ্রাহ ব্রাহ্মণঃ পাণৌ গচ্ছাব ইতি চাব্রবীৎ।। ১১।।
ঋষিপুত্রস্ততঃ কোপং চকারামর্ষচোদিতঃ।
মাতরং তাং তথা দৃষ্ট্বা নীয়মানাং বলাদিব।। ১২।।
ক্রুদ্ধন্তু তং পিতা দৃষ্ট্বা বেপমানমুবাচ হ।
মা তাত! কোপং কার্ষীস্ত্বম্ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।। ১৩।।
অনাবৃতা হি সর্ব্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি।
যথা গাবঃ স্থিতাস্তাত! স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজাঃ।। ১৪।।
তথৈব চ কুটুম্বেষু ন প্রমাদ্যন্তি কর্হিচিৎ।
ঋতুকালে তু সম্প্রাপ্তে ভর্ত্তারং ন জহুস্তদা।। ১৫।।
ঋষিপুত্রস্তু তং ধর্ম্মং শ্বেতকেতুর্ন চক্ষমে।
চকার চৈব মর্য্যাদামিমাং স্ত্রীপুংসয়োর্ভুবি।। ১৬।।
মানুষেষু মহাভাগে! ন ত্বেবান্যেষু জন্তুষু।
ততঃ প্রভৃতি মর্য্যাদা স্থিতেয়মিতি নঃ শ্রুতম্ ।। ১৭।।
ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিং নার্য্যা অদ্যপ্রভৃতি পাতকম্ ।
ভ্রূণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্ ।। ১৮।।
ভার্য্যাং তথা ব্যুচ্চরতঃ কৌমারব্রহ্মচারিণীম্ ।
পতিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকং ভুবি।। ১৯।।
পত্যা নিযুক্তা যা চৈব পত্নী পুত্রার্থমেব চ।
ন করোতি বচস্তস্যা ভবিষ্যত্যেতদেব হি।। ২০।।
ইতি তেন পুরা ভীরু! মর্য্যাদা স্থাপিতা বলাৎ।
উদ্দালকস্য পুত্রেণ ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা।। ২১।।
অর্থাৎ :
তার পর, ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা ঋষিরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আমি সেই প্রাচীন ধর্ম্মতত্ত্ব তোমার নিকট বলিব; শ্রবণ কর। ৩।। চারুহাসিনি! পূর্ব্বকালে সকল স্ত্রীলোকই অনবরুদ্ধ ছিল এবং তাহারা ইচ্ছা অনুসারে বিহার করিয়া বেড়াইত এবং স্বাধীন ছিল। ৪।। সুন্দরি! তাহারা বিবাহের পর হইতে পতিকে ছাড়িয়া ইচ্ছানুসারে অন্য পুরুষের সহিত বিচরণ করিত; তাহাতে তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। কেন না, তাহাই প্রাণিগণের চিরন্তন স্বভাব। ৫।। মনুষ্যভিন্ন প্রাণীরা আসক্তি ও বিদ্বেষশূন্য হইয়া এখনও সেই প্রাচীন ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। ৬।। মহর্ষিরাও প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন বলিয়া এই ব্যবহারের আদর করেন এবং উত্তর কুরুদেশে এখনও এই ব্যবহার আদৃত হইয়া থাকে; আর, এই আচার স্ত্রীলোকদিগের প্রতি

অনুগ্রহসূচক এবং চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। ৭।। সুন্দরি! অধিক কাল হয় নাই; যে কারণে যিনি এই দেশে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা তুমি বিস্তরক্রমে আমার নিকট শ্রবণ কর। ৮।।
আমাদের শুনা আছে- উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন; শ্বেতকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন, তিনিও মুনি ছিলেন। ৯।। পদ্মনয়নে! সেই শ্বেতকেতু যে কারণে ক্রোধবশতঃ এই ন্যায়সঙ্গত নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট শোন। ১০।। একদা এক ব্রাহ্মণ সেই উদ্দালকের সমক্ষে শ্বেতকেতুর মাতার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, 'চল, আমরা যাই'। ১১।। তাহার পর, বলপূর্ব্বকই যেন মাতাকে সেইভাবে লইয়া চলিয়াছে- ইহা দেখিয়া শ্বেতকেতু অসহিষ্ণুতাবশতঃ ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। ১২।। কিন্তু তখন পিতা উদ্দালক, পুত্র শ্বেতকেতুকে ক্রোধকম্পিত দেখিয়া বলিলেন- 'বৎস! তুমি ক্রোধ করিও না; ইহাই স্ত্রীলোকদিগের চিরাচরিত নিত্যধর্ম্ম। ১৩।। জগতে সকল বর্ণের স্ত্রীলোকেরাই অনবরুদ্ধ; সুতরাং গরুগুলি যেমন স্বেচ্ছাচারিণী, মনুষ্যরমণীরাও তেমন আপন আপন বর্ণে স্বেচ্ছাচারিণীই হইয়া থাকে। ১৪।। তবে তাহারা কখনও রন্ধনাদি গৃহকার্য্যে অনবধানতা করিত না, কিংবা ঋতুকালে ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সংসর্গ করিত না'। ১৫।। ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু সে প্রাচীন আচার সহ্য করিলেন না; কিন্তু জগতে সকল স্ত্রী-পুরুষের জন্যই এই নিয়ম স্থাপন করিলেন। ১৬।। কুন্তি! আমাদের শুনা আছে যে, তদবধি এই নিয়ম কেবল মনুষ্যসমাজেই চলিয়াছে; কিন্তু অন্য প্রাণীর মধ্যে নহে। ১৭।। 'আজ হইতে যে রমণী পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সংসর্গ করিবে, তাহার ভ্রূণহত্যা তুল্য ঘোরতর দুঃখজনক পাপ হইবে। ১৮।। আবার, কন্যাকালে ব্রহ্মচারিণী এবং বিবাহের পর পতিব্রতা- এহেন ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া যে পুরুষ অন্য স্ত্রীর সংসর্গ করিবে, তাহারও এই পাপই হইবে। ১৯।। আর, যে রমণী ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করিবার জন্য পতির আদেশ পাইয়াও সে আদেশ পালন করিবে না, তাহারও এইরূপ পাপই হইবে'। ২০।। কুন্তি! পূর্ব্বকালে উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু তপোবলে এই ধর্ম্মসঙ্গত নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন। ২১।।

যৌনজীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা যে একটি বিশেষ যুগেই বদলেছে- আগে একরকম ছিলো, পরে অন্যরকম হলো- উদ্ধৃত শ্বেতকেতুর কাহিনীটাই এ-কথার স্পষ্ট প্রমাণ হতে পারে। যদিও সেই যুগ বলতে ঠিক কোন যুগ,- কোন যুগ থেকে কামজীবন সম্বন্ধে আধুনিক ধ্যানধারণার শুরু,- এ-প্রশ্ন অবশ্যই স্বতন্ত্র। কিন্তু সেকালের ধারণাটা ঠিক কী রকম বা কীরকম ধারণার বশবর্তী হলে বৈদিক ঋষিদের পক্ষে কামজীবনকে এতাটা গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক মনে করা সম্ভবপর?
এর-জবাবে দেবীপ্রসাদ বলেন, 'এ-প্রশ্নের পুরো জবাবটা অবশ্যই শুধুমাত্র বৈদিক সাহিত্যের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না।... কিন্তু, যেটা খুবই বিস্ময়ের কথা, এ-বিষয়ে বৈদিক সাহিত্য আমাদের সম্পূর্ণ নিরাশ করে না। উপনিষদ এবং বিশেষ করে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির কাছ থেকেই প্রশ্নটার অন্তত আংশিক উত্তর পাওয়া যাচ্ছে।'- (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-১০৯)

কী উত্তর? এ-প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ হিসেবে ছান্দোগ্য-উপনিষদের বামদেব্য-ব্রতের কথা উল্লেখ করেছেন। ‘বামদেব্য’ নামটা এখানে উল্লেখযোগ্য। কেননা তাঁর মতে, বৈদিক সাহিত্যেও যে বামাচারের স্মারক রয়েছে তার একটি স্পষ্ট নিদর্শন ওই নামেই মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। এই বামদেব্য-ব্রত সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদে (ছান্দোগ্য-২/১৩) বলা হয়েছে-

‘উপমন্ত্রয়তে স হিঙ্কারো জ্ঞপয়তে স প্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে সঃ উদ্গীথঃ প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনমেতদ্-বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্’। (ছান্দোগ্য-২/১৩/১)।।
‘স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনীভবতি মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্-জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্ ব্রতম্’। (ছান্দোগ্য-২/১৩/২)।।
অর্থাৎ :
মৈথুনে লিপ্ত হওয়ার আগে যে পুরুষ স্ত্রীলোককে আহ্বান করে সেই হলো পঞ্চবিধ সামের প্রথম সাম ‘হিঙ্কার’। স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা বা তাকে সন্তুষ্ট করা হলো দ্বিতীয় সাম ‘প্রস্তাব’। স্ত্রীর সঙ্গে শয্যায় শয়ন হলো ‘উদ্গীথ’। সঙ্গমের প্রাক-মুহূর্তে স্ত্রীর অভিমুখ হয়ে শয়ন করা ‘প্রতিহার’। মিথুন-অবস্থায় থাকা হলো ‘নিধন’। আবার চরিতার্থতাও ‘নিধন’। এই বামদেব্য নামক সাম মিথুনে প্রতিষ্ঠিত। (ছান্দোগ্য-২/১৩/১)।।
যে এইভাবে বামদেব্য সামকে মিথুনে প্রতিষ্ঠিত বলে জানে সে নিয়ত মিথুনে মিলিত হয়। (তার) প্রত্যেক মিথুন থেকেই প্রজার (সন্তানের) উৎপত্তি হয়। সে পূর্ণজীবী হয়। সন্তান, পশু ও কীর্তিতে মহান হয়। কোনো স্ত্রীলোককেই পরিহার করবে না- এই-ই ব্রত। (ছান্দোগ্য-২/১৩/২)।।

অতএব, বামদেব্য ব্রতে- ‘মিথুনাৎ মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি জ্যোক্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা’- এই হলো আসল কথা। মিথুন থেকে কী কী পাওয়া যাবে? তালিকা হলো-
সন্তান পাওয়া যাবে।
পূর্ণ জীবন পাওয়া যাবে।
পশু পাওয়া যাবে।
মহান কীর্তির নামডাক পাওয়া যাবে।

এখানে কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়টি হলো, উপনিষদের ঋষি মৈথুনকে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনেরই উপায় মনে করছেন না, সেই সঙ্গেই ধন-উৎপাদনের উপায় বলেও বর্ণনা করছেন। উপনিষদের যুগেও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনেকখানিই পশুপালনমূলক বলে আমরা জানি, তাই ধনউৎপাদন বলতে প্রধানতই পশুবৃদ্ধি। আর এই ধারণার দরুনই মিথুনকে এতোটা জরুরি বলে মনে করা হচ্ছে যে, উপনিষদের ঋষি মিথুনের বিভিন্ন স্তরকে যজ্ঞের

হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার প্রভৃতি পঞ্চবিধ সামগানের সঙ্গে এক বলে বর্ণনা করছেন। শুধু তাই নয়, উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্ ব্রতম্'- কোনো স্ত্রীলোককেই পরিহার করবে না, এই-ই ব্রত।

তাহলে, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রাচীনদের মনে মিথুন সম্বন্ধে ধারণাটা ঠিক একালের আমাদের মতো নয়। আমাদের ধারণায় মিথুন থেকে কী পাওয়া যায়? উত্তর হলো, সন্তান। কিন্তু প্রাচীন ঋষিদের ধারণায় মিথুন থেকে কী পাওয়া যায়? শুধু সন্তান নয়, ধনসম্পদও। আমাদের ধারণায় সন্তান উৎপাদনের সঙ্গে ধনসম্পদ উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাঁদের ধারণায়, ধনসম্পদ উৎপাদন ও সন্তান উৎপাদন- দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক বড়ো গভীর। কিন্তু কোন্ ধারণা সঠিক এ-নিয়ে কি তর্ক তোলার আদৌ দরকার আছে? এ-প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ বলেন-
'এখন, আমাদের ধারণাটা ঠিক না তাঁদের ধারণাটা ঠিক, এ-নিয়ে তর্ক তোলবার দরকার নেই। অবশ্যই, এ-বিষয়ে আমাদের ধারণা তাঁদের চেয়ে অনেক স্পষ্ট, অনেক নির্ভুল। তার তুলনায়, তাঁদের ধারণাটার প্রায় পরেরো আনাই কল্পনা। কিন্তু যেটা আসলে ঢের বড়ো কথা, তাঁদের যুগে তাঁদের মনে এই রকমের একটা কল্পনা সত্যিই ছিলো, ছিলো ওই রকমের একটা ভুল ধারণা। তাই তাঁদের লেখা পুঁথিপত্র আমরা যদি বুঝতে চাই তাহলে আমাদের একালের ধ্যান-ধারণাগুলিকে তাঁদের লেখার উপর আরোপ করে বসলে প্রকাণ্ড ভুল হবে- ঠিক কী ভেবে তাঁরা কী লিখেছিলেন সে-কথা আমরা বুঝতেই পারবো না।'- (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-১১০)

দেবীপ্রসাদ আরো বলেন (লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-১১১), 'তাঁদের মনে যে সত্যিই ওই রকমের একটা ধারণা ছিলো এ-কথার প্রমাণ শুধুই উপনিষদ নয়, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিও। বরং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে এই কথা এতোবার এবং এতো স্পষ্টভাবে তাঁরা লিখে রেখেছেন যে সেদিকে চোখ না পড়াটাই বিস্ময়কর। স্থানসংকুলানের খাতিরে আমরা এখানে মাত্র একটি নমুনার উল্লেখ করতে পারবো; উৎসাহী পাঠক...অন্যান্য বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাবেন। আমাদের এই দৃষ্টান্তটি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম পঞ্চিকা প্রথম অধ্যায় থেকে সংগৃহিত, তর্জমা শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ/৬-৭) :
'যে যজমান আপনাকে অপ্রতিষ্ঠিত মনে করে সে ঘৃতপক্ক চরু নির্বাপন করিবে। (অপ্রতিষ্ঠিত অর্থে, পুত্রাদিরহিত ও গবাদিরহিত)।
হে বৎস, যে এইরূপ প্রতিষ্ঠারহিত সে ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত (শ্লাঘ্য) হয় না। (ঘৃতচরুর দ্বারা সেই অপ্রতিষ্ঠার পরিহার হয়)।
তাহাতে (সেই ঘৃতপক্ক চরুতে) যে ঘৃত আছে তাহা স্ত্রীর পয়ঃ (শোনিতস্বরূপ) আর যে তণ্ডুল আছে তাহা পুরুষের (রেতঃ স্বরূপ); সেই ঘৃততন্ডুল মিথুন সদৃশ; সেই জন্য এই মিথুনদ্বারাই (ঘৃততন্ডুলময় চরুপ্রদানদ্বারা) ইহাকে (যজমানকে) সন্ততিদ্বারা ও পশুদ্বারা বর্ধিত করা হয়। (সেই হেতু এই চরু) প্রতিষ্ঠারই হেতু।'

এখানেও সেই একই ধারণার প্রতিচ্ছবি- মিথুন থেকে শুধুই যে সন্তান পাওয়া যাবে তাই নয়, পশু অর্থাৎ ধনসম্পদও। তার মানে, সে-যুগের যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের ধারণায় ধনউৎপাদন আর প্রজনন এমন কিছু আলাদা ব্যাপার নয়। মিথুন থেকে শুধু সন্তান পাবার আশা নয়, পশুদ্বারা বর্ধিত হবার আশাও। আর এই বিশ্বাস যদি অটুট হয় তাহলে তাঁরা স্বভাবতই উপদেশ দেবেন : 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্ ব্রতম্', কোনো স্ত্রীলোককেই পরিহার করবে না- এই-ই ব্রত।
এখানে আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়। এই ব্রাহ্মণমন্ত্রে ঋষি-কর্তৃক মিথুন-সদৃশ ঘৃততণ্ডুলের মধ্যে স্ত্রীর স্বরূপে যে ঘৃতের উপমা ব্যবহার করা হয়েছে এদিকে বেদপন্থী পণ্ডিত-দার্শনিকদের শ্যেন-দৃষ্টি যে-কোনো অদৃশ্য কারণে পিছলে গেলেও লোকায়ত চার্বাক-মতগোষ্ঠির নামে প্রচলিত প্রবাদ- 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋনং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' অর্থাৎ, যতদিন বাঁচো সুখেই বাঁচো, প্রয়োজন হলে ঋণ করেও ঘি খাও- উদ্ধৃত করে ভোগবাদিতার পরাকাষ্ঠায় নিন্দামুখর হয়ে তাঁরা লোকায়তিকদের উপর সম্মিলিতভাবে হামলে পড়তে কোন দ্বিধাবোধ করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তাই সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে, আধুনিক কালের বেদপন্থী পণ্ডিতেরা বেদ-উপনিষদে এ-ধরনের লেখা আছে দেখে কী-ধরনের মনোভাব প্রকাশ করেন? হয়তো বা এ-কারণে বিলক্ষণ বিরক্তিবোধ করতে পারেন। কেননা, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ ও জাতিগোষ্ঠির মধ্যে আদিম বিশ্বাসজনিত কামাচার বা বামাচারের স্বাক্ষর দেখে যেভাবে তাঁরা আধুনিক রুচি-বিগর্হিত অধঃপাতের নমুনা আবিষ্কার করেন, যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে বেদ-উপনিষদের রচয়িতাদের মধ্যে অত্যন্ত স্থূল আর কদর্য মনোবৃত্তি কল্পনা না করে উপায় থাকে কি? কিন্তু তাই বা কী করে বলা যায়? হাজার হোক, তাঁরা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি ! ফলে আধুনিক বেদপন্থী পণ্ডিতদের পক্ষে হয়তো একমাত্র উপায় হলো ঋষিদের এই জাতীয় কথাবার্তাগুলিকে চেপে যাওয়া। এই প্রবণতার নমুনা খুঁজলে তার কমতি হবে না বলেই মনে হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতজনেরা তাঁদের কথিত অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মে বামাচারের কদর্যতা প্রকাশ করতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করতে হয় বললেও অন্যদিকে বৈদিক সাহিত্যে প্রকটিত বামাচারের জ্বলজ্যান্ত স্মারকগুলি নিয়ে কোথাও কিছু বলেছেন কিনা জানা নেই। আর খুব একটা গুরুত্ববহ না হলেও অতি-সাম্প্রতিক একটা ভিন্নধরনের উদাহরণ এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে হয়। যেমন, ইতঃপূর্বে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদের ত্রয়োদশ খণ্ডে বর্ণিত বামদেব্য-ব্রতের (ছান্দোগ্য-২/১৩/১-২) শ্রুতিদ্বয় প্রয়োজনীয় তর্জমাসহ উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু স্বামী লোকেশ্বরানন্দ কৃত 'উপনিষদ' দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থে ছান্দোগ্য উপনিষদের শঙ্করভাষ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যায় মূল সংস্কৃতে বামাদেব্য ব্রতের এই শ্রুতিদুটির উল্লেখ থাকলেও তার বাংলা তর্জমা দেয়া হয়েছে এভাবে-
'উপরোক্ত মন্ত্র দুটির অন্তনির্হিত অর্থ হল, জাগতিক বলতে আমাদের কিছুই নেই। আমাদের সবকিছুই আধ্যাত্মিক, এমনকি দৈহিক অভিজ্ঞতাগুলিও।'- (উপনিষদ দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-৮২)

বাস্তবে কি তাই? প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের বক্তব্যগুলিকে এভাবে চেপে যাওয়া বা ভণিতার মাধ্যমে এড়িয়ে যাওয়ার পদ্ধতিটাই যে ভুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, দেবীপ্রসাদের মতে, প্রাচীনেরা কী ভেবে কী লিখেছেন তা ঠিকমতো বুঝতে হলে সর্বপ্রথম মনে রাখা দরকার যে প্রাচীনেরা ছিলেন প্রাচীন- তাই একালের ধ্যানধারণাগুলি তাঁদের মধ্যে কল্পনা করাটাই অসঙ্গত ও যুক্তিহীন।

বৈদিক সাহিত্যের মূল গ্রন্থাবলি অনেকটা দুষ্প্রাপ্য হলেও তবুও এখনো বিরল নয়, বহাল তবিয়তে বর্তমান আছে। কিন্তু আশঙ্কার কথা হলো, প্রাচীন জড়বাদী চার্বাক-মতের নিজস্ব গ্রন্থাবলির বিলুপ্তিজনিত কারণে তাঁদের বিবৃতি ও বক্তব্য খুঁজে পেতে আমাদেরকে যখন বিরোধীপক্ষের গ্রন্থের উপরই নির্ভর করতে হয়, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে চার্বাক-মত নির্ধারণে সুনিশ্চিতভাবেই অদ্ভূত এক জটিলতার সম্মুখীন হতেই হয়, কোনটা তাঁদের প্রকৃত মত কিংবা কোনটা বিরোধীপক্ষের বিকৃত-উপস্থাপনের ভণিতা তা নির্ধারণের অসহায়তা।

.

সে যাক, আমাদের মনোযোগের অন্যতম লক্ষ্য ছিলো একই জড়বাদী দর্শনের বিভিন্ন নামকরণের প্রবনতা পর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ চার্বাকই বার্হস্পত্য এবং বার্হস্পত্যই যে লোকায়ত, এ বিষয়টি ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সবসময়ই একে অন্যের সাথে যুক্ত হয়েই উপস্থাপিত হয়ে এসেছে। ফলে সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন থেকেই লোকায়ত মতের গভীরে চার্বাক দর্শনের আদি রূপটিকে খুঁজে দেখা যৌক্তিকভাবেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে। হয়তো সেখানেই লুকিয়ে আছে চার্বাক দর্শনের মূল স্পন্দনটুকু। তবে লোকায়তিক আলোচনায় প্রবেশের আগে বৃহস্পতির সূত্র তথা বার্হস্পত্য-দর্শনের সাথে আরেকটু নিবিড় পরিচয়ের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়।

৪.০ : বার্হস্পত্য, চার্বাক-মতের আদিরূপ
...
চার্বাকী জড়বাদী চিন্তাধারার উপর কেবলি এক দেহাত্মবাদী ভোগলিপ্সু দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করে এই মতটি যে ঘৃণ্য অসুর মত তা প্রমাণ ও প্রচারে ব্যস্ত হওয়ার নিদর্শন শুধু ভিন্নমতাবলম্বী দার্শনিকদের মধ্যেই নয়, বরং এর প্রবনতা-উৎস ঢের পেছনে সেই উপনিষদ যুগ থেকেই দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন ছান্দোগ্য-উপনিষদের (৭০০খ্রিস্টপূর্ব) 'প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ' উপাখ্যানে এই নমুনা অস্পষ্ট নয়। উপাখ্যানটি এরকম-

য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকা বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্বাংশ্চ লোকান্ আপ্নোতি সর্বাঃশ্চ কামান্ যস্তম্ আত্মানম্ অনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ।। ৮/৭/১।। (ছান্দোগ্য-উপনিষদ)।
অর্থাৎ : প্রজাপতি এক সময় বলেছিলেন যে, পাপ-জরা-মৃত্যু-শোক-আহারেচ্ছা-পিপাসা রহিত যে আত্মা সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প তাঁকেই অন্বেষণ করতে হবে, বিশেষভাবে জানতে হবে। যে তাঁকে অনুসন্ধান করে জানতে পারে তার কাছে কোন লোক (জগৎ) যেমন অপ্রাপ্য থাকে না, তেমনি কোন কামনাই অপূর্ণ থাকে না।
.
তৎ হ উভয়ে দেবাসুরা অনুবুবুধিরে। তে হোচুঃ- হন্ত তম্ আত্মানম্ অন্বিচ্ছামো যমাত্মানম্ অন্বিষ্য সর্বাংশ্চ লোকান্ আপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ ইতি। ইন্দ্রো হৈব দেবানাম্ অভিপ্রবব্রাজ। বিরোচনোহসুরাণাং। তৌ হ অসংবিদানৌ এব সমিৎপাণী প্রজাপতি-সকাশম্ আজগ্মতুঃ।। ৮/৭/২।। (ছান্দোগ্য-উপনিষদ)।
অর্থাৎ : দেব ও অসুরগণ উভয়েই লোকপরম্পরায় এই উপদেশের কথা শুনলেন। দুপক্ষই নিজেদের মধ্যে বসে আলোচনা করলেন, 'যে আত্মাকে অনুসন্ধান করলে সর্বলোক ও সর্বকাম্যবস্তু লাভ করা যায়, আমরা সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করবো'। (এ উদ্দেশ্যে) দেবগণের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র এবং অসুরগণের মধ্যে অসুররাজ বিরোচন (প্রজাপতির) অভিমুখে গমন করলেন। তাঁরা পরস্পরকে না জানিয়ে সমিৎপাণি অর্থাৎ সমিধ হাতে শিষ্য হয়ে প্রজাপতির সমীপে উপস্থিত হলেন।
.
তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্যম্ ঊষতুঃ। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিম্ ইচ্ছন্তৌ অবাস্তমিতি ? তৌ হোচতুঃ- য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ বিশোকো বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্য স সর্বাংশ্চ লোকান্ আপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তম্ আত্মানম্ অনুবিদ্য বিজানাতীতি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে। তম্ ইচ্ছন্তৌ অবাস্মম্ ইতি।। ৮/৭/৩।। (ছান্দোগ্য-উপনিষদ)।
অর্থাৎ : তাঁরা সেখানে দুজনেই বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য নিয়ে রইলেন। তারপর একদিন প্রজাপতি তাঁদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন- 'কী ইচ্ছা করে তোমরা এখানে এমনভাবে রইলে ?' তাঁরা বললেন, 'ভগবানের বাক্য বলে বিদিত যে- যে-আত্মা পাপরহিত, জরারহিত, শোকরহিত, অশনেচ্ছারহিত, যিনি সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প- তাঁকেই অন্বেষণ করতে হবে,

তাঁকেই বিশেষরূপে জানতে হবে। যিনি এ আত্মাকে অনুসন্ধান করে জানেন, তিনি সর্বলোক ও সমুদয় কাম্যবস্তু লাভ করেন। সেই আত্মাকে জানার ইচ্ছা নিয়েই আমরা এখানে আপনার কাছে রয়েছি।'

.

তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ- এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচ এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্মেতি। অথ যোহয়ং ভগবঃ অপ্সু পরিখ্যায়তে, যশ্চ অয়ম্ আদর্শে কতম এষ ইতি ? এষ উ এবৈষু সর্বেষু অন্তেষু পরিখ্যায়তে ইতি হোবাচ।। ৮/৭/৪।। (ছান্দোগ্য-উপনিষদ)।

অর্থাৎ : প্রজাপতি তাঁদের প্রার্থনা শুনে বললেন- 'চক্ষুতে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়, ইনিই আত্মা।' তিনি আরো বললেন- 'ইনিই অমৃত অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম।' প্রজাপতির এই উপদেশের মর্মার্থ ধরতে না পেরে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন- হে ভগবন্ ! এই যে পুরুষ জলে দৃষ্ট হয়, আর এই যে পুরুষ দর্পণে দৃষ্ট হয়, ইহা কে ? প্রজাপতি বললেন- 'এই সমুদয়েই আত্মা পরিদৃষ্ট হন।'

.

উদশরাব আত্মানম্ আব্যে, যদাত্মনো ন বিজানীথঃ তন্মে প্রব্রূতমিতি। তৌ হ উদশরাবে অবেক্ষাংচক্রাতে। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ- কিং পশ্যথ ইতি ? তৌ হোচতুঃ- সর্বমেবেদম্ আবাং ভগব আত্মানং পশ্যাব আলোমভ্য আনখেভ্যঃ প্রতিরূপমিতি।। ৮/৮/১।। (ছান্দোগ্য-উপনিষদ)।

অর্থাৎ : প্রজাপতি বললেন- 'জলপূর্ণ পাত্রে আপনাকে (দেখো), দেখে আত্মার বিষয়ে যা বুঝবে না, তা আমাকে বোলো।' তাঁরা জলপূর্ণ পাত্রে নিজেদেরকে দেখলেন। এরপর প্রজাপতি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন- 'কী দেখলে ?' তাঁরা বললেন- হে ভগবন্ ! আমরা সমগ্র আত্মা- লোম ও নখ পর্যন্ত এর প্রতিরূপ দর্শন করলাম।

.

তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ- সাধু-অলংকৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বা উদশরাবে অবেক্ষেথাম্ ইতি। তৌ হ সাধু-অলংকৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বা উদশরাবে আবেক্ষাংচক্রাতে। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ- কিং পশ্যথ ইতি ?।। ৮/৮/২।। (ছান্দোগ্য-উপনিষদ)।

অর্থাৎ : প্রজাপতি তাঁদেরকে বললেন- '(এবার) সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে, সুবসন পরিধান করে, পরিষ্কৃত হয়ে জলপূর্ণ পাত্রে নিজেদের দর্শন করো।' তাঁরা সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে সুবসন পরিধান করে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে জলপূর্ণ পাত্রে নিজেদের দর্শন করলেন। প্রজাপতি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন- 'কী দেখলে ?'

.

তৌ হোচতুঃ- যথৈবেদমাবাং ভগবঃ সাধু-অলংকৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ স্ব এবমেব ইমৌ ভগবঃ সাধ্বলংকৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ইতি। এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্মেতি। তৌ হ শান্তহৃদয়ৌ প্রবব্রজতুঃ।। ৮/৮/৩।। (ছান্দোগ্য-উপনিষদ)।

অর্থাৎ : তাঁরা বললেন- 'হে ভগবন ! এই আমরা যেমন সুন্দর অলঙ্কারে ও সুবসনে বিভূষিত

এবং পরিষ্কৃত, তেমনি জলের মধ্যেও এই দু'জন সুন্দর অলঙ্কারে ও সুবসনে বিভূষিত ও পরিষ্কৃত।' প্রজাপতি বললেন- 'ইনিই আত্মা; ইনিই অমৃত ও অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম।' (এই জ্ঞান নিয়ে) এরপর দু'জন শান্ত হৃদয়ে ফিরে গেলেন।

.

তৌ হ অন্বীক্ষ্য প্রজাপতিরুবাচ- অনুপলভ্য আত্মানম্ অননুবিদ্য ব্রজতে যতর এতদুপনিষদো ভবিষ্যন্তি দেবা বা অসুরা বা তে পরাভবিষ্যন্তীতি। স হ শান্তহৃদয় এব বিরোচনোহসুরান্ জগাম। তেভ্যো হ এতাম্ উপনিষদং প্রোবাচ। আত্মৈব ইহ মহয্য আত্মা পরিচর্য আত্মানম্ এবেহ মহয়ন্ আত্মানম্ পরিচরণ্ উভৌ লোকৌ অবাপ্নোতি ইমং চ অমুংচেতি।। ৮/৮/৪।। (ছান্দোগ্য-উপনিষদ)।

অর্থাৎ : তাঁদেরকে (চলে যেতে) দেখে প্রজাপতি মনে মনে বললেন- '(এরা) আত্মাকে উপলব্ধি না করেই, আত্মাকে অবগত না হয়েই চলে গেলো। এদের মধ্যে যে এটাকে উপনিষৎ (অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান) বলে গ্রহণ করবে- দেবতা হোক বা অসুরই হোক- সে বিনাশপ্রাপ্ত হবে।'

বিরোচন শান্ত হৃদয়ে অসুরদের নিকট গেলেন এবং তাঁদেরকে এই উপনিষৎ শিক্ষা দিলেন- 'এই পৃথিবীতে দেহেরই পূজা করবে এবং দেহেরই পরিচর্যা করবে। দেহকে মহীয়ান করলে এবং দেহের পরিচর্যা করলেই ইহলোক ও পরলোক- এই উভয় লোকই লাভ করা যায়।'

.

তস্মাদ্ অপি অদ্য ইহ অদদানম্ অশ্রদ্দধানম্ অযজমানম্ আহুঃ আসুরো বতেতি অসুরাণাম্ হি এষা উপনিষৎ- প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেন অলঙ্কারেণেতি সংস্কুর্বন্তি; এতেন হি অমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে।। ৮/৮/৫।। (ছান্দোগ্য-উপনিষদ)।

অর্থাৎ : এইজন্য আজও দানহীন, শ্রদ্ধাহীন, যজ্ঞহীন ব্যক্তিকে অসুর বলা হয়। এটাই অসুরগণের উপনিষৎ। তারা গন্ধমাল্যাদি এবং বসন ও অলঙ্কার দ্বারা মৃতব্যক্তির দেহকে সজ্জিত করে এবং মনে করে এর দ্বারা পরলোক জয় করবে।

.

এই দীর্ঘ উপাখ্যানের এখানেই শেষ নয়। এরপর, অসুরদের প্রতিনিধি বিরোচন ওইভাবে দেহকেই আত্মা বলে জেনে সন্তুষ্ট হলেও দেবতাদের প্রতিনিধি ইন্দ্রের কাছে এই দেহাত্মবোধ নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি প্রজাপতির কাছে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দেহাত্মবোধের ভ্রম উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর ক্রমশ সচ্চিদানন্দ আত্মাকে উপলব্ধি করার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়া একে একে বর্ণিত হয়েছে।

.

দেহাতিরিক্ত এই আত্মার ধারণাই মূলত ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলোর মূল বিবেচ্য বিষয়। অন্যদিকে জড়বাদী নাস্তিক দর্শনে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত কোন সত্তা স্বীকৃত নয়, যা চার্বাক দর্শনের মূল কথা। উল্লেখিত উপাখ্যানে ব্রহ্মার বদান্যতায় অসুর মতের যে দেহাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারিত হয়েছে, তাতে বৈদিক সংস্কৃতির বিপরীত ধারণাটাই অসুর মতের মাধ্যমে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে করে অনুমিত হয় যে, প্রাচীন উপনিষদ যুগের শুরুতে কিংবা তারও

আগে থেকেই ভারতীয় সমাজে চার্বাক মতের জড়বাদী চিন্তাধারার উদ্ভব হয়ে গেছে। এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ই লোকসমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলো বা জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো বলেই হয়তো প্রাচীন উপনিষদে একে প্রতিরোধের নিমিত্তে বিভিন্ন উপাখ্যানেরও সৃষ্টি হয়েছে। আবার প্রাচীন উপনিষদে দেহাত্মবাদ বিরোধী আধ্যাত্মবাদী ধারণা ও মতামতের মধ্যেও পরবর্তী যুগের পরিণত চার্বাকী দেহাত্মবাদের প্রাথমিক রূপের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন ঐতরেয় উপনিষদে (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-৫০০) বলা হয়েছে-

'এষঃ ব্রহ্ম, এষঃ ইন্দ্রঃ, এষঃ প্রজাপতিঃ, এতে সর্বে দেবাঃ, ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি- পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপোজ্যোতীংষি ইতি এতানি, ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণি ইব বীজানি, ইতরাণি চেতরাণি চ- অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চ উদ্ভিজানি চ- অশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ, যৎকিঞ্চ ইদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং;- সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং, প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।। ৩/৩।। (ঐতরেয় উপনিষদ)।

.

অর্থাৎ : সেই প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মাই হলেন বিরাট-স্বরাট ব্রহ্ম। ইনিই ইন্দ্র, স্রষ্টা প্রজাপতি, ইনিই দেবরাজ্যের সব দেবতা। ইনিই জগৎ-সৃষ্টির পাঁচটি মূল উপাদান- পঞ্চমহাভূত (মাটি, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি বা তেজ)। ইনিই ক্ষুদ্র কীটাণুকীট, উভচর থেকে সব কিছুর উৎপত্তিস্থল- বীজ। অণ্ডজ (পাখি ইত্যাদি), উদ্ভিজ্জ (গাছপালা প্রভৃতি) থেকে শুরু করে ঘোড়া, গরু, মানুষ, হাতি- যত প্রাণী, এমনকি স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যেও ইনিই হলেন সেই প্রাণ। প্রজ্ঞার সত্তা নিয়েই বিশ্বচরাচর সত্তাবান। প্রজ্ঞাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। সেই প্রজ্ঞাই হল সব কিছুর মূল। জীবজগৎ, জড়জগৎ, লোকালোক- সব কিছু আশ্রয় করে আছে এই প্রজ্ঞানকেই। বিরাট এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। তিনিই সেই আত্মা।

.

উপনিষদীয় এই আধ্যাত্ম ধারণার বিরোধী চার্বাক মতের দেহাত্মবাদ সংশ্লিষ্ট দার্শনিক সূত্রে আমরা দেখি-

'পৃথিব্যপতেজো বায়ুরিতি তত্ত্বানি। তৎ-সমুদায়ে শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়-সংজ্ঞা। (বার্হস্পত্য-সূত্র)।
অর্থাৎ : পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু- এই চারটিই তত্ত্ব। এর সমন্বয়ে শরীর, ইন্দ্রিয়, চৈতন্য ইত্যাদি সৃষ্ট।

.

এখানে আত্মার অস্তিত্ব তো নেই-ই, এমনকি আকাশ নামের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যহীন ভূত বা তত্ত্বও স্বীকৃত হয়নি। এই দেহাত্মবাদী চার্বাক চেতনার উৎসকাল জানার কোন প্রামাণ্য তথ্য আমাদের হাতে না থাকলেও এটা কল্পনা করতে বাধা নেই যে, উপরিউক্ত উপনিষদীয় ধারণার প্রেক্ষাপটেও যদি বিরোধী দেহাত্মবাদী মত সৃষ্ট হয়ে থাকে তাহলেও উপনিষদ যুগেই চার্বাক ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছিলো।

.

একইভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদের (খ্রিস্টপূর্ব ৭০০) একটি অনুচ্ছেদে আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণে মরণোত্তর চৈতন্যের অস্তিত্বের অস্বীকৃতি দেখা যায়-

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকম্ এবানুবিলীয়েত ন হ অস্য উদগ্রহণায় এব স্যাৎ। যতো যতস্ত্¡াদদীত লবণম্ এবৈবং বা অর ইদং মহৎ ভূতং অনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি অরে ব্রবীমিতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।। ২/৪/১২।। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ)।
অর্থাৎ : (মৈত্রেয়ীকে) যাজ্ঞবল্ক্য বললেন- একটা নুনের ডেলা জলে পড়ে গেলে ডেলাটাকে তুলে আনতে পারবে না। জলের সঙ্গে সে মিশে একাকার হয়ে যাবে। জলটাই নোনতা হয়ে যাবে। যেখান থেকেই চুমুক দাও, সেই মিশে-যাওয়া নুনের স্বাদটুকু ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। আমাদের সেই মহান বস্তুটিও তেমনি অনন্ত, অপার, বিজ্ঞানময়। ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর থেকে শুরু করে দেবতা, মানুষ যত জঙ্গম দেখি সবই অভিব্যক্ত হয়েছে ঐ মহান আত্মা থেকে। এক এক রূপ, এক এক নাম। যখন এদের সংজ্ঞা লোপ পায়, পরমায়ু শেষে মৃত্যু আসে, তখন সবই গিয়ে মিশে যায় তাঁর সঙ্গে। সেই মহান আত্মাই হল তত্ত্ব।

.

অন্যান্য উপনিষদের বিভিন্ন স্থানেও আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় এই জলের সাথে মিশে থাকা লবণের দৃষ্টান্ত উক্ত হতে দেখা যায় (যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদ: ঋষি উদ্দালক-শ্বেতকেতু উপাখ্যান ২/৪/১২, ৬/১৩/১-২ ইত্যাদি)। ভূতাত্মক দেহ থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি এবং দেহনাশের সমকালীন চৈতন্যের বিনাশসম্বন্ধীয় যে ধারণা চার্বাক মতে অঙ্গীভূত তার প্রতিচ্ছবি এই উপনিষদীয় অনুচ্ছেদে লক্ষ্যণীয়। এই উপনিষদীয় ধারণা থেকে আত্মাটাকে বাদ দিলেই চার্বাকীয় দেহাত্মবাদী রূপটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

.

তবে কঠোপনিষদের (খ্রিস্টপূর্ব ৫০০-৪০০) নচিকেতা-যমরাজ উপাখ্যানের এক পর্যায়ে পরলোকগামী আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় বিশেষের উল্লেখ (কঠোপনিষদ: ১/১/২০) আমাদেরকে ভিন্ন বা আদিরূপে চার্বাক মতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ সেই উপনিষদীয় যুগেই চার্বাক দর্শনের আদিরূপের অস্তিত্বে আধ্যাত্মবাদ বিরোধী বস্তুবাদী ধারণার উপস্থিতির সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করা যায় না। আলোচ্য এই দীর্ঘ নচিকেতা-যমরাজ উপাখ্যানটির উদ্দিষ্ট অংশটুকুতে আমরা দেখি-

.

ঋষি গৌতম রাজশ্রবস যজ্ঞদানকালে একবার রেগেমেগে কথায় কথায় পুত্র নচিকেতাকে যমকে দান করলে পিতৃবাক্য পালনে নচিকেতা যমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হন। পরবর্তীতে নচিকেতার গুণে সন্তুষ্ট যমরাজ নচিকেতাকে তিনটি বর দিতে চাইলেন। তৃতীয় বর চাইতে গিয়ে নচিকেতা বললেন-
যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেহস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্ বিদ্যাং অনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।। ১/১/২০।। (কঠোপনিষদ)।
অর্থাৎ : মানুষ মাত্রেই মরণশীল। জন্মালে মরতেই হবে। কিন্তু মৃত্যুর পর কী ? কেউ বলেন আত্মা আছে। কেউ বলেন বাজে কথা, আত্মা থাকে না। যতদিন মানুষ বেঁচে থাকে ততদিনই আত্মা থাকে, কাজ করে। মরে প্রেত হয়ে গেলে নাকি আত্মারও আর কিছু করার থাকে না।

এ-নিয়ে আমাদের মধ্যে দারুণ সংশয় আছে। এ-ব্যাপারে কোনটা ঠিক, মৃত্যুর অধিপতি আপনি যেমন জানেন, আর কেউ তেমন জানেন না। এর রহস্য জানতে আমার খুব ইচ্ছে। আপনি যখন স্বেচ্ছায় আমাকে বর দিতে চেয়েছেন, তখন এটাই আমার তৃতীয় প্রার্থনা। পরলোকের রহস্য আমায় বলুন।

.

নচিকেতার বর প্রার্থনা শুনে যমরাজ চমকে উঠলেন। ভাবতেও পারেননি যে ঐটুকু ছেলে নচিকেতা তাঁকে এমন একটা প্রশ্ন করে বসতে পারেন। এ যে দারুণ গোপন ব্যাপার। পরলোকের এই রহস্য যদি কোন মানুষ জানতে পারে, তাহলে আর তো সে তার আওতার মধ্যে থাকবে না। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন-

.

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা না হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ। অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্ ।। ১/১/২১।। (কঠোপনিষদ)।

অর্থাৎ : তোমার এই প্রশ্নের জবাব দেয়া বড়ই কঠিন। সহজে বোঝানো যায় না, বোঝাও যায় না। দেবতারাও এখনো এ-নিয়ে সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছেন, মানুষ তো কোন্ ছার। তুমি ও-বিষয়ে জানার জন্য আমাকে অনুরোধ কোরো না। অন্য বর চাও।

.

নচিকেতা বললেন-

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাত্থ। বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্য এত্য কশ্চিৎ।। ১/১/২২।। (কঠোপনিষদ)।

অর্থাৎ : (সে কি কথা যমরাজ!) পরলোকের এমনি রহস্য যে বোঝানোও যায় না, বোঝাও যায় না ? আবার দেবতারাও সঠিক জানেন না ! মহারাজ, যদি তাই হয়, তাহলে, এই বর ছাড়া আমার আর অন্য বর নেই। বিশেষ করে আপনার মত ধর্মরাজের অনুগ্রহ যখন পেয়েছি, তখন এই রহস্য ছাড়া আমি আর অন্য কিছু জানতে চাই না। কেননা, আত্মতত্ত্বই হল পরমপুরুষার্থ- সবরকমের বন্ধনমুক্তির একমাত্র উপায়।

.

অতঃপর উপাখ্যানটি পরলোক, আত্মা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ধারণার জটিল থেকে জটিলতর বুননের দিকে এগিয়ে গেছে। কিন্তু সেই উপনিষদের যুগেই যে ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা বা পরলোকের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিলো তা নিয়ে হয়তো সন্দেহ থাকে না। এবং চার্বাক মতের আদিরূপে এসব ভাববাদী চেতনায় অবিশ্বাসী বস্তুবাদীদের উপস্থিতিও বেশ জোরেশোরে ছিলো বলে প্রতীতী হয়।

.

ভারতীয় দর্শন সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এই জড়বাদী চার্বাক দর্শনকে লোকায়ত দর্শন নামেই অভিহিত করা হয় এবং তাকেই বার্হস্পত্য মত হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আর বার্হস্পত্য মত মানে বৃহস্পতির মত বা বৃহস্পতি-প্রণীত মত। পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে বৃহস্পতি দেবগুরু বা দেবতাদের আচার্য। কিন্তু স্বয়ং দেবগুরু-প্রণীত মত হওয়ায়

বৈদিক সংস্কৃতির বাহকদের কাছে দর্শনটি খুবই মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার কথা থাকলেও তা না-হয়ে যে ঠিক উল্টোটিই হয়েছে, এর কারণ তার জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গিই। এবং এই জড়বাদী মত কী করে দেবগুরুর উদ্ধৃতিতে প্রচারিত হলো, এটাই ভারতীয় দর্শনে এক ধোঁয়াশাপূর্ণ রহস্য। অবশ্য পৌরাণিক উপাখ্যানেই এই রহস্যের জবাবও দেয়া হয়েছে বেশ কৌশলে। মৈত্রায়নী উপনিষদের উপাখ্যান অনুসারে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতারা হেরে গেলে দেবগুরু বৃহস্পতি ফন্দি করে অসুর গুরু শুক্রের ছদ্মবেশ ধারণ করে অসুরদের মধ্যে গিয়ে এই বেদবিরোধী বস্তুবাদী দর্শনের প্রচার করেন। এবং এই ভ্রান্ত ও ঘৃণ্য মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অসুরেরা এমন অধঃপাতে গেলো যে সেই সুযোগে তাদেরকে যুদ্ধে হারিয়ে দেবতারা হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। এই উপাখ্যানের মাধ্যমে একটা প্রতারণামূলক নাস্তিক্যবাদী শাস্ত্রের প্রবক্তা হিসেবে বৃহস্পতিকে একাত্ম করে দেখানো হয়েছে। সাথে হয়তো এটাও শিক্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, এই শাস্ত্র অসুরদের নাশের জন্যেই সৃষ্ট, তাই এটা অনুসরণ করলে অনুসরণকারীর জন্য অধঃপাত অনিবার্য।

.

অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হিসেবে আমাদেরকে পুনরায় স্মরণ করতে হয় যে, উপনিষদ হলো বেদের অন্তিম অংশ। সংহিতা বা মন্ত্রের মাধ্যমে যে বৈদিক যুগের প্রারম্ভ এবং বৈদিক 'ব্রাহ্মণে' যার পূর্ণ বিকাশ, সেই বৈদিক যুগের পরিসমাপ্তি এই উপনিষদের যুগে। কিন্তু এই যুগের পরিধিকে কোন বিশেষ সীমারেখায় আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের কালকে ইতিহাসের এক বিশেষ সীমা হিসেবে চিহ্নিত করে এর সাপেক্ষে 'ছান্দোগ্য', 'বৃহদারণ্যক' প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান উপনিষদের রচনাকালকে বহু প্রাচীন এবং বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী বলে মনে করা হলেও 'মৈত্রায়ণীয়' এবং অন্যান্য বহু উপনিষদ বুদ্ধোত্তর বলে অনেকেরই ধারণা। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর 'দর্শন-দিগদর্শন' গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য উপনিষদগুলির ক্রমিক সৃষ্টিকাল নির্ণয় করেছেন এভাবে-

(১) প্রাচীনতম উপনিষদ (৭০০ খ্রিস্টপূর্ব)- (ক) ঈশ, (খ) ছান্দোগ্য, (গ) বৃহদারণ্যক।
(২) দ্বিতীয় যুগের উপনিষদ (৬০০-৫০০ খ্রিস্টপূর্ব)- (ক) ঐতরেয়, (খ) তৈত্তিরীয়।
(৩) তৃতীয় যুগের উপনিষদ (৫০০-৪০০ খ্রিস্টপূর্ব)- (ক) প্রশ্ন, (খ) কেন, (গ) কঠ, (ঘ) মুণ্ডক, (ঙ) মাণ্ডুক্য।
(৪) চতুর্থ যুগের উপনিষদ (২০০-১০০ খ্রিস্টপূর্ব)- (ক) কৌষীতকি, (খ) মৈত্রী বা মৈত্রায়ণীয়, (গ) শ্বেতাশ্বতর।

.

সেক্ষেত্রে এই মৈত্রায়ণীয় উপনিষদের উপাখ্যান কল্পনা যে দেবগুরুর ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের এক কৌশলী প্রয়াস হিসেবেই করা হয়ে থাকতে পারে এই সন্দেহ অযৌক্তিক হবে না। অর্থাৎ এই পৌরাণিক কাহিনী সৃষ্টির আগেই চার্বাক বা লোকায়ত মত ভারতীয় সমাজে ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিলো। তাছাড়া বৈদিক সংস্কৃতির ব্রাহ্মণ্যবাদী অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বুদ্ধমতেরও সূচনা হয়েছিলো বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

.

এছাড়াও বুদ্ধের প্রায় সমকালবর্তী ও বয়োজ্যেষ্ঠ দার্শনিক অজিত কেশকম্বলীর (৫২৩ খ্রিস্টপূর্ব) উক্তিতেও চার্বাকী চিন্তার প্রতিচ্ছবি রয়েছে। বৌদ্ধ ত্রিপিটকের কয়েক জায়গায় যেমন দীঘনিকায় (১/২), মজ্ঝিমণিকায় (২/১/১০, ২/৬/৬) অজিত কেশকম্বলীর দার্শনিক মতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এভাবে-

'দান-ধ্যান ...যজ্ঞ নেই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল বিপাক নয়। ইহলোক-পরলোক নয়, মাতা-পিতা-দেবতা নেই। সত্যলোকে পৌঁছে যাওয়া এমন কোন সত্যারূঢ় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নেই, যিনি স্বয়ং ইহলোক-পরলোককে জ্ঞাত হয়ে মানুষকে বোঝাতে পারেন। মনুষ্য চতুর্ভূতের সৃষ্টি। মৃত্যুর পর (দৈহিক) পৃথিবী পৃথিবীতেই বিলীন হয়। ...অনল অনলে ...জল জলে ...বায়ু বায়ুতেই লয় প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয় আকাশে গমন করে। মৃত ব্যক্তিকে খাটে করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। চিতায় অগ্নিসংযোগ পর্যন্ত তার অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়; তারপর অস্থিসমূহ ক্রমশ ক্ষুদ্র ও ধূসরবর্ণ হয়ে আসে, অবশেষে চিতাভস্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। দান করার পরামর্শ মূর্খের উপদেশ, যিনি আস্তিক্যবাদের কথা বলেন তিনি তুচ্ছ ও মিথ্যা কথা বলেন। মূর্খ-বিদ্বান সকলেই বিনষ্ট হয়, বিচ্ছিন্ন হয়, মৃত্যুর পর আর কিছু থাকে না।' (পৃষ্ঠা-৭৪, দর্শন-দিগদর্শন ২য় খণ্ড / রাহুল সাংকৃত্যায়ন)

.

বৈদিক যজ্ঞ ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধাভোগের বিরোধিতা এবং বেদবিহিত শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের সমালোচনার মাধ্যমে কেশকম্বলী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা অজিত কেশকম্বলীর উপরিউক্ত চিন্তাধারা চার্বাক দর্শনের সঙ্গে একই আসনে নিজের স্থান করে নিয়েছে বলা যায়। এখানে-

.

'চার্বাকের মত অজিতও মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। আর পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, কর্মফল ইত্যাদি ধারণাও অস্বীকার করেন। জাগতিক বস্তুনিচয়ের উপাদান হিসাবে পঞ্চ মহাভূতের পরিবর্তে চার মহাভূতের স্বীকৃতিতে ভারতীয় সাধারণ ধারণার যে ব্যতিক্রম চার্বাক মতবাদে পরিস্ফুট, অজিতের মধ্যে আমরা তার সূচনা লক্ষ্য করি। ...অজানিত ভবিষ্যতে সুখের আশায় জীবনের প্রতিদিনের সাধারণ আনন্দের প্রতি যাঁরা উদাসীন- তাঁদের আদর্শবাদী চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত হল এই সম্প্রদায়ের মনোভাব। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে চার্বাকদের সঙ্গে কেশকম্বলীদের অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।' (পৃষ্ঠা-১৬, চার্বাক দর্শন / লতিকা চট্টোপাধ্যায়)।

.

এরকম নাস্তিক্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নমুনা রামায়ণেও বিরল নয়। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে (রামায়ণ: ২/১০৮) ব্রাহ্মণ জাবালির উক্তির মধ্যে এই মতাদর্শিয় যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে পরবর্তীকালের 'চার্বাক' নামযুক্ত দর্শনের রূপ সুস্পষ্টভাবেই পরিস্ফুট হয়েছে।

.

'পিতার মৃত্যুর পর ভরত বনবাসী রামকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার জন্য অনুরোধ জানালে পিতৃসত্য পালনে কৃতসংকল্প রাম তাঁর সেই অনুরোধ

প্রত্যাখ্যান করেন এবং অরণ্যজীবনের কঠোরতা বরণের সমর্থনে অভিমত জ্ঞাপন করেন। রামকে কৃচ্ছ্রসাধনের দৃঢ় সংকল্প থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণ জাবালি উপদেশাত্মক এক বিবৃতি দেন এবং রামায়ণে অন্তর্ভুক্ত নাস্তিকবাদ এই প্রচেষ্টারই সাক্ষ্য বহন করে।
জাবালি বলেন যে, পারলৌকিক ধর্মের মোহে বৈষয়িক সুখকে বিসর্জন দেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। এর ফলে বর্তমান জীবন দুঃখময় হয়, কিন্তু পরিণামে দেহত্যাগের পর সুখের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কারণ ফলভোক্তার দেহাতিরিক্ত কোন পৃথক সত্তা নেই। অন্ন প্রভৃতি ভোজ্য বস্তুর সাহায্যে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য যে ভোগ সম্ভব, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমরা সেটাকেই কেবল নষ্ট করি, নতুন কোন ফল পাই না। জাবালি বলেন যে, মৃত্যুর পর প্রাণীর কোন অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই মৃতের উদ্দেশ্যে আমরা যে ভোজনের আয়োজন করি তা নিরর্থক হয়।
আপাতঃ রমণীয় হলেও জাবালির উপদেশকে রাম প্রতিপালনের অযোগ্য বলে বর্ণনা করেছেন এবং এঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেননি।' (পৃষ্ঠা-১১, চার্বাক দর্শন / লতিকা চট্টোপাধ্যায়)

.

উল্লেখ্য, বর্তমানে মহাভারতকে যে আকারে পাওয়া যায় তার রচনাকালের পূর্বসীমা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ এবং শেষ সীমা খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক বলে সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকেই রামায়ণ রচনা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে পণ্ডিতদের অভিমত। অর্থাৎ রামায়ণ এবং মহাভারতের পূর্ণ রূপায়ণের বহু পূর্বেই ভারতীয় দর্শনের জগতে 'চার্বাক' নাম বিশিষ্ট না হলেও এই মতের আবির্ভাব সূচিত হয়েছিলো বলেই প্রতীয়মান হয়। এবং এই মত যে প্রকৃতই তৎকালীন লোকসমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলো, প্রাচীন সাহিত্যগুলিতে এর উপস্থিতি এই সাক্ষ্যই দেয়। হতে পারে এই মতকে অসার বা প্রয়োগযোগ্যতাহীন প্রতিপন্ন করার প্রয়োজনেই তৎকালীন সাহিত্য-আয়োজনে এর উপস্থাপন করা হয়েছিলো, তবু ইতিহাসের নিরীখে এই উপস্থিতির গুরুত্ব কোনভাবেই খাটো করে দেখার উপায় নেই।

.

প্রসঙ্গক্রমে এটাও মনে রাখা দরকার যে, 'অবশ্যই মহাভারত একজনের রচনা নয়। অধুনালভ্য মহাভারতের সংস্করণটি নানা কবির হাত ঘুরে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাই মহাভারতের সর্বত্র হুবহু একই মতাদর্শের পরিচায়ক হবার কথা নয়।' (পৃষ্ঠা-২২, ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে / দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)। অতএব মহাভারতে নাস্তিক্য বা লোকায়ত বস্তুবাদী মতের আভাস যেমন বিরল নয়, তেমনি বস্তুবাদ-বিদ্বেষের নজির দেখানোও কঠিন নয়।

.

মহাভারতের বনপর্বে (মহাভারত: ৩/৩০-৩১) দেখা যায়, দ্যুত ক্রীড়ায় পরাজিত পঞ্চপাণ্ডব যখন বন থেকে বনান্তরে ঘুরে অশেষ দুর্দশায় কালাতিপাত করছিলেন, সে সময় যুধিষ্ঠিরের

উদ্দেশ্যে দ্রৌপদী বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকুলে নানা ধরনের যুক্তি দেখিয়ে যে বক্তব্য রাখেন তাতে 'নাস্তিক্য' মতের আভাসই পরিলতি হয়। নিজ শক্তিতে বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করে নেবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করার যে প্রয়াস দ্রৌপদীর বক্তব্যে লক্ষ্য করা যায়, তা যে তৎকালীন ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতিতে প্রচলিত অদৃষ্ট, প্রাক্তন বা পূর্বজন্মের কর্মের সংস্কার ইত্যাদি ধারণার পরিপন্থি ছিলো বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা সনাতন ধর্মের এই সংস্কারে পূর্ণ প্রভাবিত মানুষ গভীরতম দুঃখেও বিচলিত না হয়ে নিজের দুর্দশাকে অতীতেরই স্বকৃত কর্মফল হিসেবে বিচার করে তা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত থাকেন। ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এবং ধর্ম ও শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আধ্যাত্মিক মতের মোক্ষকে চরম লক্ষ্য স্থির করে তারই প্রস্তুতি হিসেবে প্রাত্যহিক জীবনের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন এই শ্রেণীর লোকেরা। ফলে ধর্মকে একান্তভাবে অবলম্বন করেও যে ঐহিক উন্নতি লাভে যুধিষ্ঠির অসমর্থ, ধর্মকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র নিজ শক্তিতে কর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই দুর্যোধন তা অর্জন করেছেন বলে দ্রৌপদীর অভিমত। এখানে দ্রৌপদীর উল্লেখিত 'কর্ম' প্রচলিত সনাধন ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দেয়। মহাভারতের বনপর্বে দ্রৌপদীর উল্লিখিত দীর্ঘ বক্তব্যের কিছু নমুনা, যেমন-

'দ্রৌপদ্যুবাচ।
নাবমন্যে ন গর্হে চ ধর্ম্মং পার্থ! কথঞ্চন।
ঈশ্বরং কুত এবাহমবমংস্যে প্রজাপতিম্ ।। (বনপর্ব-১২৮/১)।।
জঙ্গমেষু বিশেষেণ মনুষ্যা ভরতর্ষভ!।
ইচ্ছন্তি কর্ম্মণা বৃত্তিমবাপ্তুং প্রেত্য চেহ চ।। (বন-১২৮/৫)।।
উত্থানমভিজানন্তি সর্ব্বভূতানি ভারত!।
প্রত্যক্ষং ফলমশ্নন্তি কর্ম্মণাং লোকসাক্ষিকম্ ।। (বন-১২৮/৬)।।
উৎসীদেরন্ প্রজাঃ সর্ব্বা ন কুর্য্যুঃ কর্ম্ম চেদ্ভুবি।
তথা হ্যেতা ন বর্দ্ধেরন্ কর্ম্ম চেদফলং ভবেৎ।। (বন-১২৮/১১)।।
যশ্চ দিষ্টপরো লোকো যশ্চায়ং হঠবাদিকঃ।
উভাবপসদাবেতৌ কর্ম্মবুদ্ধিঃ প্রশস্যতে।। (বন-১২৮/১৩)।।
যচ্চাপি কিঞ্চিৎ পুরুষো দিষ্টং নাম ভজত্যুত।
দৈবেন বিধিনা পার্থ! তদ্দৈবমিতি নিশ্চিতম্ ।। (বন-১২৮/১৭)।।
যৎ স্বয়ং কর্ম্মণা কিঞ্চিৎ ফলমাপ্নোতি পুরুষঃ।
প্রত্যক্ষমেতল্লোকেষু তৎ পৌরুষমিতি স্মৃতম্ ।। (বন-১২৮/১৮)।।
মনসার্থান্ বিনিশ্চিত্য পশ্চাৎ প্রাপ্নোতি কর্ম্মণা।
বুদ্ধিপূর্ব্বং স্বয়ং বীর! পুরুষস্তত্র কারণম্ ।। (বন-১২৮/২৫)।।
সংখ্যাতুং নৈব শক্যানি কর্ম্মাণি পুরুষর্ষভ!।
অগারনগরাণাং হি সিদ্ধিঃ পুরুষহৈতুকী।। (বন-১২৮/২৬)।।
ইষ্টাপূর্ত্তফলং ন স্যান্ন শিষ্যো ন গুরুর্ভবেৎ।
পুরুষঃ কর্ম্মসাধ্যেষু স্যাচ্চেদয়মকারণম্ ।। (বন-১২৮/৩০)।।

সর্ব্বমেব হঠেনৈকে দৈবেনৈকে বদন্ত্যুত।
পুংসঃ প্রযত্নজং কিঞ্চিত্ত্রৈধমেতন্নিরুচ্যতে।। (বন-১২৮/৩২)।।
ত্রিদ্বারামর্থসিদ্ধিন্তু নানুপশ্যন্তি যে নরাঃ।
তথৈবানর্থসিদ্ধিঞ্চ যথা লোকাস্তথৈব তে।। (বন-১২৮/৩৮)।।
পৃথিবীং লাঙ্গলেনেহ ভিত্ত্বা বীজং বপত্যুত।
আস্তেহয়ং কর্ষকস্তূষ্ণীং পর্জ্জন্যস্তত্র কারণম্ ।। (বন-১২৮/৪৭)।।
কুর্ব্বতো নার্থসিদ্ধির্মে ভবতীতি হ ভারত!।
নির্ব্বেদো নাত্র কর্ত্তব্যো দ্বাবন্যৌ হ্যত্র কারণম্ ।। (বন-১২৮/৫০)।।
গুণাভাবে ফলং ন্যূনং ভবত্যফলমেব চ।
অনারম্ভে তু ন ফলং ন গুণো দৃশ্যতে ক্বচিৎ।। (বন-১২৮/৫২)।।
ন ত্বেবাত্মাবমন্তব্যঃ পুরুষেণ কদাচন।
ন হ্যাত্মপরিভূতস্য ভূতির্ভবতি শোভনা।। (বন-১২৮/৫৮)।।
এবং সংস্থিতিকা সিদ্ধিরিয়ং লোকস্য ভারত!।
তত্র সিদ্ধিগতিঃ প্রোক্তা কালাবস্থাবিভাগতঃ।। (বন-১২৮/৫৯)।।
ব্রাহ্মণং মে পিতা পূর্ব্বং বাসয়ামাস পন্ডিতম্ ।
সোহপি সর্ব্বামিমাং প্রাহ পিত্রে মে ভরতর্ষভ!।। (বন-১২৮/৬০)।।
নীতিং বৃহস্পতিপ্রোক্তাং ভ্রাতৃন্ মেহগ্রাহয়ৎ পুরা।
তেষাং সকাশাদশ্রৌষমহমেতত্তদা গৃহে।। (বন-১২৮/৬১)।।
অর্থাৎ :
দ্রৌপদী বলিলেন-
পার্থ! আমি কোন প্রকারেই ধর্ম্মকে অবজ্ঞা বা নিন্দা করি নাই এবং কেনই বা লোকনিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞা করিব। (বন-১২৮/১)।। তবে, ভরতশ্রেষ্ঠ! জঙ্গম প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্যেরাই বিশেষ বিশেষ কর্ম্মদ্বারা পরলোকে এবং ইহলোকে স্থিতিলাভ করিবার ইচ্ছা করে। (বন-১২৮/৫)।। ভরতনন্দন! জগতের সকল প্রাণীই কর্ম্মের উদ্যম করিতে জানে এবং আপন প্রত্যক্ষে ও লোকপ্রত্যক্ষে সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করে। (বন-১২৮/৬)।। জগতে যদি প্রাণীরা কর্ম্ম না করিত, তবে সমস্ত প্রাণীই উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং কর্ম্ম যদি নিষ্ফল হইত, তাহা হইলে প্রাণীরা বৃদ্ধি পাইত না। (বন-১২৮/১১)।। যে লোক কেবল দৈবকেই আশ্রয় করিয়া থাকে এবং যে লোক 'অতর্কিত ভাবেই সকল সিদ্ধ হয়' এই কথা বলে, তাহারা উভয়েই অধম; আর যে লোক দৈবসহকারে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা করে, সে-ই প্রশংসনীয়। (বন-১২৮/১৩)।। পার্থ! মানুষ দেবতার আরাধনা দ্বারা যে কিছু ধর্ম্ম লাভ করে, তাহাকেই দৈব বলা হয়। (বন-১২৮/১৭)।। মানুষ জনসাধারণের প্রত্যক্ষে আপন কর্ম্ম দ্বারা যে ফল লাভ করে, তাহাকে পৌরুষ বলা হয়। (বন-১২৮/১৮)।। বীর! প্রাণিগণ প্রথমে মনে মনে কর্ত্তব্য বিষয় নিশ্চয় করিয়া, পরে চেষ্টা দ্বারা বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই কার্য্য আরম্ভ করে; সুতরাং তাহাদের দেহ নিমিত্ত কারণ। (বন-১২৮/২৫)।। পুরুষশ্রেষ্ঠ! কর্ম্মগুলির সংখ্যা করা যায় না; (তবে ইহা বলা যায় যে,) গৃহনগরপ্রভৃতি সমস্ত কার্য্যসিদ্ধির প্রতিই পুরুষের দেহ-হেতু।

(বন-১২৮/২৬)।। মানুষ যদি কর্ম্মফলের প্রতি কারণ না হইত, তবে কেহই যাগ ও কূপ-নির্ম্মাণপ্রভৃতি কর্ম্মের ফল পাইত না এবং কেহ কাহারও শিষ্য বা গুরু হইত না। (বন-১২৮/৩০)।। নাস্তিকেরা বলে- 'সকল কার্য্যই স্বভাবতঃ সিদ্ধ হয়', আস্তিকেরা বলেন- 'সকল কার্য্যই দৈববশতঃ সিদ্ধ হয়' এবং প্রাকৃত লোকেরা বলে- 'সকল কার্য্যই মানুষের চেষ্টায় সিদ্ধ হয়'। এইভাবে ত্রিবিধ লোক ত্রিবিধ কারণ নিরূপণ করে। (বন-১২৮/৩২)।। অতএব ইষ্ট বা অনিষ্ট সমস্ত ফলের প্রতিই ঈশ্বর, প্রারব্ধ কর্ম্ম এবং পুরুষকার- এই তিনটিই কারণ; ইহা যাহারা পর্যালোচনা করিয়াও বোঝে না, তাহারা ইতর লোকের ন্যায় একেবারে অনভিজ্ঞ। (বন-১২৮/৩৮)।। কৃষক লাঙ্গলদ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করে এবং তাহার পরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কেন না, তখন ফলের কারণ হয়- মেঘ। (বন-১২৮/৪৭)।। অতএব ভরতনন্দন! আপনিও পুরুষকার করুন; তাহাতে ফল না হইলেও আপনি যেন নিজের অবমাননা করেন না। কারণ, ফলসিদ্ধিবিষয়ে (ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রাক্তন কর্ম্মস্বরূপ) আরও দুইটি কারণ আছে। (বন-১২৮/৫০)।। কার্য্য আরম্ভ করিলে পর তাহার অঙ্গহানি হইলে, অল্প ফলও হয়, একেবারে ফল নাও হয়; কিন্তু কার্য্য আরম্ভ না করিলে, কোথাও ফল বা কর্ত্তার উৎকর্ষ, কোনটাই দেখা যায় না। (বন-১২৮/৫২)।। পুরুষ কখনো নিজের প্রতি নিজে অবজ্ঞা করিবে না। কারণ, সেরূপ লোকের ভাল সম্পত্তি হয় না। (বন-১২৮/৫৮)।। ভরতনন্দন! আমি এই নিয়মে লোকের কার্য্যসিদ্ধির কথা এবং দেশ ও অবস্থার বিভাগ অনুসারে কার্য্যসিদ্ধির উপায়ের কথা বলিলাম। (বন-১২৮/৫৯)।। ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে আমার পিতা কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে বাস করাইয়াছিলেন; তিনিই এই সমস্ত নীতি আমার পিতার নিকট বলিয়াছিলেন। (বন-১২৮/৬০)।। এবং সেই ব্রাহ্মণই এই বৃহস্পতিপ্রোক্ত নীতি পূর্ব্বে আমার ভ্রাতৃগণকে শুনাইয়াছিলেন; আবার আমি আমার ভ্রাতাদের নিকট তখন ইহা শুনিয়াছিলাম। (বন-১২৮/৬১)।।

.

ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও দ্রৌপদীর অভিযোগ পরিলক্ষিত হয়। যুধিষ্ঠিরকে বিপদ এবং দুর্যোধনকে সম্পদ প্রদান করার মধ্যে যে পক্ষপাতিত্বের প্রকাশ তার জন্য দ্রৌপদী ঈশ্বরকে দোষারোপ করেন। কর্মফলবাদের নীতি অনুসারে স্বকৃত কর্মের ফল প্রত্যেককেই ভোগ করতে হয়। এই নীতি স্বীকৃতি পেলে ঈশ্বরও তাঁর কৃতকর্মের জন্য পাপে লিপ্ত হতে এবং সে অনুযায়ী ফল ভোগ করতে বাধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে স্বকৃত পাপের ফল ভোগের ব্যাপারে অব্যাহতি লাভ করেন তার মূলে ঈশ্বরের শক্তি ও প্রতাপ কার্যকরী। অর্থাৎ দ্রৌপদী তাঁর বক্তব্যে এটাই পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন যে, নিজ শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তিযুক্ত কর্মের মাধ্যমেই কেবল জাগতিক সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ সম্ভব। ধর্ম, কর্মফল বা ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নয়। যেমন, মহাভারতের বনপর্বে দ্রৌপদীর কিছু আক্ষেপ-

নেহ ধর্ম্মানৃশংসাভ্যাং ন ক্ষান্ত্যা নার্জ্জবেন চ।
পুরুষঃ শ্রিয়মাপ্নোতি ন ঘৃণিত্বেন কর্হিচিৎ।। (বন-১২৬/৩)।।
নহি তেহধ্যগমন্ জাতু তদানীং নাদ্য ভারত!।

ধর্ম্মাৎ প্রিয়তরং কিঞ্চিদপি চেজ্জীবিতাদিহ।। (বন-১২৬/৫)।।
রাজানং ধর্ম্মগোপ্তারং ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
ইতি মে শ্রুতমার্য্যাণাং ত্বান্তু মন্যে ন রক্ষতি।। (বন-১২৬/৮)।।
মণিঃ সূত্র ইব প্রোতো নস্যোত ইব গোবৃষঃ।
স্রোতসো মধ্যমাপন্নঃ কূলাদ্বৃক্ষ ইব চ্যুতঃ।। (বন-১২৬/২৬)।।
ধাতুরাদেশমন্বেতি তন্ময়ো হি তদর্পণঃ।
নাত্মাধীনো মনুষ্যোহয়ং কালং ভজতি কঞ্চন।। (বন-১২৬/২৭)।। (যুগ্মকম্)
অজ্ঞো জন্তুরনীশোহয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেষিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং নরকমেব চ।। (বন-১২৬/২৮)।।
পশ্য মায়াপ্রভাবোহয়মীশ্বরেণ যথা কৃতঃ।
যো হন্তি ভূতৈর্ভূতানি মোহয়িত্বাত্মমায়য়া।। (বন-১২৬/৩২)।।
আর্য্যান্ শীলবতো দৃষ্টা হ্রীমতো বৃত্তিকর্ষিতান্ ।
অনার্য্যান্ সুখিনশ্চৈব বিহ্বলামীব চিন্তয়া।। (বন-১২৬/৩৯)।।
তবেমামাপদং দৃষ্টা সমৃদ্ধিঞ্চ সুযোধনে।
ধাতারং গর্হয়ে পার্থ! ডবষমং যোহনুপশ্যতি।। (বন-১২৬/৪০)।।
আর্য্যশাস্ত্রাতিগে ক্রূরে লুব্ধে ধর্ম্মাপচায়িনি।
ধার্ত্তরাষ্ট্রে শ্রিয়ং দত্ত্বা ধাতা কিং ফলমশ্নুতে।। (বন-১২৬/৪১)।।
কর্ম্ম চেৎ কৃতমন্বেতি কর্ত্তারং নান্যমৃচ্ছতি।
কর্ম্মণা তেন পাপেন লিপ্যতে নূনমীশ্বরঃ।। (বন-১২৬/৪২)।।
অথ কর্ম্ম কৃতং পাপং ন চেৎ কর্ত্তারমৃচ্ছতি।
কারণং বলমেবেহ জনান্ শোচামি দুর্ব্বলান্ ।। (বন-১২৬/৪৩)।।
অর্থাৎ :
এই জগতে ধর্ম্ম, কোমলতা, ক্ষমা, সরলতা কিংবা দয়া দ্বারা কেহ কখনও সম্পদ লাভ করিতে পারে না। (বন-১২৬/৩)।। ভরতনন্দন! আপনার ভ্রাতারা তখন বা এখন বা কোন সময়েই ধর্ম্ম অপেক্ষা কোন বস্তুকেই প্রিয়তর বলিয়া জানেন নাই; জীবন অপেক্ষাও ধর্ম্মকেই প্রিয়তর বলিয়া জানেন। (বন-১২৬/৫)।। আমি গুরুজনবর্গের নিকট শুনিয়াছি যে, রাজা ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে, ধর্ম্মও রাজাকে রক্ষা করেন; কিন্তু সে ধর্ম্ম আপনাকে রক্ষা করেন না- ইহা আমি মনে করি। (বন-১২৬/৮)।। জগতের সকল প্রাণীই ঈশ্বরময় এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া রহিয়াছে; সুতরাং সূত্রগ্রথিত মণির ন্যায়, নাসিকাবদ্ধ বৃষের ন্যায় এবং তীরচ্যুত ও স্রোতের মধ্যে পতিত বৃক্ষের ন্যায় প্রাণিগণ বিধাতার আদেশেরই অনুসরণ করে; কিন্তু স্বাধীন হইয়া কোন সময়েই চলিতে পারে না। (বন-১২৬/২৬-৭)।। নিজের সুখ-দুঃখবিধানে অসমর্থ মূঢ় প্রাণীরা ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়াই স্বর্গে বা নরকে যায়। (বন-১২৬/২৮)।। মহারাজ! ঈশ্বর এই মায়ার প্রভাবকে যেমন করিয়াছেন, তাহা দেখুন। যিনি নিজের মায়ায় মোহিত করিয়া প্রাণিগণ দ্বারাই প্রাণিগণকে বধ করিতেছেন। (বন-১২৬/৩২)।। সচ্চরিত্র ও লজ্জাশীল সজ্জনদিগকে দুঃখিত দেখিয়া এবং অসজ্জনদিগকে

সুখী দেখিয়া আমি চিন্তায় যেন বিহ্বল হইতেছি। (বন-১২৬/৩৯)।। পার্থ! আপনার এই বিপদ এবং দুর্য্যোধনের সম্পদ দেখিয়া আমি বিধাতাকেই নিন্দা করিতেছি। কারণ, যিনি বিপরীতভাবে পর্য্যালোচনা করিতেছেন। (বন-১২৬/৪০)।। হায়! দুর্য্যোধন ধর্ম্মশাস্ত্র অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে এবং সে ক্রূরস্বভাব ও লুব্ধপ্রকতি; তথাপি বিধাতা তাহাকে সম্পত্তি দান করিয়া কি ফল পাইতেছেন ! (বন-১২৬/৪১)।। যদি প্রাক্তন কর্ম্ম কর্ত্তারই অনুসরণ করে, অন্যের অনুসরণ করে না; তবে নিশ্চয়ই সেই পাপকর্ম্মে ঈশ্বরও লিপ্ত হইতেছেন। (বন-১২৬/৪২)।। তা'র পর, যদি ইহা বলা যায় যে, প্রাক্তন কর্ম্ম কর্ত্তার অনুসরণ করে না, তবে বলিতে হইবে যে, তাহার কারণ একমাত্র বল। এমন হইলে, দুর্ব্বল লোকদের জন্যই আমার শোক হইতেছে। (বন-১২৬/৪৩)।।

দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যহেতু ঈশ্বরে সরাসরি অস্বীকৃতি না থাকলেও দ্রৌপদী বণিত এই নাস্তিক্য মত যে আমাদের পরিচিত বার্হস্পত্য বা চার্বাক মতের মূল নীতিগুলিরই অনুগামী, তা অস্পষ্ট নয়।

.

আবার মহাভারতের শান্তিপর্বে সাংখ্যাচার্য পঞ্চশিখকে নিজ মতবাদ প্রচারের সময় সমসাময়িক যে সব মতগোষ্ঠীর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো সেবিষয়ক উপাখ্যানও দেখতে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে 'চার্বাক' বিশেষণের প্রয়োগ না হলেও চার্বাক মতের অনুরূপ মতেরও অন্তর্ভুক্তি রয়েছে (মহাভারত: ১২/২১৮/২৩-২৯)। যেমন-

জাতিনির্বেদমুক্ত্বা স কর্ম্মনির্বেদমব্রবীৎ।
কর্ম্মনির্বেদমুক্ত্বা চ সর্বনির্ব্বেদমব্রবীৎ।। (শান্তিপর্ব-২১৫/২২)।।
যদর্থং ধর্ম্মসংসর্গঃ কর্ম্মণাঞ্চ ফলোদয়ঃ।
তমনাশ্বাসিকং মোহং বিনাশি চলমধ্রুবম্ ।। (শান্তি-২১৫/২৩)।।
দৃশ্যমানে বিনাশে চ প্রত্যক্ষে লোকসাক্ষিকে।
আগমাৎ পরমস্তীতি ব্রুবন্নপি পরাজিতঃ।। (শান্তি-২১৫/২৪)।।
অনাত্মা হ্যাত্মনো মৃত্যুঃ ক্লেশো মৃত্যুর্জরাময়ঃ।
আত্মানং মন্যতে মোহাত্তদসম্যক্ পরং মতম্ ।। (শান্তি-২১৫/২৫)।।
অথ চেদেবমপ্যস্তি যল্লোকে নোপপদ্যতে।
অজরোহয়মমৃত্যুশ্চ রাজাসৌ মন্যতে যথা।। (শান্তি-২১৫/২৬)।।
অস্তি নাস্তীতি চাপ্যেতত্তস্মিন্নসতি লক্ষণে।
কিমধিষ্ঠায় তদ্-ব্রূয়াল্লোকযাত্রাবিনিশ্চয়ম্ ।। (শান্তি-২১৫/২৭)।।
প্রত্যক্ষং হ্যেতয়োর্মূলং কৃতান্তৈতিহ্যয়োরপি।
প্রত্যক্ষেণাগমো ভিন্নঃ কৃতান্তো বা ন কিঞ্চন।। (শান্তি-২১৫/২৮)।।
যত্র যত্রানুমানেহস্মিন্ কৃতং ভাবয়তোহপি চ।
নান্যো জীবঃ শরীরস্য নাস্তিকানাং মতে স্থিতঃ।। (শান্তি-২১৫/২৯)।।
রেতো বটকণীকায়াং ঘৃতপাকাধিবাসনম্ ।

জাতিঃ স্মৃতিরয়স্কান্তঃ সূর্য্যকান্তোহন্বুভক্ষণম্ ।। (শান্তি-২১৫/৩০)।।
প্রেতীভূতেহত্যয়শ্চৈব দেবতাদ্যুপযাচনম্ ।
মৃতে কর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চয়ঃ।। (শান্তি-২১৫/৩১)।।
নন্বেতে হেতবঃ সন্তি যে কেচিন্মুর্ত্তিসংস্থিতাঃ।
অমূর্ত্তস্য হি মূর্ত্তেন সামান্যং নোপপদ্যতে।। (শান্তি-১২৫/৩২)।।
অর্থাৎ :
পঞ্চশিখ প্রথমে জন্মের দোষ বলিয়া পরে কর্ম্মের দোষ বলিলেন এবং কর্ম্মের দোষ বলিয়া লৌকিক সমস্ত কার্য্যেরেই দোষ বলিলেন। (শান্তি-২১৫/২২)।। মানুষ মীমাংসকের মত অনুসরণ করিয়া যে মুক্তির জন্য নিষ্কামভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে; সে মুক্তিলাভ করায় বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন কেবল ধর্ম্মে মুক্তি হয় না। আর মানুষ যে পুত্রাদি ফললাভের জন্য কাম্যকর্ম্ম করে, তাহাও মোহ-প্রযুক্ত। কেন না, কাম্যকর্ম্মের ফল বিনশ্বর, অস্থির ও অনিশ্চিত। (শান্তি-২১৫/২৩)।। নাস্তিকেরা বলেন- দেহই আত্মা, দেহ ভিন্ন আত্মা নাই। কারণ, দেহেরই বিনাশ দেখা যায়, প্রত্যক্ষ করা যায় এবং মানুষেরাই তাহা প্রত্যক্ষ করে; অতএব শাস্ত্র অনুসারে দেহ ভিন্ন আত্মা আছে-এইরূপ বলিতে থাকিয়া আস্তিকগণ পরাজিতই হয়। (শান্তি-২১৫/২৪)।। আত্মার মৃত্যুর মূর্ত্তি নাই; সুতরাং সেই মৃত্যুকে দেখা যায় না। সে যাহা হউক, ছেদভেদাদিজনিত কষ্ট, জরা, রোগ ও বিনাশ এইগুলি দেহেরই ধর্ম্ম; সুতরাং দেহই আত্মা, অতএব আস্তিকগণ দেহভিন্ন আত্মা আছে বলিয়া যে মনে করে, তাহাদের সে মত সমীচীন নহে। (শান্তি-২১৫/২৫)।। তারপর তোমরা (আস্তিকেরা) যদি বল যে, জগতে যাহা দেখা যায় না, এরূপ বস্তুও আছে; যেমন অঙ্কুর দেখা যায় না, অথচ তাহা বীজে আছে। সে বিষয়ে আমাদের (নাস্তিকদের) বক্তব্য এই যে, স্তুতিপাঠকেরা যেমন রাজাকে অজর ও অমর মনে করিয়াই যেন তাঁহার সেইরূপ বর্ণনা করে; তোমরাও (আস্তিকেরাও) তেমন আত্মাকে অজর ও অমর মনে করিয়া সেইরূপ বলিয়া থাক। বাস্তবিকপক্ষে রাজার ন্যায় আত্মারও জরা এবং মৃত্যু আছে। (শান্তি-২১৫/২৬)।। আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে দৃঢ়তর প্রমাণ না থাকিলে এবং আত্মা আছে কি নাই- এইরূপ সন্দেহ চলিতে লাগিলে, মানুষ কি অবলম্বন করিয়া সাংসারিক কার্য্য করিবে; তাহা আপনার (নাস্তিকের) বলা উচিত। (শান্তি-২১৫/২৭)।। প্রত্যক্ষই অনুমান ও আগমের মূল; সুতরাং প্রত্যক্ষকর্ত্তৃক বাধিত হইলে অনুমান ও আগম কিছুই নহে (ইহা নাস্তিকের উক্তি)। (শান্তি-২১৫/২৮)।। এই অনুমানদ্বারা যেখানে যেখানে সাধ্যের সিদ্ধি হইল বলিয়া তুমি মনে কর, সেইখানে সেইখানে তাহা করিবে না; কারণ, আমাদের নাস্তিকদের মতে অনুমান প্রমাণ নহে এবং দেহভিন্ন অন্য জীবাত্মা নাই। (শান্তি-২১৫/২৯)।। বটবৃক্ষের ক্ষুদ্র বীজে যেমন প্রথমে তাহার পত্র, শাখা ও প্রশাখাপ্রভৃতি সূক্ষ্মভাবে থাকে, পরে প্রকাশ পায়; তেমন পুরুষের শুক্রে প্রথমে মনপ্রভৃতি সূক্ষ্মভাবে থাকে, পরে প্রকাশ পায়। ভুক্তঘৃত পরিপাক পাইলে তাহা হইতে যেমন শুক্র জন্মে, তেমন পিতার শুক্র পরিণত হইলে তাহা হইতে পুত্র ও কন্যার শুক্র ও শোণিত জন্মিয়া থাকে। চন্দনবাসিত কাষ্ঠ হইতে যেমন সৌরভ উৎপন্ন হয়, তেমন স্ত্রীশোণিতসংযুক্ত পুরুষের শুক্র হইতে রক্তপ্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পর্য্যুষিত তণ্ডুল-প্রভৃতি বহুদ্রব্যনির্ম্মিত মদ্যে যেমন

মাদকতাশক্তি জন্মে; তেমন ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু- এই চারিটি দ্রব্যনির্ম্মিত দেহে চৈতন্য জন্মে। যেমন জড় মন হইতে অজড় স্মৃতি উৎপন্ন হয়, তেমন জড়দেহ হইতে অজড় চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। জড় অয়স্কান্তমণি যেমন লৌহকে সঞ্চারিত করে, তেমন জড় দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে সঞ্চালিত করে। শীতল সূর্য্যকান্তমণি যেমন সূর্য্যরশ্মিসংযোগে অগ্নি আবিষ্কার করে, তেমন শীতল শুক্র ও রসরক্তসংযোগে জঠরানল আবিষ্কার করে। আর জলোৎপন্ন বড়বানল যেমন জলই ভক্ষণ করে, তেমন শুক্র হইতে উৎপন্ন দেহ শুক্র ধারণ করে। (শান্তি-২১৫/৩০)।। (আস্তিকের বক্তব্য) চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইলে দেহ প্রাণশূন্য হইয়া পড়িলে চৈতন্য থাকে না কেন? গুরুতর রোগ জন্মিলে চৈতন্য রক্ষার জন্য নাস্তিকেরাও দেবতাপ্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করে কেন? এইগুলিই আমাদের আস্তিকদের মতে চৈতন্য যে দেহ হইতে ভিন্ন এবং জীবাত্মা তাহার পক্ষে প্রমাণ; আর ইহাই নিশ্চয়। (শান্তি-২১৫/৩১)।। নাস্তিক! আপনি যে যুক্তিগুলি দেখাইয়াছেন, তাহা কি সম্ভবপর হয়? কখনই না। কারণ, জগতে যে কিছু মূর্ত্তিমান্ পদার্থ আছে, তাহা হইতে অমূর্ত্ত পদার্থের উৎপত্তি হয় না। কেন না, মূর্ত্তিমান্ পদার্থের সহিত অমূর্ত্ত পদার্থের সাদৃশ্য থাকে না। (শান্তি-১২৫/৩২)।।

.

তবে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্রে’র সাক্ষ্যে বার্হস্পত্য সম্পর্কে চমৎকার প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রথম অধিকরণ বিনয়াধিকারিকম্ এর বিদ্যাসমুদ্দেশ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যা ও তাদের সম্মন্ধে পূর্ববর্তী শ্রদ্ধেয় আচার্যগণের মতভঙ্গি উদ্ধৃত করতে গিয়ে কৌটিল্য বলেন-

[কৌটিল্যস্য স্বমতং চ।] আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ।

.

ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি মানবাঃ। ত্রয়ীবিশেষো হ্যান্বীক্ষিকীতি।

.

বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বার্হস্পত্যাঃ। সংবরণমাত্রং হি ত্রয়ী লোকযাত্রাবিদ ইতি।

.

দণ্ডনীতিরেকা বিদ্যেত্যৌশনসাঃ। তস্যাং হি সর্ববিদ্যারম্ভাঃ প্রতিবদ্ধা ইতি।

.

চতস্র এব বিদ্যা ইতি কৌটিল্যঃ। তাভির্ধর্মার্থৌ যদ্বিদ্যাত্তদ্বিদ্যানাং বিদ্যাত্বম্ ।। ১/২/১।।
(কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্)।

.

অর্থাৎ :

কৌটিল্যের মতে, বিদ্যা চার প্রকারের, যথা- আন্বীক্ষিকী (হেতুবিদ্যা বা তর্কবিদ্যা বা মোক্ষদায়ক আত্মতত্ত্ব), ত্রয়ী (ঋক্-যজুঃ-সামবেদাত্মক বেদ-বিদ্যাসমুদায়), বার্তা (কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যা) এবং দণ্ডনীতি (অর্থাৎ রাজনীতি বা নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র)।

.

মানব সম্প্রদায় অর্থাৎ মনু-শিষ্যগণ বলেন- ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি- বিদ্যা এই তিনপ্রকার। কারণ, আন্বীক্ষিকী (বা হেতুবিদ্যা) ত্রয়ীর অর্থবিচার করে বলে সেটি ত্রয়ীবিশেষ-মাত্র অর্থাৎ ত্রয়ীরই অন্তর্ভুক্ত।

.

বৃহস্পতির শিষ্যগণের (বার্হস্পত্যগণের) মতে, বার্তা ও দণ্ডনীতি- এই দুই প্রকারের বিদ্যা ; কারণ, ত্রয়ী লোকযাত্রাবিদের অর্থাৎ বার্তা ও দণ্ডনীতির অনুষ্ঠান বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষের পক্ষে সংবরণের অর্থাৎ আচ্ছাদনের কাজ করে মাত্র (লোকতন্ত্রজ্ঞ হলেও ত্রয়ীজ্ঞান না থাকলে নাস্তিক বলে লোকসমাজে যে নিন্দিত হতে হয়, তার থেকে রক্ষার উপায়মাত্র হওয়ায় ত্রয়ীর স্বতন্ত্র বিদ্যাত্ব স্বীকারের কোনো প্রয়োজন নেই)।

.

ঔশনস (উশনা-পুত্র শুক্রাচার্যের শিষ্য-) গণের মতে, দণ্ডনীতি বা অর্থশাস্ত্রই একমাত্র বিদ্যা, কারণ দণ্ডনীতিতেই অন্যান্য সমস্ত বিদ্যার আরম্ভ (অর্থাৎ কর্মনীতিপদ্ধতি এবং যোগক্ষেম) প্রতিষ্ঠিত আছে।

.

কিন্তু কৌটিল্যের মতে, (প্রথম উক্ত) চারটিই বিদ্যা। (এই চারটিকে বিদ্যা বলবার কারণ-) এই চারটির দ্বারাই ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার এবং অর্থ বা জাগতিক সকল প্রয়োজনবস্তু জানা যায় ; এবং এদের দ্বারা জানা যায় বলেই এদের ‘বিদ্যাত্ব’ সার্থক হয়েছে।

.

এবং এই বিদ্যাগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কৌটিল্য আবার বলেন-

সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষিকী।

.

ধর্মাধর্মৌ ত্রয্যাম্ । অর্থানর্থৌ বার্তায়াম্ । নয়াপনয়ৌ দণ্ডনীত্যাম্ । বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরন্বীক্ষমাণান্বীক্ষিকী লোকস্যোপকরোতি, ব্যসনেহভ্যুদয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, প্রজ্ঞাবাব্যক্রিয়াবৈশারদ্যং চ করোতি।

.

প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্ ।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা।। ১/২/২।। (কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্)।
অর্থাৎ :
সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন ও লোকায়ত- এই তিনটি শাস্ত্রই উক্ত আন্বীক্ষিকী-বিদ্যারই অন্তর্ভুক্ত।

.

এই আন্বীক্ষিকীর দ্বারা এবং সূক্ষ্ম অন্বীক্ষার সাহায্যে ধর্ম এবং অধর্মের বিষয় ত্রয়ীতে প্রতিপাদিত হয় ; অর্থ এবং অনর্থ প্রতিপাদিত হয় বার্তা-নামক বিদ্যায় ; এবং দণ্ডনীতিতে নয় ও অপনয় (good policy and bad policy) প্রতিপাদিত হয়। এই তিন বিদ্যার বল ও অবল (সামর্থ্য ও অসামর্থ্য) বা প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য যুক্তির দ্বারা নির্ধারণ করা হয় বলে আন্বীক্ষিকী লোকসমাজের উপকার করে থাকে, বিপৎকালে এবং অভ্যুদয়ের সময় মানুষের

বুদ্ধি অবিচলিত রাখে এবং মানুষের প্রজ্ঞা, বাক্য-ব্যবহার ও কর্মশক্তির নৈপুণ্য সম্পাদন করে।

.

আন্বীক্ষিকীবিদ্যা (অপর-) সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ (মার্গদর্শক), সকল কর্মের (অর্থাৎ কর্মসাধনের পক্ষে) উপায়তুল্য, সকল (লৌকিক ও বৈদিক-) ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ বলে সর্বদা পরিগণিত হয়ে থাকে।

.

উল্লেখ্য, আন্বীক্ষিকীর অন্তর্ভুক্ত বিদ্যা হিসেবে কৌটিল্যবর্ণিত যে যোগদর্শনের উল্লেখ রয়েছে, পণ্ডিতদের মতে সেটা আসলে পতঞ্জলির (২৫০ খ্রিস্টাব্দ) যোগদর্শন নয়, মূলত ন্যায়-বৈশেষিক অর্থে প্রাচীন যোগ বোঝানো হয়েছে। কেননা, পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী উভয়েই মূল্যবান সাক্ষ্য ও যুক্তি প্রদর্শন করে নিশ্চিত করেছেন যে, পরবর্তীকালে যে-দার্শনিক মতকে আমরা ন্যায়-বৈশেষিক নামে সনাক্ত করতে অভ্যস্ত, প্রাচীন কালে তাকেই 'যোগ' নামে অভিহিত করার প্রথা ছিলো। কৌটিল্যের রচনাতেও যোগ শব্দ এই প্রাচীন অর্থেই ব্যবহৃত।

.

এখানে কৌটিল্যের মতে বিদ্যা চারটি হলেও উল্লেখিত শ্লোক অনুযায়ী কৌটিল্যবর্ণিত বার্হস্পত্যদের মতে বিদ্যার সংখ্যা দুই- দণ্ডনীতি এবং বার্তা। বেদ অথবা আন্বীক্ষিকীকে বার্হস্পত্যরা বিদ্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেন না। তাঁরা বেদকে 'লোকযাত্রাবিদ্' বা লৌকিক ব্যবহারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের 'সংবরণ' বা পোশাক বলে অভিহিত করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, বার্হস্পত্যদের অভিমত অনুসারে সে সময়ে বেদজ্ঞ বলে যাঁরা নিজেদের প্রচার করতেন তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ সব সময়ই বেদজ্ঞানের আবরণে গোপন থাকতো। তা থেকে অনুমিত হয় যে, 'অর্থশাস্ত্রে'র সময়কালে অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই বার্হস্পত্য মতবাদ বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

.

তবে এখানে যে কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়টি নজর এড়িয়ে যাওয়া সঙ্গত হবে না, তা হলো, কৌটিল্য বর্ণিত যে আন্বীক্ষিকীর অন্তর্গত শাস্ত্র হিসেবে লোকায়তের পরিচিতি, সেই আন্বীক্ষিকীকে কৌটিল্য সর্ব ধর্মের আশ্রয় বলে বর্ণনা করলেও বার্হস্পত্যরা এই আন্বীক্ষিকীকে বিদ্যারই অন্তর্ভুক্ত করেন নি। এখানে আন্বীক্ষিকী মানে অনুমান-মূলক দর্শন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তবে কি প্রাচীন লোকায়ত শাস্ত্র আর পরবর্তীকালের চার্বাক দৃষ্টিভঙ্গির লোকায়ত মত এক নয় বা পরস্পর বিপরীত ? হতেও পারে। কেননা পরবর্তীকালের 'চার্বাক' নামে বিশেষিত লোকায়তিক দর্শনের পরিধি থেকে ধর্ম সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত হওয়ার কারণেই হয়তো এই বৈপরিত্য সৃষ্টি হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে দর্শনমতের বিবর্তন অসম্ভব কিছু নয়।

.

তাই কৌটিল্যের এই বার্হস্পত্য মত বর্ণনার সাপেক্ষে পরবর্তীকালের সাহিত্যে চার্বাক

দর্শনের সাযুজ্য বিশ্লেষণ করতে একাদশ শতকের কৃষ্ণমিশ্র রচিত ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ নাটকটিকে গুরুত্বপূর্ণ নমুনা-উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই রূপক নাটকে বর্ণিত চার্বাক সিদ্ধান্তে বলা হচ্ছে-

দণ্ডনীতিরেব বিদ্যা। অত্রৈব বার্তান্তর্ভবিষ্যতি ধূর্ত প্রলাপস্ত্রয়ী।। (প্রবোধচন্দ্রোদয়, পৃষ্ঠা-৬৫)।
অর্থাৎ : দণ্ডনীতিই একমাত্র বিদ্যা। বার্তা দণ্ডনীতির অন্তর্ভুক্ত এবং ত্রয়ী বা বেদ ধূর্তদের প্রলাপ।

.

আবার অষ্টম শতকের প্রখ্যাত অদ্বৈত-বেদান্ত দার্শনিক শঙ্করাচার্য লোকায়ত প্রসঙ্গে তাঁর ‘সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যদণ্ডনীত্যাদিভির্বুধঃ। দৃষ্টৈরেব সদোপায়ৈর্ভোগাননুভবেদ্ ভুবি।। ২/১৫।।
(সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ)।
অর্থাৎ : (লোকায়তরা) কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, দণ্ডনীতি ইত্যাদি দৃষ্ট উপায়ের মাধ্যমে জাগতিক বস্তু উপভোগের পরামর্শ দেন।

.

অতএব, ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ গ্রন্থের বার্হস্পত্য-চার্বাক বা ‘সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ’ গ্রন্থের বার্হস্পত্য-লোকায়তের আদি রূপ হিসেবে কৌটিল্যবর্ণিত বর্ণিত বার্হস্পত্যের অনুমান করা খুব অসঙ্গত হবে না বলেই মনে হয়। তারপরও প্রশ্ন থাকে, চার্বাক তথা বার্হস্পত্য দর্শনের প্রকৃত উৎস কোথায় ?

৫.০ : বার্হস্পত্য-সূত্র

...

ভারতীয় দর্শন বা প্রাচীন সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বৃহস্পতি-সূত্র নাম দিয়ে যে সূত্রগুলি ব্যবহার করা হয় তার স্পষ্ট উৎস আমাদের কাছে অজ্ঞাত এখনো। অথচ ভারতীয় দার্শনিক প্রথা বা ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রতিটা দর্শনেরই একেকটি সূত্রগ্রন্থ থাকলেও যে সূত্রগুলির উপর ভিত্তি করে চার্বাক দর্শন নামে একটা প্রতিপত্তিশালী শক্ত দর্শন দাঁড়িয়ে আছে, ভারতীয় দর্শন-রীতিতে তারও একটা সূত্রগ্রন্থ থাকার কথা ছিলো, যার প্রণেতা হয়তো বৃহস্পতি নামের কেউ। কিন্তু সেরূপ গ্রন্থ আদৌ ছিলো কি ছিলো না, তা নিয়েও দার্শনিক মহলে যথেষ্ট বিতর্ক রয়ে গেছে।

.

তবে অন্যতম পরোক্ষ উৎস হিসেবে চতুর্দশ শতকের বেদান্ত দার্শনিক সায়ণমাধবাচার্যের যে বিখ্যাত গ্রন্থটির বিস্তৃত পূর্বপক্ষ বয়ান থেকে চার্বাক দর্শনের বিশিষ্ট রূপটিকে অনুমান করা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে, সেই 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থেও মাধবাচার্য প্রধানত চার্বাক-ষষ্ঠিকে অবলম্বন করেই চার্বাক-দর্শন সংকলন করেছেন। প্রায়ক্ষেত্রেই তিনি চার্বাক-ষষ্ঠির বচনকেই প্রমাণরূপে প্রদর্শন করেছেন, কোথাও বার্হস্পত্য-সূত্রের উল্লেখ করেন নি। এতে করে পণ্ডিতদের ধারণা, তিনি অন্যান্য কোন কোন গ্রন্থে বার্হস্পত্য-সূত্র দেখে থাকলেও সম্পূর্ণ বার্হস্পত্য সূত্র দেখেন নি অর্থাৎ বার্হস্পত্য-সূত্র নামের কোন গ্রন্থের খোঁজ তিনি পান নি। এবং গ্রন্থশেষে তিনি 'তদেতৎ সর্বং বৃহস্পতিনাপ্যুক্তং' বলে চার্বাকষষ্ঠির শ্লোকাকার বচনগুলির উল্লেখ করেছেন। বৃহস্পতি সূত্রাকারে চার্বাকমত বললেও শ্লোকাকারে বলেন নি। তবে চার্বাক-ষষ্ঠি যে বৃহস্পতির সূত্র অবলম্বনে রচিত, এ ব্যাপারে পণ্ডিতেরা মোটামুটি নিঃসন্দেহই বলা যায়। এবং নানান প্রাচীন গ্রন্থে ভারতীয় দর্শনের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসরণে সৃষ্ট এরূপ কোন কোন সূত্রের উল্লেখ থেকে অনুমান হয়, বার্হস্পত্য-সূত্র অতি প্রাচীন। (সূত্র: চার্বাক-দর্শনম্ /শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী)।

.

চার্বাক বা বার্হস্পত্য দর্শনসংশ্লিষ্ট কোন সূত্রগ্রন্থের অস্তিত্ব এখনো অজ্ঞাত হলেও অতীতে কোন এককালে এরকম সূত্রগ্রন্থ থাকার সম্ভাব্যতাকে অস্বীকারও করা যায় না। কেননা প্রখ্যাত ব্যাকরণকার পাণিনির (আনুমানিক ৬০০-৪০০ খ্রীস্টপূর্ব) কালজয়ী ব্যাকরণসূত্র 'অষ্টাধ্যায়ী'র ভাষ্যকার পতঞ্জলির (আনুমানিক অন্যুন ১৫০ খ্রীস্টপূর্ব) 'মহাভাষ্যে' 'ভাগুরি' নামে লোকায়তের এক 'বর্তিকা' বা ভাষ্যের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে- 'বর্ণিকা ভাগুরী লোকায়তস্য, বর্তিকা ভাগুরী লোকায়তস্য' (মহাভাষ্য: ৭/৩/১)। অর্থাৎ ভাগুরী লোকায়তের বর্ণিকা বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ। মূলগ্রন্থ ছাড়া কোন ভাষ্যগ্রন্থের অস্তিত্ব অনুমান কঠিন বলেই মহাভাষ্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী লোকায়তের কোন গ্রন্থ ও তার ভাষ্য ছিলো বলেই অনুমান করা হয়। এছাড়া বৌদ্ধদের লেখা সংস্কৃত গ্রন্থ (অনুমান সম্রাট অশোকের কিছুটা পরবর্তীকালের) 'দিব্যাবদানে'ও লোকায়ত শাস্ত্রের মূল গ্রন্থের উপর লেখা ভাষ্য ও প্রবচনের উল্লেখ রয়েছে- 'লোকায়তং ভাষ্যপ্রবচনম্' (দিব্যাবদান, পৃষ্ঠা ৬৩০) উদ্ধৃতিতে।

.

জীবনের দীর্ঘকাল ব্যাপী চার্বাক বা লোকায়ত নিয়ে একনিষ্ঠভাবে অনুসন্ধান ও আলোচনায় রত থাকা প্রখ্যাত ভারতীয় সংস্কৃতিবিদ পণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী তাঁর 'চার্বাক দর্শন' গ্রন্থের শেষে 'বার্হস্পত্যসূত্রম্' শিরোনামে একটি পরিশিষ্ট সংযোজন করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থে চার্বাকমত বর্ণনায় চার্বাকদের নিজস্ব উক্তি হিসেবে যে-সব উদ্ধৃতি পাওয়া যায় তারই সংকলন এটি। তাঁর তালিকায় মোট ৫৪ টি 'সূত্র' বর্তমান। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায়- '... বৃহস্পতি, চার্বাক, লোকায়ত, পুরন্দর, কম্বলাশ্বতর- এই কয়জন দার্শনিকের অর্ধশতাধিক সূত্র এবং যে গ্রন্থ হইতে যেরূপ অবস্থায় সংগৃহীত হইয়াছে তা প্রদত্ত হইল।'

.

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক এভাবে বিভিন্নজনের সূত্রগুলিকে 'বার্হস্পত্যসূত্রম' নামে পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্তির কারণ তাঁর ধারণা- বৃহস্পতি ব্যক্তিবিশেষের নাম নয় ; ব্যাস, শঙ্করাচার্য ইত্যাদি উপাধির মত বৃহস্পতিকেও উপাধিবিশেষ বলা চলে। চার্বাক মতের প্রচারে যাঁরা সহায়তা করেছেন এই উপাধি তাঁরাই লাভ করেছেন। এবং তাঁর মতে- 'সুদূর অতীতে কোনও সময়ে এই বৃহস্পতিগণ মিলিত হইয়া বার্হস্পত্য মত প্রবর্তন... ...করেন।' কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ধারণা বা সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যথোপযুক্ত প্রমাণের অভাব থাকায় তা সমর্থনযোগ্য নয় বলেই গবেষকরা মনে করেন।

.

এছাড়া তাঁর প্রদত্ত তালিকায় চার্বাকদের নামে প্রচলিত নানান প্রামাণিক লোকগাথাও অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই কোন কোন গবেষকদের মধ্য থেকে এরকম প্রশ্নও উত্থিত হয়েছে যে- পারিভাষিক অর্থে লোকগাথাকেও 'সূত্র' আখ্যা দেয়া সঙ্গত কিনা। তবে চার্বাকালোচনা করতে হলে কোনভাবেই তাঁর পরিশিষ্টটিকে উপেক্ষা করার উপায় নেই বলেই মনে হয়।

.

অন্যদিকে বিখ্যাত ইতিহাস গবেষক এফ. ডব্লু. টমাস (F. W. Thomas) 'বৃহস্পতি-সূত্র' নামে একটি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন বলে জানা যায় এবং ১৯২১ সালে অনুবাদসহ তার মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু গ্রন্থটি প্রকৃত চার্বাক মতের পরিচায়ক হতে পারে না বলে পণ্ডিতদের অভিমত। কেননা আরেক প্রখ্যাত গবেষক 'তুচ্চি (Twcci) গ্রন্থটির ওপর মন্তব্য করেছেন যে, এই বই ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে ভরপুর। গ্রন্থটি থেকে হয়তো বড়জোর চার্বাক-সংক্রান্ত সামান্য খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া যেতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। চন্দ্রকীর্তির 'প্রজ্ঞাশাস্ত্র' এবং আর্যদেবের 'শাস্ত্রাশাস্ত্র' গ্রন্থে প্রকৃত বার্হস্পত্য-সূত্র উদ্ধৃত হয়েছে বলে তুচ্চি উল্লেখ করেন। তাই বিভিন্ন দার্শনিকের চার্বাক-বর্ণনায় উদ্ধৃত বৃহস্পতি-সূত্রগুলি বা চার্বাকদের নিজস্ব উক্তি হিসেবে বাক্যগুলির প্রকৃত উৎস জানবার সুযোগ না থাকলেও উদ্ধৃতিগুলি উড়িয়ে দেবার মতো নয়। অনেকসময় চার্বাকমত পুনর্গঠনে এগুলি বিশেষ মূল্যবান উপাদান হতে পারে।' (সূত্র: ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে / দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)।

.

তবে যেভাবেই বিবেচনা করা হোক না কেন, চার্বাকমতের সেসকল সূত্র কালের গহ্বরে হারিয়ে গেলেও ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থের অনুশীলনে পুনঃসজ্ঘটিত এসব সূত্র পরবর্তীকালে বার্হস্পত্য-সূত্র নামে সংকলিত হয়েছে। শ্রীমৎ-সায়ণমাধব-কৃত 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থ অবলম্বনে শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী রচিত 'চার্বাক-দর্শনম্' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংস্কৃতভাষায় এরকম একশটি বার্হস্পত্য-সূত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। উপস্থাপিত এই সংকলিত বার্হস্পত্য-সূত্রগুলি সম্যক অনুধাবনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য তর্জমাসহ নিচে উপস্থাপন করা হলো।

.

ইতোপূর্বেও সূত্রের লক্ষণে বলা হয়েছে, অল্প অক্ষরযুক্ত, সন্দেহমুক্ত, সারযুক্ত, সর্বত্র প্রয়োগযোগ্য এবং নির্দোষ নিয়মকেই সূত্র বলে। সূত্র হলো সংক্ষিপ্ত বাক্যের নম্র উপচার। ছোট ছোট অর্থপূর্ণ বচনের সাহায্যে এরকম কিছু সূত্রের আবরণে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাকে সযত্নে গেঁথে রাখা হতো। স্বল্পতম অক্ষরবিশিষ্ট এরকম কিছু সংখ্যক সূত্রের মাধ্যমে দর্শন-চিন্তার প্রথম আত্মপ্রকাশই ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত ধারা এবং ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশ শাখারই আদি রচনা এই জাতীয় কিছু সূত্রের সমষ্টি বলে মনে করা হয়। সূত্রগুলোয় অক্ষরসংখ্যা নিয়মনের দিকে খুব জোর দেয়া হয়েছে, ফলে সংক্ষিপ্ততম অবয়বে ব্যাপকতম অর্থব্যঞ্জনার প্রবণতা প্রত্যেক সূত্রে দেখা যায়। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় তার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে। কেননা সূত্রগুলির মর্মার্থের পেছনে যে ব্যাপক তথ্য ও যুক্তির শাস্ত্রীয় আধার সুপ্ত থাকে সেগুলির বিশ্লেষণ ছাড়া বস্তুত সূত্রগুলির ব্যাখ্যা সমার্থক হয় না। তারপরও ব্যাখ্যাকারের নিজস্ব চিন্তা ও মতের সাপেক্ষে ব্যাখ্যাগুলির বক্তব্য-চেহারাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর তাই যে-কোন তর্জমার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট সূত্রের একান্ত আক্ষরিক তর্জমা বলতে গেলে অসম্ভবই প্রায়। সেই সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেই বার্হস্পত্য-সূত্রের তর্জমাগুলি স্ব-স্ব সূত্রের সাথে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

...

বৃহস্পতি-প্রণীতম্ বার্হস্পত্য-সূত্রম্

...

লোকায়ত-মতে তত্ত্বানি দর্শয়তি-
(লোকায়ত-মতে তত্ত্বাদির বিচার)

.

১) পৃথিব্যপতেজো বায়ুরিতি তত্ত্বানি।
[পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু- এই চারটিই তত্ত্ব।]

...

২) তৎ-সমুদায়ে শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়-সংজ্ঞা।
[এর (পদার্থ বা তত্ত্ব চতুষ্টয়) সমন্বয়ে শরীর, ইন্দ্রিয়, চৈতন্য ইত্যাদি সৃষ্ট।]

...

৩) তেভ্যশ্চৈতন্যম্ ।

[(দেহের আকারে পরিণত ভূত-চতুষ্টয় হতে) চৈতন্যের জন্ম ও অভিব্যক্তি হয়।]
...
৪) কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ।
[কিণ্ব বা বৃক্ষবিশেষ হতে যেরূপ মদশক্তি জন্মে।]
...
৫) শরীরেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাত এব চেতনঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ।
[শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সংঘাতের মাধ্যমে দেহে চেতনার জন্ম হয়।]
...
.
সুকৃত-দুষ্কৃত-কর্মণাং ফলাভাবং দর্শয়তি-
(ধর্মশাস্ত্রের সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফলের অভাব বিচার)
.
৬) ন ধর্ম্মাংশ্চরেৎ।
[(প্রত্যক্ষের অগোচরে অতীন্দ্রিয় সত্তা নেই বলে) ধর্ম কর্ম অনুষ্ঠেয় নহে।]
...
৭) এষ্যৎ ফলত্বাৎ।
[এ-রকম অদৃষ্ট ব্যাখ্যাত ফল ইহজন্মে পাওয়া যায় না।]
...
৮) সাংশয়িকত্বাচ্চ।
[(ধর্মশাস্ত্র-বর্ণিত যজ্ঞাদি বা পারলৌকিক বিষয়াদি সাধিত হলেও ফল হবে কিনা) সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।]
...
৯) কো হ্যবালিশো হস্তগতং পরগতং কুর্য্যাৎ।
[মূর্খ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি হস্তগত দ্রব্যকে পরগত করে?]
...
১০) বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ।
[আগামীকাল ময়ূর লাভের আশার অপেক্ষা আজকের প্রাপ্ত কপোত মন্দের মধ্যে ভালো।]
...
১১) বরং সাংশয়িকান্ নিষ্কাদসাংশয়িকঃ কার্যাপণঃ।
[সংশয়সঙ্কুল শত স্বর্ণমুদ্রা লাভ অপেক্ষা নিঃসন্দেহ এক কার্যাপণ লাভও মন্দের ভালো।]
...
১২) ন ভস্মধারণম্ ।
[(প্রতিক্ষণে শরীরের অনিত্যতাকে উপলব্ধির জন্য) শরীরে চিতা-ভস্মধারণ করা অর্থহীন কাজ।]
...

১৩) নাগ্নিহোত্র-বেদপাঠাদীনি চ।
[(পারলৌকিক ফলপ্রাপ্তির আশায়) যাগ-যজ্ঞ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠেয় নহে, বেদ পাঠও নিষ্ফল।]
...
১৪) ন তীর্থযাত্রা।
[(অর্থহীন অপচয় করে কাল্পনিক ফললাভের আশায়) তীর্থযাত্রা করণীয় নয়।]
...
১৫) সর্বমর্থার্থং করোত্যগ্নিহোত্র-সন্ধ্যা-জপাদীন্ ।
[অগ্নিহোত্র-সন্ধ্যা-জপ ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা সর্ব অর্থেই অর্থহীন অপ্রয়োজনীয়।]
...
১৬) স্বদোষং গূহিতুং কামার্ত্তো বেদং পঠতি।
[বস্তুত স্বীয় দোষ ঢাকবার অভিপ্রায়ে বেদ-পাঠের কথা বলা হয়।]
...
১৭) অগ্নিহোত্রাদীন্ করোতি।
[(পারলৌকিক স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায়) অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করা নির্বুদ্ধিতা।]
...
১৮) সুরাপানার্থং মহিলামেহনার্থং করোতি।
[সুরাপান রমণী-সম্ভোগ সুখার্থেই করণীয়।]
...
১৯) বিষ্ণ্বাদয়ঃ সুরাপায়িনঃ।
[সুরাপান উপভোগ-স্পৃহার জন্ম দেয়।]
...
২০) শিবাদয়ঃ। [নিজের কামনা পূরণার্থে রমণীয় সুখ উপভোগ্য।]
...
.
শৃঙ্গারবেশাদীনাং কর্ত্তব্যত্বং দর্শয়তি-
(শৃঙ্গারবেশ ইত্যাদির কর্তব্য বিচার)
.
২১) শৃঙ্গারবেশং কুর্য্যাৎ।
[(নিজেকে উপভোগ্য করতে) শৃঙ্গার বেশ করণীয়।]
...
২২) অক্ষৈর্দীব্যাৎ।
[পণ-পূর্বক অক্ষ বা দ্যুতক্রীড়া ক্ষতির কারণ হয়।]
...
২৩) নৈব দীব্যাচ্চ।
[তাই কখনো এতে আসক্ত হওয়া উচিৎ নয়।]

...
২৪) আসবানি সেবয়েৎ।
[আসব পান করণীয়।]
...
২৫) মাংসানি চ।
[(ভোগ-সামর্থ্যের প্রয়োজনে) মাংস ভোজন দোষণীয় নয়।]
...
২৬) মত্তকাশিন্যঃ সেব্যাঃ।
[সামর্থ অনুযায়ী সুখ উপভোগ করা উচিৎ।]
...
২৭) দিব্য-প্রমদা-দর্শনঞ্চ।
[(মনোমুগ্ধতার জন্য) দিব্য প্রমদার দর্শন উচিৎ।]
...
২৮) নেত্রাজনঞ্চ।
[(সৌকর্য্যের প্রয়োজনে) নেত্রাঞ্জন গ্রহন করা উচিৎ।]
...
২৯) আদর্শ-দর্শনঞ্চ।
[(নিজেকে আকর্ষণীয় করার প্রয়োজনে) দর্পণে মুখাদির দর্শন করণীয়।]
...
৩০) তম্বুল-চর্বণঞ্চ।
[(সুখকর তৃপ্তির জন্য) তাম্বুল চর্বণ করা যেতে পারে।]
...
৩১) কর্পূর-চন্দনাগুরুধূপঞ্চ।
[কর্পূর চন্দন ও অগুরু অনুলেপন করণীয়।]
...

.

বেদাপ্রামাণ্যং দর্শয়তি-
(বেদের অপ্রামাণ্য বিচার)

.

৩২) যাগশ্রূতিরপ্রমাণং প্রত্যক্ষবিরুদ্ধত্বাৎ গ্রাবোন্মজ্জন-শ্রূতিবৎ।
[পাথর ভাসতে থাকার মতোই যজ্ঞের ফল বিষয়ে বেদের সত্যতা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ অসম্ভব।]
...
৩৩) অনিত্য-দর্শনাচ্চ।
[বেদানুগ ভাবনা শূন্যগর্ভ।]
...

৩৪) শাস্ত্রদৃষ্ট-বিরোধাচ্চ।
[কেননা শাস্ত্রে প্রচুর বিরোধ দৃষ্ট হয়।]
...
৩৫) তথা ফলাভাবাৎ।
[(শাস্ত্রে যেসব পারলৌকিক ফলপ্রাপ্তির কথা আছে) সে-সব নিষ্ফল।]
...
৩৬) অন্যানর্থক্যাৎ।
[শাস্ত্র-কথিত অনর্থক বাক্যের অর্থ করতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা।]
...
৩৭) অভাগি-প্রতিষেধাচ্চ।
[বেদের পরস্পরবিরোধী বাক্যই একটি আরেকটিকে মিথ্যা প্রমাণ করে।]
...
৩৮) অনিত্য-সংযোগাৎ।
[বেদবাক্যের একটির সাথে অন্যটির সাযুজ্য নেই।]
...
৩৯) স্ত্র্যপরাধাৎ কর্ত্তুশ্চ পুত্রদর্শনাৎ।
[(বেদোক্ত শূদ্র ইত্যাদি অশূচি বর্ণের দোষ) স্ত্রীলোকের অপরাধ হিসেবে পুত্রে সঞ্চারিত হতে দেখা যায়।]
...
৪০) বিধিশ্চানর্থকঃ ক্বচিৎ তস্মাৎ স্তুতিঃ প্রতীয়েত
তৎসামান্যাদিতরেষু তথাত্বম্ ।
[বেদে বিধিবাক্যের নামে যেসব স্তুতি রয়েছে তাতে চিরায়ত সামান্যের-কল্পনা নিরর্থক।]
...
৪১) তদর্থ-শাস্ত্রাৎ।
[শাস্ত্র ব্যতীত ধর্মে কোনো প্রমাণ নেই- এই অর্থে বেদ অপ্রামাণ্য।]
...
৪২) বাক্য-নিয়মাৎ।
[শাস্ত্র-বাক্য লৌকিক নিয়ম বহির্ভূত।]
...
৪৩) বুদ্ধশাস্ত্রাৎ।
[বেদ মনুষ্য-রচিত, তাই তা নিত্য সত্য হতে পারে না।]
...
৪৪) অবিদ্যমান-বচনাৎ।
[বেদের অবিদ্যমান বচন থেকে যে জ্ঞান হয় তার কোনো বাস্তব রূপায়ন নেই।]
...

৪৫) অচেতনেহর্থবন্ধনাৎ।
[ফলপ্রাপ্তির কামনায় বেদে অচেতন পদার্থের স্তুতি রয়েছে বলে বেদের অযথার্থতা প্রতীত হয়।]
...
৪৬) অর্থ-বিপ্রতিষেধাৎ।
[বেদবাক্যে পরস্পর অর্থ-বিরোধ দৃষ্ট হয়, যা একটি আরেকটিকে খণ্ডন করে।]
...
৪৭) স্বাধ্যায়বদবচনাৎ।
[স্বাধ্যায়রূপ প্রণব-ধ্বনি কোন বচন বা বাক্য হতে পারে না, এবং স্বাধ্যায়ের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় ইষ্টদেবতার সন্দর্শন ঘটে এমন ধারণা বিশ্বাসযোগ্য নয়।]
...
৪৮) অবিজ্ঞেয়াৎ।
[বেদোক্ত প্রত্যক্ষ উপলব্ধিহীন অর্থবিচার গ্রহণীয় নয়।]
...
৪৯) অনিত্যসংযোগাদ্ মন্ত্রানর্থক্যম্ ।
[শাস্ত্রে এক মন্ত্রের সাথে অন্য মন্ত্রের অর্থগত সাযুজ্যহীনতা রয়েছে।]
...
৫০) হেতুদর্শনাচ্চ।
[ধর্মের পারলৌকিক কল্পনার সাথে ব্যাপ্তি-স্মরণ সম্ভব নয় বলে তা অপ্রামাণ্য।]
...
৫১) অস্থানাৎ।
[দেশান্তরে বা কালান্তরে সাধ্যের সাথে হেতুর ব্যাপ্তি সর্বকালীন নয়।]
...
৫২) করোতি-শব্দাৎ।
[(কোনো ইন্দ্রিয়াতীত সর্বজ্ঞ সত্তা হও বললেই হয়ে যায়) এমন কৃত-বাক্য গ্রহণীয় নয়।]
...
৫৩) সত্ত্বান্তরে চ যৌগপদ্যাৎ।
[(শ্রুতিবাক্য সর্বত্র অবিকৃত অভিন্ন হওয়ার কথা হলেও) স্থানবিশেষে ভিন্নরূপে প্রদর্শিত হয়।]
...
৫৪) বৃদ্ধিশ্চ কর্তৃভূম্নাস্য।
...
৫৫) প্রকৃতি-বিকৃত্যোশ্চ।
[জগতের ব্যাখ্যায় শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি-বিকৃতি ইত্যাদি সমর্থনযোগ্য নয়।]
...

৫৬) ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্ব-শ্রূতেঃ।
[শ্রুতি বা বেদবাক্য থেকে কোনো কার্যকর নিত্যজ্ঞান সম্ভব নয়।]
...
৫৭) ন শব্দ-নিত্যত্বং কার্য্যতা-প্রতীতেঃ।
[আপ্তবাক্যে শব্দ-নিত্যতা প্রমাণিত নয়।]
...
৫৮) তদপ্রামাণ্যমনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্ত-দোষেভ্যঃ।
[এতে (বেদে) অনৃত দোষ বা মিথ্যে কথা, ব্যাঘাত দোষ বা পরস্পর বিরুদ্ধ কথা এবং পুনরুক্ত দোষ পূর্ণ।]
...
৫৯) ধূর্ত্ত-প্রলাপস্ত্রয়ী।
[(বেদের কর্তা) ভণ্ড, ধূর্ত, নিশাচর ত্রয়ী।]
...
৬০) বৃথা ধর্মং বদত্যর্থসাধনং লোকায়তিকঃ পিণ্ডাদয়শ্চোর ইতি চ।
[লোকায়তিকরা বলেন, ধর্মশাস্ত্রে পিণ্ডদান প্রেত্যকর্ম ইত্যাদির সমর্থনে অযথা অতিকথন ভণ্ডদের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মাত্র।]
...
৬১) সোহপ্যশনার্থং ধর্মং বদতি।
[আস্তিকগণ অশন বা জীবিকার জন্য ধর্ম প্রচার করেন।]
...
৬২) পরাপবাদার্থং বেদশাস্ত্রং ধর্মাদীন্ পঠতি।
[ধর্মের নামে বেদশাস্ত্রে হিংসাত্মক বাক্য পাঠ করানো হয়।]
...
৬৩) সর্বান্ নিন্দতি।
[(বেদ) নিন্দাবাক্যে ভরপুর।]
...
৬৪) মহেশ্বর-বিষ্ণ্বাদীনপি।
[(ধর্মশাস্ত্রোক্ত) মহেশ্বর জাগতিক কামনা পূরণে অসমর্থ।]
...
.
পুরুষার্থং দর্শয়তি-
(পুরুষার্থ বিচার)
.
৬৫) কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ।
[(যা কামনা করা হয় তাই কাম এবং) একমাত্র কামই পুরুষার্থ।]

...
৬৬) উভয়ী প্রকৃতিঃ কামে সজ্জেৎ।
[ধর্ম ও মোক্ষ কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ করতে পারে না বলে কামনা পূরণের জন্য শরীরই মুখ্য।]
...
৬৭) কাম এব প্রণিনাং কারণম্ ।
[পুরুষার্থ রূপে কামে আসক্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।]
...
৬৮) শরীরস্থিতি-হেতুত্বাদাহার-সধর্ম্মাণো হি কামাঃ।
[শরীরের স্থিতিহেতু বলে কামগুলি আহারের সধর্মা- আহারের সমানগুণযুক্ত।]
...
৬৯) ন হি ভিক্ষুকাঃ সন্তীতি স্থাল্যো নাধিশ্রীয়ন্তে।
ন হি ভিক্ষুকাঃ সন্তীতি যবা নোপ্যন্তে।
[দ্বারে ভিক্ষুক এসে দাঁড়াতে পারে বলে উনুনে হাঁড়ি চড়াবে না, এরকম করে না কেউ। কিংবা ভিক্ষুক আছে বলে যব বপন করবে না, এটাও সুবুদ্ধির পরিচয় নয়।]
...

.
প্রমাণং দর্শয়তি-
(প্রমাণ বিচার)

.
৭০) প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্ ।
[কেবল প্রত্যক্ষই প্রমাণ।]
...
৭১) নানুমানং প্রমাণম্ ।
[অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ নয়।]
...
৭২) অত্যন্ত-প্রায়েকদেশ-সাধর্ম্যাদুপমানাসিদ্ধিঃ।
[সাদৃশ্যজ্ঞান অনুমাননির্ভর। পূর্বশ্রুত সাদৃশ্য-জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞাতপূর্ব পদার্থকে প্রত্যক্ষ করে যে উপমিতি জ্ঞান হয় তাকে বলে উপমান। প্রমাণ হিসেবে উপমান অসিদ্ধ।]
...
৭৩) শব্দোহনুমানমর্থস্যানুপলব্ধেরনুমেয়ত্বাৎ।
[শব্দ বা আপ্তবাক্য অনুমাননির্ভর বলে তা অজ্ঞাত অনুপলব্ধ বিষয়ের জ্ঞান হতে পারে না।]
...
৭৪) অপ্রমানং শব্দঃ।
[শব্দ বা আপ্তবাক্য প্রমাণ নয়।]

...
.
ঈশ্বরাভাবং দর্শয়তি-
(ঈশ্বরের অনস্তিত্ব বিচার)
.
৭৫) ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।
[ঈশ্বর অসিদ্ধ বা তার কোন অস্তিত্ব নেই।]
...
৭৬) প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।
[প্রমাণের অভাবেই তার (ঈশ্বর) অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না।]
...
৭৭) ঈনেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলসম্পত্তিঃ কর্মণা তৎ-সিদ্ধেঃ।
[যদি ঈশ্বরে প্রমাণ থাকতো তবে ঈশ্বরে সিদ্ধি হতো, কিন্তু ঈশ্বরে প্রমাণ নেই বলে স্বোপার্জিত কর্মই অনুগুণ ফল প্রদান করে।]
...
৭৮) শোণিত-শুক্রসম্ভবঃ পুরুষো মাতাপিতৃ-নিমিত্তকঃ।
[শুক্র-শোণিত সম্ভূত এই মানুষের সৃষ্টি পিতা-মাতার মিলনহেতুই সম্ভব।]
...
৭৯) নাস্তি সর্বজ্ঞঃ প্রত্যক্ষাদি-গোচরাতিক্রান্তত্বাৎ।
[প্রত্যক্ষের অগোচরে সর্বজ্ঞ সর্বাধিকারী কিছুর অস্তিত্ব নেই।]
...
৮০) শশশৃঙ্গবৎ।
[শশক বা খরগোশের শিং-এর মতোই (অতীন্দ্রিয় বস্তু অবাস্তব)।
...
৮১) মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎ-সিদ্ধিঃ।
[(অতীন্দ্রিয় কিছু নেই বলে) মুক্ত বা বদ্ধ আত্মা বলে কোনো সত্তা সিদ্ধ নয়।]
...
৮২) স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ।
[লোকের প্রয়োজনে অধিষ্ঠিত (রাজাই) ক্ষমতা শীর্ষে থাকার সুবাদে দুর্জনকে শাস্তি প্রদান করেন, সুজনকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন।]
...
৮৩) লৌকিকেশ্বরবদিতরথা।
[ভুবন প্রসিদ্ধ অতিক্ষমতার অধিকারী (রাজাই) লৌকিক ঈশ্বর।]
...
৮৪) আত্মবান্ রাজা।

[(যিনি পালক, রক্ষক, পরিচালক রূপে প্রজার অন্তরে আসন লাভ করেন) এই অমিত ক্ষমতার অধিকারীই রাজা।]

...

৮৫) লোকসিদ্ধো রাজা পরমেশ্বরঃ।

[(কার্যসিদ্ধির প্রয়োজনে দেশ, কাল, পাত্র অনুযায়ী বিবিধ রূপ ধারণে সক্ষম) লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর।]

...

.

পরলোকাভাবং দর্শয়তি-

(পরলোকের অনস্তিত্ব বিচার)

.

৮৬) নাস্তি পরলোকঃ।

[পরলোক বলে কিছু নেই।]

...

৮৭) কো হি তদ্ বেদ যদমুস্মিন্ লোকে অস্তি বা নাস্তি বা।

[অদৃষ্ট বলে যদি কিছু থাকতো, তবে তা কোন না কোনভাবে দৃষ্ট হতো, দৃষ্ট না হয়ে অদৃষ্ট হতো না।]

...

৮৮) দৃষ্ট-বিরোধাচ্চ।

[অতএব অদৃষ্ট নাই।]

...

৮৯) পরলোকিনোহভাবাৎ পরলোকাভাবঃ।

[যেহেতু পরলোক নাই, তাই পরলোকগামী আত্মা বা পরলোকীও নাই।]

...

৯০) জাতিস্মরণমসিদ্ধম্, এক-গ্রাম-গতানং সর্বেষাং স্মরণাৎ।

[জাতিস্মরণ বা পূর্বজন্মের স্মৃতি অসিদ্ধ বা অসম্ভব। মৃতের কোন স্মৃতি ধারণ অসম্ভব।]

...

.

আত্মস্বরূপং দর্শয়তি-

(আত্মস্বরূপের বিচার)

.

৯১) শরীরমাত্মা।

[শরীরই আত্মা।]

...

৯২) চৈতন্য-বিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ।

[চৈতন্যবিশিষ্ট কায়া বা দেহই পুরুষ বা আত্মা।]
...
৯৩) মম শরীরমিতি ব্যবহারো রাহোঃ শির ইত্যাদিবদৌপচারিকঃ।
[(পৌরাণিকী অনুসারে রাহু বলতে যেহেতু মস্তক-সর্বস্ব শরীরই বোঝায়) 'আমার দেহ' বললেও তা 'রাহুর মস্তক' এর মতো অভেদ উপাচার বিশেষ, অর্থাৎ কথার কথা।]
...
৯৪) এতাবানেব পুরুষো যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ।
[যে পুরুষ ইন্দ্রিয়ের গোচর, সেই পুরুষই আছে, অন্য পুরুষ নাই।]
...
৯৫) ইহলোক-পরলোক-শরীরয়োর্ভিন্নত্বাৎ
তদগতয়োরপি চিত্তয়োর্নৈকঃ সন্তানঃ।
[শরীর ভিন্ন ইহলোক পরলোক বলে কিছু নেই, শরীরের নাশ হলে চৈতন্যেরও অবলুপ্তি হয়।]
...
.
মোক্ষং দর্শয়তি-
(মোক্ষ বিচার)
.
৯৬) দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ।
[দেহের উচ্ছেদই মোক্ষ।]
...
৯৭) সেবকা ন মুক্তাঃ পরতন্ত্রত্বাদ্ বদ্ধজীববৎ।
[শরীর ভিন্ন মুক্ত বা বদ্ধ আত্মা বলে কিছু নেই।]
...
৯৮) তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ।
[(যুক্তি প্রতিষ্ঠিত বলে) তর্ক অপ্রতিষ্ঠ নয়।]
...
৯৯) সর্বথা লোকায়তিকমেব শাস্ত্রম্ ।
[সর্বদা লোকায়তিকই একমাত্র শাস্ত্র।]
...
১০০) ইত্যাহাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ।
[আচার্য বৃহস্পতি কর্তৃক বর্ণনা সমাপ্ত হলো।]
...
.
[সবগুলো বার্হস্পত্য-সূত্রের তর্জমা দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে সংগৃহীত হলে যথাস্থানে তা

সংযুক্ত করে দেয়া হবে।]

.

এখানে উল্লেখ্য, জয়রাশি ভট্টের ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহ’ ও জয়ন্ত ভট্টের ‘ন্যায়মঞ্জরী’ গ্রন্থে উল্লেখকৃত বার্হস্পত্য সূত্রের প্রথম বা আদি সূত্র ছিলো- ‘অথাতো তত্ত্বং ব্যাখ্যা স্যামঃ।’ কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ও পাটনা প্রকাশিত বার্হস্পত্য-সূত্রের সংকলনে এই সূত্রটি অনুপস্থিত বলে জানা যায়। সঙ্গত কারণেই উপরে শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রীর উপস্থাপিত বার্হস্পত্য-সূত্রেও এটি নেই। এজন্যেই ‘মনে হয়, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ বিবেচনায় পরবর্ত্তীকালে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে’ বলে শাস্ত্রী মহাশয় মন্তব্য-টীকায় তা উল্লেখ করেছেন।

৬.০ : চার্বাক ও লোকায়ত

...

অষ্টম শতকের বৌদ্ধ আচার্য শান্তরক্ষিত তাঁর 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থে স্বমত-সমর্থনে তথা বিপক্ষমত খণ্ডনে যে বিস্তৃত আয়োজন করেছিলেন, সেখানে তৎকালীন প্রচলিত বস্তুবাদী মতবাদকে তাঁর খণ্ডনের প্রয়োজন ছিলো এবং সে ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। এই খণ্ডনের প্রয়োজনে পূর্ব-পক্ষ হিসেবে স্থাপিত বস্তুবাদী মতকে তিনি 'লোকায়াত' নামে আখ্যায়িত করেছেন। আবার একই শতকের বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীল তাঁর গুরু শান্তরক্ষিতের 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা' নামের যে বিশাল ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন, সেখানেও বস্তুবাদী মত খণ্ডনে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু কমলশীল এখানে গুরু শান্তরক্ষিতের আখ্যায়িত 'লোকায়ত' মতকে 'চার্বাক' মত হিসেবে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ এই দুই বৌদ্ধ আচার্যের দার্শনিক সিদ্ধান্তে লোকায়ত ও চার্বাক ভিন্ন ভিন্ন নামে আসলে একই অভিন্ন মতবাদ ও সম্প্রদায় হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে।

.

একইভাবে অষ্টম শতকের আরেক জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সূরী তাঁর স্বমত জৈনমতের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণে রচিত 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়' গ্রন্থে সেকালের যে ছটি প্রখ্যাত দার্শনিক মতের বিচারমূলক পর্যালোচনা করেছেন, সেখানে বস্তুবাদী মতটিকে 'লোকায়ত' মত হিসেবেই উপস্থাপন করেন। অথচ এই 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়' গ্রন্থের বিশদ ব্যাখ্যা হিসেবে আনুমানিক চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের প্রখ্যাত জৈন দার্শনিক গুণরত্নের রচিত 'তর্করহস্যদীপিকা' নামের টীকাগ্রন্থে ওই একই বস্তুবাদী মত চার্বাক নামে অভিহিত হয়েছে। অবশ্য চার্বাক ও লোকায়ত যে একই মতের ভিন্ন ভিন্ন নাম, গুণরত্ন তা বলতেও দ্বিধা করেননি-

'তৎ নামানি চার্বাক লোকায়ত ইতি-আদীনি'।- (তর্করহস্যদীপিকা)।
অর্থাৎ : তার নাম চার্বাক, লোকায়ত ইত্যাদি।

.

এখানেই শেষ নয়, বেদান্ত দর্শনের মূল গ্রন্থ মহর্ষি বেদব্যাস বা বাদরায়ন রচিত 'ব্রহ্মসূত্রে'র প্রখ্যাত ভাষ্যকার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্ত দার্শনিক রামানুজ একাদশ শতকে রচিত তাঁর ভাষ্যগ্রন্থে বস্তুবাদী দর্শনকে 'চার্বাক' নামে অভিহিত করলেও এর বহু আগেই সপ্তম শতকের আরেক প্রখ্যাত ভাষ্যকার অদ্বৈত-বেদান্তবাদী দার্শনিক শঙ্করাচার্যের প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ 'বেদান্তভাষ্য'র কোথাও চার্বাক শব্দটি চোখে পড়ে না। বস্তুবাদী মতটিকে শঙ্করাচার্য একাধিকবার 'লোকায়ত' নামেই উল্লেখ করেছেন।

.

আসলে চার্বাকমতেরই পূর্বকৃত নামান্তর যে লোকায়ত, এটারই উল্লেখ পাওয়া যায় চতুর্দশ শতকের আরেক বেদান্ত দার্শনিক মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে-

তস্য চার্বাকমতস্য লোকায়তম্ ইতি অণ্বর্থম্ অপরং নামধেয়ম।- (সর্বদর্শনসংগ্রহ)।
অর্থাৎ : ওই চার্বাকদর্শনেরই অপর এক জুৎসই বা সার্থক নাম হলো লোকায়ত।

.

লোকায়ত নামটিকে মাধবাচার্য কথিত অপর এক ‘অণ্বর্থম্’ বা জুৎসই উল্লেখের মধ্যে চার্বাকদর্শনের প্রতি তাঁর অপছন্দ-প্রসূত কটাক্ষের আভাস রয়েছে বলে মনে হয়। এরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় লোকায়ত নামের ব্যাখ্যায় জৈন দার্শনিক গুণরত্নের উক্তিতেও-
‘লোকো নির্বিচারাঃ সামান্য লোকাঃ তৎবদ্ আচরন্তি স্ম ইতি লোকায়ত, লোকায়তিকা ইতি অপি।’- (তর্করহস্যদীপিকা)।
অর্থাৎ : সহজ কথায় বিচারবিহীন সাধারণ মানুষ এই মত অনুসারে আচরণ করে বলেই লোকায়ত বা লোকায়তিক শব্দের ব্যবহার।

.

গুণরত্নের এই ব্যাখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয়, এই বস্তুবাদী মতানুযায়ী কোন বাছবিচার ছাড়া সাধারণ মানুষের আচরণ অনুচর্চিত হয় বলে এটা লোকায়ত অর্থাৎ জনসাধারণের দর্শন। আর সাধারণ মানুষের বস্তুবাদী আচরণ নিশ্চয়ই আধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের কাছে সম্মানজনক বিবেচিত হয়নি। ফলে এসব দার্শনিকের পক্ষ থেকে এরকম কম-বেশি কটাক্ষ বর্ষণ ভারতীয় দার্শনিক আচার হিসেবেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে হয়তো। এবং লোকায়তবাদীদের পক্ষ থেকেও যখন ফের পাল্টা কটাক্ষ বর্ষিত হতে শুরু করে, তখনই শুরু হয় যুক্তিতর্কের এক অন্যরকম দার্শনিক বিতর্ক। তাই চার্বাক মতের উৎসগ্রন্থের অনুপস্থিতিতে বিষয়ানুগ আলোচনায় এসব উষ্ণতা এড়িয়ে চার্বাক মত পুনর্গঠনের সুযোগ আপাতদৃষ্টিতে নেই বলেই মনে হয়।

.

এই দার্শনিক কটাক্ষের মধ্য দিয়েই যে লোকায়ত মতগুলি ভারতীয় আধ্যাত্ম দর্শনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে চার্বাক মতের প্রতিনিধি হয়ে নিজের সদম্ভ অস্তিত্ব ঘোষণা করে নিরন্তর যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলি আসলে প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সমাজে একরকম দার্শনিক ছড়া হিসেবে চালু ছিলো। এগুলি কার রচনা তা জানা নেই কিংবা বিদগ্ধ কোন গ্রন্থের অংশও নয় এগুলি। তবুও লোকমুখে মুখে চলে এসেছে বলে একে বলা হয় লোকগাথা। এই লোকগাথার পেছনে দীর্ঘকালের রেশ থাকলে অনেক সময় তা প্রামাণিক লোকগাথা হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়ে যায়। চার্বাকের নামে প্রচলিত এরকম কিছু প্রামাণিক লোকগাথার উপস্থিতি দেখা যায় প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্য গ্রন্থগুলিতে, তাও আবার প্রতিপক্ষ দার্শনিকদের দর্শনযুক্তির পূর্বপক্ষ হয়ে। এরকম একটি লোকগাথা হলো-
যাবদ্ জীবেৎ সুখং জীবেদ্ নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ।। -(সর্বদর্শনসংগ্রহ : চার্বাক-দর্শনম্)।
অর্থাৎ : যতদিন বেঁচে আছ ততদিন সুখভোগ করে নাও। মরণ থেকে কারুরই রেহাই নেই। লাশ পুড়ে যাবার পর আবার কেমন করে ফিরে আসবে?

.

মাধবাচার্য তাঁর ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ গ্রন্থে এই লোকগাথাটি উদ্ধৃত করে এরপর মন্তব্য করেছেন-
-ইতি লোকগাথামনুরুন্ধানা নীতিকামশাস্ত্রানুসারেণার্থ-কামৌ এব পুরুষার্থৌ মন্যমানাঃ পারলৌকিকম্ অর্থম্ অপহ্নুবানাঃ চার্বাকমতম্ অনুবর্ত্তমানা এবানুভূয়ন্তে। অতএব তস্য

চার্বাক-মতস্য লোকায়তম্ ইতি অন্বর্থম্ অপরং নামধেয়ম্ । -(সর্বদর্শনসংগ্রহ : চার্বাক-দর্শনম্)।
অর্থাৎ : এই লোকগাথার অনুবর্তন করে, নীতিশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র অনুসারে অর্থ ও কামকে পুরুষার্থ মনে করে, পারলৌকিক স্বর্গ, দেবতা, পাপ ও পুণ্য প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ পদার্থ অগ্রাহ্য করে চার্বাকমতের অনুবর্তন করতে দেখা যায়। এজন্যে চার্বাক মতের অপর একটি সার্থক নাম লোকায়ত। প্রায় সমস্ত লোকে এই মতটি পরিব্যাপ্ত বলে তা লোকায়ত মত নামে প্রসিদ্ধ।

.

মাধবাচার্যের এই মন্তব্য থেকে আমাদের অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, চার্বাক মত আর লোকায়ত মত একই, যা সাধারণ জনমনে খুবই জনপ্রিয়। এবং তার চেয়েও বড় কথা হলো, দর্শনটি ঐকান্তিক অর্থেই ইহলোকসর্বস্ব। এই মতে পরকাল পরলোক প্রভৃতির কোন স্থান নেই। দৃশ্যমান এ পৃথিবী বাস্তব সত্য। মূলত এটিই এ দর্শনের প্রাণকথা। প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই বাস্তবতাকে কোন ইন্দ্রিয়াতীত কল্পনার আধ্যাত্মিক যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যে দুরুহ তা চার্বাকমতের ঘোর বিরোধী হয়েও মাধবাচার্য হয়তো অনুধাবন করেছিলেন ঠিকই। তাই শুরুতেই বলে রেখেছেন-
‘দুরুচ্ছেদং হি চার্বাকস্য চেষ্টিতম্ ।’- (সর্বদর্শনসংগ্রহ)।
অর্থাৎ : চার্বাকের চেষ্টিত বা প্রচারিত এই মতবাদ দুশ্ছেদ্য।

.

উপরিউক্ত লোকগাথাটি ছাড়াও মাধবাচার্য তাঁর ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ গ্রন্থে চার্বাক বা লোকায়তিকদের নামের সঙ্গে সম্পর্কিত এরকম বেশ কিছু প্রামাণিক বা প্রসিদ্ধ লোকগাথা উদ্ধৃত করেছেন। অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এই লোকগাথাগুলির অন্তর্গত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি চার্বাক মতেরই প্রতিধ্বনি। তবে এগুলোর লোকায়তিক কটাক্ষপূর্ণ বক্তব্যের মূল কথাটা হচ্ছে- কিছু ধূর্ত মানুষ লোক-ঠকিয়ে উপার্জন করবার উদ্দেশ্যে রকমারি ধর্মকর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ডের বিধান দিয়ে থাকেন এবং এসব যে নেহায়েতই লোক-ঠকানো ব্যাপার, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ থেকেই তা সহজে বোঝা যায়। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ‘সর্বদর্শনসংগ্রহে’ উদ্ধৃত লোকগাথাগুলি বাংলা তর্জমাসহ বিবৃত করা হলো-
সর্বদর্শনসংগ্রহে লোকায়তিক চার্বাকপক্ষ প্রকরণ
…
অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি-বারি-অনল-অনিলাঃ ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যঃ চৈতন্যম্ উপজায়তে ।।
[(লোকায়ত মতে) মাটি, জল, আগুন, বাতাস- শুধুমাত্র এই চার রকম ভূতবস্তুই বর্তমান। এই চার রকম ভূতবস্তু থেকেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়।]
.
কিণ্ব-আদিভ্যঃ সমেতেভ্যঃ দ্রব্যেভ্যঃ মদশক্তিবৎ।
অহং স্থূলঃ কৃশঃ অস্মি ইতি সামানাধিকরণ্যতঃ।।

[যেমন কিণ্ব প্রভৃতি বস্তুগুলি থেকেই উৎপন্ন হয় মদশক্তি। ‘আমি মোটা’, ‘আমি রোগা’- এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আসলে বিশেষ্য-বিশেষণ সম্পর্কই বর্তমান।]

.

দেহঃ স্থৌল্য-আদি-যোগাৎ চ স এব আত্মা ন চ অপরঃ ।
মম দেহঃ অয়ম্ ইতি উক্তিঃ সম্ভবেৎ ঔপচারিকী ।।
[‘মোটা’ প্রভৃতি শব্দ দেহেরই বিশেষণ বলে স্বতন্ত্র কোনো আত্মার কথা অবান্তর। ‘আমার দেহ’ জাতীয় কথা নেহাতই কথার কথা- যাকে বলে উপচার।]

.

ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ।।
[স্বর্গ বলে কিছু নেই, অপবর্গ বা মুক্তি বলেও নয়, পরলোকগামী আত্মা বলেও নয়। বর্ণাশ্রম-বিহিত ক্রিয়াকর্মও নেহাতই নিষ্ফল।]

.

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা ।।
[যাদের না-আছে বুদ্ধি, না খেটে খাবার মুরোদ তাদের জীবিকা হিসাবেই বিধাতা যেন সৃষ্টি করেছেন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, তিন বেদ, সন্ন্যাসীদের ত্রিদণ্ড, গায়ে ভস্মলেপন প্রভৃতি ব্যবস্থা।]

.

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্থাপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে।।
[জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু যদি সরাসরি স্বর্গেই যায়, তাহলে যজমান কেন নিজের পিতাকে হত্যা করে না? (অর্থাৎ, স্বর্গে যাবার অমন সোজা সড়ক থাকতেও যজমান কেন নিজের পিতাকে তা থেকে বঞ্চিত করে?]

.

মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারণম্।
নির্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্ধয়েৎ শিখাম্।।
[কেউ মারা যাবার পর শ্রাদ্ধকর্ম যদি তার তৃপ্তির কারণ হয়, তাহলে তো প্রদীপ নিভে যাবার পরেও তেল ঢেলে তার শিখা প্রদীপ্ত করা যেত।]

.

গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্।
গেহস্থকৃতশ্রাদ্ধেন পথি তৃপ্তিরবারিতা।।
[যে পৃথিবী ছেড়ে গেছে তার পাথেয় (পিণ্ড) কল্পনা করা বৃথা, কেননা তাহলে ঘর ছেড়ে কেউ গ্রামান্তর গমন করলে ঘরে বসে তার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিলেই তো তার পাথেয়-ব্যবস্থা সম্পন্ন হতো। (অর্থাৎ গ্রামান্তরগামীর পক্ষে তো তাহলে পাথেয় হিসেবে চাল-চিঁড়ে বয়ে নিয়ে যাবার দরকার হতো না।)]

.
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে ।।
[যিনি স্বর্গে গেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে দান নেহাতই বৃথা, কেননা তাহলে যিনি প্রাসাদের উপরে উঠে গেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে (মাটিতে বসে) দান করলেও তো তাঁর তৃপ্তি হবার কথা।]
.
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ।।
[যতদিন বেঁচে আছ সুখে বাঁচার চেষ্টা কর, ধার করেও ঘি খাবার ব্যবস্থা কর। লাশ পুড়ে যাবার পর আবার কেমন করে ফিরে আসবে?]
.
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ।।
[জীব যদি এই দেহ ছেড়ে পরলোকে যায়, তাহলে বন্ধুবান্ধবদের টানে সে আবার ফিরে আসে না কেন?]
.
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতাকার্যাণি ন ত্বন্যৎ বিদ্যতে ক্বচিৎ ।।
[ব্রাহ্মণদের জীবিকা হিসেবেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে (শ্রাদ্ধাদি) প্রেতকার্য বিহিত হয়েছে। তাছাড়া এসবের আর কোনো উপযোগিতা নেই।]
.
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্তনিশাচরাঃ ।
জর্ফরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্।।
[যারা তিন বেদ রচনা করেছেন তাঁরা নেহাতই ভণ্ড, ধূর্ত ও চোর (নিশাচর)। জর্ফরীতুর্ফরী (প্রভৃতি অর্থহীন বেদমন্ত্র) ধূর্ত পণ্ডিতদের বাক্যমাত্র।]
.
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নং তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্তিতম্ ।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরং চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্তিতম্।
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচর-সমীরিতম্।।
[আর তাঁরাই বিধান দিয়েছেন, অশ্বমেধ-যজ্ঞে যজমান-পত্নী অশ্বের শিশ্ন গ্রহণ করবে। তেমনি চোরেরাই (নিশাচর) মাংস খাবার মতলবে (যজ্ঞে পশুবলির) বিধান দিয়েছেন।]
...
তস্মাদ্ বহূনাং প্রাণিনামনুগ্রহার্থং চার্বাকমতমাশ্রয়ণীয়মিতি রমণীয়ম্।
ইতি সায়ণমাধবীয়ে সর্বদর্শন-সংগ্রহে চার্বাকদর্শনম্ সমাপ্তম্ ।
[এরকম আরো বহু রমণীয় চার্বাক লোকগাথা রয়েছে। সায়ণ মাধবাচার্য বিরচিত

সর্বদর্শনসংগ্রহ নামক গ্রন্থের চার্বাকদর্শন নামক প্রকরণ সমাপ্ত হলো।]
...

.

লোকমুখে প্রচারিত এই লোকগাথাগুলিতে দর্শনের জটিল বিভ্রম নেই ঠিকই, কিন্তু তাদের নিজস্ব বাস্তবসম্মত দর্শনের ঔজ্জ্বল্যটুকু বিকিরিত হয়েছে ঠিকই। আর তা হলো ইন্দ্রিয়গোচর ইহলৌকিক দর্শন। যাকে আমরা বস্তুবাদী চার্বাক দর্শন বলি। এটাই প্রাকৃতজনের বা জনগণের দর্শন অর্থাৎ লোকায়ত দর্শন। এই ইন্দ্রিয়গোচরতাই যে লোকায়ত, তা নিরূপন করতে গিয়ে জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সূরী তাঁর 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়'-এ বলেন-

'এতাবানেব লোকোইয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ'। (ষড়দর্শনসমুচ্চয়)।
অর্থাৎ : যতটুকু নিছক ইন্দ্রিয়গোচর সেটুকুকেই বলে 'লোক'।

.

আর এই 'লোক'ই যাদের কাছে একমাত্র সত্য তারাই লোকায়তিক। ফলে লোকায়তিক মতে প্রত্যক্ষগোচর পদার্থই একমাত্র সত্য। কিন্তু লোকায়তিকদের মধ্যে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ-গোচর পদার্থকে সত্য বলে স্বীকার করার কারণ কী ? এর সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় ভাষ্যকার মণিভদ্র'র উক্তিতে –

'এবম্ অমী অপি ধর্মছদ্মধূর্তাঃ পরবঞ্চনপ্রবণাঃ যৎকিংচিৎ অনুমানাদিদার্ঢ্যম্ আদর্শ্য ব্যর্থং মুগ্ধজনান্ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিলভ্য ভোগাভোগপ্রলোভনয়া ভক্ষ্যাভক্ষ্যগম্যাগম্যহেয়োপাদেয়াদি সংকটে পাতয়ন্তি, মুগ্ধধার্মিককান্ধ্যম্ চ উৎপাদয়ন্তি।'
অর্থাৎ : লোকায়তিকদের মতে প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা ধর্মপ্রবঞ্চনার প্রতিষেধক, কেননা অনুমান, আগম (শাস্ত্র) প্রভৃতির নজির দেখিয়ে পরবঞ্চনপ্রবণ ধর্মছদ্মধূর্তেরা সাধারণ মানুষের মনে স্বর্গাদিপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অন্ধ মোহের সঞ্চার করে, এই কারণেই প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য প্রমাণ স্বীকার করা সাধারণ মানুষের পক্ষে নিরাপদ নয়।
(সূত্র: ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১৬/ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

.

এর মানে দাঁড়ালো, আধ্যাত্মবাদী দর্শনের পেছনে লোকবঞ্চনার এক আয়োজন সক্রিয়। চার্বাক বিরোধী হয়েও মণিভদ্রের এই চমৎকার ব্যাখ্যাটি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে যে, তিনি একাধারে একজন ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী দার্শনিকও। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বরূপটিও তাঁর উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং মণিভদ্রের এই ব্যাখ্যা স্বীকার্য হলে এটাও মানতে হবে যে, সেকালের লোকায়তিকেরাও দার্শনিক মতকে একেবারে নির্ভেজাল তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরিচায়ক বলে মেনে নেননি। দার্শনিক মতের সঙ্গে ধর্মীয় রাজনীতির এরকম যোগাযোগ তাঁদের চেতনারও অগোচর ছিলো না। উপরে উদ্ধৃত লোকাগাথাগুলিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

.

দেহাতিরিক্ত আত্মা অস্বীকার করাটাই চরম জড়বাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর পরলোকগামী আত্মা বলে যদি কিছু না-থাকে তাহলে পরলোকের কল্পনাও অবান্তর। এ অর্থে জড়বাদ বা

বস্তুবাদ মানেই ইহলোক-সর্বস্ব দর্শন। ফলে আত্মবাদী বা আধ্যাত্মবাদীদের পক্ষে অবশ্যই এই দর্শনকে অপছন্দ করার পাশাপাশি এরকম দর্শনের প্রতি সহজাতভাবে আকৃষ্ট জনসাধারণকেও ভালো চোখে দেখার কথা নয়। কেননা, দেহাতিরিক্ত আত্মাকেই চৈতন্যের মূল বা উৎস হিসেবে প্রচার করে আধ্যাত্মবাদীরা যে ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা ও পারলৌকিক জগতের কল্পনা বিস্তার করেছেন, তা দিয়ে মূলত পূর্বজন্মের কর্মফল হিসেবে প্রাকৃত জনগোষ্ঠির বর্তমান জন্ম ও ক্রিয়াকাণ্ডকে বেঁধে ফেলে নিজেদের মতো করে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে। এটা যে চতুর লোকবঞ্চনা তা লোকায়তিকদের সাধারণ দৃষ্টিতেই ধরা পড়েছে এবং ইন্দ্রিয়াতীত কোন অস্তিত্বে সরাসরি অস্বীকারের মধ্য দিয়েই তা প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়েছে। তাই লোকায়তিকদের মতে চৈতন্য যে আসলে দেহেরই গুণ বা দেহধর্ম, তা কট্টর ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিক দার্শনিক শঙ্করাচার্য'র কটাক্ষপূর্ণ উক্তি থেকেও বোঝা যায়-
'ইতর জনগণ বা প্রাকৃতজন এবং লোকায়তিকেরা চৈতন্যবিশিষ্ট দেহমাত্রকে আত্মা বলে মনে করে।'

.

জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা লোকায়তিকদের প্রত্যক্ষ যুক্তি সংবলিত প্রচলিত লোকগাথাগুলিকে বস্তুবাদী দর্শনের অন্যতম প্রতিভূ হিসেবে পূর্বপক্ষ বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক সাহিত্যে আধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের পক্ষ থেকে যুক্তি খণ্ডনের প্রয়াস প্রত্যক্ষ করলেই এ ধারণা জোরালো হয়ে ওঠে যে, লোকায়ত ও চার্বাক আসলে একই মতের একাধিক নাম ছাড়া কিছু নয়। সপ্তম-অষ্টম শতকের শঙ্করাচার্যও তাঁর 'সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ' গ্রন্থে লোকায়ত মতের প্রতিভূ হিসেবে বেশ কিছু লোকগাথা উদ্ধৃত করেছেন। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সেগুলিও তর্জমাসহ উদ্ধৃত করা হলো-

সর্বদর্শন-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহোক্ত লোকায়তিক-মতম্

...

[সংগ্রহ সূত্র: সায়ন মাধবীয় সর্বদর্শনসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)- চার্বাকদর্শন / অমিত ভট্টাচার্য / সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।]

...

লোকায়তিকপক্ষে তু তত্ত্বং ভূতচতুষ্টয়ম্ ।
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরিত্যেব নাপরম্ ।। ১।।
[লোকায়ত মতে চারটি ভূতকেই তত্ত্ব বলা হয়। উক্ত চারটি ভূত হলো যথাক্রমে পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ু। অপর কোন ভূত এই মতে স্বীকৃত নয়।]

.

প্রত্যক্ষগম্যমেবাস্তি নাস্ত্যদৃষ্টমদৃষ্টতঃ।
অদৃষ্টবাদিভিশ্চাপি নাদৃষ্টং দৃষ্টমুচ্যতে।। ২।।
[যা কিছু প্রত্যক্ষসিদ্ধ তা-ই আছে। অদৃষ্ট যেহেতু দেখা যায় না সেহেতু অদৃষ্ট বলে কিছু নেই। অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়ে থাকে- এমন কথা অদৃষ্টবাদিগণও বলেন না।]

.
ক্বাপি দৃষ্টমদৃষ্টঞ্চেদদৃষ্টং ব্র‘‘বতে কথম্ ।
নিত্যাদৃষ্টং কথং সৎ স্যাৎ শশশৃঙ্গাদিভিঃ সমম্ ।। ৩।।
[লোকায়তিকেরা বলেন, যদি অদৃষ্ট কোথাও দেখে থাকো, তবে সেই দৃষ্ট বস্তুকে অদৃষ্ট কেন বলো? আবার শশশৃঙ্গাদির ন্যায় নিত্যই যা অদৃষ্ট, তা কিভাবে সৎ হতে পারে?]

.
ন কল্প্যৌ সুখদুঃখাভ্যাং ধর্মাধর্মৌ পরৈরিহ।
স্বভাবেন সুখী দুঃখী জনোহন্যন্নৈব কারণম্ ।। ৪।।
[অপরবাদিগণ কর্তৃক সুখদুঃখরূপ হেতুর দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের অনুমান করা অযৌক্তিক। স্বভাববশতই মানুষ সুখ এবং দুঃখ পেয়ে থাকে। এই বিষয়ে ধর্ম ও অধর্ম নামক কারণান্তরের অপেক্ষা নেই।]

.
শিখিনশ্চিত্রয়েৎ কো বা কোকিলান্ কঃ প্রকূজয়েৎ।
স্বভাবব্যতিরেকেণ বিদ্যতে নাত্র কারণম্ ।। ৫।।
[ময়ূরদের কে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করে দেয়? কোকিলদেরই বা কে কূজন করায়? বস্তুত স্বভাব ব্যতীত এক্ষেত্রে অন্য কোন কারণ নেই।]

.
স্থূলোহহং তরুণো বৃদ্ধো যুবেত্যাদিবিশেষণৈঃ।
বিশিষ্টো দেহ এবাত্মা ন ততোহন্যো বিলক্ষণঃ।। ৬।।
[আমি স্থূল, তরুণ, যুবা, বৃদ্ধ ইত্যাদি বাক্যে স্থূল প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা দেহই বিশেষিত হয়ে থাকে। দেহ থেকে ভিন্ন অন্য কোন আত্মা নামক পদার্থ ঐ বিশেষণের বিশেষ্য হয় না।]

.
জড়ভূতবিকারেষু চৈতন্যং যত্তু দৃশ্যতে।
তাম্বুলপূগচূর্ণানাং যোগাদ্রাগ ইবোত্থিতম্ ।। ৭।।
[জড় ভূতের বিকাররূপ শরীরাদিতে যে চৈতন্য দৃষ্ট হয়, তা পান, সুপারি এবং চূণ সংযোগে রক্তিমার ন্যায়- সংযোগজন্য।]

.
ইহলোকাৎ পরো নান্যঃ স্বর্গোহস্তি নরকা ন চ।
শিবলোকাদয়ো মূঢ়ৈঃ কল্প্যন্তেহন্যৈঃ প্রতারকৈঃ।। ৮।।
[ইহলোক থেকে পৃথক স্বর্গ অথবা নরক নামক কোন স্থান নেই। মূর্খ এবং প্রতারকেরাই শিবলোকাদির কল্পনা করে থাকে।]

.
স্বর্গানুভূতির্মৃষ্টাষ্টির্দ্ব্যষ্টবর্ষবধূগমঃ।
সূক্ষ্মবস্ত্রসুগন্ধস্রক্চন্দনাদিনিষেবণম্ ।। ৯।।

[শোভন অন্নভোজন, ষোড়শী যুবতীর সঙ্গ, সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং সুগন্ধ মাল্য চন্দনাদির উপভোগই স্বর্গানুভব।]

.

নরকানুভবো বৈরিশস্ত্রব্যাধ্যাদ্যুপদ্রবঃ।
মোক্ষস্তু মরনং তচ্চ প্রাণবায়ুনিবর্তনম্ ।। ১০।।
[শত্রুর অস্ত্র অথবা ব্যাধি প্রভৃতির উপদ্রবই নরকানুভব। মরণই মুক্তি এবং সেই মরণ হলো প্রাণবায়ুর চিরতরে বহির্গমন।]

.

অতস্তদর্থং নায়াসং কর্ত্তুমর্হতি পণ্ডিতঃ।
তপোভিরুপবাসাদ্যৈর্মূঢ় এব প্রশুষ্যতি।। ১১।।
[সুতরাং সেই মুক্তির জন্য বিদ্বানদের কৃচ্ছ্রসাধন করা উচিত নয়। মূর্খ লোকেরাই উপবাসাদি তপস্যার দ্বারা শুষ্ক হয়।]

.

পাতিব্যত্যাদিসঙ্কেতো বুদ্ধিমদ্দুর্ব্বলৈঃ কৃতঃ।
সুবর্ণভূমিদানাদি মৃষ্টামন্ত্রণভোজনম্ ।
ক্ষুৎক্ষামকুক্ষিভির্লোকৈর্দরিদ্রৈরুপকল্পিতম্ ।। ১২।।
[যারা বুদ্ধিমান অথচ স্বয়ং দুর্বল (নিজেদের স্ত্রী রক্ষায় অক্ষম) তারাই পাতিব্রত্য প্রভৃতির নিয়ম করেছে। ক্ষুধায় জর্জরিত দরিদ্র লোকেরাই সুবর্ণদান, ভূমিদান এবং শোভন নিমন্ত্রণ ভোজনের ব্যবস্থা কল্পনা করছে।]

.

দেবালয়প্রপাসত্রকূপারামাদিকর্মণাম্ ।
প্রশংসাং কুর্বতে নিত্যং পান্থা এব ন চাপরে।। ১৩।।
[পথিকেরাই কেবল দেবালয়, জলসত্র, কূপ, পান্থনিবাসের প্রশংসা করে থাকে, অন্যেরা নয়।]

.

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্ ।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ।। ১৪।।
[অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ডধারণ (সন্ন্যাস), ভস্মানুলেপন প্রভৃতি বুদ্ধি ও পৌরুষহীন মানুষের জীবিকার্জনের উপায় বলে বৃহস্পতি মনে করেন।]

.

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যদণ্ডনীত্যাদিভির্বুধঃ।
দৃষ্টৈরেব সদোপায়ৈর্ভোগাননুভবেদ্ভুবি।। ১৫।।
[অতএব বুদ্ধিমান সর্বদা কৃষিকর্ম, গোপালন, বাণিজ্য এবং দণ্ডনীতি প্রভৃতি দৃষ্ট উপায় দ্বারা এই পৃথিবীতেই ভোগ অনুভব করেন।]

...

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতসর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহে লোকায়তিকপক্ষো নাম দ্বিতীয়ং প্রকরণম্ ।
[আচার্য শঙ্কর বিরচিত সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহনামক গ্রন্থের লোকায়তিকপক্ষ নামক দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত হলো।]
…

.
মাধবাচার্যের ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ ও শঙ্করাচার্যের ‘সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ’-এ উদ্ধৃত লোকগাথাগুলিতে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, লোকগাথাগুলিকে প্রতিপক্ষ আধ্যাত্মবাদী দার্শনিক কর্তৃক যুক্তি খণ্ডনের নিমিত্তে পূর্বপক্ষ হিসেবে তাদের সাহিত্যে স্থাপন করা হয়েছে। এই লোকগাথাগুলির মূল কথা প্রধানতই নেতিবাচক এবং প্রধান ঝোঁক পরমত খণ্ডন। অর্থাৎ আধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা তাঁদের দার্শনিক সিদ্ধান্তে যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন তার অনেক কথাই এসব লোকগাথায় নস্যাৎ করার আয়োজন করা হয়েছে বলে মনে হয়। এতে স্বমত প্রতিষ্ঠায় যুক্তিজাল বিস্তারের কোন আয়োজন চোখে পড়ে না। এবং এগুলোর প্রধান হাতিয়ার হলো কটাক্ষপূর্ণ বক্তব্য অর্থাৎ বাস্তব জীবনের প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও হাসি-তামাশার ব্যবহার।

.
এছাড়া, অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, মহর্ষি বাৎস্যায়ন তাঁর অতি প্রসিদ্ধ ‘কামসূত্র’ গ্রন্থে লোকায়তিক মতের বর্ণনায় প্রাসঙ্গিক যে সূত্রগুলি উদ্ধৃত করেছেন সেগুলি সংকলিত বার্হস্পত্য-সূত্রেও রয়েছে। বাৎস্যায়ন ‘কামসূত্রে’র ‘সাধারণাধিকরণম্’-এর দ্বিতীয় অধ্যায় ‘ত্রিবর্গপ্রতিপত্তিঃ’-তে লোকায়তিক বর্ণনায় বলছেন-

‘নধর্ম্মাংশ্চরেৎ; এষ্যৎফলত্বাৎ, সাংশয়িকত্বাচ্চ।।
কো হ্যবালিশো হস্তগতং পরগতং কুর্য্যাৎ।।
বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ।।
বরং সংশয়িকান্নিষ্কাদসাংশয়িকঃ কার্যাপণঃ।-ইতি লৌকায়তিকাঃ।’- (কামসূত্র-১/২/২১-২৪)।।
অর্থাৎ :
‘ধর্ম্মাচরণ করিবার প্রয়োজন নাই;- কারণ তাহার ফল ইহজন্মে পাওয়া যায় না এবং যজ্ঞাদি সাধিত হইলেও ফল হইবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহও আছে’। ২১।। ‘মূর্খ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি হস্তগত দ্রব্যকে পরগত করে?’ ২২।। ‘আগামী কল্যকার ময়ূর লাভ অপেক্ষা অদ্যকার পারাবত লাভ মন্দের মধ্যে ভাল’। ২৩।। ‘সংশয়সঙ্কুল হেমশত লাভ অপেক্ষা নিঃসন্দেহে এক কার্যাপণ লাভও মন্দের ভাল।- একই কথা লোকায়তিক নাস্তিকেরা বলিয়া থাকে।’ ২৪।। (তর্জমা- গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর)।

এই বাৎস্যায়ন এবং ভারতীয় দর্শন-সাহিত্যের প্রখ্যাত ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন একই ব্যক্তি কিনা তা নির্ণয়সাপেক্ষ। তবে আস্তিক মতাদর্শি হিসেবে লোকায়তিক নাস্তিক মতের বিরোধিতা তিনি করবেন এতে আর আশ্চর্যের কী ! কিন্তু এই নাস্তিক-মতের বিরোধিতা

করলেও প্রাচীন ভারতীয় দর্শন তথা ধর্মশাস্ত্রে স্বীকৃত মানবজীবনের অন্যতম পুরুষার্থ হিসেবে জাগতিক 'কাম'কে গুরুত্ব দিয়েই তিনি স্বতন্ত্র কামশাস্ত্র হিসেবে 'কামসূত্র' প্রণয়নেও দ্বিধা করেননি। এবং বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে ধর্মাচরণজনিত লোকাচার আখ্যায়িত করে তিনি হয়তোবা শাস্ত্র নির্দেশনা মোতাবেক কামচর্চাকেও ধর্মাচরণেরই অঙ্গ বলে প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। কেননা ঠিক পরের শ্লোকেই তিনি বলছেন-

'শাস্ত্রস্যানভিশঙ্ক্যত্বাদ্ অভিচারানুর্‍্যাহারয়োশ্চ ক্বচিৎ ফলদর্শনারক্ষত্রচন্দ্রসূর্য্যতারাগ্রহচক্রস্য লোকার্থং বুদ্ধিপূর্ব্বকমিব প্রবৃত্তের্ন্দর্শনাদ্ বর্ণাশ্রমাচরস্থিতিলক্ষণত্বাচ্চ লোকযাত্রায়া হস্তগতস্য চ বীজস্য ভবিষ্যতঃ শস্যার্থে ত্যাগদর্শনাৎ চরেদ্ধস্মানিতি বাৎস্যায়নঃ।' (কামসূত্র-১/২/২৫)।।
অর্থাৎ :
'শাস্ত্রের উপর আশঙ্কাপ্রকাশ করিতে পারা যায় না, অভিচার ও শান্তিকপৌষ্টিকাদির ফল কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, লোকের শুভাশুভ প্রদর্শনার্থই যেন বুদ্ধিপূর্ব্বক নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহচক্রের প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, লোকযাত্রা বর্ণাশ্রমাচার-ঘটিত এবং ভবিষ্যৎ শস্যলাভার্থ বীজ হস্তগত হইলেও ভূমিতে বপন করা হয় দেখিতে পাওয়া যায়।- এই হেতু ধর্ম্মাচরণ করিবে,- এই কথা বাৎস্যায়ন বলেন'। (তর্জমা গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর)।।

..

সে যাক, কিন্তু লোকগাথাগুলিতে যুক্তিজাল বিস্তারের আয়োজন নেই বলেই এজাতীয় খণ্ডনপদ্ধতি যুক্তিহীন বা দার্শনিক মর্যাদার দিক থেকে অবান্তর ভাবারও কারণ নেই। কেননা প্রচলিত অর্থে বিচার-বিশ্লেষণের আয়োজন না থাকলেও এই প্রাণশক্তিপূর্ণ লোকগাথাগুলি কোনভাবেই যুক্তিশূন্য নয়। আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হিসেবে প্রকাশিত হলেও এগুলির ভিত্তি-ভূমিতে কোন যুক্তির পরিচয় না-থাকলে প্রতিটা বিপক্ষ দর্শন-সাহিত্যে এদের খণ্ডনে ব্যাপক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন হতো না। অতএব কেবলই পরমত খণ্ডন-লিপ্ত লোকগাথা হলেও দার্শনিক বিচার-পদ্ধতিতে এর অন্তর্নিহিত যুক্তির মধ্যেই স্বীয় মতের পরিচয় নিহিত রয়েছে। সেগুলি সংশ্লেষণের মধ্য দিয়েই লোকায়ত চার্বাক দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত এবং এর রূপরেখা তৈরি ও পুনর্গঠন করাও অসম্ভব নয় বলেই বিদ্বানেরা মনে করেন।

.

কিন্তু এই লোকগাথাপ্রসূত লোকায়ত মতের সাথে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রাচীন গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্রে' কৌটিল্য বর্ণিত আদি লোকায়ত ধারণার যে দ্বন্দ্বমূলক ভিন্নতা সূচিত হয়ে আছে, তার ব্যাপারে কোন যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত না-আসা পর্যন্ত বিষয়টা রহস্যময় প্রশ্ন হয়েই থেকে যায়।

৭.০ : চার্বাক-ষষ্ঠি

...

বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে চার্বাকের নামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রচলিত লোকগাথা বা লোকগাথার আদলে সংগৃহিত শ্লোক সংকলন হচেছ 'চার্বাক-ষষ্ঠি'। পণ্ডিতদের মতে চার্বাকষষ্ঠি হলো বার্হস্পত্য-সূত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। প্রাচীন দর্শন গ্রন্থের রচয়িতারা চার্বাক মত উপস্থাপন করতে গিয়ে এই শ্লোকগুলিরও আশ্রয় নিয়েছেন ব্যাপকভাবে। ষষ্ঠি অর্থ ষাট। চার্বাকষষ্ঠিতে চার্বাকের নামে প্রচলিত প্রামাণিক লোকগাথাগুলি ষাটটি লোকায়ত শ্লোকে সংকলিত হয়েছে বলে এর নাম হয়েছে চার্বাক-ষষ্ঠি। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এই মূল চার্বাক-ষষ্ঠি বাংলা তর্জমাসহ উপস্থাপন করা হলো।.

...

[সংগ্রহ সূত্র: সায়ন মাধবীয় সর্বদর্শনসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)- চার্বাকদর্শন / অমিত ভট্টাচার্য / সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।]

চার্বাক-ষষ্ঠি

...

গ্রাবোন্মজ্জনবদ্ যজ্ঞফলেহপি শ্রুতিসত্যতা।
কা শ্রদ্ধা তত্র ধীবৃদ্ধাঃ! কামাধ্বা যৎ খিলীকৃতঃ।। ১।।

[পাথর ভাসতে থাকার মতো যজ্ঞের ফল বিষয়ে বেদের সত্যতাও অসম্ভব। ওহে বুদ্ধিমানেরা! সে সম্বন্ধে তোমাদের কী এমন বিশ্বাস যে কামের পথ অবরুদ্ধ করেছ?]

...

কেনাপি বোধিসত্ত্বেন জাতং সত্ত্বেন হেতুনা।
যদ্ বেদমর্মভেদায় জগদে জগদস্থিরম্ ।। ২।।

[কোন এক বোধিসত্ত্ব বেদের মর্ম উদ্ঘাটনের জন্য জন্মেছিলেন। যেহেতু সত্তা নামক হেতুর সাহায্যে তিনি জগতকে ক্ষণিক বলেছিলেন।]

...

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ী তন্ত্রং ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ড্রকম্ ।
প্রজ্ঞাপৌরুষনিঃস্বানাং জীবো জল্পতি জীবিকাম্ ।। ৩।।

[(বৃহস্পতি বলেন-) হোম, বেদবিহিত কার্যকলাপ, পাশুপত ব্রত ও ভস্ম তিলক হলো প্রজ্ঞাশক্তিহীন ব্যক্তিদের জীবিকা।]

...

শুদ্ধির্বংশদ্বয়ীশুদ্ধৌ পিত্রোঃ পিত্রোর্যদেকশঃ।
তদনন্তকুলা দোষাদদোষা জাতিরস্তি কা।। ৪।।

[যেহেতু পিতামাতার দুই বংশের একে একে শুদ্ধতা হলে শুদ্ধি হয় এবং একইভাবে অনন্ত বংশভেদ তাই দোষবশত নির্দোষ জন্ম কোথায় আছে?]

...

কামিনীবর্গসংসর্গের্ন কঃ সংক্রান্তপাতকঃ।
নাশ্নাতি স্নাতি হা মোহাৎ কামক্ষামমিদং জগৎ ।। ৫।।
[কামিনীগোষ্ঠীর সংসর্গে কে না পাপে আক্রান্ত হয়? হায়, মোহবশে এই জগতে কাম্য ফলের অভাব সত্ত্বেও (ব্রতপার্বণে) খায় না, স্নান করে।]
...
ঈর্ষ্যয়া রক্ষতো নারীর্ধিক্ কুলস্থিতিদাম্ভিকান্ ।
স্মরান্ধত্বাবিশেষেহপি তথা নরমরক্ষতঃ।। ৬।।
[কামান্ধ ভাবের পার্থক্য না থাকলেও যারা ঈর্ষাবশত মেয়েদের আটকে রাখে আর পুরুষদের নিবৃত্ত করে না, কুলের মর্যাদার বিষয়ে দাম্ভিক সেই লোকেদের ধিক্ ।]
...
পরদারনিবৃত্তির্যা সোহয়ং স্বয়মনাদৃতঃ।
অহল্যাকেলিলোলেন দম্ভো দম্ভোলিপাণিনা।। ৭।।
[পরস্ত্রী থেকে যে নিবৃত্ত থাকা- সেটা হলো দম্ভ। বজ্রপাণি ইন্দ্র অহল্যার সঙ্গে কামক্রীড়ায় তৎপর হয়ে স্বয়ং তা উপেক্ষা করেছেন।]
...
গুরুতল্পগতৌ পাপকল্পনাং ত্যজত দ্বিজাঃ।
যেষাং বঃ পত্যুরত্যুচ্চৈর্গুরুদারগ্রহে গ্রহঃ।। ৮।।
[ওহে ব্রাহ্মণের দল! তোমরা এমন, যাদের পতি চাঁদের গুরুপত্নী সম্ভোগে অত্যন্ত আগ্রহ। অতএব গুরুপত্নী সম্ভোগে যে পাপ তার কল্পনা ত্যাগ কর।]
...
পাপাৎ তাপা মুদঃ পুণ্যাৎ পরাসোঃ স্যুরিতি শ্রুতিঃ।
বৈপরীত্যং দ্রুতং সাক্ষাৎ তদাখ্যাত বলাবলে।। ৯।।
[পাপ থেকে মৃতের তাপ, পুণ্য থেকে আনন্দ- এই হচ্ছে বেদ। দ্রুত প্রত্যক্ষ হচ্ছে এর বিপরীত ভাব। অতএব সবল ও দুর্বল কোনটা তোমরাই বল।]
...
সন্দেহেহপ্যন্যদেহাপ্তের্বিবর্জ্যং বৃজিনং যদি।
ত্যজত শ্রোত্রিয়াঃ সত্রং হিংসাদূষণসংশয়াৎ ।। ১০।।
[অন্যদেহ লাভ করা বিষয়ে সন্দেহ সত্ত্বেও যদি পাপ বর্জনীয় হয়, তবে ওহে বেদপাঠকের দল, হিংসাদোষের সন্দেহ থাকায় যজ্ঞ ছেড়ে দাও।]
...
যস্ত্রিবেদবিদাং বন্দ্যঃ স ব্যাসোহপি জজল্প বঃ।
রামায়া জাতকামায়াঃ প্রশস্তা হস্তধারণা।। ১১।।
[ত্রিবেদজ্ঞ পণ্ডিত তোমাদের আরাধ্য ব্যাসদেবও বলেছেন- কামার্ত রমণীর হস্তধারণ যুক্তিযুক্ত।]
...

সুকৃতে বঃ কথং শ্রদ্ধা সুরতে চ কথং ন সা।
তৎ কর্ম পুরুষঃ কুর্য্যাদ্ যেনান্তে সুখমেধতে।। ১২।।
[সুকৃতি বিষয়ে তোমাদের শ্রদ্ধা কেন, স্ত্রী সম্ভোগে তা নেই কেন? পুরুষের সেই কাজ করা উচিত যার শেষে আনন্দ বা সুখ বাড়ে।]
...
বলাৎ কুরুত পাপানি সন্তু তান্যকৃতানি বঃ।
সর্বান্ বলকৃতান্ দোষানকৃতান্ মনুরব্রবীৎ ।। ১৩।।
[জোর করে পাপ কর, সে-সব তোমাদের না-করা হিসেবে থাকবে। মনুই তো বলেছেন- বলপূর্বক সব কিছু করে ফেলা তো না-করা দোষ।]
...
স্বাগমার্থেঽপি মা স্থাস্মিংস্তৈর্থিকা বিচিকিৎসবঃ।
তং তমাচরতানন্দং স্বচ্ছন্দং যং যমিচ্ছথ।। ১৪।।
[ওহে সম্প্রদায়ভুক্তগণ! নিজেদের শাস্ত্রের এই অর্থ বিষয়েও সন্দিগ্ধ থেকো না। যা যা চাও স্বচ্ছন্দে সেই সেই আনন্দ ভোগ কর।]
...
শ্রুতিস্মৃত্যর্থবোধেষু ক্কৈকমত্যং মহাধিয়াম্ ।
ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপো সা নোপেক্ষ্যা সুখোন্মুখী।। ১৫।।
[বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের অর্থবোধের বিষয়ে মহাজ্ঞানীদের মধ্যে কোথায় ঐকমত্য রয়েছে? ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলের উপর নির্ভরশীল। সুখের অভিমুখী ব্যাখ্যা উপেক্ষণীয় নয়।]
...
যস্মিন্নস্মীতি ধীর্দেহে তদ্দাহে বঃ কিমেনসা।
ক্কাপি তৎ কিং ফলং ন স্যাদাত্মেতি পরসাক্ষিকে।। ১৬।।
[যে দেহে আছি বলে জ্ঞান হচ্ছে, তা পুড়িয়ে ফেললে পাপে তোমাদের কী হবে? অন্য কিছু যার সাক্ষী, সেই আত্মাতে ফল হলে আত্মা হওয়ার সুবাদে অন্য কোথাও কি তা হতে পারে না?]
...
মৃতঃ স্মরতি জন্মানি মৃতে কর্মফলোর্ময়ঃ।
অন্যভুক্তৈর্মৃতে তৃপ্তিরিত্যলং ধূর্তবার্তয়া।। ১৭।।
[মৃত ব্যক্তি পূর্বজন্মগুলি স্মরণ করে, মৃত ব্যক্তিতে কর্মফলের পরম্পরা বর্তায়, অন্যদের খাওয়ার ফলে মৃতের তৃপ্তি হয়- এধরনের বজ্জাতি-পূর্ণ কথায় লাভ নেই।]
...
জনেন জানতাঽস্মীতি কায়ং নায়ং ত্বমিত্যসৌ।
ত্যাজ্যতে গ্রাহ্যতে চান্যদহো! শ্রুত্যাতিধূর্তয়া।। ১৮।।
[বেদ অতিমাত্রায় ধূর্ত। আশ্চর্য! যে লোক ‘আমি আছি’ এইভাবে দেহকে জানে, ‘এটি তুমি নও’ এইভাবে তাকে তা ছাড়তে ও অন্য কিছুকে ধরতে প্রেরণা যোগায়।]

...
একং সন্দিগ্ধয়োস্তাবদ্ ভাবি তত্রেষ্টজন্মনি।
হেতুমাহুঃ স্বমন্ত্রাদীনসঙ্গাননন্যথা বিটাঃ।। ১৯।।
[উভয়পক্ষে সন্দেহের মধ্যে একটি অবশ্যই হবে। তার মধ্যে ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তি হলে ধূর্তেরা নিজেদের মন্ত্র প্রভৃতিকে তার কারণ বলে, অন্যথা হলে সেগুলোর অঙ্গহানি উল্লেখ করে।]
...
একস্য বিশ্বপাপেন তাপেহনন্তে নিমজ্জতঃ।
কঃ শ্রৌতস্যাত্মনো ভীরো! ঋারঃ স্যাদ্ দুরিতেন তে।। ২০।।
[ওহে ভীরু! সকলের পাপের ফলে অন্তহীন তাপে বেদে প্রতিপাদিত যে একমাত্র আত্মা ডুবে যাচ্ছে, তোমার পাপে তার কী ভারবৃদ্ধি হবে?]
...
কিং তে বৃন্তহৃতাৎ পুষ্পাৎ তন্মাত্রে হি ফলপ্রদঃ।
ন্যস্য তন্মূর্দ্ধ্নন্যস্য ন্যাস্যমেবাশ্মনো যদি।। ২১।।
[বৃন্ত হতে সংগৃহীত পুষ্পে তোমার কী প্রয়োজন? কারণ কেবল সেখানে তাতে ফল ধরে। যদি পাথরের মাথাতেই তা রাখবার উপযুক্ত হয় তবে তা নিজের মাথায় রাখ।]
...
তৃণানীব ঘৃণাবাদান্ বিধূনয় বধূরনু।
তবাপি তাদৃশস্যৈব কা চিরং জনবঞ্চনা।। ২২।।
[স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে ঘৃণাসূচক কথাগুলোকে তৃণের ন্যায় পরিহার কর। তুমিও সেইরকম হওয়ায় দীর্ঘকাল তোমার লোকঠকানো কেন?]
...
কুরুধ্বং কামদেবাজ্ঞাং ব্রহ্মাদ্যৈরপ্যলঙ্ঘিতাম্ ।
বেদোহপি দেবকীয়াজ্ঞা তত্রাজ্ঞাঃ কাধিকার্হণা।। ২৩।।
[ওহে মূর্খের দল! ব্রহ্মা প্রভৃতিও যা লঙ্ঘন করেননি, কামদেবের সেই আজ্ঞা পালন কর। বেদও দেবতার আজ্ঞা। সে বিষয়ে বেশি সম্মান কেন?]
...
প্রলাপমপি বেদস্য ভাগং মন্যধ্ব এব চেৎ ।
কেনাভাগ্যেন দুঃখান্ন বিধীনপি তথেচ্ছথ।। ২৪।।
[যদি বেদের অংশবিশেষকেও প্রলাপোক্তি বলেই মেনে থাক, তবে কোন্ দুর্ভাগ্যবশে দুঃখকর বিধানগুলোকে তেমন স্বীকার করছ না?]
...
শ্রুতিং শ্রদ্ধত্থ বিক্ষিপ্তাঃ প্রক্ষিপ্তাৎ ব্রূথ চ স্বয়ম্ ।
মীমাংসামাংসলপ্রজ্ঞাস্তাং যূপদ্বিপদাপিনীম্ ।। ২৫।।
[ওহে মীমাংসায় পরিপক্ক বুদ্ধিমানের দল! তোমরা বেদকে শ্রদ্ধা কর। আবার পরাস্ত হয়ে

হাড়িকাঠে বাঁধা হাতি দান করতে বলছে- এমন বেদকে নিজেরাই প্রক্ষিপ্ত বল।]
...
কো হি বেদাস্ত্যমুষ্মিন্ বা লোকে ইত্যাহ যা শ্রুতিঃ।
তৎপ্রামাণ্যাদমুং লোকং লোকঃ প্রত্যেতু বা কথম্ ।। ২৬।।
[কে জানে পরলোকে (সুখ) আছে কি-না- এইভাবে যে বেদ বলেছে, তাকে প্রমাণ ধরে নিয়ে পরলোক সম্বন্ধে লোকে কীভাবে বিশ্বাস করবে?]
...
ধর্মাধর্মৌ মনুর্জল্পন্ অশক্যার্জনবর্জনৌ।
ব্যাজান্ মণ্ডলদণ্ডার্থী শ্রদ্দধায়ি মুধা বুধৈঃ।। ২৭।।
[ধর্ম অর্জন ও অধর্ম বর্জন করতে পারা যায় না। কৌশলে রাষ্ট্রের দণ্ড আদায়ের প্রয়োজনে সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মনু বৃথাই পণ্ডিতদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন।]
...
ব্যাসস্যৈব গিরা তস্মিন্ শ্রদ্ধেত্যদ্ধা স্থ তান্ত্রিকাঃ।
মৎস্যস্যাপ্যুপদেশ্যান্ বঃ কো মৎস্যানপি ভাষতাম্ ।। ২৮।।
[ব্যাসদেবের কথায় সে বিষয়ে আস্থা হয়েছে- এইভাবে নিশ্চয় তোমরা যুক্তিবাদী বটে! তোমরা মাছেরও উপদেশের পাত্র। তোমাদের সঙ্গে, এমনকি মাছেদের সঙ্গে, কে কথা বলবে?]
...
পণ্ডিতঃ পাণ্ডবানাং স ব্যাসশ্চাটুপটুঃ কবিঃ।
নিনিন্দ তেষু নিন্দৎসু স্তুবৎসু স্তুতবান্ ন কিম্ ।। ২৯।।
[ঐ ব্যাস পাণ্ডবদের চাটুকারিতায় পটু কবি ও পণ্ডিত। তারা নিন্দা করতে থাকলে সে নিন্দা করেনি কি? তারা প্রশংসা করতে থাকলে সে প্রশংসা করেনি কি?]
...
ন ভ্রাতুঃ কিল দেব্যাং স ব্যাসঃ কামাৎ সমাসজৎ।
দাসীরতস্তদাসীদ্ যন্মাত্রা তত্রাপ্যদেশি কিম্ ।। ৩০।।
[ঐ ব্যাস ভ্রাতৃবধূর প্রতি নাকি কামবশে আসক্ত হয় নি। তখন দাসীর সঙ্গে সে যে রত ছিল, তাতেও কি মা আদেশ করেছিলেন?]
...
দেবৈর্দ্বিজৈঃ কৃতা গ্রন্থাঃ পন্থা যেষাং তদাদৃতৌ।
গাং নতৈঃ কিং ন তৈর্ব্যক্তং ততোহপ্যাত্মাধরীকৃতঃ।। ৩১।।
[দেবতা ও ব্রাহ্মণদের লেখা বইগুলো যাদের কাছে তাঁদের সমাদর সম্বন্ধে পথনির্দেশ, তারা গোরুকে প্রণাম জানিয়ে তার থেকেও কি নিজেদের স্পষ্টভাবে ছোট করে নি?]
...
সাধুকামুকতামুক্তা শান্তস্বান্তৈর্মখোন্মুখৈঃ।
সারঙ্গলোচনাসারাং দিবং প্রেত্যাপি লিপ্সুভিঃ।। ৩২।।

[যাদের মন শান্ত, তারা যজ্ঞে উন্মুখ হয়ে মরেও সেই স্বর্গলাভ করতে চায় যেখানে সারবস্তু হল হরিণনয়না অপ্সরা। তারা ঠিকভাবেই কামুকতা ছাড়েনি।]
...
কঃ শমঃ ক্রিয়তাং প্রাজ্ঞাঃ! প্রিয়াপ্রীতৌ পরিশ্রমঃ।
ভস্মীভূতস্য ভূতস্য পুনরাগমনং কুতঃ।। ৩৩।।
[ওহে প্রকৃষ্ট অজ্ঞের দল! শান্তি আবার কী? প্রেয়সীর প্রীতি উৎপাদনের জন্য পরিশ্রম কর। ভস্মীভূত জীবের পুনরাগমন কীভাবে হবে?]
...
উভয়ী প্রকৃতিঃ কামে সজ্জেদিতি মুনের্মনঃ।
অপবর্গে তৃতীয়েতি ভণতঃ পাণিনেরপি।। ৩৪।।
['অপবর্গে তৃতীয়া' এইভাবে যিনি বলছেন, সেই পাণিনি মুনিরও অভিপ্রায় হল- স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই ব্যক্তির (অথবা ধর্ম ও অর্থ এই দুই বিষয়ের) কামে আসক্ত থাকা উচিত। (পাণিনি সূত্রের প্রকৃত অর্থ- ফলপ্রাপ্তি বোঝালে ব্যাপ্তি অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। বিকৃত অর্থ করা হচ্ছে- মোক্ষ বিষয়ে তৃতীয় অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন নপুংসক নিযুক্ত থাকবে অথবা মোক্ষের বিষয়ে তৃতীয় পুরুষার্থ অর্থাৎ কামই উপযোগী।]
...
বিভ্রত্যুপরি যানায় জনা জনিতমজ্জনাঃ।
বিগ্রহায়াগ্রতঃ পশ্চাদ্ গত্বরোরভ্রবিভ্রমম্ ।। ৩৫।।
[উর্ধ্বলোকে যাওয়ার জন্যে (গঙ্গায়) ডুব দিয়ে লোকেরা- সামনে যুদ্ধ করতে গিয়ে পিছিয়ে যায়, এমন ভেড়ার সদৃশ্য লাভ করে।]
...
এনসানেন তির্য্যক্ স্যাদিত্যাদিঃ কা বিভীষিকা।
রাজিলোহপি হি রাজেব স্বৈঃ সুখী সুখহেতুভিঃ।। ৩৬।।
[এই পাপে তীর্যক প্রাণী হবে- ইত্যাদি কী বিভীষিকা! নিজের সুখের উপকরণে ঢোঁড়া সাপও রাজার মতো সুখী।]
...
হতাশ্চেদ্ দিবি দীপ্যন্তি দৈত্যা দৈত্যারিণা রণে।
তত্রাপি তেন যুধ্যন্তাং হতা অপি তথৈব তে।। ৩৭।।
[নিহত হয়ে যদি কেউ স্বর্গে খেলা করে, তবে দৈত্যদের শত্রু বিষ্ণুর হাতে সেইভাবেই নিহত হয়ে সেই দৈত্যগুলো সেখানেও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করুক।]
...
স্বং চ ব্রহ্ম চ সংসারে মুক্তৌ তু ব্রহ্ম কেবলম্ ।
ইতি স্বোচ্ছিত্তিমুক্ত্যুক্তির্বৈদগ্ধী বেদবাদিনাম্ ।। ৩৮।।
[সংসারদশায় নিজে ও ব্রহ্ম আছে, কিন্তু মুক্তিতে কেবল ব্রহ্ম- এই হলো বেদবাদীদের নিজের উচ্ছেদ নামক মুক্তি সম্পর্কে উক্তির বাহাদুরি।]

...
মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্ ।
গোতমং তমবেক্ষ্যৈব যথা বিথ তথৈব সঃ।। ৩৯।।
[চেতনদের পাষাণত্ব প্রাপ্তি নামক মুক্তির জন্য যে শাস্ত্র রচনা করেছে, সেই গোতমকে বিচার করে যেভাবে জানছ, সে ঠিক তাই করবে।]
...
দারা হরিহরাদীনাং তন্মগ্নমনসো ভৃশম্ ।
কিং ন মুক্তাঃ কুতঃ সন্তি কারাগারে মনোভুবঃ।। ৪০।।
[হরি, হর প্রভৃতির পত্নীরা নিরন্তর তাঁদের সম্বন্ধে মনোনিবেশ করেও কেন মুক্ত নয়? কেন তারা কামের কারাগারে থাকে?]
...
দেবশ্চেদস্তি সর্বজ্ঞঃ করুণাভাগবন্ধ্যবাক্ ।
তৎ কিং বাগব্যয়মাত্রান্ন কৃতার্থয়তি নার্থিনঃ।। ৪১।।
[যদি কৃপালু, সত্যবাক্, সর্বজ্ঞ কোন দেবতা থেকে থাকেন, তবে কেবল বাক্য ব্যয় করে আমাদের মতো প্রার্থীদের কৃতার্থ করেন না কেন?]
...
ভবিনাং ভাবয়ন্ দুঃখং স্বকর্মজমপীশ্বরঃ।
স্যাদকারণবৈরী নঃ কারণাদপরে পরে।। ৪২।।
[অন্যেরা কারণবশত আমাদের শত্রু হয়। সংসারীদের আপন কর্মজনিত দুঃখও ঘটতে প্রবর্তনা দিয়ে ঈশ্বর অকারণে আমাদের শত্রু হয়ে পড়বেন।]
...
তর্কাপ্রতিষ্ঠয়া সাম্যাদন্যোন্যস্য ব্যতিঘœতাম্ ।
নাপ্রামাণ্যং মতানাং স্যাৎ কেষাং সৎপ্রতিপক্ষবৎ।। ৪৩।।
[যেহেতু যুক্তির অপ্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে সাদৃশ্য আছে, সেহেতু পরস্পরের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে এমন কোন্ মতগুলি সৎপ্রতিপক্ষ নামক দোষে দুষ্ট হয়ে প্রামাণ্যহীন হবে না?]
...
অক্রোধং শিক্ষয়ন্ত্যন্যৈঃ ক্রোধনা যে তপোধনাঃ।
নির্ধনাস্তে ধনায়ৈব ধাতুবাদোপদেশিনঃ।। ৪৪।।
[যে ক্রোধী তপস্বীরা অপরকে ক্রোধের অভাব বিষয়ে শিক্ষা দেয়, তারা নির্ধন হওয়ায় ধনের জন্যই ধাতুবিষয়ক কথার উপদেশ দেয়।]
...
কিং বিত্তং দত্তুষ্টৈয়মদাতরি হরিপ্রিয়া।
দত্বা সর্বং ধনং মুগ্ধো বন্ধনং লব্ধবান্ বলিঃ।। ৪৫।।
[তোমরা কেন ধন দাও? এই হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী, যে দাতা নয় তার উপর সন্তুষ্ট। মূর্খ বলি সব ধন দান করে বন্ধন লাভ করেছিল।]

...
দোগ্ধা দ্রোগ্ধা চ সর্বোহয়ং ধনিনশ্চেতসা জনঃ।
বিসৃজ্য লোভসংক্ষোভমেকদ্বা যদ্যুদাসতে।। ৪৬।।
[এইসব লোক ধনীকে দোহন করে, মনে মনে তার অপকারও করে। লোভের চাঞ্চল্য ত্যাগ করে যদি কেউ উদাসীন থাকে, তো দু'একজন।]
...
দৈনস্যায়ুষ্যমস্তৈন্যমভক্ষ্যং কুক্ষিবঞ্চনা।
স্বাচ্ছন্দ্যমৃচ্ছতানন্দকন্দলীকন্দমেককম্ ।। ৪৭।।
[অচৌর্য বা চুরি না করা দৈন্যের আয়ু বাড়ায়। না খাওয়া (উপবাস) হল জঠরকে বঞ্চনা করা। সুখের একমাত্র অঙ্কুর যে স্বেচ্ছাচার- তাই অবলম্বন কর।]
...
অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।। ৪৮।।
[(চার্বাক মতানুসারে-) পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু- এই চারিটিই ভূত। কিণ্ব বা বৃক্ষবিশেষের নির্যাস ইত্যাদির বিকার বা পরিণাম থেকে মদশক্তির ন্যায় উক্ত চারিটি ভূত থেকেই দেহে চৈতন্য জন্মে।]
...
অহং স্থূলঃ কৃশোহস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ।
দেহঃ স্থৌল্যাদিযোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ।
মম দেহোহয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকী।। ৪৯।।
[আমি স্থূল, কৃশ- ইত্যাদি রূপে আত্মা ও দেহের সামানাধিকরণ্য হয়। দেহই স্থূল বা কৃশ হয় বলে দেহই আত্মা শব্দের বাচ্য। দেহ ভিন্ন অন্য কোন আত্মা নেই। 'আমার দেহ' এরূপ প্রয়োগ ঔপচারিক বা গৌণ।]
...
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে।। ৫০।।
[জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে নিহত পশুর যদি স্বর্গলাভ হয়, তবে যজ্ঞকারী যজমান কেন তার পিতাকে হত্যা করে না?]
...
মৃতানামপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারণম্ ।
গচ্ছতামিহ জন্তুনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্ ।। ৫১।।
[শ্রাদ্ধ যদি মৃত ব্যক্তিদের তৃপ্তির কারণ হয় তবে এই পৃথিবীতে পর্যটনকারী মানুষের পথের সম্বল ভোজ্য দ্রব্যাদির প্রদান ব্যর্থ।]
...

গৃহস্থকৃতশ্রাদ্ধেন পথিতৃপ্তিরবারিতা।
নির্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সবর্ধয়েচ্ছিখাম্ ।। ৫২।।
[নির্বাপিত প্রদীপে তেল ঢাললে তার শিখা প্রদীপ্ত হওয়া উচিত। গৃহস্থ ঘরে বসে শ্রাদ্ধ করলেই পথে ভ্রাম্যমাণ ব্যক্তির অবারিত তৃপ্তি হোক।]
...
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে।। ৫৩।।
[স্বর্গস্থিত পিতৃগণ যদি দানের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন, তবে প্রাসাদের উপরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এই গৃহে কেন দান করছেন না?]
...
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ।। ৫৪।।
[আত্মা যদি দেহ হতে মুক্ত হয়ে পরলোকে গমন করে তবে পুনরায় বন্ধুস্নেহে ব্যাকুল হয়ে কেন প্রত্যাবর্তন করে না?]
...
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।। ৫৫।।
[যতদিন বাঁচবে, ততদিন সুখে বাঁচবে। ঋণ করে হলেও ঘৃত পান করবে। ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন কোনভাবেই হতে পারে না।]
...
স্বদারপরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা।
গুরুশিষ্যপ্রণালীং চ ত্যজেৎ স্বহিতমাচরন্ ।। ৫৬।।
[নিজ স্ত্রী এবং পরস্ত্রী নির্বিশেষে যথেচ্ছ বিহার করবে। নিজের হিতসাধনে গুরুশিষ্য প্রণালী ত্যাগ করবে।]
...
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নন্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্তিতম্ ।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্তিতম্ ।
মাংসানাং খাদনং তদ্বদ্ নিশাচরসমীরিতম্ ।। ৫৭।।
[অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বের শিশ্ন পত্নীগ্রাহ্য বলে ভণ্ডরা প্রচার করেছেন। অন্যান্য পর-ব্যবহৃতসামগ্রী গ্রহণের কথাও ভণ্ডরা বলেছে। মাংস ভক্ষণের কথাও নিশাচরেরা বলেছে।]
...
অঙ্গনালিঙ্গনাজন্যসুখমেব পুমর্থতা।
কণ্টকাদিব্যথাজন্যং দুঃখং নিরয় উচ্যতে।
লোকসিদ্ধো ভবেদ্ রাজা পরেশো নাপরঃ স্মৃতঃ।। ৫৮।।
[স্ত্রীলোকের আলিঙ্গনাদিজন্য সুখই হল পুরুষার্থ। কণ্টকাদিজন্য দুঃখই হল নরক।

লোকপ্রসিদ্ধ রাজা হলেন পরমেশ্বর। অন্য কোন ঈশ্বর নেই।]

...

ত্যাজ্যং সুখং বিষয়জন্ম পুংসাং
দুঃখোপসৃষ্টমিতি মুর্খবিচারণৈষা।
ব্রীহীন্ জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্
কো নাম ভোস্তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী।। ৫৯।।

[পুরুষের বিষয়ভোগজন্য সুখ যেহেতু দুঃখ মিশ্রিত সেহেতু তাকে পরিত্যাগ করতে হবে- এটা নেহাৎই মূর্খের বিচার। এমন হিতার্থী কে আছেন- যিনি তুষকণাযুক্ত বলে পরিষ্কার উত্তম তণ্ডুলপূর্ণ ধান্য পরিত্যাগ করেন?]

...

লোকায়তমতেহপ্যেবং সংক্ষেপোহয়ং নিবেদিতঃ।
অভিধেয়তাৎপর্যার্থঃ পর্যালোচ্য সুবুদ্ধিভিঃ।। ৬০।।

[অভিধেয়, তাৎপর্য পর্যালোচনা করে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কর্তৃক সংক্ষেপে লোকায়তদের মত বিবৃত হল।]

...

ইতি চার্বাকষষ্টিঃ সমাপ্তা।

...

৮.০ : লোকায়ত ও আন্বীক্ষিকী
…
ইতঃপূর্বেই আমরা দেখেছি যে, লোকায়তকে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে'র অনুমোদিত বিদ্যাচতুষ্টয়ের অন্যতম আন্বীক্ষিকী'র অন্তর্গত শাস্ত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন-
'সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষিকী'। (অর্থশাস্ত্র: ১/২/২)।
অর্থাৎ : সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত- এই তিনটি শাস্ত্র উক্ত আন্বীক্ষিকী-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

.
কৌটিল্যের এই বিদ্যাচতুষ্টয় হলো-
'আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ'। (অর্থশাস্ত্র: ১/২/১)।
অর্থাৎ : আন্বীক্ষিকী (হেতুবিদ্যা বা তর্কবিদ্যা বা মোক্ষদায়ক আত্মতত্ত্ব), ত্রয়ী (ঋক্-যজুঃ-সামবেদাত্মক বেদ-বিদ্যাসমুদায়), বার্তা (কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যা) এবং দণ্ডনীতি (অর্থাৎ রাজনীতি বা নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র)।

.
'অর্থশাস্ত্রে'র বর্ণনা অনুসারে আন্বীক্ষিকী যে বিদ্যাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে তাও বোঝা যায় কৌটিল্যের উদ্ধৃতিতে-
ধর্মাধর্মৌ ত্রয্যাম্ । অর্থানর্থৌ বার্তায়াম্ । নয়াপনয়ৌ দণ্ডনীত্যাম্ । বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরন্বীক্ষমাণান্বীক্ষিকী লোকস্যোপকরোতি, ব্যসনেহভ্যুদয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, প্রজ্ঞাবাব্যক্রিয়াবৈশারদ্যং চ করোতি। (অর্থশাস্ত্র: ১/২/২)।
অর্থাৎ : এই আন্বীক্ষিকীর দ্বারা এবং সূক্ষ্ম অন্বীক্ষার সাহায্যে ধর্ম এবং অধর্মের বিষয় ত্রয়ীতে প্রতিপাদিত হয় ; অর্থ এবং অনর্থ প্রতিপাদিত হয় বার্তা-নামক বিদ্যায় ; এবং দণ্ডনীতিতে নয় ও অপনয় (good policy and bad policy) প্রতিপাদিত হয়। এই তিন বিদ্যার বল ও অবল (সামর্থ্য ও অসামর্থ্য) বা প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য যুক্তির দ্বারা নির্ধারণ করা হয় বলে আন্বীক্ষিকী লোকসমাজের উপকার করে থাকে, বিপৎকালে এবং অভ্যুদয়ের সময় মানুষের বুদ্ধি অবিচলিত রাখে এবং মানুষের প্রজ্ঞা, বাক্য-ব্যবহার ও কর্মশক্তির নৈপুণ্য সম্পাদন করে।

.
সহজ কথায় একমাত্র এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার সহায়তার ভিত্তিতেই অপর বিদ্যাগুলি সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। এই অপর বিদ্যাগুলির মধ্যে বেদও অন্তর্ভুক্ত। তাই কৌটিল্যের মতে আন্বীক্ষিকী সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ-
প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্ ।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা।। (অর্থশাস্ত্র: ১/২/২)।
অর্থাৎ : আন্বীক্ষিকীবিদ্যা (অপর-) সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ (মার্গদর্শক), সকল কর্মের (অর্থাৎ কর্মসাধনের পক্ষে) উপায়তুল্য, সকল (লৌকিক ও বৈদিক-) ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ বলে সর্বদা পরিগণিত হয়ে থাকে।

.

অন্যদিকে জড়বাদী বার্হস্পত্যরা তাঁদের মতাদর্শে এই আন্বীক্ষিকীকে যে বিদ্যারই অন্তর্ভুক্ত করেননি তাও কৌটিল্যের উদ্ধৃতি থেকেই জানা যায়-

বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বার্হস্পত্যাঃ। সংবরণমাত্রং হি ত্রয়ী লোকযাত্রাবিদ ইতি। (অর্থশাস্ত্র: ১/২/১)।

অর্থাৎ : বৃহস্পতির শিষ্যগণের (বার্হস্পত্যগণের) মতে, বার্তা ও দণ্ডনীতি- এই দুই প্রকারের বিদ্যা ; কারণ, ত্রয়ী লোকযাত্রাবিদের অর্থাৎ বার্তা ও দণ্ডনীতির অনুষ্ঠান বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষের পক্ষে সংবরণের অর্থাৎ আচ্ছাদনের কাজ করে মাত্র (লোকতন্ত্রজ্ঞ হলেও ত্রয়ীজ্ঞান না থাকলে নাস্তিক বলে লোকসমাজে যে নিন্দিত হতে হয়, তার থেকে রক্ষার উপায়মাত্র হওয়ায় ত্রয়ীর স্বতন্ত্র বিদ্যাত্ব স্বীকারের কোনো প্রয়োজন নেই)।

.

কৌটিল্য বর্ণিত এসব উদ্ধৃতি থেকেই স্পষ্টত বোঝা যায় যে, আন্বীক্ষিকী বৈদিক সংস্কৃতির পরিপন্থী ছিলো না কখনোই, বরং বেদের পরিপূরক শাস্ত্র হিসেবেই তা পরিগণিত হতো। ফলে জড়বাদী বার্হস্পত্যরা এটাকে বিদ্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। তবে তৎকালীন চিন্তাজগতে আন্বীক্ষিকীর যে যথেষ্ট সম্মান ছিলো, কৌটিল্যের বর্ণনাভঙ্গিতে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

.

অর্থশাস্ত্রে সাংখ্য, (ন্যায়-বৈশেষিক অর্থে) যোগ এবং লোকায়ত এই তিনটি শাস্ত্রকে আন্বীক্ষিকীর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ভারতীয় চিন্তাজগতে উপনিষদীয় চিন্তাধারা-প্রভাবিত সাংখ্য ও যোগ নামের এই সুপরিচিত দর্শন দুটি যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সমর্থনপুষ্ট, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু দর্শন জগতে এ দুটি শাস্ত্র মতের উৎস ও বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা থাকলেও লোকায়তের সেরকম কোন পরিচিতি সূত্র, ভাষ্য বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবু শাস্ত্র হিসেবে লোকায়তও যে সমসাময়িক সাংখ্য ও যোগের সমান সমানই ছিলো, 'অর্থশাস্ত্রে'র বিবরণী থেকে তা ধারণা করা যায়। আর কৌটিল্য বর্ণিত বার্হস্পত্য মতে বিদ্যার ক্ষেত্রে আন্বীক্ষিকীকে প্রবেশাধিকার না দেয়ায় অর্থশাস্ত্রোক্ত লোকায়ত যে তৎকালীন বার্হস্পত্য থেকে পৃথক ছিলো তাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ফলে এটা সহজেই অনুমেয়, পরবর্তী যুগের জড়বাদী নাস্তিকধর্মী চার্বাক দর্শনের সঙ্গে প্রাচীন এই লোকায়ত শাস্ত্র অভিন্ন ছিলো না। বরং 'লোকায়ত' সংজ্ঞার দ্বারা বিশেষিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী চার্বাক মতবাদ দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে প্রাচীন লোকায়ত শাস্ত্রের বিপরীত। তাহলে বিভিন্ন যুগের বিপরীতমুখি এই শাস্ত্র দুটির সাধারণ একটি সংজ্ঞায় অভিহিত হওয়ার মূলে কী কারণ থাকতে পারে ? এর কারণ হিসেবে পণ্ডিতেরা উভয়ের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে যে প্রভাবটিকে কার্যকর যোগসূত্র হিসেবে ধারণা করেন, তা হলো হেতুবিদ্যা। তাই বিষয়টি কিঞ্চিৎ পর্যালোচনার দাবি রাখে।

.

লোকায়ত শাস্ত্র নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। পালি সাহিত্য বিষয়ে সুপণ্ডিত রিস ডেভিডস (Rhys Davids) এ ব্যাপারে 'লোকায়ত' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উপরই

নির্ভর করতে চেয়েছেন। এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি হচ্ছে- ‘লোকেষু আয়তো লোকায়তঃ’। অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই নাম লোকায়ত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতেও- ‘লোকায়ত মত লোকে আয়ত অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই ওই নাম পাইয়াছে।’ এ ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মন্তব্য হলো- ‘জনসাধারণের মধ্যে যার পরিচয় পাওয়া যায়’। এ প্রসঙ্গে তিনি বৌদ্ধ গ্রন্থ ‘দিব্যাবদান’-এর নজির দেখিয়েছেন, যেখানে লোকায়ত শব্দ এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই ব্যবহৃত। তাছাড়া-

.

‘লোকায়ত’ শব্দের এই অর্থের অনুসরণে রিস ডেভিডস লোকায়তকে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়ের অবলম্বনে রূপায়িত শাস্ত্র হিসেবে নির্দেশ করেন এবং এই বিশেষ শাস্ত্রটি তাঁর মতে ব্রাহ্মণ্য বিদ্যারই একটি শাখা। ...এ ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন, ‘লোকায়ত’ সংজ্ঞায় তর্ক বা যুক্তিভিত্তিক এক বিশেষ শাস্ত্রকে বোঝায়, যার উল্লেখ বৌদ্ধ সাহিত্যের বহু স্থানে আছে। পালি গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে প্রাপ্ত লোকায়তসম্বন্ধীয় মন্তব্য থেকে দাশগুপ্ত মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন যে ‘লোকায়ত’ শাস্ত্রের আশ্রয় এক বিশেষ ধরনের তর্ক, যে তর্কের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে যে-কোন উপায়ে নিরস্ত করা, আত্মপক্ষ উপস্থাপনা নয়। এই জাতীয় তর্কের পারিভাষিক নাম ‘বিতণ্ডা’ এবং পালি লেখক বুদ্ধ ঘোষ লোকায়তকে বিতণ্ডাত্মক শাস্ত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন। (চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-২৪ /লতিকা চট্টোপাধ্যায়)।

.

উল্লেখ্য, ‘বিতণ্ডা’ শব্দটির পারিভাষিক অর্থ যে খুব ভালো কিছু নয় তা উপরের উদ্ধৃতি থেকেই প্রতীয়মান হয়। ন্যায়সূত্রে বিতণ্ডা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

স (জল্পঃ) প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা। (ন্যায়সূত্র: ১/২/৪৪)।
অর্থাৎ : প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন জল্পকে বিতণ্ডা বলে।

.

একটি বিষয় বুঝতে গিয়ে এখানে ফের নতুন একটি পারিভাষিক শব্দ ‘জল্প’-এর উপস্থিতির কারণে আরেকটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে হয়তো। ন্যায়শাস্ত্রে দার্শনিক বিতর্ক সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সমধর্মী কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন- বাদ, জল্প, বিতণ্ডা ইত্যাদি। উল্লেখিত এই তিনটি পদ বা শব্দই সমধর্মী অর্থাৎ তর্কসংশ্লিষ্ট। আর ভিন্নতা হচ্ছে যুক্তির উপস্থিতি-অনুপস্থিতি এবং বিপক্ষমত খণ্ডন ও স্বমত প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হওয়া-না-হওয়ার তারতম্যের মধ্যে। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া জরুরি।

.

ন্যায়শাস্ত্রে কোন বিষয় নিয়ে সাধারণভাবে কিছু বলার নাম ‘বাদ’। এই বলার ব্যাপারে বক্তব্যটির বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন ধর্মের আলোচনার প্রয়োজন হতে পারে এবং ধর্মগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ হলে বাদী (বক্তা) স্বভাবতঃই একটিকে সমর্থন এবং অপরটিকে প্রত্যাখ্যান করেন। ন্যায়ের ভাষায় একই বিষয়ে পরস্পর বিপরীত ধর্মের একটিকে পক্ষ এবং অপরটিকে প্রতিপক্ষ বলে। এই পক্ষ এবং প্রতিপক্ষের মধ্যে একটির সাধন বা স্থাপনা এবং

অপরটির উপালম্ভ বা প্রত্যাখ্যান বাদের আবশ্যিক অঙ্গ। সহজ কথায় প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে আলোচনাকেই বাদ বলে।

.

এই পক্ষ এবং প্রতিপক্ষযুক্ত বিষয় জল্পেরও অঙ্গ, তবে কেবল সাধারণ আলোচনা জল্পের প্রতিপাদ্য নয়। জল্প প্রসঙ্গে ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে-

যথোক্তপপন্নছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনো পালম্ভো জল্পঃ। (ন্যায়সূত্র: ১/২/৪৩)।
অর্থাৎ : জল্পের প্রধান উদ্দেশ্য অপরের প্রতিষিদ্ধ স্বপক্ষের স্থাপনা।

.

সহজ কথায়, কোন তত্ত্বনির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কেবলমাত্র প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য যে নিছক বাক্যুদ্ধ চলে, তাকেই বলা হয় জল্প। জল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আত্মপক্ষ সমর্থন। জল্পে প্রবৃত্ত ব্যক্তির মধ্যে বিজিগীষা বা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার এক মনোভাব থাকে, যে মনোভাব বাদে অদৃশ্য। যে বিজিগীষু মনোভাব জল্পের পটভূমি রচনা করে, জল্পের বিশেষ রূপ বিতণ্ডাতে তারই চরম প্রকাশ ঘটে কেবল অপরপক্ষের দূষণকে কেন্দ্র করে। বৈতণ্ডিকের কাজ শুধুই অপরপক্ষের সমালোচনা। এই সমালোচনাতেই বৈতণ্ডিক তাঁর সমগ্র প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করেন এবং পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অপরপক্ষের প্রতিপক্ষ যে স্বপক্ষ, সেই স্বপক্ষের মতামত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। সোজা কথায়, বিতণ্ডা হলো একপ্রকার যুক্তিহীন তর্ক, যেখানে কোন পক্ষই নিজের মত প্রতিষ্ঠা না করে কেবল অপরের মত খণ্ডন চেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

.

অতএব পালি লেখক বুদ্ধ ঘোষ লোকায়তকে যে বিতণ্ডাত্মক শাস্ত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন, সেটুকু বিবেচনায় নিলে অনুমিত হয়, বিতণ্ডাত্মক শাস্ত্র হিসেবে বর্ণিত প্রাচীন লোকায়তের মধ্যে অপরের সমালোচনার প্রবণতাই মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন এই লোকায়ত শাস্ত্রে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সম্মতি বা অনুমোদনের নিদর্শন দেখে ধারণা করা বিচিত্র নয় যে বৌদ্ধরাই এক্ষেত্রে লোকায়তের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বৌদ্ধদের সমালোচনার মাধ্যমেই এই লোকায়ত শাস্ত্র বিতণ্ডাত্মক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। কেননা, কৌটিল্যের সমকালীন ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মুখে প্রকাশিত বৌদ্ধবিদ্বেষ নিশ্চয়ই কোন গোপন বিষয় ছিলো না। প্রাচীন রামায়ণেও এ নজির বিরল নয়। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কিছু বক্রোক্তি রামায়ণে দেখা যায়-

‘যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি’। (রামায়ণ: ২/১০৯/৩৪)।

.

তাছাড়া রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে (রামায়ণ: ২/১০৮) বনবাসী রামকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের দৃঢ় সংকল্প থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণ জাবালি যে উপদেশাত্মক বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা ছিলো বৌদ্ধ নাস্তিকবাদের সমগোত্রীয়। জাবালির উপদেশকে রাম প্রতিপালনের অযোগ্য বলে বর্ণনা করেছেন।

.
মূলত যে ধরনের তর্ককে কেন্দ্র করে বিতণ্ডার প্রচলন, সে ধরনের তর্কের নিদর্শন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রচুর দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে-
'হেতুবিদ্যা' নামে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত যে বিশেষ বিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, তা সাধারণত তর্ককেন্দ্রিক এবং প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করার প্রয়াসেই এর ব্যবহার দেখা যেতো। প্রাচীন লোকায়ত শাস্ত্রের উপর এই হেতুবাদের প্রভাব খুব বেশি। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে বৌদ্ধদের সমালোচনায় তৎপর হেতুবাদমূলক লোকায়ত প্রাচীন যুগে কেবলমাত্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরই বিরাগের পাত্র ছিল ; অপরপক্ষে ব্রাহ্মণরা বিদ্যার এক বিশেষ শাখা হিসাবে এই শাস্ত্রের অনুশীলনে রত ছিলেন। (চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-২৫/ লতিকা চট্টোপাধ্যায়)।
.
এই হেতুবিদ্যা বা তর্কশাস্ত্রের উল্লেখ 'অর্থশাস্ত্রে'র অন্তর্গত আন্বীক্ষিকীর আলোচনায়ও দেখতে পাই আমরা। কৌটিল্য যখন বলেন-
'বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরন্বীক্ষমাণান্বীক্ষিকী লোকস্যোপকরোতি'- (অর্থশাস্ত্র: ১/২/২)।
অর্থাৎ : এই তিন (ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি) বিদ্যার বল ও অবল (সামর্থ্য ও অসামর্থ্য) বা প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য হেতু বা যুক্তির দ্বারা নির্ধারণ করা হয় বলে আন্বীক্ষিকী লোকসমাজের উপকার করে থাকে।
.
এখানে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কৌটিল্য তাঁর আলোচনায় অপর বিদ্যাগুলির গুণাগুণ, বলাবল ইত্যাদি বিচারের ব্যাপারে এই হেতুকেই প্রধান অবলম্বন হিসেবে বর্ণনা করেছেন (হেতুভিরন্বীক্ষমাণাঃ)। প্রাচীন ভারতে 'হেতু' শব্দ সাধারণত তর্ক অর্থে ব্যবহৃত হতো এবং তর্ককেন্দ্রিক বিদ্যাবিশেষকে 'হেতুবিদ্যা' নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণ প্রতিহত করে নিজ মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট উপায়ে তর্ক প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন ভারতে ভালোভাবেই অনুভূত হয়েছিলো, যার ফলে একটি বিশেষ শাস্ত্র হিসেবে ভারতের চিন্তাজগতে হেতুবিদ্যার আত্মপ্রকাশ। এর নজির হিসেবে মহাভারতের শান্তিপর্বে হেতুবাদের উল্লেখ দেখা যায় (মহাভারত : ১২/১৯/২৩-২৪, ১২/১৮০/৪৮) ।
যেমন-
ভবন্তি সুদুরাবর্ত্তা হেতুমন্তোহপি পন্ডিতাঃ।
দৃঢ়পূর্ব্বে স্মৃতা মূঢ়া নৈতদস্তীতি বাদিনঃ।। (মহাভারত : ১২/১৯/২৩)
অনৃতস্যাবমন্তারো বক্তারো জনসংসদি।
চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বাবদূকা বহুশ্রুতাঃ।। (মহাভারত : ১২/১৯/২৪)।
অর্থাৎ :
'মৃত্যুর পরে আর জীব থাকে না' এইরূপ মতবাদী, যুক্তিতর্কাবলম্বী হেতুবাদী, উক্ত মতে দৃঢ়বিশ্বাসী, প্রাচীন কতকগুলি পণ্ডিত লোকও উক্ত সিদ্ধান্তের বহুদূরে অবস্থান করিয়া গিয়াছেন। ২৩।
তা'র পর, উক্ত নাস্তিকমত মিথ্যা বলিয়া তাহার অবজ্ঞাকারী, বহুশাস্ত্রজ্ঞ এবং গার্হস্থ্যের

প্রাধান্যবাদী অনেক লোকই জনসভায় বক্তৃতা দিতে থাকিয়া সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করেন। ২৪।

.

মহাভারতের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, হেতুবাদী পণ্ডিতেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে জনসভায় নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতেন। আবার মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে (মহাভারত: ১৪/৮৫/২৭) তর্কযুদ্ধে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু হেতুবাদীর উল্লেখ থেকে হেতু বা তর্কের সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর মতকে খণ্ডন করে স্বমতের প্রতিষ্ঠাই যে হেতুবাদী এই বাগ্মীদের উপজীব্য তা বোঝা যায়। 'অর্থশাস্ত্রে' কৌটিল্যের বর্ণনায় এই হেতু বা তর্কবিদ্যারই অঙ্গ হিসেবে আন্বীক্ষিকীর পরিচিতির প্রকাশ। কৌটিল্যের সমকালীন হেতুবিদ্যা আন্বীক্ষিকী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অবিরোধী ছিলো এবং আন্বীক্ষিকীর অন্যতম লোকায়ত শাস্ত্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা অনুমোদিত বিদ্যার এক শাখা হিসেবেই পরিগণিত হতো। (চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-২৬/ লতিকা চট্টোপাধ্যায়)।

.

প্রাথমিক পর্যায়ে বেদের অবিরোধী হিসেবে আবির্ভূত হলেও এই হেতুশাস্ত্র ক্রমে বৈদিক প্রামাণ্যের বিচারকেও তার অস্ত্রপরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত করে বসলো। ফলে-
বৈদিক প্রভাবের অপপ্রয়োগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং ক্রিয়াকলাপে ক্রমশঃ বহু লোকের বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে। ফলে যুক্তির মাধ্যমে বৈদিক সব ধারণাকে যাচাই করে দেখার প্রচেষ্টার সূচনা হয়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হেতুবাদই হল এই প্রচেষ্টার মাধ্যম। এই বেদবিরোধী নাস্তিকদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে কালক্রমে হেতুবাদের প্রতি সনাতনপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্যণীয়। হেতুবাদের সংজ্ঞাতেও এর পরিণামে সাহচর্যজনিত কিছু পরিবর্তন হওয়া বিচিত্র নয়, ফলে পরবর্তী যুগের 'আন্বীক্ষিকী' শব্দও ভিন্ন সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত। (চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-২৬/ লতিকা চট্টোপাধ্যায়)।

.

এই ভিন্ন সংজ্ঞাটা কী ?
অন্বীক্ষা শব্দের অর্থ 'পরবর্তী জ্ঞান'। অনু (অর্থাৎ পরবর্তী) + ঈক্ষা (বা জ্ঞান)। অনুমান শব্দটির অর্থও হুবহু একই : অনু (পরবর্তী) + মান (জ্ঞান)। অতএব 'অন্বীক্ষা' ও 'অনুমান' একই কথা, ভারতীয় পরিভাষায় যাকে বলে পর্যায়শব্দ। কিন্তু 'পরবর্তী জ্ঞান' বললে... প্রশ্ন... কিসের পরবর্তী ? ভারতীয় ঐহিত্য অনুসারে 'প্রত্যক্ষর পরবর্তী'। ...ঐতিহ্য অনুসারে 'অনুমান' জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের অনুগামী- পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। প্রথমে কোনো প্রত্যক্ষ-জ্ঞান এবং তারই অনুসরণ করে অনুমান-জ্ঞান।...
তাহলে, 'আন্বীক্ষিকী'র শব্দার্থ হলো 'অনুমানবিদ্যা'- আজকাল চলতি কথায় আমরা যাকে বলি 'লজিক'। অবশ্য, কৌটিল্য এখানে বিশুদ্ধ অনুমানবিদ্যা অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেননি ; তাঁর মতে 'আন্বীক্ষিকী' শুধু অনুমানবিদ্যা ছাড়াও অনুমান-মূলক দার্শনিক মতও। (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৫৯/ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)।

.

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্বীয় স্থান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য উত্তর যুগের আন্বীক্ষিকী তর্ক বা অনুমান শব্দকে নিজস্ব সংজ্ঞায় 'হেতু' শব্দের স্থলাভিষিক্ত করেছে। তাই হয়তো অমরকোষে আন্বীক্ষিকীকে তর্কশাস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে- 'আন্বীক্ষিকী দণ্ডনীতিস্তর্কবিদ্যার্থশাস্ত্রয়োঃ (অমরকোষ, পৃষ্ঠা-১৩)। আর ন্যায়ভাষ্যকার বাৎসায়নের মতে, শ্রুতি বা বেদের অবিরোধী অন্বীক্ষা বা অনুমান আন্বীক্ষিকীর প্রধান কাজ- 'প্রত্যাগমাশ্রিতমনুমানং সা অন্বীক্ষা...'। (ন্যায়ভাষ্য: ১/১/১)। অপরপক্ষে হেতুবাদকে যাঁরা অবলম্বন করে থাকেন সেই হৈতুকরা সনাতনপন্থীদের নিন্দার পাত্র হলেন। যেমন মনুসংহিতায় এই হেতুবাদে অনুরক্ত নাস্তিক ব্রাহ্মণদের নিন্দা করে বলা হয়েছে-

যোহবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভি র্বহিষ্কার্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।। (মনুসংহিতা: ২/১১)।।
অর্থাৎ : যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্র অর্থাৎ অসৎ-তর্ককে অবলম্বন করে ধর্মের মূলস্বরূপ এই শাস্ত্রদ্বয়ের (শ্রুতি ও স্মৃতির) প্রাধান্য অস্বীকার করে (বা অনাদর করে), সাধু ব্যক্তিদের কর্তব্য হবে- তাকে সকল কর্তব্য কর্ম এবং সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা (অর্থাৎ অপাংক্তেয় করে রাখা)। কারণ, সেই ব্যক্তি বেদের নিন্দাকারী, অতএব নাস্তিক।

.

আবার মনুশাস্ত্রের অন্যত্র এই হৈতুকরা বাক্যালাপেরও অযোগ্য বলে বর্ণিত হয়েছে-

পাষণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্ ।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ।। (মনুসংহিতা: ৪/৩০)।।
অর্থাৎ : পাষণ্ডী অর্থাৎ বেদপথবিরুদ্ধব্রতধারী (যথা, বৌদ্ধভিক্ষু-ক্ষপণকাদি), বিকর্মস্থ (অর্থাৎ প্রতিষিদ্ধবৃত্তিজীবী, যারা আপৎকাল ছাড়াও অন্য বর্ণের জীবিকা গ্রহণ করে, যথা, ব্রাহ্মণ হয়ে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি বা ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করে যারা জীবিকার্জন করে), বৈড়ালব্রতিক (বিড়ালতপস্বী, অথবা দাম্ভিক, যারা কেবল লোককে আকৃষ্ট করার জন্যই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করে, কিন্তু ধর্মবুদ্ধিতে এই সব যজ্ঞ করে না), শঠ (বেদে শ্রদ্ধারহিত), হৈতুক (বেদবিরুদ্ধ তর্কপরায়ণ) এবং বকবৃত্তিধারী (প্রবঞ্চক ও কপটবিনয়ী-দ্বিজ)- এই সব ব্যক্তি যদি অতিথি-যোগ্য কালেও উপস্থিত হয়, তাহলে বাক্যের দ্বারাও তাদের সম্ভাষণ করবে না।

.

উল্লেখ্য, মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথির মতে হৈতুক অর্থ হচ্ছে-

হৈতুকা নাস্তিকা নাস্তি পরলোকো, নাস্তি দত্তম্, নাস্তি হুতমিত্যেবং স্থিতপ্রজ্ঞাঃ।
অর্থাৎ : নাস্তিক অর্থাৎ যারা এই রকম দৃঢ়নিশ্চয় করে যে, পরলোক নেই, দানেরও কোনও ফল নেই, হোম করারও কোনও ফল নেই, তারাই হৈতুক।

.

আবার মনুসংহিতার অপর ভাষ্যকার কুল্লুক ভট্টের মতে হৈতুক হলো-

হৈতুকা বেদবিরোধিতর্ক ব্যবহারিণঃ।
অর্থাৎ : হৈতুক হচ্ছে বেদবিরুদ্ধ তর্কপরায়ণ।

.
মহাভারতেরও বিভিন্ন স্থানে হেতুবাদরত পণ্ডিতদের নিন্দা দেখা যায় (মহাভারত: ১২/১৯/২৩-২৪)-

ভবন্তি সুদুরাবর্ত্তা হেতুমন্তোহপি পন্ডিতাঃ।
দৃঢ়পূর্ব্বে স্মৃতা মূঢ়া নৈতদস্তীতি বাদিনঃ।। (শান্তিপর্ব-১৯/২৩)।।
অনৃতস্যাবমন্তারো বক্তারো জনসংসদি।
চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বাবদূকা বহুশ্রুতাঃ।। (শান্তি-১৯/২৪)।।
অর্থাৎ :
'মৃত্যুর পরে আর জীব থাকে না' এইরূপ মতবাদী, যুক্তিতর্কাবলম্বী, উক্ত মতে দৃঢ়বিশ্বাসী, প্রাচীন কতকগুলি পণ্ডিত লোকও উক্ত সিদ্ধান্তের বহুদূরে অবস্থান করিয়া গিয়াছেন। (শান্তি-১৯/২৩)।। তা'র পর, উক্ত নাস্তিকমত মিথ্যা বলিয়া তাহার অবজ্ঞাকারী, বহুশাস্ত্রজ্ঞ এবং গার্হস্থ্যের প্রাধান্যবাদী অনেক লোকই জনসভার বক্তৃতা দিতে থাকিয়া সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করেন। (শান্তি-১৯/২৪)।।
.
তাই অনুমান করা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, কালের অগ্রগতির সঙ্গে হেতুবাদের একটি শাখা আন্বীক্ষিকীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেদবিরোধী নাস্তিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বৌদ্ধদের সমালোচনায় সীমাবদ্ধ না রেখে তর্কের অস্ত্রকে বেদের বিরোধিতার ক্ষেত্রেও প্রসারিত করে স্বতন্ত্রভাবেই হেতুবাদী তর্কশাস্ত্রে রূপান্তরিত হলো। অন্যদিকে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' এবং পরবর্তীযুগের ন্যায়ভাষ্যে বর্ণিত বিশ্লেষণমূলক শাস্ত্র হিসেবে আন্বীক্ষিকীর মূল শাখাটি বৈদিক বচনকে যুক্তির সমর্থন দিয়ে বেদসমর্থকদের শাস্ত্র হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে।
ওই হেতুবাদী তর্কশাস্ত্রই পরবর্তীকালের লোকায়ত হিসেবে আখ্যায়িত, যা বেদসমর্থকদের কাছে নিন্দাযোগ্য হিসেবে প্রচার পেয়েছে। যেমন, এরই সমসাময়িক নমুনা হিসেবে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে (রামায়ণ: ২/১০৮) দেখা যায়, রামের ভাই ভরত রামচন্দ্র সকাশে এলে তাঁকে রাজ্য-পরিচালন বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে রাম বললেন-

ক্কচিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।। (রামায়ণ: ২/১০৮)।
ধর্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।
বুদ্ধিম্ আন্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থকং প্রবদন্তি তে।। (রামায়ণ: ২/১০০/৩৮-৯)।
অর্থাৎ :
হে বৎস, আশা করি তুমি লোকায়তিক ব্রাহ্মণদের সেবা করছো না। ওরা অনর্থ ঘটাতে খুবই পটু, এবং পাণ্ডিত্যের অভিমান নিয়ে আস্ফালন করলেও আসলে বালকের মতো মূর্খ। প্রধান প্রধান ধর্মশাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও যুক্তিতর্কমূলক দুর্বুদ্ধির দোহাই দিয়ে অর্থহীন কথা প্রচার করে।
.
অপরপক্ষে মনুসংহিতায় নৃপতিদের আন্বীক্ষিকী চর্চার বৈদিক সমর্থন হিসেবে মনু বলছেন-

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্ববিদ্যাং বার্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ।। (মনুসংহিতা: ৭/৪৩)।
অর্থাৎ : রাজা ত্রিবেদবেত্তা দ্বিজাতিদের কাছ থেকে ঋগ্-যজুঃ-সাম এই বেদত্রয় আয়ত্ত করবেন। পরম্পরাগত দণ্ডনীতি অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র- যা চিরকাল বিদ্যমান আছে এমন রাজনীতিশাস্ত্র- রাজনীতিবিদ ব্যক্তিদের কাছে অধ্যয়ন করবেন। আন্বীক্ষিকী বা তর্কশাস্ত্র এবং আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা এবং বার্তা অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যপশুপালনাদি জ্ঞান সেই সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কাছে শিক্ষা করবেন।

.

তবে আন্বীক্ষিকীর সঙ্গে হেতুবাদের সম্পূর্ন বিচ্ছেদের কাল সময়ের কোন নির্দিষ্ট গণ্ডিতে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। কেননা হেতুবাদ যখন ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিরাগভাজন, তখনও কোন কোন ক্ষেত্রে হেতুবাদের সঙ্গে আন্বীক্ষিকীর ঘনিষ্টতার ছাপ সাধারণের চিত্তে অবিচল। যার ফলে আন্বীক্ষিকীও ব্রাহ্মণ্য সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচিত হয়েছে। যেমন রামায়ণের (রামায়ণ: ২/১০০/৩৬-৩৯) এই বর্ণনায় দেখা যায়, হেতুবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েও লোকায়ত আন্বীক্ষিকী সংজ্ঞার সঙ্গে পূর্ব সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখেছে। আবার মহাভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা নিন্দিত হচ্ছে।
এ প্রেক্ষিতে মহাভারতের শান্তিপর্বে (মহাভারত: ১২/১৭৪/৫-৫৪) ব্রাহ্মণ্যবাদ কর্তৃক হেতুবাদী আন্বীক্ষিকীর নিন্দামূলক ‘ইন্দ্র ও কাশ্যপ সংবাদ’ উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এরকম-
একবার এক ব্রতচারী তপস্বী দরিদ্র ব্রাহ্মণ কাশ্যপ কোন এক ধনসম্পদশালী বৈশ্যের রথের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রাগে দুঃখে অপমানে আত্মহত্যায় উদ্যোগী হলে তাঁকে নিবারণ করতে এসময় শৃগালরূপী ইন্দ্র সামনে এলেন এবং বলতে লাগলেন-

.

মনুষ্যযোনিমিচ্ছন্তি সর্ব্বভূতানি সর্ব্বশঃ।
মনুষ্যত্বে চ বিপ্রত্বং সর্ব্ব এবাভিনন্দতি।। (মহাভারত : ১২/১৭৪/৮)
মনুষ্য ব্রাহ্মণশ্চাসি শ্রোত্রিয়শ্চাসি কাশ্যপ !।
সুদুর্লভমবাপ্যৈতন্ন দোষান্মর্ত্তু মর্হসি।। (মহাভারত : ১২/১৭৪/৯)
...পাণিমদ্ভ্যঃ স্পৃহাস্মাকং যথা তব ধনস্য বৈ।
ন পাণিলাভাদধিকো লাভঃ কশ্চন বিদ্যতে।। (মহাভারত : ১২/১৭৪/১২)।
অর্থাৎ :
‘জগতে অন্যান্য সকল প্রাণীই মনুষ্যযোনি কামনা করে, আবার মনুষ্যমধ্যেও ব্রাহ্মণত্বেরই সকলে প্রশংসা করিয়া থাকে। ৮।
কাশ্যপ ! তুমি সেই মনুষ্য ও ব্রাহ্মণ এবং তাহাতে আবার বেদবিৎ হইয়াছ। অতএব অতিদুর্লভ এই সকল পাইয়া কেবল দারিদ্র্যদোষে মরিবার ইচ্ছা করিতে পার না। ৯।
...তোমার যেমন ধনের স্পৃহা চলিতেছে, আমাদেরও তেমন হস্তশালী প্রাণিগণের স্পৃহা আছে। এই জগতে হস্তলাভ অপেক্ষা অধিক কোন লাভ নাই। ১২।

.

এরপর শৃগালরূপী ইন্দ্র হস্তহীন প্রাণীদের কষ্টকর দুঃসহ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলছেন যে, আরো নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মাবার ভয়ে এই শৃগাল-জীবন থেকে আত্মহত্যার মতো ঘোরতর পাপও করা যাচ্ছে না। সেইসব নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মাবার কষ্ট আরো বহু ব্যাপক। হস্তযুক্ত আর হস্তহীন প্রাণীর সুবিধা-অসুবিধা এবং বিভিন্ন জন্মে কে কী পাপে কোন যোনিতে কিভাবে জন্ম নেয় ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনার পর তিনি তাঁর বর্তমান শৃগালযোনিতে জন্ম নেবার কারণস্বরূপ পূর্বজন্মের কৃত পাপের উল্লেখ করতে গিয়ে বলছেন-

.

‘অহর্মাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্’।। (মহাভারত : ১২/১৭৪/৪৭)
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চাতিবক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু বৈ দ্বিজান্ ।। (মহাভারত : ১২/১৭৪/৪৮)
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ।
তস্যেয়ং ফলবির্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ !।। (মহাভারত : ১২/১৭৪/৪৯)
অপি জাতু তথা তস্মাদহোরাত্রশতৈরপি।
যদহং মানুষীং যোনিং শৃগালঃ প্রাপ্নুয়াং পুনঃ।। (মহাভারত : ১২/১৭৪/৫০)
সন্তুষ্টশ্চাপ্রমত্তশ্চ যজ্ঞদানতপোরতঃ।
জ্ঞেয়জ্ঞাতা ভবেয়ং বৈ বর্জ্যবর্জয়িতা তথা।। (মহাভারত : ১২/১৭৪/৫১)।
অর্থাৎ :
আমি পূর্বজন্মে হেতুবাদী, বেদনিন্দক ও নিরর্থক তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত একটা কুৎসিত পণ্ডিত ছিলাম। ৪৭।
তৎকালে আমি কেবল যে এক এক জনের নিকট সেই হেতুযুক্ত বাক্য বলিতাম তাহা নহে, বহু সভাতেও তাহাই বলিতাম এবং বেদের উপরে গালি দিতাম ও বেদ-বাক্যসম্বন্ধে বিচারে পণ্ডিতগণকে পরাজয় করিতাম। ৪৮।
তারপর আমি সেই জন্মে নাস্তিক ছিলাম, বেদ ও স্মৃতিপ্রভৃতির সিদ্ধান্তের উপরে আশঙ্কা করিতাম; সুতরাং তখন আমি পণ্ডিতাভিমানী একটা মূর্খই ছিলাম। ব্রাহ্মণ ! তাহারই এই ফল হইয়াছে যে, আমি এই জন্মে শৃগাল হইয়াছি। ৪৯।
হায় ! এই শৃগালরূপী আমি আর কি বহুকাল পরে কখনও মানুষ হইতে পারিব ?। ৫০।
এবং সেই জন্মে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোযোগী, যজ্ঞ, দান ও তপস্যায় ব্যাপৃত, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও বর্জনীয়ের বর্জ্জয়িতা হইতে পারিব কি ?। ৫১।

.

মহাভারতের এই উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে হেতুবাদী ব্রাহ্মণদেরকে বেদনিন্দুক ও তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত নাস্তিক হিসেবে অবজ্ঞার পাশাপাশি এই মতাদর্শে কেউ অনুরক্ত হলে মহাপাপের ফল হিসেবে পরবর্তী জন্মের ভয়ঙ্করতা তুলে ধরে বেদপরিপন্থি না হবার উপদেশ প্রচার করার ব্রাহ্মণ্যবাদী মনোভাব স্পষ্ট। আর ব্রহ্মবাদীদের এই বিরোধিতা থেকে আরেকটি বিষয়ও হয়তো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সেই মহাভারতের যুগে বা তারও আগে থেকেই এই

যুক্তিপ্রবণ হেতুবাদী নাস্তিক মতটি তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিষ্ঠিত মতবাদ হিসেবে তৎকালীন লোকসমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়ও ছিলো।

.

অন্যদিকে আবার ব্রাহ্মণ্য সমাজে সাধারণভাবে নিন্দনীয় হৈতুকদেরও স্থানবিশেষে সম্মানের স্বীকৃতি দেখা যায় মনুসংহিতায়, যেখানে অনাম্নাত বিষয়ের মীমাংসার জন্য দশাবরা পরিষৎ গঠনের বিধানে সেই পরিষদের দশ জনের মিলিত সদস্যগোষ্ঠিতে হৈতুকও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে-

ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা।। (মনুসংহিতা: ১২/১১১)।।
অর্থাৎ : ঋগ্বেদ প্রভৃতি তিন বেদে অভিজ্ঞ তিনজন, হেতুক অর্থাৎ অনুমানাদি-নিপুণ একজন, তর্কী অর্থাৎ ঊহ-অপোহকুশল একজন (মীমাংসক), বেদাঙ্গ-নিরুক্তশাস্ত্র-জ্ঞাতা একজন, মানবাদিধর্মশাস্ত্রজ্ঞ একজন এবং প্রথম তিনটি আশ্রমের তিন ব্যক্তি (অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ) এইরকম অন্যূন দশজনকে নিয়ে দশাবরা পরিষৎ গঠিত হবে।

.

তবে সম্মানের স্বীকৃতি পাওয়া এ হৈতুক যে বেদ-সমালোচক নয় বরং বেদ বা শ্রুতিকে প্রমাণ গণ্য করা হেতুবিদ, তা বোঝা যায় মনুর অন্য শ্লোকে-

ধর্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্র‘‘তিপ্রত্যক্ষহেতবঃ।। (মনুসংহিতা: ১২/১০৯)।।
অর্থাৎ : ব্রহ্মচর্যাদি ধর্মযুক্ত হয়ে যাঁরা ‘সপরিবৃংহণ বেদ’ অর্থাৎ বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ইতিহাস ও পুরাণাদির দ্বারা পরিপুষ্ট বেদশাস্ত্র বিধিপূর্বক আয়ত্ত করেছেন সেই ব্রাহ্মণকে শিষ্ট বলে বুঝতে হবে; শ্রুতিই তাঁদের নিকট প্রত্যক্ষস্বরূপ এবং হেতুস্বরূপ অর্থাৎ অনুমানাদি অন্যান্য প্রমাণস্বরূপ।

.

ধারণা করা হয়, প্রাচীন লোকায়ত এবং চার্বাক দর্শনের মধ্যে মিলনের সেতু রচিত হয়েছে এই হেতু বা তর্কাশ্রয়ী যুক্তির সাহায্যে। নাস্তিক যে গোষ্ঠি হেতুবাদের আশ্রয় নিয়ে বেদের প্রামাণ্য প্রতি পদে যাচাই করতে আগ্রহী ছিলো, লোকায়ত ক্রমে তার সঙ্গে যুক্ত হলো। তাই প্রাচীন লোকায়তের হেতু বা যুক্তিভিত্তিক তর্কের উত্তরাধিকারই সঞ্চারিত হতে দেখা যায় পরবর্তী লোকায়ত বা চার্বাক সিদ্ধান্তে। প্রাচীন লোকায়তের অনুসরণে যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করে বিপক্ষের ত্রুটির অনুসন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে। এই বিপক্ষ এখানে শুধু বৌদ্ধ নয়, জৈন এবং আধ্যাত্ম দর্শনের প্রতিটি শাখা। সম্মতিতর্কপ্রকরণের ব্যাখ্যাকার অভয়দেব সূরী তাই উদ্ধৃত করেন- ‘চার্বাক শাস্ত্রকার বৃহস্পতির সকল উক্তিই পর্যনুযোগপর অর্থাৎ পরমত দূষণের জন্য প্রশ্নাত্মক।’ মূলত এই তর্কে অনুরক্তির পরিচয় পরবর্তী লোকায়ত বা চার্বাক দর্শনের মধ্যে ভালোভাবেই পাওয়া যায়। এ কারণে মনুশাস্ত্রেও এই বেদবিরোধী তর্কমূলক শাস্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা উচ্চারিত হয়-

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ।। (মনুসংহিতা: ১২/৯৫)।।

অর্থাৎ : বেদবাহ্য অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ যে সব স্মৃতি আছে এবং যে সব শাস্ত্র কুদৃষ্টিমূলক অর্থাৎ অসৎ-তর্কযুক্ত মতবাদসমূহ যে শাস্ত্রে আছে, সেগুলি শেষ পর্যন্ত একেবারে প্রেত্য বা নিষ্ফল অর্থাৎ বৃথা বা অকিঞ্চিৎকর বলে প্রতিভাত হয় এবং সেগুলি তমোনিষ্ঠ বলে স্মৃত হয়ে থাকে।

.

আর্ষং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাহবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ।। (মনুসংহিতা: ১২/১০৬)।।
অর্থাৎ : যে ব্যক্তি বেদোক্ত-ধর্মোপদেশসমূহ বেদশাস্ত্রের অবিরোধী অর্থাৎ অনুকূল তর্কের সাহায্যে অনুসন্ধান করেন অর্থাৎ নিরূপণ করতে চেষ্টা করেন, তিনিই বেদের ধর্ম অর্থাৎ বেদের অর্থ অবগত হন; এর বিপরীত স্বভাব ব্যক্তি বেদার্থধর্ম বোঝে না।

.

তবে যে কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না-করে থাকে না তা হলো, বৈদিক সংস্কৃতির সমুদ্রমন্থনে যে দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ ব্যক্তিসম্প্রদায় অমৃতের অধিকারী হয়েছেন, নাস্তিকতা বন্টনেও তারাই হয়তো অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে-
মনুকথিত নাস্তিক দ্বিজ, রামায়ণের ব্রাহ্মণ জাবালি অথবা মহাভারতের ব্রাহ্মণবেশি চার্বাকের উপাখ্যানের মাধ্যমে তার আভাস পাওয়া যায়। আর দেবগুরু বৃহস্পতিকে নাস্তিকবাদের গুরু বলে বর্ণনা করার মধ্যেও এর কিছু ইঙ্গিত মেলে। ব্রাহ্মণ্যধর্মী লোকায়তের নাস্তিক মতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সমর্থনেও হয়ত এই সব কাহিনী কোন তথ্য সরবরাহ করতে পারে। (চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৩০/ লতিকা চট্টোপাধ্যায়)।

.

অতএব, বার্হস্পত্য, লোকায়ত ও চার্বাক এই জড়বাদী তিনটি মতাদর্শের পরবর্তী রূপ অভিন্নাকার হলেও পণ্ডিতদের ধারণায় প্রাচীনকালের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক পরিক্রমায় প্রতিটা মতেরই কোন অন্তর্গত ভিন্নতাকে সময়ের প্রেক্ষাপটে আদিরূপের সাপেক্ষে অস্বীকার করা যাবে না। তাই কেউ কেউ এই প্রাচীন দর্শনকে চার্বাকপন্থী, লোকায়ত এবং বার্হস্পত্য বা বৃহস্পতিশিষ্য হিসেবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগও করেছেন। তবে সেরকমের সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য প্রমাণ না থাকায় 'নাস্তিক' সংজ্ঞার বৃহৎ পরিধিতে এগুলোকে আর পৃথক গোষ্ঠি ভাবা সমীচীন হবে না বলেই মনে হয়। তবে প্রাচীন সাহিত্যে চার্বাক দর্শনের মূলগত দৃষ্টিতে কিছু শ্রেণীগত ভেদ চোখে পড়ে ঠিকই, যা নিয়ে কিছুটা হলেও আলোচনার অবকাশ থেকে যায়।
…

৯.০ : চার্বাক দর্শনের শ্রেণীগত ভেদ

...

চার্বাক দর্শনের যে-কোন পর্যায়ের আলোচনাতেই আমাদেরকে এটা মাথায় না-রেখে উপায় থাকে না যে, বিলুপ্তির কারণেই চার্বাকদের নিজস্ব কোন সাহিত্য আমাদের জ্ঞান জগতের আয়ত্তে নেই। এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তথা বিপক্ষ দার্শনিকদের রচিত সাহিত্যে তাঁদের নিজের মতো করে চার্বাক-উপস্থাপনাকে ভিত্তি ধরেই আমাদেরকে চার্বাক-সিদ্ধান্তের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করতে হয়। ফলে বাস্তবিকই চার্বাকদের মধ্যে একাধিক সুনির্দিষ্ট মতগোষ্ঠি ছিলো কি ছিলো না, নিশ্চিত প্রামাণিক তথ্য-উপাত্ত ছাড়া সে ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত আরোপ করার উপায় নেই। তবে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের যেসব কৌতুহলি নমুনা বিভিন্ন সাহিত্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তা থেকে গবেষকরা চার্বাকদের মধ্যে তিনটি সম্প্রদায়ের অতীত উপস্থিতি নিয়ে ধারণা করেন।

.

এবং এই সম্প্রদায়গুলিকে (১) 'বৈতণ্ডিক', (২) 'স্থূল বা ধূর্ত' ও (৩) 'সুশিক্ষিত' চার্বাক নামে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও তা নিয়েও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তবিহীন প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। কেননা আমাদের এটাও মনে রাখতে হয় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা এই নামগুলি কিন্তু চার্বাক-বিরোধী দার্শনিকদেরই প্রদত্ত। এবং তাও হয়েছে কেবল একটিমাত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে। সেটা হলো, দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিচারের যুক্তি-তর্কে প্রমাণগ্রাহ্যতার মানদণ্ড নিরূপণ। সেটা কী ? প্রথম দলের বৈতণ্ডিকেরা প্রমাণাসত্ত্ব, অর্থাৎ কোন প্রমাণকেই যারা স্বীকার করেন না। দ্বিতীয় দলের স্থূল বা ধূর্ত চার্বাকেরা হলেন প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী, অর্থাৎ যাঁরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেন। আর তৃতীয় দলভুক্ত সুশিক্ষিতরা অনুমানমাত্রকেও প্রমাণ বলে স্বীকার করেন।

.

এখন প্রশ্ন, সত্যি কি চার্বাকদের মধ্যে এতো ভেদ ছিলো ? 'ধূর্ত', 'সুশিক্ষিত' এই শব্দদুটির উপস্থিতি মূলত চার্বাক মতের সবচাইতে কট্টর সমালোচক নবম শতকের ন্যায় দার্শনিক জয়ন্ত ভট্টের 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থেই চোখে পড়ে। জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়দর্শনের বিভিন্ন খুঁটিনাটির বিস্তার প্রসঙ্গে চার্বাক মতের সমালোচনা করতে গিয়ে চার্বাক গোষ্ঠির কয়েকটি শ্রেণীর চিন্তাধারার আলোচনা করেন। এবং তা করতে গিয়ে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চার্বাক গোষ্ঠিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিশেষ কিছু বিশেষণে চিহ্নিত করেছেন। কাজেই কেউ কেউ মনে করেন যে এ দুটি সংজ্ঞা চার্বাক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপরীতধর্মী বিশেষ দুটি বিভাগের অস্তিত্বের দ্যোতক। অর্থাৎ 'ধূর্ত' চার্বাকগোষ্ঠির প্রচারিত মতবাদ 'সুশিক্ষিত' গোষ্ঠির মতের থেকে পৃথক।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁর 'চার্বাক দর্শন' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে চার্বাক সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ধূর্ত' এবং 'সুশিক্ষিত' এই দুটি গোষ্ঠির অস্তিত্বের উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ২৪,৩৩,১৩৪)। যদিও তাঁর এই ধারণার সপক্ষে তিনি উপযুক্ত কোন প্রমাণের সমর্থন দেখাবার চেষ্টা করেন নি। (লতিকা চট্টোপাধ্যায়: চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৩৮)।

.
তাই এই গোষ্ঠির উপস্থিতি বা পার্থক্যটুকু বুঝতে প্রথমে প্রচলিত চার্বাক মতের বৃহৎ বা প্রধান গোষ্ঠির চিন্তাধারা কী তা জানা আবশ্যক।

.
গ্রন্থপরম্পরায় চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন যে বেশ সমৃদ্ধ ও পরিণত দর্শন হিসেবেই পরিগণিত হতো, সমসাময়িক দার্শনিকদের বিভিন্ন আলোচনা থেকেই তা প্রকাশ পায়। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহিত তথ্যানুযায়ী বস্তুবাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী চার্বাকী চিন্তাধারা সাধারণের কাছে যেভাবে পরিচিতি লাভ করেছে, তাতে চার্বাকের নিজস্ব বক্তব্য হিসেবে চতুর্ভূতাত্মক স্থূল জগতকে একমাত্র স্বীকৃতি দেয়া এবং চৈতন্যকে এর বিকার হিসেবে ব্যাখ্যা করে কিছু বার্হস্পত্য সূত্র বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রকাশিত। চার্বাকী প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদিতার সমর্থনে চার্বাক পক্ষের নিজস্ব বক্তব্য হিসেবে বোধ করি একমাত্র সেগুলিকেই উপস্থাপিত করা চলে। যেমন-

পৃথিব্যপতেজো বায়ুরিতি তত্ত্বানি। (বার্হস্পত্য-সূত্র : ১)।
[পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু- এই চারটিই তত্ত্ব।]

.
তৎ-সমুদায়ে শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়-সংজ্ঞা। (বার্হস্পত্য-সূত্র :২)।
[এর (পদার্থ বা তত্ত্ব চতুষ্টয়) সমন্বয়ে শরীর, ইন্দ্রিয়, চৈতন্য ইত্যাদি সৃষ্ট।]

.
প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্ । (বার্হস্পত্য-সূত্র : ৭০)।
[কেবল প্রত্যক্ষই প্রমাণ।]

.
নানুমানং প্রমাণম্ । (বার্হস্পত্য-সূত্র :৭১)।
[অনুমান প্রমাণ নহে।]

.
শরীরমাত্মা। (বার্হস্পত্য-সূত্র : ৯১)।
[শরীরই আত্মা।]

.
চৈতন্য-বিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ। (বার্হস্পত্য-সূত্র : ৯২)।
[চৈতন্যবিশিষ্ট কায়া বা দেহই পুরুষ বা আত্মা।]

.
বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীলের ‘তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকাতে’ও চার্বাক মতের আলোচনায় একটি লোকায়তসূত্রের উদ্ধৃতি দেখা যায় এভাবে-

পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরিতি চত্বারি তত্ত্বানি তেভ্যশ্চৈতন্যম্।

অর্থাৎ : তত্ত্বের সংখ্যা চার- পৃথিবী (মাটি), জল, তেজ (অগ্নি) ও বায়ু ; এবং এই পদার্থচতুষ্টয়ই চৈতন্যের কারণ।

.

এরকম বিভিন্ন দার্শনিকদের অন্যান্য সাহিত্যেও চার্বাক মতের উল্লেখ ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে। অর্থাৎ প্রচলিত চার্বাক মতে তত্ত্ব চতুষ্টয় এবং প্রমাণ হিসেবে একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষই চার্বাকী সিদ্ধান্তে স্বীকৃতির যোগ্য। বিলুপ্তির কারণে চার্বাকদের নিজস্ব সাহিত্যের অবর্তমানে যদিও প্রত্যক্ষের সমর্থনে কোন চার্বাকী যুক্তি আমাদের গোচরীভূত হয়নি, তবু অন্য প্রমাণগুলির বিরোধিতার ক্ষেত্রে চার্বাকী তৎপরতার সাক্ষ্য ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তথা বিভিন্ন প্রামাণিক লোকগাথা বা চার্বাকষষ্ঠীর ভূমিকা বিশ্লেষণে সুপরিস্ফুট হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রত্যক্ষের সাহায্যে লভ্য তত্ত্বের অতিরিক্ত অপর কোন তত্ত্বকে এরা গ্রাহ্য করতে অসম্মত। এরা প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী। ফলে একমাত্র বস্তুজগতেই চার্বাকী চিন্তা কেন্দ্রীভূত এবং চার্বাক দর্শন এই আলোকেই সাধারণের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে।

.

তাঁদের এই মত সর্বসাধারণ্যে আরো বিস্তারলাভ করেছে এভাবে যে- এই মতে দেহই আত্মা, তাই এরা দেহাত্মবাদী। তাঁদের মতে পরিদৃশ্যমান জগৎ চতুর্ভূত হতে উৎপন্ন, অচেতন চারটি ভূতের মিলন হতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। তাই এরা ভূতচৈতন্যবাদী। এই মতে স্থূল ইন্দ্রিয়ের উপভোগ জনিত একমাত্র সুখই হচ্ছে পুরুষার্থ। তাই এদেরকে স্থূল চার্বাকও বলা হয়। তাঁদের মতে ঈশ্বর, পরলোক বা জন্মান্তর নেই। তাই এরা অনীশ্বরবাদী। এই মতে কার্যকারণভাব বা কর্মফল স্বীকৃত হয় না। ঐহিক, ক্ষণিক দৈহিক সুখকেই স্বর্গ বলা হয়, তাই এরা সুখবাদী। কণ্টকাদি ব্যথাজনিত দুঃখই নরক এবং দেহের উচ্ছেদই মোক্ষ, তাই এরা উচ্ছেদবাদী। এবং বেদবিরোধী বলে এরা নাস্তিক। এভাবেই সর্বজনপ্রসিদ্ধ চার্বাক দর্শন বিপক্ষ আধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের কাছে বহুভাবে নিন্দিতও হয়েছেন। কারো কারো মতে এই সম্প্রদায়কেই ন্যায়ভাষ্যকার জয়ন্তভট্ট ধূর্ত চার্বাক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

.

প্রচলিত চার্বাক মতের এই বৃহৎগোষ্ঠিকে বিবেচনায় রেখে আমরা জয়ন্ত ভট্টের উক্তি বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে এক জায়গায় জয়ন্ত ভট্ট বলছেন-

তথাহি প্রত্যক্ষং এব একং প্রমাণম্ ইতি চার্বাকাঃ। (ন্যায়মঞ্জরী : ১/২৬)।
অর্থাৎ : চার্বাকরা বলেন, প্রত্যক্ষই এক এবং একমাত্র প্রমাণ।

.

জয়ন্তের এই বক্তব্য যে প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী চার্বাকদের উদ্দেশ্যেই বলা, যাঁদের মতে অনুমান বলে কোন প্রমাণ সম্ভব নয়, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু খটকা লাগে, তিনিই যখন আবার অন্যত্র মন্তব্য করেন-

চার্বাকধূর্তঃ তু অথ অতঃ তত্ত্বং ব্যাখ্যাস্যামঃ ইতি প্রতিজ্ঞায় প্রমাণ-প্রমেয়-সংখ্যা-লক্ষণ-নিয়ম-

অশক্য-করণীয়ত্বম্ এব তত্ত্বং ব্যাখ্যাতবান্ । (ন্যায়মঞ্জরী : ১/৫৯)।
অর্থাৎ : ধূর্ত চার্বাক কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলো- এবার আমরা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবো; কিন্তু 'তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবো' বলে চার্বাক আসলে দেখাতে চাইলো যে প্রমাণ ও প্রমেয়র সংখ্যা ও লক্ষণ সংক্রান্ত কোনো নিয়মই সম্ভব নয়।

.

জয়ন্ত ভট্টের চার্বাক সংক্রান্ত এই দুটি উক্তির মধ্যে সংগতিবিধান করা যে দুরুহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, প্রথম উক্তি অনুসারে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু দ্বিতীয় উক্তি অনুসারে, কোন রকম প্রমাণেরই লক্ষণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়, মানে কোন রকম প্রমাণই সম্ভব নয়- ফলে প্রত্যক্ষও সংশয়াতীত নয়। এমন পরস্পরবিরোধী দুটি মত একই মতগোষ্ঠির কাঁধে চাপিয়ে দেয়াটা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক কোন প্রক্রিয়া নয়। তাছাড়া এই দ্বিতীয়মতটি যে অবশ্যই প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী চার্বাকদের মতাদর্শ নয়, এ ব্যাপারে সন্দেহও নেই। তাহলে জয়ন্ত ভট্ট কর্তৃক বিশেষ 'ধূর্ত' সংজ্ঞায় বিশেষিত চার্বাকেরা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদীদের থেকে পৃথক অন্য কোন গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। তবে কি যারা কোনরকম প্রমাণই স্বীকার করেন না, তাঁদেরকেই ধূর্ত বলা হয়েছে? এখানেও খটকা আছে। কেননা এই একই 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থেই জয়ন্ত ভট্ট আবার 'সুশিক্ষিত' সংজ্ঞায় বিশেষিত চার্বাকদের সম্পর্কেও বলেন-

অশক্য এব প্রমাণসংখ্যানিয়ম ইতি সুশিক্ষিত চার্বাকাঃ। (ন্যায়মঞ্জরী : ১/৩৩)।
অর্থাৎ : সুশিক্ষিত চার্বাকদের মতে প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম করা সম্ভব নয়।

.

এক্ষেত্রে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য-
'জয়ন্তর স্বীয় সম্প্রদায়ের- অর্থাৎ ন্যায় সম্প্রদায়ের- দাবি এই যে প্রমাণ আসলে চার রকম। অতএব স্বমত সমর্থনে যে-দার্শনিকেরা প্রমাণের সংখ্যা চারের চেয়ে বেশি বলে মনে করেন, জয়ন্তর পক্ষে তাঁদের মত খণ্ডনের প্রয়োজন বোধ করার কথা। কিন্তু কারা চারের চেয়ে বেশি প্রমাণ মানেন ? জয়ন্ত বলছেন : প্রভাকর-পন্থী মীমাংসকরা বলেন, প্রমাণ পাঁচ রকমের; কুমারিলভট্টর অনুগামী মীমাংসকরা বলেন, প্রমাণ ছয় রকমের; কেউ-কেউ আবার বলেন, প্রমাণ আট রকমের; কিন্তু 'সুশিক্ষিত চার্বাক'রা বলেন, প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে কোনো নিয়ম মানা যায় না। কথাটার তাৎপর্য কি এই যে 'সুশিক্ষিত চার্বাক' মতে প্রমাণের সংখ্যা অসংখ্য, নাকি, প্রমাণ বলেই কিছু নেই ? (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৫৫ : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)।

.

দেবীপ্রসাদ থেকে আরো জানা যায় যে, 'গ্রন্থিভঙ্গ' নামে 'ন্যায়মঞ্জরী'র একটি টীকা প্রকাশিত হয়েছে। টীকাকার চক্রধর। এই টীকায় জয়ন্তর ধূর্ত চার্বাক সম্পর্কে উপরিউক্ত দ্বিতীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জয়ন্ত এখানে আসলে উদ্ভট নামে জনৈক চার্বাকপন্থীর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। উদ্ভট নামের এই চার্বাকপন্থীর মতে সব রকম প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি বর্জনের

উপদেশ আছে। তবে চক্রধর আরো বলেন- উদ্ভটের এই মন্তব্য অবশ্যই (চার্বাক) সূত্রের যথাশ্রুত বা আক্ষরিক অর্থ নয়; এটা আসলে উদ্ভটের নিজস্ব উদ্ভাবন। উল্লেখ্য, উদ্ভট-প্রস্তাবিত চার্বাকমতের কোন সংস্করণের উল্লেখ বা এ বিষয়ে কোন নজির জয়ন্তর গ্রন্থে নেই।

.

কোনরূপ প্রমাণকেই স্বীকার করেন না এরকম মতগোষ্ঠির উল্লেখ শ্রীহর্ষের 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্' গ্রন্থেও পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে চার্বাক প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে- 'চার্বাকেরা কোন প্রমাণকে স্বীকার করেন না'-
'সোহয়মপূর্বঃ প্রমাণাদিসত্তানভ্যুপগমাত্মা'। (খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্ : পৃষ্ঠা ২৬)।

.

বিভিন্ন ভাষ্যকাররা শ্রীহর্ষকৃত গ্রন্থের এই অংশের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যাও করেছেন। ভাষ্যকার শঙ্করকৃত ব্যাখ্যায় এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্' গ্রন্থে উল্লিখিত 'চার্বাকঃ' শব্দের অর্থ 'চার্বাকৈকদেশী' এবং এই 'চার্বাকৈকদেশী' বলতে বোঝায় চার্বাকের এক বিশেষ শাখা যাঁরা প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণ মানেন না। সম্ভবতঃ জয়রাশি এই শাখারই অন্তর্ভুক্ত এক চার্বাক। (চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৩৪ : লতিকা চট্টোপাধ্যায়)।

.

ইতঃপূর্বে জয়রাশি ভট্ট কর্তৃক সবরকম দার্শনিক মতকে উপপ্লব বা উৎখাত করে দেবার দাবি সংবলিত 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' নামের গ্রন্থটি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে এটিকে সর্বপ্রমাণবিরোধী সংশয়বাদের নিদর্শক গ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বইটির প্রধানতম প্রতিপাদ্য হলো প্রমাণমাত্রেরই খণ্ডন। ইতঃপূর্বে ন্যায় বা তর্কশাস্ত্রের দৃষ্টিতে জল্প ও বিতণ্ডার সংজ্ঞা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। নিজের কোন মত স্থাপন না করে কেবলই পরমত দূষণ ও খণ্ডনে উদ্যত বিতণ্ডার মাধ্যমে প্রমাণসিদ্ধ কোন মত আছে বলে স্বীকার না-করায় জয়রাশির মতকে ন্যায়শাস্ত্রানুযায়ী বৈতণ্ডিক হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। গুরু বৃহস্পতিকেও ধরাশায়ী করতে উদ্যত জয়রাশি নিজেকে কি বৃহস্পতিশিষ্য হিসেবে দাবি করেছিলেন ? তবু জয়রাশি মতের তত্ত্বোপপ্লববাদী গোষ্ঠিকে 'বৈতাণ্ডিক চার্বাক' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' গ্রন্থে প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তর্কই প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হয়তো 'সম্মতিতর্কপ্রকরণে'র ব্যাখ্যাকার অভয়দেব সূরির উদ্ধৃত উক্তি হচ্ছে-
সর্বত্র পর্যনুযোগঃ পরাণ্যেব সূত্রাণি বৃহস্পতেঃ। (সম্মতিতর্কপ্রকরণ)।
অর্থাৎ : চার্বাক শাস্ত্রকার বৃহস্পতির সকল উক্তিই পর্যনুযোগপর অর্থাৎ পরমত দূষণের জন্য প্রশ্নাত্মক।

.

এবং মনুসংহিতার অন্যতম টীকাকার কুল্লুক ভট্টের মতে- চার্বাকী তর্ক, 'কুতর্ক' (মনু : ১২/৯৫)। এবং 'ন্যায়মঞ্জরী'র মতে 'বরাক' সংজ্ঞায় বিশেষিত এই চার্বাকী তর্ক 'ক্ষুদ্রতর্ক'-
'চার্বাকাস্তু বরাকাঃ প্রতিক্ষেপ্তব্যা এবেতি কঃ ক্ষুদ্রতর্কস্য তদীয়স্যেহ গণনাবসরঃ'।

(ন্যায়মঞ্জরী)।

.

সর্বত্র সন্দেহ উৎপাদন করার অভীষ্টে নিয়োজিত এই বৈতাণ্ডিক গোষ্ঠি যে প্রচলিত চার্বাক মতেরও ঘোর বিরোধী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এরা পরমেশ্বর, পরলোক, বেদ, আপ্ত প্রভৃতির অস্বীকারের পাশাপাশি সর্বজনস্বীকৃত প্রত্যক্ষ প্রমাণও মানেন না। এমনকি কোন ধরনের চার্বাক মতকেও স্বীকার করেন না। বিরোধীপক্ষের সমালোচনায় কথিত এই সর্বপ্রমাণবিরোধী চার্বাক শাখার স্থান বস্তুবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণযুক্ত অন্য যে দুটি প্রসিদ্ধ মতের সাথে একই পঙক্তিতে নির্ধারণ করা হয়, তা হলো বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের শূন্যবাদ এবং ব্রহ্মবাদী অদ্বৈত বেদান্ত দার্শনিক শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ। তাই জৈন দার্শনিক বিদ্যানন্দী 'তত্ত্বার্থশ্লোকবার্তিক' গ্রন্থে বৌদ্ধ শূন্যবাদী এবং ব্রহ্মবাদীদের সঙ্গে একযোগে তত্ত্বোপপ্লববাদীদের উল্লেখ করেছেন-
'সর্বথা শূন্যবাদিনস্তত্ত্বোপপ্লববাদিনো ব্রহ্মবাদিনো বা জাগ্রদুপলব্ধার্থক্রিয়ায়াং কিং ন বাধকপ্রত্যয়ঃ। (তত্ত্বার্থশ্লোকবার্তিক, পৃষ্ঠা-১৯৫ : সূত্র- চার্বাক দর্শন, লতিকা চট্টোপাধ্যায়)।

.

এমনকি শ্রীহর্ষের 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' গ্রন্থেও (পৃ: ২৬) এই তিনটি মতবাদের অনুরূপ একত্র উল্লেখ দেখা যায় (চার্বাক দর্শন: লতিকা চট্টোপাধ্যায়)। এরপরও তত্ত্বোপপ্লববাদীদেরকে আধ্যাত্মবাদীগণ কর্তৃক 'বৈতণ্ডিক চার্বাক' নামে আখ্যায়িত করে অন্যতম চার্বাক গোষ্ঠি হিসেবে অভিহিত করার পেছনে কি তবে চার্বাকদেরকে হেয় ও কলঙ্কিত করার পরিকল্পিত উদ্দেশ্যই ক্রিয়াশীল ? 'ন্যায়মঞ্জরী'র জয়ন্ত ভট্টের মতে এই বৈতণ্ডিকরাই হীন হাবাগোবা 'বরাক' এবং হয়তো এরাই আবার 'ধূর্ত' চার্বাক হিসেবে অভিহিত। ফলে এখানে চার্বাক সম্প্রদায়ের শ্রেণীভেদে বৈতণ্ডিক ও ধূত চার্বাক নামের দুটি গোষ্ঠিগত বিভাজন করা শেষপর্যন্ত প্রশ্নবোধক হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে, 'ধূর্ত' শব্দটি সম্ভবত ন্যায়মঞ্জরীতে নিন্দাত্মক ভঙ্গিতেই ব্যবহৃত হয়েছে। এরকম নিন্দাত্মক বক্তব্য আমরা চার্বাকদের বক্তব্যেও দেখতে পাই, যেমন- 'ধূর্তপ্রলাপস্ত্রয়ী' (বার্হস্পত্যসূত্র: ৫৯), 'ভণ্ডধূর্তনিশাচরাঃ' (লোকায়ত-প্রকরণ-১৩ : সর্বদর্শনসংগ্রহ) ইত্যাদি। আদতে হয়তো এই 'ধূর্ত' বিশেষণ কোন শ্রেণীভেদের ইঙ্গিত করে না।

.

অন্যদিকে গবেষকদের দৃষ্টিতে প্রমাণগ্রাহ্যতার মানদণ্ডে 'সুশিক্ষিত' নামে খ্যাত চার্বাকদের অন্যতম তৃতীয় সম্প্রদায়টির বৈশিষ্ট্য কী ? এরা প্রত্যক্ষকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার তো করেনই, উপরন্তু শর্তসাপেক্ষে কিছু অনুমানকেও প্রমাণের মর্যাদা দেন। এই সম্প্রদায় লৌকিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যেরূপ অনুমান অবশ্য স্বীকার করতে হয় বলে মনে করেন এবং যে পরিমাণ কার্যকারণসম্বন্ধ স্বীকার না করলে লোকযাত্রা নির্বাহ হয় না, সে পরিমাণ কার্যকারণভাবের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। কিন্তু কোন অলৌকিক অনুমান অর্থাৎ যেরূপ অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বর, পরলোক, পুনর্জন্ম, কর্মফল, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি প্রতিপন্ন হয় সেরূপ অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। এই মতে অর্থ ও কাম এই দ্বিবিধ পুরুষার্থ

স্বীকার করা হয়। তাঁরা স্বভাবকে পরিদৃশ্যমান জগতের কারণ বলে স্বীকার করেন। এই সুশিক্ষিত চার্বাকগণ ঐহিক, দৈহিক, আত্মকেন্দ্রিক, স্থূল, ক্ষণিক সুখের পরিবর্তে মনুষ্যোচিত পবিত্রতর, সূক্ষ্মতর মানসিক সুখকে পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেন।
এই সুশিক্ষিত চার্বাকগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। কেউ দেহকে অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়কে, কেউ ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে মনকে, কেউ মনকে অতিক্রম করে প্রাণকে আত্মা বলে স্বীকার করেন। তাঁদেরকে যথাক্রমে ইন্দ্রিয়াত্ববাদী, মনআত্মবাদী ও প্রাণাত্মবাদী চার্বাক নামে অভিহিত করা হয়। আর এক শ্রেণীর চার্বাক আকাশকেও পঞ্চম মহাভূত বলে স্বীকার করেছেন। ফলে তাঁরা ক্রমে ক্রমে আধ্যাত্মবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। এবং সুশিক্ষিততর ভূমসুখবাদী চার্বাকগণ ঔপনিষদিকগণের প্রতিপাদিত আধ্যাত্মবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন।

.

উপনিষদীয় আধ্যাত্মবাদী মতাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করলে যে আধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের পক্ষ থেকে এরা সুশিতিতর অভিধায় ভূষিত হবেন এ আর নতুন কী ! তবে আমাদের আলোচনা আধ্যাত্মবাদে আত্মসমর্পণকারী সুশিক্ষিততরদের নিয়ে নয়। কেননা প্রচলিত চার্বাকী ভাবনায় তাদেরকে চার্বাকপন্থী ভাবার সুযোগ নেই। বরং সুশিক্ষিত চার্বাকরাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

.

বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীলের ‘তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা’য় পুরন্দর নামে এক চার্বাকের উল্লেখ আছে। চার্বাকী সাধারণ ধারণার ব্যতিক্রম হিসেবে এই পুরন্দর লৌকিক অনুমানকে প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করলেও অলৌকিক কোন ধারণাকে এই অনুমানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতে তাঁর অসম্মতির পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও দুর্ভাগ্যজনক বিলুপ্তির কারণেই পুরন্দরের রচিত কোন গ্রন্থের অস্তিত্বের কথা জানা যায় না, তবে বিভিন্ন লেখকরা পুরন্দরকে ‘চার্বাকমতে গ্রন্থকর্তা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এজাতীয় উল্লেখ থেকে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি আধুনিক বিদ্বানরাও পুরন্দরকে চার্বাকপন্থী বলেই ধরে নিয়েছেন।

.

কমলশীল তাঁর ‘তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা’ গ্রন্থটি যে গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসেবে রচনা করেন, বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিতের সেই ‘তত্ত্বসংগ্রহ’ গ্রন্থে শান্তরক্ষিত দীর্ঘবিস্তৃতভাবে পূর্বপক্ষ হিসেবে উপস্থাপিত চার্বাকপন্থী লোকায়তমত খণ্ডনের প্রয়াস করেছেন। এই পূর্বপক্ষ বর্ণনার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রকৃত চার্বাকপন্থী জনৈক দার্শনিকের উল্লেখ এবং এক্ষেত্রে দার্শনিকটির নাম পুরন্দর। কমলশীল তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা’য় বলছেন-
‘পুরন্দরঃ তু আহ লোকপ্রসিদ্ধম্ অনুমানং চার্বাকৈঃ অপি ইষ্যতে এব, যৎ তু কৈশ্চিৎ লৌকিকং মার্গম্ অতিক্রম্য অনুমানম্ উচ্যতে তন্নিষিধ্যতে।’ (তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা)।
অর্থাৎ : পুরন্দর কিন্তু বলেন চার্বাকও লোকপ্রসিদ্ধ অনুমান স্বীকার করেন; তবে কেউ যদি লৌকিক পথ অতিক্রম করে কোনকিছু অনুমান করতে চান তাহলে চার্বাক তার নিষেধ করবেন বা স্বীকার করবেন না।

.
অতএব, চার্বাকমতের এই প্রবক্তার বক্তব্য খুবই স্পষ্ট যে, অনুমানমাত্রই- বা সব রকম অনুমানই- অস্বীকার করার দরকার নেই। লোকপ্রসিদ্ধ বা ইহলোক সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণত অনুমানের যে প্রয়োগ তার বিরুদ্ধে চার্বাকেরও কোন আপত্তি নেই। আপত্তিটা সেখানেই- পারলৌকিক বিষয়ে অনুমানের বিরুদ্ধে। লৌকিক পথ অতিক্রম করে পারলৌকিক বিষয়ে অনুমান অবশ্যই অচল। এখানে একটু গভীরভাবে খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে, এই মতের সাথে প্রচলিত প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী চার্বাকপন্থী মতের আদর্শগত কোন বিরোধ বা প্রতিষেধ নেই। কারণ লোকপ্রসিদ্ধ বা ইহলোক সংক্রান্ত বিষয়ে অনুমানের পেছনে আসলে পূর্ব-প্রত্যক্ষ ইহজাগতিক অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য থেকে যায়। যেমন প্রাতে উঠোন ভেজা দেখে পূর্বরাত্রে বৃষ্টির অনুমান বা গর্ভ দেখে পূর্ব-সঙ্গমের অনুমান আসলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পূর্ব-প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরম্পরাগত অনুমান প্রমাণ। কিন্তু পারলৌকিক বিষয়ে অনুমানের পেছনে পূর্বে কোন প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার নজির থাকে না বলে এই অনুমান গ্রাহ্য হয় না। তাই পুরন্দর প্রবর্তিত চার্বাক মত আসলে প্রচলিত চার্বাক মতেরই উন্নত সংস্করণ বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

.
কিন্তু 'সুশিক্ষিত' শব্দটি যেহেতু জয়ন্ত ভট্টের ন্যায়মঞ্জরী থেকেই উদ্ভূত, তাই চার্বাকদের কোন শাখাকে এই সংজ্ঞায় শ্রেণীবদ্ধ করতে জয়ন্ত ভট্টের দৃষ্টিভঙ্গি না-জানা পর্যন্ত বিষয়টির সুরাহা হয় না। এদের সম্পর্কে জয়ন্তের উক্তিটি আগেই দেখেছি আমরা- 'সুশিক্ষিত চার্বাকদের মতে প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম করা সম্ভব নয়' (ন্যায়মঞ্জরী: ১/৩৩)।
সাধারণ চার্বাক মত থেকে পৃথক অপর একটি মতের সমর্থক হিসেবে চার্বাকদের বর্ণনা করার সময় ন্যায়াচার্য জয়ন্ত এই 'সুশিক্ষিত' সংজ্ঞাটির আরও একবার প্রয়োগ করে বলেন-

'অত্র সুশিক্ষিতাশ্চার্বাকা আহঃ, যাবচ্ছরীরমধ্যস্থিতমেকং প্রমাতৃতত্ত্বম...' (ন্যায়মঞ্জরী: ২/৩৯)।
অর্থাৎ : সুশিক্ষিত চার্বাকরা বলেন- আত্মা বা 'প্রমাতৃতত্ত্ব' স্থূলদেহ হতে ভিন্ন এবং সচেতন ব্যবহারের সব কিছু এই 'প্রমাতৃতত্ত্বে' আরোপ্য। কিন্তু এই আত্মার স্থায়িত্ব শরীরের অস্তিত্বের সমকালীন।

.
প্রচলিত চার্বাকী চিন্তার দেহাত্মবাদী মতে আত্মা বা চৈতন্যকে দেহ থেকে উৎপন্ন মনে করা হয়। কিন্তু জয়ন্তের বক্তব্য অনুযায়ী এই 'সুশিক্ষিত' সংজ্ঞার মাধ্যমে বিশেষিত যে চার্বাকদের মতে আত্মা দেহ থেকে পৃথক, অথচ দেহের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত, তাঁরা স্পষ্টতঃতই চার্বাক সম্প্রদায়ে আত্মাসম্বন্ধীয় ধারণায় শ্রেণীভেদের ইঙ্গিত দেয়।

.
এবং 'ন্যায়মঞ্জরী'র আরেক জায়গায় জয়ন্ত ভট্ট আবার চার্বাক প্রসঙ্গে 'সুশিক্ষিততর' বিশেষণ যুক্ত করে বলেন-

সুশিক্ষিততরাঃ প্রাহুঃ... যত্ত্বাত্মেশ্বরসর্বজ্ঞপরলোকাদিগোচরম্ । অনুমানং ন তস্যেষ্টং প্রামাণ্যং তত্ত্বদর্শিভিঃ। (ন্যায়মঞ্জরী: ১/১১৩)।
অর্থাৎ : সুশিক্ষিততররা বলে থাকেন- অনুমান দু-রকম, উৎপন্ন-প্রতীতি এবং উৎপাদ্য-প্রতীতি। ধূম প্রভৃতি থেকে বহ্নি প্রভৃতির অনুমান কে অস্বীকার করে ? এসব দ্বারা তার্কিক দ্বারা অক্ষত ব্যক্তিরাও সাধ্য-কে জানতে পারে। তবে আত্মা, সর্বজ্ঞ, ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি বিষয়ে যে-অনুমানের কথা বলা হয় সেগুলির প্রামাণ্য তত্ত্বদর্শীরা স্বীকার করেন না। এইসব অনুমানের দ্বারা সোজা মানুষের অনুমেয় বিষয়ে জ্ঞান হয় না- অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মন দুষ্ট তার্কিকদের দ্বারা কুটিল হয়ে ওঠে।

.

একে তো ন্যায়শাস্ত্রের জটিল পরিভাষা, তার উপরে জয়ন্ত ভট্টের পাণ্ডিত্যপূর্ণ শ্লেষ বা ঠাট্টা-তামাশায় ঠাসা বক্তব্যের তীর্যক কায়দা থেকে সহজ-সরল অর্থ উদ্ধার করা চাট্টিখানি কথা নয়। এক্ষেত্রে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জয়ন্তর এ বক্তব্যকে আমাদের বোধগম্য করে সোজা ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন এভাবে-
'জয়ন্ত বলছেন, সুশিক্ষিততরদের মতে প্রত্যক্ষগোচর ইহলোক বিষয়ে সাধারণ লোক যা অনুমান করে থাকে তা অবশ্যই স্বীকার্য : যেমন ধূম থেকে বহ্নির অনুমান। কিন্তু আত্মা, পরলোক প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে কূট তার্কিকেরা যে-সব অনুমান প্রদর্শন করেন তা শুধু তাঁদের কূটবুদ্ধিরই পরিচায়ক, স্বীকারযোগ্য অনুমান হতে পারে না।' (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৫৫)।

.

'সুশিক্ষিততর'-দের মত হিসেবে জয়ন্তর এ বক্তব্য মূলত পুরন্দরের কথাই মনে করিয়ে দেয়। বক্তব্যের প্রকাশভঙ্গি যেরকমই হোক, মূল বক্তব্য আসলে একই। এবং পুরন্দর যে চার্বাকপন্থীই এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে চার্বাকদের বিষয়ে জয়ন্ত ভট্টের বিবিধ বিশেষণ প্রয়োগকে আদৌ কোন শ্রেণীভেদ হিসেবে গণ্য করা হবে কিনা তাও সতর্ক বিবেচনার বিষয়। কেননা, শ্লেষাত্মক বিশেষণ ব্যবহারপূর্ণ রচনাকৌশলে রচিত 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে জয়ন্ত ভট্ট 'সুশিক্ষিত' শব্দটিকে ব্যাঙ্গাত্মক অর্থেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়। এই শব্দটি শুধু চার্বাকদের বেলায়ই নয়, ন্যায়মঞ্জরীতে অন্যান্য দার্শনিকদের সমালোচনায়ও একইরকম ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন, একই গ্রন্থে (ন্যায়মঞ্জরী: ১/১৬১) ঠাট্টা করে তিনি মীমাংসক প্রাভাকরদের সম্বন্ধে এই বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। আবার অন্যত্র (ন্যায়মঞ্জরী: ১/২৭৩) যে দার্শনিকেরা 'সামান্য বা জাতি' (Universal) মানেন না তাঁদেরও পরিহাস করে 'সুশিক্ষিত' বলেছেন। তাই জয়ন্তভট্টর 'ন্যায়মঞ্জরী' থেকে চার্বাকমতের শ্রেণীভেদ সম্বন্ধে কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা কঠিন বলে বিদ্বান গবেষকদের অভিমত। ফলে পাণ্ডিত্য ও তর্কবিদ্যায় পারদর্শী ও সুপরিচিত চার্বাক গোষ্ঠির সাধারণ সংজ্ঞা হিসেবে সুশিক্ষিত শব্দের ব্যবহার অস্বাভাবিক নাও হতে পারে। কিন্তু শুধু জয়ন্তর রচনার নজির দেখিয়ে চার্বাকদের 'ধূর্ত', 'সুশিক্ষিত' এসব নামের স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের

কল্পনা করা আদৌ সমীচীন হবে না বলেই মনে হয়।

.

সে যাক, সংশ্লিষ্ট অন্য অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, আত্মা, জন্মান্তর, কর্মফল, অদৃষ্ট, ঈশ্বর, শ্রুতি এবং অনুমান প্রমাণ ইত্যাদি বিষয়গুলি চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন ধারণার উৎস হয়ে অধ্যাত্ম দর্শনগুলি বিপুলভাবে পল্লবিত হয়েছে। এবং ধারণা করা যায় সেগুলিরই প্রতিরোধের ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে চার্বাকীয় দর্শনের শক্তিশালী আয়ুধগুলিও। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, চার্বাকদের নিজস্ব সাহিত্য ধ্বংস বা বিলুপ্তির কারণে চার্বাকদের একান্ত নিজস্ব সিদ্ধান্তগুলি একেবারে অকৃত্রিম ও অবিকৃতভাবে আমাদের জানার সুযোগ রহিতই বলা চলে। তবে চার্বাক-মতকে প্রতিহতের নিমিত্তে রচিত প্রতিপক্ষ চার্বাকেতর দার্শনিকদের রচিত সাহিত্য-সম্ভারই আমাদের পক্ষে চার্বাক-মত জানার একমাত্র মাধ্যম। চার্বাক তথা লোকায়ত মত যে তৎকালে প্রকৃতই একটি অতি প্রভাবশালী দর্শন-মত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। কেননা যে বিপুল উদ্যমে চার্কাক-খণ্ডনে অন্যান্য দর্শনগুলি নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলো তাতে করে চার্বাকদর্শনকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগই নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ দার্শনিকরা চার্বাক-মত খণ্ডনের সুবিধার্থে যেভাবে তাঁদের সাহিত্যে চার্বাককে উপস্থাপন করেছেন সেই রসদ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপাদান থেকেই চার্বাক মতের একটি যৌক্তিক রূপরেখা অঙ্কন অসম্ভব নয় বলেই মনে হয়, এবং বিদগ্ধ গবেষকরা সে-চেষ্টাই করেছেন। পরবর্তী চার্বাক-সিদ্ধান্তের আলোচনায় তারই আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

চার্বাক সিদ্ধান্ত, আলোচনা-সমালোচনা

ইতোমধ্যেই আমাদের বোঝার বাকি থাকে না যে, ভারতীয় অধ্যাত্ম দর্শনগুলির নিকট চার্বাকমত বুঝি এক জীবন্ত প্রহেলিকা। যুক্তিনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে অধ্যাত্ম বা অলৌকিকতার বিরুদ্ধে লৌকিক বাস্তবতার প্রচণ্ড সাঁড়াশি আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিত যে-দর্শনমতের অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিলো তাকে অধ্যাত্মবাদীরা যে প্রাণপণে প্রতিহত করবেন তাতে আর আশ্চর্যের কী! অধ্যাত্মবাদীদের এই প্রতিহতকরণ-প্রচেষ্টা কোন্ পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিলো তা অনুধাবন করা যায় চার্বাকদের বিরুদ্ধে তাঁদের ঘৃণা আর খেদোক্তি বা অভিশন্তাপের বাহুল্য দেখেও। প্রচলিত সাধারণ-জনমানসেও দেখা যায় ক্ষতিগ্রস্ত করার কারণে বিরোধী কাউকে মনমতো শায়েস্তা করতে না পারলে অক্ষম যন্ত্রণায় শেষতক অভিশাপ দিয়েই সান্ত্বনা খোঁজে, 'ধর্মই তোর বিচার করবে, তুই নরকবাসী হবি!'

এই নরকবাস আসলে কী? শাস্ত্রে নরকের নানারকম বর্ণনা পাওয়া যায়। বোঝাই যায় শাস্ত্রমতে নরক একরকমের নয়। কেবল 'মনুস্মৃতি'তেই (মনুসংহিতা-৪/৮৮-৯০) একুশ রকম নরকের ফর্দ রয়েছে। 'মনুস্মৃতি'র এই ফর্দ থেকেই বোঝা যায় সম্ভব-অসম্ভব রকমারি পার্থিব যন্ত্রণার বিবরণই নরক-কল্পনার মূল উপাদান। যেমন–

তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরবরৌরবৌ।
নরকং কালসূত্রঞ্চ মহানরকমেব চ।। (মনু-৪/৮৮)
সঞ্জীবনং মহাবীচিং তপনং সম্প্রতাপনম্ ।
সংঘাতঞ্চ সকাকোলং কুড্মলং পূতিমৃত্তিকম্ ।। (মনু-৪/৮৯)
লোহশঙ্কুমৃজীষঞ্চ পন্থানং শাল্মলীং নদীম্ ।
অসিপত্রবনঞ্চৈব লোহদারকমেব চ।। (মনু-৪/৯০)

অর্থাৎ :

এই একুশ-রকমের নরকগুলি– তামিস্র (অন্ধকার), অন্ধতামিস্র (নিবিড় অন্ধকার), মহারৌরব (মহাকোলাহলপরিপূর্ণ), রৌরব (কোলাহলপরিপূর্ণ), কালসূত্র (যেখানে সকলরকম উপায়ে পীড়ন করা হয়), সঞ্জীবন (যেখানে বার বার বাঁচিয়ে বার বার মেরে ফেলা হয়), মহানরক (যেখানে অগ্নিপ্রভৃতির দ্বারা সন্তাপ দেওয়া হয়), মহাবীচি (মতান্তরে, অবীচি; যেখানে অত্যন্ত জলতরঙ্গ), তপন (আগুন প্রভৃতির দ্বারা দগ্ধ করা হয় যেখানে), সম্প্রতাপন (কুম্ভীপাক; যেখানে কুম্ভে নিক্ষেপ করা হয়), সংঘাত (যেখানে অত্যন্ত সংকীর্ণস্থানে বহু লোককে স্থাপন করা হয়), কাকোল (যেখানে কাকদের দ্বারা ভক্ষণ করানো হয়), কুড্মল (যেখানে দড়ি দিয়ে বেঁধে পীড়ন দেওয়া হয়), পূতিমৃত্তিক (যেখানকার মাটি বিষ্ঠার গন্ধে পূর্ণ), লোহশঙ্কু (যেখানে সূচের দ্বারা ভেদন করানো হয়), ঋজীষ (যেখানে তপ্ত কড়াইতে নিক্ষেপ করা হয়), পন্থা (যেখানে বারংবার গমনাগমন করানো হয়), শাল্মলী (অন্যমতে, শাল্মল; যেখানে শাল্মলীর কাঁটার দ্বারা শরীরকে বিদ্ধ করানো হয়), নদী (বৈতরণী প্রভৃতি যে সব নদী দুর্গন্ধ-রুধির পূর্ণ, অস্থিপ্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন, উষ্ণজলপরিপূর্ণ ও বেগবতী– তার উপর ভাসানো হয়), অসিপত্রবন (যেখানে তরবারীর তীক্ষ্ণাংশদ্বারা শরীর ছিন্নভিন্ন করা হয়) এবং লোহদারক

(যেখানে লৌহশৃঙ্খলের দ্বারা বেঁধে রাখা হয়)। (মনসংহিতা-৪/৮৮-৯০)।।

কোন্ পাপে কার জন্য কোন্ নরকের নিবন্ধন ঘটে তাও নিশ্চয়ই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আর টীকাকার কুল্লুকভট্টই বলছেন, রকমারি নরকের আরো বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয় নরক-বর্ণনা নয়। তবে এতো রকমের নরকের একটি যে মহানরক, যেখানে সমস্ত রকম যন্ত্রণার আয়োজনই রাখা হয়েছে তা বোধ করি বোঝার বাকি নেই। এই মহানরকের উল্লেখ করা হচ্ছে এজন্যেই যে, প্রসিদ্ধ ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র তাঁর 'ভামতি' গ্রন্থে (ভামতি-৩/৩/৫৪) বলছেন–

'এ-হেন মহানরকেই নাস্তিক চার্বাকের স্থান। অবশ্য সাধারণত মরবার পরে নরকে যাবার কথা। কিন্তু চার্বাকের অবস্থা তা নয়। মহানরকবাসের জন্যে তার মরবারও দরকার পড়ে না, জীবদ্দশাতেই ঐ নরকবাস। কেননা, চার্বকের এমনই মত যে তা মানলে মহানরকের যন্ত্রণা ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

বাচস্পতির এই উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে' গ্রন্থ (পৃষ্ঠা-৪৩) থেকে। কিন্তু কী এমন মত যে তা মানলে জীবদ্দশাতেই এ-হেন যন্ত্রণা? দেবীপ্রসাদ-কৃত উদ্ধৃতিতে বাচস্পতি বলছেন–

'চার্বাক প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণই মানে না। তাই তার অবস্থা জানোয়ারেরও বেহদ্দ। জানোয়ারেরাও হিত-প্রাপ্তি ও অহিত-পরিহারের ব্যাপারটা বোঝে, কিন্তু বুঝতে গেলে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন, জানোয়ারেরাও হিতপ্রাপ্তির জন্যে কোমল ঘাসের ক্ষেত্রে বিচরণ করে; অহিত পরিহারের জন্যে শুকনো কাঁটার জঙ্গল এড়িয়ে যায়। নিছক প্রত্যক্ষর উপর নির্ভর করে এজাতীয় ব্যবহার সম্ভব নয় : হিতপ্রাপ্তির ও অহিত-পরিহারের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির জন্যে অনুমানের উপর নির্ভরতা প্রয়োজন। কিন্তু চার্বাক অনুমান বলে কোনো প্রমাণই মানে না; পশুর ব্যবহারের মধ্যে যেটুকু অনুমানের আয়োজন তাও নয়। তাছাড়া, চার্বাকের পক্ষে তো বেবাক বোবা হয়ে থাকবার কথা, কেননা অপরকে কিছু বলতে গেলে শব্দ ব্যবহার প্রয়োজন এবং শব্দ প্রত্যক্ষ হলেও শব্দ থেকে শব্দযোগ্য পদার্থ অনুমানসাপেক্ষ। অতএব চার্বাক জন্মান্তরের কথা উড়িয়ে দিতে গেলেও ইহজন্মেই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, নিশ্চেষ্ট এবং মূক অবস্থায় মহানরকের যন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য।'

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বাচস্পতি মিশ্র যে যেনতেন লোক নন, দার্শনিক হিসেবে দিকপাল-বিশেষ, তা বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা সম্পূর্ণই অবগত। নানা প্রসিদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যায় তাঁর গ্রন্থ প্রামাণ্য বলেই স্বীকৃত। কিন্তু বিদগ্ধ চিন্তাশীলও যখন চিন্তাচেতনার বালাই চুকিয়ে দিয়ে চার্বাককে এমন গাল দিতে উদ্যত হন তা নিশ্চয়ই হেলাফেলার বিষয় নয়। কিন্তু চার্বাকের নিন্দা– বিশেষত তার প্রত্যক্ষপরায়ণতার বিবরণ যে অতিরঞ্জিত এটুকু অনুমান করতে কষ্ট হয় না। কেননা চার্বাকদের বিরুদ্ধে একটা প্রচলিত অভিযোগ এই যে

সুখাদ্যের প্রতি চার্বাকের অত্যন্ত অভিরুচি। তাই কচি ঘাস দেখে ছাগলেও তার প্রতি আকৃষ্ট হবার জন্য যতটুকু অনুমান-পরায়ণতার পরিচয় দেয়, চার্বাকের মধ্যে তারও অভাব– এমনতর অসম্ভব উক্তি দার্শনিক প্রতিভা তো দূরের কথা, সামান্যতম সততারও পরিচায়ক নয় বলে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত। বিষয়গুলি স্পষ্টতর হওয়ার লক্ষ্যেই ভারতীয় দর্শনে চার্বাকী-সিদ্ধান্তের আলোচনায় আমরা অনুপ্রবিষ্ট হতে পারি। তবে এ-প্রসঙ্গে বলে রাখা আবশ্যক যে, আলোচনার স্পষ্টতার নিরীখে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে আলোচিত চার্বাক সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট বিশেষ কিছু দৃষ্টান্তের পুনরোল্লেখ ঘটতে পারে প্রাসঙ্গিক বিবেচনার আলোকে।

...

১.০। প্রত্যক্ষ-প্রাধান্যবাদ

...

।। ক।। প্রত্যক্ষই প্রমাণশ্রেষ্ঠ।

চার্বাক দর্শন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন গ্রন্থে বিশেষত দর্শনের সঙ্কলন গ্রন্থগুলিতে চার্বাক নামের সঙ্গে প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদিতা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। যেমন কৃষ্ণমিশ্র রচিত একাদশ শতকের রূপক নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-এ বলা হয়েছে–

'লোকায়তমেব শাস্ত্রং যত্র প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্...বাচস্পতিনা প্রণীয় চার্বাকায় সমর্পিতম্। তেন চ শিষ্যপ্রশিষ্যদ্বারেনাস্মিল্লোকে বহুলীকৃতং তন্ত্রম্'। -(প্রবোধচন্দ্রোদয়, পৃষ্ঠা-৬৪)।
অর্থাৎ : লোকায়তশাস্ত্রমতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। ...বাচস্পতি বা বৃহস্পতি প্রণীত এই লোকায়ত শাস্ত্রমতটিকে চার্বাক শিষ্য-প্রশিষ্যের মাধ্যমে চতুর্দিকে প্রচার করেন। (মুক্ত তর্জমা)।

বেদান্ত অনুসারী সায়ণ মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থের চার্বাক দর্শনের বর্ণনায় বলা হয়েছে–

'প্রত্যক্ষৈক-প্রমাণবাদিতয়া অনুমানাদেরনঙ্গীকারেণ প্রামাণ্যাভাবাৎ'। (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিত্ব হেতু অর্থাৎ একমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলেন বলে, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ অস্বীকার করেন বলে দেহাতিরিক্ত আত্মাতে অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ নয়।

'অদৃষ্ট' স্বীকারে চার্বাকদের আপত্তি; কারণ দৃষ্টিসীমার বহির্ভূত হওয়ার ফলে প্রত্যক্ষের মাপকাঠিতে 'অদৃষ্ট' বিচারযোগ্য নয়। অদৃষ্টবাদীদের দ্বারাও অদৃষ্ট কখনও দৃষ্ট হয়েছে বলে শোনা যায় না। তাছাড়া, বিশেষ কোন স্থানে বা কোন সময়ে দৃষ্ট হলেও এর অদৃষ্ট নামের সার্থকতা থাকে না। নিত্য অদৃষ্ট কোন বস্তুর সত্তাকে যদি আমরা অনুমোদন করি তাহলে 'শশশৃঙ্গ' বা অনুরূপ অসম্ভব পদার্থের অস্তিত্বকেও আমাদের স্বীকৃতি দিতে হয়। চার্বাকী বা লোকায়তিক এই মতবাদই বর্ণিত হয়েছে অদ্বৈতবেদান্তের প্রবর্তক শঙ্করাচার্যের 'সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ' গ্রন্থে–

'প্রত্যক্ষগম্যমেবাস্তি নাস্ত্যদৃষ্টমদৃষ্টতঃ।
অদৃষ্টবাদিভিশ্চাপি নাদৃষ্টং দৃষ্টমুচ্যতে।।' (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/২)।।
'ক্বাপি দৃষ্টমদৃষ্টঞ্চেদদৃষ্টং ব্রুবতে কথম্ ।
নিত্যাদৃষ্টং কথং সৎ স্যাৎ শশশৃঙ্গাদিভিঃ সমম্ ।।' (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/৩)।।
অর্থাৎ :
লোকায়তিকেরা বলেন, যা কিছু প্রত্যক্ষসিদ্ধ তা-ই আছে। অদৃষ্ট যেহেতু দেখা যায় না সেহেতু অদৃষ্ট বলে কিছু নেই। অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়ে থাকে– এমন কথা অদৃষ্টবাদিগণও বলেন না। (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/২)।। যদি অদৃষ্ট কোথাও দেখে থাকো, তবে সেই দৃষ্ট বস্তুকে অদৃষ্ট কেন বলো? আবার শশশৃঙ্গাদির ন্যায় নিত্যই যা অদৃষ্ট, তা কিভাবে সৎ হতে পারে? (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/৩)।।

নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট ‘ন্যায়মঞ্জরী’ গ্রন্থের এক জায়গায় প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী হিসেবে চার্বাকের বর্ণনায় বলছেন–

তথাহি প্রত্যক্ষং এব একং প্রমাণম্ ইতি চার্বাকাঃ। (ন্যায়মঞ্জরী-১/২৬)।
অর্থাৎ : চার্বাকরা বলেন, প্রত্যক্ষই এক এবং একমাত্র প্রমাণ।

‘সর্বমতসংগ্রহ’ গ্রন্থেও চার্বাকদেরকে বলা হয়েছে–

‘প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিনো’। (সর্বমতসংগ্রহ)
অর্থাৎ : কেবল প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী।

বলা যায়, ভারতীয় গোটা দর্শন সাহিত্যেই চার্বাকের প্রধান পরিচিতি প্রত্যক্ষবাদী হিসেবে। তবে কি অন্যান্য দর্শনগুলি প্রত্যক্ষকে স্বীকার করেন না? অবশ্যই করেন। প্রমাণসমূহের অন্যতম হিসেবে ভারতীয় দর্শনে প্রত্যক্ষের স্বীকৃতির উল্লেখ আছে সবকটি দর্শন-মতেই, ইতঃপূর্বে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি।
লৌকিক মতে প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ জ্ঞানের দ্যোতক। কিন্তু দার্শনিক পরিভাষায় এর অর্থ পৃথক। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পর্যায়ে সাধারণত পাঁচটি ইন্দ্রিয় অন্তর্ভুক্ত। এগুলির কোনও একটির সাহায্যেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদ্ভব হতে পারে। চক্ষু এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির অন্যতম হলেও কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক– এই চারটি ইন্দ্রিয়ের ভূমিকাও প্রত্যক্ষজ জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে কোন অংশে কম নয়। এই ইন্দ্রিয় পাঁচটির প্রত্যেকটিই নিজ নিজ বিভাগে জ্ঞান আহরণের বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। কোন বস্তু যখন বিশেষ কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে তখন ইন্দ্রিয়টির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমরা বস্তুটি সম্বন্ধে বিশেষ ধরনের জ্ঞান লাভ করি। যেমন একটি ফুল সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষজ জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে চক্ষু, নাসিকা এবং ত্বকেরই কেবল কার্যকারিতা দেখা যায়, অন্য ইন্দ্রিয়ের নয়। চোখ দিয়ে আমরা ফুলটিকে দেখি; নাকের সাহায্যে গন্ধ উপভোগ করি এবং ত্বক দিয়ে ফুলটিকে স্পর্শ করি। আবার গান শোনা বা সুখাদ্য ভোজন ইত্যাদি ব্যাপারে যথাক্রমে কর্ণ এবং জিহ্বার বৈশিষ্ট্য কাজ করে, অন্য ইন্দ্রিয় নয়। মনের ভূমিকা কোন কোন ক্ষেত্রে বাহ্য বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের মাধ্যম হিসেবে, আবার অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র এক ইন্দ্রিয় রূপে। জ্ঞানেন্দ্রিয় হিসেবে মন আন্তর প্রত্যক্ষের কারণ হয়, অন্য ইন্দ্রিয়গুলির বা বাহ্য বস্তুনিচয়ের যেখানে কোন কার্যকরিতা নেই।

প্রমাণগুলির মধ্যে একমাত্র এই প্রত্যক্ষের সঙ্গেই যাঁরা চার্বাকের যোগ স্বীকার করেন তাঁদের মতে চার্বাকের জ্ঞানের রাজ্যে সঞ্চয় এই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারপথেই কেবল হওয়া সম্ভব। জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সূরির ‘ষড়দর্শনসমুচ্চয়’ গ্রন্থে লোকায়ত প্রসঙ্গে এ-ধরনের উক্তিই দেখা যায়–

‘লোকায়তা বদন্ত্যেবং নাস্তি দেবো ন নির্বৃতিঃ।
ধর্মাধর্মৌন বিদ্যেতে ন ফলং পুণ্যপাপয়োঃ।।
এতাবানেব লোকোহয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ। (ষড়দর্শনসমুচ্চয়-৮১)

অর্থাৎ : লোকায়তরা বলেন, দেবতা বলে কিছু নেই, মোক্ষ বলেও নয়। ধর্ম ও অধর্ম বলে কিছু হয় না, পুণ্য ও পাপের ফল বলেও নয়। যতটুকু ইন্দ্রিয়গোচর ততটুকুই ইহলোক (অতএব সত্য)।

তার মানে, ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের বক্তব্য হলো, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যতটুকু জানা সম্ভব চার্বাকের জগৎ তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এভাবে বৌদ্ধদার্শনিক কমলশীলের 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা'-তেও অনুরূপ একটি লোকায়ত বচনের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, যেমন–
'এতবানেব পুরুষো যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ'। (তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা)
অর্থাৎ : যতটুকু ইন্দ্রিয়গোচর ততটুকুই ইহলোক।

চার্বাক দর্শন সম্বন্ধে চার্বাকেতর দার্শনিকদের সাধারণ মনোভাব এই ধারণারই অনুগামী বলে বস্তুবাদী দর্শন হিসেবে চার্বাকের পরিচিতিও সেই ধারণারই অনুসরণে গড়ে উঠেছে বা তৈরি করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারপথে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে একমাত্র বস্তুজগতের মালমসলাই সঞ্চিত হয়। প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম করার জন্য এই উপাদানের অতিরিক্ত অন্য কিছু চার্বাকের জ্ঞানের রাজ্যে তার সঞ্চয় রাখতে পারে না, ফলে স্থূল বস্তুজগৎকে কেন্দ্র করেই রূপায়িত হয়ে ওঠে চার্বাকের সম্পূর্ণ নিজস্ব বস্তুবাদী সিদ্ধান্ত। কিন্তু সাধারণভাবে এই রূপে চার্বাকের পরিচিতি তৈরি করা হলেও ভারতীয় সাহিত্যের অন্যান্য সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে চার্বাকের সামগ্রিক রূপের প্রতিফলন এখানে হয়নি এবং কেবল প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী হিসেবেও চার্বাককে সব ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা যায় না। ইতঃপূর্বে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে চার্বাক সম্প্রদায়ের শ্রেণীভেদ প্রসঙ্গে চার্বাকগোষ্ঠির মধ্যে বৈতণ্ডিক, ধূর্ত, সুশিক্ষিত ইত্যাদি একাধিক মতবাদের প্রচলনের উল্লেখ করা হয়েছে এবং চার্বাক সিদ্ধান্তের সামগ্রিক রূপের বিচারের জন্য এগুলির আলোচনা সহ বিভিন্ন দার্শনিকগোষ্ঠির মনোভাব বিশ্লেষণও আবশ্যক বলেই মনে হয়।

.
চার্বাক প্রসঙ্গে নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টর বক্তব্য এবং তত্ত্বোপপ্লবসিংহ :
যদিও চার্বাক প্রসঙ্গে জয়ন্তভট্টর প্রকৃত বক্তব্য নির্ণয় করার বেশ সমস্যা রয়েছে, তবু এ প্রসঙ্গে চার্বাক সম্বন্ধে 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে জয়ন্তভট্টর মন্তব্য উল্লেখ্য। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, তিনি প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী হিসেবে চার্বাক গোষ্ঠিকে সাধারণভাবে বিশেষিত করে 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থের এক জায়গায় সরাসরি বলেছেন–
তথাহি প্রত্যক্ষং এব একং প্রমাণম্ ইতি চার্বাকাঃ। (ন্যায়মঞ্জরী : ১/২৬)।
অর্থাৎ : চার্বাকরা বলেন, প্রত্যক্ষই এক এবং একমাত্র প্রমাণ।

শুধু এটুকু বললে সিদ্ধান্ত করা যেতো যে, তাঁর দৃষ্টিতে চার্বাকমতে প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অনুমান বলে কোনো প্রমাণ সম্ভব নয়। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, এই 'ন্যায়মঞ্জরী'রই অন্যত্র তিনি ভিন্ন

ধরনের অপর এক মতবাদকে চার্বাক নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং এই মতবাদের সমর্থক চার্বাকেরা তাঁর ভাষায় 'ধূর্ত' সংজ্ঞায় চিহ্নিত। যেমন–

'চার্বাকধূর্তঃ তু অথ অতঃ তত্ত্বং ব্যাখ্যাস্যামঃ ইতি প্রতিজ্ঞায় প্রমাণ-প্রমেয়-সংখ্যা-লক্ষণ-নিয়ম-অশক্য-করণীয়ত্বম্ এব তত্ত্বং ব্যাখ্যাতবান্'। (ন্যায়মঞ্জরী : ১/৫৯)।
অর্থাৎ : ধূর্ত চার্বাক কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলো– এবার আমরা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবো; কিন্তু 'তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবো' বলে চার্বাক আসলে দেখাতে চাইলো যে প্রমাণ ও প্রমেয়র সংখ্যা ও লক্ষণ সংক্রান্ত কোনো নিয়মই সম্ভব নয়।

জয়ন্তের বর্ণনায়, এই শ্রেণীর চার্বাকদের মতে প্রমাণ এবং প্রমেয়ের সংখ্যা এবং লক্ষণের নিয়ম করা সম্ভব নয়। সংখ্যা এবং লক্ষণ সম্বন্ধীয় নিয়মের অনৈক্যই এঁদের পরিভাষায় 'তত্ত্ব' আখ্যা পেয়েছে এবং এই অর্থানুসারী তত্ত্বের ব্যাখ্যাকে আশ্রয় করে এঁরা এমন অনেক প্রমিতির উদাহরণ দিয়েছেন যাদের উদ্ভব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের মাধ্যমে হয় না। সহজভাবে বললে, এই শ্রেণীর চার্বাকদের মতে কোন রকম প্রমাণেরই লক্ষণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়, মানে কোন রকম প্রমাণই সম্ভব নয়– ফলে প্রত্যক্ষও সংশয়াতীত নয়। তার মানে, এই মতটি যে অবশ্যই প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী চার্বাকদের মতাদর্শ নয়, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। আবার এই একই 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থেই জয়ন্ত ভট্ট আবার 'সুশিক্ষিত' সংজ্ঞায় বিশেষিত চার্বাকদের সম্পর্কেও বলেন–

অশক্য এব প্রমাণসংখ্যানিয়ম ইতি সুশিক্ষিত চার্বাকাঃ। (ন্যায়মঞ্জরী : ১/৩৩)।
অর্থাৎ : সুশিক্ষিত চার্বাকদের মতে প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম করা সম্ভব নয়।

.

এক্ষেত্রে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ইতঃপূর্বে উল্লেখকৃত মন্তব্যটি পুনরায় প্রণিধানযোগ্য–
'জয়ন্তর স্বীয় সম্প্রদায়ের– অর্থাৎ ন্যায় সম্প্রদায়ের– দাবি এই যে প্রমাণ আসলে চার রকম। অতএব স্বমত সমর্থনে যে-দার্শনিকেরা প্রমাণের সংখ্যা চারের চেয়ে বেশি বলে মনে করেন, জয়ন্তর পক্ষে তাঁদের মত খণ্ডনের প্রয়োজন বোধ করার কথা। কিন্তু কারা চারের চেয়ে বেশি প্রমাণ মানেন? জয়ন্ত বলছেন : প্রভাকর-পন্থী মীমাংসকরা বলেন, প্রমাণ পাঁচ রকমের; কুমারিলভট্টর অনুগামী মীমাংসকরা বলেন, প্রমাণ ছয় রকমের; কেউ-কেউ আবার বলেন, প্রমাণ আট রকমের; কিন্তু 'সুশিক্ষিত চার্বাক'রা বলেন, প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে কোনো নিয়ম মানা যায় না। কথাটার তাৎপর্য কি এই যে 'সুশিক্ষিত চার্বাক' মতে প্রমাণের সংখ্যা অসংখ্য, নাকি, প্রমাণ বলেই কিছু নেই? -(ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৫৫)।

মোটকথা, জয়ন্তভট্ট বর্ণিত চার্বাক-গোষ্ঠির সম্পূর্ণ চিত্রায়ণ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ এ প্রসঙ্গে চার্বাক পক্ষের নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পারে এমন রচনার প্রকৃত অভাব। এ-প্রেক্ষিতে ইতঃপূর্বে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত জয়রাশি ভট্টর 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' নামের

গ্রন্থটির উল্লেখ করা যেতে পারে। তার মধ্যেই জয়ন্ত বর্ণিত ধূর্ত চার্বাকদের ছবি আবিষ্কার করা হয়তো সম্ভব হতে পারে। প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণের মর্যাদা দান সম্বন্ধে চার্বাক প্রসঙ্গে সাধারণ যে ধারণার প্রচলন করা হয়েছে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহে'র সাক্ষ্য তারও পরিপন্থী। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার জয়রাশি ভট্ট অন্য প্রমাণের সঙ্গে প্রত্যক্ষকেও প্রমাণের আসর থেকে বহিষ্কার করতে আগ্রহী এবং প্রত্যক্ষোপার্জিত বস্তুজগতের বিষয়গুলিও তাঁর কাছে প্রমেয়ের মর্যাদা লাভে বঞ্চিত। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ বিচারে আমরা যাকে 'তত্ত্ব' বলি বিভিন্ন প্রমাণগ্রাহ্য সেই তত্ত্বের অস্তিত্বকে তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলেছেন–

'পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি লোকে প্রসিদ্ধানি, তান্যপি বিচার্যমানানি ন ব্যবতিষ্ঠন্তে, কিং পুনরন্যানি'। (তত্ত্বোপপ্লবসিংহ, পৃষ্ঠা-১)।
অর্থাৎ : সাধারণ লোকে যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূতকে তত্ত্ব বলে স্বীকার করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করলে দেখা যায় যে এরকম কোন প্রমেয় তত্ত্বেরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। (মুক্ততর্জমা)

নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপনের সময় জয়রাশি যে তত্ত্বকে উপজীব্য করেন, প্রমাণের সংখ্যা এবং লক্ষণসম্বন্ধীয় নিয়মের অনৈক্যের সঙ্গে তা একার্থক। বাস্তবিকপক্ষে জাগতিক বস্তুনিচয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করার মান, আমরা যেভাবেই ঠিক করি না কেন– কোন সময়েই তা ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না, এটা প্রদর্শন করাই তত্ত্বোপপ্লববাদীর উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জয়রাশি তর্কের বিভিন্ন কলাকৌশল উদ্ভাবন করে একই সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার সিদ্ধান্তে ত্রুটি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহে'র মতে–

'কথং কথং তানি ন সন্তি? তদুচ্যতে সল্লক্ষণনিবন্ধনং মানব্যবস্থানং, মাননিবন্ধনা চ মেয়স্থিতিঃ, তদভাবে ন তথা সদ্ব্যবহারবিষয়ত্বং কথং...'। (তত্ত্বোপপ্লবসিংহ, পৃষ্ঠা-১)
অর্থাৎ : প্রমাণের অস্তিত্ব সৎ লক্ষণের উপর নির্ভরশীল, আবার এই প্রমাণের মাধ্যমেই প্রমেয় বস্তুবিষয়ের ব্যবস্থাপনা। প্রমাণের লক্ষণে যদি ত্রুটি থাকে, তাহলে তাকে কখনই সৎ বলা চলে না এবং এই ত্রুটিপূর্ণ লক্ষণযুক্ত প্রমাণের অস্তিত্বও স্বীকৃত হতে পারে না। প্রমাণ অস্বীকৃত হলে প্রমাণের মাধ্যমে আমরা প্রমেয় যে বস্তু বা বিষয়ের ধারণা করি সেগুলিকেও অগ্রাহ্য করতে হয়।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, প্রমাণসম্বন্ধীয় নিয়মের বিরোধিতা প্রকৃতপক্ষে চার্বাকদের প্রগতিবাদী মনোভাবের ঐক্য সূচক, যা দার্শনিক মতবাদ ছাড়াও আমাদের আচরণ বিধির প্রতিটি ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ম-বন্ধনকে শিথিল করার প্রয়াসে তৎপর। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে সুকঠোর বিধিনিয়মের ভারে ভারাক্রান্ত বৈদিক আচারের প্রভাব থেকে মুক্তির প্রচেষ্টার মধ্যেই চার্বাকী চিন্তার প্রথম উন্মেষ। আবির্ভাবের প্রাথমিক মুহূর্তে যে প্রগতিবাদী দৃষ্টি চার্বাকী মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিলো, উত্তর যুগের চার্বাকী চিন্তাতেও সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব লক্ষণীয়।
এরই ধারাবাহিকতায় ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন বিভাগে প্রমাণের সংখ্যা এবং লক্ষণ সম্বন্ধীয়

নিয়ম প্রসঙ্গে যে সূক্ষ্ম মতভেদ, চার্বাকী সমালোচনা তার মূলে আঘাত করেছে। এ-ব্যাপারে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহে'র গ্রন্থকার জয়রাশি ভট্টকেও কেউ কেউ হয়তো নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টের অনুসরণ করে চার্বাকগোষ্ঠির অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করতে চেয়েছেন। শ্রদ্ধেয় লতিকা চট্টোপাধ্যায়ও এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন কিনা তা অস্পষ্ট। যদিও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বজ্জনদের মধ্যেই জয়রাশি ভট্টকে চার্বাকগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্তিকরণে তীব্র মতভেদ রয়েছে। সে যাক্, তবে জয়রাশির সঙ্গে 'ন্যায়মঞ্জরী'তে ধূর্ত সংজ্ঞায় অভিহিত চার্বাকগোষ্ঠির সম্পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে বলেই মনে হয়।

এ-প্রেক্ষিতে লতিকা চট্টোপাধ্যায় বলেন–
'সংখ্যা ও লক্ষণের নিয়মে প্রমাণের শ্রেণীবিভাগে ব্রতী দার্শনিকদের বিরুদ্ধে চার্বাকদের যে ধরনের প্রতিবাদ 'ন্যায়মঞ্জরী'তে দেখা যায় তারই অনুরূপ প্রতিবাদে সোচ্চার চার্বাক জয়রাশি বৈয়াকরণকৃত শব্দের লক্ষণগত নিয়মের বিপক্ষে, তাঁর 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' গ্রন্থে। বৈয়াকরণেরা প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের দুর্লঙ্ঘ্য বন্ধনে শব্দকে আবদ্ধ রেখেছেন। ব্যাকরণের সূত্রগুলি তাঁদের মতে লক্ষণের পর্যায়ভুক্ত। এবং এই লক্ষণান্বিত শব্দসমূহকে তাঁরা 'সাধু' আখ্যায় ভূষিত করেন। এইভাবে সাধুত্বের ছাড়পত্র লাভে যে শব্দগুলি সক্ষম, একমাত্র সেগুলিই তাঁদের নির্দেশে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত।'
'চার্বাক জয়রাশির সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণা প্রসারিত হয়েছে বৈয়াকরণ নির্দেশিত বিশেষ লক্ষণযুক্ত সাধু শব্দের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ব্যাপারে। বৈয়াকরণদের মতে বিশেষ লক্ষণ দ্বারা যেগুলি নির্দেশিত হয় না, সেগুলি অসাধু শব্দ এবং এই অসাধু শব্দের প্রয়োগকে তাঁরা অনুমোদন করেন না। জয়রাশি অসাধু শব্দের প্রয়োগের ফলে সম্ভাব্য কয়েকটি দোষের উল্লেখ করে যুক্তির মাধ্যমে সব কটি দোষেরই অবাস্তবতা প্রতিপাদন করেছেন। আর উপসংহারে সাধু শব্দের সঙ্গে অসাধু শব্দেরও সমান সার্থকতা সম্বন্ধে নিজস্ব মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন।'- (চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৭০)

কিন্তু এই 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহে' জয়রাশি অবলম্বিত প্রতিপক্ষ খণ্ডন পদ্ধতি কিরূপ? এ সম্বন্ধে একান্ত আগ্রহী পাঠকের ধারণা লাভের ব্যাপারে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' গ্রন্থে বর্ণিত প্রত্যক্ষ প্রমাণসম্বন্ধীয় প্রারম্ভিক আলোচনার কিছুটা আলোকপাত করতে পারে। এ-বিষয়ে লতিকা চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'চার্বাক দর্শন' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৭০-৭২) 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহে'র প্রতিপক্ষ খণ্ডন পদ্ধতি সম্পর্কেও কিছুটা আলোকপাত করেছেন। আমরা এ-ক্ষেত্রে সংক্ষেপে তাঁর আলোচনা-রীতিই অনুসরণ করতে পারি।

আমরা জানি যে, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ন্যায়দর্শনেই প্রমাণ নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা রয়েছে বলে ন্যায়দর্শন নামান্তরে প্রমাণশাস্ত্র হিসেবেই প্রসিদ্ধ। ন্যায়মতে প্রত্যক্ষই প্রমাণজ্যেষ্ঠ– অর্থাৎ প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষই হলো প্রথম বা সবচেয়ে সেরা বা সবচেয়ে মৌলিক। চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের সঙ্গে সরাসরি যোগের ফলে

আমাদের যে জ্ঞান হয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণকে তার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়। মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বর্ণনা করে বলেছেন–
'ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপনং জ্ঞানম্ অব্যোপদেশ্য অব্যভিচারী ব্যবসায়ত্মকম্ প্রত্যক্ষম্'। (ন্যায়সূত্র: ১/১/৪)।
অর্থাৎ : ইন্দ্রিয় এবং অর্থের সন্নিকর্ষের ফলে যে অব্যাপদেশ্য (অশাব্দ), অব্যভিচারী (অভ্রান্ত) এবং ব্যবসায়াত্মক (নিশ্চয়াত্মক) জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই প্রত্যক্ষ।

সহজ কথায়, প্রত্যক্ষ বলতে সেই ধরনের জ্ঞান বোঝায় যা ইন্দ্রিয় এবং অর্থ বা জ্ঞেয় বস্তুর সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন হয়। তবু ইন্দ্রিয় এবং অর্থ পরস্পর নিকটবর্তী হলেই যে প্রকৃত প্রত্যক্ষজ জ্ঞান সম্ভব হয় না তা বোঝাবার জন্য সূত্রকার 'অব্যপদেশ্য' বা অশাব্দ, 'অব্যভিচারী' বা অভ্রান্ত এবং 'ব্যবসায়াত্মক' বা নিশ্চয়াত্মক, এই কয়েকটি বিশেষণে এই জ্ঞানকে চিহ্নিত করেছেন।

প্রথম বিশেষণ 'অব্যাপদেশ্য' দ্বারা সংজ্ঞা, পরিচয় ইত্যাদির মাধ্যমে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত বস্তুকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিধি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। সম্মুখস্থ কোন ব্যক্তির আকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে যে জ্ঞান আমাদের মনের গোচরীভূত হয় তাকে প্রত্যক্ষ বলা চলে। লোকটি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ববর্তী জ্ঞানের সহযোগিতায় নাম ধাম ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত তার যে সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা তখন লাভ করি তা প্রত্যক্ষ-বহির্ভূত।
সূত্রে ব্যবহৃত 'অব্যভিচারী' পদ মিথ্যা জ্ঞানকে প্রত্যক্ষের পরিসর থেকে অপসারিত করেছে। সূর্যকিরণে (মরীচিকায়) জলের বা রজ্জুতে সর্পের বোধ প্রকৃত প্রত্যক্ষ পদবাচ্য নয়।
আর 'ব্যবসায়াত্মক' শব্দের দ্বারা প্রকৃত বিচার বা অবধারণাকে জ্ঞানের একটি প্রধান অঙ্গ হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যার অভাবে কেবল মাত্র অর্থের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের ফলে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নয়। চক্ষুর সন্নিকটে অসংখ্য বস্তু উপস্থাপিত হলেই যে তাদের সবগুলির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় তা বলা চলে না। বস্তুগুলির মধ্যে বিশেষভাবে যেটি অবধারণায় আসে সেটিই প্রত্যক্ষপদবাচ্য। সেটি যদি ফুল হয় তাহলে জ্ঞাতা ব্যক্তির ধারণা জন্মে 'এটি একটি ফুল'। 'ব্যবসায়' নামে অভিহিত এই বিশেষ ধারণা ন্যায়ের অভিমতে প্রকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অপরিহার্য সোপান।

'প্রত্যক্ষলক্ষণের বিচার প্রসঙ্গে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' প্রথমেই ন্যায়সূত্রবর্ণিত এই লক্ষণকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে এর সর্বাত্মক ত্রুটি প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হয়েছে। ন্যায়সূত্র-বর্ণিত 'অব্যভিচারী' পদ গ্রন্থমতে আরও বিস্তারের অপেক্ষা রাখে। অব্যভিচারিতা নানাভাবে হতে পারে– যে কারক বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই জ্ঞানের উৎপাদন তার অদুষ্টতা, জ্ঞানের পথে বাধার অস্তিত্বের অভাব অথবা প্রবৃত্তিসামর্থ্য। প্রথমটিকে অব্যভিচারিতার কারণ হিসাবে নির্দেশ করা সম্ভব নয়। কারণ চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের কুশলতার বিচার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয় না, যে জন্য প্রত্যক্ষ এই বিচারের মাধ্যম হতে পারে না। এ ব্যাপারে অনুমানেরও

অসার্থকতা একই সঙ্গে প্রতিপন্ন হয়, কারণ অনুমানের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষজ্ঞানেরই ভিত্তিতে। যে হেতু বা লিঙ্গ অনুমানের অপরিহার্য অঙ্গ, সেই লিঙ্গ এখানে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উদ্ভূত জ্ঞান। ইন্দ্রিয়োত্থ জ্ঞানেরই সহায়তায় ইন্দ্রিয়ের অদুষ্টতা বিচার করে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞানের অব্যভিচারিতা প্রমাণের চেষ্টা করলে ইতরেতরাশ্রয়দোষের প্রসঙ্গ এসে পড়ে।'
'বাধারহিতত্ব এবং প্রবৃত্তিসামর্থ্য– অব্যভিচারী জ্ঞান উৎপাদনে এ দুটির মধ্যেও কোনটি যে প্রকৃত কারণ হতে পারে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়,– সম্ভাব্য নানা রকম দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুটিকে বিচার করার পর এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার তাঁর মন্তব্য করেন। মোট কথা, বিশেষ কোন বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞানে প্রত্যক্ষজ জ্ঞান প্রকৃতই বস্তুটির পরিচয় বহন করে কিনা স্থির করার প্রস্তুতি হিসাবে অব্যভিচারী জ্ঞানের বিভিন্ন কারণ আগে নির্ণয় করা প্রয়োজন, যেগুলির অনুপস্থিতিতে যথার্থ জ্ঞানের পর্যায়ে কোন জ্ঞান উন্নীত হতে পারে না। কিন্তু এই কারণগুলি নির্ণয়যোগ্য না হওয়ায় 'অব্যভিচারী' বিশেষণও কোন জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।'
'তত্ত্বোপপ্লবসিংহে'র মতে প্রত্যক্ষলক্ষণে 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ' পদকে অন্তর্ভুক্ত করে নৈয়ায়িকেরা 'অব্যভিচারী' পদকে আরও অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছেন। বাহ্য বস্তুর জ্ঞানে অর্থ বা জ্ঞেয় বস্তু যদি ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী হয় তাহলে আপনা থেকে জ্ঞানে ব্যভিচারিতা শঙ্কার নিবৃত্তি হয়। নৈয়ায়িকেরা এ ক্ষেত্রে স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে পারেন যে ইন্দ্রিয় অর্থ বা জ্ঞেয় বস্তুর সন্নিকৃষ্ট হলেও বহু ক্ষেত্রে প্রকৃত বস্তুজ্ঞানের পরিবর্তে ভ্রমের উৎপাদন হয়। যেমন সূর্যরশ্মিতে জলের প্রতীতি। এ যুক্তির বিপরীত পক্ষে গ্রন্থকারের যুক্তি এই যে উল্লিখিত নয়নেন্দ্রিয়ের যোগ হয় নিকটবর্তী সূর্যরশ্মির সঙ্গে; যে উদক বা জলের প্রতীতি এ ক্ষেত্রে হয়, সেই উদক নয়নের সন্নিকটে একেবারেই আসে না। কাজেই ন্যায়সূত্রবর্তী 'অব্যভিচারী' পদ এখানে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ব্যভিচারী জ্ঞান বা ভ্রম সম্বন্ধে সুদীর্ঘ এক আলোচনার অবতারণা করেছেন। সূক্ষ্ম বিচারে কোন জ্ঞানই যে 'অব্যভিচারী' সংজ্ঞা লাভ করতে পারে না নানাভাবে তা দেখানো হয়েছে।'- (চার্বাক দর্শন, লতিকা চট্টোপাধ্যায়)

অতএব, 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' গ্রন্থের অভিমতে ন্যায়সূত্রে অন্তর্ভুক্ত 'অব্যভিচারী' পদটি সব দিক দিয়েই অসার্থক–

'তস্মাৎ স্থিতমেতদ্ অব্যভিচারিপদমনর্থকম্'। (তত্ত্বোপপ্লবসিংহ, পৃষ্ঠা-১৭)
অর্থাৎ : তাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, 'অব্যভিচারী' পদের ব্যবহার অর্থহীন। (মুক্ততর্জমা)

ন্যায়সূত্রে প্রত্যক্ষ লক্ষণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত অপর তিনটি পদের অসার্থকতাও 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' গ্রন্থে সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে অনুরূপভাবেই অসার্থক প্রতিপন্ন করার প্রয়াস দেখা যায়। পরিশেষে গ্রন্থকার প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় বা বাহ্য অর্থের যে কোন অবদানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এ প্রসঙ্গে ন্যায়সূত্রের অকার্যকারিতার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য শাখাতেও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে নিজস্ব লক্ষণ আছে। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহে'র সমালোচনা থেকে এগুলিও বাদ যায়নি। দর্শনের সূক্ষ্ম তর্ককে উপজীব্য করায় তাতে বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য এবং হেতুবাদের পূর্ণ প্রকাশ পরিলক্ষিত হলেও এই সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরস। তাই এ প্রসঙ্গে আলোচনা দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কেননা, কারো কারো মতে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' বইটি আদৌ চার্বাকী মতবাদী নয় বরং সর্বপ্রমাণবিরোধী সংশয়বাদের নিদর্শক গ্রন্থ বলে মন্তব্য করা হয়েছে। কারণ, বইটির প্রধানতম প্রতিপাদ্য হলো, প্রমাণমাত্রেরই খণ্ডন। ভারতীয় প্রতিটা দর্শনেই নিজ নিজ সিদ্ধান্তগুলিকে প্রমাণের নিমিত্তে নিজস্ব যুক্তির অনুকূলে ন্যায় বা তর্কশাস্ত্রীয় চর্চাটাকে খুবই গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এবং এসব যুক্তিশাস্ত্রে প্রমাণের স্বপক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রপঞ্চের আমদানি ঘটালেও প্রমাণ হিসেবে প্রত্যক্ষকে অতীব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তার নমুনাস্বরূপ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে প্রমাণশাস্ত্র হিসেবে ন্যায়দর্শনের উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। ন্যায়মতে প্রত্যক্ষই প্রমাণজ্যেষ্ঠ– অর্থাৎ প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষই হলো প্রথম বা সবচেয়ে সেরা বা সবচেয়ে মৌলিক। অন্যদিকে দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই একবাক্যে দাবি করেন যে, লোকায়ত বা চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। অথচ জয়রাশি ভট্ট প্রথমেই দেখাতে চেয়েছেন যে প্রত্যক্ষ বলে আসলে কোনো প্রমাণই হতে পারে না। অর্থাৎ এক তূণে তিনি সকল তত্ত্ব বা দর্শনকেই উড়িয়ে দিচ্ছেন। উল্লেখ্য, বইটির নাম 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' এর অর্থ হচ্ছে সোজা বাংলায়– সিংহের মতো দর্পে তত্ত্বমাত্রকে– অর্থাৎ সবরকম দার্শনিক মতকে– উপপ্লব বা উৎখাত করে দেবার দাবি।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চার্বাকেরা প্রত্যক্ষ-বাদী, কিন্তু সর্বপ্রমাণ-বিরোধী নয়। সর্বপ্রমাণ-বিরোধী হিসেবে যাঁরা ভারতীয় দর্শনে প্রসিদ্ধ তাঁরা আসলে চরম ভাববাদী, মোটেও বস্তুবাদী নন। এই চরম ভাববাদী দর্শনগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ দুটো হলো বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের (১৭৫ খ্রিস্টাব্দ) শূন্যবাদ এবং অদ্বৈত-বেদান্তী দার্শনিক শঙ্করাচার্যের (৭৮৮-৮২০ খ্রিস্টাব্দ) মায়াবাদ। এদিক থেকে দেখলে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-এর জয়রাশির অবস্থান আসলে বস্তুবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণযুক্ত অদ্বৈত-বেদান্ত ও বৌদ্ধ-শূন্যবাদের সঙ্গে একই পঙক্তিতে থাকার কথা। তাই জয়রাশি ভট্টের উদ্দেশ্য নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে যে ব্যাপক অস্পষ্টতা রয়েছে তা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' বইটি সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি প্রয়োজন বিবেচনায় আবারো উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলছেন–

'মনে রাখা দরকার, বইটির অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু থেকে সম্পাদকরা এটিকে প্রসিদ্ধ চার্বাক বা লোকায়ত মতের পরিচায়ক বলে দাবি করেননি। করা সম্ভবও নয়। শুরুতেই গ্রন্থকার বলছেন, সাধারণ লোকের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে যে মাটি, জল, আগুন, বাতাস– এগুলিই মূল সত্য। কিন্তু দার্শনিক বিচারের ধোপে তাও টেকে না! তার মানে প্রসিদ্ধ চার্বাক মত বর্জন থেকেই বই-এর শুরু। গ্রন্থশেষে জয়রাশি আস্ফালন করে বলেছেন, স্বয়ং দেবগুরু বা

বৃহস্পতির মাথাতেও যা আসেনি তা এই পাষণ্ডদর্পচ্ছেদনের বইতে ব্যাখ্যা করা হলো। বৃহস্পতি-মতের কোনো প্রকৃত সমর্থকের পক্ষে এমন আস্ফালন সহজবোধ্য নয়, কেননা গুরুমারা বিদ্যের স্থান আর যেখানেই থাকুক না কেন, অন্তত ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে থাকতে পারে না। বরং, প্রতিটি দার্শনিক মতের প্রকৃত প্রবক্তারা পরের যুগে কোনো নতুন কথা বলার সময়ও যেন-তেন-প্রকারেণ কথাটা সম্প্রদায়-প্রবর্তকের প্রকৃত অভিপ্রায় বলেই প্রচার করতে চান। পাষণ্ডদর্পচ্ছেদনের ব্যাপারটাও উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কেননা ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে প্রচলিত রকমারি গালিগালাজের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের পাষণ্ড আখ্যা দিয়ে সন্তোষ লাভ করলেও, ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ উভয়ের পক্ষেই চার্বাককে সমস্বরে পাষণ্ডশিরোমণি হিসাবেই দেখবার কথা।
তাহলে বইটিতে চার্বাক-প্রবণতার পরিচয় শুরুতেও নেই, শেষেও নেই। আরো বড় কথা হলো, বইটির প্রধানতম প্রতিপাদ্য-বিষয়ের মধ্যেও নয়। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' অবশ্যই সহজপাঠ্য বই নয়; যুক্তিতর্ক-কণ্টকিত রীতিমতো কঠিন বই। তবুও সাধ্যমতো সহজ করে এবং সংক্ষেপে তার সারমর্ম বলে রাখা দরকার।
জয়রাশি কী করে দেখাতে চান যে কোনো রকম দার্শনিক মতই স্বীকারযোগ্য নয়? সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য এই : যে-কোনো দার্শনিক মত বা তত্ত্ব হোক না কেন, স্বীকারযোগ্য হতে গেলে তার পক্ষে তো প্রমাণ থাকা দরকার। অথচ বিচার করলে বোঝা যায় যে, কোনো রকম তথাকথিত প্রমাণেরই প্রামাণ্য– বা প্রমাণ করার যোগ্যতা থাকতে পারে না। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান, প্রভৃতির প্রমাণ হিসেবে প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু জয়রাশি দেখাতে চান, সে-প্রসিদ্ধি আসলে অলীক, কেননা নামে প্রমাণ হলেও এগুলি সবই আসলে অসার; কোনোটিকেই প্রমাণ বলা যায় না। আর প্রমাণ বলেই যদি কিছু না থাকে তাহলে কোনো রকম দার্শনিক মত বা তত্ত্ব স্বীকার করার কারণও থাকতে পারে না। অতএব 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'– সিংহদর্পে সর্বতত্ত্বের উপপ্লব বা উৎখাত।' (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-২৯)।

অতএব 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' গ্রন্থটিকে চার্বাক মতের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হবে কিনা তা প্রয়োজনীয় পর্যালোচনার দাবি রাখে অবশ্যই। যেহেতু চার্বাকমতের নিজস্ব রচনার প্রকৃত অভাব রয়েছে তাই কারো কারো মতে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' আলোচনা করলে চার্বাক দর্শনের ভিন্ন এক ধরনের পরিচয় আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। কিংবা চার্বাকদর্শনের রূপরেখা গঠনে গ্রন্থটি কোন কোন ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। কেননা 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহে' অন্তর্ভুক্ত কোন কোন ক্ষেত্রে চার্বাকী ধারণার সাদৃশ্য থাকতে পারে। চার্বাকেতর বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনায় প্রত্যক্ষনির্ভর বস্তুবাদী এক দর্শন হিসেবে চার্বাকের যে পরিচিতি, তা থেকে স্বভাবতই ধারণা হতে পারে যে চার্বাক সিদ্ধান্তে যে ইতিবাচক বক্তব্য আছে, যার কেন্দ্র হলো স্থূল বস্তুবাদ এবং এই বক্তব্যের বিপরীত সব কিছুই এই দর্শনের সমালোচনার বিষয়ীভূত। অনুমান প্রমাণের বিরোধিতায় চার্বাকপক্ষের তৎপরতার মূল এই ব্যাপারে, এবং একই কারণে চার্বাকেরা বাদ দিতে চান আত্মা, পরলোক ইত্যাদিকে–

প্রত্যক্ষের মাপকাঠি দিয়ে যেগুলির বিচার চলে না। কিন্তু 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' গ্রন্থে যখন দেখা যায় যে চার্বাকদের প্রত্যক্ষকেও প্রমাণের আসর থেকে বহিষ্কৃত করতে উন্মুখ এবং প্রত্যক্ষোপার্জিত বস্তুজগতের বিষয়গুলিকেও প্রমেয়ের মর্যাদা দিতে আপত্তি তখন গ্রন্থ-রচয়িতার নির্দিষ্ট বক্তব্য সম্বন্ধে সংশয় জাগে।

ইতঃপূর্বে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিতণ্ডা প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছিলো। এই বিতণ্ডারই পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' গ্রন্থে। কেননা, বৈতণ্ডিকের কাজ শুধুই অপরপক্ষের সমালোচনা। এই সমালোচনাতেই বৈতণ্ডিক তাঁর সমগ্র প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করেন এবং পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অপরপক্ষের প্রতিপক্ষ যে স্বপক্ষ, সেই স্বপক্ষের মতামত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। সোজা কথায়, বিতণ্ডা হলো একপ্রকার যুক্তিহীন তর্ক, যেখানে কোন পক্ষই নিজের মত প্রতিষ্ঠা না করে কেবল অপরের মত খণ্ডন চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'বাদী জগতের কোন তত্ত্বই মানেন না, কিন্তু নিজস্ব কোন তত্ত্বের প্রতিষ্টাও তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। অপরের বিচারের ত্রুটি প্রদর্শন করাই যে জয়রাশির মুখ্য উদ্দেশ্য, আলোচ্য গ্রন্থের পরস্পরবিরোধী কয়েকটি সিদ্ধান্ত থেকেও তা পরিস্ফুট হয় বলে লতিকা চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য। যেমন–
'ন্যায়দর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে জাতি বা সামান্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃতি জানিয়ে (তত্ত্বোপপ্লবসিংহ, পৃপৃ:৪-৭) একই গ্রন্থে জয়রাশি ভট্ট বৌদ্ধদের বিচারে ত্রুটি প্রদর্শনকালে জাতির বিরুদ্ধে তাঁদের যুক্তি খণ্ডনে তৎপর হয়েছেন (ঐ, পৃপৃ:৪৬-৫১)। বৌদ্ধ ক্ষণিকসন্তানবাদীদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় গ্রন্থকারের প্রয়াস দেখে মনে হয় তিনি বুঝি আত্মবাদী দার্শনিকদেরই সগোত্র (ঐ, পৃ:৫৫)। কিন্তু পরক্ষণেই অধ্যাত্ম দর্শনে অনুসৃত অনুমান প্রমাণের সাহায্যে আত্মার ধারণাকে খণ্ডন করার প্রয়াস থেকে বোঝা যায় (ঐ, পৃপৃ: ৭৪-৮৩) যে ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া [তাঁর] লক্ষ্য নয়।'- (চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৭৪)

কারো কারো মতে এই 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'বাদীরা চার্বাক-সম্প্রদায়েরই ভিন্ন একটি গোষ্ঠি। সেক্ষেত্রে বলতে হবে, প্রত্যক্ষবাদী হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থে চার্বাক দর্শনের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে চার্বাকের এক বৃহৎ গোষ্ঠিই এই নেতিবাচক প্রবণতায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেনি এবং প্রত্যক্ষকে স্বীকৃতি দিয়ে সাধারণগ্রাহ্য এই প্রমাণের মাধ্যমে পাওয়া বস্তুজগৎকে তার বিষয়বস্তুর পরিসরে এনেছে। এই স্বাভাবিক ধারণারই প্রতিফলন দেখা যায় বস্তুবাদের সঙ্গে চার্বাকী মতবাদের একাত্মীকরণে। এ-প্রসঙ্গে লতিকা চট্টোপাধ্যায় মনে করেন–
'কিন্তু চার্বাকের এই বস্তুবাদী প্রকাশকে তার নেতিবাচক প্রবণতারই অঙ্গবিশেষ হিসাবে দেখাটা বোধ হয় অযৌক্তিক নয়। প্রকৃতপক্ষে চার্বাক মতকে বস্তুবাদের পরিবর্তে হেতুবাদের সঙ্গেই একাত্ম করা অধিকতর সমীচীন। এই হেতুবাদেরই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী প্রকাশের মধ্যে একটির আশ্রয় বস্তুজগৎ, প্রত্যক্ষের মাধ্যমে যার পরিচিতি। অপরটির প্রকাশ 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'তে রূপায়িত চার্বাকী ধারায়, বস্তুজগৎকে স্বীকৃতি দিতে না পারায় যা

বাস্তববাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত বৌদ্ধ এবং অদ্বৈত বেদান্তের সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছে।'-(চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৭৪)
এ-প্রেক্ষিতে জৈন দার্শনিক বিদ্যানন্দীর 'তত্ত্বার্থশ্লোকবার্তিক' গ্রন্থের বক্তব্যটি স্মর্তব্য–
'সর্বথা শূন্যবাদিনস্তত্ত্বোপপ্লববাদিনো ব্রহ্মবাদিনো বা জাগ্রদুপলব্ধার্থক্রিয়ায়ং কিং ন বাধকপ্রত্যয়ঃ'। (তত্ত্বার্থশ্লোকবার্তিক)
অর্থাৎ : শূন্যবাদী, তত্ত্বোপপ্লববাদী ও ব্রহ্মবাদী জাগ্রতোপলব্ধিজাত অর্থক্রিয়া বা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুজগতের সত্তাকে সত্য বলে স্বীকার করেন না। (মুক্ততর্জমা)

শ্রীহর্ষের 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' গ্রন্থেও এই তিনটি মতবাদ একই শ্রেণীর অন্তর্গত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, এ গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে চার্বাক প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে– 'চার্বাকেরা কোন প্রমাণকে স্বীকার করেন না'–
'সোহয়মপূর্বঃ প্রমাণাদিসত্তানভ্যুপগমাত্মা'। (খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্ : পৃষ্ঠা ২৬)।

হেতুবাদ প্রসঙ্গেও ইতঃপূর্বে ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনার চেষ্টা হয়েছে। অতএব, সে আলোচনা না বাড়িয়ে এটুকু বলা যায় যে, হেতুবাদের বিপরীতধর্মী দুটি অভিব্যক্তির মধ্যে একমাত্র প্রত্যক্ষ যেখানে প্রামাণ্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত, প্রচলিত পরিভাষায় 'চার্বাক' সংজ্ঞা সেই দর্শনেরই পরিচয় বহন করে। প্রচলিত প্রত্যক্ষবাদী চার্বাক মতে তত্ত্বের বর্তমানতা প্রত্যক্ষের মাধ্যমে লভ্য বস্তুজগতকে কেন্দ্র করে। এই বস্তুজগতের মূলগত উপাদানের সংখ্যা ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের মতে পাঁচ– ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী বা মাটি, অপ্ বা জল, তেজ বা আগুন, মরুৎ বা বাতাস এবং ব্যোম বা আকাশ। যেমন ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে–
'পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশমিতি ভূতানি'। (ন্যায়সূত্র-১/১/১৩)
অর্থাৎ : ক্ষিতি বা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চদ্রব্য ভূতবর্গ।

কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকেরা এই মূল তত্ত্বের সংখ্যা চারে সীমিত রাখতে চান। ব্যোম বা আকাশকে তারা গ্রাহ্য করেন না যেমন–
'পৃথিব্যপতেজো বায়ুরিতি চত্বারি তত্ত্বানি।
তৎ-সমুদায়ে শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়-সংজ্ঞা।' (বার্হস্পত্য-সূত্র)।
অর্থাৎ : পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু- এই চারটিই তত্ত্ব। এর সমন্বয়ে শরীর, ইন্দ্রিয়, চৈতন্য ইত্যাদি সৃষ্ট।
চার্বাকেতর দার্শনিকদের বিভিন্ন গ্রন্থে চার্বাক-মতের পরিচয়ে এই বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন অদ্বৈত-বেদান্তবাদী শঙ্করাচার্য তাঁর 'সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ' গ্রন্থে বলেছেন–
লোকায়তিকপক্ষে তু তত্ত্বং ভূতচতুষ্টয়ম্ ।
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরিত্যেব নাপরম্ ।। (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/১)।।
অর্থাৎ : লোকায়ত মতে চারটি ভূতকেই তত্ত্ব বলা হয়। উক্ত চারটি ভূত হলো যথাক্রমে পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ু। অপর কোন ভূত এই মতে স্বীকৃত নয়।

মাধবাচার্যের ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ গ্রন্থে চার্বাকমতে তত্ত্বের উল্লেখ এবং একই লোকায়তিক মতের উপস্থাপনায় এ-প্রসঙ্গে যে লোকগাথাটি উল্লেখ করেছেন, তা হলো–

তত্র পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি। (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : এই চার্বাকমতে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু– এই চারটি ভূতই চারটি তত্ত্ব।
.
অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি-বারি-অনল-অনিলাঃ ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যঃ চৈতন্যম্ উপজায়তে ।। (সর্বদর্শনসংগ্রহ)।।
অর্থাৎ : (লোকায়ত মতে) মাটি, জল, আগুন, বাতাস– শুধুমাত্র এই চার রকম ভূতবস্তুই বর্তমান। এই চার রকম ভূতবস্তু থেকেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়।

কৃষ্ণমিশ্রের ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’-এ এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

‘পৃথিব্যপ্ তেজোবায়বস্তত্ত্বানি’। (প্রবোধচন্দ্রোদয়)
অর্থাৎ : (লোকায়ত মতে), পৃথিবী, জল, আগুন ও বায়ু– এই চারটি তত্ত্ব।

জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সূরির ‘ষড়্দর্শনসমুচ্চয়’ গ্রন্থে লোকায়ত প্রসঙ্গে চতুর্ভূত প্রসঙ্গে এ-ধরনের উক্তিই দেখা যায়–

‘পৃথ্বী জলং তেজো বায়ুর্ভূত চতুষ্টয়ম্’...। (ষড়্দর্শনসমুচ্চয়)
অর্থাৎ : (লোকায়ত মতে), পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু– এই চারটি ভূত স্বীকৃত।

এভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে চার্বাক বা লোকায়তিক মতের বহু উল্লেখ করা যেতে পারে। বৌদ্ধদার্শনিক কমলশীলের ‘তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা’-তেও সূত্রের মাধ্যমে চতুর্ভূত সম্বন্ধে চার্বাকী ধারণার অভিব্যক্তি দেখা যায়–

‘পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরিতি চত্বারি তত্ত্বানি...’। (তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা-১৮৫৯)
অর্থাৎ : পৃথিবী বা মাটি, জল, তেজ বা আগুন ও বায়ু– এই চারটি তত্ত্ব।

চার্বাকেতর দর্শন-স্বীকৃত পঞ্চভূতের মধ্যে চার্বাক-মতে ব্যোম বা আকাশকে যে তত্ত্ব হিসেবে গ্রাহ্য করা হয় না তার একটাই কারণ, ব্যোম বা মহাশূন্যের জ্ঞান প্রত্যক্ষের মাধ্যমে হয় না। প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকদের কাছে প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই চারটি তত্ত্ব ছাড়া অন্য কিছু অনুমোদন লাভ করেনি। এই চার তত্ত্বের সমবায়ে দেহ, ইন্দ্রিয় এবং জাগতিক সব পদার্থের সৃষ্টি। বৌদ্ধদার্শনিক কমলশীল তাই এ-প্রসঙ্গে লোকায়তসূত্র উদ্ধৃত করে আরো বলেন–

‘তৎসমুদায়ে বিষয়েন্দ্রিয়সংজ্ঞা’। (তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা-১৮৬০)
অর্থাৎ : তার (চতুর্ভূতের) সমন্বয়ে শরীর, ইন্দ্রিয়, চৈতন্য ইত্যাদি সৃষ্ট।

বিভিন্ন প্রাণিদেহের উপাদানরূপেও মৌল এই চারটি তত্ত্বের নির্দেশ চার্বাক দর্শনে রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বস্তুজগতের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে অনুমোদিত চার্বাকী তত্ত্বের সংখ্যা ভারতের প্রচলিত ধারণার ব্যতিক্রম হলেও, চার্বাক-দর্শনের ইতিহাসে এটা কাকতালীয় কিনা

কে জানে, প্রাচীন গ্রিক চিন্তায়ও কিন্তু এর এক অনুলিপি দেখা যায়। যেমন–
(Plato) প্লেটো'র মতে– 'there are four elements out of which the body is composed, earth and fire and water and air...'।
আর অ্যারিস্টটল বলেন– 'Since the bodies of all animals, and likewise of all plants, are composed from the four elements, in some of them earth predominates, as in plants, in others, water, as in aquatic animals, and in others air of fire, as in pedestrious and winged animals.' -('plato Dictionary, p.74' : সূত্র: লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৭৬)

অতএব, এই আলোচনা থেকে চার্বাক-মত প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে, চার্বাকেরা অবশ্যই প্রত্যক্ষ-প্রমানবাদী। কিন্তু তাঁরা প্রত্যক্ষৈক-প্রমাণবাদী কিনা অর্থাৎ চার্বাকেরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে গণ্য করেন কিনা এই সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আমাদেরকে প্রমাণবাদের অন্যতম অনুমান-প্রমাণের আলোচনায় প্রবিষ্ট হতে হবে।
...

।। খ।। প্রত্যক্ষ-অনুগামী অনুমান।

প্রত্যক্ষের পরেই প্রাধান্যের বিচারে ভারতীয় দর্শনে যে প্রমাণের অগ্রগামিতা সাধারণভাবে স্বীকার্য সেই অনুমানকেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তীব্রভাবে চার্বাকী আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর অনুমান প্রমাণ হিসেবে যাঁদের দ্বারা পূর্ণভাবে অনুমোদিত, প্রতি-আক্রমণে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরাও স্ব-স্ব মতবাদের ভিত্তিমূল দৃঢ় ও নিষ্কণ্টক করার মরিয়া প্রচেষ্টায় পশ্চাৎপদ হননি। অনুমান-প্রমাণকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দার্শনিকদের এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে প্রবেশের আগে দর্শনের পরিভাষায় অনুমানের লক্ষণ সম্বন্ধে কিছুটা প্রাথমিক পরিচয় সেরে নেয়া দরকার।

মহর্ষি গৌতমের ন্যায়সূত্রে প্রত্যক্ষলক্ষণের বর্ণনার পর অনুমানকে প্রত্যক্ষ-আশ্রিত বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে–

‘অথ তৎ পূর্বকম্ অনুমানম্’। (ন্যায়সূত্র-১/১/৫)।
অর্থাৎ : প্রত্যক্ষপূর্বক অনুমিতিই অনুমান।

অনুমান প্রত্যক্ষের মতো স্বনির্ভর প্রমাণ নয়। ‘অনু’ শব্দের অর্থ ‘পশ্চাৎ’ এবং ‘মান’ অর্থ জ্ঞান। তার মানে, প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের পর প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সংগৃহীত উপকরণগুলির সাহায্যে নতুন জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয় এই অনুমান প্রমাণ।
ন্যায়বর্ণিত অনুমানের গঠন বোঝাতে সবচেয়ে প্রচলিত দৃষ্টান্ত হলো–

‘পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ– যত্র যত্র ধূমোহস্তি তত্র তত্র অগ্নিঃ, যথা মহানসাদৌ।
অর্থাৎ : পর্বতে বহ্নি আছে যেহেতু পর্বতে আমরা ধোঁয়া প্রত্যক্ষ করছি। কারণ যেখানে যেখানে ধোঁয়া থাকে সেখানে আগুনও থাকে। যেমন রান্নাঘরের চুল্লি।

তার মানে, পর্বতে ধূম বা ধোঁয়ার অস্তিত্ব থেকে বহ্নি বা আগুনের অস্তিত্ব জানা গেলো। আগুনের এই অস্তিত্ব জানলাম অনুমান করে। অনুমানের ভিত্তি এখানে ধোঁয়া এবং আগুনের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধের অভিব্যক্তি ‘যেখানে ধোঁয়া থাকে সেখানে আগুনও থাকে’ এই ভূয়োদর্শন-জনিত ধারণা। এ ধারণার উৎস আমাদের পুরাতন প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা, যথা– রান্নাঘর এবং অন্যান্য স্থানে ধোঁয়াকে সব সময়ে আগুনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে দেখা গেছে।
এই অনুমানে তিনটি পদ আছে– ধূম, অগ্নি, পর্বত। ভারতীয় ন্যায়ের পরিভাষায় এখানে–
‘ধূম’ হলো ‘হেতু’ বা ‘লিঙ্গ’ বা ‘সাধন’
‘অগ্নি’ হলো ‘সাধ্য’
‘পর্বত হলো ‘পক্ষ’।

ধোঁয়া দেখে আগুনের অস্তিত্ব আমরা অনুমান করি; কাজেই ধোঁয়া এখানে আমাদের অনুমানলব্ধ জ্ঞানের ‘হেতু’, ‘সাধন’ বা ‘লিঙ্গ’। হেতুর সাহায্য নিয়ে যা অনুমান করা হয়– এ

ক্ষেত্রে আগুন– ন্যায়ের পরিভাষায় তার নাম 'সাধ্য'। যে স্থানে বা অধিকরণে সাধ্যের অস্তিত্ব স্থির করা হয় তার নাম 'পক্ষ'। উপরের উদাহরণে পক্ষের ভূমিকা পর্বতের। কিন্তু ধূম (হেতু) থেকে পর্বতে (পক্ষতে) অগ্নির (সাধ্যের) অনুমান করা গেলো কী করে? কেননা হেতুর (ধূমের) সঙ্গে সাধ্যর (অগ্নির) নিয়ত-সম্বন্ধ জানা আছে এবং তার কোনো ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম জানা নেই : যেখানেই ধূম সেখানেই আগুন, যেমন রান্নার চুল্লিতে; এবং জলাশয় প্রভৃতি অগ্নিহীন স্থানে ধূম কখনো দেখা যায় না। 'সাধন' বা 'হেতু'র সঙ্গে 'সাধ্য'র এই চিরকালীন বা নিয়ত এবং অব্যভিচারী সম্বন্ধকে ন্যায়ের ভাষায় বলা হয় 'ব্যাপ্তি' বা অবিনাভাব। ব্যাপ্তি হচ্ছে ব্যাভিচররহিত সম্বন্ধ। অতএব 'ব্যাপ্তি'র ভিত্তিতেই অনুমান সম্ভব; 'ব্যাপ্তি' সম্ভব না-হলে অনুমানও অসম্ভব হবে।

অনুমানের ক্ষেত্রে 'ব্যাপ্তি'র গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ অনুমানের প্রকৃত ভিত্তি হিসেবে এই ব্যাপ্তির জ্ঞানকেই নির্দেশ করা যেতে পারে। 'যেখানে ধোঁয়া থাকে সেখানে আগুনও থাকে'– এই ব্যাপ্তিজ্ঞানকে ভিত্তি করে আমরা 'পক্ষ' বা পর্বতের সঙ্গে 'সাধ্য' বা আগুনের যোগ সাধন করি। ধোঁয়া এখানে 'সাধ্য' এবং 'পক্ষ' উভয়েরই সাধারণ ধর্ম বা 'লিঙ্গ'। 'হেতু' বা 'লিঙ্গ'র সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত থাকার জন্য 'সাধ্য'র অপর নাম 'লিঙ্গী'।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যে পৌঁছানোর যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া তাকে বলে অনুমান। অনুমানকে প্রত্যক্ষপূর্বক বলা হয়েছে, কারণ অনুমানগত জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রত্যক্ষের উপর আমাদের নানাভাবে নির্ভর করতে হয়। দৃষ্টি ও অনুভূত নিয়মকে ভিত্তি করে কোন অদৃষ্ট ও অননুভূত বস্তুর সত্তাকে আমরা অনুমান করি। উদাহরণে ধোঁয়াকে প্রত্যক্ষ করে তবেই ধোঁয়ার কারণ হিসেবে আগুনের সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়। নির্ভুল অনুমানের ভিত্তি যে লিঙ্গ এবং লিঙ্গীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের জ্ঞান, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভের মূলেও আছে প্রত্যক্ষের কার্যকরিতা। অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধোঁয়া এবং আগুন বা সাধন এবং সাধ্যের একত্র অবস্থানকে প্রত্যক্ষ করে তবেই এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের ধারণা সম্ভব। ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যাকার বাৎস্যায়ন তাঁর 'ন্যায়ভাষ্যে' তাই বলেন–

'তৎপূর্ব্বকমিত্যনেন লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদর্শনং লিঙ্গদর্শনঞ্চাভিসম্বধ্যতে। (ন্যায়ভাষ্য-১/১/৫)
অর্থাৎ : প্রত্যক্ষপূর্বক অনুমিতিতে লিঙ্গ এবং লিঙ্গীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিজ্ঞান নির্ণীত হয় পূর্বে কোন স্থানে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (স্মৃতির) মাধ্যমে। (মুক্ততর্জমা)

এ-প্রেক্ষিতে অনুমান প্রমাণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে ব্যাপ্তিজ্ঞানের সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানকে কেন্দ্র করেই প্রধানত চার্বাকেরা অনুমানের প্রামাণ্যে সংশয় প্রকাশ করেছেন। যে ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভিত্তিতেই রচিত অনুমান প্রমাণের বিশাল সৌধ, চার্বাকেতর গ্রন্থগুলির বিভিন্ন নজির থেকেই অনুমান হয়, চার্বাকপক্ষের বিচারে এই ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অভ্রান্ততার ছাড়পত্র পেতে নিশ্চয়ই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই প্রশ্নগুলির বিশ্লেষণমূলক সমাধানের

মধ্যেই হয়তো সেই সিদ্ধান্তটাও নিহিত আছে যে, চার্বাকমত কি প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী অর্থাৎ প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে গণ্য করেন, না কি তাঁরা প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী তথা প্রত্যক্ষ ছাড়াও বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমানকেও প্রমাণ বলে স্বীকার করেন? এর সুরাহার জন্য নিরূপায় আমাদেরকে চার্বাকেতর দর্শন-সাহিত্যেরই আশ্রয় নিতে হবে।

মাধবাচার্য'র সর্বদর্শনসংগ্রহ ও চার্বাকের অনুমান খণ্ডন।

মাধবাচার্য তাঁর 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থের চার্বাক-প্রস্থানে প্রমাণ সম্বন্ধে চার্বাকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন–

'প্রত্যক্ষৈক-প্রমাণবাদিতয়া অনুমানাদেরনঙ্গীকারেণ প্রামাণ্যাভাবাৎ'। (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিত্ব হেতু অর্থাৎ একমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলেন বলিয়া, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ অস্বীকার করেন বলিয়া দেহাতিরিক্ত আত্মাতে অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ নহে।

তার মানে, মাধবাচার্য বলতে চান যে, চার্বাকরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে মানেন; অতএব তাঁদের মতে অনুমানের প্রামাণ্য নেই, বা সোজা কথায়, অনুমান বলে কোন প্রমাণ হয় না।

এক্ষেত্রে মাধবাচার্য চার্বাকদের অনুমান-বর্জনের বর্ণনায় তাঁদেরকে অত্যন্ত কূটতর্কপ্রবণ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে প্রসঙ্গক্রমে মাধবাচার্যের লেখার কায়দাটা সম্পর্কে বলে রাখা দরকার যে, বিপক্ষ-বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি এমনভাবে বিষয়কে উপস্থাপন করেন যেন তিনি সাময়িকভাবে বিপক্ষ অবলম্বন করেছেন; অর্থাৎ তিনি নিজে যদি চার্বাক-মতানুগামী হতেন তাহলে কোন্ ধরনের বিচার করে ঐ বিপক্ষ সমর্থন করতেন যেন তারই পরিচয় দিয়েছেন। চার্বাকদের অনুমান-খণ্ডনের বর্ণনায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করে মাধবাচার্য বলছেন–

'তদেতদ্ মনোরাজ্য-বিজৃম্ভণম্ । ব্যাপ্তি-পক্ষধর্মতা-শালি হি লিঙ্গম্ গমকম্ অভ্যুপগতম্ অনুমান-প্রামাণ্য-বাদিভিঃ। ব্যাপ্তিশ্চ উভয়বিধোপাধি-বিধুরঃ সম্বন্ধঃ।' (সর্বদর্শনসংগ্রহ-চার্বাকপ্রস্থান)
অর্থাৎ :
আপনার সেই এই কথাটি তো মনোরাজ্যের বিজৃম্ভণ। অনুমান-প্রামাণ্যবাদীগণ কর্তৃক ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা-বিশিষ্ট হেতুই গমক বা জ্ঞাপক (জ্ঞান-জনক) বলে স্বীকৃত হয়েছে। শঙ্কিত ও নিশ্চিত উপাধিদ্বয়-রহিত সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধই ব্যাপ্তি।

এই জটিল দার্শনিক-ভাষা বোঝা সাধারণের কর্ম নয়। তবে এই কথাগুলোকে সহজবোধ্যভাবে বিশ্লেষণ করে বললে, মাধবাচার্য বলছেন, চার্বাক-মতে 'ব্যাপ্তি' প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব, অতএব অনুমানও সম্ভব নয়। 'ব্যাপ্তি' অসম্ভব কেন? কেননা, 'ব্যাপ্তি' স্থাপনের জন্য সমস্ত 'উপাধি'র সম্ভাবনা দূর করা দরকার। কিন্তু উপাধি মানে কী? মোটের উপর বলা যায় এক ধরনের শর্ত বা কন্ডিশন। যেমন– আগুন থাকলেই যদি ধোঁয়া থাকতো তাহলে তো তপ্ত লৌহপিণ্ডেও ধোঁয়া থাকার কথা! কিন্তু তপ্ত লৌহপিণ্ডে ধোঁয়া থাকে না। ভিজে কাঠ বা আর্দ্র জ্বালানিতে আগুন ধরালে ধোঁয়া থাকে, অতএব আর্দ্র জ্বালানি এই দৃষ্টান্তে হবে উপাধি বা শর্ত। মাধব আরো বলেছেন, চার্বাক মতে উপাধি আবার দু'রকম– 'নিশ্চিত' ও 'শংকিত'। ভিজে কাঠ হলে উপাধিটি নিশ্চিত, কেননা তা আমাদের জানা আছে। কিন্তু এমন উপাধি তো থাকতে পারে যার খবর আমাদের জানা নেই। তাকে বলবো, শংকিত উপাধি। এই দু'রকম সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে দূর হলে পরই 'হেতু' এবং 'সাধ্য'র নিয়ত-সহচার ও ব্যাভিচারের অভাব থেকে ব্যাপ্তি সুনিশ্চিত হতে পারে। কিন্তু নিশ্চিত ও শংকিত সমস্ত রকম উপাধির

সম্ভাবনা দূর করার কোনো উপায়ই সম্ভব নয়। অতএব, ব্যাপ্তিও সম্ভব নয়, এবং ব্যাপ্তি সম্ভব নয় বলেই অনুমানও অসম্ভব।

ব্যাপ্তি স্থাপন করা– বিশেষত নিশ্চিত ও শংকিত সমস্ত রকম উপাধির সম্ভাবনা দূর করে তা স্থাপনা করা– কেন একান্তই অসম্ভব, মাধবাচার্যের মতে চার্বাকরা নাকি তাই নিয়ে অনেক কূটতর্কের অবতারণা করে থাকেন। বর্তমানে আমাদের পক্ষে তার জটিলতায় প্রবেশ করার সুযোগ নেই। তবে সাধারণ কৌতুহল মেটানোর জন্যে সংক্ষিপ্ত ধারণাটা হলো এরকম– মাধবাচার্য বলেন, চার্বাক-মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান দুটি পদার্থের ব্যতিক্রমহীন, শর্তহীন বা উপাধিহীন, সুনিশ্চিত, সার্বিক, সার্বত্রিক সাহচর্যের জ্ঞান। 'ব্যাপ্তি' অর্থাৎ সাধ্যের সঙ্গে সাধনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের জ্ঞানকে যদি আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে লাভ করতে চাই তাহলে প্রয়োজন সাধ্যের সঙ্গে যুক্ত সাধনকে প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ করা। এভাবে প্রতিটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের অবধারণের পথে প্রধান অন্তরায় হলো দেশ, কাল এবং স্বভাবের ব্যবধান। এইরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ হতে পারে না। প্রত্যক্ষের দ্বারা বর্তমানকালীন কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকেই জানা যায়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় পদার্থকে প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যায় না। দুটি পদার্থের মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান ঐ দুটি পদার্থের ত্রৈকালিক ও সম্ভাব্য যাবতীয় দৃষ্টান্তকে প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমেই সম্ভব।
উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যদি ধূম ও আগুনের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় ধূম ও আগুনকে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। ত্রৈকালিক যাবতীয় ধূম এবং আগুনকে পর্যবেক্ষণ করা হলে তবেই ধূম এবং আগুনের মধ্যে শর্তহীন নিশ্চিত সার্বিক সাহচর্যের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু ত্রৈকালিক যাবতীয় ধূম ও আগুন প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। যদিও বা ধরে নেওয়া হয় যে অতীত ও বর্তমানের যাবতীয় ধূম ও আগুনকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি, তবুও ভবিষ্যতের ধূমকে আমরা কোনভাবেই প্রত্যক্ষ করতে পারি না। যাবতীয় ধূম ও আগুনের প্রত্যক্ষ ব্যতীত তাদের মধ্যে ব্যতিক্রমহীন সম্বন্ধ জানাও সম্ভব নয়। সুতরাং দুটি পদার্থের ব্যাপ্তি ও ব্যতিক্রমহীন, শর্তহীন, সুনিশ্চিত, সার্বিক ও সার্বত্রিক সাহচর্যের জ্ঞান নিছক কল্পনামাত্র।

মাধবের মতে, চার্বাকদের আরও বক্তব্য হলো, অনুমান প্রমাণের অনুগামীগণ বলতে পারেন যে একটি অনুমানের প্রয়োজনীয় ব্যাপ্তিজ্ঞান অপর একটি অনুমানের সাহায্যেই লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু একথাও গ্রহণযোগ্য নয়। একটি অনুমানের প্রয়োজনীয় ব্যাপ্তিজ্ঞান যদি অপর একটি অনুমানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে ঐ অপর অনুমানের ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করার জন্য আবার একটি অনুমানের সাহায্য প্রয়োজন। এইভাবে অনবস্থা-দোষ অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া যদি অনুমানের সাহায্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহায্যে অনুমানকে প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ দেখা দেয়। সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

প্রমাণের অপর একটি মাধ্যম শব্দপ্রমাণ বা আপ্তবাক্যও যে চার্বাক-মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ নয়, মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'র বিবরণ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে চার্বাকপক্ষ থেকে বৈশেষিক মতের উল্লেখ করা হয়েছে, যে মত অনুসারে আপ্তবাক্য অনুমানের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকারের ক্ষেত্রে আপ্তবাক্যের সাক্ষ্য সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। আপ্তবাক্যের সত্যতার ভিত্তি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির উক্তি। আপ্ত বা বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্যকে বলা হয় শব্দ-প্রমাণ। কিন্তু শব্দ পদজ্ঞান-নির্ভর। পদজ্ঞান বৃদ্ধ-ব্যবহার বা বয়স্ক ব্যক্তির শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে লব্ধ। পদজ্ঞান এককভাবে প্রত্যক্ষলব্ধ নয়। কয়েকটি ক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করে পদজ্ঞান আমরা অনুমান করি। পদজ্ঞান আংশিকভাবে অনুমান নির্ভর। আপ্তবাক্যস্বরূপ এ জাতীয় উক্তিতে নির্ভরতা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন বাক্যের সঙ্গে অর্থের সার্বকালীন সঙ্গতি সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় থাকে, অর্থাৎ, বাক্যের সঙ্গে অর্থের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের সূচক অপর একটি ব্যাপ্তিজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। অতীত অভিজ্ঞতায় যাকে আপ্ত বলে জেনেছি সে যে বর্তমানেও আপ্ত থাকবে তার পক্ষেই বা প্রমাণ কী? কাজেই আপ্তবাক্যে নির্ভরতার সঙ্গে ব্যাপ্তিজ্ঞানে বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকায় ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে আপ্তবাক্য গণ্য হতে পারে না। এ-প্রেক্ষিতে মন্তব্য করা বোধকরি অসঙ্গত হবে না যে, অনুমানের আশ্রয় ব্যাপ্তিজ্ঞান আপ্তবাক্যের মাধ্যমে নির্ণয়যোগ্য নয়– চার্বাকদের এই উক্তি প্রকৃতপক্ষে অনুমানকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হলেও প্রমাণ হিসেবে আপ্তবাক্যের দুর্বলতারই ইঙ্গিত সূচিত করে।
এছাড়া উপমান বা অন্য কোন প্রমাণের দ্বারাও ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। শব্দ, উপমান বা অন্য কোন প্রমাণ নিজেই সিদ্ধ নয়। পূর্বশ্রুত সাদৃশ্য-জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞাতপূর্ব পদার্থকে প্রত্যক্ষ করে যে জ্ঞান হয় তাকে বলে উপমিতি। সাদৃশ্যজ্ঞানও আংশিকভাবে অনুমান-নির্ভর। অনুমান অসিদ্ধ হওয়ায় শব্দ ও উপমান অসিদ্ধ হয়ে পড়ে। কোন অসিদ্ধ প্রমাণের সাহায্যে লব্ধ ব্যাপ্তিজ্ঞান সিদ্ধ হতে পারে না।

এখানেই শেষ নয়, চার্বাক-মতানুসারে বলা হয়, বৌদ্ধগণ যে কার্য-কারণ ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধের মাধ্যমে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ। কার্য-কারণ বা তাদাত্ম্য নিজেই নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। সুতরাং তাদের সাহায্যে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কখনোই সার্থক হতে পারে না। বস্তুর স্বভাবের দ্বারাও ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। দহনক্রিয়া ও নিম্নগতি যথাক্রমে অগ্নি ও জলের স্বভাবধর্ম। প্রতিটি বস্তুর স্বভাবধর্ম যেহেতু অপরিবর্তনীয় সেহেতু অনেকে স্বভাবধর্মের মাধ্যমেও ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কিন্তু চার্বাকগণ বস্তুর কোন অপরিবর্তনীয় স্থির স্বভাবধর্ম মানতে রাজী নন। তাঁদের বক্তব্য হলো, বস্তুর স্বভাবধর্ম ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা স্থির করা হয়। এই অভিজ্ঞতা কোন কিছুর ভবিষ্যতে ঘটার সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে মাত্র, কোন স্থির নিশ্চয়তা দিতে পারে না। অগ্নির দাহিকাশক্তি ভবিষ্যতে অগ্নির দহন করার সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তনে ভবিষ্যতে অগ্নির এই স্বভাব যে কখনও পরিবর্তিত হবে না– এমন তথ্য স্থির নিশ্চিতভাবে

প্রতিষ্ঠা করে না।

বস্তুতপক্ষে দুটির পদার্থের মধ্যে শর্তহীন, নিঃসন্দিগ্ধ ব্যাপ্তিজ্ঞান কোনভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যত বেশিসংখ্যক ক্ষেত্রই পরীক্ষা করা হোক না কেন দুটি পদার্থের সাহচর্য যে সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত তা কোনভাবেই নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান-সাপেক্ষ। ব্যাপ্তিজ্ঞান যেহেতু কোন প্রমাণের দ্বারাই লাভ করা সম্ভব নয় সেহেতু অনুমান অসিদ্ধ। অতএব চার্বাকদের সিদ্ধান্ত হলো প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ (প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্)।

অনুমান-প্রমাণে সমস্ত রকম শর্ত বা উপাধির সম্ভাবনা দূর করে ব্যাপ্তি স্থাপনা করা কেন একান্তই অসম্ভব, উপরের এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'কার মাধবাচার্যের মতে চার্বাকরা নাকি তাই নিয়ে অনেক কূটতর্কের অবতারণা করে থাকেন। কিন্তু এখানে যদি বিপ্রতীপ-দৃষ্টিতে এরকম প্রশ্ন উত্থাপিত হয়– স্বয়ং মাধবাচার্যই চার্বাকদের মুখে এই রকম কঠিন ও জটিল যুক্তিজাল বসিয়ে দিয়ে উল্টো চার্বাকদেরকেই তিনি জটিল ও কঠিন যুক্তিবিশারদ আখ্যায় অতিশয়োক্তি করেছেন, তাহলে বাস্তব ইতিহাসের দিক থেকে তা কতোটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? প্রশ্নটা অবান্তর কিনা তা বিশ্লেষণ করতে হলে প্রসঙ্গত এখানে বলা যেতে পারে, চার্বাকদের অনুমান-খণ্ডন হিসেবে মাধবাচার্য যে যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন তা অন্তত অনেকাংশে মাধবাচার্যের নিজের সম্প্রদায়-উদ্ভাবিত বলে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে–
'মাধবাচার্য ছিলেন অদ্বৈত-বেদান্ত মতে অতি-নিষ্ঠ অনুগামী। অদ্বৈত-বেদান্ত মতে শ্রুতি (বা বেদান্ত) ছাড়া আর কোনো প্রমাণই সম্ভব নয়। তাই স্বয়ং শঙ্করাচার্য তাঁর 'ব্রহ্ম-সূত্র'-ভাষ্যের ভূমিকাতেই ঘোষণা করেছেন যে সর্বপ্রকার প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহারের ভিত্তি বলতে আসলে অজ্ঞান বা অবিদ্যা। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে শ্রীহর্ষর কূটতর্কে পারদর্শিতা সুপ্রসিদ্ধ। এবং তিনি মাধবাচার্যের পূর্বেই অদ্বৈতমতকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য' নামে গ্রন্থে সব রকম প্রমাণ খণ্ডনের আয়োজন করেছেন। শ্রীহর্ষ কূটতর্কে পারদর্শী ছিলেন বলেই সর্বপ্রকার প্রমাণ বলতে তাঁর কাছে বিশেষত অনুমান-প্রমাণ। শ্রীহর্ষের বইতে তাই অনুমান খণ্ডনের বিশদ আয়োজন। তার জন্যে যথেষ্ট যুক্তিতর্কও। যুক্তিতর্কগুলি খুবই বিদগ্ধ, সহজবোধ্য নয়। তারই জের টেনে শ্রীহর্ষর ব্যাখ্যাকারেরা তর্কজাল আরো জটিল করেছেন। এইসব বই থেকেই মাধবাচার্য অনুমান-খণ্ডনের অতি-বিদগ্ধ বিচার চয়ন করে চার্বাকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন কিনা, যোগ্যতর বিদ্বানরা তা অনুসন্ধান করতে পারেন। সে অনুসন্ধান হয়তো নিষ্ফল হবে না।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৪৬)

আগেই বলা হয়েছে, মাধবাচার্যের লেখার কায়দাটা এরকম যে, বিপক্ষ-বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি এমনভাবে বিষয়কে উপস্থাপন করেন যেন তিনি সাময়িকভাবে বিপক্ষ অবলম্বন করেছেন; অর্থাৎ তিনি নিজে যদি চার্বাক-মতানুগামী হতেন তাহলে কোন্ ধরনের বিচার করে ঐ

বিপক্ষ সমর্থন করতেন যেন তারই পরিচয় দিয়েছেন। চার্বাকদের অনুমান-খণ্ডনের বর্ণনায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করা তাঁর জন্য যথেষ্ট সুবিধাজনকই হওয়ার কথা। কেননা, তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের প্রবক্তারাই অনুমান-খণ্ডনে বিশেষ পারদর্শিতার নজির দেখিয়েছেন। তা অনুসরণ করে অনুমান-খণ্ডনের অতি-বিদগ্ধ বর্ণনা রচনা করা সহজ ব্যাপার বলে দেবীপ্রসাদের অভিমত। যদিও মাধবাচার্য ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন কিনা– এই প্রশ্ন নিয়ে অবশ্যই বিবাদের অবকাশ থাকতে পারে বলেও দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আদৌ চার্বাকরা মাধব-বর্ণিত এরকম জটিল ও কঠিন যুক্তিবিশারদ ছিলেন এই অতিশয়োক্তি নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কেননা চার্বাকদের প্রামাণিক লোকগাথাগুলি থেকে বরং মনে হয়, তাঁরা কূট তার্কিকও ছিলেন না, আবার বাচস্পতি মিশ্রের আখ্যা অনুযায়ী একান্ত যুক্তিহীন অর্থে জানোয়ারেরও অধম ছিলেন না। তার বদলে হয়তো সাধারণ মানুষের বোধগম্য সাদামাটা যুক্তি দিয়ে সম্প্রদায়ান্তরের নানা মতামত নিয়ে হাসিতামাশা করেছেন। এই কিছু কিছু লোকগাথা মাধবাচার্যের ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ গ্রন্থেই লোকায়ত-মত হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, যেমন–

‘পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে’।। (চার্বাকষষ্ঠি-৫০)।।
অর্থাৎ : জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে নিহত পশুর যদি স্বর্গলাভ হয়, তবে যজ্ঞকারী যজমান কেন তার পিতাকে হত্যা করে না?

.
গচ্ছতামিহ জন্তূ’নাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্।
গেহস্থকৃতশ্রাদ্ধেন পথি তৃপ্তিরবারিতা।। (লোকায়তিকমত-সর্বদর্শনসংগ্রহ)।।
অর্থাৎ : যে পৃথিবী ছেড়ে গেছে তার পাথেয় (পিণ্ড) কল্পনা করা বৃথা, কেননা তাহলে ঘর ছেড়ে কেউ গ্রামান্তর গমন করলে ঘরে বসে তার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিলেই তো তার পাথেয়-ব্যবস্থা সম্পন্ন হতো।

যজ্ঞে নিহত পশু যদি সোজা স্বর্গে যায় তাহলে নিজের পিতাকে স্বর্গে পাঠানোর অমন সোজা পথ থেকে বঞ্চিত করা কেন? কিংবা, শ্রাদ্ধক্রিয়ায় পিণ্ড দান করলেই যদি মৃতের ভোজনরূপ ক্ষুধা নিবৃত্তি ঘটে তাহলে গ্রামান্তরগামীর পক্ষে তো আর পাথেয় হিসেবে চাল-চিঁড়ে বয়ে নিয়ে যাবার দরকার হতো না! হাসিতামাশা হলেও কথাগুলি যুক্তিহীন নয়, আবার শংকিত ও নিশ্চিত উপাধি বর্জন করে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করার অসম্ভাবনার মতো যুক্তিতর্কের কূটকচালও নয়। যেহেতু চার্বাকদের নিজস্ব মত ও বিতর্ক উপস্থাপন করে এমন গ্রন্থ প্রকৃতই অজ্ঞাত তাই স্থির সিদ্ধান্ত জানার উপায় নেই। কিন্তু দেবীপ্রসাদের মতে অন্তত আপাতদৃষ্টিতে মাধবাচার্যের চার্বাক-বর্ণনায় বেশ কিছুটা অসংগতি চোখে পড়ে। একদিকে মাধবাচার্য তাঁর ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ গ্রন্থে চার্বাকের নামে প্রচলিত একটি প্রামাণিক লোকগাথা উদ্ধৃত করেন–

যাবদ্ জীবেৎ সুখং জীবেদ্ নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ।। -(সর্বদর্শনসংগ্রহ : চার্বাক-দর্শনম্)।

অর্থাৎ : যতদিন বেঁচে আছ ততদিন সুখভোগ করে নাও। মরণ থেকে কারুরই রেহাই নেই। লাশ পুড়ে যাবার পর আবার কেমন করে ফিরে আসবে?
এবং এই লোকগাথাটি উদ্ধৃত করে তিনি এরপর মন্তব্য করেছেন–
-ইতি লোকগাথামনুরুন্ধানা নীতিকামশাস্ত্রানুসারেণার্থ-কামৌ এব পুরুষার্থৌ মন্যমানাঃ পারলৌকিকম্ অর্থম্ অপহ্নুবানাঃ চার্বাকমতম্ অনুবর্ত্তমানা এবানুভূয়ন্তে। অতএব তস্য চার্বাক-মতস্য লোকায়তম্ ইতি অন্বর্থম্ অপরং নামধেয়ম্ । -(সর্বদর্শনসংগ্রহ : চার্বাক-দর্শনম্)।
অর্থাৎ : এই লোকগাথার অনুবর্তন করে, নীতিশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র অনুসারে অর্থ ও কামকে পুরুষার্থ মনে করে, পারলৌকিক স্বর্গ, দেবতা, পাপ ও পুণ্য প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ পদার্থ অগ্রাহ্য করে চার্বাকমতের অনুবর্তন করতে দেখা যায়। এজন্যে চার্বাক মতের অপর একটি সার্থক নাম লোকায়ত। প্রায় সমস্ত লোকে এই মতটি পরিব্যাপ্ত বলে তা লোকায়ত মত নামে প্রসিদ্ধ।

তার মানে, একদিকে তিনি বলছেন, চার্বাকেরই নামান্তর হিসেবে লোকায়ত শব্দটি বেশ জুৎসই, কেননা হাজার হোক এই দর্শন ইতর জনগণেরই দর্শন। তাদেরই মনে ধরবার মতো কথা। অন্যদিকে বলছেন চার্বাকেরা কঠিন ও জটিল কূটতর্কের অবতারণা করে থাকেন। ‘কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায়, ইতর জনগণ তো শিক্ষাদীক্ষার সামান্য সুযোগ থেকেই বঞ্চিত। তাই এই ইতর জনগণই ‘নিশ্চিত’ ও ‘শংকিত’ উভয় প্রকার ‘উপাধি’ বর্জন করে ব্যাপ্তি নিশ্চয় নিয়ে অতি-বিশুদ্ধ আলোচনার অবতারণা করতে পারে– এ-হেন কথা কষ্টকল্পনার পক্ষেও দুঃসাধ্য। সংক্ষেপে চার্বাকেরা যে সত্যিই অমন ফলাও করে অনুমান মাত্ররই অসারতা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, এ-হেন কথা কল্পনা করার কোনো কারণ নেই।’ দেবীপ্রসাদের এ-যুক্তি উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই।
আমরা পরে দেখবো, চার্বাকেরা একেবারে কোনো রকম অনুমানই মানতেন না।– এমন কি এজাতীয় কথা খুব জোর করে বলায় অনেক বড় বাধা আছে। বরং অন্যান্য নজির থেকে মনে হয়, আত্মা পরলোক ইত্যাদি একান্ত অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান অগ্রাহ্য করলেও প্রত্যক্ষ-গোচর বিষয়ে সাধারণ বা লৌকিক অনুমান মানবার ব্যাপারে তাঁদের মতে কোনো বাধা ছিলো না।

হরিভদ্র সূরি'র ষড়্দর্শনসমুচ্চয় ও চার্বাকের অনুমান-খণ্ডন

চার্বাকদের অনুমান-খণ্ডন বিষয়ে আমরা ইতোমধ্যেই পর্যালোচনার চেষ্টা করেছি যে মাধবাচার্যের বর্ণনা সংশয়-সাপেক্ষ। অন্যান্য দার্শনিকদের রচনাতে তাই হয়তো চার্বাকের অনুমান-খণ্ডন সংক্রান্ত অমন বিস্তৃত, বিদগ্ধ ও যুক্তিকণ্টকিত আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং তার বদলে, চার্বাকদের অনুমান-খণ্ডনের উদ্দেশ্য এবং উপায়– উভয়েরই অনেকটা সাদামাটা ও সহজবোধ্য পরিচয় পাওয়া যায়।

অষ্টম শতকের প্রখ্যাত জৈন দার্শনিক হরিভদ্রসূরি তাঁর বিখ্যাত 'ষড়্দর্শনসমুচ্চয়' গ্রন্থে চার্বাক-বর্ণনায় লোকায়তিক-মত প্রসঙ্গে (ইতঃপূর্বে আংশিক-উদ্ধৃত হয়েছে) বলেন–

'লোকায়তা বদন্ত্যেবং নাস্তি দেবো ন নির্বৃতিঃ।
ধর্মাধর্মৌন বিদ্যেতে ন ফলং পুণ্যপাপয়োঃ।।
এতাবানেব লোকোহয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ।
ভদ্রে! বৃকপদং পশ্য যদ্বদন্তি বহুশ্রুতাঃ'।। (ষড়্দর্শনসমুচ্চয়-৮১)

অর্থাৎ : লোকায়তরা বলেন, দেবতা বলে কিছু নেই, মোক্ষ বলেও নয়। ধর্ম ও অধর্ম বলে কিছু হয় না, পুণ্য ও পাপের ফল বলেও নয়। যতটুকু ইন্দ্রিয়গোচর ততটুকুই ইহলোক (অতএব সত্য)। হে ভদ্রে! নেকড়ের পায়ের চিহ্ন দেখ এবং তা থেকে মহাপণ্ডিতেরাও কী বলেন (ভেবে দেখ)।

হরিভদ্রর গ্রন্থটি শ্লোকে লেখা। কিন্তু শ্লোকগুলি সহজ ও প্রাঞ্জল হলেও হরিভদ্রর রচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলে এগুলির বিশদার্থ বোঝার জন্য তাঁর ব্যাখ্যাকার মণিভদ্র এবং গুণরত্নর লেখার উপর নির্ভর করতে হয়। সন্দেহ নেই যে প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকদের বস্তুবাদী লোকায়তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিবেচ্য করেই এ-শ্লোকটি রচিত হয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত উক্তি– 'ভদ্রে! বৃকপদং পশ্য যদ্বদন্তি বহুশ্রুতাঃ' অর্থাৎ, 'হে ভদ্রে! নেকড়ের পায়ের চিহ্ন দেখ এবং তা থেকে মহাপণ্ডিতেরাও কী বলেন (ভেবে দেখ)'– বেশ হেঁয়ালিপূর্ণ বলে মনে হয়। ব্যাখ্যাকার গুণরত্ন এই হেঁয়ালির তাৎপর্যটুকু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বলছেন–

''এই বিষয়ে চার্বাক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি গল্প চালু আছে। জনৈক ব্যক্তি নাস্তিকমতের বিশেষ সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন আস্তিকমতে বিশ্বাসী। লোকটি নানা যুক্তি দিয়ে স্ত্রীকে নিজমতের প্রতি টানবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যুক্তি দিয়ে কিছুতেই বোঝাতে না পেরে লোকটি এক মতলব আঁটলেন। গভীর রাতে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি নগরের বাইরে গেলেন এবং বললেন, 'এই নগরে তো অনুমান প্রভৃতি পরোক্ষ জ্ঞানের সমর্থক অনেক বড়বড় পণ্ডিত আছেন। কিন্তু তাঁদের বুদ্ধির দৌড় তোমাকে দেখাব।' এই বলে নগরদ্বার থেকে শুরু করে চৌমাথা পর্যন্ত ধুলোর উপর নেকড়ের পায়ের ছাপ এঁকে ফিরলেন। পরদিন সকালে আস্তিক মহাপণ্ডিতেরা মিলিত হয়ে আলোচনা করতে লাগলেন : 'নিশ্চয়ই নগরে নেকড়ে বাঘ এসেছিল, নইলে পায়ের ছাপ পড়ল কী করে?' তখন তাদের দেখিয়ে নাস্তিক তাঁর স্ত্রীকে বললেন : 'এঁরা আসল কথা না-জেনেও সবাই মিলে একই সিদ্ধান্ত করছেন। স্বর্গ ইত্যাদি বিষয়েও এঁরা একই রকম আচরণ করেন। নিজেদের মতের সমর্থনে কিঞ্চিৎ অনুমান বা

আগম উল্লেখ করে স্বর্গ প্রভৃতির লোভ দেখিয়ে সাধারণ লোককে ঠকান। সুতরাং এঁদের কথা স্বীকার করবার কোনো কারণ নেই।' ফলে স্ত্রী স্বামীর মত মেনে নিলেন।''- (সূত্র: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৪৮)

গল্পটা মজাদার বটে। পাণ্ডিত্যের জাঁকজমক বা কূটযুক্তি অবতারণার কোনো প্রয়াস নেই, তবুও একরকম যেন পরীক্ষামূলকভাবে সরাসরি দেখিয়ে দেয়া গেলো যে মহাপণ্ডিতেরাও অনুমান, শাস্ত্র প্রভৃতির দোহাই দেখিয়ে অদৃষ্ট, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে যে-সব কথা বলেন তা আসলে অসার। দেবীপ্রসাদের মতে এ-জাতীয় গল্প চার্বাকদের মধ্যে চালু থাকার সম্ভাবনাও উপেক্ষা করা যায় না, কেননা গল্পটার সঙ্গে তাদের প্রামাণিক লোকগাথাগুলির মূল প্রবণতার বেশ মিল আছে।

কিন্তু এমন বহুশ্রুত ব্যক্তিরাও অনুমান, আগম প্রভৃতির দোহাই দেখিয়ে প্রত্যক্ষগোচর ইহলোকের বদলে অপ্রত্যক্ষ পরলোকের প্রতি কেন সাধারণ লোককে মনোযোগী করতে চান? উত্তরে চার্বাকেরা কী বলবেন তা হরিভদ্রসূরি'র অপর ব্যাখ্যাকার মণিভদ্র মোটের উপর বিস্তৃতভাবেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে চার্বাক বলবেন–
'তবু যে-সব বাচাল ব্যক্তিরা শুধু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বীকারে বিরত না হয়ে অনুমান, শাস্ত্র ইত্যাদির প্রমাণ দেখিয়ে বলেন যে, পুণ্য ও পাপের ফলে স্বর্গসুখ ও নরকদুঃখ ঘটে, তাদের উদ্দেশ্য (চার্বাক) বলছেন– ভদ্রে, নেকড়ের পায়ের ছাপ দেখ। (তাৎপর্য এই যে) জনৈক ব্যক্তির বউ নেকড়ের পায়ের ছাপ দেখবার কৌতুহল প্রকাশ করেছিল। ঐ ব্যক্তি ধুলোর উপর আঙুল দিয়ে নেকড়ের পায়ের ছাপ এঁকে বলল : ভদ্রে, বৃকপাদ দেখ। (বক্তব্য এই যে) যেমন ঐ ব্যক্তি তার মুগ্ধ পত্নীর বৃকপাদ দেখার আগ্রহ প্রকৃত বৃকপাদ না-দেখিয়ে শুধুমাত্র নিজের আঙুল দিয়ে আঁকা ছবি দেখিয়ে অপরকে প্রবঞ্চনা করতে পারে, তেমনি দক্ষ, কপট ধার্মিক ব্যক্তিরাও কিছু কিছু অনুমান, শাস্ত্র প্রভৃতির দোহাই দেখিয়ে সাধারণ লোকের মনে স্বর্গসুখ ইত্যাদির প্রলোভন জাগিয়ে ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, গ্রাহ্য-ত্যাজ্য ইত্যাদি বিষয়ে সংকটে ঠেলে দেয় এবং ধর্মের প্রতি অন্ধ মোহ সঞ্চার করে। পরমার্থতত্ত্ব-বেত্তা বলে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা এইভাবেই (প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনুমান, শাস্ত্র, প্রভৃতি) প্রমাণের দোহাই দেখিয়ে থাকে।'- (সূত্র: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৪৯)

প্রাচীনকালের বস্তুবাদী হলেও চার্বাকদের এ-জাতীয় বক্তব্যের সঙ্গে আধুনিক বস্তুবাদীর বক্তব্যেও বেশ কিছুটা মিল সুযোগ আছে বলে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন। তাছাড়া এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো, জৈন দার্শনিকদের উক্তিগুলি থেকে মনে হয় চার্বাকদের বিশেষ আস্থা প্রত্যক্ষর উপর এবং তাঁরা এই অর্থেই অনুমান-প্রমাণের বিরোধী যে, অনুমানের দোহাই দিয়ে অনেকে অপ্রত্যক্ষ পরলোকাদির– তথা ধর্মাধর্ম ও পাপপুণ্যের– কথা বলে থাকে। এ-প্রেক্ষিতেই বোধকরি 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়ে'র ভাষ্যকার মণিভদ্র'র স্পষ্ট উক্তি–
'এবম্ অমী অপি ধর্মছদ্মধূর্তাঃ পরবঞ্চনপ্রবণাঃ যৎকিংচিৎ অনুমানাদিদার্ঢ্যম্ আদর্শ্য ব্যর্থং

মুগ্ধজনান্ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিলভ্য ভোগাভোগপ্রলোভনয়া ভক্ষ্যাভক্ষ্যগম্যাগম্যহেয়োপাদেয়াদি সংকটে পাতয়ন্তি, মুগ্ধধার্মিককান্ধ্যম্ চ উৎপাদয়ন্তি।'
অর্থাৎ :
লোকায়তিকদের মতে প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা ধর্মপ্রবঞ্চনার প্রতিষেধক, কেননা অনুমান, আগম (শাস্ত্র) প্রভৃতির নজির দেখিয়ে পরবঞ্চনাপ্রবণ ধর্মছদ্মধূর্তেরা সাধারণ মানুষের মনে স্বর্গাদিপ্রাপ্তি ইত্যাদির প্রলোভন জাগিয়ে ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, গ্রাহ্য-ত্যাজ্য ইত্যাদি বিষয়ে সংকটে ঠেলে দেয় এবং ধর্ম সংক্রান্ত অন্ধ মোহের সঞ্চার করে, এই কারণেই প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য প্রমাণ স্বীকার করা সাধারণ মানুষের পক্ষে নিরাপদ নয়।

তার মানে, আধ্যাত্মবাদী দর্শনের পেছনে লোকবঞ্চনার এক আয়োজন সক্রিয়। চার্বাক বিরোধী হয়েও মণিভদ্রের এই চমৎকার ব্যাখ্যাটি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তাই আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে যে, তিনি একাধারে একজন ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী দার্শনিকও। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বরূপটিও তাঁর উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং মণিভদ্রের এই ব্যাখ্যা স্বীকার্য হলে এটাও মানতে হবে যে, সেকালের লোকায়তিকেরাও দার্শনিক মতকে একেবারে নির্ভেজাল তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরিচায়ক বলে মেনে নেননি। দার্শনিক মতের সঙ্গে ধর্মীয় রাজনীতির এরকম যোগাযোগ তাঁদের চেতনারও অগোচর ছিলো না। চার্বাকদের নামে প্রচলিত প্রামাণিক লোকাগাথাগুলিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু চার্বাকেরা ঐকান্তিক অর্থে অনুমান-বিরোধী কিনা– সে-কথা জৈন দার্শনিকদের রচনায় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি। অর্থাৎ পরলোকের প্রমাণে অনুমানের বিরোধিতা করলেও চার্বাক প্রত্যক্ষগোচর ইহলোক প্রসঙ্গেও অনুমান অগ্রাহ্য করতেন– এমন কোনো স্পষ্ট কথা হরিভদ্র ও তাঁর ব্যাখ্যাকারদের রচনায় পাওয়া যায় না বলে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন। পক্ষান্তরে, এ-প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ আরো বলেন,–

'ইহলোক-সর্বস্ব দার্শনিকের পক্ষে ইহলৌকিক বিষয়ে অনুমান মানায় অন্তত কোনো অনিবার্য বাধা থাকার কথা নয়। অবশ্যই, নেকড়ের পায়ের ছাপ থেকে নেকড়ের আগমন ইহলৌকিক বিষয়েরই অনুমান। কিন্তু আলোচ্য উপাখ্যানে দৃষ্টান্তটির তাৎপর্য এই হতে পারে যে, যে-কোনো অনুমানের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়। বস্তুতপক্ষে, আঙুলে আঁকা নেকড়ের পায়ের ছাপ সযত্নে পরীক্ষা করলে বোঝবার সম্ভাবনা থাকে, ওগুলি আসল নেকড়ের পায়ের ছাপ নয়; কিন্তু বিদগ্ধ ব্যক্তিরাও তা না-করে অসতর্কভাবে এবং হয়তো কিছুটা আতঙ্কের প্রভাবে তাড়াহুড়োয় নেকড়ের পায়ের ছাপের মতো চিহ্ন থেকেই ভেবে বসলেন যে, সত্যিই নেকড়ে এসেছিল। এ জাতীয় অসতর্ক অনুমানই স্বর্গ-নরক পাপ-পুণ্য ধর্ম-অধর্ম প্রভৃতি অনুমানের ভিত্তি। অবশ্যই জৈন লেখকদের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে এই মন্তব্য নেই। তাঁদের উক্তিগুলির মূল কথা হলো, চার্বাক মতে অনুমান, শাস্ত্রবচন প্রভৃতির দোহাই দিয়ে প্রত্যক্ষগোচর বাস্তব পৃথিবীর বাস্তব সুখের প্রতি উদাসীন হয়ে কাল্পনিক পাপ-পুণ্য ও পরলোক প্রভৃতির কথায় কান দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়, কেননা অনুমান সব সময়

নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু অনুমান কোনো সময়ই নির্ভরযোগ্য হতে পারে না– কিংবা অনুমানমাত্রই অসঙ্গত– এ-জাতীয় কোনো কথা হরিভদ্র, গুণরত্ন ও মণিভদ্র সরাসরি বলেন নি। তাঁরা যা বলেছেন তা থেকে শুধু এটুকুই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, অনুমান ও শাস্ত্রবচনের উপর নির্ভর করে পরলোকাদিতে বিশ্বাস একেবারেই কাজের কথা নয়। নেকড়ের পায়ের ছাপ সংক্রান্ত উপাখ্যান থেকে হয়তো আরো বোঝা যায়, চার্বাকমতে দৃষ্টান্ত-বিশেষে এমনকি সাধারণ লৌকিক অনুমানও ভ্রান্ত হতে পারে। কিন্তু তার তাৎপর্য এই হওয়া অনিবার্য নয় যে, অতএব অনুমানমাত্রই– এমনকি সবরকম লৌকিক অনুমানও– অগ্রাহ্য হতে বাধ্য। এই কথার পক্ষে এখানে একটি সহজ যুক্তি দেখানো যেতে পারে। কোনো উল্লেখযোগ্য দার্শনিক এমন কথা বলেননি যে চার্বাক প্রত্যক্ষ-প্রমাণ অস্বীকার করেন। কিন্তু লৌকিক বিষয়েই দৃষ্টান্ত-বিশেষে তো প্রত্যক্ষও ভ্রান্ত জ্ঞানের জনক হতে পারে : মরীচিকায় জলদর্শন, রজ্জুতে সর্পদর্শন প্রভৃতি ভ্রান্ত প্রত্যক্ষর নানান নমুনা তো ভারতীয় দর্শন-সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। অথচ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষর নজির দেখিয়ে প্রত্যক্ষমাত্রকেই অস্বীকার করবার উপদেশ চার্বাকমত হিসাবে কোথাও পাওয়া যায় না। তেমনি, দৃষ্টান্ত-বিশেষে লৌকিক অনুমান ভ্রান্ত বলেই চার্বাকমতে সমস্ত লৌকিক অনুমানই ভ্রান্ত হতে বাধ্য– চার্বাকমতের এ-জাতীয় ব্যাখ্যা অন্তত হরিভদ্র প্রভৃতির অভিপ্রেত হতে বাধ্য নয়।’- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৪৯-৫০)

পুরন্দরের মত এবং শান্তরক্ষিত ও কমলশীল

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সূত্র ধরেই আলোচনাটা আগানো যেতে পারে। চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই যে প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, একথা প্রায় সকলেই বলেছেন। আর হরিভদ্র ও তাঁর ব্যাখ্যাকারেরা বিশদভাবে দেখাতে চেয়েছেন, এ-জাতীয় দাবির পেছনে আসল উদ্দেশ্যটা বস্তুত কী। একদল ধূর্ত প্রবঞ্চক লোক অনুমান ও শাস্ত্রপ্রমাণের দোহাই দেখিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক প্রভৃতি কাল্পনিক বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাস প্রচার করে তাদের ঠকাতে চায়। এ-জাতীয় কথার সঙ্গে লোকায়তিকদের প্রামাণিক লোকগাথাগুলিরও সঙ্গতি সুস্পষ্ট। তাই চার্বাকমত প্রসঙ্গে এ-পর্যন্ত মোটের উপর সুনিশ্চিত হওয়া যেতেই পারে।

কিন্তু যে প্রশ্নটার বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা আবশ্যক, তা হলো– একান্ত অপ্রত্যক্ষ ও অলৌকিক বিষয়ে অনুমান অগ্রাহ্য করলেও চার্বাক কি সমস্ত রকম অনুমান– এমনকি প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ লৌকিক বিষয়ে অনুমানও– অস্বীকার করতে চান?
মাধবাচার্যের বর্ণনাতেই আমরা দেখেছি তিনি বলেছেন, চার্বাক অনুমানমাত্ররই বিরোধী; কারণ ব্যাপ্তি ছাড়া অনুমান অসম্ভব, কিন্তু ব্যাপ্তি-নিশ্চয় কিছুতেই হওয়া সম্ভব হতে পারে না। আর বাচস্পতিমিশ্রের বর্ণনা মতে, এমনকি জন্তু-জানোয়ারের আচরণ থেকে অনুমান-পরায়ণতার যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, চার্বাক তাও মানেন না।

বাচস্পতির কথাটা যে অত্যুক্তির প্রকট নিদর্শন, স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান খরচ করলে তা হয়তো অনেকে স্বীকার করবেন। কিন্তু মাধবাচার্যের বর্ণনার বেলায় অন্য কথা। কেননা, উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, পরবর্তীকালে অনেকেই এবং আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে প্রায় সকলেই মাধবাচার্যের কূটযুক্তিপূর্ণ বর্ণনাটুকু হুবহু মেনে নিয়েই চার্বাক-মতটিকে বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছেন। আধুনিককালের প্রায় সবক'টি পাঠ্যগ্রন্থেই চার্বাক-মতের বর্ণনায় মাধবাচার্য-বর্ণিত চার্বাক-মতেরই অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রায় সকলেই ধরে নেন যে, চার্বাক-মতে অনুমানমাত্রই অপ্রমাণ, তা ইহলৌকিক বা পারলৌকিক যে-কোনো বিষয়েই হোক-না-কেন কোনো রকম অনুমানই চার্বাক-মতে সম্ভব নয়।

কিন্তু এ-হেন কথা স্বীকার করার বাধা আছে বলে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন। কারণ–
'প্রথমত, একেবারে ঐকান্তিক অর্থে অনুমান অস্বীকার করলে সাধারণ-লোকব্যবহারই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ধোঁয়ো দেখে আগুন অনুমান অবান্তর হলে– বা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনুমান করা অসঙ্গত হলে– মানুষের পক্ষে বাঁচাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। চার্বাকরা যদি সত্যি অমন বেকুব হতেন তাহলে তাঁদের মত খণ্ডন করবার জন্যে দিকপাল দার্শনিকদের পক্ষেও মাথা ঘামাবার দরকার পড়তো না।
দ্বিতীয়ত, আগেই বলেছি, লোকায়তিকদের প্রামাণিক লোকগাথাগুলি বিদগ্ধ প্রমাণবিদ্যা-সম্মত অনুমানরূপে ব্যক্ত না-হলেও বিচারে বোঝা যায় যে, এগুলি অবশ্যই একরকম অনুমান-

নির্ভর। অনুমান সম্পূর্ণ নস্যাৎ হলে কী করে ঠাট্টা করেও বলা যায় : যজ্ঞে নিহত জীবের স্বর্গপ্রাপ্তি হলে যজ্ঞে নিহত স্বীয় পিতারও স্বর্গপ্রাপ্তি মানতে হবে? অনুমান একেবারে না-মানলে লোকগাথাটির মূল শ্লেষই ব্যর্থ হতে বাধ্য।'
'এ-জাতীয় কথা একেবারে অবান্তর না-হলে স্বীকার করতে হবে যে চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হলেও লোকব্যবহার-প্রসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ ইহলৌকিক বিষয়েও অনুমানকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করার কথাটা অতিরঞ্জিত। চার্বাকমতে অবশ্যই অপ্রত্যক্ষ পরলোকাদি ব্যাপারে অনুমান স্বীকার্য নয়। কিন্তু লৌকিক ব্যবহারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন এবং প্রত্যক্ষগোচর বিষয়েও অনুমান অস্বীকার করা চার্বাকের অভিপ্রেত মত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৫১)

চার্বাকদের নিজস্ব মত প্রকাশক গ্রন্থ বা সাহিত্য বিলুপ্তির অজ্ঞাত-অন্ধকারে পতিত ও দুর্লভ হওয়ায় উপরিউক্ত দাবি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক বিচারের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তবুও আশার কথা হলো, দাবিটির পক্ষে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক বিচারই এখানে একমাত্র সম্বল নয়। নানা দার্শনিক নানাভাবে পূর্বপক্ষ হিসেবে মতটি বর্ণনা করেছেন এবং সমস্ত পূর্বপক্ষ-বর্ণন সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য না-হলেও কোনো কোনো পূর্বপক্ষ-বর্ণনার মধ্যে এমন কথা স্পষ্টতই পাওয়া যায় যে, অলৌকিক বিষয়ে অনুমান না-মানলেও লোকপ্রসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষগোচর বিষয়ে অনুমান চার্বাক স্বীকার করতেন। তারই নমুনা পাওয়া যায় প্রখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিতের লেখা 'তত্ত্বসংগ্রহ' এবং কমলশীলের 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা' গ্রন্থে, যা কমলশীলের 'পঞ্জিকা' নামে খ্যাত।

কমলশীলের এই বিশাল গ্রন্থ মূলত তাঁর গুরু শান্তরক্ষিত রচিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থের ব্যাখ্যা। শান্তরক্ষিত ভারতীয় দর্শনের প্রথা অনুসারে পরমত খণ্ডন করে স্বীয় মত স্থাপন করার লক্ষ্যে প্রচলিত দার্শনিক মতগুলো খণ্ডন করে স্বীয় বৌদ্ধ মতের সমর্থনে 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থটি রচনা করেন। কিন্তু ওখানেও লোকায়ত হিসেবে বস্তুবাদী মতের সমালোচনা থাকলেও চার্বাক শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু কমলশীলের 'পঞ্জিকা'য় এই বস্তুবাদ সুস্পষ্টভাবেই চার্বাক নামে অভিহিত হয়েছে। তাঁদের এই পূর্বপক্ষ বর্ণনার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, চার্বাকমতের প্রবক্তা হিসেবে পুরন্দর নামে জনৈক পূর্ববর্তী দার্শনিকের উল্লেখ। তবে পুরন্দর রচিত কোন গ্রন্থের নাম আদৌ জানা না গেলেও অন্যান্য লেখকেরাও পুরন্দরকে 'চার্বাকমতে গ্রন্থকর্তা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এজাতীয় উল্লেখ থেকে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ আধুনিক বিদ্বানরাও পুরন্দরকে চার্বাকপন্থী বলেই ধরে নিয়েছেন।
শান্তরক্ষিতের লেখা 'তত্ত্বসংগ্রহ'-র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা'য় কমলশীল বলছেন–
'পুরন্দরঃ তু আহ লোকপ্রসিদ্ধম্ অনুমানং চার্বাকৈঃ অপি ইষ্যতে এব, যৎ তু কৈশ্চিৎ লৌকিকং মার্গম্ অতিক্রম্য অনুমানম্ উচ্যতে তন্নিষিধ্যতে।' (তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা)।
অর্থাৎ :
পুরন্দর কিন্তু বলেন চার্বাকও লোকপ্রসিদ্ধ অনুমান স্বীকার করেন; তবে কেউ যদি লৌকিক

পথ অতিক্রম করে কোনকিছু অনুমান করতে চান তাহলে চার্বাক তার নিষেধ করবেন বা স্বীকার করবেন না।

মাধবাচার্য প্রমুখের বর্ণিত চার্বাকী সাধারণ ধারণার ব্যতিক্রম হিসেবে চার্বাকমতের এই প্রবক্তা পুরন্দর লৌকিক অনুমানকে প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যদিও অলৌকিক কোন ধারণাকে এই অনুমানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতে তাঁর অসম্মতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট, অনুমানমাত্রই– বা সব রকম অনুমানই– অস্বীকার করার দরকার নেই। লোকপ্রসিদ্ধ বা ইহলোক সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণত অনুমানের যে প্রয়োগ তার বিরুদ্ধে চার্বাকেরও কোন আপত্তি নেই। আপত্তিটা অন্যত্র। পারলৌকিক বিষয়ে অনুমানের বিরুদ্ধে। লৌকিক পথ অতিক্রম করে পারলৌকিক বিষয়ে অনুমান অবশ্যই অচল ও অগ্রাহ্য।

কমলশীলের উপরিউক্ত মন্তব্য– এবং তারই সঙ্গে পুরন্দর প্রসঙ্গে জৈন লেখক বাদিদেব সূরির উক্তির সঙ্গতি রেখে– সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যে-ভাবে আধুনিক ভাষায় এই চার্বাকমত ব্যাখ্যা করেছেন, প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তর্জমায় তা উদ্ধৃত করা হলো। দাশগুপ্ত বলছেন–

‘(আনুমানিক সপ্তম শতকের) চার্বাকমতানুগামী পুরন্দর নামে দার্শনিক প্রত্যক্ষসাপেক্ষ পার্থিব বা ইহলৌকিক বিষয়ে অনুমানের উপযোগিতা স্বীকার করেন; কিন্তু প্রত্যক্ষাতীত লোকোত্তর বিষয়ে বা পরকাল ও কর্মফল প্রভৃতি বিষয়ে কোনো মত অনুমানের নজির দেখিয়ে প্রমাণ করা যায় না। সাধারণ অভিজ্ঞতায় জানা ব্যবহারিক জীবনে অনুমানের প্রামাণ্য এবং অভিজ্ঞতাবহির্ভূত বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ে অনুমানের অনুপযোগিতা– এই দু-এর পার্থক্য প্রদর্শনের মূল যুক্তি হলো, দুটি বিষয়ের মধ্যে নিয়ত-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত না-হলে অনুমান সম্ভব নয়; পরিভাষায় এই দুটিকে বলে ‘লিঙ্গ’ (যেমন ধূম) এবং ‘সাধ্য’ (যেমন বহ্নি)। (ধূম ও বহ্নির মধ্যে নিয়ত-সম্বন্ধ স্বীকৃত বলেই ধূম থেকে বহ্নির অনুমান হয়)। এ-জাতীয় নিয়ত-সম্বন্ধ স্থাপনের দুটি শর্ত। এক : বহু দৃষ্টান্তে উভয়কেই একত্রে দর্শন। যেমন বহু দৃষ্টান্তেই দেখা গেছে যে যেখানেই ধূম বর্তমান সেখানেই বহ্নি বর্তমান। দুই : বহু দৃষ্টান্তে একটির অভাবে অপরটিরও অভাব দর্শন। যেমন, বহু দৃষ্টান্তে দেখা গেছে বহ্নি-শূন্য স্থানে ধূম অবর্তমান। কিন্তু এই জাতীয় দ্বিবিধ পরিদর্শন পারলৌকিক বিষয়ে অসম্ভব, কেননা কোনো ক্ষেত্রেই পরলোক প্রত্যক্ষগোচর হতে পারে না। অতএব, পরলোকাদি বিষয়ে অনুমানও অসম্ভব। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষগোচর ইহলৌকিক বিষয়ে এজাতীয় দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত দর্শনের সম্ভাবনা আছে। তাই প্রত্যক্ষগোচর ইহলৌকিক বিষয়ে সাধারণ-স্বীকৃত অনুমানের উপযোগিতা মানা যায়।’- (সূত্র: ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৫৩)

ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের নানা নজির অবজ্ঞা না-করলে পুরন্দর নামের দার্শনিককে নিশ্চয়ই চার্বাকমতের প্রবক্তা বলে স্বীকার করতে হবে। অতএব পুরন্দরের উপরিউক্ত বক্তব্য চার্বাকমত-সম্মত বলেও স্বীকার করা প্রয়োজন বলে দেবীপ্রসাদ মনে করেন। তাহলে,

চার্বাকরা কোনো রকম অনুমানই মানতেন না– এ-হেন দাবিকে অত্যুক্তি বলে সন্দেহ করারও কারণ আছে। বরং স্বীকার করা দরকার যে, চার্বাক-মতে পরলোকাদির অনুমান অসম্ভব হলেও প্রত্যক্ষগোচর ইহলৌকিক বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ অনুমান স্বীকার্য। এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই, এই কথা মানলে চার্বাক প্রসঙ্গে প্রচলিত অনেক কথাই কল্পিত বলে প্রমাণিত হবে।

চার্বাকমত-সম্পর্কে জয়ন্তভট্টর বক্তব্য প্রসঙ্গে

ইতঃপূর্বে প্রত্যক্ষ-প্রমাণের আলোচনায় প্রখ্যাত নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টের বক্তব্য প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। এবং এটাও বলা হয়েছে যে, চার্বাক প্রসঙ্গে জয়ন্তভট্টর প্রকৃত বক্তব্য নির্ণয় করার বেশ কিছুটা সমস্যা রয়েছে। কেননা তিনি তাঁর 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থের একেক স্থানে একেকবার চার্বাক প্রসঙ্গে একেক ধরনের পরস্পর অসঙ্গত বক্তব্য দিয়েছেন, যা থেকে চার্বাকমত প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বিষয়ক কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন। যেমন 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে তার পরম্পরাহীন বক্তব্যগুলি ছিলো–

'তথাহি প্রত্যক্ষং এব একং প্রমাণম্ ইতি চার্বাকাঃ।' (ন্যায়মঞ্জরী : ১/২৬)।
অর্থাৎ : চার্বাকরা বলেন, প্রত্যক্ষই এক এবং একমাত্র প্রমাণ।

.

'চার্বাকধূর্তঃ তু অথ অতঃ তত্ত্বং ব্যাখ্যাস্যামঃ ইতি প্রতিজ্ঞায় প্রমাণ-প্রমেয়-সংখ্যা-লক্ষণ-নিয়ম-অশক্য-করণীয়ত্বম্ এব তত্ত্বং ব্যাখ্যাতবান্'। (ন্যায়মঞ্জরী : ১/৫৯)।
অর্থাৎ : ধূর্ত চার্বাক কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলো- এবার আমরা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবো; কিন্তু 'তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবো' বলে চার্বাক আসলে দেখাতে চাইলো যে প্রমাণ ও প্রমেয়র সংখ্যা ও লক্ষণ সংক্রান্ত কোনো নিয়মই সম্ভব নয়।

.

'অশক্য এব প্রমাণসংখ্যানিয়ম ইতি সুশিক্ষিত চার্বাকাঃ।' (ন্যায়মঞ্জরী : ১/৩৩)।
অর্থাৎ : সুশিক্ষিত চার্বাকদের মতে প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম করা সম্ভব নয়।

বলা বাহুল্য, সাধারণ পাঠকের পক্ষে চার্বাক প্রসঙ্গে জয়ন্তর এই বিভিন্ন ধরনের বর্ণনার মধ্যে সংগতিসাধন সহজসাধ্য হবার কথা নয়। একই সঙ্গে কী করে বলা যায় যে চার্বাকেরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে মনে করতেন এবং তাঁরা কোনো প্রমাণই মানতেন না; প্রত্যক্ষও তাঁদের কাছে সংশয়াতীত নয়! এবং আবার এও বলেন যে 'সুশিক্ষিত চার্বাক'দের মতে প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে কোনো নিয়ম মানা যায় না। এই মতে প্রমাণের সংখ্যা অসংখ্য, না কি প্রমাণ বলেই কিছু নেই, জয়ন্তর উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে আসলে কিছু বোঝারই উপায় নেই।

তাছাড়া অনুমানের বিরোধিতা প্রসঙ্গেও চার্বাক পক্ষের উক্তি নিয়ে জয়ন্তভট্ট 'ন্যায়মঞ্জরী'তে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা অনেকটাই মাধবাচার্যের বর্ণনার অনুরূপ বলে মনে হয়। জয়ন্তভট্ট বলছেন, ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভিত্তি ভূয়োদর্শন, অর্থাৎ অসংখ্য ক্ষেত্রে সাধনকে সাধ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা। চার্বাকপন্থীরা বলেন যে এই পরিবর্তনশীল জগতে দেশ, কাল ও পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী বস্তুপ্রকৃতিও নিয়ত পরিবর্তনের অপেক্ষা রাখে। এই পরিবর্তনের পটভূমিকায় বিশেষ কোন ধর্ম বস্তুবিশেষের সঙ্গে সব অবস্থাতেই যুক্ত থাকতে বাধ্য, এটা আশা করা যায় না। কাজেই–

‘দেশকালদশাভেদবিচিত্রাত্মসু বস্তুষু অবিনাভাবনিয়মো ন শক্যা বস্তুমাহ চ’। (ন্যায়মঞ্জরী)
অর্থাৎ : দেশ, কাল ও পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী বস্তুপ্রকৃতির নিয়ত পরিবর্তনের কারণে ভূয়োদর্শনের মাধ্যমে লব্ধ বিশেষ দ্রব্য এবং ধর্মের পরস্পর উপাধিমুক্ত সম্বন্ধ বা অবিনাভাবের সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। (মুক্ততর্জমা)

অসংখ্য ক্ষেত্রে সাধন এবং সাধ্যের একত্র অবস্থান যদিও দেখা যায়, তাহলেও এর থেকে আমরা চিরকালীন সত্য কোন ব্যাপ্তিজ্ঞানের আশা করতে পারি না; কারণ অতীতে যে অবিনাভাব দেখা গেছে, ভবিষ্যতে তার ব্যতিক্রম হবে না, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ‘ন্যায়মঞ্জরী’র উক্তিতে বলা হয়েছে যে,–
‘বিশ্বের সমস্ত বস্তু যদি কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষগোচরে আনা সম্ভব হতো তাহলে সেই ব্যক্তি তাঁর বিশেষ শক্তির সাহায্যে হয়তো বলতে পারতেন সাধন বা ধূম সাধ্য বা অগ্নির সঙ্গে সব ক্ষেত্রেই প্রকৃতই যুক্ত কিনা। কিন্তু এই ধরনের শক্তিমান ব্যক্তির পক্ষে অনুমান এবং অনুমানের ভিত্তি ব্যাপ্তিজ্ঞান– দুইই নিষ্প্রয়োজন’- (‘ন প্রত্যক্ষাকৃতা যাবৎ...... এষামনুমানপ্রয়োজনম্’)।

সর্বশেষ বাক্যে জয়ন্তভট্টে শ্লেষটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না। জয়ন্তভট্টর লেখার কায়দাটাই ওই রকম রকমারি শ্লেষ বা ঠাট্টা-তামাসায় ঠাসা। তবে বোঝাই যায়, নিয়ত ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ সম্ভব নয় বলে চার্বাকরা কোন অনুমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না– এই ব্যাখ্যারই দীর্ঘ আয়োজন করা হয়েছে।
আবার ব্যাপ্তিজ্ঞানের সমর্থকদের মতে ধূমের অগ্নিব্যাপ্যতা প্রমাণ করতে হলে ধূমের সঙ্গে অগ্নির সহাবস্থানের প্রতিটি ঘটনা লক্ষ্য করার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন কেবল ‘ধূমত্ব’ এবং ‘অগ্নিত্ব’ এই দুটি সামান্যের মধ্যে কার্যকারণভাবে বিশ্বাস। ব্যাপ্তিগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে ধূম ও অগ্নিসম্বন্ধীয় এই ‘সামান্য’কে কেন্দ্র করে। ‘ন্যায়মঞ্জরী’তে জয়ন্তভট্টের আলোচনার মধ্যে ব্যাপ্তি শব্দের এই ধরনের অর্থ সূচিত হয়। তবে চার্বাকী ধারণায় কিন্তু এই সামান্যের কোন স্বীকৃতি নেই এবং ফলে সামান্যদ্বারক কার্যকারণভাবও এই দর্শন মতে অনিশ্চয়তার দোষে দুষ্ট– জয়ন্তের বর্ণনায় এসব দার্শনিক কূটযুক্তির ভিতরে প্রবেশ করার প্রয়োজন আমাদের নেই। মোটের উপর জয়ন্তের বক্তব্য থেকে চার্বাক-মত সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা চয়ন ব্যাপক সমস্যাপূর্ণ বলে মনে হয়।

‘ন্যায়কুসুমাঞ্জলি’ গ্রন্থে (ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-৩/৫,৬) উদয়নাচার্য বলেন,– চার্বাকী যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত মানুষ যদি প্রত্যক্ষ বহির্ভূত সব বস্তুকে অস্বীকৃতি দেয় তাহলে ব্যবহারিক জীবনে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। জয়ন্তভট্টও অনুরূপ মন্তব্যে তাঁর ‘ন্যায়মঞ্জরী’তে বলেন–
‘অনুমানাপলাপ তু প্রত্যক্ষাদপি দুর্লভা। লোকযাত্রেতি লোকাঃ স্যুর্লিখিতা ইব নিশ্চলাঃ’। (ন্যায়মঞ্জরী)

অর্থাৎ : প্রত্যক্ষ বহির্ভূত সব অনুমানই যদি অপলাপ হয়, ব্যবহারিক জীবনে লোকযাত্রা নিশ্চল হতে আর বাকি কী।

এরপর চার্বাক মতবাদের খণ্ডনে জয়ন্তভট্ট তাঁর স্বভাবসুলভ বিদ্রূপাত্মক হেঁয়ালিপূর্ণ উক্তিতে বলেন,–

স্বামীর গৃহে অনুপস্থিতিকালে চার্বাক-পত্নী বিধবা হন, কারণ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের মাধ্যমে গৃহবহির্ভূত চার্বাকের বর্তমানতাকে স্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না।

উক্তিটি নিছক পরিহাসধর্মী হলেও ব্যবহারিক জীবনের গতিপথে বিশুদ্ধ চার্বাক-পন্থীরা যে ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে পারেন, এর মধ্যে তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই প্রশ্ন হলো, সত্যি কি চার্বাকেরা কোন ক্ষেত্রেই– সীমিত আকারে হলেও– অনুমানকে স্বীকার করতেন না?

কিন্তু জয়ন্তর-উক্ত 'সুশিক্ষিত চার্বাক' নিয়ে আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে বেশ একটু শোরগোল পড়ে যখন দেখা যায় একই গ্রন্থ 'ন্যায়মঞ্জরী'র আরেক জায়গায় তিনি বলেন–

'সুশিক্ষিততরাঃ প্রাহুঃ... যত্ত্বাত্মেশ্বরসর্বজ্ঞপরলোকাদিগোচরম্ । অনুমানং ন তস্যেষ্টং প্রামাণ্যং তত্ত্বদর্শিভিঃ।' (ন্যায়মঞ্জরী: ১/১১৩)।

অর্থাৎ : সুশিক্ষিততররা বলে থাকেন– অনুমান দু-রকম, উৎপন্ন-প্রতীতি এবং উৎপাদ্য-প্রতীতি। ধূম প্রভৃতি থেকে বহ্নি প্রভৃতির অনুমান কে অস্বীকার করে? এসব দ্বারা তার্কিক দ্বারা অক্ষত ব্যক্তিরাও সাধ্য-কে জানতে পারে। তবে আত্মা, সর্বজ্ঞ, ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি বিষয়ে যে-অনুমানের কথা বলা হয় সেগুলির প্রামাণ্য তত্ত্বদর্শীরা স্বীকার করেন না। এইসব অনুমানের দ্বারা সোজা মানুষের অনুমেয় বিষয়ে জ্ঞান হয় না– অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মন দুষ্ট তার্কিকদের দ্বারা কুটিল হয়ে ওঠে।

একে তো ন্যায়শাস্ত্রের জটিল পরিভাষা, তার উপরে জয়ন্ত ভট্টের পাণ্ডিত্যপূর্ণ শ্লেষ বা ঠাট্টা-তামাশায় ঠাসা বক্তব্যের তীর্যক কায়দা থেকে সহজ-সরল অর্থ উদ্ধার করা চাট্টিখানি কথা নয়। এক্ষেত্রে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জয়ন্তর এ বক্তব্যকে আমাদের বোধগম্য করে সোজা ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন এভাবে–

'জয়ন্ত বলছেন, সুশিক্ষিততরদের মতে প্রত্যক্ষগোচর ইহলোক বিষয়ে সাধারণ লোক যা অনুমান করে থাকে তা অবশ্যই স্বীকার্য : যেমন ধূম থেকে বহ্নির অনুমান। কিন্তু আত্মা, পরলোক প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে কূট তার্কিকেরা যে-সব অনুমান প্রদর্শন করেন তা শুধু তাঁদের কূটবুদ্ধিরই পরিচায়ক, স্বীকারযোগ্য অনুমান হতে পারে না।' (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৫৫)।

'সুশিক্ষিততর'-দের মত হিসেবে জয়ন্ত এখানে যা বলেছেন তা অবশ্যই পুরন্দরের কথাই মনে করিয়ে দেয়। বক্তব্যের প্রকাশভঙ্গি যেরকমই হোক, মূল বক্তব্য আসলে একই। এবং পুরন্দর যে প্রকৃত চার্বাকপন্থীই ছিলেন এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা ভারতীয়

দার্শনিক সাহিত্যে তার একাধিক নজির রয়েছে। কিন্তু, দেবীপ্রসাদের মন্তব্য অনুসারে– ‘সুশিক্ষিততর’ বিশেষণ দিয়ে জয়ন্ত যাঁদের কথা বলছেন তাঁরাও যে চার্বাকপন্থী ছিলেন– এ বিষয়ে কোথাও নিশ্চিত নজির নেই; অন্তত জয়ন্তর ‘ন্যায়মঞ্জরী’তে নয়। তাঁর আলোচ্য উক্তির আগে বা পরে কোথাওই চার্বাক বা লোকায়ত শব্দ চোখে পড়ে না। উক্তিটি অবশ্য পূর্বপক্ষ বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পূর্বপক্ষ হিসাবে এখানে ঠিক কাকে বা কাদের বোঝা হবে? জয়ন্ত যেহেতু এখানে এমনকি আভাসে-ইংগিতেও চার্বাকের উল্লেখ করেননি সেইহেতু এখানেও পূর্বপক্ষ বলতে ঐ চার্বাকই– এমনতর কথা কল্পনা করা ভিত্তিহীন হবে। পক্ষান্তরে, মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে (Indian Logic in Its Sources, pp-31 f.) স্পষ্টই দেখিয়েছেন যে, জয়ন্তর আলোচ্য পূর্বপক্ষ-বর্ণনাটির মধ্যে অনেকগুলি শ্লোক ভর্তৃহরির ‘বাক্যপদীয়’তেও পাওয়া যায়– একেবারে হুবহু একইভাবে পাওয়া যায়। ভর্তৃহরিকে চার্বাপন্থী মনে করার কারণ নেই। তাই শুধুমাত্র শ্লোকগুলির নজির থেকেই বলা যায় যে ‘সুশিক্ষিততরাঃ’ বলে এখানে জয়ন্ত যাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদের সরাসরি চার্বাক বলে কল্পনা করা নিরাপদ নয়।’- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৫৬)

আধুনিক বিদ্বানদের অনেকেই অতি-সারল্যের পরিচয় দিয়ে নির্বিবাদে ধরে নেন যে, জয়ন্তর লেখা থেকেই বোঝা যায়, চার্বাকদের দুটি সম্প্রদায় ছিলো। একটি হলো ধূর্ত চার্বাক এবং অপরটি হলো সুশিক্ষিত চার্বাক। তাঁরা আরো ধরে নেন যে, দুটির মধ্যে মূল প্রভেদ হলো, ধূর্ত চার্বাকেরা প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোন প্রমাণ মানেননি; আর সুশিক্ষিত চার্বাকেরা অবশ্য তা ছাড়াও লোকপ্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বিষয়ে অনুমান-প্রমাণ মেনেছেন, শুধু অপ্রত্যক্ষ লোকোত্তর বিষয়ে অনুমান অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁদের এ-জাতীয় মতের পক্ষে একমাত্র নজির বলতে জয়ন্তভট্টর ‘ন্যায়মঞ্জরী’। কেননা, জয়ন্ত চার্বাকদের বিশেষণ হিসেবে এক জায়গায় ‘ধূর্ত’ এবং অপর জায়গায় ‘সুশিক্ষিত’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া ধরেই নেয়া হয় যে ‘সুশিক্ষিততরাঃ’ বলে জয়ন্ত যাঁদের উল্লেখ করেছেন তাঁরা ঐ সুশিক্ষিত চার্বাকই।
কিন্তু এই মত স্বীকার করায় অনেক বাধা আছে বলে দেবীপ্রসাদ মনে করেন। তাঁর মতে,– ‘প্রথমত, বিদ্বেষমূলক বিশেষণ ব্যবহারে পটু জয়ন্ত একই গ্রন্থে চার্বাককে ‘বরাক’ বলেছেন। বরাক মানে বোকা-হাবা– ধূর্ত নয়। তাহলে কি এই নজির থেকেই চার্বাকদের আরো এক সম্প্রদায় কল্পনা করতে হবে? দ্বিতীয়ত, চার্বাক প্রসঙ্গে জয়ন্ত যেখানে ‘ধূর্ত’ বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, সেখানে চার্বাক বলতে যে-সর্বপ্রমাণ-বিরোধী দার্শনিকদের কথা বর্ণনা করেছেন তাঁরা কোনমতেই চার্বাকমতবাদী হতে পারেন না। এমনকি জয়ন্তর মতেও তা হওয়া কঠিন। কেননা একই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, চার্বাকরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। তাই জয়ন্তর টীকাকার চক্রধর এখানে মতটির সমর্থক হিসাবে উদ্ভট বলে কোন এক ব্যক্তির কথা কল্পনা করতে বাধ্য হয়েছেন। তৃতীয়ত, ‘সুশিক্ষিততরাঃ’ বলে জয়ন্ত যাঁদের কথা বলেছেন তাঁরা যে কোনো এক সম্প্রদায়ের চার্বাকপন্থী– এ কথার পক্ষে কোনো নিশ্চিত নজির নেই।’

তাই চার্বাকদের বিষয়ে জয়ন্ত ভট্টের বিবিধ বিশেষণ প্রয়োগকে আদৌ কোন শ্রেণীভেদ হিসেবে গণ্য করা হবে কিনা তাও সতর্ক বিবেচনার বিষয়। কেননা,– শ্লেষাত্মক বিশেষণ ব্যবহারপূর্ণ রচনাকৌশলে রচিত 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে জয়ন্ত ভট্ট 'সুশিক্ষিত' শব্দটিকে ব্যাঙ্গাত্মক অর্থেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়। এই শব্দটি শুধু চার্বাকদের বেলায়ই নয়, ন্যায়মঞ্জরীতে অন্যান্য দার্শনিকদের সমালোচনায়ও একইরকম ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন, একই গ্রন্থে (ন্যায়মঞ্জরী: ১/১৬১) ঠাট্টা করে তিনি মীমাংসক প্রাভাকরদের সম্বন্ধে এই বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। আবার অন্যত্র (ন্যায়মঞ্জরী: ১/২৭৩) যে দার্শনিকেরা 'সামান্য বা জাতি' (Universal) মানেন না তাঁদেরও পরিহাস করে 'সুশিক্ষিত' বলেছেন। তাই জয়ন্তভট্টর 'ন্যায়মঞ্জরী' থেকে চার্বাকমতের শ্রেণীভেদ সম্বন্ধে কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা কঠিন বলে বিদ্বান গবেষকদের অভিমত। ফলে পাণ্ডিত্য ও তর্কবিদ্যায় পারদর্শী ও সুপরিচিত চার্বাক গোষ্ঠির সাধারণ সংজ্ঞা হিসেবে সুশিক্ষিত শব্দের ব্যবহার অস্বাভাবিক নাও হতে পারে। কিন্তু শুধু জয়ন্তর রচনার নজির দেখিয়ে চার্বাকদের 'ধূর্ত', 'সুশিক্ষিত' এসব নামের স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের কল্পনা করা আদৌ সমীচীন হবে না বলেই মনে হয়।

একইভাবে, জয়ন্তভট্টর 'ন্যায়মঞ্জরী' থেকে চার্বাকমত সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা কঠিন, বিশেষত চার্বাকেরা অনুমান মানতেন কিনা এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা নিরাপদ নয়। অতএব এ-হেন কল্পনারও কোন সুযোগ নেই যে ধূর্ত চার্বাকেরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে মানতেন, কিন্তু সুশিক্ষিত চার্বাকেরা প্রত্যক্ষ ছাড়াও লোকপ্রসিদ্ধ ইহলৌকিক বিষয়ে অনুমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। বরং পুরন্দরের প্রামাণ্য উক্তি থেকে এটা মনে হয় যে, দ্বিতীয় কথাটিই চার্বাকপন্থীদের প্রকৃত অভিপ্রেত; অর্থাৎ তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষই প্রমাণশ্রেষ্ঠ হলেও প্রত্যক্ষর অনুগামী অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করায় বাধা ছিলো না।

…

চার্বাক-মত প্রসঙ্গে কৌটিল্যর সাক্ষ্য

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র সাক্ষ্যে বার্হস্পত্য সম্পর্কে চমৎকার প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। চার্বাক বা প্রাচীনতর কালে লোকায়ত নামে খ্যাত দার্শনিক মতে অনুমানও যে প্রমাণ বলেই স্বীকৃত ছিলো– এ বিষয়ে মোক্ষম প্রমাণ কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'।

এই গ্রন্থের প্রথম অধিকরণ 'বিনয়াধিকারিকম্' এর 'বিদ্যাসমুদ্দেশ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যা ও তাদের সম্মন্ধে পূর্ববর্তী শ্রদ্ধেয় আচার্যগণের মতভঙ্গি উদ্ধৃত করতে গিয়ে কৌটিল্য বলেন–

[কৌটিল্যস্য স্বমতং চ।] আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ।
ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি মানবাঃ। ত্রয়ীবিশেষো হ্যান্বীক্ষিকীতি।
বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বার্হস্পত্যাঃ। সংবরণমাত্রং হি ত্রয়ী লোকযাত্রাবিদ ইতি।
দণ্ডনীতিরেকা বিদ্যেত্যৌশনসাঃ। তস্যাং হি সর্ববিদ্যারম্ভাঃ প্রতিবদ্ধা ইতি।
চতস্র এব বিদ্যা ইতি কৌটিল্যঃ। তাভির্ধর্মার্থৌ যদ্বিদ্যাত্তদ্বিদ্যানাং বিদ্যাত্বম্ ।। ১/২/১।।
(কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্)।

অর্থাৎ :

কৌটিল্যের মতে, বিদ্যা চার প্রকারের, যথা– আন্বীক্ষিকী (হেতুবিদ্যা বা তর্কবিদ্যা বা মোক্ষদায়ক আত্মতত্ত্ব), ত্রয়ী (ঋক্-যজুঃ-সামবেদাত্মক বেদ-বিদ্যাসমুদায়), বার্তা (কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যা) এবং দণ্ডনীতি (অর্থাৎ রাজনীতি বা নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র)।

মানব সম্প্রদায় অর্থাৎ মনু-শিষ্যগণ বলেন– ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি– বিদ্যা এই তিনপ্রকার। কারণ, আন্বীক্ষিকী (বা হেতুবিদ্যা) ত্রয়ীর অর্থবিচার করে বলে সেটি ত্রয়ীবিশেষ-মাত্র অর্থাৎ ত্রয়ীরই অন্তর্ভুক্ত।

বৃহস্পতির শিষ্যগণের (বার্হস্পত্যগণের) মতে, বার্তা ও দণ্ডনীতি– এই দুই প্রকারের বিদ্যা ; কারণ, ত্রয়ী লোকযাত্রাবিদের অর্থাৎ বার্তা ও দণ্ডনীতির অনুষ্ঠান বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষের পক্ষে, সংবরণের অর্থাৎ আচ্ছাদনের কাজ করে মাত্র (লোকতন্ত্রজ্ঞ হলেও ত্রয়ীজ্ঞান না থাকলে নাস্তিক বলে লোকসমাজে যে নিন্দিত হতে হয়, তার থেকে রক্ষার উপায়মাত্র হওয়ায় ত্রয়ীর স্বতন্ত্র বিদ্যাত্ব স্বীকারের কোনো প্রয়োজন নেই)।

ঔশনস (উশনা-পুত্র শুক্রাচার্যের শিষ্য-) গণের মতে, দণ্ডনীতি বা অর্থশাস্ত্রই একমাত্র বিদ্যা, কারণ দণ্ডনীতিতেই অন্যান্য সমস্ত বিদ্যার আরম্ভ (অর্থাৎ কর্মনীতিপদ্ধতি এবং যোগক্ষেম) প্রতিষ্ঠিত আছে।

কিন্তু কৌটিল্যের মতে, (প্রথম উক্ত) চারটিই বিদ্যা। (এই চারটিকে বিদ্যা বলবার কারণ–) এই চারটির দ্বারাই ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার এবং অর্থ বা জাগতিক সকল প্রয়োজনবস্তু জানা যায় ; এবং এদের দ্বারা জানা যায় বলেই এদের 'বিদ্যাত্ব' সার্থক হয়েছে।

এবং এই বিদ্যাগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কৌটিল্য আবার বলেন–

সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষিকী।

ধর্মাধর্মৌ ত্রয্যাম্ । অর্থানর্থৌ বার্তায়াম্ । নয়াপনয়ৌ দণ্ডনীত্যাম্ । বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরন্বীক্ষমাণান্বীক্ষিকী লোকস্যোপকরোতি, ব্যসনেহভ্যুদয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, প্রজ্ঞাবাব্যক্রিয়াবৈশারদ্যং চ করোতি।

প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্ ।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা।। ১/২/২।। (কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্)।

.
অর্থাৎ :
সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত– এই তিনটি শাস্ত্রই উক্ত আন্বীক্ষিকী-বিদ্যারই অন্তর্ভুক্ত।
এই আন্বীক্ষিকীর দ্বারা এবং সূক্ষ্ম অন্বীক্ষার সাহায্যে ধর্ম এবং অধর্মের বিষয় ত্রয়ীতে প্রতিপাদিত হয় ; অর্থ এবং অনর্থ প্রতিপাদিত হয় বার্তা-নামক বিদ্যায় ; এবং দণ্ডনীতিতে নয় ও অপনয় (good policy and bad policy) প্রতিপাদিত হয়। এই তিন বিদ্যার বল ও অবল (সামর্থ্য ও অসামর্থ্য) বা প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য যুক্তির দ্বারা নির্ধারণ করা হয় বলে আন্বীক্ষিকী লোকসমাজের উপকার করে থাকে, বিপৎকালে এবং অভ্যুদয়ের সময় মানুষের বুদ্ধি অবিচলিত রাখে এবং মানুষের প্রজ্ঞা, বাক্য-ব্যবহার ও কর্মশক্তির নৈপুণ্য সম্পাদন করে।
আন্বীক্ষিকীবিদ্যা (অপর-) সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ (মার্গদর্শক), সকল কর্মের (অর্থাৎ কর্মসাধনের পক্ষে) উপায়তুল্য, সকল (লৌকিক ও বৈদিক-) ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ বলে সর্বদা পরিগণিত হয়ে থাকে।

এখানে কৌটিল্যের মতে বিদ্যা চারটি হলেও উল্লিখিত শ্লোক অনুযায়ী কৌটিল্যবর্ণিত বার্হস্পত্যদের মতে বিদ্যার সংখ্যা দুই– দণ্ডনীতি এবং বার্তা। বেদ অথবা আন্বীক্ষিকীকে বার্হস্পত্যরা বিদ্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেন না। তাঁরা বেদকে ‘লোকযাত্রাবিদ্’ বা লৌকিক ব্যবহারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ‘সংবরণ’ বা পোশাক বলে অভিহিত করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, বার্হস্পত্যদের অভিমত অনুসারে সে সময়ে বেদজ্ঞ বলে যাঁরা নিজেদের প্রচার করতেন তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ সব সময়ই বেদজ্ঞানের আবরণে গোপন থাকতো। তা থেকে অনুমিত হয় যে, ‘অর্থশাস্ত্রে’র সময়কালে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই বার্হস্পত্য মতবাদ বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। অনুরূপ বক্তব্য পরবর্তী অন্য দার্শনিকদের উক্তিতেও প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যায়।

তাই, কৌটিল্যের এই বার্হস্পত্য মত বর্ণনার সাপেক্ষে পরবর্তীকালের সাহিত্যে চার্বাক দর্শনের সাযুজ্য বিশ্লেষণ করতে একাদশ শতকের কৃষ্ণমিশ্র রচিত ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ নাটকটিকে গুরুত্বপূর্ণ নমুনা-উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই রূপক

নাটকে বর্ণিত চার্বাক সিদ্ধান্তে বলা হচ্ছে–
‘দণ্ডনীতিরেব বিদ্যা। অত্রৈব বার্তান্তর্ভবিষ্যতি ধূর্ত প্রলাপস্ত্রয়ী।।’ (প্রবোধচন্দ্রোদয়, পৃষ্ঠা-৬৫)।
অর্থাৎ : চার্বাক মতে, দণ্ডনীতিই একমাত্র বিদ্যা। বার্তা দণ্ডনীতির অন্তর্ভুক্ত এবং ত্রয়ী বা বেদ ধূর্তদের প্রলাপ।
আবার অষ্টম শতকের প্রখ্যাত অদ্বৈত-বেদান্ত দার্শনিক শঙ্করাচার্য লোকায়ত প্রসঙ্গে তাঁর ‘সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন–
কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যদণ্ডনীত্যাদিভির্বুধঃ। দৃষ্টৈরেব সদোপায়ৈর্ভোগানানুভবেদ্ ভুবি।। ২/১৫।। (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ)।
অর্থাৎ : (লোকায়তরা) কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, দণ্ডনীতি ইত্যাদি দৃষ্ট উপায়ের মাধ্যমে জাগতিক বস্তু উপভোগের পরামর্শ দেন।
অতএব, ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ গ্রন্থের বার্হস্পত্য-চার্বাক বা ‘সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ’ গ্রন্থের বার্হস্পত্য-লোকায়তের আদি রূপ হিসেবে কৌটিল্যবর্ণিত বর্ণিত বার্হস্পত্যের অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

তবে বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে বিষয়টি অধিকতর পর্যালোচনার দাবি রাখে। এ বিবেচনায় প্রথমে ‘অর্থশাস্ত্রে’ ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দার্থ আলোচনা করা যেতে পারে। কৌটিল্যের মতে (রাজার পক্ষে) শিক্ষণীয় বিদ্যা বলতে চার রকম– আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি। এর মধ্যে বার্তা ও দণ্ডনীতির অর্থ নিয়ে বিশেষ কোন হাঙ্গামা নেই। বার্তা মানে কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য ইত্যাদি– এককথায় সেকালের অর্থনীতি। আর দণ্ডনীতি মানে রাজ্যশাসন বিদ্যা– মানে সেকালের পলিটিক্স বা রাজনীতি। আমাদের বিশ্লেষণের লক্ষ্য বাকি দুটি শব্দ– ত্রয়ী ও আন্বীক্ষিকী।

গবেষক জ্যাকবি ত্রয়ী শব্দের অর্থ করেছেন থিয়োলজি বা ধর্মতত্ত্ব। কিন্তু এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো, যে কোনো ধর্মতত্ত্বই ত্রয়ী নয়। প্রাচীন ভারতে প্রচলিত একটি প্রথা অনুসারে অথর্ববেদকে বাদ দিয়ে শুধু ঋক্, সাম ও যজুর্বেদকে তিন বেদ বলে ধরা হতো। সেই প্রথা অনুসারে এখানেও ত্রয়ী বলতে তিন বেদ। অর্থাৎ, ত্রয়ী মানে ধর্মতত্ত্ব হলেও শুধু এই তিন বেদমূলক ধর্মতত্ত্ব বা এই তিন বেদের বিদ্যা। যদিও সেকালে পাল্টা ধর্মতত্ত্ব হিসেবে বিশেষত বৌদ্ধ ও জৈন মত সহজেই অনুমিত হতে পারলেও বেদবাদীরা তাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাবেন এমন কল্পনা কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু কৌটিল্য-বর্ণিত চার রকম বিদ্যার মধ্যে কৌটিল্য আন্বীক্ষিকী নামক বিদ্যাটির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। আন্বীক্ষিকী মানে কী? দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যায়–

‘অন্বীক্ষা শব্দের অর্থ ‘পরবর্তী জ্ঞান’। অনু (অর্থাৎ পরবর্তী) + ঈক্ষা (বা জ্ঞান)। অনুমান শব্দটির অর্থও হুবহু একই : অনু (পরবর্তী) + মান (জ্ঞান)। অতএব ‘অন্বীক্ষা’ ও ‘অনুমান’ একই কথা, ভারতীয় পরিভাষায় যাকে বলে পর্যায়শব্দ। কিন্তু ‘পরবর্তী জ্ঞান’ বললে অবশ্যই

প্রশ্ন উঠবে : কিসের পরবর্তী ? ভারতীয় ঐহিত্য অনুসারে 'প্রত্যক্ষর পরবর্তী'। ...মনে রাখা দরকার যে ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে 'অনুমান' জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের অনুগামী– পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। প্রথমে কোনো প্রত্যক্ষ-জ্ঞান এবং তারই অনুসরণ করে অনুমান-জ্ঞান। কিংবা বলা যায়, অনুমানের একটি মূল শর্ত হলো পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষ। ভারতীয় দার্শনিকেরা একথা বলছেন কেন? পূর্ব-প্রত্যক্ষ বাদ দিয়ে অনুমান কেন সম্ভব নয়? একটা খুব সহজ দৃষ্টান্ত থেকে কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। ধূম থেকে আমরা অগ্নি অনুমান করি। কী করে করি? কেননা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি (বা প্রত্যক্ষ করেছি) : যেখানে ধূম সেখানেই অগ্নি, যেমন রান্নার উনুনে। এ-জাতীয় পূর্বপ্রত্যক্ষ বাদ দিয়ে শুধু ধূম থেকে অগ্নির অনুমান সম্ভব নয়। তাই অন্বীক্ষা (অনু + ঈক্ষা) বা অনুমান (অনু + মান)। 'চরক-সংহিতা' এবং 'ন্যায়সূত্র'তে বিষয়টি আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।...
তাহলে, 'আন্বীক্ষিকী'র শব্দার্থ হলো 'অনুমানবিদ্যা'– আজকাল চলতি কথায় আমরা যাকে বলি 'লজিক'। অবশ্য, কৌটিল্য এখানে বিশুদ্ধ অনুমানবিদ্যা অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেননি ; তাঁর মতে 'আন্বীক্ষিকী' শুধু অনুমানবিদ্যা ছাড়াও অনুমান-মূলক দার্শনিক মতও। কেননা একই সঙ্গে তিনি বলেছেন– 'আন্বীক্ষিকী' বলতে তিনি এবং শুধুমাত্র তিন : সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়ত। এগুলি দার্শনিক মতের নাম। তাই এখানে 'আন্বীক্ষিকী' বলতে হেতুবিদ্যা বা অনুমানবিদ্যা ছাড়াও এমন দার্শনিক মতও বুঝতে হবে যার মূল ভিত্তি বলতে অনুমান বা অন্বীক্ষা। অর্থাৎ কৌটিল্য এখানে প্রকৃত অনুমান-ভিত্তিক– বা, চলতি কথায় হয়তো বলা যায়, যুক্তিমূলক– দার্শনিক মত হিসেবে শুধুমাত্র তিনটির উল্লেখ করেছেন। সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত। তাঁর বিচারে আর কোনো দার্শনিক মতের যুক্তিবিদ্যা-ভিত্তির মর্যাদা নেই।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৫৯)।

.

উল্লেখ্য, আন্বীক্ষিকীর অন্তর্ভুক্ত বিদ্যা হিসেবে কৌটিল্যবর্ণিত যে যোগের উল্লেখ রয়েছে, পণ্ডিতদের মতে সেটা আসলে পতঞ্জলির (২৫০ খ্রিস্টাব্দ) যোগদর্শন নয়, মূলত ন্যায়-বৈশেষিক অর্থে প্রাচীন যোগ বোঝানো হয়েছে। কীভাবে? কেননা, দার্শনিক মত হিসেবে পতঞ্জলির যোগ-দর্শন এবং সাংখ্য-দর্শনের মধ্যে মূল পার্থক্য শুধু এই যে, সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই; কিন্তু পতঞ্জলি সাংখ্য-দর্শনের বাকি সব তত্ত্ব মেনে নিয়ে কোনোরকমে কেবল তার সঙ্গে ঈশ্বরকেও জুড়ে দিয়েছেন। এবং এ-কারণে পতঞ্জলির যোগদর্শন নামান্তরে 'সেশ্বর সাংখ্য' (বা সাংখ্য + ঈশ্বর) নামেও খ্যাত। অতএব কৌটিল্যের বর্ণনায় যোগ নামে পতঞ্জলির যোগদর্শনকে বোঝানো সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। তাছাড়া দেবীপ্রসাদের ভাষ্যে জানা যায়, ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় সংশয়াতীতভাবে নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রীর মতো মহাপণ্ডিতেরা মূল্যবান সাক্ষ্য ও যুক্তি প্রদর্শন করে নিশ্চিত করেছেন যে, পরবর্তীকালে যে-দার্শনিক মতকে আমরা ন্যায়-বৈশেষিক নামে সনাক্ত করতে অভ্যস্ত, প্রাচীন কালে তাকেই 'যোগ' নামে অভিহিত করার প্রথা ছিলো। কৌটিল্যর রচনাতেও যোগ শব্দ এই প্রাচীন অর্থেই ব্যবহৃত। অতএব সিদ্ধান্ত

হয় যে, আন্বীক্ষিকী বা অনুমান-মূলক দর্শন বলতে শুধুমাত্র সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক অর্থে যোগ, এবং লোকায়ত।

এ-প্রসঙ্গে আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল যে লক্ষ্য– চার্বাক বা লোকায়ত মতে অনুমান-মাত্রই অগ্রাহ্য কিনা– 'অর্থশাস্ত্র'র উক্তি থেকে এর চূড়ান্ত উত্তর অনুসন্ধান। সে-ক্ষেত্রে চরম উত্তরটি হলো, অনুমান-মাত্রই অগ্রাহ্য করা তো দূরের কথা, 'অর্থশাস্ত্র'র মতে মাত্র তিনটি দর্শনমত অনুমান-মূলক বা আন্বীক্ষিকী বলে স্বীকার্য, তার মধ্যে একটি হলো লোকায়ত। অতএব লোকায়তিকেরা সব রকম অনুমানই অস্বীকার করেছেন– পরবর্তীকালের এ-জাতীয় কথার সঙ্গে প্রাচীন নজিরের মিল হয় না।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গে আরেকটি কৌতুহলের বিষয় হলো, কৌটিল্য শুধুমাত্র তিনটি মতকে প্রকৃত দর্শনের মর্যাদা দিয়েছেন, তার মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, পূর্ব-মীমাংসা এবং বেদান্তর মতো প্রভাবশালী দর্শনের উল্লেখ নেই কেন?
এ-প্রেক্ষিতে প্রখ্যাত বিদ্বান গবেষক জ্যাকবির অনুমান হলো, কৌটিল্য বা চাণক্যের মতো প্রখ্যাত ব্রাহ্মণের পক্ষে বৌদ্ধ ও জৈন মতকে প্রকৃত দার্শনিক মতের মর্যাদা না দেবারই কথা। কিন্তু দেবীপ্রসাদের মতে জ্যাকবির এই অনুমান সহজে মানা যায় না। কেননা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে কৌটিল্যর পক্ষে লোকায়তমতই সর্বপ্রথম অবজ্ঞা করার কথা এবং পূর্বমীমাংসা ও বেদান্তর মতো প্রভাবশালী মতের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রদর্শনই স্বাভাবিক। অতএব, জ্যাকবির মন্তব্য গ্রহণ না-করে বরং মনে করা যেতে পারে যে, কৌটিল্যের সময় বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রভাব তুলনায় সীমাবদ্ধ ছিলো; অন্তত প্রভাবশালী দার্শনিক হিসেবে কৌটিল্যপূর্ব কোনো প্রখ্যাত বৌদ্ধ বা জৈন মতের সমর্থক ঐতিহাসিকভাবে আবির্ভূত হননি– কিংবা হলেও তাঁদের কথা কৌটিল্যের জানা ছিলো না। তবে কেবল ধারণাগত মতাদর্শ থেকে বৌদ্ধ ও জৈন মতকে যাঁরা দার্শনিক প্রস্থান হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ করেছেন ভারতীয় দর্শনেতিহাসে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে কৌটিল্যর সময়কালের পরেই। মহারাজ অশোকের পর– অর্থাৎ কৌটিল্যর পরে– নাগার্জুনের মতো বৌদ্ধ বা উমাস্বাতির মতো প্রখ্যাত জৈন দার্শনিকদের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু কৌটিল্যের লেখায় পূর্বমীমাংসা ও বেদান্তের উল্লেখ নেই কেন? পূর্বমীমাংসার আকরগ্রন্থ জৈমিনির 'মীমাংসাসূত্র' এবং বেদান্তর আকরগ্রন্থ বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র'র রচনাকাল সংক্রান্ত সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত সম্ভব না-হলেও ভারতীয় দর্শন-জগতে এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক ('যোগ') এবং লোকায়ত দর্শনের পূর্ববর্তী। অতএব দার্শনিক মত হিসেবে শুধু এই তিনটি উল্লেখ করেও কৌটিল্য কেন পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত সম্বন্ধে নীরব? প্রশ্নটি নিশ্চয়ই উপেক্ষা করার মতো নয়। কিন্তু দেবীপ্রসাদের মতে, কৌটিল্যের পুরো উক্তির সঙ্গে পূর্বমীমাংসা ও বেদান্তদর্শনের মূল দাবি মিলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন নয়। কেননা–

‘পূর্বমীমাংসকদের মূল দাবি কোনো স্বতন্ত্র বা স্বাধীন দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নয়। তার বদলে পূর্বমীমাংসা বেদেরই কর্মকাণ্ডের রূপায়ণ। তেমনি বেদান্তও কোনো স্বাধীন দার্শনিক মত নয় : বেদেরই জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ-উক্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়সাধন। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, এই দুটি দর্শনের স্বীয় দাবিই হল, এগুলি বেদ ছাড়া আর কিছুই নয়– বেদেরই তাৎপর্য ব্যাখ্যা। অতএব, কৌটিল্য-উক্ত বিদ্যার তালিকায় ‘ত্রয়ী’ বা বেদ ছাড়াও দর্শন হিসাবে পূর্বমীমাংসা এবং বেদান্তের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন : উভয় দর্শনেরই সারাংশ ‘ত্রয়ী’-রই অন্তর্ভুক্ত।’- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৬১)

এখানে উল্লেখ্য, ‘অর্থশাস্ত্রে’ কৌটিল্যের বর্ণনায় প্রাচীনকালের মতাদর্শগত একটা বিতর্কেরও পরিচয় পাওয়া যায়। কৌটিল্যর স্বীয় মতে বিদ্যা বলতে চার রকম। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, প্রাচীনেরা সকলেই এ-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত নন। এ প্রসঙ্গে তিনি মতান্তরগুলিও উল্লেখ করেছেন। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, মানব বা মনু-র অনুগামীদের মত বর্ণনায় কৌটিল্য বলছেন, মনুর অনুগামীদের মতে বিদ্যা বলতে শুধুমাত্র তিনটি– ত্রয়ী, দণ্ডনীতি এবং বার্তা; আন্বীক্ষিকীকে স্বতন্ত্র বিদ্যা বলে মানার কোনো কারণ নেই, কেননা তা ত্রয়ীবিশেষই বা ত্রয়ীরই অন্তর্ভুক্ত।

তবে এখানে মনু নামে কৌটিল্য যাঁর উল্লেখ করেছেন তিনিই ‘মনুস্মৃতি’-কার কিনা– এ-বিষয়ে আধুনিক গবেষকদের মধ্যে কিছু বিতর্ক রয়েছে। কারো কারো মতে, এখানে ‘মানব’ বা মনুর অনুগামী বলতে ‘মনুস্মৃতি’র অনুগামীদের বোঝা যুক্তিযুক্ত হবে না। কেননা, ‘মনুস্মৃতি’তে আন্বীক্ষিকী (বা নামান্তরে হেতুবিদ্যা, তর্কবিদ্যা) অবজ্ঞা করার উপদেশ নেই; বরং স্বীকৃতিই চোখে পড়ে। যেমন–

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্ ।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ।। (মনুসংহিতা-৭/৪৩)।
অর্থাৎ : রাজা ত্রিবেদবেত্তা দ্বিজাতিদের কাছ থেকে ঋগ্-যজুঃ-সাম এই বেদত্রয় আয়ত্ত করবেন। পরম্পরাগত দণ্ডনীতি অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র– যা চিরকাল বিদ্যমান আছে এমন রাজনীতিশাস্ত্র– রাজনীতিবিদ ব্যক্তিদের কাছে অধ্যয়ন করবেন। আন্বীক্ষিকী বা তর্কশাস্ত্র এবং আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা এবং বার্তা অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যপশুপালনাদি জ্ঞান সেই সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কাছে শিক্ষা করবেন।

কিন্তু দেবীপ্রসাদের মতে এই মন্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা, ‘মনুস্মৃতি’-তে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, শ্রুতি (বেদ) এবং স্মৃতি (ধর্মশাস্ত্র) চরম প্রমাণ; এমনকি কোনো দ্বিজও যদি হেতুশাস্ত্র অবলম্বন করে শ্রুতি-স্মৃতিতে কোনো সংশয় প্রকাশ করে তাহলে ধার্মিক ব্যক্তিরা তাকে একেবারে দূর করে দেবেন। যেমন–

শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রস্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্মো হি নির্বভৌ।। (মনুসংহিতা-২/১০)।

অর্থাৎ : ‘বেদ’ বলতে ‘শ্রুতি’ বোঝায় এবং ‘ধর্মশাস্ত্রের’ নাম ‘স্মৃতি’। সকল বিষয়েই (অর্থাৎ সকল রকম বিধি-নিষেধের স্থানে) এই দুই শাস্ত্র বিরুদ্ধতর্কের দ্বারা মীমাংসার অতীত, কারণ, শ্রুতি ও স্মৃতি থেকেই ধর্ম স্বয়ং প্রকাশিত হয়েছে।

.

যোহবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভি র্বহিষ্কার্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।। (মনুসংহিতা-২/১১)।।
অর্থাৎ : যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্র অর্থাৎ অসৎ-তর্ককে অবলম্বন করে ধর্মের মূলস্বরূপ এই শাস্ত্রদ্বয়ের (শ্রুতি ও স্মৃতির) প্রাধান্য অস্বীকার করে (বা অনাদর করে), সাধু ব্যক্তিদের কর্তব্য হবে– তাকে সকল কর্তব্য কর্ম এবং সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা (অর্থাৎ অপাংক্তেয় করে রাখা)। কারণ, সেই ব্যক্তি বেদের নিন্দাকারী, অতএব নাস্তিক।

মনুর এই ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ কী? এমন মন্তব্য করা মনে হয় অস্বাভাবিক হবে না যে, হেতুশাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধাই মনুর মতে বেদনিন্দা বা নাস্তিকতার উৎস। কেননা মনুর মতে হেতুশাস্ত্রের কাজ হলো শ্রুতি ও স্মৃতিকে বেদবিহিতরূপে প্রমাণ ও ব্যাখ্যা করা। এ হৈতুক যে বেদ-সমালোচক নয় বরং বেদ বা শ্রুতিকে প্রমাণ গণ্য করা হেতুবিদ, তা বোঝা যায় মনুর অন্য শ্লোকে–

ধর্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ।। (মনুসংহিতা: ১২/১০৯)।।
অর্থাৎ : ব্রহ্মচর্যাদি ধর্মযুক্ত হয়ে যাঁরা ‘সপরিবৃংহণ বেদ’ অর্থাৎ বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ইতিহাস ও পুরাণাদির দ্বারা পরিপুষ্ট বেদশাস্ত্র বিধিপূর্বক আয়ত্ত করেছেন সেই ব্রাহ্মণকে শিষ্ট বলে বুঝতে হবে; শ্রুতিই তাঁদের নিকট প্রত্যক্ষস্বরূপ এবং হেতুস্বরূপ অর্থাৎ অনুমানাদি অন্যান্য প্রমাণস্বরূপ।

আর হেতুশাস্ত্রকে যারা বেদ-বিরোধী বা বেদের সমালোচনায় নিযুক্ত করেন, মনু হয়তো বলতে চান যে ওই হৈতুকরাই হেতুশাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান। সেইসব হৈতুকই মনুর মতে পরিত্যাজ্য। এ কারণেই মনুশাস্ত্রে এই বেদবিরোধী তর্কমূলক শাস্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা উচ্চারিত হয়–

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ।। (মনুসংহিতা-১২/৯৫)।।
অর্থাৎ : বেদবাহ্য অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ যে সব স্মৃতি আছে এবং যে সব শাস্ত্র কুদৃষ্টিমূলক অর্থাৎ অসৎ-তর্কযুক্ত মতবাদসমূহ যে শাস্ত্রে আছে, সেগুলি শেষ পর্যন্ত একেবারে প্রেত্য বা নিষ্ফল অর্থাৎ বৃথা বা অকিঞ্চিৎকর বলে প্রতিভাত হয় এবং সেগুলি তমোনিষ্ঠ বলে স্মৃত হয়ে থাকে।

তার মানে, শাস্ত্রবিশ্বাসে অবিচল থেকে শাস্ত্রকে হেতুস্বরূপ ব্যবহারে নিয়োজিত রাখাটাই মনুর

মতে অনুমোদিত হেতুশাস্ত্র। তাকে অশ্রদ্ধা দেখানো চলে না। অশ্রদ্ধা দেখিয়ে হেতুশাস্ত্রকে যারা তার বিপরীতে ব্যবহার করেন তারা হচ্ছেন নিন্দিত হৈতুক, হেতুশাস্ত্রপরায়ণ বা তার্কিক। কিন্তু কাদের মধ্যে এ-হেন হেতুশাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা? এর ব্যাখ্যায় মেধাতিথি, কুল্লুকভট্ট প্রমুখ টীকাকার চার্বাক প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। যেমন, মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথির মতে হৈতুক অর্থ হচ্ছে–

হৈতুকা নাস্তিকা নাস্তি পরলোকো, নাস্তি দত্তম্, নাস্তি হুতমিত্যেবং স্থিতপ্রজ্ঞাঃ।
অর্থাৎ : নাস্তিক অর্থাৎ যারা এই রকম দৃঢ়নিশ্চয় করে যে, পরলোক নেই, দানেরও কোনও ফল নেই, হোম করারও কোনও ফল নেই, তারাই হৈতুক।

আবার মনুসংহিতার অপর ভাষ্যকার কুল্লুকভট্টের মতে হৈতুক হলো–

হৈতুকা বেদবিরোধিতর্ক ব্যবহারিণঃ।
অর্থাৎ : হৈতুক হচ্ছে বেদবিরুদ্ধ তর্কপরায়ণ।

চার্বাকেরা যে বেদনিন্দক নাস্তিক ছিলেন, একথা অবশ্যই সুবিদিত। কিন্তু কুল্লুকভট্টর বাখ্যা স্বীকার করলে মানতে হয়, তার আসল কারণ চার্বাকদের হেতুশাস্ত্র-পরায়ণতা। আর অবশ্যই অনুমানকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে হেতুশাস্ত্র-পরায়ণতার কথা ওঠে না। অতএব, দেবীপ্রসাদের মতে, মনু ও কুল্লুকের কথা মানলে– চার্বাকেরা ঐকান্তিক অর্থে অনুমান অস্বীকার করেছেন– এজাতীয় মাধবাচার্য প্রভৃতির দাবির বিরুদ্ধে যায়।

অতএব, দেবীপ্রসাদ-প্রযুক্ত ‘মনুস্মৃতি’র এজাতীয় নজিরগুলি মনে রেখে ‘অর্থশাস্ত্রে’ কৌটিল্যর বক্তব্যের বিশ্লেষণ করা যাক। কৌটিল্য বলছেন, তাঁর স্বীয় মতে (রাজার শিক্ষণীয়) বিদ্যা বলতে চার রকম হলেও ‘মানব’ বা মনুর অনুগামীরা তা মানেন না; তাঁদের মতে আন্বীক্ষিকীর কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, তা ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে তাহলে কৌটিল্যের কথা এবং মনুর কথা কি এক হয়? কৌটিল্য আন্বীক্ষিকী বলতে স্বাধীন যুক্তিবিদ্যা বা তর্কবিদ্যার কথাই বলেছেন। কিন্তু ‘মনুস্মৃতি’র মতে কেবল আন্বীক্ষিকী অবশ্য পরিত্যাজ্য; শুধুমাত্র শাস্ত্রানুগামী– বা বেদান্ত অনুগামী– অর্থে আন্বীক্ষিকীর কিছুটা মূল্য আছে, কেননা তা আত্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা বোঝবার পক্ষে সহায়ক হতে পারে।
এবং আন্বীক্ষিকী অর্থে কৌটিল্য শুধুমাত্র যে-তিনটি দার্শনিক মত স্বীকার করেছেন তার মধ্যে লোকায়ত বলতে যে পরবর্তীকালের নামান্তরে চার্বাক দর্শনই বোঝায়, ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্য স্বীকার করলে তা বোধকরি অস্বীকার করা যায় না।

প্রমাণ প্রসঙ্গে অতঃপর চার্বাক-সিদ্ধান্ত

.

(১) প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে :

প্রমাণ বিষয়ক উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমাদের ধারণায় এটুকু স্পষ্ট হয়েছে যে, পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাকদর্শনের বর্ণনায় মাধবাচার্য প্রমুখ যদিও বলেছেন যে প্রমাণ হিসেবে চার্বাকেরা অনুমান প্রমাণ একেবারে বাতিল করে দিতে চেয়েছিলেন, তবু ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে একথা মেনে নেয়া সম্ভব নয়। কেননা, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, মাধবাচার্যের নিজের সম্প্রদায়ে (অর্থাৎ অদ্বৈত বেদান্তে) অবশ্যই সর্বপ্রমাণ বর্জনের– অতএব অনুমান বর্জনেরও– উপদেশ আছে। শঙ্করাচার্যের লেখা থেকে শ্রীহর্ষ ও তাঁর ব্যাখ্যাকারদের রচনায় সেকথা সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে এটাই হয়তো যৌক্তিক যে–

‘আসলে অনুমান খণ্ডনের প্রস্তাব মাধবাচার্য চার্বাকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাদের দার্শনিক মতকে খেলো প্রতিপন্ন করবার সহজ পথ বেছে নিয়েছেন : অনুমানই যদি কেউ না মানে তাহলে দর্শনের দরবারে তাকে কী করে স্থান দেওয়া যায়? প্রসঙ্গত, এ-জাতীয় যুক্তির জবাব দিয়েই শ্রীহর্ষ তাঁর প্রখ্যাত ‘খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য’ বই শুরু করেছেন; অর্থাৎ তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে শূন্যবাদী এবং মায়াবাদীরা সব রকম প্রমাণ অগ্রাহ্য করেও শূন্যবাদ ও মায়াবাদ প্রচারের অধিকারী ছিলেন।’- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৬৩)

কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনা অবশ্যই শূন্যবাদ বা মায়াবাদ নিয়ে নয়, প্রখর বস্তুবাদ নিয়ে– যে বস্তুবাদ লোকায়ত বা চার্বাক নামে ভারতীয় দর্শনে প্রসিদ্ধ। এবং বিভিন্ন নজির থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে প্রকৃত চার্বাকমতে প্রত্যক্ষ অবশ্যই প্রমাণজ্যেষ্ঠ– অর্থাৎ, প্রমাণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বা সবচেয়ে সেরা। কিন্তু প্রত্যক্ষ-অনুগামী ইহলোক প্রসঙ্গেও অনুমানকে প্রমাণ বলে মানায় বাধা নেই। কেবল পরলোক, কর্মফল, আত্মা প্রভৃতি একান্ত অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান নিষ্ফল– কেননা একদল ধূর্ত এজাতীয় বিষয়ে অনুমান প্রমাণ দেখাবার চেষ্টা করে লোক ঠকাবার আয়োজন করে।

এই যদি চার্বাকদের প্রকৃত অভিপ্রেত মত হয় তাহলে সাধারণত মতটিকে অধ্যাত্মবাদীদের কর্তৃক যতটা খেলো করে প্রচার করার চেষ্টা চোখে পড়ে তা মূলতই বিরূপ-প্রচারের সামিল হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, বিশেষত আমাদের দেশে শ্রুতি-স্মৃতির দোহাই পাড়ার প্রয়োজন এমনই প্রবল হয়েছিলো যে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের গুরুত্ব নেহাতই গৌণ বা অনেকাংশে অবান্তর বলেই বিবেচিত হবার আশঙ্কা দেখা গিয়েছিলো এবং এমন একটা ধারণা চালু হয়েছিলো যে আমাদের সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যই বুঝি ঋষিদের ধ্যানলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অধ্যাত্মবিদ্যা– যার সঙ্গে চোখে দেখা মাটির পৃথিবীর বড় একটা সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ছাড়া প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রথম ধাপই সম্ভব হয় না। অর্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষকে প্রমাণের জ্যেষ্ঠত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব না মেনে তা সম্ভবই নয়।

যেহেতু আমাদের আলোচনার নজিরগুলি ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যকে কেন্দ্র করে যুক্তিবিস্তৃত হচ্ছে, বিজ্ঞান-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেরকম নজির উপস্থাপন করা যায় কিনা দেখা যেতে পারে। এ-প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদ তাঁর 'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৬৫) সুপ্রাচীন কালের শল্যবিদ্যর আকরগ্রন্থ 'সুশ্রুত-সংহিতা'র নজির টেনে বলছেন, 'সুশ্রুত-সংহিতা'-তেও প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিপাদন করা হয়েছে; এই কারণেই সুশ্রুত-মতে শবব্যবচ্ছেদ না করে প্রকৃত ভিষক্ হওয়া সম্ভব নয়। এ-প্রসঙ্গে তিনি 'সুশ্রুত-সংহিতা'র প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

'ত্বক্ পর্যন্ত সমস্ত দেহের যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উক্ত হইয়াছে, শল্যজ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার কোন অঙ্গ বর্ণন করিতে পারা যায় না। অতএব শল্যাপহর্তা যদি নিঃসংশয় (সন্দেহরহিত) জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে একটি মৃতদেহকে শোধন করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল সম্যক্রূপে দর্শন করা তাঁহার কর্তব্য। যাহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয় এবং যাহা শাস্ত্রে দেখা যায় তদুভয়ই উভয় বিষয়ে সহজে অধিকতর জ্ঞান বর্ধন করিয়া থাকে।।'

'অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দর্শনার্থে যেরূপ শব গৃহীত হইবে, তাহাই বলা যাইতেছে। শবটির যেন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে, তাহা যেন বিষোপহত না হয়, দীর্ঘকাল ব্যাধিপীড়িত না হইয়া থাকে, শতবৎসর বয়স্কের দেহ না হয়। এনরূপ শবের অন্তঃপুরীষ নিষ্কাশিত করিয়া কোন নির্জন প্রদেশে তাহা একটি স্রোতহীন জলাশয়ে পচাইবে। মৎস্যাদিতে ভক্ষণ করিতে না পারে এবং অন্য কোথাও সরিয়া না যায়, এইজন্য এই জলাশয়ের জলের মধ্যে একটি মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর ঐ শবকে রাখিতে হইবে, এবং মুঞ্জ বল্কল কুশ ও শণাদি রজ্জুর কোন রজ্জু-দ্বারা তাহার সর্বাবয়ব বেষ্টন করিয়া বাঁধিতে হইবে। সাতদিনের মধ্যেই উহা সম্যক পচিবে, তখন উহাকে তুলিয়া বেণারমূল, চুল, বাঁশের চেয়াড়ী বা কুঁচী দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিয়া ত্বগাদি সমস্তই অর্থাৎ যথোক্ত বাহ্যাভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিবে।।'

…'যিনি শবচ্ছেদ দ্বারা শরীরের বাহ্যাভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রে তৎসমস্ত অবগত হইয়াছেন, তিনিই আয়ুর্বেদবিশারদ। প্রত্যক্ষদৃষ্ট এবং শাস্ত্রশ্রুত বিষয় দ্বারা সন্দেহ নিরাকরণপূর্বক তিনি চিকিৎসা করিয়া থাকেন।'- (দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর তর্জমা। শারীরস্থান, পঞ্চম অধ্যায়)

পাঠক হয়তো এখানে সরাসরি ব্যবহারিক জ্ঞানের উপদেশ দেখে ভাবতে পারেন যে দার্শনিক উপপত্তি কোথায়? কিন্তু উল্লেখ্য, তৎকালীন প্রথা হিসেবেই প্রাচীন গ্রন্থগুলিতেও প্রাসঙ্গিক দর্শনালাপের খুব একটা কমতি দেখা যায় না কোথাও। এক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের আকরগ্রন্থ– 'চরক-সংহিতা' এবং 'সুশ্রুত-সংহিতা'য়– প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের উপর চরম গুরুত্ব অর্পণের অজস্র নজির রয়েছে। তার দীর্ঘ তালিকায় না গিয়ে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

আয়ুর্বেদ-মতে অম্বষ্ঠ নামের একজাতীয় ফল আমাশয় জাতীয় রোগের চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রসূ, কেননা বহু দৃষ্টান্তেই দেখা গেছে যে তা খেলে কোষ্ঠ বদ্ধ হয়। আয়ুর্বেদ-মতে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতেই অম্বষ্ঠ জাতীয় ফলের এই উপযোগিতা স্বীকার্য। এবং প্রত্যক্ষের

উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই একই ফলের বিপরীত গুণাগুণ হাজার যুক্তিতর্ক দিয়েও প্রমাণ করা অসম্ভব। তাই ‘সুশ্রুত-সংহিতা’য় বলা হয়েছে–

‘প্রত্যক্ষলক্ষণফলাঃ প্রসিদ্ধাঃ চ স্বভাবতঃ।
নৌষধীর্হেতুভির্বিদ্বান্ পরীক্ষেত কথঞ্চন।।
সহস্রেণাপি হেতুনাং ন অম্বষ্ঠাদির্বিরেচয়েৎ।
তস্মাত্তিষ্ঠেত্তু মতিমানাগমে ন তু হেতুষু।।’ (সুশ্রুতসংহিতা-১/৪১/২৩-২৪)
অর্থাৎ :
সংক্ষেপে, প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ বিষয়কে শুধুমাত্র হেতু বা যুক্তি দিয়ে বিচার করতে যাওয়া বিদ্বানের লক্ষণ নয়। যেমন, সহস্র হেতু প্রয়োগ করেও প্রমাণ করা যাবে না যে অম্বষ্ঠ জাতীয় ফল বিরেচনের কারণ হতে পারে।

এখানে প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে বলে তার মানে অবশ্যই এই নয় যে, আয়ুর্বেদে যুক্তিতর্কের– এবং সাধারণভাবে অনুমানের– গুরুত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। ‘চরক-সংহিতা’ গ্রন্থে অনুমান নিয়ে এতো দীর্ঘবিস্তৃত আলোচনা আছে যে, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে এমনকি ন্যায়দর্শনের উৎস-সন্ধানে শেষ পর্যন্ত এই আলোচনায় উপনীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বক্তব্য যে অমূলক নয় তা আরেকটু পরেই আমরা দেখবো। তবে আয়ুর্বেদের অভিপ্রেত মত এই যে যুক্তিতর্ক এবং অনুমানের গুরুত্ব যতই হোক না কেন, তা প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ হলে বস্তুত অচল হয়ে যাবে। এবং এই দাবিও ন্যায়দর্শনের কথাই মনে করিয়ে দেয়, কেননা, ইতঃপূর্বেই আমরা দেখেছি, ‘ন্যায়-সূত্রে’র ভাষ্যে বাৎসায়নও দেখাতে চেয়েছেন যে প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অনুমানের মূল্য স্বীকার করা যায় না। সংক্ষেপে, ন্যায়দর্শনের মতোই আয়ুর্বেদ-মতেও প্রত্যক্ষই প্রমাণজ্যেষ্ঠ– অর্থাৎ, প্রমাণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে বলে রাখা আবশ্যক, চার্বাক আলোচনায় এই আয়ুর্বেদকে টেনে আনার কারণ আর কিছু নয়, চার্বাকদের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানের একটা বড় হাতিয়ার হলো তাদের প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা, এবং চার্বাকমতকে একেবারে খেলো প্রতিপন্ন করবার উৎসাহেই মনে হয় কথাটাকে বিকৃত করে বলা হয়েছে যে, চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ; এমনকি সাধারণ লোকব্যবহারসিদ্ধ অনুমানকেও প্রমাণের মর্যাদা দিতে চার্বাকেরা নারাজ। কিন্তু আমরা বিভিন্ন নজির থেকে অনুধাবন করতে পেরেছি, এই দ্বিতীয় কথাটি স্বীকার করা যায় না– অর্থাৎ, চার্বাকেরা একেবারে ঐকান্তিক অর্থে অনুমান অগ্রাহ্য করেননি। চার্বাক-মতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ; তবুও প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ বিষয়ে সাধারণ লৌকিক অনুমান মানায় তাঁদেরও আপত্তি ছিলো না। কিন্তু তা স্বীকার করলেও মানতে হবে, চার্বাকেরা অবশ্যই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।
অথচ চার্বাক-বিরোধীদের মন্তব্য হলো, চার্বাকদের এই প্রত্যক্ষ-বিহ্বলতা স্বাভাবিক এবং এর থেকেই বোঝা যায় মতটা আসলে অত্যন্ত অসার। ইন্দ্রিয়লব্ধ সুখভোগের প্রতিই যাদের অমন টান– যাদের মনের মতো কথা শুধু এই যে খাও-দাও-ফূর্তি করো– তারা প্রত্যক্ষলব্ধ

জ্ঞান ছাড়া আর কীই বা মানতে পারে?–

‘যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।’ (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : (লোকায়ত মতে) যতদিন বেঁচে আছ সুখে বাঁচার চেষ্টা কর, ধার করেও ঘি খাবার ব্যবস্থা কর। লাশ পুড়ে যাবার পর আবার কেমন করে ফিরে আসবে?

এর উত্তরে অনেক আধুনিক বিদ্বান গবেষকই দেখার চেষ্টা করেছেন যে, পরলোকের কাল্পনিক সুখের আশায় ইহলোকের বাস্তব সুখের প্রতি বিরাগ চার্বাকমতে অবশ্যই বেকুবের কথা। প্রত্যক্ষলব্ধ ইহকালের কথা ছেড়ে অপ্রত্যক্ষ পরকালের কল্পনাও তাইই। তবু এই নজির থেকে– অর্থাৎ চার্বাকের প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা থেকে– দার্শনিক মত হিসেবে নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন হয় না। বরং, চার্বাকের প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা একদিক থেকে দার্শনিক উৎকর্ষেরই পরিচায়ক। কেননা, প্রত্যক্ষ-পরায়ণতাই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি। এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদের কাল থেকে মধ্যযুগের রসায়নবিদ্যা পর্যন্ত প্রকৃতি-বিজ্ঞানের যতটুকু উৎকর্ষ তার মূলেও এই প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা। প্রত্যক্ষকেই প্রমাণজ্যেষ্ঠ বা প্রমাণশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার না করে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এদিক থেকে বলা যায়, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অন্যান্য দার্শনিক মতের তুলনায় চার্বাকমতই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিশেষ সহায়ক ছিলো। অতএব, চার্বাকমতের আলোচনায় ভারতীয় প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য অবান্তর নয়; পক্ষান্তরে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলেই দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন।

.

(২) অনুমান প্রসঙ্গে :

প্রত্যক্ষকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হলেও অবশ্যই নিছক প্রত্যক্ষ বা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষর উপর নির্ভর করেও প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনুমানের উপরও নির্ভর করা প্রয়োজন। আয়ুর্বেদের গ্রন্থেই তার ভূরিভূরি নিদর্শন রয়েছে। ফলে অনুমানের আলোচনাও আছে। ইতঃপূর্বে আমরা অন্বীক্ষা বা অনুমান শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি– অনু+ঈক্ষা হলো অন্বীক্ষা, বা অনু+মান হলো অনুমান। সহজ কথায়, পরবর্তী জ্ঞান– অর্থাৎ, অন্য কোনো জ্ঞানের অনুগামী জ্ঞান। কিন্তু কিসের পরবর্তী? প্রত্যক্ষ জ্ঞানের। মোদ্দা কথায়, কোনো পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষর উপর নির্ভরশীল আরেক রকম জ্ঞান হলো অনুমান। আয়ুর্বেদের আকর-গ্রন্থ ‘চরক-সংহিতা’য়ও কথাটা খুবই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে–

‘প্রত্যক্ষ-পূর্বং ত্রিবিধং ত্রিকালং চ অনুমীয়তে।
বহ্নিঃ নিগূঢ়ঃ ধূমেন মৈথুনং গর্ভদর্শনাৎ।।
এবং ব্যবস্যন্তী অ্তীতং বীজাৎ ফলম্ অনাগতম্ ।
দৃষ্টা বীজাৎ ফলং জাতম্ ইহ এব সদৃশং বুধৈঃ।।’ (চরকসংহিতা-১/১১/২১-২২)
অর্থাৎ :
যাহা প্রত্যক্ষপূর্ব, ত্রিবিধ এবং তিন কালেই অনুমেয় হয়, তাহাকে অনুমান বলে। অনুমান

প্রত্যক্ষ-পূর্ব, অর্থাৎ পূর্বে যাহার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, তৎসম্বন্ধেই অনুমান করা যায়। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমান কখনই হইতে পারে না। অনুমান তিন প্রকার বলাতে কারণ-অনুমান, কার্য-অনুমান ও সামান্যদৃষ্ট-অনুমান বুঝায়। অনুমানের গতি যে বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ– এই তিন কালেই হইয়া থাকে তৎপক্ষে দৃষ্টান্ত যথা : ধূম দ্বারা বর্তমান বহ্নির অনুমান, গর্ভ দেখিয়া অতীত মৈথুনের অনুমান হয় এবং বীজ দেখিয়া সেই বীজে একবার যেরূপ বৃক্ষ ফলিয়াছিল, এবারেও তৎসদৃশ ফল ফলিবেক, এইরূপ ভবিষ্যৎ অনুমান করা যায়। (কবিরাজ সতীশচন্দ্র শর্মা কবিভূষণের তর্জমা)।

এই শ্লোকের উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো, 'চরক-সংহিতা'য় ত্রিবিধ অনুমানের কথা বলা হয়েছে– বর্তমান ধূম দেখে বর্তমান অগ্নির অনুমান, বর্তমান গর্ভ দেখে অতীত মৈথুনের অনুমান এবং বর্তমান বীজ দেখে ভবিষ্যৎ বৃক্ষ ও ফলের অনুমান। কিন্তু এই তিন রকম অনুমানেরই মূল শর্ত হলো পূর্ব-প্রত্যক্ষ। এই কারণে অনুমান প্রসঙ্গে প্রথম কথাই হলো 'প্রত্যক্ষ-পূর্ব'। প্রথমে প্রত্যক্ষ; এবং সেই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করেই অনুমান। বলাই বাহুল্য, এই মতে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান জ্ঞানের কোনো স্থান নেই; অতএব আত্মা, কর্মফল, পরকাল, পরলোক প্রভৃতি প্রসঙ্গে অনুমান অবান্তর হবে, কেননা এ-জাতীয় বিষয়ে কোনো পূর্ব-প্রত্যক্ষর সুযোগই নেই।

এ প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–
'অধুনালভ্য 'চরক-সংহিতা'য় আত্মা, পরলোক প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা চোখে পড়ে। কিন্তু তার নজির থেকে আমাদের বর্তমান যুক্তি অগ্রাহ্য করা যায়।... আত্মা, পরলোক, প্রভৃতি আলোচনার সঙ্গে আয়ুর্বেদের প্রকৃত সারাংশের কোনো বাস্তব সম্পর্ক নেই। আসলে প্রকৃত চিকিৎসাবিদ্যার সমর্থনে আয়ুর্বেদ-বিদেরা গোমাংসাদি ভক্ষণ জাতীয় এমন অনেক কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, যা ধর্মশাস্ত্রকারদের– অর্থাৎ সুপ্রাচীন আইনকর্তাদের– বিধান-বিরুদ্ধ। এই কারণে ধর্মশাস্ত্রকারেরা চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিদ্যার তীব্র নিন্দা করেছেন। ফলে, আইনকর্তাদের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণের আশায় অধুনালভ্য 'চরক-সংহিতা' এবং 'সুশ্রুত-সংহিতা'য় এমন অনেক আলোচনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে যার সঙ্গে আয়ুর্বেদের সারাংশর প্রকৃত সম্পর্ক না থাকলেও অন্তত আপাতদৃষ্টিতে আয়ুর্বেদের উপর ধর্মশাস্ত্র আনুগত্যের এক রকম যেন মুখোশ পরানো যায়। কে বা কারা এই আয়োজন করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই; শুধু এইটুকু জানা আছে যে দীর্ঘযুগ ধরে অনেকের হাত ঘুরে– অনেক অবান্তর কথা সংযোজিত হয়ে– 'চরক-সংহিতা' ও 'সুশ্রুত-সংহিতা'য় বর্তমান সংস্করণ আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অতএব পরবর্তী সংস্কারক ও সম্পাদকদের পক্ষে আত্মাদি বিষয়ে আলোচনা সংযোজনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মোট কথা, অনুমানের লক্ষণ ও তার ত্রিবিধ দৃষ্টান্ত থেকে যে-উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে সেই উক্তি অনুসারে একান্ত অপ্রত্যক্ষ আত্মা, পরলোক প্রভৃতি বিষয়ে আয়ুর্বেদ-মতে অনুমানের সুযোগ নেই।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৬৯)

আমরাও ইতঃপূর্বে দেখেছি, বহু প্রাসঙ্গিক নজির থেকে মনে করা যেতে পারে যে অনুমান প্রসঙ্গে চার্বাকদেরও আসল বক্তব্য মোটের উপর একই রকম হওয়া সম্ভব। প্রত্যক্ষ-অনুগামী লৌকিক বিষয়ে অনুমান চার্বাকেরাও অগ্রাহ্য করেন নি। অতএব এদিক থেকেও বলা যায়, বহু বিরূপ-প্রচারণা সত্ত্বেও চার্বাকমতকে একেবারে খেলো মনে করার কারণ নেই। পক্ষান্তরে ভারতীয় প্রকৃতিবিজ্ঞানের মূল ভিত্তির সঙ্গে চার্বাকমতের অন্তত অনেকাংশে আত্মীয়তা চোখে পড়ে।

এখানে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর সেই চিত্তাকর্ষক মন্তব্যটি স্মর্তব্য– ন্যায়-দর্শনের উৎস সন্ধানে আমাদের পক্ষে 'চরক-সংহিতা'য় ফিরে যাবার সম্ভাবনা; অর্থাৎ আয়ুর্বেদ-এর আকরগ্রন্থে প্রমাণ প্রসঙ্গে যে আলোচনা আছে তাই কালক্রমে ন্যায়দর্শনের রূপ গ্রহণ করেছিলো। দাশগুপ্তের এই মন্তব্য সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য কিনা তা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু এ-কথাটি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক যে, 'ন্যায়সূত্র'-তে অনুমান প্রসঙ্গে প্রায় হুবহু একই কথা বলা হয়েছে। প্রত্যক্ষর আলোচনার পরেই 'ন্যায়সূত্র'কার বলছেন–

'অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ববৎ শেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঃ চ'। (ন্যায়সূত্র-১/১/৫)।।
অর্থাৎ : অনন্তর, অর্থাৎ প্রত্যক্ষনিরূপণের অনন্তর অনুমান (নিরূপণ করিতেছি)। তৎপূর্বক, অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিশেষমূলক জ্ঞান অনুমান প্রমাণ ত্রিবিধ– পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট।

ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় সূত্রটির ব্যাখ্যা অল্পবিস্তর কঠিন মনে হলেও মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ তাঁর 'ন্যায়দর্শন' গ্রন্থে সূত্রটির যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন।– 'ন্যায়সূত্র'র আলোচ্য সূত্রটির সরল অর্থ হলো, অনুমান বলতে বোঝায় 'প্রত্যক্ষ-পূর্বক'। অর্থাৎ আগেকার কোনো প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল প্রমাণ, তা তিন রকম– পূর্ববৎ (অর্থাৎ বর্তমান কারণের প্রত্যক্ষ থেকে ভাবী কার্যর অনুমান; যেমন মেঘ দেখে অনুমান হয় বৃষ্টি হবে), শেষবৎ (অর্থাৎ কার্য থেকে কারণ অনুমান; যেমন নদীর জলস্ফীতি প্রভৃতি দেখে অনুমান হয় অতীতে বৃষ্টি হয়েছিলো), এবং সামান্যতোদৃষ্ট (যেমন কোনো বস্তুর স্থানান্তরপ্রাপ্তি থেকে তার গতি অনুমান; সূর্যের গতি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয়, কিন্তু আকাশে সূর্যের স্থানান্তরপ্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করে অনুমান হয় তার গতি আছে)।

'ন্যায়সূত্র'র সরল অর্থ অনুসারে অনুমান প্রমাণ প্রত্যক্ষ-নির্ভর। অর্থাৎ, আগে প্রত্যক্ষ এবং সেই প্রত্যক্ষর উপর নির্ভর করেই অনুমান। শেষ কথায় ফণিভূষণ যেমন বলেছেন, 'প্রত্যক্ষের জ্ঞান ব্যতীত অনুমানের জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং ঐ জ্ঞানদ্বয়ের কার্য-কারণ ভাব আছে।'- (ন্যায়দর্শন-১/১৩১)।
অনুমান প্রসঙ্গে এই কথাই যদি ন্যায়দর্শনের সারাংশ হয় তাহলে চার্বাকমতের সারাংশের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায় এবং কতোখানি? চার্বাক কোনো অর্থেই অনুমান মানতেন না– একথা চার্বাকদের বিরুদ্ধে বিকৃত-প্রচারণা হওয়াই স্বাভাবিক। বরং আমরা দেখেছি যে,

প্রত্যক্ষগোচর ইহলৌকিক বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ অনুমান স্বীকার করা চার্বাকমতসম্মত হওয়াই স্বাভাবিক।

অতএব, বহু প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, প্রমাণ প্রসঙ্গে চার্বাকদের সিদ্ধান্ত হলো, চার্বাক-মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে শ্রেষ্ঠ; পারলৌকিক বিষয়ে অনুমানকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেও প্রত্যক্ষগোচর– বা প্রত্যক্ষ-অনুগামী– লৌকিক অনুমান স্বীকার করায় চার্বাকদের আপত্তি ছিলো না।

২.০ : দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদ

চার্বাকেতর দর্শন সম্প্রদায়গুলির পরবর্তীকালের প্রায় সকল দার্শনিকেরাই চার্বাকমত হিসেবে প্রচারিত প্রধানত দুটি দাবি খণ্ডন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। এই প্রধান দুটি চার্বাক-মত হলো–

এক : প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। অতএব অনুমানের কোনো প্রামাণ্য নেই।

দুই : দেহাত্মবাদ। অর্থাৎ দেহ ভিন্ন আত্মা বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই। আত্মা বলে একান্তই যদি কোনো শব্দ ব্যবহার করতে হয় তাহলে এই দেহকেই আত্মা বলে মানতে হয়।

ইতোমধ্যে প্রথম দাবির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রাপ্ত যুক্তি-তথ্য অনুসারে দৃঢ়ভাবে মনে হয়েছে যে, প্রকৃত চার্বাকমতের সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক মতের এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্রের আকরগ্রন্থ 'চরক-সংহিতা'য় স্বীকৃত বিজ্ঞানের খুব একটা তফাৎ থাকে না। বরং চার্বাক-প্রতিপক্ষরা চার্বাকদের প্রত্যক্ষ-সংক্রান্ত আরোপিত যে-কোন দাবিকে প্রতিষ্ঠার যত চেষ্টাই করুন না কেন সেগুলিকে অতিরঞ্জিত বিকৃত-প্রয়াস বলেই মনে হয়। বর্তমান আলোচনা চার্বাক-সংক্রান্ত দ্বিতীয় দাবি দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গে।

মূলত যে বৈশিষ্ট্য চার্বাক-দর্শনকে ভারতীয় অন্যান্য দর্শন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রেখেছে তাকে দেহাত্মবাদ বা ভূত-চৈতন্যবাদ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়ে থাকে। চার্বাক-অনুমোদিত বস্তুজগতের উপাদান চার তত্ত্ব সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে কিছু আলোচনা হয়েছে এবং এই মৌল উপাদানের সংখ্যা সম্বন্ধে ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের স্বীকৃতির সঙ্গে চার্বাকী ধারণার পার্থক্যও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই তত্ত্বগুলি চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শনে মহাভূত সংজ্ঞায় পরিচিত এবং অন্যান্য বহু তত্ত্ব বা বিষয়ের মধ্যে স্থূলতম হিসেবে পরিগণিত। ভারতীয় অন্যান্য দর্শনে অনুমোদিত তত্ত্বগুলির পরিচয় এবং সংখ্যা দর্শন ভেদে বিভিন্ন। চার্বাক দর্শনের বর্ণনা প্রসঙ্গে সেগুলির খুঁটিনাটি বিবরণের প্রয়োজন নেই। সে যাক, এই স্থূল বস্তুজগত ভারতীয় মতে মহাভূতের সমবায়ে গঠিত এবং এ বিষয়ে চার্বাক মতও ভারতীয় সাধারণ ধারণার সমধর্মী বলে হয়। তবে যেটুকু প্রভেদ তাতেই চার্বাকের সাথে অন্যান্য দর্শনগুলির সাথে বিশাল এক মৌলিক ব্যবধান তৈরি করে দিয়েছে। পঞ্চমহাভূত প্রসঙ্গে ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে–

'পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশমিতি ভূতানি'। (ন্যায়সূত্র-১/১/১৩)
অর্থাৎ : ক্ষিতি বা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চদ্রব্য ভূতবর্গ।

'বৈশেষিকের দৃষ্টিতে ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ্ (জল), তেজ (আলোও উত্তাপের মূল উৎস), মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম (আকাশ) এই পাঁচটি পঞ্চমহাভূত নামে প্রসিদ্ধ। পঞ্চমহাভূত বৈশেষিক মতে নয়টি দ্রব্যের অন্তর্গত। বৈশেষিক মতে দ্রব্য আর ইংরেজি ম্যাটার এক কথা নয়। 'দ্রব্য' শব্দটির অর্থ এর চেয়ে ব্যাপক। কারণ বৈশেষিক মতে আত্মা, মন, কাল এবং দিক দ্রব্যের অন্তর্গত। 'দ্রব্য' মানে ইংরেজিতে সাবস্ট্যান্স, অর্থাৎ যার কোনো না কোনো গুণ

আছে। বৈশেষিক মতে দ্রব্যও আবার মূল ছয়টি পদার্থের (দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সমবায় ও বিশেষ) অন্তর্গত। এখানে পদার্থ মানে 'রিয়ালিটি'– মৌলিকতম বস্তু অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে। সেজন্য বৈশেষিক দর্শনকে ষটপদার্থবাদী বলা হয়। নয়টি দ্রব্যের মধ্যে প্রথম চারটি (ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ ও মরুৎ) সূক্ষ্মতম বস্তুকণা (পরমাণু) দিয়ে গঠিত এবং বস্তুজগতের মূল উপাদান পরমাণু। এজন্য বৈশেষিক দর্শনকে পরমাণুবাদী বলা হয়।'– (হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়,চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-২৭)।

কিন্তু চার্বাক মতে ক্ষিতি, অপ্‌ তেজ ও মরুৎ এই চারটিই হলো মূল বস্তু যা বিশ্বজগতের উপাদান। যেমন–
তত্র পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি। (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : এই চার্বাকমতে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু– এই চারটি ভূতই চারটি তত্ত্ব।
বার্হস্পত্য-সূত্রেও বলা হয়েছে–
পৃথিব্যপতেজো বায়ুরিতি তত্ত্বানি। (বার্হস্পত্যসূত্র-১)
অর্থাৎ : পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু– এই চারটিই তত্ত্ব।

চার্বাক-স্বীকৃত এই চার মহাভূতের উপাদানে যে বস্তুজগতের সৃষ্টি, সেই জগতের জ্ঞান প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সাক্ষাৎভাবে হওয়া সম্ভব এবং সেইজন্যই চার্বাক দর্শনে এই ভৌতিক জগতের অনুমোদন আছে। অন্যরা এই চার রকম ভূতপদার্থ ছাড়াও আকাশ নামে যে পঞ্চম এক ভূতপদার্থ স্বীকার করার প্রস্তাব করেছেন, কেন করেছেন, সে-কথা বেশ জটিল। সে-প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনার বিবেচ্য নয়। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে, চার্বাকেরা আকাশ স্বীকার করেন না, কেননা আকাশের প্রত্যক্ষ হয় না এবং চার্বাকমতে যার প্রত্যক্ষ হয় না তা যথার্থ নয়।
আবার আকাশের জ্ঞান অনুমানের দ্বারা হয়ে থাকে। আমরা শব্দ শুনি। এই শব্দ গুণ বলে কোন দ্রব্যে অবশ্যই থাকবে। এই শব্দ পৃথিবী, জল, তেজের গুণ নয়, কেননা তাদের গুণ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন। সেকারণে কোন কোন মতে, আকাশকে শব্দগুণের আশ্রয় দ্রব্য মনে করা হয়। কিন্তু চার্বাক সাধারণভাবে অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না বলে চার্বাকমতে আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না।

'আকাশকে চার্বাকগণ ভূতবৈরল্যের অতিরিক্ত কিছু মনে করেন না। 'ভূতবৈরল্যে'র অর্থ ভৌতিক কণার বিরলতা। এই কথার তাৎপর্য যেখানে ভৌতিক কণার ঘনীভাব হয় না সেখানে আকাশের প্রতীতি হয় না। আকাশ বিষয়ক দু'টি বস্তুর প্রতীতি হয়। ১. একটি ভৌতিক কণার অভাব, ২. অন্যটি তার বৈরল্য অর্থাৎ তার বিরলতা। প্রথম পক্ষটি সঙ্গত নয়, কেননা ভৌতিক কণার অভাব স্বীকার করা কোনভাবে যুক্তিযুক্ত নয়। ফলে ভৌতিক কণার বিরলতা স্বীকার করতে হয়। চার্বাকগণের এক সম্প্রদায় অবশ্য অন্যান্য দার্শনিকের মত আকাশকে একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব বলে স্বীকার করেন। কিন্তু পণ্ডিতেরা এই মতে আস্থাশীল

নন। একারণে চার্বাকের নিজের বিশেষ মত হচ্ছে যে, মূল জগতে চারটি তত্ত্ব বর্তমান, পঞ্চম তত্ত্ব স্বীকার্য নয়। অনুরূপভাবে অন্য দার্শনিকদের স্বীকৃত দিক্, কাল, মন প্রভৃতি পদার্থের স্বতন্ত্র সত্তা চার্বাকগণ স্বীকার করেন না।'– (ড. বিশ্বরূপ সাহা, নাস্তিকদর্শনপরিচয়ঃ, পৃষ্ঠা-১৭)।

একইভাবে চার্বাকেরা আত্মা মানেন না। উল্লেখ্য, যেকোন দার্শনিক আলোচনারই একটি উদ্দেশ্য ও সামাজিক তাৎপর্য থাকে। চার্বাকমত আলোচনার ক্ষেত্রেও আমাদেরকে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, চার্বাকদর্শনের সামাজিক তাৎপর্যের সঙ্গে চার্বাকের দার্শনিক চিন্তা সংগতিপূর্ণ। ঈশ্বর, বস্তুনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র চৈতন্য (আত্মা), পরলোক, জন্মান্তর, পূর্বজন্মের কর্মফল, অদৃষ্ট, পারলৌকিক মুক্তি, স্বর্গসুখের আশ্বাস ইত্যাদি কল্পনাবাহুল্যের নিপীড়ন থেকে মানবচেতনাকে ভারমুক্ত করে মানবকেন্দ্রিক ধ্যানধারণা গড়ে তোলাই ছিলো চার্বাকমতের উদ্দেশ্য। অতএব, চার্বাকমতে নিছক ভূপদার্থ দিয়ে গড়া আমাদের দেহ ছাড়া আত্মা বলে আর কিছু মানবার কোনো কারণ নেই।

আমরা ইতঃপূর্বে ভিন্ন অধ্যায়ে অধ্যাত্ম দর্শনগুলিতে আত্মার ধারণা আমদানির ঔপনিষদিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু দর্শনক্ষেত্রে কেবল শ্রুতিপ্রমাণকে সম্বল করে দর্শনতত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যেকোন তত্ত্বের পক্ষে একটি দার্শনিক যুক্তির ভিত্তি রচনার প্রয়োজন হয়। আত্মা বা আত্মতত্ত্বও এর ব্যতিক্রম নয়। এর দার্শনিক ব্যাখ্যা কী?
'অন্যান্য বস্তুর মতো প্রাণীদেহও ভৌতিক উপাদানে গঠিত এবং সহজেই প্রত্যক্ষযোগ্য। কিন্তু প্রাণী সংজ্ঞায় ভৌতিক প্রাণীদেহ ছাড়া আরও কিছু অভিব্যক্ত হয়, যা প্রাণীজগতের অন্যতম মানুষ হিসাবে 'আমি' এই অনুভূতির মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়তই অনুভব করি। 'আমি' এই অনুভূতির বিকাশ সচেতনতা বা চৈতন্যের পটভূমিতে এবং এই সচেতন 'আমি'কে কেন্দ্র করেই মানুষ বা যে কোন জীবের বৈশিষ্ট্য। এই সচেতন 'আমি'র নানাভাবে বিচিত্র প্রকাশ দেহের মাধ্যমে, যার ফলে ভৌতিক উপাদানে গঠিত হয়েও জীবদেহ স্বকীয় বিশেষত্বে মণ্ডিত এবং অন্য নানা ভৌতিক বস্তুর সঙ্গে এর প্রভেদ সহজেই বোঝা যায়। এই সচেতন 'আমি'র নিজস্ব রূপ হিসাবে ভারতের অধ্যাত্মদর্শনে ভৌতিক জীবদেহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অপর একটি তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করেছে। জীবদেহে নিবদ্ধ এই তত্ত্বের নাম ভারতীয় দর্শনে জীবাত্মা, যা শুদ্ধ আত্মস্বরূপের এক বিশেষ বা সংসারদশায় আবদ্ধ রূপ। এই জীবাত্মা প্রাক্তন কর্মের ভোগ ক্ষয় করার জন্য বিশেষ এক ভৌতিক দেহের আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই বিশেষ দেহে যে ভোগ সম্ভব তা সম্পূর্ণ করার পর দেহ ত্যাগ করে চলে যায়। জীবাত্মার এই দেহত্যাগকে আমরা মৃত্যু সংজ্ঞায় অভিহিত করি। প্রাক্তন কর্মের সংস্কার শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই জীবাত্মাকে নূতন নূতন পরিবেশে ভিন্নজাতীয় ভোগের জন্য নূতন নূতন দেহ ধারণ করতে হয় এবং এইভাবে চলতে থাকে মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত আত্মার দেহ থেকে দেহান্তরে পরিক্রমা।'– (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৯০-৯১)।

ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন অনুসারে মৃত্যুর অর্থ জীবদেহের বিনাশ মাত্র, কিন্তু মৃত্যুর মাধ্যমে জীবদেহে অধিষ্ঠিত এই আত্মা বিনষ্ট হয় না। স্থূল দেহের একটি থেকে অপরটির উদ্দেশ্যে তার যাত্রার দীর্ঘ গতিপথে এক বিশেষ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি মাত্র। স্থূল শরীর থেকে বহির্গত এই আত্মার আশ্রয় তখন সূক্ষ্ম শরীর। উপনিষদীয় ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়া এই সূক্ষ্মশরীরের গঠন সম্পর্কে মতভেদও আছে। পঞ্চতন্মাত্র নামে অভিহিত পঞ্চভূতের সূক্ষ্মভাগ উত্তরকালের সাংখ্যমতে এই শরীরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'য় বলা হয়েছে–

তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ।। (সাংখ্যকারিকা-৩৮)
সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে।। (সাংখ্যকারিকা-৩৯)
অর্থাৎ :
(শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ– এই পাঁচটি) তন্মাত্রকে অবিশেষ (বা সূক্ষ্মভূত) বলে। সেই পাঁচটি (তন্মাত্র) থেকে (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম– এই) পাঁচটি স্থূলভূত উৎপন্ন হয়। এই পাঁচটি স্থূলভূত (সত্ত্ব-রজঃ-তমো-গুণাত্মক বলে এদের) সুঃখ, দুঃখ ও মোহ-স্বভাব বলা হয়। (সাংখ্যকারিকা-৩৮)।। বিশেষ তিন প্রকার (যথা–) সূক্ষ্মশরীর, স্থূলশরীর ও পাঁচটি মহাভূত। এদের মধ্যে সূক্ষ্মশরীর প্রলয়কাল পর্যন্ত (আপেক্ষিক) নিত্য, স্থূলশরীর (কিছুদিন থেকে) নষ্ট হয়। (সাংখ্যকারিকা-৩৯)।।

কিন্তু প্রত্যক্ষের মাধ্যমে যা ধরা পড়ে সেই পাঁচ বা চার স্থূল মহাভূতের যে এক্ষেত্রে কোনই অবদান নেই সে সম্বন্ধে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীরা সকলে একমত। তাঁদের উপনিষদীয় ধারণা মতে, স্থূল শরীরের বন্ধন ছিন্ন হলেই জীবাত্মার মুক্তি হয় না; প্রাক্তন কর্মের সংস্কারের বশে সূক্ষ্ম দেহে সে আবদ্ধ থাকে তার নিজস্ব মন, বুদ্ধি এবং পূর্বজন্মার্জিত কর্মের সঞ্চয় ইত্যাদির সঙ্গে। এই সূক্ষ্মদেহধারী জীব (আত্মা) আবার নতুন পরিবেশে নতুন স্থূল দেহে তার আবাস রচনা করে। জীবাত্মার এই পথ-পরিক্রমার অবসান হয় মুক্তির মাধ্যমে যখন ছিন্নবন্ধন এই আত্মা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে শুদ্ধ আত্মস্বরূপে বিলীন হয়।

কিন্তু দেহাতিরিক্ত এই আত্মার অনুমোদন চার্বাক দর্শনে নেই। চার্বাকমতে মানুষের মৃত্যু তাই 'দেহত্যাগ' নয়, দেহাবসানের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ সত্তারই অবসান। যেমন–

'তেষু বিনষ্টেসু সৎসু স্বয়ং বিনশ্যতি।'- (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : (চার্বাকমতে) দেহের সংগঠক সেই চারটি ভূত বিনষ্ট হলে সেই চৈতন্যও স্বয়ংই বিনষ্ট হয়।

এবং 'চার্বাকষষ্ঠি'র লোকগাথায়ও বলা হয়েছে, যা মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-তেও উদ্ধৃত হয়েছে–

'ভস্মীভূতস্য ভূতস্য পুনরাগমনং কুতঃ।'- (চার্বাকষষ্ঠি-৩৩)

অর্থাৎ : ভস্মীভূত জীব বা দেহের পুনরাগমন কোন কারণেই হতে পারে না।

চার্বাকেরা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য মহাভূতের উপাদানে গঠিত দেহকেই আত্মা বলেন। যে সচেতন 'আমি'কে কেন্দ্র করে আত্মস্বরূপের প্রকাশ, সেই 'আমি' চার্বাক মতে দেহের সঙ্গে অভিন্ন। যেমন–

'তচ্চৈতন্য-বিশিষ্ট-দেহ এব আত্মা, দেহাতিরিক্তে আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ।'- (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : (চার্বাকমতে) চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহ-ভিন্ন আত্মাতে প্রমাণ নাই।

.

'ভূতচতুষ্টয়ং চৈতন্যভূমিঃ'। (ষড়্দর্শনসমুচ্চয়-৮৩)
অর্থাৎ : (লোকায়তমতে) চারটি ভূতই চৈতন্যের উৎস-ভূমি।

অধ্যাত্মবাদীদের দৃষ্টিতে সচেতন 'আমি'র নিজস্ব রূপ হিসাবে ভারতের অধ্যাত্মদর্শনে ভৌতিক জীবদেহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক যে তত্ত্বকে 'আত্মা' বলে প্রচার করা হয়েছে, চার্বাকদের বর্ণনায় এই 'আমি' তার প্রকৃত অর্থে প্রকাশমান 'আমি গৌরবর্ণ' 'আমি স্থূল' ইত্যাদি বাক্যে, যেখানে দেহের বিভিন্ন গুণ 'আমি' সংজ্ঞায় অভিহিত আত্মাকে আরোপ করা হয়। এই 'আমি' শব্দই ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত 'আমার দেহ' ইত্যাদি বাক্যাংশে, যেখানে 'আমি' দেহ থেকে পৃথক। চার্বাক মত অনুসারে এই বাক্যাংশগুলি ঔপচারিক, অর্থাৎ 'আমি' এ-সব ক্ষেত্রে তার প্রকৃত অর্থে প্রযুক্ত হয় না। এ-প্রসঙ্গে মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' চার্বাকমত বর্ণনায় বলছেন–

'অহং স্থূলঃ কৃশোহস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ।
দেহ-স্থৌল্যাদি-যোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ।
মম দেহোহয়মিত্যুক্তিঃ সংভবেদৌপচারিকী।।'- (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : (চার্বাকমতে) আমি স্থূল ও কৃশ হচ্ছি– এইরূপ সামানাধিকরণ্য বা অভেদের প্রত্যক্ষবশত এবং দেহে স্থূলতা কৃশতার সম্বন্ধবশত দেহই আত্মা বলে সিদ্ধ হয়। দেহের অতিরিক্ত অপর কোন আত্মার সিদ্ধি হয় না। কারণ তার প্রত্যক্ষ হয় না। যার প্রত্যক্ষ হয় না, তার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। 'আমার দেহ' ইত্যাদি বাক্যাংশে উক্ত 'আমি' ঔপচারিক ব্যবহার-প্রযুক্ত।

শঙ্করাচার্যের 'সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ' গ্রন্থে লোকায়ত মতের প্রতিভূ হিসেবে প্রাসঙ্গিক লোকগাথার উদ্ধৃতি রয়েছে–

'স্থূলোহহং তরুণো বৃদ্ধো যুবেত্যাদিবিশেষণৈঃ।
বিশিষ্টো দেহ এবাত্মা ন ততোহন্যো বিলক্ষণঃ।।'- (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/৬)।।
অর্থাৎ : আমি স্থূল, তরুণ, যুবা, বৃদ্ধ ইত্যাদি বাক্যে স্থূল প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা দেহই বিশেষিত হয়ে থাকে। দেহ থেকে ভিন্ন অন্য কোন আত্মা নামক পদার্থ ঐ বিশেষণের বিশেষ্য হয় না।

এ-বিষয়টি আরো সহজভাবে বুঝতে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য– ‘চলতি কথায় আমরা অবশ্য বলি “আমার দেহ”। অর্থাৎ, যেন “আমি” এক এবং দেহটি আলাদা কিছু। এবং “আমি” বা “আমার” বলতে যা উল্লেখ করছি– তাই-ই যেন ওই “দেহ”র মালিক। এ-হেন মালিক আত্মা ছাড়া আর কীই বা হতে পারে? চার্বাকমতে এ-হেন যুক্তি ধোপে টেকে না। “আমার দেহ” নেহাতই কথার কথা; ভারতীয় পরিভাষায় তাকে বলে উপচার। কিন্তু এ-হেন ঔপচারিক ব্যবহার থেকে “আমি” আর “দেহ”-র মধ্যে তফাৎ করতে যাওয়াটা অবান্তর হবে। কথার কথা হিসেবে তো অনেক সময় “রাহুর মাথা”-ও বলা হয়। তাই বলে কি স্বীকার করতে হবে যে “রাহু” এক, এবং তার “মাথা” বলতে অন্য কিছু। রাহুর কথা তো পুরাণকারদের কাছে শোনা এবং তাঁদেরই মতে, ওই মাথাই রাহুর সর্বস্ব; মাথাটির মালিক হিসেবে রাহু বলে স্বতন্ত্র কারুর কল্পনা একান্তই অবান্তর। তাই অত সহজে– কথার কথা-র নজির দেখিয়ে– দেহ ছাড়াও আত্মা বলে কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, বা দেহাত্মবাদ খণ্ডন করা সম্ভব নয়। বরং, যাঁরা স্বতন্ত্র আত্মা মানেন তাঁদেরই বিপদে পড়ার ভয় আছে। যেমন, আমরা তো হামেশাই বলে থাকি, ‘আমি রোগা’, ‘আমি কালো’, ‘আমি ফর্সা’। এ-জাতীয় ক্ষেত্রে ‘আমি’ বলতে দেহ ছাড়া আর কি বোঝা যেতে পারে? কালোই বলুন আর ফর্সাই বলুন, রোগাই বলুন আর মোটাই বলুন– এ সবই দেহধর্ম বা দেহের গুণ। এ-জাতীয় দৃষ্টান্তেও আত্মাবাদীরা– অর্থাৎ, আত্মায় বিশ্বাসীরা– ‘আমি’ বলতে কি আত্মা বোঝাবেন? তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা তামাশার মতো শোনাবে : আত্মাটি মোটা বা রোগা, কালো বা ফর্সা– এ-জাতীয় কথা মানতে হবে।’- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৭৩)

এ-প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ আরো বলেন যে, অবশ্যই লৌকিক ভাষা-ব্যবহারের নজির থেকে কোনো মতের দার্শনিক মূল্যায়ন হয় না। দেহাত্মবাদেরও নয়। তার প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য দার্শনিক বিচারের অবতারণা প্রয়োজন। দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি মূলত চারটি বিষয়ের প্রস্তাব করেন–
১। দেহাত্মবাদের সমর্থনে চার্বাকদের পক্ষে কোন্ ধরনের নজির দেখানো সম্ভব?
২। দেহাত্মবাদ খণ্ডনে বিপক্ষ দার্শনিকরা কী যুক্তি প্রস্তাব করেন?
৩। এজাতীয় যুক্তি দিয়ে দেহাত্মবাদ কি সত্যিই নস্যাৎ হয়?
৪। সাধারণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেহাত্মবাদের প্রকৃত তাৎপর্য কী?

এই প্রস্তাবনা আলোচ্য বিষয়ের যথাযথ পর্যালোচনায় আমাদের সহায়ক হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রথম প্রস্তাবটিই সবচেয়ে কঠিন বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি চার্বাকমত পুনর্গঠন তথা রূপরেখা তৈরির পক্ষে আজকের দিনে আমাদের আসল সম্বল বলতে খুবই সামান্য। তাই ‘দেহাত্মবাদের সমর্থন’ প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদই বলছেন, এক্ষেত্রে আমাদের আসল সম্বল বলতে–
‘অর্থশাস্ত্র’ জাতীয় প্রাচীন পুঁথিপত্রের নজির ছাড়া কিছু প্রামাণিক লোকগাথা এবং পূর্বপক্ষ

হিসাবে বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু রচনা। কিন্তু পূর্বপক্ষ হিসাবে বর্ণনার উপর নির্বিচারে নির্ভর করা নিরাপদ নয়। খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বর্ণিত কোনো মত সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ না-হবারই সম্ভাবনা; পক্ষান্তরে কিছুটা কারসাজিই থাকতে পারে। অর্থাৎ, পূর্বপক্ষ বর্ণনায় এমন যুক্তি বা বিচার গুঁজে দেবার প্রবণতা অসম্ভব নয়, যার অন্তঃসারশূন্যতা দেখানো তুলনায় সহজ হয়। অবশ্যই ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরকে খণ্ডন করতে চেয়েছে, অতএব পূর্বপক্ষ হিসেবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের উল্লেখও করেছে। তবে ন্যায়-বৈশেষিক, বেদান্ত, পূর্বমীমাংসা, জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কথা আলাদা; এগুলির সমর্থনে রচিত নানা গ্রন্থ বর্তমান। পূর্বপক্ষ হিসাবে এগুলির বর্ণনায় কারসাজির কোনো চেষ্টা থাকলেও তা সনাক্ত করা কঠিন নয়। কিন্তু চার্বাকদের নিজস্ব রচনা এককালে যে বর্তমান ছিল– সে-বিষয়ে মোটের উপর সুনিশ্চিত নজির থাকলেও, বাস্তব পরিস্থিতিটা এই যে, যে-কোনো কারণেই হোক-না-কেন, আজ তা বিলুপ্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। সম্প্রতিকালে প্রকাশিত জয়রাশিভট্টর ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহ’ বলে বইটি নিয়ে অবশ্যই বেশ কিছুটা শোরগোল পড়েছিল। কেননা এর সম্পাদকেরা মনে করেছিলেন প্রসিদ্ধ চার্বাক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ না-হলেও কোনো-এক-কালে কোনো-এক-দেশে কোনো একরকম “সর্বপ্রমাণ-বিরোধী” চার্বাক সম্প্রদায় সম্ভবত বর্তমান ছিল; এই গ্রন্থে তারই মত বিবৃত হয়েছে। কিন্তু বইটা নিয়ে শোরগোল আজকাল প্রায়াংশেই স্তিমিত। অগ্রণী বিদ্বানদের বস্তুনিষ্ঠ বিচারে প্রমাণ হয়েছে চার্বাকমতের সঙ্গে ‘তত্ত্বোপপ্লবসিংহ’-র সম্পর্ক মোটের উপর কল্পিতই : বইটিতে আসলে একরকম চরম সংশয়বাদেরই পরিচয়– অনেকটা শ্রীহর্ষর ‘খন্ডনখন্ডখাদ্য’র মতোই, যদিও স্বয়ং শ্রীহর্ষ সর্বপ্রমাণ খণ্ডন করে অদ্বৈত-বেদান্ত দর্শনের সমর্থন করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার তাৎপর্য যাই হোক-না-কেন, আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এই যে চার্বাকমতের সমর্থনে রচিত কোনো বই-এর অভাবে পূর্বপক্ষ হিসাবে বিরুদ্ধ দার্শনিকদের রচনায় কম-বেশি কারসাজি থাকলেও তা সনাক্ত করা সহজ নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রধান অবলম্বন বলতে বোধহয় চার্বাকদের প্রামাণিক লোকগাথাগুলি : আলোচ্য পূর্বপক্ষের সঙ্গে প্রামাণিক লোকগাথাগুলির যতটা সঙ্গতি অন্তত ততটা পর্যন্ত ওই পূর্বপক্ষ-বর্ণনার যাথার্থ্য স্বীকার করায় বাধা নেই। তাছাড়া আরো একটা ভাববার মতো কথা আছে : সমস্ত বিরুদ্ধ দার্শনিকদের রচনায় দেহাত্মবাদের সমর্থনে বর্ণিত যুক্তিতর্ক সমান নয়। নানা দার্শনিক দেহাত্মবাদের বর্ণনায় নানা রকম যুক্তিতর্কের– এমনকি রকমারি কূটতর্কের– অবতারণা করেছেন। এদিক থেকেও ভেবে দেখার সুযোগ আছে কোন্ যুক্তি চার্বাকদের প্রকৃত অভিপ্রায় হবার সম্ভাবনা আর কোন্ যুক্তি বিরুদ্ধ কল্পনায় অনুপ্রাণিত।’- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৭৪)

এদিকে দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গে ইতোমধ্যে প্রদত্ত গুটিকয় নমুনা-দৃষ্টান্ত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যে সচেতন ক্রিয়াকলাপ আত্মগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, চার্বাকেরা তার উৎপত্তির ক্ষেত্র হিসেবে দেহকে নির্দেশ করে থাকেন। আত্মাকে দেহের গণ্ডির মধ্যে সীমিত রাখার মূলে কার্যকর দৃষ্টিভঙ্গিটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ-অতিরিক্ত প্রমাণে চার্বাকদের স্বীকৃতি নেই; কারণ, যে আত্মা

দেহতে আশ্রিত নয়, সেই বিদেহ চৈতন্য প্রত্যক্ষের মাপকাঠিতে ধরা পড়ে না। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে অবিচল থাকার জন্য স্বপক্ষ সমর্থনে অবশ্য যুক্তির সহায়তায় পূর্বপক্ষ হিসেবে আসরে অবতীর্ণ হতে হয়েছে প্রতিপক্ষ দার্শনিকদের রচিত গ্রন্থে। কাজেই চার্বাকী নীতি বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমানের বিরোধী হলেও এবং স্থূল দেহের অতিরিক্ত আত্মাকে অস্বীকার করার মূল এই নীতিতে নিহিত থাকলেও চার্বাকপক্ষের আশ্রয় এক্ষেত্রে যুক্তিভিত্তিক অনুমান। আর চার্বাকেতর অধ্যাত্মবাদী মতবাদের প্রধান ভিত্তিই যেহেতু আত্মা বা আত্মতত্ত্ব, অতএব নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই চার্বাকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে তাঁদের দ্বিধা করার কোন অবকাশ নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের বিভিন্ন শাখাও তাদের আত্ম-সম্বন্ধীয় ধারণার সমর্থনে যুক্তিকে বহুক্ষেত্রে টেনে এনেছেন। কিন্তু প্রকৃত বিচারে তাঁদের এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ধারণার মূল আপ্তবাক্য। কাজেই অনুমানকে যখন তাঁরা প্রমাণের আসনে বসান, তখন তা সব সময়ে সহজগ্রাহ্য হয় না, এবং কষ্টকল্পিত তাঁদের এই যুক্তিগুলিতে প্রচুর ত্রুটিও থেকে যায় বলে আধুনিক বিদ্বানেরা মনে করেন। আর তর্কের আসরে নেমে বিরোধীপক্ষকে পরাভূত করার ক্ষেত্রে এই ত্রুটির সুযোগ নিতে চার্বাকেরা ইতস্ততঃ করবেন বলে মনে হয় না। কেননা, ইতোমধ্যেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রমাণের জগৎ থেকে লৌকিক ব্যবহার-বহির্ভূত অনুমানকে বহিষ্কৃত করার মূলে যে ভাবনা চার্বাকদের মধ্যে সাধারণভাবে কার্যকরি তা হলে আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদির ধারণার ক্ষেত্রে অনুমানের কোন উপযোগিতা নেই। এইভাবে আত্মপ্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনের আসরে এক বিরাট তর্কযুদ্ধের সূচনা হয়। চার্বাকী দেহাত্মবাদের বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে এই তর্কযুদ্ধেরই আলোচনা; এবং বহুক্ষেত্রে তা নীরস হলেও বর্তমান প্রসঙ্গে এর প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য।

‘এই তর্কযুদ্ধে চার্বাকের প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষকে দুভাগে ভাগ করা যায়– প্রথম, স্থায়ী আত্মায় বিশ্বাসী অধ্যাত্মদর্শনের বিভিন্ন শাখা; দ্বিতীয়, বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়, যাঁদের ধারণায় স্থায়ী আত্মার স্থান অধিকার করেছে সচেতন অনুভূতির পরস্পরাবদ্ধ প্রবাহ। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য বা বিজ্ঞানকে দেহাতিরিক্ত মর্যাদা দিয়ে বৌদ্ধ দর্শন আত্মাবাদী দর্শনগুলির সঙ্গে একইভাবে চার্বাকী দেহাত্মবাদের বিরোধিতা করেছে এবং জন্মান্তরবাদ, কর্মফল, পরলোক ইত্যাদি বিষয়ের ধারণাতে এই দর্শন আত্মবাদী দর্শনগুলির সমগোত্রীয়। আত্মবাদী দার্শনিকদের সঙ্গে চার্বাকী তর্কযুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায় সাংখ্য, ন্যায়, জৈন, বেদান্ত ইত্যাদি দর্শনের আচার্যদের রচিত পুস্তকে। বৌদ্ধ দার্শনিকদের সঙ্গে চার্বাকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিবরণ সংগৃহীত হয় প্রধানতঃ শান্তরক্ষিত এবং কমলশীল প্রণীত ‘তত্ত্বসংগ্রহ’ এবং ‘তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা’ গ্রন্থে। বস্তুতঃ উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে বৌদ্ধ আচার্যদ্বয় চার্বাক দর্শন প্রসঙ্গে যে আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন, দেহাত্মবাদ সম্বন্ধীয় চার্বাকী দৃষ্টিভঙ্গীর রূপায়ণে তা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে সমর্থ।’- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৯৩)

এছাড়া, ‘জৈন দার্শনিক হরিভদ্রর ব্যাখ্যাকার– বিশেষত গুণরত্নে– দেহাত্মবাদ নিয়ে পাতার

পর পাতা লিখেছেন; প্রভাচন্দ্র নামে অপর এক জৈন মহাতার্কিক তাঁর 'ন্যায়কুমুদচন্দ্র' এবং 'প্রমেয়কমলমার্তণ্ড' বলে বইতে দেহাত্মবাদের বিচারে বিস্তর বাগবিস্তার করেছেন। আরো অনেকেই করেছেন এবং তাঁদের রচনায় তর্কবিতর্কের মারপ্যাঁচ বোঝা সহজসাধ্য নয়। লোকায়তর অর্থ যদি হয় 'লোকেষু আয়ত' বা জনাসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, তাহলে সহজেই সংশয় হবে, চার্বাক বা লোকায়তিকেরা সত্যিই অতশতর ধার ধারতেন কি না!' 'কিন্তু শঙ্করের লেখা একেবারে অন্য রকম। এমন সহজ সরল ভাষায় তিনি লোকায়তিকদের দাবিটা বর্ণনা করেছেন যে, সাধারণ পাঠক অল্প আয়াসেই তা বুঝতে পারেন। আরো কথা আছে।... শঙ্করের দেহাত্মবাদ বর্ণনার সঙ্গে লোকায়তিকদের প্রামাণিক লোকগাথারও অন্তত অনেকাংশেই মিল হয়। অবশ্যই এমন কথা জোর গলায় বলা যায় না যে শঙ্করের দেহাত্মবাদ বর্ণনায় একেবারেই কোনোরকম কারসাজি নেই। কিন্তু যদিই বা থাকে তাহলেও তিনি সেটা সহজ ভাষায় দেহাত্মবাদীদের বক্তব্যের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন যে তা সনাক্ত করা সহজসাধ্য নয়।'- (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৭৫-৭৬)

। শঙ্করাচার্য-বর্ণিত চার্বাকী দেহাত্মবাদ।

অদ্বৈত-বেদান্তের প্রবর্তক শঙ্করাচার্যের নিজস্ব মতের সম্পূর্ণ বিপরীত বলতে ভারতীয় দর্শনে যদি কিছু থাকে তা হলো এই দেহাত্মবাদ। কেননা, চার্বাকমতে দেহই সত্য, আত্মা বলে কিছু নেই; অন্যদিকে শঙ্কর-মতে আত্মাই একমাত্র সত্য, তথাকথিত দেহ বলে বস্তুটি অজ্ঞানের ঘোরে সাময়িক কল্পনামাত্র। তবুও বিদ্বান গবেষকদের মতে শঙ্করের বর্ণনার আকর্ষণীয় দিকটি হলো, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে শঙ্করের মতো সহজ-সরল গদ্য রচনার নমুনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আলঙ্কারিকদের ভাষায়, শঙ্করের লেখা প্রসাদগুণে অুলনীয়। অন্যান্য দার্শনিকদের সঙ্গে কিছুটা তুলনা করলে শঙ্করের বর্ণনায় সে-তুলনায় কূটতর্কেল বিশেষ বালাই নেই, কেননা শঙ্কর যুক্তিতর্কেরই বড় একটা ধার ধারতেন না। তাঁর নিজের দাবি অনুসারে মায়াবাদ বা অদ্বৈত-বেদান্তের আসল খুঁটি হলো শাস্ত্র বা শ্রুতি-স্মৃতি। শ্রুতি-স্মৃতির উপর নির্ভর না করে স্বাধীন যুক্তিতর্কের প্রতি যে কোনো প্রবণতাই অজ্ঞানের কুহেলিকায় দিশেহারা হতে বাধ্য। তবে নেহাতই নিকৃষ্ট পরমত খণ্ডনের জন্য– বা পাঠক-সাধারণের মোহমুক্তির উদ্দেশ্যে– যুক্তি-তর্কের গৌণ মূল্য থাকতে পারে। এই কারণে তিনি তুলনায় সীমিত অর্থে তর্কবিতর্কেরও পরিচয় দিয়েছেন। ফলে তাঁর রচনায় দেহাত্মবাদের বর্ণনাও যেমন সহজ সরল, দেহাত্মবাদের খণ্ডনও তেমনি সাদামাটা।

শঙ্করাচার্য চার্বাকী দেহাত্মবাদ বর্ণনার ক্ষেত্রে অন্যান্য নানা অবান্তর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে দেহাত্মবাদ নিয়ে যেটা প্রধান বিতর্ক সরাসরি তারই আলোচনা তুলেছেন। কিসের বিতর্ক? দেহাত্মবাদীর মতে দেহগঠনের মূল উপাদান বলতে আগুন, বাতাস, জল ও মাটি। ভূতপদার্থই। কিন্তু এই উপাদানগুলির মধ্যে কোথাও চেতনা বা চৈতন্যের পরিচয় নেই। এগুলির সবই নিছক অচেতন; জড়পদার্থ। অথচ, মানুষ প্রভৃতির দৃষ্টান্তে সুস্পষ্টভাবেই চেতনার পরিচয়। এবং এই চৈতন্যের সাক্ষ্য থেকেই প্রমাণ হয় যে মানবাদির ক্ষেত্রে আত্মা বলে অতিরিক্ত কিছু মানা দরকার, কেননা আত্মাই চেতনপদার্থ বা চৈতন্যবিশিষ্ট। দেহাত্মবাদ নিয়ে অন্যান্য দার্শনিকেরাও যত তর্ক তুলুন না কেন, শেষ পর্যন্ত সবকিছুই এই চৈতন্য বা চেতনার নজিরটির উপর প্রতিষ্ঠিত। চার্বাকেরা এ বিষয়ে কী উত্তর দেবেন?

দেহাত্মবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হিসেবে শঙ্কর বলছেন–

‘দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতা জনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্না’।
(শাঙ্করভাষ্য-১/১/১)
অর্থাৎ : অশিক্ষিত বা ইতর জনগণ এবং লোকায়তিকেরা চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহমাত্রকে আত্মা বলে মনে করে।

তার মানে লোকায়তমতে চৈতন্য দেহেরই গুণ বা দেহেরই ধর্ম। কিন্তু নিছক অচেতন বা জড় বস্তু দিয়ে গড়া এই দেহই কী করে চৈতন্যবিশিষ্ট বা চৈতন্যগুণযুক্ত হতে পারে? একই গ্রন্থের অন্যত্র শঙ্কর লোকায়তমতের বর্ণনায় এই প্রশ্নের তুলনায় বিশদ উত্তর দিয়েছেন।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের স্বাধীন তর্জমায় তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। শঙ্কর বলছেন–
'অত্রৈকে দেহমাত্রাত্মদর্শিনো লোকায়তিকা...... তেভ্যশ্চৈতন্যং মদশক্তিবৎ বিজ্ঞানং ...।'-
(শাঙ্করভাষ্য-৩/৩/৫৩)
দেবীপ্রসাদ-কৃত তর্জমা :
'লোকায়তিকেরা বলে আত্মা বলে কিছুই নেই; নিছক দেহকেই তারা আত্মা বলে বোঝে। তাদের মতে পৃথিবী বাহ্য ভূতবস্তুগুলিতে স্বতন্ত্রভাবে এবং এমনকি মিলিতভাবেও চৈতন্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এই পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবস্তুগুলিই শরীরাকারে পরিণত হলে তাতে চৈতন্যের উদ্ভব হয়। অতএব জ্ঞান বা চৈতন্য (ভারতীয় পরিভাষায় 'বিজ্ঞান') মদশক্তির মতো। অর্থাৎ, মদ তৈরি করার জন্য কিণ্ব– খামির বা গাঁজ– প্রভৃতি বস্তু ব্যবহার করা হয়। এগুলির কোনটিতেই মদশক্তির পরিচয় নেই : সোজা কথায়, এগুলির কোনোটি খেলেই নেশা হয় না। কিন্তু এগুলি দিয়েই মদ তৈরি করলে– বা এগুলিই মদিরাকারে পরিণত হলে– তাতে মদশক্তির উদ্ভব হয় বা এগুলি দিয়ে তৈরি মদ গিললে নেশা হয়। এইভাবেই পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুগুলিই দেহ আকারে পরিণত হলে– অর্থাৎ এগুলি থেকেই দেহ তৈরি হলে– সেই দেহে চৈতন্যের উদ্ভব হয়। তাই ওরা– লোকায়তিকেরা– বলে মানুষ বলতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব স্বর্গগমন বা মোক্ষলাভে সমর্থ আত্মা নেহাতই কাল্পনিক। এমনতর কথা বলা যাবে না যে দেহের মধ্যে আত্মা বলে আলাদা কিছু আছে বলেই দেহে চৈতন্যের পরিচয়। লোকায়তমতে দেহই সচেতন, বা– আত্মা বলে কোনো কিছুর কথা যদি বলতেই চাও, তাহলে– ওই দেহকেই আত্মা বলো। এই মতের সমর্থনে সূত্র আছে : 'শরীরে ভাবাৎ'। অর্থাৎ, যা বর্তমান থাকলে অপরকিছু বর্তমান থাকে, এবং যার অবর্তমানতায় সেই অপরকিছুও অবর্তমান হয়, সেই অপরকিছুকে তাই ধর্ম বলতে হবে। যেমন অগ্নির ধর্ম উষ্ণতা ও প্রকাশ : আগুন থাকলে তাপ ও আলো থাকে, আগুন না-থাকলে তাপ ও আলো থাকে না; অতএব তাপ ও আলো আগুনেরই ধর্ম। আত্মবাদীরা– অর্থাৎ যাঁরা দেহ ছাড়াও আত্মা বলে স্বতন্ত্র কিছু মানতে চান, তাঁরা– প্রাণ, চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতিকে ওই আত্মার ধর্ম বা গুণ বলে কল্পনা করেন। কিন্তু এসবই দেহতেই উপলব্ধ হয়, দেহ ছাড়া আর কোথাওই উপলব্ধ হয় না। তাই দেহ ছাড়া– বা দেহ-আত্মা বলে এমন কিছু মানা যায় না যার ধর্ম বা গুণ বলতে প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতিকে স্বীকার করার সুযোগ আছে। দেহের বর্তমানতায় বর্তমান এবং অবর্তমানতায় অবর্তমান বলে এগুলিকে দেহধর্ম বলেই মানতে হবে। এই অর্থে দেহই আত্মা।' (সূত্র: ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৭৬-৭৭)

সত্যি বলতে কি, দেহাত্মবাদের এরকম সাদামাটা প্রাঞ্জল বর্ণনা ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ। যদিও, এই প্রসঙ্গে লোকায়তিক সূত্র হিসেবে শঙ্কর 'শরীরে ভাবাৎ' বলে যে কথা উদ্ধৃত করেছেন তা তিনি কোথা থেকে পেলেন জানা নেই। তবে এটুকু বোঝা কঠিন নয় যে সূত্রটির তাৎপর্যের সঙ্গে দেহাত্মবাদের মিল হয়। চার্বাকদের লোকায়তসূত্র নামে প্রচলিত বার্হস্পত্যসূত্র, চার্বাকষষ্ঠি কিংবা প্রচলিত চার্বাকী লোকগাথাগুলিতে শঙ্কর-উদ্ধৃত

সূত্রটি কোথাও দেখা যায় না। 'যদি এমন হয় যে লোকায়তমতের প্রকৃত তাৎপর্য দার্শনিক পরিভাষায় বোঝাতে গিয়ে শঙ্কর এ-হেন একটি সূত্র নিজেই জুড়ে দিয়েছেন, তাহলে বলতেই হবে, শঙ্কর দেহাত্মবাদী চার্বাকদের হাতে কঠিন এক অস্ত্র তুলে দিয়েছে যা তাঁর নিজস্ব অদ্বৈতমতের জন্যেই নিজের বিপদ নিজে টেনে এনেছেন।'

সে যাক্, শঙ্করের ভাষ্যে এখানে প্রধানত উল্লেখ্যযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে, অচেতন জড় মহাভূতের উপাদানে গঠিত দেহকে চৈতন্যের আবির্ভাবের ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকার করার সময় চার্বাকেরা স্বীয় ধারণার সম্ভাব্য অসঙ্গতি দূর করার প্রচেষ্টায় যে লোকায়তিক দৃষ্টান্তের আশ্রয় নিয়েছেন সেটি হলো– মদশক্তিবৎ।
সুরা বা মদের উপাদান হিসেবে যে বিশেষ ধরনের বৃক্ষনির্যাসের ব্যবহার, তা মূলতঃ মাদকতাবিহীন হলেও পরে তাতে মাদকশক্তির উদ্ভব হয় এবং সেটা সুরা বা মদে পরিণতি লাভ করে; অনুরূপভাবে স্থূল মহাভূত যদিও প্রকৃতিগতভাবে চৈতন্যবর্জিত, তাহলেও দেহরূপে পরিণত হবার পর এই স্থূলভূতে চৈতন্যের বিকাশ দেখা যায়। চার্বাকী দেহাত্মবাদ বর্ণনায় প্রায় সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরাই এই মদশক্তির উপমা ব্যবহার করেছেন। জৈন দার্শনিক হরিভদ্রসূরি তাঁর 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়ে' বলেছেন–
'মদশক্তিঃ সুরাঙ্গেভ্যো যদ্বৎ তদ্বৎ স্থিতম্ আত্মতা'। (ষড়দর্শনসমুচ্চয়-৮৪)
অর্থাৎ : (চার্বাকমতে) মাদকতাবিহীন উপাদানের পরিণাম যেরূপ মদশক্তি, সেইরূপ স্থূলভূতের দেহরূপে পরিণত হবার পর চৈতন্যের বিকাশ হয়।

চার্বাকী দেহাত্মবাদে এই উপমা ব্যবহারের ইঙ্গিত বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিতের 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থেও পাওয়া যায়–
'তস্মাদ্ভূতবিশেষেভ্যো যথা শুক্তসুরাদিকম, তেভ্য এব তথা জ্ঞানং জায়তে ব্যজ্যতেহথবা'। (তত্ত্বসংগ্রহ-১৮৫৮)
অর্থাৎ : (লোকায়তিকমতে) শুক্তসুরাদির মতোই চৈতন্যবর্জিত স্থূল মহাভূত দেহরূপে পরিণত হবার পর স্থূলভূতে জ্ঞান বা চৈতন্যের জন্ম হয়।
'ন্যায়মঞ্জরী'তে নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টও বলেন–
'উক্তং চ, মদশক্তিবৎ বিজ্ঞানমিতি'। (ন্যায়মঞ্জরী)
অর্থাৎ : (চার্বাকমতে) তারা বলেন জ্ঞান বা চৈতন্য মদশক্তির মতো।

জয়ন্তভট্ট অবশ্য আরেকটু বিশদ করেই বলেছেন। লতিকা চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'চার্বাক দর্শন' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৯৪) বলছেন–
'ন্যায়মঞ্জরী'-তে চার্বাক ব্যবহৃত এই দৃষ্টান্তের বিবরণ এইভাবে দেওয়া হয়েছে– গুড়, পিষ্ট ইত্যাদি পদার্থ প্রাথমিক অবস্থায় মদশক্তিবিহীন হলেও সুরার আকারে পরিণত এই বস্তুগুলিতে বিশেষ এই মদশক্তির যে ভাবে প্রকাশ, ঠিক সেইভাবে আদিতে চৈতন্যবর্জিত মৃত্তিকাদি চতুর্ভূত শরীরাকারে রূপান্তরিত অবস্থায় চৈতন্যরূপ বিশেষ শক্তির দ্বারা যুক্ত হয়।

এই বিশেষ শক্তির প্রকাশ ভূতাত্মক দেহে কিছুকাল থাকে, যে সময়ে স্মৃতি, অনুসন্ধান ইত্যাদি সচেতন ব্যবহারের অভিব্যক্তি এই দেহে দেখা যায়। কালবসানে ব্যাধি ইত্যাদির দ্বারা এই শক্তি বিনষ্ট হলে দেহ পুনরায় অচেতন রূপ পরিগ্রহ করে। (‘জ্ঞানাদি যোগস্তু ভূতানামেব পরিণাম বিশেষোপপাদিতশক্ত্যতিশয়জুষাং.........ভবিষ্যন্তীতি’, ব্যাস, ২,৩)।’

তবে, নানা রকম উপকরণ মিশ্রিত তাম্বুল বা পানে যেমন উপকরণগুলির প্রত্যেকটির রঙ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রক্তবর্ণের উৎপত্তি, জড় মহাভূত থেকেও সেইভাবে ভিন্নধর্মী চৈতন্যের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা যায়– এধরনের উপমা-যুক্ত চার্বাকমতের প্রামাণিক একটি লোকায়তিক উদ্ধৃতি শঙ্করাচার্যের ‘সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ’ গ্রন্থে রয়েছে–

‘জড়ভূতবিকারেষু চৈতন্যং যত্তু দৃশ্যতে।
তাম্বুলপূগচূর্ণানাং যোগাদ্রাগ ইবোত্থিতম্ ।।’ (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/৭)।।
অর্থাৎ : (লোকায়তমতে) জড় ভূতের বিকাররূপ শরীরাদিতে যে চৈতন্য দৃষ্ট হয়, তা পান, সুপারি এবং চূণ সংযোগে রক্তিমার ন্যায়– সংযোগজন্য।

কিন্তু দৃষ্টান্ত হিসেবে চার্বাকী সাহিত্যে এই তাম্বুলপূগচূর্ণ-এর চেয়ে প্রথমটির অর্থাৎ মদশক্তিবৎ-এর প্রচলন বোধ হয় ব্যাপকতর, কারণ চার্বাক সিদ্ধান্তের আলোচনা বা সমালোচনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনার মধ্যে প্রচুর উল্লেখ রয়েছে– মদশক্তিবৎ। মদ্য প্রস্তুতের নানা উপকরণ। স্বতন্ত্র কিংবা মিলিত অবস্থায় (অর্থাৎ একসঙ্গে জড়ো করে দিলেও) এগুলির মধ্যে মদশক্তির বা নেশা ধরানোর সামর্থ্য থাকে না। অথচ, এগুলিই কোনো এক রকম ‘বিশেষ পরিণামে’র ফলে মদ তৈরি হলে সেই মদে নেশা হয়। এখানে উল্লেখ্য, ‘বিশেষ পরিণাম’ শব্দটি অবশ্য শঙ্কর ব্যবহার করেননি। কিন্তু জয়ন্তভট্ট করেছেন এবং তা করে শঙ্করের অভীষ্ট বক্তব্য আরো প্রাঞ্জল করেছেন। কেননা, মদ তৈরির উপকরণগুলি যে-কোনো ভাবে একজায়গায় জড়ো করলেই মদ পাওয়া যায় না; অথচ এগুলিকেই কোনো এক বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করলে মদ তৈরি হয়। এই ঘটনার নজির দেখিয়ে লোকায়তিকেরাও বলবেন, আগুন, বাতাস, জল আর মাটি যেমন তেমন করে একত্র জড়ো করলেই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু এগুলিরই কোনো-এক-রকম বিশেষ পরিণামের ফলে প্রাণ-চেষ্টা-চৈতন্য-স্মৃতি বিশিষ্ট দেহের উৎপত্তি হয়। এটিই চার্বাকী দেহাত্মবাদের মূল কথা; চার্বাকমতের গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত প্রামাণিক লোকগাথাগুলি এই সাক্ষ্যই দেয়। এক্ষেত্রে দেহাত্মবাদের সমর্থনে কয়েকটি প্রামাণিক লোকগাথার উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। মাধবাচার্য তাঁর ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ গ্রন্থের শুরুতেই– ‘চার্বাক-দর্শন’ নামে প্রথম পরিচ্ছেদেই– অনেকগুলি লোকগাথা উদ্ধৃত করেছেন, যা আমরা ইতঃপূর্বে ভিন্ন অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছি। তার মধ্যে বর্তমান দেহাত্মবাদ আলোচনার পক্ষে বিশেষ প্রাসঙ্গিক কয়েকটি হলো–

‘অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি-বারি-অনল-অনিলাঃ ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যঃ চৈতন্যম্ উপজায়তে ।।
কিণ্ব-আদিভ্যঃ সমেতেভ্যঃ দ্রব্যেভ্যঃ মদশক্তিবৎ।

অহং স্থূলঃ কৃশঃ অস্মি ইতি সামানাধিকরণ্যতঃ।।
দেহঃ স্থৌল্য-আদি-যোগাৎ চ স এব আত্মা ন চ অপরঃ ।
মম দেহঃ অয়ম্ ইতি উক্তিঃ সম্ভবেৎ ঔপচারিকী ।।'- (সর্বদর্শনসংগ্রহ-চার্বাকপ্রস্থান)
অর্থাৎ :
(লোকায়ত মতে) মাটি, জল, আগুন, বাতাস– শুধুমাত্র এই চার রকম ভূতবস্তুই বর্তমান। এই চার রকম ভূতবস্তু থেকেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়।। যেমন কিণ্ব প্রভৃতি বস্তুগুলি থেকেই উৎপন্ন হয় মদশক্তি। 'আমি মোটা', 'আমি রোগা'– এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আসলে বিশেষ্য-বিশেষণ সম্পর্কই বর্তমান।। 'মোটা' প্রভৃতি শব্দ দেহেরই বিশেষণ বলে স্বতন্ত্র কোনো আত্মার কথা অবান্তর। 'আমার দেহ' জাতীয় কথা নেহাতই কথার কথা– যাকে বলে উপচার।।

এই প্রাসঙ্গিক লোকগাথাগুলির সহজ সরল বক্তব্য থেকেই চার্বাকী দেহাত্মবাদের প্রয়োজনীয় বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু চার্বাকেতর আত্মবাদী দার্শনিকেরা এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবতারণা করে প্রকৃতপক্ষে স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনেরই অল্পবিস্তর প্রয়াস করেছেন বলে সন্দেহের অবকাশ আছে; কেননা এই প্রসঙ্গে তাঁরা এতরকম কূট বিচারের অবতারণা করেছেন যার তোয়াক্কা লোকায়তিকেরা সত্যিই করতেন বলে মনে হয় না। পক্ষান্তরে লোকায়তিকদের প্রামাণ্য লোকগাথাগুলি থেকে অনুমান হয়, তাঁরা সত্যিই অতশতর ধার ধারতেন না।

। মদশক্তির দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা।

মদশক্তির নজিরটা প্রকৃত চার্বাকমতের পরিচায়ক বলে স্বীকার করার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে। এ-রকম নজির ব্যবহার করার মধ্যেই– বিশেষত প্রাচীন কালের পটভূমিতে– একটা বিজ্ঞান-সম্মত বাস্তব মনোভাবের পরিচয় খোঁজা অবান্তর হবে না বলে মনে হয়। মদ গিললে যে নেশা হয়, একথা অবশ্যই সকলের জানা। কিন্তু কেন হয়, তা দীর্ঘ যুগ ধরে দেশ-বিদেশের অনেকেরই জানা ছিলো না। তাই এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের নানারকম জল্পনা-কল্পনা চোখে পড়ে। সেসব জল্পনা-কল্পনার মূল কথা হলো, মদের মধ্যে বুঝি কোনো একরকম অপ্রাকৃত বা এমনকি অলৌকিক শক্তি আছে, যারই প্রভাবে মদ পেটে পড়লে মানুষ রকমারি অদ্ভূত আচরণ করে থাকে– চলতি কথায় যাকে আমরা বলি মাতলামি। এই জাতীয় বিশ্বাসের অনেক দৃষ্টান্ত হেস্টিংস্ সম্পাদিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজন অ্যান্ড এথিক্স' (Encyclopaedia of Religion and Ethics, ed. Hastings)-এর 'Drinks, Drinking' শীর্ষক নিবন্ধটিতে রয়েছে। নিবন্ধের দৃষ্টান্তগুলির বেশির ভাগই তুলনায় অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়ে থাকা মানুষদের বিশ্বাসের বিবরণ। এটাই স্বাভাবিক।

এ-প্রেক্ষিতে ঋগ্বেদের নজিরে প্রাচীন মানুষদের দেবতা-বিশ্বাসে 'সোমরসে'র বিষয়টিও স্মরণ করা যেতে পারে। সোম নামে এক শ্রেণীর লতা ছিলো, যা পার্বত্য-অঞ্চলে জন্মাতো। বৈদিক কবিরা সোম-লতার পার্বত্য আবাস ও মর্ত্যে আগমন নিয়ে, সোম-লতা সংগ্রহ করা, জল দিয়ে ধোয়ে পাথরের সাহায্যে তা নিষ্কাশন করা, নিষ্কাশিত হরিৎবর্ণের রস ভেড়ার লোমের ছাঁকনীতে ছেঁকে কাঠের কলসে ভরা, তাকে দুধের সঙ্গে মেশানো, দেবতাদের উদ্দেশে তার আহুতি দেওয়া এবং অবশ্যই তা নিজেরা পান করা– ইত্যাদি বিষয়ে ঋগ্বেদে এমন অসম্ভব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, প্রক্রিয়াগুলির খুঁটিনাটি নিয়ে আদিম কল্পনার এমন জটিল জাল বুনেছেন যে বর্তমান সময়ে তার সমস্ত তাৎপর্য স্পষ্টভাবে বোঝা হয়তো সম্ভব নয়। এই রসের একমাত্র গুণটি হলো তা মদশক্তি বা মাদকত্বে ভরপুর। এই সোমলতার কোনও সন্ধান এখন পাওয়া যায় না। সরস্বতী নদীর মতো তা হয়তো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেবল তার স্মৃতি এবং অশেষ গুণের কথা ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে রক্ষিত হয়ে আছে। এসব দৃষ্টান্তে নেশায় উন্মত্ত করা সোমকে কখনো অঢেল বলবীর্য দানকারী স্বর্গীয় মহিমা, কখনো হর্ষদায়ী দেবতা, কখনো অমরত্ব দানকারী অমৃত ইত্যাদি বিভিন্ন বিশ্বাস অঙ্কিত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্য বিষয়ক ভিন্ন অধ্যায়ে এই 'সোম-দেবতা' প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্তসহ বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, ভিন্নতর প্রেক্ষিতে–

'আজকের দিনেও ইংরেজরা কড়া মদকে বলেন স্পিরিট বা 'spirit'– অর্থাৎ, আক্ষরিক অর্থে ভূত বা প্রেতাত্মা জাতীয় কিছু। এই শব্দ ব্যবহার থেকেই সন্দেহ হয় যে এর পিছনে এক বিশ্বাস লুকোনো আছে : মদের বোতলের মধ্যে ভূত-প্রেত জাতীয় অলৌকিক কিছু বুঝি পোরা আছে; মদ গেলার ফলে তারই প্রভাবে মানুষ রকমারি তাণ্ডব বা তাজ্জব ব্যবহার

করতে শুরু করে। ব্যাপারটা বানানো কথা নয়। জে. ডি. বার্নাল রচিত ‘ইতিহাসে বিজ্ঞান’ (J. D. Bernal, Science in History) বই দেখুন। দেখবেন, একদা য়ুরোপের বিজ্ঞানী মহলেও অন্তত ষোড়শ-সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এই রকম ধারণা চালু ছিল। নমুনা হিসেবে প্যারাসেল্সাস্ (Paracelsus : 1493-1541) নামে (বা আসলে ছদ্মনামে) রসায়নবিদের উল্লেখ করেছেন বার্নাল। তাঁর মতে, “The crucial process of chemistry, distillation, was essentially a process of capturing the invisible spirits that rose from a boiling liquid. That such spirits were indeed powerful was only too evident from the effect of drinking them.” (বার্নাল, পৃ-৩৯৯)। অর্থাৎ, প্যারাসেল্সাস্-এর ধারণায় রসায়নবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মদ্য প্রস্তুতে বিশিষ্ট প্রক্রিয়াটি আসলে ফুটন্ত তরল পদার্থ থেকে অদৃশ্য প্রেত ধরবার এক রকম পদ্ধতি; এই প্রেতের শক্তিটা যে কতখানি তা মদ্যপানের ফলাফল থেকেই বস্তুত বোঝা যায়। এমনকি ভ্যান্ হেলমোস্ট (Van Helmost : 1577-1644) মনে করতেন মদ তৈরি করা বলে ব্যাপারটা আসলে শুঁড়িখানায় শুঁড়ির ভাঁট থেকে একরকম ভূত বা প্রেত ধরবার কৌশল।’- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৮০)

উপরিউক্ত কথাগুলি বিবেচনায় রাখলে চার্বাকদের মদশক্তির দৃষ্টান্তটিরই একটা চিত্তাকর্ষক তাৎপর্য অবজ্ঞান ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। কিণ্ব প্রভৃতি কতকগুলি নেহাতই জাগতিক বস্তুর কোনো একরকম বিশেষ পরিণামের ফলে মদ্য বলে একরকম নেহাতই জাগতিক জিনিস প্রস্তুত করা হয়, এবং তারি মধ্যে নেহাতই জাগতিক এক নতুন গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। ‘আত্মা’ বলে দেহাতীত কোনো অলৌকিক বস্তুর অস্তিত্ব খণ্ডন করবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বলে মদশক্তির এই নজিরটির মধ্যে অজাগতিক কোনো কিছুর কল্পনা অবশ্যই অবান্তর হবে। ঠিক কবে– কীভাবে– চার্বাকদের মাথায় এই মদশক্তির দৃষ্টান্ত এসেছিলো, তা আমাদের জানা নেই, জানবার উপায়ও নেই। জানতে পারলে হয়তো বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা বিকাশের ইতিহাসে কিছুটা নতুন আলোকপাতের সম্ভাবনা থাকতো। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, দেহ ছাড়া আত্মা বলে আলাদা কিছু মানবার বিরুদ্ধে– বা দেহাত্মবাদের সমর্থনে– তাঁরা এই মদশক্তির যে নজিরটি ব্যবহার করেছেন, নজিরটির স্বকীয় বৈজ্ঞানিক মূল্য তুচ্ছ নয়।

চার্বাকী দেহাত্মবাদে ‘মদশক্তিবৎ’-এর দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে আরেকটি বক্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য মনে হয়, যেখানে বলা হয়েছে–
‘চার্বাকের যুগে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের পদার্থবিজ্ঞান বা ভৌতবিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্র জানা ছিল না। তবু তিনি প্রাণিদেহে চৈতন্য নামক গুণটির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে উদাহরণটি দিয়েছেন তার মধ্যে কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রাথমিক উন্মেষ প্রতিফলিত হয়েছে। চার্বাক উদাহরণ দিয়েছেন ‘মদশক্তিবৎ’। মদের বিভিন্ন উপাদানগুলি বিশেষ পরিমাণে সমন্বিত করে জ্বাল দিয়ে চোলাই করে মদ তৈরি করা হয়। পৃথকভাবে

অবস্থান কালে মদের উপাদানগুলির মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে মাদকতা শক্তি থাকে না। কিন্তু বিশেষ প্রক্রিয়ায় সমন্বিত হয়ে মদ নামক যে নূতন জিনিসটি উৎপাদন করে সেই বস্তুটির মধ্যেই মাদকতা শক্তির আবির্ভাব ঘটে। এভাবে প্রাণিশরীরের মূল উপাদানগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ায় সমন্বিত হয়ে দেহ নামক নূতন বস্তুটি উৎপাদিত হলেই দেহের চৈতন্য গুণটির আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং এই দেহনিষ্ঠ গুণটি দেহছাড়া থাকতে পারে না। পৃথক একটি আত্মার কল্পনা অনাবশ্যক। চার্বাক আধুনিক যুগে জন্মগ্রহণ করলে মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থের পার্থক্য দেখিয়ে উদাহরণটি সমৃদ্ধ করতে পারতেন। মদ না বলে অ্যালকোহল (C2H5OH) বলতে পারতেন, জল (H2O) বা গ্লুকোস (C6H12O6) থেকে উদাহরণ টানতে পারতেন। দেখাতে পারতেন যৌগিক পদার্থে প্রাকৃতিক নিয়মেই এমন সব নূতন গুণ বা আণবিক পরিবর্তনের সূচনা হয় যা মৌলিক পদার্থে থাকে না। কিন্তু অত প্রাচীন যুগে একজন ভারতীয় দার্শনিক যে অসাধারণ বিজ্ঞানমুখী চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য ভারতীয় হিসেবে আমরা বিস্ময় ও গর্ব অনুভব করতে পারি।'– (হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, চার্বাকদর্শন, পৃষ্ঠা-৩২)

সে যাক্, আপাতত চার্বাকদের দেহাত্মবাদের দার্শনিক গুরুত্ব আরো কিছুটা খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কেননা, অন্যান্য বিদগ্ধ দার্শনিকেরাও এই মতটাকে একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারেননি। ফলে নিজেদের আত্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই দেহাত্মবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে যেন রীতিমতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন।

। দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রয়াস।

এ-পর্যন্ত আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য দার্শনিকেরা সবচেয়ে বড় যুক্তি হিসেবে চৈতন্যের নজির দেখাতে চেয়েছেন। আগুন, বাতাস, জল, মাটি– সবই অচেতন বা জড় বস্তু। দেহের উপাদান হিসেবে আর কিছু মানার সুযোগ নেই; অন্তত চার্বাকেরা আর কিছুই মানতে রাজি নন। কিন্তু এই জাতীয় নিছক জড় বা অচেতন বস্তু দিয়ে যা গড়া তাও তো সহজ সরল যুক্তিতে নেহাত অচেতনই হবার কথা। মানুষ তো আর তা নয়। আমাদের মধ্যে চৈতন্যর পরিচয় রয়েছে। তার ব্যাখ্যাটা কী হবে? কিংবা চৈতন্যর পর্যাপ্ত ব্যাখ্যার জন্য দেহ ছাড়াও দেহস্থ চেতন আত্মা স্বীকার না করে উপায় কী?

উত্তরে চার্বাকেরা বলতে চান, উপায় আছে। বস্তুবিশেষ প্রস্তুতের উপাদানগুলিতে স্বতন্ত্র বা মিলিত অবস্থায় কোনো গুণ বা লক্ষণের পরিচয় না থাকলেও সেগুলিরই কোনো একরকম বিশেষ পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ওই গুণ বা লক্ষণের উদ্ভব এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। নজির : মদশক্তি। যেমন মদের গুণ, চৈতন্যও তেমনি দেহেরই গুণ। মদ তৈরির কোনো উপকরণে মদশক্তির পরিচয় নেই। তেমনি দেহ গঠনের কোনো উপকরণেও চৈতন্যের পরিচয় নেই। উভয় ঘটনাই সমজাতীয়।

শুধু শঙ্করাচার্যের কথাই নয়, ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য প্রখ্যাত প্রতিনিধিদের লেখা থেকেও অনায়াসেই বোঝা যায়, দেহাত্মবাদ নিয়ে যত বিতর্ক তার মধ্যে মূল কথা বলতে একটাই। এর সঙ্গে অবশ্য অনেকে অনেক সময় অনেক রকম বাড়তি যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন– পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাকমত বর্ণনা প্রসঙ্গেও করেছেন, খণ্ডন প্রসঙ্গেও। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন,–

‘অত্যুক্তির অপবাদ না কুড়িয়েও বলা যায়, অনেকে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও যুক্তিকৌশলের উৎকর্ষ দেখাবার উৎসাহেই করেছেন বলে সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা, চার্বাকদের পক্ষে যে-ধরনের কূট তর্ক আদপেই তোলবার দরকার ছিলো না, স্বাভাবিকও নয়, এমনতর অনেক কথাই দেহাত্মবাদের বিচার প্রসঙ্গে অনেকের লেখায় চোখে পড়ে। উৎসাহী-পাঠকেরা তার নমুনা হিসেবে প্রভাচন্দ্র, শান্তরক্ষিত, কমলশীল বা গুণরত্নের বিস্তৃত আলোচনা উলটে দেখতে পারেন। কিন্তু কথা হলো, চার্বাকপক্ষ থেকে দেহাত্মবাদের সমর্থনে যেটা সবচেয়ে মোক্ষম নজির বলে মনে করার পর্যাপ্ত কারণ আছে– অর্থাৎ ওই মদশক্তির নজির– তা বাস্তবিকই খণ্ডন করবার চেষ্টা কতটুকু সার্থক হয়েছে? এই নজির খণ্ডন করতে না-পারলে হাজারো রকম কূট তর্কের অবতারণা করলেও দেহাত্মবাদ কি সত্যিই খণ্ডন করা যায়?’- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৮২)

এক্ষেত্রে আমরা একান্তই আগ্রহী পাঠকের জ্ঞাতার্থে প্রথমে এ-ধরণের যুক্তি-তর্ক বিস্তারের কিছু সংক্ষিপ্ত নমুনা উপস্থাপন করতে পারি দার্শনিক-নজির সংরক্ষণের বাড়তি খেয়ালে। কেননা আমাদের ভুলে গেলে চলে না যে, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে দেহ ও আত্মা বিষয়ক

বিতর্কটাই আসলে সবচেয়ে মৌলিক প্রপঞ্চ এবং তার উপরেই মূলত স্ব-স্ব দর্শনগুলির অন্য সব তত্ত্ব উপস্থাপনের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। এই নমুনা উপস্থাপন শেষে, এরপর, চার্বাকী দেহাত্মবাদী সিদ্ধান্ত যাচাই ও পর্যালোচনা করে উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার একটা যৌক্তিক উপায় অন্বেষণ করে সে-মোতাবেক এগিয়ে যাবার প্রয়াস নেবো। উল্লেখ্য, দেহাত্মবাদ খণ্ডনে বিভিন্ন দার্শনিকদের যুক্তি বিস্তারের নমুনা চয়নে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রধানত লতিকা চট্টোপাধ্যায়ের 'চার্বাক দর্শন' গ্রন্থে উপস্থাপিত রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

.

দেহাত্মবাদ খণ্ডনে তর্ক ও যুক্তি বিস্তার :

১.

সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁর 'সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য' গ্রন্থে (সাভা-৩/২০, ২২) দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গে চার্বাকপক্ষের মদশক্তিবৎ দৃষ্টান্তে ত্রুটি প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে বাইরে প্রকাশ না পেলেও সূক্ষ্ম মাদকাশক্তি সুরার উপাদান হিসেবে বর্ণিত দ্রব্যগুলির মধ্যে বর্তমান থাকে এবং এই শক্তি সমষ্টিগতভাবে পরে মাদকতা উৎপাদনের কাজে সহায়তা করে।
বিজ্ঞানভিক্ষুর সমালোচনা এক্ষেত্রে চার্বাকী দৃষ্টান্তকে কতোটা আঘাত করে সেটা বিবেচনার বিষয়, কারণ চার্বাকপক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর আসতে পারে যে সুরার উপাদানে বর্তমান অদৃশ্য মাদকশক্তির মতো জীবদেহের উপাদানেও আমরা প্রচ্ছন্ন চৈতন্যশক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারি।
এ ধরনের চার্বাকী প্রত্যুত্তরের সম্ভাবনাকে বিজ্ঞানভিক্ষুও পরিহার করতে পারেননি। কিন্তু যে যুক্তির আশ্রয় নিয়ে তিনি একে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন, তাকে প্রকৃষ্ট যুক্তির পরিবর্তে পূর্ব-স্বীকৃত অধ্যাত্ববাদী ধারণার অনুকথনই বলা চলে। যুক্তি এখানে আবরণমাত্র। তিনি বলেন যে জীবদেহ সমষ্টিগতভাবে যে ভৌতিক উপাদানে গঠিত সেই উপাদানের সমষ্টির প্রত্যেক অবয়বে সূক্ষ্মভাবে চৈতন্যের উপস্থিতি অনুমান করলে বহুসংখ্যক চৈতন্যশক্তির অবস্থিতি স্বীকার করতে হয় এবং এতে যে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে, সাংখ্য এবং সহযোগী অপর ভারতীয় দর্শনগুলির অনুমোদিত নিত্য এবং অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপের কল্পনায় তা দূর হওয়া সম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে জীবদেহের উপাদানে ব্যষ্টিগতভাবে অদৃশ্য চৈতন্যশক্তির কল্পনা সমীচীন হয় না।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন (সাভা-৫/১৩০), চৈতন্যকে যাঁরা দেহের গুণ বলেন আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁরা এ-ক্ষেত্রে ঘটের দৃষ্টান্তের অবতারণা করে দেখান যে জল আহরণ করা ইত্যাদি ঘটধর্ম ঘটের উপাদান মৃত্তিকাতে থাকে না। কিন্তু জীবদেহে সচেতনতার অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ দৃষ্টান্ত একান্তই দুর্বল এবং এটা গ্রহণ করার বিপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে ভৌতিক পদার্থে বিশেষ কোন গুণের সৃষ্টি সব সময়ে স্বজাতীয় কারণ গুণের সাহায্যে হয়। কাজেই উপাদান কারণে চৈতন্য না থাকলে দেহে চৈতন্যের উপস্থিতি অকল্পনীয়।

২.

চৈতন্য এবং দেহের মধ্যে কার্যকারণভাবের বিদ্যমানতা অস্বীকার করার সময় বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীলও অনুরূপ যুক্তির অবতারণা করেছেন। তিনি তাঁর 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা'য় বলছেন–

'যত্র যদ্ভাবসিদ্ধৌ ন কিংচিৎ প্রমাণমস্তি ন তত্র তদ্ব্যবহারঃ প্রেক্ষাবতা কার্যঃ, যথা বহ্নৌ শীতব্যবহারঃ। নাস্তি চ বুদ্ধিদেহয়োঃ কার্যকারণভাবসিদ্ধৌ কিংচিৎ প্রমাণম্'।
(তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, পৃঃ-৫২৫)
অর্থাৎ : বিশেষ কোন গুণের কোন বস্তুতে সদ্ভাবের পক্ষে কারণ না থাকলে বস্তুটিকে ঐ বিশেষ গুণের সঙ্গে কার্যকারণসম্বন্ধে আবদ্ধ করা যেতে পারে না, যে জন্য আগুনে আমরা শৈত্য আরোপ করতে পারি না। জ্ঞান এবং দেহের কার্যকারণভাব সিদ্ধির পক্ষে কোন প্রমাণ না থাকায় চার্বাক-অভিপ্রেত এই কার্যকারণভাবে পক্ষে কোন যুক্তি নেই।

এই প্রসঙ্গে 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা'তে সাধারণভাবে কার্যকারণ সম্বন্ধ বিচারিত হয়েছে। কমলশীল বলেন–

'যেষামুপলম্ভে সতি উপলব্ধি লক্ষণ প্রাপ্তম্ পূর্বমনুপলব্ধং সদ্ উপলভ্যতে ইত্যেবমাশ্রয়নীয়ম'।
(তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, পৃঃ-৫২৫)
অর্থাৎ : কোন একটি বস্তুর বর্তমানতায় উপলব্ধি লক্ষণযুক্ত অথচ পূর্বে অনুপলব্ধ অপর একটি পদার্থ যদি উপলব্ধিগোচরে আসে, তাহলে প্রথম বস্তুটিকে দ্বিতীয়টির কারণ বলা যেতে পারে।

এই কার্যকারণতার বিচার অন্যভাবেও করা চলে। কমলশীল বলছেন, দুটি বস্তু বা ঘটনার তুলনামূলক পর্যালোচনায় যদি দেখা যায় যে প্রথমটির ভিতর দ্বিতীয়টির উৎপাদনের উপযোগী বিভিন্ন উপাদানের বর্তমানতা সত্ত্বেও বিশেষ একটি উপাদানের অভাবে দ্বিতীয়টির আবির্ভাব সম্ভব হয় না; সদ্ভাবে হয়, তাহলে–

'সৎসু তদন্যেষু সমর্থেষু তদ্ধেতুষু যস্যৈকস্যাভাবে ন ভরতীত্যেবং আশ্রয়নীয়ম্'।
(তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, পৃঃ-৫২৬)
অর্থাৎ : যে বিশেষ উপাদানের সদ্ভাবে দ্বিতীয়টির উৎপন্ন বা উপলব্ধি হয় তাকেই দ্বিতীয়টির কারণ হিসেবে নির্দেশ করা উচিত, অপরগুলিকে নয়।

যে কোন দুটি পদার্থের পারস্পরিক কার্যকারণভাবের সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য এই সদ্ভাব এবং অভাবগত উভয়বিধ মানেই প্রথমে বিচার করা প্রয়োজন। একমাত্র এই উপায়ের মাধ্যমেই কারণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে সেই উপাদানকে যার বিশেষ উপস্থিতি আলোচ্য কার্যগুণকে উৎপন্ন করেছে।

'কমলশীলের মতে দেহকে মনোগত বিজ্ঞানের কারণ হিসাবে নির্দেশ করার ব্যাপারে এই উভয় প্রকার মানের প্রয়োগ সম্ভব নয়। সদ্ভাবগত মানে বিচারের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভ্রূণ অবস্থায় দেহের সঙ্গে মনের সম্বন্ধের বিষয়ে কিছু বলা অসম্ভব, কারণ ভ্রূণের

মানসিক শক্তির বিকাশ হয় না। যে কোন বস্তু পর্যবেক্ষণ করার ব্যাপারে এই বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অপর প্রাণীর মন কেউ পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম নয়; কাজেই সে ক্ষেত্রেও দেহ এবং মনের কার্যকারণ সম্বন্ধের বিচার করা চলে না। অভাবগত মানের সম্ভাব্যতার বিপক্ষে বলা যেতে পারে যে শরীরের বিনাশের সঙ্গে একযোগে মনেরও বিলোপ হয় কিনা কারও পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, সে শরীর নিজেরই হোক বা অপরেরই হোক। মৃতদেহে গতিশীলতার অভাব থেকে মৃত ব্যক্তির মনোগত বিজ্ঞানের বিনাশ কল্পনা করা অসঙ্গত। কারণ, অপর কোন হেতুর অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে পরিহার করা চলে না, যা মৃত্যুর পরেও বর্তমান এই মানসিক বিজ্ঞানকে মৃতদেহে সচলতা সৃষ্টির পথে বাধা দেয়। কমলশীল এ ব্যাপারে বৌদ্ধ মত ঘোষণা করে বলেন যে মৃত্যুর পূর্বে প্রাণীদেহে অধিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বর্তমানতা প্রাণীটির মৃত্যুর পরেও অনস্বীকার্য। কিন্তু এই বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সত্ত্বেও মৃত প্রাণীর দেহে সচলতার অভাবের কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেন যে মৃত্যুর পূর্বে ঐ বিশেষ দেহটিকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানগত বাসনা ও অবিদ্যার রূপায়ণের যে প্রয়োজন ছিল, সেই প্রয়োজনবোধ তখন লুপ্ত এবং সেইজন্যই দেহটিকে পরিচারিত করার ক্ষমতা বিজ্ঞানটির তখন আর থাকে না।'- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৯৭)

আমরা নিশ্চয়ই টের পেতে শুরু করেছি যে দেহাত্মবাদের দার্শনিক যুক্তিবিচার কোত্থেকে কোনদিকে বিস্তারিত হতে শুরু করেছে। প্রসঙ্গত এখানে দার্শনিক পরিভাষার 'জ্ঞান' শব্দটি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা রাখা আবশ্যক। ব্যবহারিক জগতে কোন বিষয় বা বস্তুকে জানার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যায়। বহির্জগতের কোন বস্তুর বিশেষ রূপ যখন আমাদের অন্তর্লোকে প্রতিভাত হয়, তখন আমরা সেই বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন অনুসারে জ্ঞানের এই সব ব্যক্তিগত প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্ম-চৈতন্যের বিশেষ অভিব্যক্তি। বৌদ্ধরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে ক্ষণিক বিজ্ঞানপ্রবাহ এই ব্যষ্টি জ্ঞানের আশ্রয়। কিন্তু এ বিষয়ে উভয় শ্রেণীর দার্শনিকেরাই একমত যে মনের এই সচেতন অভিব্যক্তিকে জড় দেহের সঙ্গে একাত্ম করা চলে না এবং এদের উৎপত্তির কেন্দ্র হিসেবে বাহ্যবস্তুনিরপেক্ষ চৈতন্যের বৃহত্তর প্রবাহকে নির্দেশ করা উচিত।

বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত এবং কমলশীল তাঁদের 'তত্ত্বসংগ্রহ' এবং 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা' গ্রন্থে যখন লোকায়ত মত নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত তখন বৌদ্ধ পরিভাষা অনুসারে 'জ্ঞান' 'মনোধী' 'মনোবুদ্ধি' ইত্যাদি শব্দেরই তাঁরা ব্যবহার করেছেন 'চৈতন্য', 'আত্মা' ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে। এই প্রসঙ্গে তাঁরা চার্বাক মতের বিবরণ দিয়েছেন কম্বলাশ্বতর নামে এক লোকায়তিকের মত উদ্ধৃত করে। এই মত অনুসারে–

'কায়াদেব ততো জ্ঞানং প্রাণাপানাদ্যধিষ্ঠিতাৎ, যুক্তং জায়ত ইত্যেতং কম্বলাশ্বতরোদিতস'। (তত্ত্বসংগ্রহ-১৮৬৪)

অর্থাৎ : কম্বলাশ্বতর বলেন– প্রাণ, অপান ইত্যাদি বায়ুর দ্বারা অধিষ্ঠিত দেহ জ্ঞানের আশ্রয়।

কিন্তু, শান্তরক্ষিত বলেন, চার্বাক মতে জ্ঞানের একমাত্র প্রকাশ অর্থাবগতির মধ্যে। যেমন–

'ন চার্থাবগতেরন্যদ্রূপং জ্ঞানস্য যুজ্যতে'। (তত্ত্বসংগ্রহ-১৮৬৬)
অর্থাৎ : অর্থাবগতি ছাড়া জ্ঞানের প্রকাশ সম্ভব নয়।

'অর্থ' এখানে বাহ্য বিষয়ের দ্যোতক এবং 'অর্থাবগতি' ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাহ্য বস্তুর প্রকাশনাকে বোঝায়। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য বস্তুর রূপ আমাদের অবগতিতে আসে এবং সেই রূপ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করি। অনুরূপভাবে কর্ণ ইত্যাদি অন্য ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমরা বাহ্য বিষয়ের শব্দ ইত্যাদি জ্ঞাত হই। চার্বাকমতে এই অর্থাবগতি যেখানে নেই জ্ঞানেরও সেখানে অভাব। সেইজন্য সুপ্তি বা মূর্ছা অবস্থাতে জ্ঞানের অস্তিত্ব লোকায়তরা স্বীকার করেন না। তাই, প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্থের প্রকাশনার মধ্যেই চার্বাকেরা জ্ঞানর সীমানা নির্দিষ্ট রাখেন বলে কমলশীলের মন্তব্য–
'ইন্দ্রিয়ার্থবলোদ্ভূতং সর্বং বিজ্ঞানম্'। (তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা-১৯২১)
অর্থাৎ : (চার্বাকমতে) সকল জ্ঞানের উদ্ভব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্থের প্রকাশের মধ্যে।

এই মতের বিরোধিতা প্রসঙ্গে কমলশীল বলেন যে, আমাদের স্বপ্নাবস্থার জ্ঞানের উপযুক্ত কারণ চার্বাকী বিবরণে নির্ণীত হয়নি। স্বপ্নে আমরা যা দেখি ইন্দ্রিয় বা বাহ্য অর্থের উপস্থিতি ব্যতীতই তা আমাদের মনে প্রতিভাত হয়। স্বপ্নাবস্থার এই জ্ঞানকে মনোবিজ্ঞান বলা চলে। এই মনোবিজ্ঞান স্বনির্ভর এবং ইন্দ্রিয় অথবা বাহ্য বস্তুর কোন অপেক্ষা রাখে না। স্বপ্নে বা অন্য অবস্থায় এই স্বনির্ভর বিজ্ঞানের সুপরিস্ফুট অস্তিত্ব থেকে বিজ্ঞান কেবলমাত্র অর্থাবগতির মাধ্যমে প্রতিভাত– লোকায়তদের এই উক্তি নিরর্থক প্রমাণিত হয়।
কমলশীলের বিবরণী পাঠে বোঝা যায় যে সুপ্তি, মূর্ছা ইত্যাদি অবস্থাতে চিত্তের স্ববেদনানুপলম্ভ বা অনুপলব্ধিই চেতনার তৎকালীন অবর্তমানতার সিদ্ধান্তে চার্বাকদের উপনীত হতে সাহায্যে করেছে। স্বসংবেদনের অনুপলব্ধির মূলে আছে উদাহৃত অবস্থাগুলিতে সংবেদনার অস্তিত্বে নিশ্চয়তাবোধের অভাব। কমলশীলের মতে চিত্তের স্বসংবেদন সম্বন্ধে যে নিশ্চয়তাবোধের অভাব চার্বাকদের এই ধারণার ভিত্তি, সেই অভাবই প্রকৃতপক্ষে সুপ্তি, মূর্ছা ইত্যাদি অবস্থায় চিত্ত বা মনের উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে।

শান্তরক্ষিত এবং কমলশীলের রচনায় এ প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে যেখানে প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য উত্তর এবং সেই উত্তরগুলিরও প্রত্যুত্তর লিপিবদ্ধ হয়েছে। চার্বাক পক্ষ থেকে বৌদ্ধমতের বিরোধিতা প্রসঙ্গে আপত্তি দেখানো হয় যে, জাগরিত অবস্থায় আমরা নিদ্রা বা মূর্ছাকালীন বিজ্ঞানকে যে স্মরণ করতে পারি না তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে নিদ্রাগত বা মূর্ছিত অবস্থায় বৌদ্ধস্বীকৃত বিজ্ঞানের সদ্ভাবের ধারণা ভ্রান্ত।
শান্তরক্ষিত উত্তরে বলেন যে অস্তিত্ব সত্ত্বেও জ্ঞানের অস্পষ্টতা এই অস্মরণের প্রকৃত কারণ। কমলশীল এ প্রসঙ্গে স্বপক্ষের বক্তব্য আরও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করেন। নিদ্রা বা মূর্ছাভঙ্গের পর মানুষের যে প্রথম বোধ হয় তার জনক বাহ্যবস্তুনিরপেক্ষ এই কারণ বিজ্ঞান, নিদ্রা বা মূর্ছা অবস্থাতেও যার অস্তিত্ব অব্যাহত ছিলো। পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মরণকালে স্মৃতির

উদ্ভবের সময়েও এই কারণ বিজ্ঞানেরই কার্যকরিতা দেখা যায়। কমলশীল আরও বলেন যে সুপ্তি, মূর্ছা ইত্যাদি অবস্থায় এ ধরনের কোন বিজ্ঞানের যদি অস্তিত্ব না থাকতো তাহলে ঐ অবস্থাগুলি মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত হতো।

কিন্তু লোকায়তবাদীরা এ প্রসঙ্গে বলতে চান যে উদাহৃত অবস্থাগুলিতে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব লুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যু হয় না, কারণ জাগরণকালে আবার সম্পূর্ণ নতুন বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। উত্তরে 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা'তে (পঞ্জিকা-১৯২৮-৩০) বলা হয়েছে যে, এভাবে নতুন বিজ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করলে মানুষের মৃত্যু কোন রকমেই ব্যাখ্যা করা চলে না। কারণ নতুন বিজ্ঞানের উদ্রেকে যেখাবে মানুষের নিদ্রা বা মূর্ছা ভঙ্গ হয়, সেইভাবে তার মৃত অবস্থারও অবসান হতে পারে এবং এভাবে মৃত ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় জীবিত হবার পথে কোন বাধা থাকে না। মোট কথা, চার্বাক মতের বিরোধিতা প্রসঙ্গে বৌদ্ধ দার্শনিকদ্বয় এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন যে–
'স্বতন্ত্রা মানসী বুদ্ধিশ্চক্ষুরাদ্যনপেক্ষণাৎ, স্বোপাদানবলেনৈব স্বপ্নাদাবিব বর্ততে'।
(তত্ত্বসংগ্রহ-১৯২৯)
অর্থাৎ : সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানসী বুদ্ধি বা মনোগত বিজ্ঞান ইন্দ্রিয় অথবা বাহ্য বিষয়ের অপেক্ষা না রেখেই স্বীয় অস্তিত্বে বিরাজমান।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তাঁরা বাস্তবে অসম্ভব আকাশ-কুসুম ইত্যাদি ধারণার উদাহরণ দেন। কারণ, তাঁরা বলতে চান (তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা-১৯৩১-২), এই জাতীয় জ্ঞানের আবির্ভাবের ঠিক পূর্ববর্তী ঘটনা হিসেবে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্য বস্তুর যোগগুলিকে কখনোই নির্দেশ করা চলে না এবং চিত্তস্থিত পূর্ববর্তী এক ধারণার কার্যকরিতা সব সময়ে এই জ্ঞানে প্রভাব বিস্তার করে। সে ধারণার অনুপস্থিতিতে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় এবং অর্থের সংযোগে কোনক্রমেই এ জ্ঞান সম্ভব হয় না।
দেহ যদি এই মনোবুদ্ধির উৎস হতো তাহলে দেহগত বৈকল্যের ফলে মানসিক বিজ্ঞানেরও বিকলতা দেখা যেতো। এ ছাড়াও হস্তী ইত্যাদি বৃহৎ শরীরধারী জীবের মানসিক ক্ষমতার কাছে ক্ষুদ্রতর অবয়ব বিশিষ্ট মানুষের মনের শক্তি নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতো।
কমলশীল এক্ষেত্রে যুক্তি দেখান যে, একটির পরিবর্তন বা তারতম্যের উপর অপরটির পরিবর্তন বা তারতম্য নির্ভরশীল না হলে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির কারণ বলা চলে না। স্বতন্ত্র মনোবিজ্ঞানের অস্তিত্বের বিরোধী চার্বাকেরা যদি ইন্দ্রিয়সমষ্টি যুক্ত দেহতেই কেবল মনের কারণতা আরোপ করেন, তাহলেও তাঁদের মত গ্রহণযোগ্য হয় না। কারণ, সে ক্ষেত্রে যে কোন ইন্দ্রিয়ের হানি হলেই মানসিক শক্তির বৈলক্ষণ্য দেখা দিতো। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা এর বিপরতীত সাক্ষ্যই বহন করে। ফলে কমলশীল বৌদ্ধমতের সমর্থনে বলেন–
'প্রসুপ্তিকারোগাদিনা কার্যেন্দ্রিয়াদীনামুপঘাতেহপি মনোধীর বিকৃতৈকাবিকলাং স্বসত্তামনুভবতী'। (তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা-১৯৩৪)
অর্থাৎ : পক্ষাঘাত ইত্যাদি ব্যাধিতে কর্মেন্দ্রিয়গুলির সব রকম কার্যক্ষমতা বিনষ্ট হলেও মন

তার পূর্ণ শক্তিতে সজীব থাকে।

আবার অনেক সময় শারীরিক অবস্থা সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও মানসিক প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য শারীরিক অবস্থা মানসিক ভাবকে কিছুটা প্রভাবান্বিত করে; কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে মনের বিনাশ শরীরের বিলোপের উপর নির্ভরশীল।

চার্বাকেরা হয়তো বলতে পারেন যে দেহ এবং মনোবিজ্ঞানের সহস্থিতি দেহকে এই বিজ্ঞানের কারণ হিসেবে চিন্তা করার একটি প্রধান কারণ। কিন্তু মনোবিজ্ঞান যেমন দেহের সঙ্গে সব সময়ে একত্র অবস্থান করে, দেহও সেইরকম মানসিক জ্ঞানের সঙ্গে সর্বদা একত্রবর্তী; কাজেই যে যুক্তির বলে দেহ মনের কারণ হিসেবে নির্দেশিত, সেই একই যুক্তির প্রভাবে মনোবিজ্ঞানও দেহের কারণরূপে বিবেচিত হতে পারে।
কমলশীলের মতে (তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা-১৯৩৪), কেবলমাত্র সহস্থিতি থেকেই কার্যকারণতার বিচার অযৌক্তিক; কারণ, দুটি পদার্থের সহস্থিতিভাবের মূলে তৃতীয় অপর একটি পদার্থের উপস্থিতির সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা চলে না। কাজেই বিজ্ঞানের দেহমূলকতা সম্বন্ধে চার্বাকী ধারণা বৌদ্ধ মতে গ্রহণযোগ্য নয় এবং দেহ বিনষ্ট হলেও এই বিজ্ঞানের লুপ্ত হবার কোন আশঙ্কা নেই বলে বৌদ্ধ দার্শনিকেরা মনে করেন।

৩.
ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা অবশ্য চার্বাকী অভিমতকে প্রতিহত করার জন্যেই এক্ষেত্রে ‘বিজ্ঞান’ বা ‘মনোবুদ্ধি’ পদের পরিবর্তে ‘চৈতন্য’ শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। জীবদেহ যে জীব-চৈতন্যের উৎস তার সমর্থনে চার্বাকদের যুক্তি এঁরা প্রথমে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং পর স্বপক্ষীয় যুক্তির সাহায্যে এই চার্বাকী যুক্তি প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হয়েছেন।
ইতোমধ্যে এই আলোচনার পূর্বভাগে অদ্বৈত বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যের ‘ব্রহ্মসূত্রভাষ্য’ বা ‘শাঙ্করভাষ্য’-এ শঙ্কর-বর্ণিত চার্বাকী দেহাত্মবাদের বর্ণনার কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।

আচার্য শঙ্করের ভাষ্যগ্রন্থে (শাঙ্করভাষ্য-৩/৩/৫৩) এ প্রসঙ্গে চার্বাকপক্ষের যে যুক্তিগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে তার মধ্যে একটি যুক্তি অনুসারে চৈতন্য থেকে ইচ্ছা, দ্বেষ ইত্যাদি যে মনেবৃত্তিগুলির উদ্ভব, সেগুলি আমাদের শরীর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সব কাজে প্রেরণার উৎস হওয়ায়, চৈতন্যকে শরীরের ধর্ম বলে স্বীকার করা উচিত।
এ ব্যাপারে চার্বাকী অন্য একটি যুক্তির বিবরণও শঙ্করাচার্যের গ্রন্থে আছে। যুক্তিটি এই রকম– কোন বস্তু বর্তমান থাকলে যা দৃশ্য, কিন্তু বস্তুটি অবর্তমানে যা অদৃশ্য, তাকে ঐ বস্তুর ধর্ম বা গুণ বলে ধরে নিতে হয়। উষ্ণতা, দীপ্তি ইত্যাদিকে অগ্নিধর্ম বলা চলে এই যুক্তিরই অনুসরণে; কারণ, আগুনের উপস্থিতিতেই এদের বর্তমানতা, আগুন না থাকলে নয়। প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতি ইত্যাদি সচেতনতার যে সব প্রকাশকে আত্মবাদী দার্শনিকেরা আত্মার

ধর্ম বলে মনে করেন সেগুলি প্রকৃতপক্ষে দেহতেই বর্তমান এবং দেহের অনুপস্থিতিতে এদের কোন অস্তিত্ব থাকে না; কাজেই এগুলি দেহেরই ধর্ম, দেহব্যতিরিক্ত অন্য কিছুর নয়।

চার্বাকমত খণ্ডন করতে গিয়ে স্বভাবসুলভ সহজ-সরল যুক্তি বিস্তার করে শঙ্করাচার্য বলেন, কোন একটি বস্তুর বর্তমানতার সঙ্গে আর একটির উপস্থিতি জড়িত থাকতে দেখা গেলেই প্রথম বস্তুটিকে দ্বিতীয়টির কারণ হিসেবে নির্দেশ করা চলে না। কাজেই উপরের যুক্তির অনুসরণে সেই গুণগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধী গুণান্তর অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমান থাকতে দেখা যায়। শ্যামবর্ণ ও রক্তবর্ণ এইভাবে দ্রব্যবর্তী পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি গুণ। প্রতিদ্বন্দ্বী এই উভয় গুণের এক দ্রব্যে একই সময় অবস্থান সম্ভব নয়। সেইজন্য কোন একটি গুণ দ্রব্য থেকে বিলীন হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী অপর গুণের দ্রব্যে আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়– যেমন অগ্নিপাককে উপলক্ষ করে ঘটগত শ্যামবর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী রক্তবর্ণে রূপান্তর লাভ করে। চৈতন্যকে কিন্তু দ্রব্যগত এই ধরনের গুণগুলির সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত করা চলে না। কারণ, চৈতন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী এমন কোন গুণ দেখা যায় না যার সঙ্গে চৈতন্যের সহাবস্থান সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে চৈতন্য শরীরের গুণ হলে বিনাশের পূর্ব পর্যন্ত শরীর অবশ্যই চৈতন্যযুক্ত থাকতো, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যের সঙ্গে এ ধারণার সঙ্গতি থাকে না। কাজেই চৈতন্যকে দেহের ধর্ম বলে স্বীকার করা চলে না।

অন্যান্য দার্শনিকদের মতো অদ্বৈত বেদান্তের প্রবক্তা শঙ্করাচার্য (শাঙ্করভাষ্য-৩/৩/৫) মরণোত্তর প্রাণীদেহে সচেতন অভিব্যক্তির অনুপস্থিতির সাক্ষ্য থেকে চৈতন্যের দেহধর্মতার প্রতিকূলে অভিমত প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে দেহ অবর্তমানে চৈতন্যের অভাব সম্বন্ধে চার্বাকী সিদ্ধান্তকেও তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মতে রঙ, আকার ইত্যাদি দেহধর্মগুলি দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সকলের প্রত্যক্ষযোগ্য, কিন্তু চৈতন্য, স্মৃতি ইত্যাদি সকলের অনুভবগ্রাহ্য নয়। তা সত্ত্বেও প্রাণীর জীবিতকালে প্রাণীদেহে ঐগুলির উপস্থিতি সাধারণভাবে সকলের স্বীকৃত। দেহ ধ্বংস পাবার সঙ্গেই চৈতন্য ইত্যাদিও বিনষ্ট হয়– চার্বাকদের এ ধারণার মূলেও শঙ্করাচার্য প্রমাণের কোন সমর্থন পান না। চার্বাকী সিদ্ধান্তের অনুকূলে প্রমাণের অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে শঙ্করাচার্য ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে অনুমোদিত শ্রুতিপ্রমাণের ভিত্তিতে আত্মা সম্বন্ধে স্বীয় অভিমতকে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে দেহস্থিত এই চৈতন্যের বিনাশ নেই এবং এই চৈতন্যই আত্মা সংজ্ঞায় অভিধেয়। সাধারণত দেহের সঙ্গে যুক্ত অবস্থাতেই কেবল আত্মা আমাদের জ্ঞানের গোচরীভূত, কিন্তু এ থেকে দেহের বাইরে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না।

চৈতন্য আর দেহ যে ভিন্ন ভিন্ন সত্তা তার সমর্থন করে শঙ্কর অন্যত্র বলেন যে, প্রাণী অঙ্গের সর্বত্রই চৈতন্যের ব্যাপ্তি দেখা যায়– হস্ত, পদ ইত্যাদি প্রাণীদেহের প্রত্যেকটি অবয়বই সচেতন। শরীর চৈতন্যের উৎপত্তিস্থল হলে শরীরের প্রতিটি অবয়ব স্বস্থানবর্তী চৈতন্যের জনক হতো এবং এর ফলে একই শরীরে বহু চৈতন্য সৃষ্টির প্রসঙ্গকে পরিহার করা সম্ভব

হতো না। প্রতিদেহবর্তী প্রাণীর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কিন্তু চেতনার ঐক্য প্রকাশ পায় যার ফলে মানুষের এক বিশেষ অবয়ব, হস্ত, যে প্রেরণার বশবর্তী হয়ে খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করে, তার রসনা সেই প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। প্রাণীদেহের প্রতিটি অঙ্গের এ ধরনের ঐক্যবদ্ধ সঙ্গতিপূর্ণ কাজের ব্যাখ্যা এক দেহে বহু চৈতন্যের স্বীকৃতিতে সম্ভব নয়। শঙ্করের যুক্তিগুলির অনুরূপ যুক্তি ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের 'ন্যায়ভাষ্যে'ও বিশদভাবে রয়েছে।

৪.

এ প্রসঙ্গে ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তাঁর 'ন্যায়ভাষ্যে' বলেন যে,–

'শরীরং শরীরাবয়বাশ্চ সর্ব্বে চেতনোৎপত্ত্যা ব্যাপ্তা ইতি ন ক্বচিদনুৎপত্তিশ্চেতনায়াঃ, শরীরবচ্ছরীরাবয়বাশ্চেতনা ইতি প্রাপ্তং চেতনবহুত্বং। তত্র যথা প্রতিশরীরং চেতনবহুত্বে সুখদুঃখজ্ঞানানাং ব্যবস্থা লিঙ্গং, এবমেকশরীরেহপি স্যাৎ? নতু ভবতি, তস্মান্ন শরীর গুণশ্চেতনেতি।' (ন্যায়ভাষ্য-৩/২/৫০)

অর্থাৎ :

শরীর এবং শরীরের সমস্ত অবয়ব চৈতন্যের উৎপত্তি কর্তৃক ব্যাপ্ত; সুতরাং (শরীরের) কোন অবয়বে চৈতন্যের অনুৎপত্তি নাই, শরীরের ন্যায় শরীরের সমস্ত অবয়ব চেতন এ জন্য চেতনের বহুত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শরীর ও ঐ শরীরের প্রত্যেক অবয়ব চেতন হইলে একই শরীরে বহু চেতন স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে যেমন প্রতিশরীরে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীরে চেতনের বহুত্বে সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানের ব্যবস্থা (নিয়ম) লিঙ্গ, অর্থাৎ অনুমাপক হয়, এইরূপ এক শরীরেও হউক? কিন্তু হয় না, অতএব চৈতন্য শরীরের গুণ নহে। (তর্জমা-ফণিভূষণ তর্কবাগীশ)

বাৎস্যায়নের মতে, বস্তুবিশেষের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক গুণকেই বস্তুটির স্বধর্ম বলে নির্দেশ করা চলে না। উদাহরণস্বরূপ তিনি উষ্ণ কোন আধারস্থিত জলের সঙ্গে যুক্ত তরলতা এবং উষ্ণতা, এই গুণ দুটির উল্লেখ করেন। তাঁর মতে জলের স্বধর্ম প্রথমটি, দ্বিতীয়টি নয়; কারণ এই বিশেষ ক্ষেত্রে জলে উষ্ণতা দেখা গেলেও ভিন্ন আধারস্থিত জলে তা অদৃশ্য। ন্যায়ভাষ্যে বলা হয়েছে–

'স্বগুণোহপ্স, দ্রবত্বমুপলভ্যতে, পরগুণশোষ্ণতা। তেনাহয়ং সংশয়ঃ, কিং শরীরগুণশ্চেতনা শরীরে গৃহ্যতে? তথ দ্রব্যান্তরগুণ ইতি'। (ন্যায়ভাষ্য-৩/২/৪৬)

অর্থাৎ :

জলে স্বকীয় গুণ দ্রব্যত্ব উপলব্ধ হয়, পরের গুণ অর্থাৎ জলের অন্তর্গত অগ্নির গুণ উষ্ণতাও উপলব্ধ হয়। অতএব কি শরীরের গুণ চেতনা শরীরে উপলব্ধ হয়? অথবা দ্রব্যান্তরের গুণ চেতনা শরীরে উপলব্ধ হয়? এই সংশয় জন্মে।

তাঁর মতে, জলের সঙ্গে এইভাবে বহু ক্ষেত্রে যুক্ত হলেও উষ্ণতা প্রকৃতপক্ষে আগুনের স্বধর্ম।

অনুরূপভাবে দেহের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে যুক্ত থাকার নিদর্শন থেকেই চৈতন্যের দেহধর্মতার অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেওয়া সমীচীন হয় না। দৃষ্টান্তস্থিত উষ্ণতা যেমন জল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আগুনের ধর্ম, চৈতন্যকেও সেইরকম দেহ থেকে পৃথক আত্মার স্বভাব বলা চলে। শরীরের স্বধর্ম হিসেবে বাৎস্যায়ন কৃষ্ণ, গৌর ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দেহবর্ণের উল্লেখ করেন, যার অস্তিত্ব প্রাণীদেহে সব সময়েই থাকে, এমনকি মৃত প্রাণীর শরীরেও। আগুনের সঙ্গে উষ্ণতার একত্র বর্তমানতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে চার্বাকেরা যখন দেহকে চৈতন্যের কারণ হিসেবে নির্দেশ করেন, তখন তাঁদের উপস্থাপিত দৃষ্টান্ত স্পষ্টতই ত্রুটিমুক্ত হয় না। উষ্ণতা এবং দীপ্তির সঙ্গে আগুনের যোগ সব সময় থাকে। এ থেকে বোঝা যায় যে এগুলি আগুনের স্বভাব, কারণ স্বভাব তার আশ্রয়কে কখনও পরিত্যাগ করে না। চৈতন্যের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক কিন্তু অনুরূপ নয়। চৈতন্য সব সময়ে দেহকে কেন্দ্র করেই বিকশিত এবং দেহ অবর্তমানে চৈতন্য অদৃশ্য– চার্বাকপক্ষের এ বক্তব্য অস্বীকার্য নয় বটে, কিন্তু মৃত্যু বা সংজ্ঞাহীনতার কবলিত অচেতন দেহের অস্তিত্বও সকলের কাছে সুপরিচিত। কাজেই উষ্ণতার সঙ্গে আগুনের স্বাভাবিক সম্পর্কের দৃষ্টান্ত চৈতন্যের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। এ-প্রসঙ্গে ‘ন্যায়ভাষ্যে’ বাৎস্যায়ন বলেন–

‘ন রূপাদিহীনং শরীরং গৃহ্যতে, চেতনাহীনন্তু গৃহ্যতে, যতোষ্ণতাহীনা আপঃ, তস্মান্ন শরীরগুণশ্চেতনেতি।’- (ন্যায়ভাষ্য-৩/২/৪৭)
অর্থাৎ : রূপাদিশূন্য শরীর প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু চেতনাশূন্য শরীর প্রত্যক্ষ হয়, যেমন উষ্ণতাশূন্য জল প্রত্যক্ষ হয়,– অতএব চেতনা শরীরের গুণ নহে।

চার্বাকদের সমালোচনা করার সময় চার্বাকী যুক্তির এই ত্রুটির উল্লেখ অনেকেই করেছেন। সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুর (সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য-৩/২১) মতে মৃত্যুর পরে এবং অন্য নানা অবস্থায় দেহের মধ্যে চৈতন্যের যে অভাব দেখা যায় তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে চৈতন্য দেহের স্বাভাবিক ধর্ম নয়।

এই মতের বিরোধিতা প্রসঙ্গে দেহাত্মবাদীদের পক্ষ থেকে যে ধরনের আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে সে সম্বন্ধেও ন্যায়ভাষ্যে আলোচনা আছে। তাঁরা হয়তো বলতে পারেন যে প্রাণীদেহে চৈতন্যের মতো ঘটে যে শ্যাম রূপের প্রকাশ, সেই রূপও ঘটদেহে চিরকাল থাকে না। অগ্নিদগ্ধ ঘটে এই রূপ সম্পূর্ণ রূপে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রূপকে ঘটের উপাদানের ধর্ম বলতে কারও দ্বিধা নেই। অনুরূপভাবে চৈতন্যকেও ভৌতিক উপাদানে গঠিত জীবদেহের ধর্ম বলে স্বীকার করতে অসম্মত হওয়া উচিত নয়।
আপত্তির উত্তরদান প্রসঙ্গে বাৎস্যায়ন বলেন যে উল্লিখিত দৃষ্টান্তটি এ ক্ষেত্রে সঠিক প্রযোজ্য নয়। ঘটের শ্যামতার যে বিলুপ্তি দেখা যায়, তা প্রকৃতপক্ষে অবস্থার রূপান্তর মাত্র। অগ্নিদগ্ধ ঘটে বর্ণের পরিবর্তন হয়– শ্যামবর্ণ রক্তবর্ণে পরিণতি লাভ করে। মৃত প্রাণীদেহে চৈতন্যের যেভাবে সম্পূর্ণ অবলোপ হয়, অগ্নিদগ্ধ ঘটদেহে শ্যামতার অবসান সেভাবে হয় না। এ ক্ষেত্রে বাৎস্যায়ন শরীরস্থিত চৈতন্যের সঙ্গে দ্রব্যগত শ্যামতা ইত্যাদি গুণের প্রভেদের বিষয়

উল্লেখ করে বলেন–
‘নাত্যন্তং রূপোপরমো দ্রবস, শ্যামে রূপে নিবৃত্তে পাকজং গুণান্তরং রক্তং রূপ মুৎপদ্যতে। শরীরে তু চেতনামাত্রোপরমোহত্যন্তমিতি।’- (ন্যায়ভাষ্য-৩/২/৪৮)
অর্থাৎ : দ্রব্যের আত্যন্তিক রূপাভাব হয় না, শ্যাম রূপ নষ্ট হলে পাকজন্য গুণান্তর রক্ত রূপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শরীরে চৈতন্যমাত্রের অত্যন্তাভাব হয়।

৫.
চার্বাকী ভূতচৈতন্যবাদের নিরসন প্রসঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষের দার্শনিকেরা স্বসমর্থিত আত্ম-সম্বন্ধীয় মতবাদের অবতারণা করেছেন– দেহধারী জীবের মধ্যে সচেতনতার অভিব্যক্তির ব্যাখ্যার ব্যাপারে স্বপক্ষীয় মতের উপযোগিতাই যে একমাত্র স্বীকার্য, তা ব্যক্ত করা এ ক্ষেত্রে তাঁদের অভিপ্রায়। নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টের ‘ন্যায়মঞ্জরী’তেও এইভাবে চার্বাকী ধারণার বিপরীত অধ্যাত্মবাদী ধারণা উপস্থাপিত করা হয়েছে।
চার্বাকপক্ষের মতকে প্রতিহত করে স্বপক্ষীয় অভিমতকে এইভাবে উপস্থাপিত করার সময় জয়ন্তভট্ট ভূতচৈতন্যবাদের সমর্থনে চার্বাকী যুক্তির এক বিবরণ দিয়ে বলছেন–
‘ভূতেষ্বন্নপানাদ্যুপযোগপুষ্টেষু পাট্বী চেতনা ভবতি তদ্বিপর্যয়ে বিপর্যয়ঃ,
ব্রাহ্মীঘৃতাদ্যুপযোগসংস্কৃতে চ কুমার শরীরে পটুপ্রজ্ঞতা জায়তে।’- (ন্যায়মঞ্জরী)
অর্থাৎ : (চার্বাকমতে) বুদ্ধি বা চৈতন্যের বিকাশ শরীরের সম্যক পরিপুষ্টির উপর নির্ভরশীল। ভোজন, পান ইত্যাদির দ্বারা দেহ পুষ্ট থাকলেই চৈতন্যের সতেজ স্ফূর্তি দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মীঘৃত অথবা অন্য ঔষধাদি সেবনের ফলে বালকের মধ্যেও যথেষ্ট প্রজ্ঞার সঞ্চার হতে দেখা যায়।

অপর পক্ষে অপুষ্ট শরীরে বুদ্ধি বা চৈতন্য সম্যক বিকশিত হতে পারে না। আবার দধি, আর্দ্র পরিবেশ ইত্যাদি ভৌতিক দ্রব্যের বিবিধ সংস্থান নানাবিধ কৃমি পতঙ্গাদির উৎপত্তির কারণ হয়। চার্বাকদের মতে ভৌতিক দ্রব্য থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি সমর্থনে এই কারণগুলিকে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করা চলে না। ভৌতিক দেহকে চৈতন্যের উৎপত্তিস্থল হিসেবে গণ্য করার কারণ হিসেবে চার্বাকেরা শরীরের মাধ্যমে চৈতন্যলক্ষণযুক্ত ইচ্ছা, দ্বেষ ইত্যাদির আরম্ভ এবং নিবৃত্তির উল্লেখ করেন। শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এবং ন্যায়সূত্র ও ন্যায়ভাষ্যেও ভূতচৈতন্যবাদীদের এই বক্তব্যের অন্তর্ভুক্তি আছে। জয়ন্তভট্ট শরীরের সঙ্গে চৈতন্যকে একাত্ম করার চার্বাকী এই প্রয়াসের বিরোধিতা করার সময় তাঁর স্বভাবসুলভ হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষায় শরীরের নিত্যপরিবর্তনশীলতার বিষয় উল্লেখ করে বলেন–
‘শরীরং চ বাল্যাদ্যবস্থাভেদেন ভিন্নমতন্তস্য নাশ্রয়ো ভবিতুমর্হতি সন্তানান্তরবদ্ যথা হি দেবদত্ত দৃষ্টেহর্থে যজ্ঞদত্তস্য ন স্মরণমেবং বাল শরীরাদ্যনুভূতে যুবশরীস্য তন্ন স্যাৎ।’- (ন্যায়মঞ্জরী)
অর্থাৎ : বাল্যদেহ, যৌবনের দেহ ও বৃদ্ধদেহ ভিন্ন ভিন্ন হলেও বাল্যকালের অভিজ্ঞতা যৌবনে এবং যৌবনের অভিজ্ঞতা বার্ধক্যকালে স্মরণ হয়। দেবদত্ত নামের ব্যক্তির দৃষ্ট অভিজ্ঞতা কি যজ্ঞদত্ত নামের অপর কেউ স্মরণ করতে পারে?

জয়ন্তভট্ট বলতে চেয়েছেন, জীবদেহ প্রতি পদে রূপান্তরিত হয়, শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি দশাভেদে। একের দৃষ্ট বিষয় যেমন অপরকে স্মরণ করতে দেখা যায় না এবং একের স্মৃতি বা অনুভবকে অপরের ইচ্ছার কারণ বলা চলে না সেই রকম ভূতচৈতন্যবাদকে স্বীকৃতি দিলে জীবদেহের কোন অবস্থায় প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের স্মরণ সেই একই জীবের অন্য অবস্থায় ব্যাখ্যা করা যায় না এবং স্মৃত কোন বিষয় থেকেও পরবর্তী অবস্থার দেহে অভিব্যক্ত ইচ্ছাদিকে উৎপন্ন বলা চলে না। কাজেই প্রাণী চৈতন্যের যে ঐক্য পরম্পরাবদ্ধ অর্থবিজ্ঞান, স্মৃতি, ইচ্ছা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিভাত, শরীরের সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থার মধ্যেও যা অভিন্ন এক জীবের পরিচিতি বহন করে, ভূতচৈতন্যবাদের সঙ্গে তার কোন সঙ্গতি নেই।

৬.

স্বতন্ত্র আত্মার ধারণায় বিশ্বাসী দার্শনিকদের প্রতিপক্ষ হিসেবে যে চার্বাকপক্ষ এতক্ষণ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু, চৈতন্যধর্মী আত্মা এই চার্বাকদের মতে দেহের সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু এই শ্রেণীর চার্বাকেরা ছাড়াও–

‘আত্মগত ধারণার ভিত্তিতে আরও তিনটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত চার্বাকদের বর্ণনা সদানন্দের ‘বেদান্তসার’ গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং... ‘বেদান্তসারে’র অভিমতে দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য অনুযায়ী চার্বাকী বৃহৎ গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন স্তর বিন্যাস আছে এবং এই স্তরের প্রকারভেদ অনুসারে চার্বাকেরা স্থূলতম বিষয় থেকে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে ধারণায় সমর্থ, যদিও বেদান্ত-অভিপ্রেত সচ্চিদানন্দরূপী শুদ্ধ আত্মস্বরূপ এঁদের প্রত্যেকেরই অবগতির বহির্ভূত। এই বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত চার্বাকদের মধ্যে দেহাত্মবাদীরাই স্থূলতম ধারণার অংশীদার এবং বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনায় এই দেহাত্মবাদী বা ভূতচৈতন্যবাদীরাই উল্লিখিত হয়েছেন। জয়ন্তভট্ট তাঁর গ্রন্থে আত্মসম্বন্ধীয় আলোচনার প্রসঙ্গে ভূতচৈতন্যবাদ ছাড়াও ইন্দ্রিয় চৈতন্যবাদ এবং মনশ্চৈতন্যবাদ এই দু’ধরনের মতের উল্লেখ করেছেন। সদানন্দের বর্ণনায় ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সঙ্গে যাঁরা আত্মাকে অভিন্ন বলে মনে করেন সেই চার্বাকদের ধারণা চিত্রিত হয়েছে। এই মতবাদগুলির কোনটাই অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের আত্মসম্বন্ধীয় ধারণার সমগোত্রীয় নয় এবং ‘ন্যায়মঞ্জরী’ গ্রন্থেও এই মতবাদগুলির বিরোধিতা করা হয়েছে।
জয়ন্তভট্ট তাঁর আলোচনায় ‘সুশিক্ষিত’ এই বিশেষণের মাধ্যমে আর এক শ্রেণীর চার্বাকদের পরিচিতি দিয়েছেন যাঁদের মতে আত্মা ‘প্রমাতৃতত্ত্ব’, স্থূল দেহ থেকে ভিন্ন। সচেতন ব্যবহারের সব কিছু এই আত্মা বা ‘প্রমাতৃতত্ত্বে’ এই শ্রেণীর চার্বাকেরা আরোপ করেন, কিন্তু এই আত্মার স্থায়িত্ব তাঁদের অভিমত অনুযায়ী শরীরের স্থায়িত্বকে অতিক্রম করে যেতে পারে না এবং দেহনাশের পর এই আত্মার বর্তমানতা এবং দেহান্তর পরিগ্রহ সুশিক্ষিত চার্বাকেরা স্বীকার করেন না।’- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১০৫-৬)

জয়ন্তভট্ট বর্ণিত এই ‘সুশিক্ষিত’ চার্বাকেরা আত্মার দেহ থেকে দেহান্তরে পরিক্রমণের বিরোধিতা করেছেন। ‘ন্যায়মঞ্জরী’র ভাষ্যানুযায়ী এঁরা বলেন–

'যদি হ্যেবং ভবেত্তদিহ শরীরে শৈশবদশানুভূতপদার্থস্মরণবৎ অতীতজন্মানুভূতপদার্থ স্মরণমপি তস্য ভবেন্ন হি তস্য......তস্মাদুর্ধ্বং দেহান্নাস্ত্যেব প্রমাতা'। (ন্যায়মঞ্জরী)
অর্থাৎ :
আত্মা বা প্রমাতার দেহ থেকে দেহান্তরে পরিক্রমণ সম্ভব হলে শৈশবে অনুভূত পদার্থের মতো জন্মান্তরে অনুভূত পদার্থেরও স্মরণে কোন বাধা থাকতো না এবং আমরা বিগত জন্মের ঘটনাগুলির স্মৃতিও অনায়াসেই বহন করতে সমর্থ হতাম। কিন্তু জন্মান্তরের ঘটনা স্মরণ করতে মানুষকে দেখা যায় না। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে শরীর নাশের পর শরীরস্থিত প্রমাতারও অস্তিত্বের লোপ হয়।

'সুশিক্ষিত' বিশেষণে ভূষিত চার্বাকেরা আত্মাকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন বলে স্বীকার না করায় ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের বিচারে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি দেহাত্মবাদী বৃহৎ গোষ্ঠির তুলনায় উন্নততর বলা হলেও এঁরা কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মধারণার সম অংশীদার নন। কারণ তাঁদের অনুমোদিত প্রমাতৃতত্ত্ব দেহ থেকে পৃথক হয়েও দেহেরই সমকালীন বিনাশের কবলে পতিত হয়।
জয়ন্তভট্টের বিবরণীতে এই চার্বাকদের মতবাদে ত্রুটি দেখানো হয়েছে। নৈয়ায়িকেরা কার্যকারণভাবে বিশ্বাসী এবং জয়ন্তভট্টের মতে যে কোন সৎ বস্তুর বিনাশ কল্পনা করতে হলে বিনাশের মূলে নির্দিষ্ট কোন হেতুর আগে স্বীকৃতি হওয়া উচিত। কারণ–
'ন চাস্তিত্বাবিনাভাবী ভাবানাং বিনাশঃ স্বাভাবিকঃ কিন্তু হেত্বন্তরনিমিত্তকঃ'। (ন্যায়মঞ্জরী)
অর্থাৎ : স্বাভাবিকভাবে যাকে সৎ বা বর্তমান বলে স্বীকার করা যায়, কারণ না থাকলে তাকে বিনষ্ট বলে ঘোষণা করা অযৌক্তিক।

নৈয়ায়িক আচার্য জয়ন্তভট্ট নানাভাবে বিচার করে দেখাতে চান যে আত্মার বিনাশের কোন কারণ আবিষ্কার করা সুকঠিন।
অনুমানের মাধ্যমে এই আত্মার বিনাশের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। 'সুশিক্ষিত' সংজ্ঞায় বিশেষিত চার্বাকদের অভিমত হলো আত্মা জড় দেহ থেকে পৃথক। কাজেই জড় বস্তুর ধর্ম আত্মাতে আরোপ করে আত্মার ধ্বংসের কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে না। জড় বস্তুনিচয় প্রধানত অবয়বী, অর্থাৎ বিভিন্ন অবয়ব বা অংশের সংযোগে এদের উৎপত্তি এবং এই অবয়বের বিনাশই এদের বিনাশের হেতু। এ ধরনের অবয়বের বিভাগ জড় বস্তু থেকে ভিন্ন আত্মাতে সম্ভব নয়। দ্রব্যাদির গুণ যেমন আশ্রয়দ্রব্যের বিনাশের সঙ্গে লুপ্ত হয়, আত্মার সেই ধরনের বিনাশও অনুমেয় নয়, কারণ আত্মাকে দ্রব্যবিশেষের গুণ বলা চলে না। কাজেই স্থূল দেহের ধ্বংসের সঙ্গে দেহাতিরিক্ত আত্মার বিলোপের কোন যোগ নেই এবং অন্য হেতু অবর্তমানে দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার সমকালীন এই আত্মার বিনাশের কল্পনা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।
জয়ন্তর মতে দেহাতিরিক্ত এই আত্মার বিনাশ প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও বিরোধী। আত্মার ধ্বংস কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষের গোচরে কখনো আসেনি, যদিও মৃত দেহটির ক্ষেত্রে এ জাতীয়

অভিজ্ঞতা খুব সাধারণ, কারণ অগ্নিদাহ বা হিংস্র পশুর আক্রমণের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে মৃতদেহকে প্রায়ই দেখা যায়।

পরিশেষে জয়ন্তভট্ট মন্তব্য করেন যে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, এই উভয়বিধ প্রমাণের যে কোনটিরই মাধ্যমে দেহনাশের সমকালীন আত্মার বিলোপের সপক্ষে 'সুশিক্ষিত' চার্বাকদের অভিমত গ্রাহ্য হতে পারে না। কাজেই ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে অনুমোদিত নিত্য প্রমাতা বা আত্মার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য ঘোষণা করে বলা হচ্ছে–

'তস্মাদস্তি নিত্যঃ পরলোকে প্রমাতেতি'। (ন্যায়মঞ্জরী)
অর্থাৎ : লোকে বা পরলোকে নিত্য প্রমাতা বা আত্মার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।

৭.

প্রকৃতপক্ষে চার্বাক দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের মৌল বিভেদ আত্মার অমরত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রূপায়িত। আত্মার অমরত্বের ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শনগুলির অনুমোদিত জন্মান্তরবাদ ও পরলোকতত্ত্ব। দেহাতীত যে আত্মা দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয় না একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব পুনরায় নতুন জন্মে এবং নতুন পরিবেশে ভিন্ন দেহের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করা। কিন্তু আত্মার অমরত্বে বা অস্তিত্বে চার্বাকদের কোন সম্মতি নেই। জীবদেহে অভিব্যক্ত চৈতন্যে তাঁরা যে নশ্বরতার ছাপ দেন তা জন্মান্তরবাদের ধারণার সঙ্গে একেবারেই সামঞ্জস্যহীন। বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীলের 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা'য় চার্বাকমত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, চার্বাক মতে দেশান্তর, অবস্থান্তর বা কালান্তরকে পরলোক বলা যায়। চার্বাকমতের বর্ণনায় এ-প্রসঙ্গে একটি লোকায়ত বা বার্হস্পত্য সূত্রেরও উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে–

পরলোকিনোঽভাবাৎ পরলোকাভাবঃ। (তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা-১৮৫৮)
অর্থাৎ : (চার্বাক মতে) যেহেতু পরলোক নাই, তাই পরলোকীও নাই।

এ ব্যাপারে চার্বাকদের সমালোচনায় তৎপর দার্শনিকেরা প্রত্যেকেই আত্মার ক্ষণস্থায়িত্ব বা অস্তিত্বহীনতা সম্বন্ধে চার্বাকী ধারণার বিরোধিতা করেছেন আত্মার অমরত্ব এবং অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণার বিবরণী দিয়ে।
চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শনের অন্য গোষ্ঠির মতো বৌদ্ধদর্শনও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জন্মান্তরবাদের এই বৌদ্ধ ধারণাও স্বাভাবিকভাবে চার্বাকেরা স্বীকার করেন না এবং এই প্রসঙ্গে এই দুই গোষ্ঠির পারস্পরিক তর্কযুদ্ধের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিতের 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থে এবং কমলশীল-কৃত এই গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা'র ব্যাখ্যাতে।

'বৌদ্ধরা আত্মার পরিবর্তে অবিচ্ছিন্ন 'বিজ্ঞান-সন্ততি'র অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেন এবং এই 'বিজ্ঞান' তাঁদের মতে দেহ, মন বা ইন্দ্রিয়– এগুলির কোনটার মাধ্যমেই উৎপন্ন হয় না। এই

'বিজ্ঞান-সন্ততি'র অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিজ্ঞানের জনক ঠিক তার পূর্ববর্তী অপর একটি 'বিজ্ঞান', 'যে বিজ্ঞানে'র কারণরূপে নির্দেশ করা চলে অনুরূপ আর একটি 'বিজ্ঞান'কে। এইভাবে প্রতিটি বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে পূর্ববর্তী অপর বিজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হলে শিশুমনের আদি বিজ্ঞানের কারণরূপেও কোন বিজ্ঞানের অস্তিত্বের ধারণা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদের ভিত্তি এই ধারণাতে। বৌদ্ধরা শিশুমনের আদি চেতনার কারণ হিসেবে পূর্ববর্তী জন্মের অন্তিম বিজ্ঞানকে নির্দেশ করেন। এই উভয় বিজ্ঞান অচ্ছেদ্য কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ থেকে বিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহকে অক্ষুণ্ন রাখে। এইভাবেই গড়ে ওঠে প্রতিটি জন্মের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অপর জন্মগুলির অস্তিত্বের ধারণা।
পূর্ববর্তী জন্মের অন্তিম বিজ্ঞান একমাত্র তখনই পরবর্তী জীবনের বিজ্ঞানের উৎস হয় যখন তা রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি ধর্মের দ্বারা সম্পৃক্ত হয়। সম্পূর্ণভাবে বীতরাগ ব্যক্তি পুরাতন দেহের বন্ধন ছিন্ন হবার পর নূতন দেহের বন্ধনে পুনরায় আবদ্ধ হন না। অন্য মানুষের ক্ষেত্রে পূর্বতন জীবনের বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি মানসিক ধর্ম পরবর্তী জীবনে শিশুমনে সংক্রামিত হয়।'- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১০৮-৯)

কিন্তু চার্বাক মতে দেহই জ্ঞানের একমাত্র আশ্রয় এবং দেহনাশের সঙ্গে দেহাশ্রিত এই জ্ঞানেরও সম্পূর্ণ বিনাশ হয়। বৌদ্ধরা যখন পূর্বজন্মের মরণকালীন চিত্ত বা বিজ্ঞানকে পরবর্তী জন্মের প্রারম্ভিক বিজ্ঞানের কারণ বলেন– অথবা বর্তমান দৃশ্যমান দেহে যে সচেতনতার অভিব্যক্তি তার সঙ্গে অতীত কোন দেহের বিজ্ঞানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্র আবিষ্কার করেন, তখন চার্বাকেরা তার মধ্যে যুক্তির কোন সমর্থন পান না। প্রথমত, পূর্বজন্মবর্তী যে দেহের অবসানকালে জাত বিজ্ঞানকে বৌদ্ধরা বর্তমান দেহের বিজ্ঞানের সঙ্গে কার্যকারণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত করতে অভিলাষী, সেই দেহের অস্তিত্বই চার্বাক মতে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের দ্বারা অসমর্থিত। তাছাড়া দুটি বিভিন্ন দেহবর্তী বিজ্ঞানকে একই বিজ্ঞান প্রবাহে অন্তর্ভুক্ত করার বৌদ্ধ প্রচেষ্টাতেও চার্বাকেরা ত্রুটি খুঁজে পান। 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা'র পূর্বপক্ষীয় বর্ণনায় দেখা যায়, চার্বাকরা বলেন যে–

'ন চৈকসন্তান বর্তিনোশ্চেতসো দেহান্তর সমাশ্রয়ণং যুক্তম্, গজবাজ্যাদিচিত্তবদেকসন্তান-সম্বন্ধিত্বহানি প্রসঙ্গাৎ'। (তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা-১৮৭০)
অর্থাৎ : (চার্বাক বলেন) ভিন্নদেহবর্তী গজ ও অশ্ব অথবা বরাহ ও মহিষের চিত্তকে আমরা কখনও একই বিজ্ঞানসন্তানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না, কারণ এক প্রবাহবর্তী চেতনার ভিন্নদেহ আশ্রয় করার ধারণা অযৌক্তিক।

অতএব, চার্বাকমতে, অনুরূপভবে ইহলোকবর্তী এবং পরলোকগত দেহ পরস্পর ভিন্ন হওয়ার ফলে সেই দেহান্তর্গত বিজ্ঞানগুলিকেও এক অভিন্ন প্রবাহভুক্ত করা চলে না। এক্ষেত্রে বৌদ্ধরা হয়তো বলতে পারেন যে সদৃশ বস্তু থেকেই কেবল অপর সদৃশ বস্তুর আবির্ভাব সম্ভব, অসদৃশ বস্তু থেকে নয় এবং এইজন্যই আদি বিজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করতে হলে পূর্ববর্তী অপর বিজ্ঞানের অস্তিত্বের কল্পনা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

কিন্তু চার্বাকেরা বলবেন যে, এই যুক্তির অনুসরণে ধোঁয়ার কারণ হবার যোগ্যতা কেবল ধোঁয়ারই থাকে, আগুনের নয়। যদি বলা হয়, ধোঁয়া এবং আগুন উভয় বস্তুই 'রূপরূপতা' এই ধর্মে সদৃশ, অর্থাৎ দুটি বস্তুরই রূপ আছে, যা একটিকে অপরটির কারণ হবার যোগ্যতা দিয়েছে, তাহলে চার্বাক পক্ষ থেকেও ভূত এবং বিজ্ঞান উভয়েরই সদৃশ ধর্ম হিসেবে 'স্বলক্ষণরূপতা'কে নির্দেশ করা চলে; অর্থাৎ দুটি বস্তু নিজস্ব লক্ষণযুক্ত রূপে প্রকাশমান এবং এই সদৃশ ধর্মের ভিত্তিতেই একটি অপরটির কারণ হিসেবে নির্দেশিত হতে পারে।
বৌদ্ধরা আপত্তি প্রসঙ্গে বলতে পারেন যে ভৌতিক পদার্থ বিজ্ঞানের মতোই স্বালক্ষণ্যে অবিচল থাকলেও ভৌতিক বস্তুতে বিজ্ঞানরূপতা নেই, যে কারণে বিজ্ঞানের উপাদান কারণ হবার যোগ্যতা ভৌতিক পদার্থে থাকতে পারে না। এর উত্তরে চার্বাকেরা বলতে পারেন যে, এ যুক্তি গ্রহণ করলে আগুনও ধূমের উপাদান কারণ হতে পারে না, কারণ আগুনের মধ্যে ধূমরূপতার অভাব। কাজেই আগুনকে যাঁরা ধোঁয়ার কারণ রূপে নির্দেশ করেন, ভূতসংঘাতকে বিজ্ঞানের জনক বলতে তাঁদের কোন বাধা থাকতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের তর্কযুদ্ধের কোন নির্দিষ্ট পর্যায়ে সীমারেখা টানা যায় না এবং ভূতচৈতন্যবাদীদের সঙ্গে জন্মান্তরবাদের সমর্থকদের যে সংঘর্ষ ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রসারিত তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের যোদ্ধারা বিজয়ীর সম্মান দাবি করেছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষের তর্কবাণের আক্রমণে তাঁরা পরাভূত বলে মনে হয়েছে। প্রকৃত কথা হলো, অন্যান্য বহু বিষয়ের মতো জন্মান্তরবাদও ভারতীয় দর্শনে যুক্তির পথ দিয়ে প্রবেশ করেনি।

৮.
জন্মান্তরবাদ ছাড়াও জন্মান্তরবাদের সঙ্গেই অচ্ছেদ্য বন্ধনসূত্রে আবন্ধ চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শনগুলির অনুমোদিত অপর ধারণাটি হলো কর্মফলবাদ। এই কর্মফলবাদ ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় অধ্যাত্মজীবনের স্তম্ভ স্বরূপ।
'জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভিন্ন ভিন্ন শরীরের মাধ্যমে জীবের যে ভোগবৈচিত্র্য তার কারণ হিসাবে ভারতের দর্শনে কর্মবৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জীবের প্রাক্তন কর্মের ক্ষয় একমাত্র ভোগের মাধ্যমেই হতে পারে, এবং এই ভোগের বিভিন্নতা ভারতীয় দার্শনিকদের মতে পূর্বকৃত কর্মের বৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল। দেহধারী জীবের পক্ষেই কেবল এই বিচিত্র ভোগ সম্ভব এবং সেইজন্য ভোগের মাধ্যমে প্রাক্তন কর্মের সংস্কার ক্ষয় করার জন্য বিশেষ পরিবেশে বিশেষ শরীরে মানুষকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতে হয়। ভারতের অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা তাই শরীর সৃষ্টির উপাদান হিসাবে পঞ্চ মহাভূতকে স্বীকৃতি দিলেও এ ব্যাপারে মহাভূতের স্বতন্ত্র কারণতা অনুমোদন করেন না। তাঁদের মতে পঞ্চভূত থেকে জীবদেহের উৎপত্তির মূলে কার্যকরী জীবনের পূর্বকৃত কর্মের সংস্কারের প্রেরণা।'- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১১১-২)।
এ-প্রসঙ্গে ন্যায়সূত্রের দৃষ্টান্তে বলা হয়েছে–

‘পূর্ব্বকৃত-ফলানুবন্ধাৎ তদুৎপত্তিঃ’। (ন্যায়সূত্র-৩/২/৬০)
অর্থাৎ : পূর্বকৃত কর্মফলের (ধর্ম ও অধর্ম নামক অদৃষ্টের) সম্বন্ধপ্রযুক্ত সেই শরীরের উৎপত্তি হয় (অর্থাৎ শরীর-সৃষ্টি আত্মার কর্ম বা অদৃষ্ট-নিমিত্তক, এটাই তত্ত্ব)।

কিন্তু জন্মান্তরবাদে অবিশ্বাসী চার্বাকেরা স্বাভাবিক কারণেই জন্মান্তরবাদের সঙ্গে সমসূত্রে গাঁথা কর্মফলবাদকেও স্বীকৃতি দিতে অসম্মত। অধ্যাত্মবাদীরা যেখানে স্থূল ভূতের উপাদানে গঠিত বস্তুনিচয়কে তাত্ত্বিকক্রমে গৌণ মর্যাদা দেন, নাস্তিক চার্বাকদের বিবেচনায় সেখানে ভৌতিক স্থূল পদার্থের মুখ্য ভূমিকা জাগতিকক্রমে। এবং এই জড় ভূতের উপাদানে গঠিত দেহ থেকেই উৎপন্ন জাগতিক অপরাপর তত্ত্ব, মন, বুদ্ধি চৈতন্য ইত্যাদি। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে, ন্যায়সূত্রে নাস্তিকদের এই মনোভাব উল্লেখ করে বলা হয়েছে–
‘ভূতেভ্যো মূর্ত্ত্যুপাদানবত্তদুপাদানম্’। (ন্যায়সূত্র-৩/২/৬১)
অর্থাৎ : (নাস্তিকমতে) ভূতবর্গ হতে (উৎপন্ন) মূর্তদ্রব্যের অর্থাৎ সাবয়ব বালুকা প্রভৃতি দ্রব্যের গ্রহণের ন্যায় তার (শরীরের) গ্রহণ হয়।

তার মানে, নাস্তিকেরা জীবদেহসৃষ্টিতে জীবের অনুষ্ঠিত প্রাক্তন কর্মের নিমিত্ততা স্বীকার করেন না। শর্করা, পাষাণ ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে যেভাবে নানা ধরনের মূর্তির নির্মাণ, প্রাণীদেহও তাঁদের মতে ঠিক সেই ভাবেই বিভিন্ন ভৌতিক উপাদানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের অধ্যাত্মদর্শনে কর্মফলবাদের অন্তর্ভুক্তির মূলে যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রেরণা, সে দৃষ্টিভঙ্গি চার্বাকদর্শনে অনুপস্থিত। এ কারণেই আত্মা, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদির মতো এই কর্মফলবাদের ধারণাও চার্বাক মতবাদীদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে।

কর্মফলের মতো মোক্ষও স্বাভাবিকভাবেই ভূতচৈতন্যবাদী চার্বাকদের ধারণায় প্রবেশ লাভ করেনি। চার্বাক-মতে মৃত্যুর পর দেহের বিনাশকেই মোক্ষ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। চার্বাকেতর বিভিন্ন দার্শনিকদের রচিত গ্রন্থে চার্বাকমতের বর্ণনায় এ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–
‘দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ’। (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
‘দেহস্য নাশো মুক্তিঃ’। (সর্বদর্শন সংগ্রহ)
‘মরণেব চ মোক্ষঃ’। (সর্বমতসংগ্রহ)
নরকানুভবো বৈরিশস্ত্রব্যাধ্যাদ্যুপদ্রবঃ।
মোক্ষস্তু মরনং তচ্চ প্রাণবায়ুনিবর্তনম্ । (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/১০)
অর্থাৎ :
(লোকায়তিক-চার্বাক মতে) দেহের উচ্ছেদই মোক্ষ। (সর্বদর্শনসংগ্রহ)।। দেহের নাশই মুক্তি। (সর্বদর্শনসংগ্রহ)।। মরণেই মোক্ষ। (সর্বমতসংগ্রহ)।। শত্রুর অস্ত্র অথবা ব্যাধি প্রভৃতির উপদ্রবই নরকানুভব। মরণই মুক্তি এবং সেই মরণ হলো প্রাণবায়ুর চিরতরে বহির্গমন। (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/১০)।।

এছাড়া ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি সম্বন্ধীয় অপর কয়েকটি ধারণা ভারতীয় অধ্যাত্মধারণার আবশ্যিক অঙ্গ না হয়েও ভারতীয় জনমানসে বহুদিন থেকে স্থায়ী আসন অধিকার করে আছে। চার্বাক-মতে স্বর্গ, নরক ইত্যাদির ভোগ ইহজন্মেই হয়। যেমন–

'স্বর্গনরকাবপি ন স্তঃ'। (সর্বমতসংগ্রহ)

অর্থাৎ : (চার্বাকমতে) স্বর্গ বা নরক বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই।

কিংবা–

ইহলোকাৎ পরো নান্যঃ স্বর্গোহস্তি নরকা ন চ।
শিবলোকাদয়ো মূঢ়ৈঃ কল্প্যন্তেহন্যৈঃ প্রতারকৈঃ।। (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/৮।।

অর্থাৎ : (লোকায়তিক মতে) ইহলোক থেকে পৃথক স্বর্গ অথবা নরক নামক কোন স্থান নেই। মূর্খ এবং প্রতারকেরাই শিবলোকাদির কল্পনা করে থাকে।

এবং–

ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ।। (সর্বদর্শনসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : স্বর্গ বলে কিছু নেই, অপবর্গ বা মুক্তি বলেও নয়, পরলোকগামী আত্মা বলেও নয়। বর্ণাশ্রম-বিহিত ক্রিয়াকর্মও নেহাতই নিষ্ফল।

ফলে চার্বাকেরা দেশের রাজাকেই পরমেশ্বর আখ্যায় সংজ্ঞায়িত করেছেন–

'অতএব কণ্টকাদি-জন্যং দুঃখমেব নরকঃ।
লোক-সিদ্ধ রাজা পরমেশ্বরঃ।। (সর্বদর্শনসংগ্রহ)

অর্থাৎ : (চার্বাকমতে) সুতরাং কণ্টকাদি জন্য দুঃখই নরক। লোকপ্রসিদ্ধ রাজই পরমেশ্বর।

কারণ, প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিতে রাজা বহু ক্ষেত্রেই ঈশ্বর পদবাচ্য। এমনকি, মজার বিষয় হলো, 'মনুস্মৃতি'তেও এই নজির বিরল নয়, যেমন–

'বালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।।' (মনুসংহিতা-৭/৮)

অর্থাৎ : রাজা বালক হলেও তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কারণ, এই রাজা প্রকৃতপক্ষে একজন অসাধারণ দেবতা, ইনি মানুষের আকারে পৃথিবীতে অবস্থান করেন।

…

। চার্বাকী দেহাত্মবাদী সিদ্ধান্ত-খণ্ডন প্রয়াসের পর্যালোচনা।

চার্বাকী দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রয়াসে চার্বাকেতর দার্শনিকদের উপরিউল্লিখিত যুক্তি বিস্তারের নমুনা থেকে শেষপর্যন্ত কী প্রমাণ হলো এবং সাধারণ পাঠক হিসেবে আমাদের কতোটা বোধগম্য হয়েছে তা নিশ্চয় করে বলার সুযোগ নেই। তবে দেবীপ্রসাদের ভাষ্যানুযায়ী তাঁরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি ও যুক্তিকৌশলের উৎকর্ষ দেখাবার উৎসাহেই যুক্তি-বিস্তারণ যে পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তাতে আসলেই সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, চার্বাকদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে এ-ধরনের কূট তর্ক আদপেই তোলবার দরকার ছিলো কিনা। এমনতর অনেক কথাই যে দেহাত্মবাদের বিচার প্রসঙ্গে অনেকের লেখায় চোখে পড়েছে তা হয়তো পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কিন্তু এতে করে চার্বাকদের পক্ষ থেকে দেহাত্মবাদের সমর্থনে ইতঃপূর্বে যে মদশক্তির উপমা ব্যবহার করা হয়েছে, বিপক্ষ দার্শনিকদের এতো কূটতর্কের অবতারণার পরও সেই দেহাত্মবাদ কি খণ্ডন করা সম্ভব হয়েছে?

বলাই বাহুল্য, মদ্য প্রস্তুতের উপাদানগুলির মধ্যে কোনোটি থেকেই– বা এগুলিকে যেন-তেন-প্রকারে এক জায়গায় জড়ো করলেই– মদ তৈরি হয় না; অর্থাৎ মদশক্তি বা মাদকতা জননের সামর্থ্য সম্ভব নয়। কিন্তু এগুলিরই কোনো একরকম বিশেষ পরিণামের ফলে মদ তৈরি হয় এবং তাতে মদশক্তি বলে এক অভূতপূর্ব গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। যতোই উৎসাহ থাক, কথাটা উড়িয়ে দেওয়া আদৌ কি সম্ভব? বলা যায় একেবারেই অসম্ভব। এবং এই নজির মানতে বাধ্য হলে দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে মূল আপত্তিটা আর অত জোর গলায় তোলার সুযোগ থাকে না হয়তো; কেননা সে-আপত্তি বলতে তো এই যে, আগুন বাতাস জল প্রভৃতি দেহগঠনের উপাদানগুলি দিয়েই তৈরি নিছক দেহের মধ্যে চৈতন্য বলে গুণের পরিচয় সম্ভব নয়। এই কারণেই দেহবাসী চেতন আত্মা মানা দরকার। কিন্তু উপাদান-সামগ্রীতে যে-গুণের পরিচয় নেই সেগুলিরই বিশেষ পরিণামের ফলে ওই উপাদান-গঠিত বস্তুতেই অভূতপূর্ব গুণ– বর্তমান দৃষ্টান্তে চৈতন্য প্রভৃতি গুণ– আবির্ভূত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়। তার মানে, দেহগঠনের উপাদানগুলি স্বয়ং-অচেতন, শুধুমাত্র এই যুক্তি দিয়ে দেহাত্মবাদ খণ্ডন পর্যাপ্ত হতে পারে না।

‘তাই দেহাত্মবাদের বিচারে আমাদের কাছে প্রধান প্রশ্ন এই নয় যে এই প্রসঙ্গে কত দার্শনিক কতরকম কূট তর্কের নমুনা দেখিয়েছেন। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, চার্বাকমতের পক্ষে এই মূল নজিরটি অন্যান্যরা কতটা সার্থক ভাবে খণ্ডন করতে পেরেছেন?
যতদূর মনে হয়, দৃষ্টান্ত হিসাবে মদশক্তির এই দৃষ্টান্তটি নিয়ে বিপক্ষ দার্শনিকেরা খুব একটা তর্কাতর্কি তোলেননি। তার একটা কারণ এই হতে পারে যে দৃষ্টান্ত হিসাবে এটা উড়িয়ে দেওয়া সহজ নয়, হয়তো সম্ভবও নয়। তাছাড়া, তাঁরা হয়তো বলবেন, শুধুমাত্র একটা দৃষ্টান্তর নজির থেকে অত বড় একটা সিদ্ধান্ত– দেহাত্মবাদ– সুনিশ্চিত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা নিরর্থক। তার মানে অবশ্য এই নয় যে দার্শনিক বিচারে দৃষ্টান্তর গুরুত্ব নেই। অবশ্যই আছে। কিন্তু নিছক কোনো দৃষ্টান্তর– বিশেষত এমন এক দৃষ্টান্তর যা মোটের উপর খুব

প্রচলিত নয়, বরং তুলনায় দুর্লভ ক্ষেত্রেই পরিদৃষ্ট হয়– তার উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা অতি-বড় অপ্রচলিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার পক্ষে হয়তো সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। যাই হোক এবং যে-কোনো কারণেই হোক, বিপক্ষ সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা মদশক্তির দৃষ্টান্ত নিয়ে তেমন কিছু তর্কাতর্কি করেননি। তার বদলে অন্যান্য অনেক যুক্তি দেখিয়ে দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রয়াস করেছেন।'- (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৮২-৩)

ইতোমধ্যেই আমরা তঁদের অনেকগুলি যুক্তিই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি; যদিও তাঁদের সমস্ত যুক্তির কোনো তালিকা তৈরি করার সুযোগ নেই এবং তা সম্ভবও নয়। তার বদলে তাঁদের কয়েকটি প্রসিদ্ধ– এবং অন্তত আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ– যুক্তির বিচারই বর্তমান উদ্দেশ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত হতে পারে। এ-প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে' গ্রন্থের আলোচনা রীতি অনুসরণ করা যেতে পারে, যা আমাদের জন্য সহায়ক হতে পারে। দেহাত্মবাদ খণ্ডনে চার্বাকেতর দার্শনিকদের যুক্তি হিেসব এখানে বোধকরি বিশেষত দুটির আলোচনা যথার্থ হবে।–

ক। দেহাত্মবাদের সমর্থনে চার্বাকেরা আগুন, বাতাস, জল প্রভৃতি স্বয়ং-অচেতন বা জড় ভূতবস্তুগুলির 'বিশেষ পরিণাম' হিসেবে যে-কথা বলতে চান তা আসলে বিচারের ধোপে টেকে না। বিশেষত জৈন দার্শনিক গুণরত্ন এই কথাটি বেশ ফলাও করে দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হলো, আর যে-যাই-বলে-বলুক, বিশেষত চার্বাকদের মুখে একথাটা একেবারেই শোভা পায় না।

খ। চৈতন্য প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র কোনো আত্মার ধর্ম বলে স্বীকার না-করে চার্বাকেরা যে-ভাবে নিছক দেহধর্ম বলে প্রতিপন্ন করতে চান তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো মৃতদেহের সাক্ষ্য। চৈতন্য প্রভৃতি যদি শুধুমাত্র দেহেরই গুণ বা লক্ষণ হতো তাহলে যতক্ষণ বা যেখানেই দেহ বর্তমান ততক্ষণ সেখানেই চৈতন্য প্রভৃতি থাকবার কথা। কিন্তু আসলে দেখা যায় যে দেহ থাকা সত্ত্বেও চৈতন্য নাও থাকতে পারে; তারই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মৃতদেহ। ন্যায়বৈশেষিকের প্রথা অনুসারে জয়ন্তভট্ট যেমন তাঁর স্বভাবসুলভ হেঁয়ালিপূর্ণ বক্তব্যে খুব সাঁটে বলছেন–

'শরীরং চৈতন্যশূন্যং, শরীরত্বাৎ মৃতশরীরবৎ'। (ন্যায়মঞ্জরী)
অর্থাৎ : শরীর আসলে চৈতন্যশূন্য, কেননা তা নিছক শরীর, যেমন কিনা মৃতশরীর।

শঙ্করাচার্য অবশ্য যুক্তিটা এরকম সাঁটে বলেননি; তাঁর স্বভাব সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু মূলত একই যুক্তি। এবং অন্যান্য নানা দার্শনিকও এই যুক্তিকেই চলতি কথায় যাকে বলে 'তুরুপের টেক্কা' হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ, অনেকের কাছেই দেহাত্মবাদ খণ্ডনে এই যেন মোক্ষম প্রমাণ। এছাড়া স্মৃতির নজিরকেও দেহাত্মবাদ খণ্ডনে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

প্রতিপক্ষ দার্শনিকদের পক্ষ থেকে দেহাত্মবাদ খণ্ডনের নমুনা হিসেবে মূলত এই ক'টি প্রধান যুক্তিই পর্যালোচনা করে দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে যে এ-ক'টির বলে দেহাত্মবাদ সত্যিই খণ্ডন হয় কিনা, কিংবা যা প্রায় একই কথা, দেহ ছাড়াও চৈতন্য-বিশিষ্ট আত্মা বলে স্বতন্ত্র কিছু মানবার বাধ্যবাধকতা থাকে কিনা।

.

ক। 'দেহাকারে পরিণাম' নিছক ভূতবস্তু না বাড়তি কিছুর ফল?।

'ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, মধ্যযুগ থেকে– কিংবা নাগার্জুনের কথা মনে রাখলে বোধহয় মানতে হবে প্রাচীন কাল থেকেই– এদেশে দার্শনকি দ্বন্দ্বের একটা কৌশল হিসেবে বিপক্ষকে একভাবে কোণঠাসা করার চেষ্টা ছিল। কী-ভাবে কোণ-ঠাসা করা? বিপক্ষের মত উল্লেখ করে প্রথমে দেখানো বিপক্ষের পক্ষেই ঠিক কী কী সম্ভাব্য অর্থে এই মত ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে। তারপর দেখানো, এর মধ্যে কোনো অর্থই যুক্তিসহ নয়।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৮৪)

দেহাত্মবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে গুণরত্ন এই রকম একটা দার্শনিক কায়দার পরিচয় দিয়েছেন। কীভাবে?

প্রথমত মনে রাখতে হবে, আগুন-বাতাস-জল-মাটি থেকেই চার্বাকমতে দেহ গঠিত হলেও চার্বাকেরা নিশ্চয়ই মানতে বাধ্য হবে যে ওই ভূতবস্তুগুলিকে যা-হোক-তা-হোক করে একজায়গায় জড়ো করে দিলেই তা থেকে দেহগঠন সম্ভব হবে না, যেমন মদ তৈরির উপকরণগুলি যে-কোনভাবে একত্র করলেই তা থেকে মদ তৈরি হয় না। চার্বাকদের এই বক্তব্যটা নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট তাঁর 'ন্যায়মঞ্জরী'তে বেশ স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন এভাবে–

'বিশেষ পরিণামের ফলে জড়পদার্থগুলিই কোনোরকম বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হলে সেগুলিতেই জ্ঞান বা চৈতন্য উৎপন্ন হয়; যেমন গুড় পিষ্ট প্রভৃতিতে আগে মদশক্তির পরিচয় না-থাকলেও সেগুলিই সুরাকারে পরিণত হলে মদশক্তি লাভ করে। তেমনি ভূতবস্তুগুলি মাটি প্রভৃতি অবস্থায় অচেতন হলেও সেগুলিই 'দেহাকারে পরিণত' হলে চৈতন্যবিশিষ্ট হয়।'- (ন্যায়মঞ্জরী)

আগেই বলা হয়েছে, চার্বাকদের বক্তব্য যে মোটের উপর এইরকমই ছিলো তা প্রামাণিক লোকগাথা প্রভৃতি থেকেও স্বীকার করার যথেষ্ট কারণ আছে। অতএব, চার্বাকমতের একটা বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'দেহাকারে পরিণাম' বলে কোনো একরকম পরিবর্তন স্বীকার না করে উপায় নেই।

এবং ঠিক এই কথাটি নিয়েই গুণরত্ন চার্বাকদের কোণঠাসা করতে চান। তাঁর বক্তব্য হলো, 'দেহাকারে' বা 'কায়াকারে' পরিণাম না-মেনে চার্বাকদের গত্যন্তর নেই; কিন্তু চার্বাকরা কীভাবে তার ব্যাখ্যা করবে?

গুণরত্নর মতে, চার্বাকপক্ষ থেকে ঘটনাটার মাত্র তিনরকম ব্যাখ্যা সম্ভব, চতুর্থ কিছু থাকতে

পারে না। এইভাবে দেহাত্মবাদীকে কোণঠাসা করে গুণরত্ন দেখাতে চান, তিনটির মধ্যে কোনোটিই চার্বাকমতে স্বীকৃত হতে পারে না। অর্থাৎ দেহাত্মবাদী একদিকে 'কায়াকারে' পরিণত হবার কথা বলতে বাধ্য, কিন্তু অপরদিকে স্বমত-সম্মত ভাবে ঘটনাটির কোনোরকম ব্যাখ্যাই দিতে পারেন না।
দেহাত্মবাদীর পক্ষে 'কায়াকারে' বা 'দেহাকারে' পরিণামের কারণ মোটের উপর তিনরকম হতে পারে–
এক : শুধুমাত্র পৃথিবী প্রভৃতি ভূতই তার কারণ।
দুই : ঘটনাটির আসল কারণ অন্য কিছু। দার্শনিক পরিভাষায় তাকে বলে 'তত্ত্বান্তর' স্বীকৃতি।
তিন : ব্যাপারটা অহেতুক, অর্থাৎ তার কোনো কারণই নেই।

প্রথমত, দেহাত্মবাদী নিশ্চয়ই বলতে পারে না যে শুধুমাত্র পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবস্তুই কায়াকারে পরিণামের কারণ। কেননা, এই ভূতবস্তুগুলি তো সর্বত্রই বর্তমান এবং শুধুমাত্র এগুলিই যদি শরীররূপে পরিণত হবার পর্যাপ্ত কারণ হয় তাহলে তো সর্বত্রই কায়াকার ঘটবার কথা। তাহলে কি দেহাত্মবাদী বলবে, ভূতবস্তুগুলিই কায়াকারে পরিণত হবার কারণ হলেও এই পরিণতির জন্যে 'সহকারি কারণ' হিসেবে আরো কিছু মানা দরকার। যেমন, ধোঁয়ার আসল কারণ অবশ্যই আগুন; কিন্তু গনগনে লোহার পিণ্ডে আগুন থাকলেও ধোঁয়া থাকে না– তার জন্য ভেজা কাঠ জাতীয় সহকারী কারণ থাকা দরকার। কিন্তু ভূতবস্তুর পক্ষেও শরীর-আকারে পরিণত হবার জন্য কোনো রকম সহকারী কারণ কি মানা যায়?
গুণরত্ন বলছেন, সহকারী কারণের কথা আর যার মুখেই শোভা-পাক-না-কেন, অন্তত চার্বাকদের মুখে শোভা পায় না। কেননা তামাম দুনিয়ায় চার্বাকমতে এই ভূতবস্তুগুলি ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই সহকারী কারণ আর কোনো কিছু মানা চার্বাকের পক্ষে অসম্ভব, কিংবা, যা একই কথা, মানতে গেলে চার্বাকের পক্ষে নিজের মূল প্রতিপাদ্যই পরিহার করতে হবে। তথাকথিত 'সহকারী কারণ'টিকে পৃথিবী প্রভৃতি ভূতপদার্থেরই বৈশিষ্ট্য বলে ব্যাখ্যা করতে গেলে কিন্তু আবার সর্বত্রই দেহাকারে পরিণাম হবার কথা। অতএব, সংক্ষেপে, গুণরত্নর বক্তব্য হলো : হয় ভূতবস্তুকেই একমাত্র সত্য বলে বক্তব্য ছাড়ো, না-হয় তো কায়াকারে পরিণামের কথা ছাড়ো।
আর, এতোশত ঝামেলা এড়াতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি বলতে চাও যে দেহাকারে পরিণাম সম্পূর্ণ অহেতুক– তার কোনো কারণই নেই– তাহলে একদিকে যেমন যখন-তখন যেখানে-সেখানে দেহাকারে পরিণতির সম্ভাবনা স্বীকার করতে হবে, অপরদিকে তেমনই কোথাওই এবং কখনোই তার সম্ভাবনা মানা যাবে না : কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া একটা ঘটনা যেমন যত্রতত্র ঘটতে পারে আবার তেমনি কোথাওই তা ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। মোদ্দা কথা : কোনো ঘটনাকে অহেতুক বললে তা নিয়ে আর কোনো দার্শনিক আলোচনার সুযোগই থাকে না।

এটাকেই কূট-তর্ক বলে কিনা সে-প্রশ্ন না করেও বলা যায় গুণরত্নের যুক্তি-চাতুর্য অবশ্যই

স্বীকার্য। ঐতিহাসিকভাবে চার্বাকেরা এজাতীয় যুক্তিবিন্যাসের সত্যিই কোনো জবাব দিতে পারতেন কিনা– বা এই রকম যুক্তির মারপ্যাচের সত্যিই বড় একটা পরোয়া করতেন কিনা– আমাদের পক্ষে মনে হয় আজ তা নিশ্চিতভাবে জানবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে গুণরত্নের যুক্তিটা এমনই অমোঘ যে চার্বাকপক্ষ থেকে তার কোনো জবাবই হয় না। বরং খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, চার্বাকপক্ষ সমর্থনে এহেন যুক্তির জবাব অসম্ভব নয়।
কী জবাব হতে পারে?

দেবীপ্রসাদ বলছেন– 'একথায় অবশ্যই সন্দেহ নেই যে আগুন-বাতাস-জল-মাটিকে যেমন-তেমন-ভাবে একত্র করলেই 'দেহাকারে পরিণাম' সম্ভব নয়। এটুকু কথা যে চার্বাকেরা বুঝতেন না– তা কল্পনা করারও কোনো কারণ নেই। কেননা, চার্বাকদের বেকুব বলে প্রচার করার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এটুকু প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটনা তাঁদের পক্ষে অবশ্যই বোঝবার কথা। অতএব গুণরত্ন-বর্ণিত প্রথম পক্ষটি চার্বাক-পক্ষ বলে কল্পনা করার কোনো কারণ নেই। তৃতীয় পক্ষটিও নয় : অর্থাৎ, 'কায়াকারে পরিণাম' হিসেবে বর্ণিত ব্যাপারটাকে নেহাতই অহেতুক বলে স্বীকার করে চার্বাকদের পক্ষে একেবারে হাল ছেড়ে দেবার সম্ভাবনাও সুদূর-পরাহত; তাহলে তো মতটা সমর্থন করার আর কোনো সুযোগই থাকে না। অর্থাৎ, গুণরত্নের যুক্তি-খণ্ডনে চার্বাকেরা সত্যিই কী বলতেন-না-বলতেন– আমাদের পক্ষে আজ তা নিশ্চিতভাবে জানবার মতো সুনিশ্চিত কোনো তথ্য না-থাকলেও অন্তত এটুকু অনুমান করার সুযোগ আছে যে, যে-তিনটি সম্ভবপর পক্ষ দেখিয়ে গুণরত্ন তাঁদের কোণঠাসা করতে গিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্তত দুটি চার্বাকপক্ষ থেকে মানবার কোনো কারণ নেই। তাহলে বাকি থাকে মাত্র আর একটি পক্ষ। দার্শনিক পরিভাষায় তা হলো 'তত্ত্বান্তর' স্বীকৃতি।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৮৬)

এই 'তত্ত্বান্তর স্বীকৃতি'র ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে। চার্বাকমতে প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্ব বলতে মাত্র চতুর্ভূত। তামাম দুনিয়ায় এই চতুর্ভূত ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। কিন্তু এই চতুর্ভূতকে যেন-তেন-প্রকারে সমবেত বা একত্র করলেই তো আর দেহাকারে পরিণাম সম্ভব নয়। তাহলে দেহাকারে পরিণামের ব্যাখ্যা হিসেবে আরো বাড়তি কিছু মানতে হবে। অর্থাৎ, চতুর্ভূত ছাড়াও আরো কোনো তত্ত্ব মানতে হবে। ওই বাড়তি কিছুকে 'তত্ত্বান্তর' বলা হবে।
তার মানে, গুণরত্ন বলতে চান, তোমার নিজের মতেই শুধুমাত্র যা তত্ত্ব বলে ঘোষণা করতে চাও– বা শুধুমাত্র সত্য বলে ঘোষণা করতে চাও– তোমার নিজের পক্ষ সমর্থনেই শুধুমাত্র তাকেই সত্য বলে মানা চলে না। তাছাড়াও আরো কিছু মানা দরকার। এবং এ-হেন বাড়তি কিছুকে যদি মানতে বাধ্য হও তাহলে নিজের মূল মতটা শোধরাতে রাজি হও। স্বীকার করো যে আগুন-বাতাস-জল-মাটি ছাড়াও আরো কোনো সত্য আছে– এ-হেন বাড়তি সত্য না-মানলে কোনো এক বিশেষ অবস্থায় কায়াকারে পরিণাম সম্ভব নয়– এ-হেন ঘটনার আর কী

ব্যাখ্যা দেবে?

কিন্তু এইভাবে 'তত্ত্বান্তর'– বা বাড়তি তত্ত্ব– মানতে বাধ্য হওয়াটা দার্শনিকের পক্ষে মারত্মক ব্যাপার– যাকে বলে হার স্বীকার করা। নিজেই যাকে শুধুমাত্র সত্য বলে ঘোষণা করছো তা ছাড়াও আরো কিছু সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য হও। সোজা কথায়, নিজের দর্শন থেকেই ইস্তফা দাও।
তাহলে কি দেহাকারে পরিণামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে চার্বাকেরা নিরুপায় হয়ে 'শুধুমাত্র চতুর্ভূতই সত্য' এই দাবি ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন? গুণরত্নের তর্ক-চাতুর্য মেনে নিয়েও উত্তরে বলা যায়, অন্তত এই সম্ভাবনা অনিবার্য নয়। অর্থাৎ, প্রকৃত অর্থে 'তত্ত্বান্তর' স্বীকার করতে বাধ্য না-হয়েও স্বমত-সম্মতভাবে চার্বাকদের পক্ষে দেহাকারে পরিণামের একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।
কী রকম ব্যাখ্যা?

এ-প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ বলছেন– 'আসলে তত্ত্বান্তরের প্রসঙ্গটা ওঠে কখন?
প্রথমে একটা সহজ দৃষ্টান্ত দেখা যাক। সকলেই মানবেন, 'অগ্নি উষ্ণ'। কিন্তু একথা মানলেই সকলে কি 'অগ্নি' ছাড়াও 'উষ্ণতা'– বা উষ্ণতার ব্যাখ্যায়– বাড়তি কোনো তত্ত্ব স্বীকার করতে বাধ্য? নিশ্চয়ই নয়। কেন নয়? কারণ, 'উষ্ণতা' অগ্নি-বহির্ভূত স্বতন্ত্র কিছু নয়। অগ্নির স্বভাবই হলো 'উষ্ণ'। তাই উষ্ণতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অগ্নি ছাড়া বাড়তি কিছু মানতেই হবে– এ-হেন দাবি চলতি কথায় যাকে বলি এঁড়ে তর্ক। বাজে কথা।
তাহলে 'স্বভাব' বলে কোনো কিছু মানার একটা সুযোগ আছে। জল শীতল। কেন শীতল? জলের স্বভাবই তাই। কোনো দার্শনিক মুখে স্বীকার করুন-আর-নাই-করুন, 'স্বভাব' বলে একটা কিছু মানতেই হবে, এবং 'স্বভাব' বলে কিছু মানা মানেই 'তত্ত্বান্তর' স্বীকৃতি নয়। তত্ত্বান্তরের প্রসঙ্গ তাহলে ওঠে কখন? স্বমত-স্বীকৃত তত্ত্বর স্বভাব-বহির্ভূত কোনো কিছু মানলে। নইলে নয়।
এই কথা মনে রাখলে চার্বাকমতের সমর্থনে চতুর্ভূতেরই দেহাকারে পরিণামের ব্যাখ্যার জন্যে তত্ত্বান্তর স্বীকৃতি অনিবার্য নয়। চার্বাকপক্ষ থেকে অনায়াসেই বলা যায়, চতুর্ভূতের স্বভাবই হলো 'পরিস্থিতি-বিশেষে তা দেহাকারে পরিণত হয়'। এখানে কোটেশন চিহ্ন ইচ্ছে করে ব্যবহার করছি, কেননা পুরো বক্তব্যটাকেই চতুর্ভূতের স্বভাব বলে বর্ণনা করতে চাই। কূট তার্কিক অবশ্যই আপত্তি তুলতে পারেন যে 'পরিস্থিতি-বিশেষ' বলে ব্যাপারটাকে আলাদা করে বুঝতে হবে; ওটাকে চতুর্ভূতের স্বভাবের মধ্যে গুঁজে দেওয়া চলবে না। এবং আলাদা করে ভাবলে তত্ত্বান্তরের স্বীকৃতি থেকে যায়। কিন্তু এ-হেন আপত্তিতে চার্বাকের পক্ষে বিচলিত হবার কারণ নেই। কেননা, পরিস্থিতি-বিশেষকে কেন আমরা আলাদা করে ভাবতে বাধ্য হবো? স্বভাব বলে ব্যাপারটা কখনো বা সরল আবার কখনো বা জটিল হতে পারে। ভারতীয় দর্শনে স্বভাব-এর ব্যাখ্যায় অনেকরকম প্রাকৃতিক নিদর্শন বা নমুনার কথা পড়েছি। নিম তেতো; খেজুর মিষ্টি। কিন্তু কেন? কেননা ওদের স্বভাবই ওই রকম। আধুনিক

বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করুন। নিম কেন তেতো বা খেজুর কেন মিষ্টি– এজাতীয় প্রশ্নের উত্তর হিসেবে তিনি নিশ্চয়ই অল্প-বিস্তর দীর্ঘ ব্যাখ্যা দেবেন। অত কথা অবশ্যই প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের জানা ছিল না, থাকবার কথাও নয়। কিন্তু তাঁরা যখন বলতেন, নিমের স্বভাবই তিক্ততা বা খেজুরের স্বভাবই মধুরতা তখন তাঁদের প্রকৃত বক্তব্যটুকু আজকের দিনে আমরা কী ভাবে বুঝবো? আধুনিক বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যায় পুরোটাই জটিল ব্যাপার। কিন্তু পুরোটাকে আলাদা-আলাদাভাবে ভেঙে বোঝাবার চেষ্টা নিরর্থক। পুরো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতিটি উপাদান ভেঙে এবং আলাদা-আলাদা ভাবে বুঝতে গেলে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের 'স্বভাব' বলে ধারণাটাও অর্থহীন হয়ে যাবার আশঙ্কা। চার্বাক-পক্ষ থেকেও এই কথা, চার্বাকদের বিপক্ষের পক্ষেও একই কথা। তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে অবহেলা করার কোনো প্রস্তাব আমাদের কাছে স্বীকৃত হতে পারে। অবশ্য সেইসঙ্গে একথাও মানা দরকার যে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বিতর্কটার বিচার প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার সাধারণ কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ রাখা প্রাসঙ্গিক। যেমন ধরা যাক চতুর্ভূত-এর (বা পঞ্চভূত-এর) কথা : আগুন বাতাস জল মাটি (এবং তার সঙ্গে অনেকে আকাশ বলে পঞ্চম একটা ভূতপদার্থ জুড়েছেন)। চার্বাকমতে সত্য চতুর্ভূতই; অন্যান্য নানা দার্শনিকের মতেও ভূতপদার্থের তালিকা মোটামুটি একই রকম। অন্যান্যরা এই ভূত-পদার্থকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করতে রাজি না হলেও ভূতপদার্থ বলতে তাঁদের জ্ঞান-গম্মি ওই পর্যন্তই। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আগুন বাতাস জল প্রভৃতির কতটুকু বা আজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে? শুধু প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের কথাই বা কেন? প্রাচীন গ্রীক দর্শন থেকে শুরু করে আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনের বেলাতেও একই কথা। যুগের পর যুগ ধরে ভূতপদার্থের জ্ঞান বেড়েছে, ধারণাও বদলেছে। বিশ্বপ্রকৃতি প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে। এবং জ্ঞানের এই অগ্রগতির দৌড় আজ এমন প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তবুও প্রাচীন দর্শনের আলোচনা নিছক অজ্ঞানের আবর্জনা বলে বর্জিত হয়নি, বা অন্তত তা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মানুষ আজ কোথায় এসে পৌঁছেছে এবং কোনদিকে কীভাবে আগামীকাল তার অগ্রগতির পথ নির্ণীত হবে তা উপলব্ধির জন্যে অতীতকে আরো ভালো করে বোঝবার তাগিদ থেকে গিয়েছে। সোজা কথায়, অজ্ঞানের অপবাদ দিয়ে অতীতটাকে একেবারে মুছে ফেলা যায় না। তাহলে ইতিহাস বলে ব্যাপারটাই বরবাদ হবার আশঙ্কা।... ইতিহাসের চর্চা চলছে, চলবে। কেননা, অতীতের উপর থেকে পর্দা সরাতে পারলেই ভবিষ্যতের পথ নির্ণয় করার প্রয়াস তুলনায় নির্ভুল হয়।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৮৭-৯)

তার মানে, আধুনিক বিজ্ঞানের মানদণ্ডে বিচার করে প্রাচীন দর্শনকে একেবারে বাতিল করার প্রস্তাবটা যুক্তিযুক্ত হবে না। ফলে প্রাচীন দর্শনের বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রাচীন যুগের দিকেই ফিরে তাকাতে হবে। সেক্ষেত্রে তাহলে প্রাচীন বিতর্কটার পুনর্বিচারে প্রাচীন কালের ধ্যান-ধারণার সাধারণ চৌহদ্দির কথা ভুলে গেলে চলবে না। সেই চৌহদ্দির মধ্যেই চার্বাকেরা দাবি করেছিলেন, ভূতপদার্থ থেকেই প্রাণ, চৈতন্য প্রভৃতির উদ্ভব। আধুনিক বিজ্ঞানীদের উচ্চাঙ্গ

পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা মনে রেখেও বোধ হয় বলা যায় প্রাণ, চৈতন্য প্রভৃতির উদ্ভব বা উৎপত্তি প্রসঙ্গে সমস্যার চরম সমাধান আমাদের পক্ষে এখনো অপেক্ষা-সাপেক্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা অন্তত বলা চলে যে, সে-সমাধানের আশায় আধুনিক বিজ্ঞান ভূতপদার্থ ছাড়াও আত্মা জাতীয় কিছুর প্রাচীন কল্পনা পুনরুজ্জীবনের তাগিদ বোধ করছে না। অবশ্য ভূতপদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ে সেকালের সঙ্গে একালের আকাশ-পাতাল তফাৎ, আবার একালের সঙ্গে আগামীকালের পার্থক্য কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তাও আন্দাজ করা সহজ নয়। এটাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রগতি।

কিন্তু সেই প্রসঙ্গেই একথা বলাও আবশ্যক যে, বৈজ্ঞানিক তথ্যের যৎসামান্য সম্বল সত্ত্বেও চার্বাকেরা যেভাবে সমস্যাটার একটা সন্ধান খুঁজেছিলেন, আধুনিক জ্ঞানের মানদণ্ডে তার মূল্যায়ন অবশ্যই অবান্তর। কিন্তু তারই মধ্যে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের কোনো প্রতিশ্রুতি বা এমনকি কোনোরকম অস্পষ্ট আভাস ছিলো কিনা, এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই অবান্তর নয়। সে-আভাসের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা, নিছক ভূতবস্তু থেকেই প্রাণ, চৈতন্য প্রভৃতির উৎপত্তি ব্যাখ্যার দিকেই আজকের বিজ্ঞানের ঝোঁক, ভূতবস্তু অতিরিক্ত কোনো আত্মার কথায় ফিরে আসবার দিকে নয়। এমনকি, দেবীপ্রসাদের মতে, একথাও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে এই উৎপত্তির ব্যাখ্যায় আধুনিক বিজ্ঞানেও এক অর্থে শেষ পর্যন্ত স্বভাববাদের উপরই নির্ভরতা। কেননা, স্বভাববাদের মূল কথাটা হলো প্রাকৃতিক নিয়ম। অবশ্যই আধুনিক বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নিয়ম বা স্বভাবকে বোঝবার ব্যাপারেও যে-অগ্রগতি, তার কথা ভুলে যাওয়াও কোনো কাজের কথা নয়; তুলনায় এই প্রসঙ্গে চার্বাকদের যেটুকু জ্ঞান তা একান্তই প্রাথমিক। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা এই যে প্রাথমিক অবস্থা থেকেই মানুষ শুরু করতে বাধ্য। আধুনিক জ্ঞানের প্রকাণ্ড ইমারত রাতারাতি গড়ে ওঠেনি। এবং এই ইমারত গড়ার ভিত্তিস্থাপনে যাঁরা প্রথম পদক্ষেপের পরিচয় দিয়েছিলেন ইতিহাসের বিচারে তাঁদের অবদান অসীম।

'অনুমান হয় ভূতপদার্থ থেকে চৈতন্য প্রভৃতির উৎপত্তি প্রসঙ্গে চার্বাকদের পক্ষ থেকে চরম কথা 'স্বভাব' হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তর্কের খাতিরে এই স্বভাবের কথা চেপে গিয়ে 'তত্ত্বান্তর স্বীকৃতি' বলে একটা গুরুগম্ভীর যুক্তির অবতারণা বস্তুনিষ্ঠ দার্শনিক বিচারের পরিচায়ক নয়। স্বভাব শব্দের একটা সংকীর্ণ অর্থ উদ্ভাবন করে বিপক্ষের ঘাড়ে তা চাপিয়ে দেবার চেষ্টাও চলবে না। যেমন 'অগ্নির স্বভাব উষ্ণ'– শুধু এটুকু বলাই পর্যাপ্ত নয়। আরো বলা দরকার : 'উষ্ণস্বভাব অগ্নির স্বভাবই এই যে অন্যান্য ভূতপদার্থের সঙ্গে নির্দিষ্ট নিয়মে মিলিত এবং পরিবর্তিত হয়ে তা কায়াকারে বা দেহরূপে পরিণত হয়।' বাড়তি কথাটুকুকে 'স্বভাব' ছাড়াও অন্য কিছু বলে কল্পনা করে 'তত্ত্বান্তর স্বীকৃতি'-র অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৯০)

এ-প্রসঙ্গে তাই মদশক্তির দৃষ্টান্তটা আবার উল্লেখ করা যেতে পারে, কেননা এক্ষেত্রেও কি

গুণরত্নের মতো প্রখর তার্কিক ‘তত্ত্বান্তর স্বীকৃতি’র অভিযোগ আনবেন? বা এজাতীয় অভিযোগ তোলবার কোনো সুযোগ আছে? শুষ্ক তর্কের খাতিরে হয়তো থাকতে পারে; কেননা মদ্য প্রস্তুতের উপাদানগুলি যেন-তেন-প্রকারে জড়ো করলেই মদ তৈরি হয় না। এগুলিরই একরকম বিশেষ পরিণামের ফলে মদ তৈরি হয়। কিন্তু এই বিশেষ পরিণাম স্বীকার করা মানেই বাড়তি তত্ত্বের স্বীকৃতি নয়; তা উপাদানগুলির স্বভাব। তার প্রমাণ, অন্য উপাদান দিয়ে মদ তৈরি করা যায় না; শুধুমাত্র নির্দিষ্ট উপাদান– অতএব সেগুলির নির্দিষ্ট স্বভাব থেকেই মদ তৈরি হয়। ‘বিশেষ পরিণাম’টা তাই তত্ত্বান্তর নয়; উপাদান-সমূহের স্বভাবেরই অন্তর্ভুক্ত।

এখানে উল্লেখ্য, চার্বাকদর্শনের আরেকটি উপপাদ্য হলো ‘স্বভাববাদ’, যে-বিষয়ে আমরা পরে আলোকপাত করবো। তবে এক্ষেত্রে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের আরেকটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–
‘স্বভাব’ বলে এই ধারণাটি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে সর্বসম্প্রদায়-স্বীকৃত কোনো ধারণা নয়। সম্প্রদায়-বিশেষে তা স্বীকৃত; সম্প্রদায়-বিশেষে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত।... ‘স্বভাববাদ’-এর সমর্থক হিসাবে চার্বাকেরাই একমাত্র দার্শনিক হোন-আর-নাই-হোন অন্তত সবচেয়ে অগ্রণী দার্শনিক। পক্ষান্তরে ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা স্বভাববাদ খণ্ডনের সাধ্যমতো প্রয়াস করেছেন।
কেন করেছেন? কেননা, স্বভাববাদ মানায় দেহাত্মবাদ ছাড়াও অন্যান্য দার্শনিক বিপত্তির আশঙ্কা আছে। এমনকি তার ফলে অধ্যাত্মবাদের ভিত টলে যাবার ভয়। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এর একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমও উপেক্ষণীয় নয়। বিজ্ঞানী-মহলে– বিশেষত চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মূল প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গে– স্বভাববাদ স্বীকৃত হয়েছে। এদিক থেকে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে চার্বাকমতের একরকম আত্মীয়তা অনুমানের অবকাশ আছে। অন্যান্য দিক থেকেও আছে। আগেও দেখেছি। পরে আরো দেখবো।’-
(ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৯১)

.
খ। মৃতদেহের নজির।
দেহাত্মবাদ খণ্ডনে ভারতীয় দর্শনে একাধিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে মৃতদেহের নজির দেখিয়ে এই যুক্তি প্রস্তাবিত হয়েছে। কিন্তু সহজ সরল ও সুখপাঠ্য হিসেবে সমগ্র ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে শঙ্করাচার্যের রচনা তুলনাহীন বলা চলে। তাই দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে প্রধানতম এই যুক্তিটি বোঝবার জন্য তাঁর লেখাই অনুসরণ করা সুবিধাজনক হবে। তবে যতো সহজ ভাষাতেই শঙ্কর এই যুক্তি প্রকাশ করুন না কেন, ‘ব্যতিরেক’, ‘অব্যতিরেক’ প্রভৃতি কিছু অতি-প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ তিনিও ব্যবহার করেছেন। তাই এ-জাতীয় পারিভাষিক শব্দের তাৎপর্য সাধ্যমতো অক্ষুণ্ন রেখে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনার অনুসরণে সাদামাটা ভাষায় দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে এই মূল যুক্তিটি উপস্থাপন ও পর্যালোচনা

করা যায়।
প্রথমে, যুক্তিটা কী?

'দেহ ছাড়া আত্মা বলে যদি আর কিছু না মানো তাহলে আত্মবাদীরা যে ধর্মগুলিকে আত্মধর্ম বলে স্বীকার করতে চান সেগুলিকেও আসলে দেহধর্ম বলে গ্রহণ করতে হবে। এজাতীয় ধর্ম বলতে শঙ্কর প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য ও স্মৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। দেহাত্মবাদীরা এই ধর্মগুলিকেও নিছক দেহের ধর্ম বলে স্বীকার করতে বাধ্য; অন্য কিছুর ধর্ম বলে মানতে গেলে তো দেহাতিরিক্ত অন্য কিছু– অর্থাৎ আত্মা– মানতে হয়। কিন্তু শঙ্কর দেখাতে চান এগুলিকে নিছক দেহধর্ম বলে প্রমাণ করা অসম্ভব। আসলে আমাদের ক্ষেত্রে দু-রকম ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। একরকম হলো নিছক দেহের ধর্ম; আর একরকম ধর্মকে দেহ-অতিরিক্ত কিছুর (আত্মার) ধর্ম বলে স্বীকার না-করে উপায় নেই। তফাৎটা কীভাবে নির্ণয় করা হবে? যা নিছক দেহধর্ম তার লক্ষণ হবে দেহের বিদ্যমানতায় ধর্মটিরও বিদ্যমানতা : যতক্ষণ দেহ থাকবে ততক্ষণ ধর্মটিও থাকতে বাধ্য। যেমন, রূপ। দেহ বর্তমান অথচ তার রূপ অবর্তমান– এ-হেন কথা কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু দেহ বর্তমান হলেও যদি কোন ধর্ম অবর্তমান হয় তাহলে আর কীভাবে তাকে নিছক দেহেরই ধর্ম বলা যাবে? পক্ষান্তরে, এজাতীয় ধর্মকে দেহান্যধর্ম– বা দেহ ছাড়া অন্য কিছুর ধর্ম, অর্থাৎ আরো সহজ কথায়, আত্মার ধর্ম– বলে মানতে আমরা বাধ্য।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৯২)

এই যুক্তি মনে রেখে প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতি ধর্মগুলির কথা বিচার করা যাক। যদি দেখা যায়, দেহ বর্তমান থাক সত্ত্বেও এই ধর্মগুলি অবর্তমান হয় তাহলে এগুলিকে কিছুতেই নিছক দেহধর্ম বলার সুযোগ থাকে না। অথচ বাস্তবে এই ব্যাপারই দেখা যায়– দেখা যায় দেহ আছে অথচ এই ধর্মগুলি নেই। কোথায় দেখা যায়? মৃতদেহের দৃষ্টান্তে। মৃতদেহও দেহ। তাই মৃতদেহেও নিছক দেহধর্ম বর্তমান। যেমন, রূপ– মৃতদেহ থেকে রূপ বলে ধর্মটি উবে যায় না। কিন্তু প্রাণ, চৈতন্য, চেষ্টা ইত্যাদি? অবশ্যই ভারতীয় দর্শনে বোকা-হাবা বলে চার্বাকদের রকমারি গালিগালাজ দেবার প্রথা ছিলো। কিন্তু তাই বলে কি এমনই হাবা যে ওরা বলবে, মৃতদেহেও প্রাণ, চৈতন্য ইত্যাদির পরিচয় আছে? চার্বাকদের অতি-বড় সমালোচকেরাও ওঁদের ঘাড়ে এরকম অসম্ভব কোনো কথা চাপিয়ে দেননি। মড়াটা যে প্রাণহীন, চৈতন্যহীন ইত্যাদি– এই ব্যাপারটা এমনই প্রকট যে চার্বাকের মতো আকাট বোকাও তা যেন স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু একথা স্বীকার করলে আরো স্বীকার করতেই হবে যে প্রাণ, চৈতন্য প্রভৃতি নিছক দেহধর্ম হতে পারে না। লাশটা তো রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কি প্রাণ, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মের লেশমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়? নিশ্চয়ই নয়। তা সত্ত্বেও কী করে চার্বাকেরা আত্মা বাদ দিয়ে প্রাণ, চৈতন্য প্রভৃতিকে নিছক দেহধর্ম বলে কল্পনা করতে পারেন?

আপাত-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, চার্বাকদের বিরুদ্ধে এ যেন একেবারে মোক্ষম যুক্তি, যা

থেকে চার্বাকপক্ষকে বাঁচানোর আর উপায় নেই। হয়তো এই কারণেই অন্যান্য দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই দেহাত্মবাদ খণ্ডনের উৎসাহে মূলত এই যুক্তিই প্রয়োগ করেছেন। যদিও সকলের প্রকাশভঙ্গি সমান নয়– কারুর লেখা কঠিন, কারুর লেখা তুলনায় সহজ; কারুর লেখায় যুক্তির সঙ্গে আরো নানা কথা জুড়ে দিয়ে পুরো আলোচনা অনেক বেশি কঠিন-কঠোর করবার প্রয়াস, কারুর লেখায় সে-চেষ্টার পরিচয় তুলনায় কম। কিন্তু মূল যুক্তিটা একই। এখানে আমাদের পক্ষে তাঁদের প্রতিটি উক্তি উদ্ধৃত করার সুযোগ নেই। দরকারও নেই। আমরা ইতঃপূর্বেই তার কিছু নমুন দেখেছি। চার্বাকপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে খুচরো-খাচরা তর্ক-বিতর্ক তুলেও আলোচনা পল্লবিত করা যেতে পারে; কিন্তু সে-চেষ্টারও প্রয়োজন নেই। যেমন ধরা যাক, চার্বাকপক্ষ থেকে অনায়াসে বলা যেতে পারে, দেহ এবং মৃতদেহ এক নয়। নিষ্ঠাবান ও ধার্মিক আত্মাবাদীর আচরণ থেকেই তার প্রকাশ পায়। কীভাবে? যে-গুরুজনকে আজ তিনি অতি ভক্তিভরে প্রণাম করেছেন তাঁরই মৃতদেহ আগামীকাল এমনই অপবিত্র হবে যে ছুঁলে স্নান করার বিধান। অতএব মৃতদেহর নজির দেখিয়ে দেহমাত্র প্রসঙ্গে কোনো সিদ্ধান্ত কতখানি যুক্তিযুক্ত তা আত্মবাদীকেও নতুন করে ভাবতে হবে। কিংবা, চার্বাকপক্ষ থেহে তর্ক তুলে বলা যেতে পারে যে মৃতদেহের নজির থেকে দেহমাত্র প্রসঙ্গে কোনো সিদ্ধান্তে বাধা আছে। যেমন নিছক দেহের একটা ধর্ম বা লক্ষণ হিসেবে শঙ্কর রূপ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দেহ এবং মৃতদেহের রূপ প্রভৃতি ধর্মও কি সর্বাংশে সমান?

কিন্তু এখানে এজাতীয় খুচরো যুক্তির তালিকা তৈরি করার দরকার নেই। কেননা, আবার দেহাত্মবাদের খণ্ডনে আত্মাবাদীরা এজাতীয় খুচরো কিন্তু পাল্টা যুক্তির পাল্টা ফর্দ তৈরি করতে পারেন। সে-সবের জটিলতায় ফাঁসলে আসল বিতর্কটা থেকে অল্পবিস্তর বিচ্যুত হবার সম্ভাবনা। দেহাত্মবাদ-বিরোধী আত্মাবাদীদের চতুর উদ্দেশ্যটাও আসলে এখানেই। তাই, এ-জাতীয় আলোচনার না-তুলে এখানে ভারতীয় প্রমাণবিদ্যার স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে বিতর্কটার সোজা ভাষায় পুনর্বিচারে প্রয়াস করা যায়।

দেহাত্মবাদের আলোচনায় আচার্য শঙ্কর দেহ এবং চৈতন্য প্রভৃতির মধ্যে ধর্ম-ধর্মী ভাবের কথা বলেছেন। কিন্তু এই নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষায় তাকে কারণ-কার্য সম্বন্ধেরই একটা নমুনা বলে ধরা যেতে পারে। এখানে পঞ্চভূতে গড়া দেহটি কারণ, এবং চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম তারই কার্য। একথা মানলে, ভেবে দেখতে হবে ভারতীয় প্রমাণ-বিদ্যার স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসারে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মূল পদ্ধতি কী এবং তা খণ্ডনেরই বা মূল শর্ত কী?

প্রমাণ-বিদ্যায় কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার প্রধান শর্ত বলতে দু'রকম– অন্বয় ও ব্যতিরেক–
এক। কারণ থাকলে কার্য থাকবে। যেমন, বহ্নি ধূমের কারণ হলে বহ্নি থাকলে ধূম থাকবে।
দুই। কারণ না থাকলে কার্য থাকে না। যেমন, বহ্নিশূন্য ধূমের অভাব।
প্রমাণ-বিদ্যার পরিভাষায়, প্রথমটিকে বলে 'অন্বয়', দ্বিতীয়টিকে বলে 'ব্যতিরেক'। এবং কার্য-

কারণ সম্বন্ধ খণ্ডনের প্রসিদ্ধ নিয়ম হলো, ‘অন্বয়’ এবং ‘ব্যতিরেক’ উভয়েরই গলদ দেখানো। সেক্ষেত্রে দেহাত্মবাদের বিচারে দেহাত্মবাদীর পক্ষে ‘অন্বয়’ হবে– শরীর থাকলে চৈতন্য প্রভৃতি থাকবে। এবং ‘ব্যতিরেক’ হবে– শরীরের অভাবে চৈতন্য প্রভৃতিরও অভাব হবে।

কিন্তু মৃতদেহের নজির থেকে কতটুকু কথা প্রমাণ হয়? দেহাত্মবাদের পক্ষে শুধু ‘অন্বয়’টুকুর খণ্ডন– শরীর থাকলেও চৈতন্য প্রভৃতির অভাব হতে পারে। মৃতদেহের নজির দেখিয়ে আত্মাবাদীরা এটুকুই দেখাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, তাছাড়াও প্রমাণ-বিদ্যার অনিবার্য শর্ত হিসেবে ‘ব্যতিরেক’টিও খণ্ডন করা দরকার। অর্থাৎ, দেখানো দরকার যে শরীরের অবিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্য প্রভৃতির পরিচয় সম্ভব। আত্মবাদী মহলে এই দ্বিতীয় কথাটি প্রমাণ করবার উৎসাহ বড় একটা চোখে পড়ে না। তার কারণ হয়তো এই যে তা প্রমাণ করা সহজসাধ্য নয়, বা অন্তত সহজবুদ্ধির কাছে গ্রাহ্য হওয়া কঠিন। দেহ নেই অথচ শুধু চৈতন্য আছে– এহেন ঘটনার নজির দেখানো তেমন সোজা নয়।
আত্মাবাদীদের পক্ষ থেকে হয়তো দাবি করা হবে যে দেহের মায়া কাটিয়ে আত্মা মোক্ষলাভ করলে চৈতন্য থাকে, কিন্তু শরীর থাকে না। কিন্তু ব্যাপারটা একটু গোলমেলে হয়ে গেলো নয় কি? কেননা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নজিরবিহীন মোক্ষলাভের কথাটা মেনে নিলেও– বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব আপাত-কল্পনায় স্বীকার করলেও– মুক্ত আত্মার অবস্থাটা আসলে কীরকম, এ-বিষয়ে আত্মবাদীদের মধ্যেও মতে মিল নেই। যেমন শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অনুসারে, মুক্ত আত্মা চৈতন্যস্বরূপ; কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা তা মানেন না। তাঁদের মতে মুক্ত আত্মার স্বরূপ জড়বস্তুর মতোই; তাতে চৈতন্যের কোন পরিচয় নেই। শুধুমাত্র দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয় বা বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সংযোগের ফলে আত্মাতে চৈতন্যের উদ্ভব হয়।

তার মানে, দেহের অনুপস্থিতিতেও চৈতন্যের পরিচয় পাওয়া যায়– এই দাবির পক্ষে সুনিশ্চিত প্রমাণ দেখাতে না-পারলে ভারতীয় প্রমাণবিদ্যার প্রথা অনুসারেই দেহাত্মবাদের খন্ডন সর্বাঙ্গীণ বা সম্পূর্ণ হয় না। মৃতদেহের নজির থেকে বড় জোর এটুকুই প্রমাণ হতে পারে যে দেহ বর্তমান থাকলেও চৈতন্যের অভাব সম্ভব। তার বেশি কিছু নয়। অতএব, দেবীপ্রসাদের ভাষ্য হলো–
‘জীবদেহ ও মৃতদেহকে দেহ অর্থে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলে স্বীকার করলেও শুধুমাত্র তারই নজির থেকে দেহাত্মবাদের পূর্ণাঙ্গ খণ্ডন হয় না। অন্তত ভারতীয় ন্যায়বিদ্যার নিরিখে নয়। কিংবা, দাবাড়ে ভাষায়, শুধু মড়ার নজিরের চাল দিয়ে দেহাত্মবাদকে মাৎ করে দেওয়া সম্ভব নয়।’- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৯৫)

এ প্রসঙ্গে তাই হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়ও বলেন–
‘যেহেতু চেতনা জীবদেহেরই একটা বিশেষ গুণ তাই দেহের সঙ্গে সঙ্গেই চেতনার জন্ম ও মৃত্যু। এর অকাট্য অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণ হল :
যে পর্যন্ত দেহ জীবিত থাকে সে পর্যন্ত চেতনা থাকে। মৃতদেহে কোনো চেতনার লক্ষণ খুঁজে

পাওয়া যায় না। আমরা চেতনা বিশিষ্ট দেহ দেখতে পাই, চেতনাশূন্য দেহও দেখতে পাই। কিন্তু দেহহীন স্বাধীন চেতনা কোথাও কখনো দেখি না। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় চেতন দেহেরই এক বিশেষ গুণ, চৈতন্যময় আত্মা নামক দেহবিযুক্ত কোনো স্বতন্ত্র পদার্থ নেই। এই সিদ্ধান্তের জন্যই চার্বাক দর্শনকে বলা হয় ভূতচৈতন্যবাদী বা দেহাত্মবাদী দর্শন। এই মতবাদ স্বভাববাদেরই একটা অঙ্গ।'- (চার্বাকদর্শন, পৃষ্ঠা-৩১)

সাথে সাথে হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় এই চার্বাক-সিদ্ধান্তের তাৎপর্যটাও উল্লেখ করে দিতে ভুলেন না যে–
'চৈতন্য ভৌতিক প্রাণিদেহেরই একটি বিশেষ গুণ– এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। তা হলে দেহব্যতিরিক্ত, দেহবহির্ভূত চৈতন্যময় আত্মা নামক কোনো স্বতন্ত্র অজর অমর পদার্থ নেই যে পদার্থটি জন্ম-জন্মান্তর পরিভ্রমণের পর, সংসার চক্রের বাইরে ঈশ্বরের দরবারে মুক্ত পুরুষ রূপে অবস্থান করে। স্বতন্ত্র আত্মা না থাকলে, জন্ম-জন্মান্তর, পূর্বজন্মের কর্মফল, অদৃষ্ট, স্বর্গ নরক, পারলৌকিক মুক্তি, সৃষ্টিকর্তা ও মুক্তিদাতা ঈশ্বর সব কিছুই অনাবশ্যক বলে বাতিল হয়ে যায়।'- (চার্বাকদর্শন, পৃষ্ঠা-৩১)

.
গ। স্মৃতির নজির।
দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে আরো নানা যুক্তির মধ্যে আরেকটি যুক্তি তুলনায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে জয়ন্তভট্ট, উদয়নাচার্য প্রভৃতি মহানৈয়ায়িকেরা যুক্তিটির তুলনায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে তার্কিক হিসেবে এঁদের কোনোমতেই তুচ্ছ ভাবা যায় না। তাই এঁরা যে-যুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তাও সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্যই এঁদের লেখা সহজপাঠ্য নয়; রচনার উৎকর্ষ সাধনে এঁরা যে-সব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন তার পর্যাপ্ত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ছাড়া সাধারণ পাঠক হিসেবে আমাদের সহজে বোধগম্য হবার কথা নয়। তাই যুক্তিটির সহজ পরিচয়ের জন্য আমরা এক্ষেত্রেও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তা নিতে পারি।

ইতঃপূর্বে নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টের প্রাসঙ্গিক উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। যুক্তিটির মূল কথা হলো স্মৃতির সাক্ষ্য। একথা না-মানার কোন কারণ নেই যে, বাল্যকালের অভিজ্ঞতা যৌবনে– এবং যৌবনের অভিজ্ঞতা বার্ধক্যকালে– স্মরণ হয়। কিন্তু বাল্যদেহ, যৌবনের দেহ ও বৃদ্ধদেহ অবশ্যই এক নয়। দেহ হিসেবে এগুলির মধ্যে এমনই মৌলিক পার্থক্য যে বরং এগুলির প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন দেহ বলে বিবেচিত হবার কথা। দ্বিতীয়ত, একের অভিজ্ঞতা অপরের পক্ষে স্মরণ করার প্রশ্ন ওঠে না– দেবদত্ত নামের ব্যক্তিটির অভিজ্ঞতা যজ্ঞদত্ত নামে অপর কেউ কি স্মরণ করতে পারে?
এই দুটি কথা মনে রাখলে স্বীকার করতেই হবে যে নিছক দেহকে স্মরণকর্তা বলে স্বীকার

করা অসম্ভব। অথচ, স্মৃতি বলে ঘটনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাহলে, স্মৃতির পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা হিসেবে মানতেই হবে যে স্মরণকর্তা অর্থে শুধু দেহকেই সত্য বলা সম্ভব নয়। দেহ ছাড়াও বাড়তি কিছু স্বীকার করতে হয়। সেই বাড়তি কিছুটিকে আত্মা বলে মানো। কেননা, দেহ নিত্য পরিবর্তনশীল হলেও আত্মা একই থাকে। বাল্য থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত আত্মাও বদলাতে থাকে– এমনতর দাবি করা যাবে না।

অবশ্যই সাধারণভাবে আমরা এটা জানি যে বৌদ্ধ দার্শনিকেরা নিত্য আত্মা বলে কিছু মানতেন না। তাঁদের মতবাদ তাই নৈরাত্ম্যবাদ বলে প্রসিদ্ধ। এই কারণে, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে নিত্য আত্মায় বিশ্বাসী নৈয়ায়িক প্রভৃতির সঙ্গে বৌদ্ধ দার্শনিকদের ধুমাধূম তর্ক আছে। কিন্তু এখানে সে তর্ক বিচারের প্রয়োজন নেই। নিত্য আত্মা মানুন আর নাই মানুন– এবং নিত্য আত্মা অস্বীকার করেও স্মৃতির কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব কিনা, কিংবা নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধরা স্মৃতির কী ব্যাখ্যা দিতেন– বর্তমান অবস্থায় সে-আলোচনায়ও বিক্ষিপ্ত হবার কারণ নেই। কেননা নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধরা আর যাই হোন দেহাত্মবাদী ছিলেন না। কিন্তু চার্বাকী দেহাত্মবাদের আলোচনায় এই স্মৃতির সাক্ষ্য যে অন্তত দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড়ো অন্তরায়, এ কথাটুকু স্বীকার করতেই হবে। অর্থাৎ, নিত্য আত্মা মানুন বা নাই মানুন, জয়ন্তভট্ট বা উদয়নাচার্য প্রভৃতির যুক্তি থেকে অন্তত আপাত দৃষ্টিতে এটুকু মনে হয় যে দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা একটা মোক্ষম নিদর্শন দেখিয়েছেন। এখন প্রশ্ন, চার্বাকেরা এ-তর্কের কী জবাব দেবেন?

সত্যি বলতে কী– দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে– 'প্রাচীনকালের সাধারণ পটভূমিতে এই তর্কের কোনো উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তার কারণ, স্মৃতি বলে ঘটনাটির পর্যাপ্ত কোনো ব্যাখ্যা প্রাচীনকালে ও এমনকি মধ্যযুগেও কারুর জানা থাকবার কথা নয়। কিন্তু তাই বলে এই তর্কের সম্মুখীন হয়ে চার্বাকপক্ষ থেকে একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়া বা দেহাত্মবাদ বর্জন করারও কারণ নেই।...
প্রাচীন দার্শনিকদের কাছে বিজ্ঞানের তথ্যসম্ভাব প্রত্যাশা করার অবশ্যই কোনো কারণ নেই। তবুও প্রাচীন দর্শনের বিচারে একটি প্রশ্ন অবান্তর হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দিক থেকে প্রাচীন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্য সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেও নিশ্চয়ই প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকে, কোনো দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের প্রতিশ্রুতি– বা অন্তত কোনো অস্পষ্ট আভাস– খুঁজে পাওয়া যায় কি? যদি যায়, তাহলে স্বীকার করতে হবে অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় যার মধ্যে এই রকম ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি ছিল তার অন্তত ঐতিহাসিক মূল্য উড়িয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-৯৬)

তার মানে, প্রাচীন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অধুনালভ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের সম্পর্কের মধ্যেই জবাবটি নিহিত। বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মৃতি বলে ঘটনাটির রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস শুধু আজকের ব্যাপার নয়। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রয়াস চলেছে এবং এমনকি বিজ্ঞানীমহলেও এই

নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। কিন্তু সুদীর্ঘ যুগ ধরে গবেষণার ফলে আজকের পরিস্থিতিটা অন্য রকম। স্মৃতির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া না-গেলেও অন্তত মোটের উপর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছে। যে-ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছে তার পরিচয় দেবার সুযোগ এখানে নেই; কেননা ব্যাখ্যাটা সহজ-সরল মোটেই নয়, এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছোট করে উল্লেখ করবার চেষ্টা করাও নিষ্ফল। কিন্তু বর্তমান আলোচনার পক্ষে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক কথা হলো যে সে-গ্রন্থ মূলতই শরীরবিদ্যা বিষয়ের। অর্থাৎ, আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে যেটা সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক কথা তা হচ্ছে আজকের বিজ্ঞান স্মৃতির ব্যাখ্যায় যতটুকু সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পেয়েছে তার মূলে শরীর বা দেহ প্রসঙ্গেই গভীরতর জ্ঞান। দেহকে বাদ দিয়ে নয়, বরং দেহকে আরো ভালো করে বুঝেই আজ স্মৃতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যার দিকে অগ্রগতি।

তাহলে প্রাচীন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোথায় আমরা ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের প্রতিশ্রুতি পেতে পারি? দেহাত্মবাদের মধ্যে, না কি তার বিরুদ্ধমত আত্মবাদের মধ্যে? ঐতিহাসিকভাবে চার্বাকদের পক্ষে স্মৃতির রহস্য কতটুকু জানা ছিলো, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে লাভ নেই। সমস্যাটা নিয়ে তাঁরা একান্তই মাথা ঘামিয়েছিলেন কিনা, তাও আমাদের জানা নেই। কিন্তু এটুকু বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবার কথা নয় যে তাঁদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই বিজ্ঞানের বীজ খুঁজে পাবার কথা– কারণ, বিজ্ঞান স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৩.০ : স্বভাববাদ

ইতঃপূর্বে দেহাত্মবাদের আলোচনায় ‘স্বভাব’ বা ‘স্বভাববাদ’ বিষয়টি প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হয়েছে। কোন প্রসঙ্গে? চার্বাকমতে আগুন বাতাস জল মাটি বলে চৈতন্যহীন ভূতবস্তুরই কোনো একরকম বিশেষ পরিণামের ফলে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহের উৎপত্তি হয়। কিন্তু কী করে হয়? আত্মপক্ষ সমর্থনে চার্বাক অবশ্যই দাবি করবেন এ জাতীয় বিশেষ পরিণামের ব্যাখ্যায় ভূতবস্তুগুলি ছাড়া আর কিছু মানার দরকার নেই, কেননা ভূতবস্তুগুলির ‘স্বভাব’ই ওই– অবস্থাবিশেষে তা দেহাকারে পরিণত হয়। কিন্তু, প্রশ্ন উঠবে, এইভাবে চার্বাকমত সমর্থন করার পক্ষে সত্যিই কি কোনো প্রমাণ আছে? কিংবা, যা একই কথা, চার্বাক কি বাস্তবিকই ‘স্বভাব’ বলে কিছু মানতেন?

শঙ্করাচার্যের ‘সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ’ গ্রন্থে স্বভাববাদী চার্বাকদের অভিমতের এক বিবরণে বলা হয়েছে–

‘ন কল্প্যৌ সুখদুঃখাভ্যাং ধর্মাধর্মৌ পরৈরিহ।
স্বভাবেন সুখী দুঃখী জনোহন্যন্নৈব কারণম্ ।।’ (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/৪)।।
‘শিখিনশ্চিত্রয়েৎ কো বা কোকিলান্ কঃ প্রকূজয়েৎ।
স্বভাবব্যতিরেকেণ বিদ্যতে নাত্র কারণম্ ।।’ (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/৫)।।
অর্থাৎ :
(লোকায়তিক চার্বাকমতে) অপরবাদিগণ কর্তৃক সুখদুঃখরূপ হেতুর দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের অনুমান করা অযৌক্তিক। স্বভাববশতই মানুষ সুখ এবং দুঃখ পেয়ে থাকে। এই বিষয়ে ধর্ম ও অধর্ম নামক কারণান্তরের অপেক্ষা নেই। (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/৪)।। ময়ূরদের কে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করে দেয়? কোকিলদেরই বা কে কূজন করায়? বস্তুত স্বভাব ব্যতীত এক্ষেত্রে অন্য কোন কারণ নেই। (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/৫)।।

তার মানে, এই মত অনুসারে, শিখিপুচ্ছে নানা রঙের বৈচিত্র্য বা কোকিলের কণ্ঠে মধুর স্বরের সমাবেশ স্বাভাবিক যে নিয়মে হয়, মানুষের সুখ-দুঃখেও সেই নিয়মেরই প্রভাব দৃষ্ট হয়। এসবের কারণ হিসেবে ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদির কল্পনা অসঙ্গত। এই স্বাভাবিক নিয়মই হলো স্বভাব-নিয়ম; যাকে স্বভাববাদ বলে চিহ্নিত করা হয়। অন্যান্য চার্বাকী ধারণার মতো স্বভাববাদও ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। তবে এ আলোচনায় যাওয়ার আগে স্বভাববাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের পক্ষে কিছু প্রাচীন নজির অনুসন্ধান করা আবশ্যক, যা থেকে প্রমাণ হয় যে, চার্বাক বস্তুত স্বভাববাদী ছিলেন।

.

। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের নজির।

প্রসিদ্ধ দর্শন-গবেষক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর ‘চার্বাক দর্শন’ গ্রন্থে বলেছেন, স্বভাববাদ সম্ভবত আদিতে স্বতন্ত্র মত হিসেবে ভারতের চিন্তাক্ষেত্রে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যার

উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছিলো। চার্বাক মতের সঙ্গে এই মতের একীকরণ পরবর্তী পর্যায়ে বলে অনেকের ধারণা। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই বক্তব্যের উৎস খুঁজতে হলে আমাদেরকে প্রাচীন নজির হিসেবে ‘শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ’কেই লক্ষ্য হিসেবে ধরে নিতে হয়। কেননা, ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে স্বভাববাদের সবচেয়ে পুরোনো নজির বলতে ‘শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ’।

উপনিষদের নামটি অবশ্য কিছুটা অদ্ভুত ঠেকতে পারে। কেননা দেবীপ্রসাদের মন্তব্য অনুসারে ‘শ্বেতাশ্বতর’ শব্দটির অর্থ সোজা কথায় ‘সাদা খচ্চর’। উপনিষদটির মধ্যেও ঋষি নিজেকে এই শ্বেতাশ্বতর নামেই উল্লেখ করেছেন–

‘তপঃপ্রভাবাৎ দেবপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোহথ বিদ্বান্ ।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগ্-ঋষিসঙ্ঘ-জুষ্টম্ ।।’ (শ্বেতাশ্বতর-৬/২১)
অর্থাৎ :
শ্বেতাশ্বতর নামে এক বিদ্বান অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বে জ্ঞানী তপস্যাবলে আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। কিন্তু কেবল তপস্যাবলেই নয়, দেবতার অনুগ্রহে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিলেন। তারপর, তিনি সেই পরম-পবিত্র ঋষিগণ-সেবিত সেই সত্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পূজনীয় আশ্রমিকদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন।

পরবর্তীকালের অধ্যাত্মবাদীদের কাছেও নামটা নিশ্চয়ই বিস্ময়কর মনে হয়েছে। তাই, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষ্যে–
‘শঙ্করানন্দ এর একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করতে চেয়েছেন : শ্বেত মানে বিশুদ্ধ এবং ঔপচারিক অর্থে অশ্ব মানে ইন্দ্রিয়। ‘বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়’ : কিন্তু মুস্কিল হলো, গ্রন্থ এবং তার প্রবক্তা ঋষিটির নাম শ্বেত-অশ্বতর এবং অশ্ব ও অশ্বতর এক নয়। একালে রাধাকৃষ্ণণও বুঝেছেন, ব্যাপারটা বেশ একটু গোলমেলে; ফলে নামটার নামে করেছেন, ‘সাদা খচ্চরের মালিক’। কিন্তু ব্যাকরণের পরোয়া করলে এমন মানে দাঁড় করানো কঠিন। এবং যদিই বা দাঁড় করানো যায় তাহলেও সাদা খচ্চরের মালিকানাটা এমন কিছু আহামরি ব্যাপার হবে না যে তা থেকে নিজের নাম এবং তাঁরই নামে প্রচলিত উপনিষদটির নামকরণ করে কেউ খুব একটা অধ্যাত্ম-গৌরব অনুভব করতে পারেন।
পক্ষান্তরে আমাদের ধারণা, নৃতত্ত্ববিদরা যাকে প্রাচীন ‘টোটেম বিশ্বাস’ বলেন, নামটার পিছনে তার কোনো ইংগিত থাকা অসম্ভব নয়; কেননা এহেন বিশ্বাসের মূল কথাই হলো গাছগাছড়া বা জন্তুজানোয়ার থেকে মানবদলের নামকরণ– দলের সবাই নিজেকে তারই বংশধর বলে কল্পনা করতো। টোটেম বিশ্বাস অবশ্যই আদিম সমাজের পরিচায়ক; কিন্তু বিশেষত আমাদের দেশে তার রেশ দীর্ঘযুগ ধরে টিকে থেকেছে। আজো আছে।’- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১০৮-৯)

তবে উপনিষদটির নামকরণের কারণ যাই হোক-না-কেন, আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে গ্রন্থটির গুরুত্ব বড় কম নয়। কেননা এই উপনিষদেই, ধারণা করা হয়, সর্বপ্রথম

বিশিষ্ট দার্শনিক মত হিসেবে ‘স্বভাব’ বা ‘স্বভাববাদে’র উল্লেখ পাওয়া যায়। উপনিষদটির প্রথম দুটি শ্লোকেই পাওয়া যায়, যদিও শ্লোক দুটির আক্ষরিক অর্থ নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা– অতএব মতভেদ– আছে। কিন্তু অতশত সূক্ষ্ম বিচারে আমাদের আপাতত প্রয়োজন নেই; মোটকথা অর্থটাই যথেষ্ট। এখানে বলা হয়েছে–

‘ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি–
‘কিং কারণং ব্রহ্ম, কুতঃ স্ম জাতা, জীবাম কেন, ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ।।’ (শ্বেতাশ্বতর-১/১)
‘কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবাৎ আত্মাহপি অনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ।।’ (শ্বেতাশ্বতর-১/২)
অর্থাৎ :
পরম সত্য (উপনিষদের ভাষায় ব্রহ্ম) নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের মধ্যে প্রশ্ন উঠলো– পরম সত্য (বা ব্রহ্ম) আসলে কী? কী থেকে আমাদের জন্ম, কিসের উপর নির্ভর করে আমরা বাঁচি এবং শেষ পর্যন্ত কিসে ফিরে যাই? আমাদের সুখদুঃখের কারণ কী? (শ্বেতাশ্বতর-১/১)।। কাল, বস্তুর স্বভাবধর্ম, নিয়তি (কারণ ও তার কার্য), যদৃচ্ছা (আকস্মিক ঘটনা), ভূতবস্তু, যোনি, পুরুষ (জীবাত্মা), এই সবের কোনও একটি কি জগতের কারণ? কোন একটি কারণ, না সব কটি কারণ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে এই সৃষ্টি-কাজ সফল করেছে? এই সবগুলিকে একত্রিত করতে পারে জীবাত্মাই (পুরুষ); কিন্তু আবার সুখ-দুঃখের অধীন কোন জীবাত্মাই নিজের প্রভু অর্থাৎ স্বাধীন নয়। তাহলে এই যে সৃষ্টি-পরিণাম এর কারণ কী? (শ্বেতাশ্বতর-১/২)।।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, প্রথম শ্লোকের প্রশ্নগুলি নিয়ে সেকালে রকমারি মত চালু ছিলো। তার তালিকাটাও খুব চিত্তাকর্ষক। একটা মতে, ‘কাল’ই পরম সত্য। অর্থাৎ, ‘কাল’ থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি; ‘কালে’ই সবকিছুর স্থিতি; ‘কালে’র মধ্যেই সব কিছু আবার বিলীন হয়। মতটাকে তাই ‘কালবাদ’ বলার প্রথা আছে। আধুনিক বিদ্বানরা বলছেন, ‘অথর্ববেদ’ থেকেই এই জাতীয় মতের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এককালে একদল চিন্তাশীলের মধ্যে– বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মহলে– মতটা বেশ চালু ছিলো।

দ্বিতীয় মতে, ‘স্বভাব’ই পরম সত্য। আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিলয়ের মূলে এই ‘স্বভাব’ ছাড়া আর কিছু নেই। মতটাকে তাই ‘স্বভাববাদ’ বলা হয়।

তৃতীয় মতে, ‘ভূতবস্তু’ই পরম সত্য। মতটা অবশ্যই চার্বাকদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, কেননা প্রাচীনকালে আর কেউ নিছক ভূতবস্তুকে একমাত্র সত্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

চতুর্থ ও পঞ্চম মতে, ‘নিয়তি’ এবং ‘যদৃচ্ছা’ (অর্থাৎ আকস্মিকত্বই বা কারণহীনতাই) পরম সত্য।

এর পর উপনিষদ্-এ ‘যোনি’ এবং ‘পুরুষ’ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শব্দ দুটি নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে কিছুটা বিতর্ক আছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ে ভাষ্যে–
‘কেউ বলেন ‘কারণ’ অর্থে যোনি শব্দটাকে উপরিউক্ত মতগুলির সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে হবে। অপর মতে ‘যোনি’ বলতে স্বতন্ত্র মত উল্লিখিত। যোনি শব্দের আক্ষরিক অর্থ অবশ্যই নারীর জননাঙ্গ; সেদিক থেকে জন্ম বা উৎপত্তি-সূচক মনে করে কারণ অর্থে প্রয়োগ অসম্ভব নয়। অপরে বলেন, এখানে স্বতন্ত্র একটি কারণ অর্থে যোনি শব্দের প্রয়োগ। সে-অর্থ গ্রহণ করলে হয়তো তন্ত্রমতের কোনো আদিম সংস্করণের আভাস পাওয়া যেতে পারে। আবার কেউ বলছেন, স্বতন্ত্র পরম সত্য হিসেবে এখানে সাংখ্যমতের কোনো আদি-সংস্করণের নির্দেশ অসম্ভব নয়, কেননা সাংখ্যমতে যে ‘প্রকৃতি’ জগৎকারণ তা আদি-নারীরূপেই কল্পিত।’
‘এ-হেন ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে কিন্তু সাংখ্যদর্শনের আদিরূপ হিসেবে যার আভাস পাওয়া যায় তার সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের পরবর্তী সংস্করণের মিল থাকে না। কেননা এই ‘যোনিবাদ’ অনুসারে নিছক প্রকৃতি বা প্রকৃতিমাত্রই জগৎকারণ, কেননা উপনিষদ্কার এখানে স্বতন্ত্রভাবে ‘পুরুষ’-এর কথা– বা ‘পুরুষবাদ’– উল্লেখ করেছেন। ‘ঋগ্বেদ’ থেকেই অবশ্য ‘পুরুষ’কে আদি কারণ বলে ঘোষণা করার প্রথা আমাদের জানা আছে (পুরুষসূক্ত), যদিও কিছু পরবর্তীকালে উপনিষদের চরম ভাববাদীরা বিশুদ্ধ আত্মা বা চিন্ময় পরব্রহ্মেরই প্রতিশব্দ হিসেবেও ‘পুরুষ’ শব্দ গ্রহণ করতে চেয়েছেন।’- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১১০)

এই বিশুদ্ধ আত্মা বা চিন্ময় পরব্রহ্মের প্রতিশব্দ হিসেবে ‘পুরুষ’ শব্দ গ্রহণের দৃষ্টান্ত হিসেবে যেমন ‘বৃহদারণ্যক উপনিষদ্’-এ আছে–
‘ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু, অসৌ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু। যশ্চায়মাস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুয়ুষো যশ্চায়মধ্যাত্বং শারীরস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্মা; ইদং অমৃতং, ইদং ব্রহ্মেদং সর্বম্’।। (বৃহদারণ্যক-২/৫/১)
অর্থাৎ :
এই পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় সবার কাছে মধুস্বরূপ, মধুভাণ্ড বা মধুচক্র। আবার এই পৃথিবীর কাছেও, যা কিছু আছে, যত জীব আছে সবই মধুস্বরূপ। এই পৃথিবীতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ আছেন, এবং জীব শরীরের অভ্যন্তরে যে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ আছেন– ইনিই তিনি। দুই-ই এক (মধু); যিনি হলেন এই এই আত্মা, এই অমৃত, এই ব্রহ্ম, এই সব কিছু।

কিন্তু এ-আলোচনা আমাদের পক্ষে খুব বেশি প্রাসঙ্গিক নয়। ‘শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্’-এ ‘যোনি’ ও ‘পুরুষ’ শব্দ ব্যবহারের পিছনে উপনিষদ্কারের বুদ্ধিস্থ আসলে কী ছিলো, সে-বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া সহজসাধ্য নয়। কিন্তু একটি বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে আলোচ্য উপনিষদটির প্রতিপাদ্য বিষয় ঈশ্বরই প্রকৃত জগৎকারণ। যেমন–
‘স্বভাবমেকো কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ।।’ (শ্বেতাশ্বতর-৬/১)

অর্থাৎ :
অনেক কবি বা দ্রষ্টার ধারণা, সৃষ্টির মূল কারণ হলো স্বভাব। বস্তুর স্বভাবধর্মই হলো সৃষ্টি করা, রূপ দেয়া। তাঁদের এ ধারণা ভুল। আবার কারও মতে জগতের উৎপত্তি কাল থেকে, অর্থাৎ কালই জগৎনস্রষ্টা। এই ধারণাও ভুল। বস্তুত পরমেশ্বর পরমাত্মাই এই ব্রহ্মচক্র অর্থাৎ জগতের কারণ।

কিন্তু ঈশ্বরই প্রকৃত জগৎকারণ এই প্রতিপাদ্য-বিষয় ব্যাখ্যা করার আগে তাই সেকালে প্রচলিত কয়েকটি বিরুদ্ধ মত বর্জনার্থে অন্যান্য ধারণাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। সেকালে মতগুলির বিশেষ প্রভাব না-মানলে এই উল্লেখের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ফলে অনুমান করা যায় যে, ওই সুদূর প্রাচীনকালেই মতগুলি বিশেষ প্রভাবশীল ছিলো। এগুলির মধ্যে আমাদের আলোচনায় বিশেষ প্রাসঙ্গিক বলতে দুটি মত– 'স্বভাববাদ' ও 'ভূতবাদ'।

.
। ভূতবাদ ও স্বভাববাদ।
'ভূতবাদ' বলতে চার্বাকমত– বা তারই খুব নিকটাত্মীয় কোনো প্রাচীন বস্তুবাদ– বলে গ্রহণ করায় বোধহয় বিশেষ কোন আপত্তির আশঙ্কা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, 'স্বভাববাদ'-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? স্বভাববাদ প্রসঙ্গে 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্'-এর সাক্ষ্যই যদি এক্ষেত্রে একমাত্র সম্বল হতো তাহলে অবশ্য ভূতবাদ ও স্বভাববাদকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে মানতে বাধ্য হতে হতো, কেননা উপনিষদটিতে স্বতন্ত্রভাবে মত দুটির উল্লেখ রয়েছে। এ-জাতীয় পার্থক্য স্বীকার করলে স্বভাববাদকে চার্বাক বা লোকায়ত মতের পরিচায়ক বলে মনে করায় বাধা হয় বলে দেবীপ্রসাদ মনে করেন। কেননা, ভূতবাদই লোকায়ত বা চার্বাকমতের প্রাণবস্তু।

কিন্তু তুলনায় কিছু পরবর্তীকালের নজির থেকে অবধারিতভাবেই প্রমাণ হয় যে, ভূতবাদী চার্বাক স্বভাববাদীও ছিলেন; বস্তুত স্বভাববাদ না-মানলে চার্বাকের ভূতবাদ বা চরম বস্তুবাদ প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। এখানে উল্লেখ্য, উপনিষদে চার্বাক তো দূরের কথা লোকায়ত নামেরই কোন উল্লেখ নেই; কিন্তু প্রখর বস্তুবাদের বা ভূতবাদের বিস্তর নজির আছে। এই ভূতবাদের সঙ্গে স্বভাববাদের অনিবার্য আত্মীয়তার কথা 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্'-এ উপলব্ধ হোক-আর-নাই-হোক, পরবর্তী সাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে। সম্ভবত তারই নজির মনে রেখে গোপীনাথ কবিরাজ মন্তব্য করেছেন–
'মনে হয় চরম স্বভাববাদের প্রতিনিধি বলতে সুপ্রাচীন ভারতের একদল একেবারে স্বাধীন চিন্তাশীল ছিলেন; আদিতে এঁদেরই লোকায়ত বলে উল্লেখ করার প্রথা ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এঁরাই অনেক ব্যাপকভাবে চার্বাক নামে পরিচিত হন। তাঁদের মতের আদিরূপটির বৈশিষ্ট্য বলতে কট্টর বস্তুবাদ, অদৃষ্টে (অর্থাৎ কর্মফলে) অবিশ্বাস, আপসহীন যুক্তিবাদ– বা হয়তো বিতণ্ডাও।'- (সূত্র: ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১১১)

বিতণ্ডা বলতে বোঝায় বৃথাতর্ক বা শুধু তর্কের খাতিরে তর্ক। লোকায়তিকদের ঘাড়ে বিতণ্ডাবাদের অপবাদটা যে-উদ্দেশ্যে চাপানো হয়েছিলো তার যাথার্থ্য বড় জোর সংশয়-সাপেক্ষ। কিন্তু সে বিতর্ক না-তুলেও নিশ্চয়ই মন্তব্য করার সুযোগ আছে যে, 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্'-এর উক্তি সত্ত্বেও অন্তত কিছু দিনের মধ্যেই স্বভাববাদকে লোকায়ত বা চার্বাক বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। আর তাই হয়তো 'মহাভারত'-এ সরাসরিই বলা হয়েছে–

'স্বভাবং ভূতচিন্তকাঃ'। (মহাভারত)
অর্থাৎ : যাঁরা শুধু ভূতবস্তু বিষয়েই চিন্তা করেন (অর্থাৎ শুধু ভূতবস্তুকেই মানেন) তাঁরা স্বভাববাদী।

আর 'বৃহৎ-সংহিতা'-র ব্যাখ্যায় ভট্ট উৎপল বলছেন– 'অন্যেরা, অর্থাৎ লোকায়তিকেরা স্বভাবকেই জগৎকারণ বলে গ্রহণ করেন; স্বভাবের জন্যই বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি, স্বভাববশতই তার বিলোপ।'- (সূত্র: ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১১২)। এবং 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-তে চার্বাকমতের ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য বলছেন–

ননু অদৃষ্টানিষ্টৌ জগদ্-বৈচিত্র্যম্ আকস্মিকং স্যাদিতি চেৎ? ন তদ্ ভদ্রম্, স্বভাবাদেব তদুপপত্তেঃ। তদুক্তম্–
'অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শস্তথাহনিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্-ব্যবস্থিতিঃ।।'- (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ :
[চার্বাক দর্শনের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠবে :] তোমরা যদি 'অদৃষ্ট' (অর্থাৎ পূর্বকর্মের ফল ধর্ম-অধর্ম) না মানো তাহলে পৃথিবীর এতো বৈচিত্র্য তো আকস্মিক (অর্থাৎ অকারণ) বলে স্বীকার করতে বাধ্য হবে। [চার্বাকেরা কিন্তু বলবেন], এমনতর কথা (বা আপত্তি) ঠিক নয়, [কেননা জগৎ-বৈচিত্র্যের] ব্যাখ্যার জন্য 'স্বভাব' স্বীকার করাই পর্যাপ্ত। [এই প্রসঙ্গে মাধব চার্বাকদের লোকগাথা উদ্ধৃত করেন]–
'অগ্নি উষ্ণ, জল শীতল, বাতাস সমস্পর্শ অর্থাৎ অনুষ্ণ ও অশীত (গরমও নয়, ঠাণ্ডাও নয়)। এতো বৈচিত্র্য কার সৃষ্টি? (কারুরই নয়;) স্বভাবের জন্যই এগুলি ওই রকম।'

হরিভদ্রর লেখা 'ষড়্দর্শনসমুচ্চয়' ব্যাখ্যায় জৈন দার্শনিক গুণরত্ন স্বভাববাদের আরো কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন এবং সেই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি প্রামাণিক লোকগাথা উদ্ধৃত করেছেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কিছুটা স্বাধীন তর্জমায় তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে–

'স্বভাববাদীরা নিম্নোক্ত দাবি করবেন। স্বভাব বলতে বোঝায় বস্তুর স্বীয় বা স্বকীয় পরিণাম। স্বভাব-জন্যই সবকিছুর উৎপত্তি; যেমন, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, পট নয়। তেমনি তন্তু বা সুতো থেকে শুধু পটই তৈরি হয়। [শুধুমাত্র মাটি থেকেই ঘট তৈরি হয়, কাপড় বোনা যায় না; তেমনি শুধুমাত্র সুতো থেকেই কাপড় তৈরি হয়, ঘট হয় না। অতএব, মাটির স্বভাবই এমন এবং সুতোরও স্বভাবই এমন যে প্রথমটি থেকে শুধু ঘট এবং দ্বিতীয়টি থেকে শুধু পট

তৈরি হয়; অন্যথা তো মটি থেকেও পট এবং সুতো থেকেও ঘট তৈরি হতে পারতো]। স্বভাব ছাড়া এজাতীয় পরিণাম-নিয়মের কোনো ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়। অতএব, সবকিছুই স্বভাবের পরিণাম বলে মানতে হবে। [এ-বিষয়ে লোকগাথা আছে]–
কণ্টককে কে তীক্ষ্ণ করলো?
মৃগ-পক্ষীদের এত বৈচিত্র্যই বা কার সৃষ্টি?
এ সবই স্বভাব থেকে উৎপন্ন;
এগুলি কারুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরিণাম নয়।।
.
খেজুর গাছের কাঁটা তীক্ষ্ণ,
কোনোটা ঋজু, কোনোটা বাঁকা।
কিন্তু (গাছটার) ফল গোলাকার।
এসব আর কার সৃষ্টি– বলতে পারো?

‘অন্যান্য পরিণামের কথা না-হয় বাদই দেওয়া গেল। এমনকি স্বভাব ছাড়া মুগডালও (মুদ্গ) সেদ্ধ হয় না। রান্নার পাত্র, চুল্লির আগুন, ফোটাবার সময় (কাল) প্রভৃতি সমস্ত আয়োজন-উপকরণ সত্ত্বেও কাঁকরের মুগডাল (‘কঙ্কদুকমুদ্গ’? ডালের মতো দেখতে কাঁকর) সেদ্ধ সম্ভব নয়। অতএব, যার অভাবে কিছুর উৎপত্তি হয় না এবং যার উপস্থিতিতে উৎপত্তি হয়– উভয় দিক থেকেই স্বভাবকেই কারণ বলে মানতে হবে। [অর্থাৎ, স্বভাবই কারণ; কেননা স্বভাব থাকলে ঘটনাটা ঘটে, না থাকলে ঘটে না : মুগডালের স্বভাবই এমন যে তা সিদ্ধ হয়; (ডালের মতো দেখতে) কাঁকরের স্বভাবই এমন যে তা সেদ্ধ হয় না।] অতএব, মুগডাল যে সেদ্ধ হয় তারও কারণ স্বভাব। তাই স্বীকার করতে হবে, সব ঘটনারই কারণ বলতে ‘স্বভাব’।’- (সূত্র: ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১১২-৩)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অন্তত কালক্রমে লোকায়ত বা চার্বাকমতে স্বভাবই সব ঘটনার কারণ বলে স্বীকৃত। এককালে এই স্বভাবের ব্যাখ্যায় কিছু প্রামাণিক লোকগাথাও প্রচলিত ছিলো। এবং ঈশ্বরবাদ ছাড়াও কর্মফলবাদের পক্ষ থেকে নানা দার্শনিক স্বভাববাদ খণ্ডন করার সাধ্যমতো চেষ্টাও করেছেন। তাঁদের এই খণ্ডন প্রচেষ্টা যে মূলত অদৃষ্ট অনুমান-ভিত্তিক কার্য-কারণ ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু চার্বাকেরা অদৃষ্ট অনুমান-ভিত্তিক কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্বীকার করেন না।

। স্বভাববাদ খণ্ডন-প্রচেষ্টা।
স্বভাববাদ বিরোধীরা বলেন, দুটি ঘটনার একাধিক ক্ষেত্রে ক্রমিক সংঘটনের ব্যাপারে বিশ্লেষণ করলে উভয় ঘটনার আশ্রয় বস্তুগুরির অন্তর্নিহিত সামান্য ধর্মে অধিকাংশ সময়েই কার্যকারণভাবের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। অনুমানের ভিত্তি ব্যাপ্তিজ্ঞানের জনক হিসেবে এই কার্যকারণভাবের উল্লেখ করা যেতে পারে।
কিন্তু কার্যকারণভাবে অবিশ্বাসী চার্বাকেরা মনে করেন যে দুটি ঘটনার একত্র যোগাযোগ নেহাতই অহেতুক এবং এ থেকে ভবিষ্যতেও অতীতের এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি অনুমান করা যায় না। কারণ, অতীতে দৃষ্ট হয়নি এবং সেইজন্য আমাদের কল্পনাতেও আসেনি এমন অনেক বিষয়ের উপস্থিতিতে হয়তো ভবিষ্যতে ঘটনাগুলির ক্রমিকতা নষ্ট হতে পারে।

অনেক সময় ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি বা রোগনিবৃত্তির জন্য রত্নধারণ, মন্ত্রপ্রয়োগ বা ঔষধ ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়। এতে অভীষ্টসিদ্ধি না হলে কেউ কি তা ব্যবহার করতো? কিন্তু চার্বাকদের মতে, কার্যকারণবাদীদের উপস্থাপিত এই দৃষ্টান্ত ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, এ সবের মাধ্যমে অভীষ্টসিদ্ধি কোন কোন ক্ষেত্রে হলেও চার্বাকদের মতে এগুলির ব্যবহার এবং ফলপ্রাপ্তি, উভয়ের মধ্যে কার্যকারণ কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, অনেক সময় মণি, মন্ত্র বা ঔষধ প্রয়োগেও ফল পাওয়া যায় না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলির ব্যবহার ছাড়াই উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-তে মাধবাচার্যের চার্বাকমত বর্ণনায় মণি, মন্ত্র বা ঔষদের প্রয়োগ এবং সেই প্রয়োগের ফলে আংশিক ক্ষেত্রে লব্ধ ফল– উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ চার্বাকী পরিভাষায় 'যাদৃচ্ছিক' আখ্যা পেয়েছে। যেমন–
'ক্বচিৎ ফল-প্রতিলম্ভস্তু মণি-মন্ত্রৌষধাদিবদ্ যাদৃচ্ছিকঃ। অতঃ তৎ-সাধ্যম্ অদৃষ্টাদিকমপি নাস্তি।'- (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : কখনো কোন স্থলে ফল প্রাপ্তি (বিষয় প্রাপ্তি) কিন্তু মণি, মন্ত্র ও ঔষধাদির ন্যায় যাদৃচ্ছিক। অতএব অনুমান সাধ্য অদৃষ্ট (পাপ ও পুণ্য) প্রভৃতিও নেই।

তার মানে, চার্বাক মত অনুসারে জগতের অন্য যে সমস্ত ঘটনাকে আপাতঃ দৃষ্টিতে কার্যকারণঘটিত বলে মনে হয়, অনুরূপ বিচারে সেগুলিও 'যাদৃচ্ছিক' প্রতিপন্ন হয়। তবে চার্বাকদের অভিমতে অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য ইত্যাদি যেমন স্বাভাবিক এবং এই ধরনের কয়েকটি বিশেষ বস্তুর বিশেষ কোন গুণের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মূলে কোন বস্তু বা ঘটনাকে যেমন কারণ হিসেবে নির্দেশ করা চলে না, সেইরকম জগতের বিভিন্ন ঘটনাবলী, মানুষের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ইত্যাদিও স্বাভাবিকভাবেই হয়। 'অদৃষ্ট' 'ধর্ম-অধর্ম' ইত্যাদিকে জগতের বৈচিত্র্যের কারণ হিসেবে স্বীকার করার পক্ষে কোন যৌক্তিকতা নেই। এই স্বভাববাদ অনুসারে, শিখিপুচ্ছে নানা রঙের বৈচিত্র্য বা কোকিলের কণ্ঠে মধুর স্বরের সমাবেশ স্বাভাবিক যে নিয়মে হয়, মানুষের সুখ-দুঃখেও সেই নিয়মেরই প্রভাব দৃষ্ট হয়। এসবের কারণ হিসেবে ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদির কল্পনা অসঙ্গত। এই মতের সমর্থন শঙ্করের

‘সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ’ গ্রন্থে চার্বাকী প্রামাণিক লোকগাথার দৃষ্টান্তে ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি। এয়াড়াও ‘সর্বসিদ্ধান্তগ্রন্থে’ অন্য আরো প্রামাণিক লোকগাথা অনুযায়ী দেখা যায়, ‘অদৃষ্ট’ স্বীকারে চার্বাকদের আপত্তি; কারণ দৃষ্টিসীমার বহির্ভূত হওয়ার ফলে প্রত্যক্ষের মাপকাঠিতে ‘অদৃষ্ট’ বিচারযোগ্য নয়। অদৃষ্টবাদীদের দ্বারাও অদৃষ্ট কখনও দৃষ্ট হয়েছে বলে শোনা যায় না। তাছাড়া, আরো বলা হয়, বিশেষ কোন স্থানে বা কোন সময়ে দৃষ্ট হলেও এর অদৃষ্ট নামের সার্থকতা থাকে না। নিত্য অদৃষ্ট কোন বস্তুর সত্তাকে যদি আমরা অনুমোদন করি তাহলে ‘শশশৃঙ্গ’ বা অনুরূপ অসম্ভব পদার্থের অস্তিত্বকেও আমাদের স্বীকৃতি দিতে হয়। যেমন–

‘প্রত্যক্ষগম্যমেবাস্তি নাস্ত্যদৃষ্টমদৃষ্টতঃ।
অদৃষ্টবাদিভিশ্চাপি নাদৃষ্টং দৃষ্টমুচ্যতে।।’ (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/২)।।
‘ক্কাপি দৃষ্টমদৃষ্টঞ্চেদদৃষ্টং ব্র‘‘বতে কথম্ ।
নিত্যাদৃষ্টং কথং সৎ স্যাৎ শশশৃঙ্গাদিভিঃ সমম্ ।।’ (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/৩)।।
অর্থাৎ :
লোকায়তিকেরা বলেন, যা কিছু প্রত্যক্ষসিদ্ধ তা-ই আছে। অদৃষ্ট যেহেতু দেখা যায় না সেহেতু অদৃষ্ট বলে কিছু নেই। অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়ে থাকে– এমন কথা অদৃষ্টবাদিগণও বলেন না। (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/২)।। যদি অদৃষ্ট কোথাও দেখে থাকো, তবে সেই দৃষ্ট বস্তুকে অদৃষ্ট কেন বলো? আবার শশশৃঙ্গাদির ন্যায় নিত্যই যা অদৃষ্ট, তা কিভাবে সৎ হতে পারে? (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/৩)।।

আমরা আগেই দেখেছি যে ‘অদৃষ্ট’ ‘ধর্ম-অধর্ম’ ইত্যাদি ধারণা ভারতীয় অধ্যাত্ম দর্শনের অনুমোদিত কর্মফলবাদের আবশ্যিক অঙ্গ। কাজেই এই ধারণাগুলির বিরোধিতার মাধ্যমে কর্মফলবাদও যে প্রকারান্তরে অস্বীকৃতি লাভ করে তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু অধ্যাত্মবাদীরা স্বভাববাদকে এতো সহজে ছেড়ে দিতে রাজী নন। নৈয়ায়িকদেরকেও এই চার্বাকী ধারণার সমালোচনায় যথেষ্ট তৎপর হতে দেখা যায়। যেমন ‘ন্যায়সূত্রে’ পূর্বপক্ষীয় যুক্তিতে বলা হয়েছে–

‘অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ’। (ন্যায়সূত্র-৪/১/২২)
অর্থাৎ : (পূর্বপক্ষীয় যুক্তিতে) ভাববস্তুগুলির [অর্থাৎ, পৃথিবীতে বর্তমান বস্তুগুলির] নিমিত্তকারণ [অর্থাৎ, কর্তা অর্থে কারণ] নেই; কেননা কণ্টকের তৈক্ষ্ণ্য দর্শন [থেকেই তা বোঝা যায়]।

স্বভাববাদের প্রসিদ্ধ নজির ‘কণ্টকের তীক্ষ্ণতা’ থেকে বোঝাই যায়, এটা স্বভাববাদী চার্বাকী যুক্তি। যাঁর মতে উপাদান-কারণের ‘স্বভাব’ থেকেই সমস্ত জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি। ন্যায়সূত্রকার এই যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে আরো দুটি সূত্র রচনা করে একটি ‘প্রকরণ’– অর্থাৎ, সহজ কথায়, একটা আলোচনার স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিচয়– সম্পন্ন করেছেন। বাকি সূত্র

দুটির তর্জমা হলো–
‘নিমিত্ত অন্য, নিমিত্তের প্রত্যাখ্যান অন্য; কিন্তু তাই বলেই নিমিত্ত প্রত্যাখ্যান হয় না।’ (ন্যায়সূত্র-৪/১/২৩)।।
‘[পূর্বসূত্রের এই যুক্তি] অসিদ্ধ; কেননা নিমিত্ত এবং অনিমিত্ত-র অর্থ সম্পূর্ণই আলাদা।’ (ন্যায়সূত্র-৪/১/২৪)।।

তার মানে কি ‘নিমিত্তকারণের অভাব’ স্বীকারও এক অর্থে তাকেই নিমিত্তকারণের স্থান দেওয়া? সূত্রগুলি এমনই সাঁটে লেখা যে আলোচনার প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা সহজসাধ্য অবশ্যই নয়। তবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তর্কটা জগতে বিদ্যমান বস্তুর বা ভাবপদার্থের ‘নিমিত্তকারণ’ নিয়ে। ‘নিমিত্তকারণ’ মানে কী? সোজা কথায় বললে, উপাদান-অতিরিক্ত কর্তাকে নিমিত্তকারণ বলে। যেমন ঘটের উপাদান মৃত্তিকা; কিন্তু শুধু মৃত্তিকা থাকলেই তো ঘট হয় না; তাছাড়াও কুম্ভকার বলে কারণ মানতে হবে। এই দৃষ্টান্তে কুম্ভকারই ঘটের নিমিত্তকারণ।
তাহলে, দেবীপ্রসাদের মতে, ‘ন্যায়সূত্র’র এই তিনটি সূত্রে আসল তর্কটা জাগতিক বস্তুগুলির কোনো নিমিত্তকারণ আছে কিনা– তাই নিয়ে। এগুলির উপাদান-কারণ তো সুবিদিত : ভারতীয় দর্শনে আগুন-বাতাস-জল-মাটি– এই চতুর্ভূত, কিন্তু অনেক সময় তার সঙ্গে ‘আকাশ’ ধরে পঞ্চভূতকে জগতের উপাদান-কারণ বলে স্বীকার করা হয়। অন্তত নৈয়ায়িকরা তা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এছাড়াও জাগতিক বস্তুর নিমিত্তকারণ হিসেবে স্বীকার করতে হবে, শুধু চতুর্ভূত বা পঞ্চভূতের ‘স্বভাব’ থেকেই সমস্ত জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি। অতএব আসল তর্ক হলো : স্বভাববাদ-বনাম-নিমিত্তকারণবাদ নিয়ে– যে নিমিত্তকারণ বলতে ঈশ্বর, অদৃষ্ট, প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়।

ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমোক্ত ন্যায়সূত্রে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন স্বভাববাদের অনুরূপ যে চিন্তাধারার উল্লেখ পান জাগতিক ঘটনাসমূহের মূলে নিমিত্তের অবদান তাতে স্বীকৃত নয়। এই মতবাদ অনুসারে প্রকৃতির বিভিন্ন অভিব্যক্তি, যথা কণ্টকের তীক্ষ্ণতা, রঙের বৈচিত্র্য ইত্যাদি যেমন নিজেকে প্রকাশ করতে কারণের অপেক্ষা রাখে না, সেই রকম বিভিন্ন উপাদানের সমবায়ে গঠিত মানুষের দেহ প্রভৃতি বস্তু নিমিত্ত কারণ ব্যতিরেকেই স্বরূপে পরিণতি লাভ করে।
এই মতের আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার মন্তব্য করেন যে–
‘যতশ্চোৎপদ্যতে তন্নির্মিত্তম। অনিমিত্তস্য নিমিত্তত্বান্নার্নিমিত্তো ভাবোৎপত্তিরিতি’। (ন্যায়ভাষ্য-৪/১/২৩)
অর্থাৎ :
ভাবোৎপত্তির নিমিত্ত হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে অনিমিত্তকে; ফলে নিমিত্তকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে স্বভাববাদীরা অগ্রসর হয়েছেন নিমিত্তেরই সাহায্য নিয়ে, যদিও এই নিমিত্ত হিসেবে তাঁরা অনিমিত্তকে ব্যবহার করেছেন।

তার মানে, ন্যায়ভাষ্যকার বলতে চান, স্বভাববাদীরা এক্ষেত্রে যে ধারণাকে অস্বীকার করতে প্রবৃত্ত সেই বিশেষ ধারণাই এখানে তাঁদের অবলম্বন। তাঁদের এ ধরনের যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

অন্যদিকে আরেক নৈয়ায়িক উদ্যোতকর তাঁর ‘ন্যায়বার্তিক’ গ্রন্থে স্বভাববাদের সমর্থকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন– ‘নিমিত্তের অভাব কণ্টকাদি বিশেষ কয়েকটি বস্তুর ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য, না প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে এর প্রয়োগ স্বীকার্য? যদি কয়েকটি মাত্র বস্তুকে অনিমিত্ত মনে করা হয়, তাহলে অবশিষ্ট সব দ্রব্যের নিমিত্তমূলকতা প্রমাণিত হয়। অপর পক্ষে, প্রত্যেক বস্তু অনিমিত্ত– এ ধরনের স্বীকৃতিতে স্ববিরোধ দোষের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কারণ, স্বভাববাদের প্রচারকের এ-ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অপরের মনে একটি বিশেষ ধারণা উৎপাদন করা। স্বভাববাদের সমর্থনে উৎপন্ন ধারণা নিমিত্তকে কেন্দ্র করেই সম্পাদিত। ফলে স্বভাববাদ এখানে ব্যাহত এবং কার্যের নিমিত্তমূলকতা শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য। কয়েকটি অংশের সমবায়ে গঠিত হবার ফলে কণ্টক প্রভৃতি দ্রব্য স্বরূপে পরিণতির জন্য কারণের অপেক্ষা রাখে– চার্বাক মতের বিরোধিতা প্রসঙ্গে ন্যায়বার্তিককার এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে মন্তব্য প্রকাশ করেন।’- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৮৫)

‘প্রকৃতপক্ষে, কার্যের উৎপত্তি বা ঘটনার সংঘটনের মূলে কারণের অস্তিত্বকে স্বীকার না করলে বিশেষ এক সময়ে কোন কার্য বা ঘটনা কেন উৎপন্ন বা সংঘটিত হয়, সব সময়ে হয় না– এ প্রশ্নের সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়। স্বভাববাদের এই মূলগত ত্রুটি স্বভাববাদ বিরোধীদের অস্ত্র হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এই মতবাদের আলোচনার সময় উদয়ন (ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-১/৫) বলেন যে কার্যের উৎপাদন কারণের উপর নির্ভরশীল হলে তবেই তার বিশেষ কোন সময়ে আবির্ভাবের যৌক্তিকতা থাকে এবং এই জন্যই কার্যের উৎপত্তির মূলে কারণকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ‘ন্যায়কুসুমাঞ্জলি’ ও তার টীকাকে অনুসরণ করে এ সম্বন্ধে আরও বলা যায়– স্বভাব শব্দের অর্থ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য কার্যের কিংবা কারণের। প্রথম সম্ভাবনায় উৎপত্তির পূর্বে কার্যের এবং সেই সঙ্গে তার বৈশিষ্ট্যেরও অস্তিত্ব না থাকায় স্বভাবের মাধ্যমে কার্যের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না। স্বভাবকে যদি কারণের অস্তিত্ব বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে স্বভাববাদের সমর্থকেরা প্রকারান্তরে কারণবাদকেই স্বীকৃতি দেন এবং স্বভাববাদের কোন স্বাধীন সত্তা থাকে না।’- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৮৬)

এই ধরনের দার্শনিক কূট-যুক্তি ও তর্কের সমাহার আমরা ইতঃপূর্বে অন্যক্ষেত্রেও দেখেছি। অধ্যাত্মবাদের সমর্থকরা যে ভূতবাদের মতোই স্বভাববাদকেও কখনোই মেনে নিতে প্রস্তুত নন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু স্বভাববাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই একটা খটকা থেকে যায়। স্বভাববাদীরাও কি সব-অর্থে ‘নিমিত্তকারণ’ অস্বীকার করে পার পাবেন? ঈশ্বর, অদৃষ্ট প্রভৃতি আধ্যাত্মিক অর্থে ‘নিমিত্তকারণ’ বলে কিছু না মানলেও সাধারণভাবে ও সর্বত্র

‘নিমিত্তকারণ’-মাত্রই অস্বীকার করা অসম্ভব; চার্বাক যদি তা করে থাকেন তাহলে সেটা তাঁর দার্শনিক দুর্বলতারই পরিচায়ক হবে বলে দেবীপ্রসাদ প্রমুখ আধুনিককালের বিদ্বানদের অভিমত। মৃত্তিকাই ঘটের কারণ; কিন্তু এই কারণ বলতে ঐকান্তিক অর্থে ‘নিমিত্তকারণে’র নিষেধ করে শুধুমাত্র ‘স্বভাব’ মানাই পর্যাপ্ত হবে না। কেননা, নিছক স্বভাব ছাড়া নিমিত্তকারণ হিসেবে সবকিছু প্রত্যাখ্যান করলে তা মাটি থাকলেই ঘট হবার কথা। কিন্তু তা হয় না। নিমিত্তকারণ হিসেবে কুম্ভকারও মানতেই হবে। তন্তুর নিছক স্বভাবকেই বস্ত্রের পর্যাপ্ত কারণ বলা যায় না। কেননা সুতো থাকলেই কাপড় হয় না; সুতো থেকে কাপড় বোনবার জন্যে তাঁতী বলে নিমিত্তকারণও মানা দরকার। তবুও অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে এই নিমিত্তকারণও স্বভাব-নিরপেক্ষ নয়; পক্ষান্তরে স্বভাব-সাপেক্ষই। তা নাহলে তো মাটি থেকেই তাঁতী কাপড় বুনতে পারতো বা সুতো থেকেই কুমোর ঘট গড়তে পারতো।

চার্বাক প্রসঙ্গে আমাদের যেটুকু তথ্যের সম্বল তা থেকে অনুমানের সুযোগ নেই যে, এ-হেন পার্থিব অর্থে নিমিত্তকারণ বলে চার্বাক কিছু স্বীকার করতেন। যদি না করে থাকেন তাহলে তা প্রাচীন বস্তুবাদের একটা উল্লেখযোগ্য দুর্বলতারই পরিচায়ক হবে। আমরা বরং স্বভাববাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যটির দিকে আলোকপাত করতে পারি। তিনি বলছেন–
‘সাধারণত, স্বভাব শব্দের ইংরেজি করা হয় ‘নেচার’। যে-কোনো জাগতিক ঘটনার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যায় তার জাগতিক কারণটুকুই পর্যাপ্ত। তার জন্যে অতি-প্রাকৃত বা প্রকৃতি-বহির্ভূত আর কিছু মানবার প্রশ্ন ওঠে না। ঈশ্বর নয়, অতীত কর্মের ফল হিসেবে ধর্মাধর্ম (বা পারিভাষিক অর্থে ‘অদৃষ্ট’)– এসব কিছুই নয়। আরো একটু ব্যাখ্যা করে বলবার সুযোগ দিলে হয়তো দাবি করা যেতে পারে যে, স্বভাব বলতে আমাদের প্রাচীন বস্তুবাদীরা ‘প্রাকৃতিক নিয়ম’ বা অন্তত তারই খুব কাছাকাছি একটি ধারণা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতিবিজ্ঞানে আজকাল আমরা যাকে বলি ‘প্রাকৃতিক নিয়ম’ বা ‘ল অব নেচার’। অবশ্যই সুপ্রাচীন কালের দার্শনিকদের কাছে থেকে এই ধারণার আধুনিক অর্থে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রত্যাশা করা ঐতিহাসিকভাবে অবাস্তব হবে। কিন্তু এই ধারণারই প্রতিশ্রুতি বা পূর্বাভাস স্বভাববাদের মধ্যে খোঁজবার চেষ্টা অত্যুক্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
প্রাচীন ধ্যানধারণার মধ্যে আধুনিক– এবং অনেক সময় অতি-আধুনিক– বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনুসন্ধান অবশ্যই অচল। কখনো বা তার ফলে রকমারি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।... কিন্তু... প্রাচীন কালের চিন্তার মধ্যেও সেখানে যতটুকু বিজ্ঞান-চেতনার প্রতিশ্রুতি ছিল সেটুকুকেও সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। স্বভাববাদের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম বা ‘ল অব্ নেচার’ একেবারে আধুনিক অর্থে অবশ্যই প্রত্যাশিত নয়; কিন্তু তারই যতটুকু প্রতিশ্রুতি বা পূর্বাভাস স্বভাববাদের মধ্যে অনুমিত হয় তাও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা কোনো কাজের কথা নয়। বরং একরকম যেন পাল্টা ভুল। একটা ভুল– এবং তা যত বড় ভুলই হোক-না-কেন– সংশোধন করার জন্য পাল্টা-ভুলের পথ ধরা যুক্তিযুক্ত নয়। স্বভাববাদের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা একেবারে অস্বীকার করা এই রকম একটা পাল্টা-ভুল

বলেই মনে হয়।’- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১১৩-৪)

.
সে যাক্, তারপরেও ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে ‘স্বভাববাদ’ নিয়ে– ইচ্ছাকৃত হোক আর অনিচ্ছাকৃতই হোক– একধরনের বিভ্রান্তির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যেমন মাধবাচার্যের ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’-এর উৎস নির্দেশ করে লতিকা চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন–
‘চার্বাক মত অনুসারে জগতের অন্য যে সমস্ত ঘটনাকে আপাতঃ দৃষ্টিতে কার্যকারণঘটিত বলে মনে হয়, অনুরূপ বিচারে সেগুলিও ‘যাদৃচ্ছিক’ প্রতিপন্ন হয়। চার্বাকদের অনুসৃত এই দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিপ্রেক্ষিতে চার্বাক দর্শনের অপর সংজ্ঞা ‘যাদৃচ্ছিকবাদ’ বা ‘স্বভাববাদ’।’- (চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৮৪)

সুস্পষ্টভাবেই, এই মন্তব্যে, ‘যাদৃচ্ছিকবাদ’ ও ‘স্বভাববাদ’কে অনুরূপ বা অভিন্ন মত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সত্যি কি এই দুটি মত এক ও অভিন্ন? এ-বিষয়টিও নিশ্চয়ই আলোচনার দাবি রাখে। এবং বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার নজির হিসেবেও আলোচনাটি অবান্তর হবে না বলেই মনে হয়।

.
। স্বভাব ও যদৃচ্ছা।
শ্রদ্ধেয় দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর ‘চার্বাক দর্শন’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১১৪) স্বভাববাদীদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন– (১) যাঁরা স্বভাবকে কারণের স্বীকৃতি দেন এবং (২) যাঁরা কার্যকারণবাদের বিরোধী এবং মনে করেন যে জগতের সবকিছু ঘটনাই অহেতুক। দ্বিতীয় দলের স্বভাববাদীদের যাদৃচ্ছিক বলা হয়।
শাস্ত্রী মহাশয় অবশ্য স্বভাববাদীদের মতদ্বৈধ অনুযায়ী চার্বাকগোষ্ঠির মধ্যেও দুটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। যদিও এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি কোন তথ্য সরবরাহ করেন না।

সম্ভবত, শাস্ত্রী মহাশয় এখানে ‘যাদৃচ্ছিকবাদ’কে ‘স্বভাববাদ’ থেকে বিযুক্ত না করে তারই অংশ-বিশেষ বা ভিন্ন বিভাগ হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। সেকালের মতো একালের কোনো কোনো লেখকও বোধহয় ‘স্বভাববাদ’-কে– কিছুটা খেলো করবার উৎসাহেই কিনা কে-জানে– ‘যদৃচ্ছাবাদ’ বলে আর একটা প্রাচীন মতের সঙ্গে তার তাদাত্ম্য দেখাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ, এঁদের বিচারে ‘স্বভাববাদ’-ও যা, ‘যদৃচ্ছাবাদ’-ও তাই। যদৃচ্ছাবাদের মূল কথা কিন্তু কার্যকারণবাদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নেহাতই অহেতুক, অকারণ; অঘটনের সামিল। যদি সত্যিই তাই হয়, দেবীপ্রসাদের মতে, তাহলে প্রাকৃতিক ঘটনার কোনো কারণ খুঁজতে যাওয়া বেকুবির পরিচায়ক হবে। অর্থাৎ, যদৃচ্ছাবাদ সম্পূর্ণ অর্থে বিজ্ঞান-বিরোধী, কেননা বিজ্ঞানের একটা মূল উদ্দেশ্যই হলো, প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ

অনুসন্ধান। নিউটন যদি ভাবতেন, ফলটা মাটির দিকে অকারণেই বা এমনিই পড়েছে– তাহলে আর এ নিয়ে তাঁর কোনো জিজ্ঞাসা জাগতো না। বিজ্ঞানও হতো না।

কিন্তু, এ-প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদ বলেন, স্বভাববাদকে এইভাবে 'যদৃচ্ছাবাদে'র সঙ্গে অভিন্ন মনে করার পিছনে না আছে কোনো যুক্তি, না কোনো নির্ভরযোগ্য বা প্রামাণ্য তথ্য। ইতঃপূর্বে বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্ধৃত 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্'-এর দৃষ্টান্ত থেকেও দেখা যায় যে, উপনিষদ্কার 'স্বভাববাদ' ও 'যদৃচ্ছাবাদ'– এই দুটি মতকে সম্পূর্ণ পৃথক অর্থেই উল্লেখ করেছেন। তুলনায় পরবর্তীকালের নানা দার্শনিকও তাই-ই করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের প্রতিটি উক্তি হয়তো এখানে উদ্ধৃত করার সুযোগ নেই, দরকারও নেই। বর্তমান আলোচনার পক্ষে পর্যাপ্ত বিবেচনায় শুধু একটি নমুনা উপস্থাপন করা যেতে পারে। স্বভাববাদের সঙ্গে যদৃচ্ছাবাদের মূল পার্থক্য দেখাবার উদ্দেশ্যে জৈন দার্শনিক গুণরত্ন যদৃচ্ছাবাদের খুবই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কিছুটা স্বাধীন তর্জমায় তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম উদ্ধৃত করা যেতে পারে। গুণরত্ন বলছেন,–

'যদৃচ্ছা বলতে বোঝায় কোনো রকম পূর্ব-পরিস্থিতি ছাড়াই ঘটনার ব্যাখ্যাপ্রয়াস। প্রশ্ন ওঠে : এ হেন মতবাদের সমর্থক বলতে কে বা কারা? উত্তর : কার্যকারণবাদকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে যাঁরা সব কিছুকেই একেবারে অকারণ বলে মনে করেন, তাঁরা। তাঁদের মূল যুক্তি হলো, কার্যকারণবাদ মানবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কেননা তার পক্ষে কোনোরকম প্রমাণ নেই। যেমন, পদ্মবনেও শালুকফুল ফোটে, গোবরের গাদাতেও ফোটে। কিংবা, একটা অগ্নিকুণ্ড থেকে যেমন কোনো কিছুতে আগুন ধরানো যায়, তেমনি চকমকি পাথর ঠুকেও তা সম্ভব হয়। কিংবা, কলাগাছের গুঁড়ি থেকে নতুন কলাগাছ জন্মাতে পারে, আবার বীজ পুঁতেও কলাগাছ ফলানো সম্ভব। ধোঁয়ো থেকেও ধূম উৎপন্ন হয়, কাঠে অগ্নিসংযোগের ফলেও হয়। অতএব, কার্যকারণ বলে সম্বন্ধের কথাটা অলীক। মানতেই হবে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নিছক অকারণ বা অহেতুক। প্রকৃত বিদ্বানেরা তাই তথাকথিত কার্যকারণ সম্বন্ধের দৃষ্টান্তগুলিকে কাকতালীয়র মতোই বিবেচনা করেন; অর্থাৎ কাক উঠে গেল, আর এদিকে গাছ থেকে তাল পড়ল, দুটো ঘটনার মধ্যে আসলে কোনো রকম সম্বন্ধ না-থাকলেও একটিকে অপরটির কারণ বলে কল্পনা করার সামিল।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১১৫)

তাহলে প্রশ্ন, আগুন কেন উষ্ণ? যদৃচ্ছাবাদী বলবেন, ব্যাপারটা নেহাতই অহেতুক; এর কোনো কারণ খোঁজাই বেকুবি। কাঁটা কেন তীক্ষ্ণ? তারও কোনো কারণ নেই। কারণ খুঁজতে যাওয়াই বেকুবি। তাই দেবীপ্রসাদ বলেন, এ-হেন মত মানলে আর-যাই-হোক, প্রকৃতি-বিজ্ঞান বলে কিছুই হতে পারে না। স্বভাববাদও নয়। কেননা, স্বভাববাদের মূল কথা হলো, প্রতিটি ঘটনারই পর্যাপ্ত কারণ থাকতে বাধ্য; কিন্তু সেই কারণের সন্ধানে প্রাকৃতিক বিষয় ছেড়ে অতি-প্রাকৃত বা প্রকৃতির অতীত কিছু খুঁজতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক। প্রাকৃতিক নিয়ম থেকেই প্রাকৃতিক ঘটনার পর্যাপ্ত কারণ পাওয়ার কথা।

দুটি মতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নিয়ে আমাদের বর্তমান আলোচনা পল্লবিত করার প্রয়োজন হবে না। একালের অগ্রণী বিদ্বান গবেষকেরা তা করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করাই বর্তমান উদ্দেশ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত হবে বলে বিশ্বাস। অবশ্যই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কিছুটা ব্যাখ্যামূলক স্বাধীন তর্জমায়। ভারতীয় দর্শনে নাস্তিক্যের আলোচনা প্রসঙ্গে হিরিয়ান্না (Hiriyanna) মন্তব্য করেছেন–

‘কিন্তু এখানে তার মধ্যে দুটির (অর্থাৎ দুটি নাস্তিক্যমতের) পার্থক্য করা ভালো; কেননা ভারতীয় দর্শনের কয়েকটি বিষয় প্রসঙ্গে পরবর্তী আলোচনায় তা কাজে লাগবে। তার মধ্যে একটি হলো ‘আপতনবাদ’ (accidentalism), দার্শনিক পরিভাষায় ‘যদৃচ্ছাবাদ’ বা ‘অনিমিত্তবাদ’। অপরটি হলো ‘প্রকৃতি-সর্বস্ববাদ’ (naturalism) বা ‘স্বভাববাদ’। ‘শ্বেতাশ্বতর’ উপনিষদ্-এ দুটি স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয়েছে, এবং পরবর্তী দার্শনিক গ্রন্থেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্বীকৃত (যেমন ‘ন্যায়কুসুমাঞ্জলি’-১/৫)। প্রথমটি অনুসারে বিশ্বপ্রকৃতি বিশৃঙ্খলার রাজ্য, তার মধ্যে যেটুকুবা নিয়মানুবর্তিতার পরিচয় পাওয়া যায় তা নেহাতই আকস্মিক ঘটনামাত্র। দ্বিতীয় মতে বিশ্বপ্রকৃতি স্বীয়স্বভাব-নিয়ন্ত্রিত (‘মহাভারত’-১২/২২২/২৭ : ‘স্বভাব-ভাবিনো ভাবান্’)। প্রথমটি কার্যকারণ-সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। দ্বিতীয়টি কার্যকারণভাবকে বিশ্বজনীন নিয়ম বলে মানে; কিন্তু এই মতে সমস্ত পরিবর্তন যে-বস্তুতে পরিদৃষ্ট হয় তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রতি বস্তুই অনুপম; এবং তার পুরো ইতিহাসটাই এই অনুপমতার দ্বারা পূর্বনিয়ন্ত্রিত। অতএব স্বভাববাদ অনুসারে যে-জগতে আমাদের বাস সেই জগৎ মোটেই নিয়মহীন নয়; কেবল সেই নিয়মের নিয়ন্তা বলতে প্রকৃতিবাহ্য কিছু কল্পনা করা চলবে না। জগৎ আত্ম-নিয়ন্ত্রিত; অনিয়ন্ত্রিত নয়। অতএব অন্য মতটির সঙ্গে এই মতের পার্থক্য হলো, এই মতে যাবতীয় ঘটনা অমোঘ নিয়মের অনুবর্তী; কিন্তু এই অমোঘ নিয়ম বস্তুস্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত– বাহ্য কোনো কর্তার আয়ত্তাধীন নয়। এ-বিষয়ে আমরা অন্ধ বলেই কল্পনা করি যে, প্রকৃতিতে নিয়ম বলে কিছু নেই বা আমরা স্বেচ্ছায় যা-খুশি করতে পারি। উভয় মতের মধ্যে মিল শুধু এইটুকুই যে উভয়ই জগৎনিয়ন্তা কোনো ঐশ্বরিক শক্তি অস্বীকার করে। তাছাড়া, দুটি মতের কোনোটিই শাস্ত্রবচন বা ঈশ্বর-আম্নাত বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করে না। [হিরিয়ান্না অবশ্য এখানে খানিকটা হাল্কাভাবেই চার্বাকমতের পিছনে যদৃচ্ছাবাদের প্রভাব কল্পনা করেছেন; কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে সে-জাতীয় কল্পনা বর্জনের যুক্তি দেখিয়েছি। যাই হোক, তিনি আর যদৃচ্ছাবাদ নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেননি; পরন্তু একটু পরেই তিনি স্বভাববাদের সঙ্গেই লোকায়ত-মতের সম্পর্ক দেখিয়েছেন।]

‘এককালে স্বভাববাদ নিশ্চয়ই যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, কেননা শঙ্কর (‘ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য’-১/১/২) প্রভৃতি পুরোনো কালের দার্শনিকদের রচনায় আমরা তার উল্লেখ পাই। ‘মহাভারত’-এর নানা প্রসঙ্গে মতটির পরিচয় আছে (মহাভারত-১২/১৭৯/২২২ ও ২২৪)। মতটি প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হলো তার বস্তুতান্ত্রিকতা (positivistic character)। ‘অদৃষ্টবাদ’-এর বা প্রকৃতি-অতীত বিশ্বাসের সঙ্গে স্বভাববাদের যে রকম বিরোধ সেই রকমই বিরোধ ‘উপনিষদ্’-এর অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে। মনে হয় ‘লোকায়ত’ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইহলোক সংক্রান্ত দর্শন) বলতে আদিতে স্বভাববাদের এই বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই বোঝাতো, যদিও

পরবর্তী সাহিত্যে লোকায়ত শব্দটিই সাধারণভাবে প্রচলিত। মতটির আর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলতে দেহান্তরগামী আত্মার অস্বীকৃতি, যদিও অবশ্য এমন কথা অনুমানের সুযোগ আছে যে যতদিন দেহে প্রাণ বর্তমান ততদিন পর্যন্ত কোনো এক অর্থে আত্মার বর্তমানতা স্বীকার করায় স্বভাববাদের পক্ষে হয়তো বাধা ছিল না। কিন্তু মতটির সঙ্গে প্রধান বিরোধ বলতে অধ্যাত্মবাদেরই, কেননা অধ্যাত্মবাদের মূল কথাই হলো ভূত-অতিরিক্ত আত্মায় বিশ্বাস। যে-সব তথ্যের উপর নির্ভর করে আমাদের এই আলোচনা তার মধ্যে 'মহাভারত'-এর একটি উক্তি হলো, 'মৃত্যুতেই জীবের পরম পরিসমাপ্তি'। আসলে, স্বভাববাদের বিশেষ প্রবণতা বলতে প্রকৃতি-অতীত বস্তু অস্বীকারই। এইভাবে স্থায়ী আত্মা অস্বীকার করার ফলে সাধারণত কর্মফল বলতে যা বোঝায় তাও স্বভাববাদে অস্বীকৃত। বস্তুজগতের মূল উপাদান এক বা একাধিক– এবিষয়ে স্বভাববাদীর মত সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে সুনিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়, কেননা মহাকাব্যে দু-রকম মতেরই ইংগিত পাওয়া যায়। যেমন, মহাকাব্যের এক জায়গায় উক্ত হয়েছে জীবদেহ অবশ্যই পঞ্চভূতের পরিণাম; অন্যত্র মোটের উপর একই কথা– স্বভাববাদীর মতে পঞ্চভূতই পরম সত্য। কিন্তু আবার প্রসঙ্গান্তরে উক্ত হয়েছে স্বভাববাদ অনুসারে জগৎ বৈচিত্র্যের মূলে একই বস্তু।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১১৬-৭)

প্রাচীন সাহিত্যে বিবিধ প্রসঙ্গে ছড়ানো স্বভাববাদ-সংক্রান্ত নানা মন্তব্যে নানা রকম ঝোঁক থাকার ফলে আমাদের কাছে আজ মতবাদটি প্রসঙ্গে অল্পবিস্তর অস্পষ্টতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবুও কিন্তু, দেবীপ্রসাদের মতে, দুটি কথা জোর দিয়ে বলার সুযোগ আছে।–
এক।। প্রাচীন লোকায়ত ও চার্বাকমতে জগৎ-বৈচিত্র্যের কোনো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা খোঁজা নিষ্ফল, কেননা স্বভাববাদের মধ্যেই তার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অবশ্য ভারতীয় দর্শনে লোকায়ত ছাড়া আর কোনো দর্শনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বভাববাদ স্বীকৃত কিনা– এ প্রশ্ন স্বতন্ত্র।
দুই।। মতটি খুব প্রাচীন বলেই ভারতীয় দর্শনে এ সম্বন্ধে যে সব কথা পাওয়া যায় তারই উপর নির্ভর করে আধুনিক কোনো মতের সঙ্গে তার তুলনা হয়তো সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। কিন্তু অত্যুক্তির আশঙ্কা এড়িয়েও বোধহয় দাবি করা যেতে পারে যে আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' বলতে যা বোঝায় স্বভাববাদের মধ্যেই তার অন্তত প্রতিশ্রুতি বা পূর্বাভাস খোঁজা নিষ্ফল নয়।

এ-ব্যাপারে সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই যে ভারতীয় দর্শনে অন্যতম প্রাচীন মত হিসেবে 'স্বভাববাদ' অবশ্যই চার্বাক-সম্মত। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন আসতেই পারে যে, ভারতীয় দর্শনে লোকায়ত ছাড়া আর কোনো দর্শনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই স্বভাববাদ স্বীকৃত কিনা?
এক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রাচীন সাহিত্যের দৃষ্টান্ত নজরে আসলে খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই কিছু কৌতুহল জেগে উঠে অবশ্যই। যেমন, দেবীপ্রসাদ দেখাচ্ছেন, 'মহাভারত'-এর ব্যাখ্যায়

(শান্তিপর্ব-২৩২/২১) নীলকণ্ঠ বলছেন–
'স্বভাব ইতি পরিণামবাদিনাং সাংখ্যানাম্'। (মহাভারত-১২/২৩২/২১)
অর্থাৎ : পরিণামবাদী সাংখ্যমতে 'স্বভাব' স্বীকৃত।
আবার 'সাংখ্যকারিকা'র ভাষ্যে গৌড়পাদও মন্তব্য করেছেন–
'সাংখ্যানাং স্বভাবো নাম কশ্চিৎ কারণমস্তি'। (সাংখ্যকারিকাভাষ্য)
অর্থাৎ : সাংখ্যদর্শনের অনুগামীদের মতে 'স্বভাব' নামের একরকম কারণ আছে।

এ-প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন– 'হয়তো এজাতীয় নজিরের উপর নির্ভর করেই টি. ই. হিউম (T. E. Hume) 'শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্'-এর তর্জমা প্রসঙ্গে স্বভাববাদকে সাংখ্যবাদীর মত বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সমর্থনে শঙ্করাচার্যের উক্তি অনায়াসে উদ্ধৃত করা যায়। সাংখ্য-খণ্ডনে তিনি বারবার মতটিতে স্বভাববাদের উপর নির্ভরতা প্রদর্শন করেছেন।
এজাতীয় নজিরগুলির গুরুত্ব স্বীকার করলে অনুমানের সুযোগ থাকে, পরবর্তীকালে সাংখ্যদর্শনে 'প্রকৃতি' বা 'প্রধান' হিসেবে উল্লিখিত আদিম অচেতন কারণটির সঙ্গে 'পুরুষ' নামে এক চেতন তত্ত্ব সংযোজিত হলেও দর্শনটির আদিরূপে হয়তো তা ছিল না : অচেতন প্রধান থেকে স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই জগৎ-উৎপত্তি। এই কারণেই কি পরবর্তী সাংখ্যে 'পুরুষ' সংযোজিত হলেও তা 'উদাসীন এবং অপ্রধানে'র চেয়ে বেশি মর্যাদা পাননি? যদি তাইই হয়, তাহলে সুখলালজী এবং সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর ব্যাখ্যা অনুসরণ করে আদি-সাংখ্যকেও কোনো একরকম প্রাচীন বস্তুবাদ বলে অনুমান করার সুযোগ আরো জোরদার হয়। জৈন দার্শনিক শীলাঙ্ক তো সরাসরি এই কথাই বলেছেন। সেদিক থেকে আরো বলা যেতে পারে, বস্তুবাদী দর্শন হিসেবে চার্বাক বা লোকায়ত একান্তই নিঃসঙ্গ নয়। সম্ভাবনাটি নিয়ে বিদ্বানেরা আশা করি আরো গভীর বিবেচনা করতে সম্মত হবেন। প্রথাবিরুদ্ধ হলেও এবং প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী হলেও আদিসাংখ্য নিয়ে গবেষণার সুযোগটাই অস্বীকার করা মুক্ত মনের পরিচায়ক হবে না, বিশেষত ভারতীয় ঐতিহ্যেই যখন একথা স্বীকৃত যে সাংখ্যর আদিরূপ অনেকাংশেই বিলুপ্ত হয়েছে এবং তার 'কণামাত্র' আজ অবশিষ্ট।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১২০)

উল্লেখ্য, সাংখ্য-প্রবচন বা সাংখ্য-সূত্রের ভাষ্যের ভূমিকায় স্বয়ং বিজ্ঞানভিক্ষু বলেছিলেন–
'কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞান-সুধাকরম্ ।
কলাবশিষ্টং ভূয়োহপি পুরয়িষ্যে বচোহমৃতৈঃ।।'- (সাংখ্যাপ্রবচনভাষ্য)
অর্থাৎ : সাংখ্যশাস্ত্র কালসূর্যের গ্রাসে পতিত হয়েছে এবং তার কণামাত্রই অবশিষ্ট আছে; আমি অমৃতবাক্যের দ্বারা তা পূরণ করবো।

অনুমান করা হয়, বিজ্ঞানভিক্ষু যে-ভাবে তা পূরণ করেছিলেন 'তার ফলে এ-দর্শন আর যাই হোক সাংখ্য-দর্শন থাকেনি– বেদান্তমতে বা অন্তত প্রায়-বেদান্তমতে পরিণত হয়েছিলো।

কেননা, নিরীশ্বর সাংখ্যকে সেশ্বর দর্শনে পরিণত করেই তিনি ক্ষান্ত হননি; শেষ পর্যন্ত তিনি বেদান্তের সঙ্গে সাংখ্যের প্রায় সমস্ত মৌলিক প্রভেদই উড়িয়ে দেবার আয়োজন করেছিলেন।'- (ভারতীয় দর্শন, দেবীপ্রসাদ, পৃষ্ঠা-২৩)। সম্ভবত পরবর্তীকালের অনুসারীদের মধ্যেও এই প্রবণতা অব্যাহত ছিলো।

৪.০ : চার্বাকী বস্তুবাদ

চার্বাক সিদ্ধান্তের আলোচনার সময় প্রথমেই আমাদের যে বিষয়টি মনে রাখা আবশ্যক তা হলো, চার্বাককে দেখা উচিত ভারতীয় একটি দর্শন হিসেবেই এবং এই চার্বাক দর্শনের সামগ্রিক চিত্রায়ণ ভারতীয় দর্শনের সাধারণ ধারার পরিপ্রেক্ষিতেই করা উচিত। সে বিবেচনায়, আমরা আগেই দেখেছি যে কেবল থিওরি বা মতবাদের মধ্যে ভারতের কোন দর্শনই আসলে সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত নয়। আর তাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দর্শনটি যে আকারে প্রতিভাত, দর্শনের সম্পূর্ণ রূপরেখার বিচারে তার আলোচনাও আবশ্যক বৈকি।

মতবাদের ক্ষেত্রে চার্বাক নাস্তিক, অর্থাৎ ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনকে কেন্দ্র করে যে মূল্যবোধ ভারতীয় ঐতিহ্যে বহুকাল ধরে সঞ্চিত, তার সমালোচনার ভিত্তিতে নেতিবাচক রূপে চার্বাকের প্রতিষ্ঠা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই নাস্তিকতার রূপায়ণ কি সম্ভব? এই প্রশ্নটিকে ঘিরে ভারতীয় দার্শনিক গোষ্ঠীতে এই চার্বাকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ইতিবাচক বিশেষ কোন আচরণবিধির পটভূমিতে নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করা চলে, এই আচরণবিধি ভারতের সনাতন ধারার পরিপন্থী হলেও। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'নাস্তিক' শব্দ যদিও নেতিবাচক রূপই প্রকাশ করে, তবুও চার্বাক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাহচর্যের ফলে এই সংজ্ঞা ইতিবাচক কিছু অর্থের দ্যোতক অবশ্যই। এবং নাস্তিকদের এই ইতিবাচক রূপের প্রকাশ সনাতনগোষ্ঠীর বিরোধী কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে।

সনাতনপন্থী দার্শনিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে চার্বাকগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নামে বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক মত প্রচার করার প্রবণতা ইতঃপূর্বেই লক্ষ্য করেছি। সেক্ষেত্রে আমাদের বিচারে পুরন্দরপন্থী চার্বাকমতই যে আসলে দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রকৃত চার্বাকমত হওয়ার যোগ্য– এবং হয়তো সেটাই ছিলো– তাও আমরা ঐতিহাসিক বিবেচনায় অনুসন্ধান ও রূপায়নের প্রচেষ্টা করেছি। এই চার্বাকগোষ্ঠীই হলো বস্তুবাদী চার্বাক। তবে– 'এই চার্বাকদের পরিপূর্ণ আলেখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিকদের গ্রন্থে অদৃশ্য। কারণ এই দার্শনিকদের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে কেবল চার্বাকী হেতুবাদ, তর্কের সাহায্যে যা প্রতিপক্ষের ত্রুটি উন্মোচনে উন্মুখ। চার্বাকদের রীতিনীতি এবং আচরণবিধির কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় দর্শনের সঙ্কলন গ্রন্থগুলিতে এবং সমসাময়িক অন্যান্য কিছু গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত চার্বাকদের বিবরণী থেকে। প্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিকেরা চার্বাকী আক্রমণের আঘাত থেকে নিজ নিজ মতবাদগুলিকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন– ফলে তাঁদের বর্ণনা হয়েছে পারস্পরিক তর্কযুদ্ধের এক বিবরণী। অন্যান্য ব্যাপারগুলিকে নিজেদের আলোচনার পরিসরে তাঁরা অন্তর্ভুক্ত করেননি। অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে অবশ্য তর্কযুদ্ধের এ ছবি নেই, আছে কেবল চার্বাকী আচরণবিধির এবং কোন

কোন ক্ষেত্রে এই আচরণবিধির সমর্থনে চার্বাক পক্ষের যুক্তির কিছু বর্ণনা।'- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১১৪)

যেমন– 'বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'র বর্ণনা অনুসারে (কামসূত্র-১/২/২৯/৩০) চার্বাকদের জগৎ প্রধানতঃ বর্তমানকে কেন্দ্র করে। বাৎস্যায়ন 'কামসূত্রে'র 'সাধারণাধিকরণম্'-এর দ্বিতীয় অধ্যায় 'ত্রিবর্গপ্রতিপত্তিঃ'-তে লোকায়তিক বর্ণনায় বলছেন–

'নধর্ম্মাংশ্চরেৎ; এষ্যৎফলত্বাৎ, সাংশয়িকত্বাচ্চ।।
কো হ্যবালিশো হস্তগতং পরগতং কুর্য্যাৎ।।
বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ।।
বরং সংশয়িকান্নিষ্কাদসাংশয়িকঃ কার্যাপণঃ।–ইতি লৌকায়তিকাঃ।'-
(কামসূত্র-১/২/২১-২৪)।।
অর্থাৎ :
'ধর্ম্মাচরণ করিবার প্রয়োজন নাই;– কারণ তাহার ফল ইহজন্মে পাওয়া যায় না এবং যজ্ঞাদি সাধিত হইলেও ফল হইবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহও আছে'। ২১।। 'মূর্খ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি হস্তগত দ্রব্যকে পরগত করে?' ২২।। 'আগামী কল্যকার ময়ূর লাভ অপেক্ষা অদ্যকার পারাবত লাভ মন্দের মধ্যে ভাল'। ২৩।। 'সংশয়সঙ্কুল হেমশত লাভ অপেক্ষা নিঃসন্দেহে এক কার্যাপণ লাভও মন্দের ভাল।– একই কথা লোকায়তিক নাস্তিকেরা বলিয়া থাকে'। ২৪।। (তর্জমা– গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর)।

'যে বর্তমান সুনিশ্চিত তাকে উপেক্ষা করে সংশয়িত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে চার্বাকেরা অগ্রসর হতে চান না, ভবিষ্যৎ যদিও উজ্জ্বল সম্ভাবনার রঙে রঞ্জিত থাকে। এই গ্রন্থে বর্ণিত চার্বাকেরা পরবর্তী দিনে ময়ূর লাভের আশায় বর্তমান দিনে হস্তগত পারাবতকে উপেক্ষা করেন না এবং ভবিষ্যতে স্বর্ণমুদ্রার প্রতীক্ষায় থেকে বর্তমানের তাম্রমুদ্রাকে বিসর্জন দিতেও তাঁরা প্রস্তুত নন। তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টাকে বিতর্কিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে প্রসারিত করার পরিবর্তে বর্তমানে নিশ্চিতলভ্য বস্তুগুলির দিকে নিয়োজিত করতে তাঁদের আগ্রহ 'কামসূত্রে'র বর্ণনায় সুপরিস্ফুট।' – (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১১৪)

চার্বাকেরা বৈষয়িক এবং জাগতিক ভোগসুখে আকণ্ঠ নিমজ্জিত– এরকম অভিমতই বর্ণিত হয়েছে মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে। এতে আরো বলা হয়েছে, এই ভোগকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতাই তাঁদের জীবনে মূল লক্ষ্য। দুঃখবাদী অধ্যাত্মদর্শনের কোন প্রভাব চার্বাক দর্শনে নেই। চার্বাকমতে জগৎ ভোগসুখের সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল। এবং এই জাগতিক সুখকে করায়ত্ত করার প্রচেষ্টায় চার্বাকেরা তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে আগ্রহী। বস্তুজগৎ তার মনোহারী রূপ নিয়ে সুখের আকর্ষণে মানুষকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে। অধ্যাত্মবাদীদের দাবি অনুসারে ভারতের অধ্যাত্মদর্শনে এই আকর্ষণকে দমন করার শিক্ষা আছে এবং এই বস্তুজগতের বিপরীতগামী পথই সেখানে চরম শান্তির পথ হিসেবে নির্দেশিত। মাধবের মতে,

চার্বাকেরা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক। বিষয়রসে মগ্ন হয়ে তাঁরা তাঁদের উপভোগস্পৃহা চরিতার্থ করতে আগ্রহী। যেমন–

‘অঙ্গনাদ্যালিঙ্গনাদি-জন্য-সুখমেবঃ পুরুষার্থঃ। ন চাস্য দুঃখসম্ভিন্নতয়া পুরুষার্থত্বমেব নাস্তীতি মন্তব্যম্, অবর্জনীয়তয়া প্রাপ্তস্য দুঃখস্য পরিহারেণ সুখমাত্রস্যৈব ভোক্তব্যত্বাৎ।’- (সর্বদর্শনসংগ্রহ)

অর্থাৎ :

(চার্বাকেরা বলেন,) অঙ্গনার আলিঙ্গন, চুম্বন, মর্দন প্রভৃতি জন্য এবং কাম্য বিষয়ের প্রাপ্তিজন্য সুখই পুরুষার্থ। এই সুখ দুঃখ-সম্ভিন্ন অর্থাৎ দুঃখ-মিশ্রিত বলে পুরুষার্থই নয়, তা মনে করবেন না। কারণ অবর্জনীয়রূপে প্রাপ্ত দুঃখের পরিহারের দ্বারা সুখমাত্রই সকলের ভোক্তব্য হয়ে থাকে।

তার মানে, দুঃখের যে সংমিশ্রণ এই জাগতিক সুখে থাকে চার্বাকদের ভোগের পথে তা বাধার সৃষ্টি করে না। ‘সর্বদর্শনসংগ্রহে’র এই বিবরণীতে মাধবাচার্য চার্বাকদের কর্মোদ্যমের বিশেষ এক পরিচিতি তুলে ধরে বলেছেন যে, চার্বাকেরা জাগতিক সুখের উপভোগে প্রয়াসী বাধা বা বিপদের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। কণ্টকের উপস্থিতি তাঁদের পুষ্প আহরণ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে না। চার্বাক মতে ধানে তুষ থাকে বলে ধানের ক্ষুধা নিবৃত্তির ক্ষমতাকে উপেক্ষা করে ধান ফেলে দেবার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। মৎস্য ভোজনের সুখ যাঁরা আস্বাদন করতে চান তাঁদের প্রথমে কাঁটাযুক্ত মাছই সংগ্রহ করতে হয়। যে দুঃখ অপরিহার্য সুখের পথে অগ্রসর হতে গেলে তাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা উচিত। শস্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ মাটিতে বীজ বপন করে। রন্ধনকার্যে প্রবৃত্ত হবার মূলেও থাকে তার ভোজনে পরিতৃপ্তির আশা। কিছু কিছু আশঙ্কা অনেক সময় এই আশার সঙ্গি হয়, কতকগুলি অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপরিহার্য অমঙ্গল মানুষের এ্ সুখ সম্ভাবনার পক্ষে বহু্ ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। পশুপাখি এবং কীট পতঙ্গের দ্বারা ভূমিতে উৎপাদিত শস্য বিনষ্ট হতে পারে। রন্ধনকর্তার সুখাদ্য ভোজনে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার জন্য অনাহুত ভিক্ষুকের উপস্থিতির সম্ভাবনাকেও পরিহার করা চলে না। চার্বাকেরা কিন্তু এই দুঃখময় সম্ভাবনার ভয়ে ভীত হনা না এবং সুখ দুঃখময় জগতে চলার পথে দুঃখকে সব সময়ে উপেক্ষা করে সুখের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। এই মনোবৃত্তি যে প্রকৃতই চার্বাকমতই, তা বোঝাতে মাধবাচার্য কিছু প্রামাণিক লোকগাথাও উদ্ধৃত করেন–

‘ত্যাজ্যং সুখং বিষয়জন্ম পুংসাং
দুঃখোপসৃষ্টমিতি মুর্খবিচারণৈষা।
ব্রীহীন্ জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্
কো নাম ভোস্তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী।।’ (সর্বদর্শনসংগ্রহ)

অর্থাৎ : (চার্বাক বলেন,) পুরুষের বিষয়ভোগজন্য সুখ যেহেতু দুঃখ মিশ্রিত সেহেতু তাকে পরিত্যাগ করতে হবে– এটা নেহাৎই মূর্খের বিচার। এমন হিতার্থী কে আছেন– যিনি তুষকণাযুক্ত বলে পরিষ্কার উত্তম তণ্ডুলপূর্ণ ধান্য পরিত্যাগ করেন?

ইহজগতে ভোগসুখকে উপেক্ষা করে কৃচ্ছ্রসাধন চার্বাকদের অভিপ্রেত নয়। সন্ন্যাস বা ত্যাগের পথ তাঁদের অনুমোদন লাভ করেনি। ত্রিদণ্ড, ভস্মের আবরণ ইত্যাদি সন্ন্যাসের উপকরণগুলি চার্বাকমতে বুদ্ধি বা পৌরুষহীন ব্যক্তির জীবিকার উপায়। এই বিবরণের সপক্ষে লোকগাথার উদ্ধৃতি রয়েছে মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' ও শঙ্করাচার্যের 'সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ' গ্রন্থে–

'অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্ ।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ।।' (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/১৪)।
অর্থাৎ : অগ্নিহোত্র, (ঋক, সাম ও যজু) তিন বেদ, ত্রিদণ্ডধারণ (সন্ন্যাস), ভস্মানুলেপন প্রভৃতি বুদ্ধি ও পৌরুষহীন মানুষের জীবিকার্জনের উপায় বলে বৃহস্পতি মনে করেন।

চার্বাক সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থের বিবরণীতে চার্বাকেরা নিয়ম বন্ধন-বিহীন ইন্দ্রিয়-সুখপরায়ণ হিসেবেই অভিহিত হয়েছেন। এই গ্রন্থগুলির বর্ণনা থেকে মনে হয় যে ভোগের দুর্দম আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করার কোনো বাঁধন চার্বাক দর্শনে নেই এবং চার্বাকেরা তাঁদের কাজে ঔচিত্য বা নীতিবোধের প্রেরণায় চালিত হন না। 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' উদ্ধৃত বিশেষ একটি শ্লোকে উল্লিখিত ঘৃতপায়ী চার্বাক সাধারণের কাছে সুপরিচিত–

'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ।।' (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : (চার্বাক মতে,) যতদিন বেঁচে আছ সুখে বাঁচার চেষ্টা কর, ধার করেও ঘি খাবার ব্যবস্থা কর। লাশ পুড়ে যাবার পর আবার কেমন করে ফিরে আসবে?

এই চার্বাক সুখের রসের স্বাদে বঞ্চিত হতে অনিচ্ছুক। ঘৃতপানকে যদি তিনি এই লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় বিবেচনা করেন, তাহলে এই ঘৃতপানের ব্যয় বহন করার জন্য ঋণ করতেও তাঁর কুণ্ঠা নেই। চার্বাকমতের নামে এই বিশেষ শ্লোকটি অতি প্রচলিত। আবার 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থেরেই ভিন্ন এক স্থানে এই শ্লোকটির অনুরূপ অপর একটি শ্লোক দেখা যায় লোকগাথা বা লোকপ্রবাদের পরিচিতি নিয়ে। যেমন–

'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।' (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : যতদিন বাঁচো সুখেই বাঁচো, মৃত্যুর পর আর কিছুই নেই। ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন কোনভাবেই হতে পারে না।

এমনকি জয়ন্তভট্টের 'ন্যায়মঞ্জরী'তেও দ্বিতীয় শ্লোকটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে উদ্ধৃতি দেখা যায়। সেখানে 'দেহস্য' শব্দের পরিবর্তে 'শান্তস্য' শব্দের ব্যবহার হয়েছে কেবল। এই শ্লোকে বর্ণিত চার্বাক সুখলিপ্সু সন্দেহ নেই, কিন্তু সুখের প্রয়োজনে নীতিবোধ বিসর্জন দেবার কোন ইঙ্গিত কি এই শ্লোকে আছে? দেহনাশের পরে আত্মার সত্তায় বিশ্বাসের অভাব এই শ্লোকে

পরিস্ফুট, যে কারণে পারলৌকিক সুখকে কামনা না করে বর্তমান জীবনের সুখেই তাঁরা মগ্ন থাকতে চান।

চার্বাকদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ধর্ম তাঁদের জীবনের লক্ষ্য নয়, অর্থ এবং কাম, বিশেষত কাম তাঁদের নিকট পুরুষার্থরূপে গণ্য। ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তায় মনুষ্যজীবনের চারপ্রকার লক্ষ্য পুরুষার্থ-রূপে কথিত হয়, যথা– ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। কিন্তু চার্বাকেরা অর্থ ও কামের উপাসক।
মোক্ষ সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। মানুষের সব দুঃখের এবং সেই সঙ্গে জাগতিক ভোগসুখেরও একান্ত অবসান এই মোক্ষ বা মুক্তির মধ্যে। ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে মোক্ষ চরম লক্ষ্য হিসেবে নির্দেশিত হলেও সাধারণ সংসারী মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা এই লক্ষ্যের পথে প্রসারিত নয়। সেজন্য সাধারণভাবে চতুর্বর্গ হিসেবে অভিহিত হলেও সাংসারিক মানুষের জীবনে পুরুষার্থ প্রধানত ত্রিবর্গাত্মক, অর্থাৎ– ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনটি বিভিন্ন লক্ষ্যের সমবায়ে গঠিত। ভারতীয় চিন্তায় 'অর্থ' শব্দটি ধনসম্পদের বাচক এবং 'কাম' শব্দটি ইন্দ্রিয়জ সুখের বাচক। সাংসারিক ভোগসুখ অর্থ ও কামের অন্তর্গত। সম্পূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে কিন্তু 'অর্থ' ও 'কাম' কখনও নির্দেশিত হয়নি। অর্থ ও কাম নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ধর্মের দ্বারা। এই ধর্মযুক্ত 'অর্থ' ও 'কাম' ত্রিবর্গ আখ্যায় অভিহিত। (দ্রষ্টব্য : লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১১৭)

কিন্তু একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় চিন্তাধারায় অর্থ এবং কামের পরিচর্যাকে কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্যের বাইরে রাখা হয়নি। অর্থ এবং কামকে যথাক্রমে উপজীব্য করেও অর্থশাস্ত্র এবং কামশাস্ত্র সনাতনপন্থীদের সমালোচনার বিষয় হয়নি। কারণ হয়তো, 'অর্থশাস্ত্র'কার কৌটিল্য এবং 'কামসূত্রে'র রচয়িতা বাৎস্যায়ন ধর্মের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' বলা হয়েছে–
'ধর্মার্থকামেভ্যো নমঃ'। (কামসূত্র-১/১/১)
'অন্যোহন্যানুবন্ধং পরস্পরানুপঘাতকং ত্রিবর্গং সেবেত'। (কামসূত্র-১/২/১)
অর্থাৎ : (মুক্ততর্জমা)
ধর্ম, অর্থ ও কামকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করো। (কামসূত্র-১/১/১)।। এরা একে অন্যের অনুবন্ধ। কোনটি বর্জন না করে এই ত্রিবর্গের অনুসরণ করা কর্তব্য। (কামসূত্র-১/২/১)।।
এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' বলা হয়েছে–
'ধর্মার্থাবিরোধেন কামং সেবেত, ন নিঃসুখঃ স্যাৎ । সমং বা ত্রিবর্গমন্যোন্যানুবন্ধম্ । একো হ্যত্যাসেবিতো ধর্মার্থকামানামাত্মানমিতরৌ চ পীড়য়তি। অর্থ এব প্রধান ইতি কৌটিল্যঃ। অর্থমূলৌ হি ধর্মকামাবিতি।' (অর্থশাস্ত্র-১/৭/২)
অর্থাৎ :
ধর্ম ও অর্থের সঙ্গে অবিরোধে তিনি (রাজা) কাম নামক তৃতীয় পুরুষার্থের সেবা করবেন, সম্পূর্ণ সুখবর্জিত ভাবে থাকবেন না। অথবা, তিনি পরস্পরসংসৃষ্ট ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ

ত্রিবর্গের সেবা সমানভাবে অর্থাৎ তুল্যমাত্রায় করবেন। কারণ, ধর্ম, অর্থ ও কাম (এই তিনটির মধ্যে) যে কোনও একটির অতিরিক্তভাবে সেবা (অনুষ্ঠান) করলে নিজের পক্ষে এবং অপর দুটির পক্ষেও (অর্থাৎ অর্থ ও কাম, ধর্ম ও কাম, বা ধর্ম ও অর্থ– এগুলির পক্ষে) তা পীড়াদায়ক হয়ে থাকে। কৌটিল্যের মতে (ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে) অর্থ-ই প্রধান, কারণ, ধর্ম ও কাম– এই দুটির মূল-ও অর্থ (অর্থাৎ ধর্ম ও কামের অনুষ্ঠান অর্থের উপরই নির্ভর করে)।

বোঝা-ই যায়, ‘অর্থশাস্ত্র’ ও ‘কামসূত্রে’ ধর্মের প্রতি আনুগত্য আছে– অর্থাৎ, নাস্তিকতার মনোভাব তাঁদের মধ্যে নেই। সেইজন্যই অর্থ এবং কামকে অবলম্বন করেও এঁদের বস্তুবাদ কখনও নিন্দিত হয়নি।

‘ধর্মবিরোধী হিসাবে চার্বাকী আচরণের পরিচিতি প্রধানতঃ সমালোচকদের বিবৃতির মাধ্যমেই আমাদের কাছে উপস্থাপিত। এ সম্বন্ধে চার্বাকপক্ষের নিজস্ব অভিমত আমাদের জানা নেই; তবে ধর্ম যদি সনাতন ধারার প্রতি আনুগত্যের দ্যোতক হয় তাহলে নিঃসন্দেহে চার্বাকী মনোভাব এই ধর্মের বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকতার মধ্য দিয়ে চার্বাক মতবাদে যে বিদ্রোহী রূপের প্রকাশ, সাধারণ আচরণবিধির মানদণ্ড হিসাবে গৃহীত তথাকথিত ‘ধর্মে’র সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য থাকতে পারে না। আর এই ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষায় চার্বাকেরা অসমর্থ বলেই চার্বাকী আচরণে সমালোচকেরা অনুসরণীয় সাধারণ মানের অভাব লক্ষ্য করেছেন।’- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১১৮)

চার্বাকদের আচরণকে ধর্মের বিরোধী বলে অভিহিত করায় চার্বাকী নৈতিকমান যে সনাতনপন্থীদের নীতিগত মানদণ্ডের অনুকূল নয় সেটাই প্রকাশ পায়। সনাতনগোষ্ঠির অনভিপ্রেত যে কোন আচরণই বোধহয় এইভাবে ‘চার্বাক’ সংজ্ঞার সঙ্গে অভিন্ন সত্তায় নিজেকে একাত্ম করেছে।
মোট কথা, ভারতীয় সনাতনপন্থীদের বিচারে চার্বাকগোষ্ঠি চিরদিন অবজ্ঞেয় এবং সেইজন্য এই সম্প্রদায়ের আচরিত অধিকাংশ ক্রিয়াকলাপই তাঁদের কাছে দুর্নীতিপরায়ণতার পরিচায়ক বলে গণ্য হয়েছে। এই কারণেই চার্বাকদের বিরুদ্ধে যখন সনাতনপন্থীরা উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগ করেন, সেই অভিযোগকেও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে না বলেই মনে হয়।

চার্বাকদের বিরুদ্ধে সনাতনপন্থী অধ্যাত্মবাদীদের অভিযোগের অন্ত নেই। তার প্রধান কারণই হয়তো চার্বাক ‘ধর্ম’ মানে না। এই ‘ধর্ম’ মানে কী? এই তথাকথিত ‘ধর্ম’ চার্বাকদের কাছে আসলে ‘শাস্ত্রশাসন’। কোন্ শাস্ত্র? ধর্মবাদীদের দৃষ্টিতে যা বেদবিহিত তাই শাস্ত্র। বৈদিক সংস্কৃতির প্রতিভূ এই শাস্ত্র তথা ‘বেদ’ সম্পর্কে চার্বাকদের মনোভাব কী তার যৎসামান্য কিছু ধারণা আমরা ইতোমধ্যেই অবগত হয়েছি। কিন্তু চার্বাকী বস্তুবাদের আলোচনাকে অভীষ্ট

লক্ষ্যে নিয়ে যেতে এ-বিষয়ে আরো কিছু আলোচনার অবকাশ রয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আলোচনাটা লক্ষ্যনিষ্ঠ হবে যদি বেদ প্রসঙ্গে চার্বাকদের মনোভাবের যথাযথ বিশ্লেষণটুকু করা সম্ভব হয়।

। চার্বাক ও বেদ।

বৈদিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যে চার্বাক দর্শনের মূল ধারার আবির্ভাবের যে ইঙ্গিত পণ্ডিতেরা দিয়েছেন তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই বিদ্রোহের পটভূমিতে চার্বাক সিদ্ধান্তকে বিচার করতে গেলে বৈদিক চিন্তাধারার সমান্তরালে চার্বাকী মনোভাব মিলিয়ে দেখাটাই প্রাসঙ্গিক হবে। ইতঃপূর্বে আমরা প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য ও তার চিন্তাধারার পরিচয় অধ্যায়ান্তরে আলোচনা করেছি। সেখানেই আমরা অবগত হয়েছি যে, বেদের সংখ্যা চার– ঋক্, সাম, যজুস্ ও অথর্ব। অবশ্য বহুক্ষেত্রে বেদ 'ত্রয়ী' নামের মাধ্যমে পরিচিত; কারণ, অথর্ব বা চতুর্থ বেদকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে অনেক দেরিতে। প্রত্যেক বেদের আবার তিনটি বিভাগ– মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষৎ। সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে বিভক্ত বেদ এক বিপুল সাহিত্য সম্ভার। বৈদিক সাহিত্য হিসেবে এর পরিচিতি এবং যে যুগের পরিধির মধ্যে এই সাহিত্যের সৃষ্টি, বৈদিক যুগ বলতে সাধারণত তাকেই বোঝায়।

তবে সূক্ষ্ম বিচারের মাপকাঠিতে কিন্তু সংহিতা এবং 'ব্রাহ্মণ'ই কেবল বৈদিক যুগের সাক্ষ্য বহন করে, কারণ, বৈদিক মন্ত্র এবং 'ব্রাহ্মণে'র অনুসরণে উদ্ভূত হলেও বৈদিক সাহিত্যের অন্তিম অংশ উপনিষৎ এক ভিন্নধর্মী ভাবের পরিচায়ক, যার অনুবৃত্তি পরবর্তী চিন্তাধারায় সুপরিস্ফূট। এই বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদিক যুগ বলতে বিশিষ্ট অর্থে মন্ত্র এবং 'ব্রাহ্মণে'র যুগকেই বোঝায়। এবং আমাদের খেয়াল রাখা আবশ্যক, চার্বাক দর্শনে বেদ প্রধানত মন্ত্র এবং 'ব্রাহ্মণ' পর্যায়ের বৈদিক সাহিত্যের অর্থে ব্যবহৃত।

(১)

আমরা আগেই দেখেছি, বৈদিক যুগের চিন্তাধারা মূলত পার্থিব কামনাভিত্তিক। সাধারণ মানুষ সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য ইত্যাদির অধিকারী হতে চায়। কামনার লক্ষ্য সেই সব বিষয়। বৈদিক যুগের সমস্ত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য প্রথমত এই কামনাগুলির পূর্তি এবং দ্বিতীয়ত এই কামনাপূর্তির পথের অন্তরায়গুলির দূরীকরণ। বৈদিক সংহিতায় এই প্রয়াসই রূপ পেয়েছে বিভিন্ন কল্পিত দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত প্রার্থনার মাধ্যমে। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপে দেবত্বের মহিমা আরোপ করে মানুষ তাঁর পূজা করেছে; দেবতার কাছে তাঁর প্রার্থনা, তিনি যেন তাঁর মঙ্গলময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে সর্বদা আবির্ভূত হন এবং রুদ্ররূপকে সংবরণ করেন। আর এই প্রার্থনা ছাড়াও মানুষের কামনা পূর্তির উদ্দেশ্য সাধনের অঙ্গ হিসেবে যজ্ঞ ইত্যাদি নানা রকম ক্রিয়াকর্মের বিধান বা প্রচলনও স্থান পেয়েছে বৈদিক সংহিতাতে।

এই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান সংহিতা-উত্তর 'ব্রাহ্মণের' যুগে অত্যন্ত প্রাধান্য পায় এবং প্রধানতঃ এই অনুষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করেই 'ব্রাহ্মণের' যুগের রূপায়ণ।

'ক্রিয়াকর্মের খুঁটিনাটিবহুল এই সব বৈদিক যজ্ঞের যথাযথ ফল প্রদানের ক্ষমতা বৈদিক নির্দেশনা অনুসারে মন্ত্রাদির বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং বিভিন্ন ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল ছিল। এ ধরণের বিশুদ্ধতা পালন সাধারণ লোকের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়;

ফলে, একটা দুর্বোধ্যতার আবরণ এই যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানগুলিকে সাধারণ লোকের বুদ্ধির জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখত। অনুষ্ঠানের জটিলতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। অনভিজ্ঞ অথচ যাজ্ঞিক ক্রিয়ায় রত ব্যক্তির শোচনীয় অবস্থার এক বর্ণনা 'শতপথ ব্রাহ্মণে' (শঃব্রাঃ-১২/২) পাওয়া যায়। অন্তবর্তী পথগুলির বিবরণ সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়েও যে ব্যক্তি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে তার দশার সঙ্গে এই অবস্থা তুলনীয়। এইভাবে অরণ্যে প্রবেশকারীকে যেভাবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুর্জনের প্রতারণা ইত্যাদি প্রতিকূলতার কাছে পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয়, অনভিজ্ঞ যজ্ঞকারীরও সেইভাবে নানা ধরনের দুর্বিপাকের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অপর পক্ষে, যজ্ঞ সম্বন্ধে 'বিস্তারিত জ্ঞান' যাঁদের আছে, সেই ব্যক্তিদের দ্বারা যজ্ঞ পরিচালিত হলে যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে সব রকম বিপদ থেকে পরিত্রাণ এবং পরিশেষে সুখ, শান্তি এবং স্বর্গলাভ হয়।'- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১২০)

যজ্ঞের ব্যাপারে এই 'বিস্তারিত জ্ঞানের' যাঁরা অধিকারী, স্বাভাবিকভাবেই বৈদিক সমাজে তাঁদের সর্বাধিক প্রতিপত্তি ছিলো; কারণ, সাধারণ মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি এবং স্বর্গের চাবিকাঠি ছিলো তাঁদের হাতে। এই অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায় নামে বিশেষ এক শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং যজ্ঞ পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিশেষ এই শ্রেণীর অধিকারে আসে। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সাধারণ ব্যক্তিদের এই পুরোহিত বা যাজকদের উপর নির্ভর করতে হতো, কারণ যজ্ঞের জটিল ক্রিয়াপদ্ধতির জ্ঞান একমাত্র এঁদেরই অধিগত ছিলো। যাঁর কামনাপূর্তি যজ্ঞানুষ্ঠানের লক্ষ্য, সেই যজমান বস্তুতপক্ষে যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন। এই পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা জাতিগতভাবে পৌরোহিত্যকেই বৃত্তি হিসেবে অবলম্বন করতেন।

কেবল পৌরোহিত্যকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেই ক্রমান্বয়ে এই পরাশ্রিত পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায় যে সমাজের স্তরবিনাসে সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তার দৃষ্টান্ত হলো, বৈদিক সাহিত্যের বহু অংশে এই যাজক শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা দেবতা হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। যেমন, 'শতপথ ব্রাহ্মণে' (শতপথ-ব্রাহ্মণ-২/২/২/৬, ৪/৩/৪/৪, ২/৪/৩/১৪) দেবতাকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে– স্বর্গের দেবতা আর মানুষ দেবতা বা পুরোহিত, যাঁরা বৈদিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং যজ্ঞ পরিচালনার ভার যাঁদের উপর অর্পিত।

এই পুরোহিতেরা সমাজজীবনে যে বিশেষ ধরনের সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিলেন বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন জায়গায় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। ইতঃপূর্বে ভিন্ন অধ্যায়ে 'মনুস্মৃতি' বা 'মনুসংহিতা'র বিবরণে এ-বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। পুরোহিতদের স্থান অপর ব্যক্তির তুলনায় উচ্চুর স্তরে নির্দেশিত ছিলো এবং এঁদের সঙ্গে ব্যবহারে এই বিশেষ ব্যবধানটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলেই সচেতন থাকতেন। এই যাজকদের সব সময়ে সম্মান দেখাতে হতো, উপহার বা দক্ষিণা দিতে হতো এবং এঁদের

হত্যা বা উৎপীড়ন করার অধিকার কারও থাকতো না। এমনকি এঁদের সঙ্গে ব্যবহারের সময় দেশের রাজাকেও এই একই নিয়ম পালন করতে হতো। এই যাজকদের সম্পত্তিতে রাজা কোন পরিস্থিতিতেই হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। সাধারণ লোকের সঙ্গে বিরোধের ব্যাপারে বিচারক সব সময়ে যাজকদের পক্ষে রায় দিতেন; কারণ, এই যাজকদের কোন কাজে ত্রুটির সম্ভাবনা অকল্পনীয় ছিলো। কৃষ্ণযজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও এর বিশদ আলোচনা রয়েছে। তবে সার-কথা বা মর্ম-উপদেশটা হলো–

'যৎ ব্রাহ্মণশ্চাব্রাহ্মণশ্চ প্রশ্নমেয়াতাং ব্রাহ্মনায়াধি ব্রূয়াদ্যৎ ব্রাহ্মণায়াধ্যাহাহত্মনেহধ্যাহ যৎ ব্রাহ্মণং পরাহাহত্মানং পরাহহ তস্মাৎ ব্রাহ্মণো ন পরোচ্যঃ।'- (তৈত্তিরীয়-সংহিতা-২/৫/১১)
অর্থাৎ :
এ জগতে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এ নিয়ে বিবাদ করে কোন অভিজ্ঞ লোকের কাছে গেলে, সে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে, তবে তার নিজের আধিক্য হয়। ব্রাহ্মণের পরাভব হলে, তারও পরাভব হয়। অতএব কখনও ব্রাহ্মণের পরাভব করা উচিত নয়।

কিন্তু ক্ষমতা ও অর্থের লোভ মানুষের মধ্যে চিরন্তন এবং এই যাজকসম্প্রদায়ের লোকেরাও তা থেকে অব্যাহতি পাননি।
'জনসাধারণের অজ্ঞতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে এঁরা সমাজে এঁদের বিশেষ সুযোগ সুবিধার অপব্যবহারে রত হলেন। কেবলমাত্র জাতিগত ব্রাহ্মণতার ভিত্তিতেই পৌরোহিত্যের মর্যাদা দাবী করে বহু লোক সাধারণের কাছে নিজেদের উপস্থাপিত করলেন এবং এইভাবে সমাজে তাঁদের প্রভুত্ব বিস্তারের প্রস্তুতি শুরু হল। পরলোকে প্রচুর সুখ ও সম্পদের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করা এঁদের মধ্যে অনেকের জীবিকার উপায় হয়ে দাঁড়াল। এই জাতীয় লোকের অন্তর্ভুক্তি স্বাভাবিকভাবেই যাজকসম্প্রদায়ের মধ্যে অধঃপতনের সূচনা করতে থাকে এবং এইভাবে সংহিতার যুগে যে বৈদিক সংস্কৃতির উদ্ভব, সংহিতোত্তর 'ব্রাহ্মণে'র যুগে তা এ বিকৃত আকার ধারণ করে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব যে সময়ে সর্বাপেক্ষা প্রবল, সেই 'ব্রাহ্মণের' যুগেই বেদের যজ্ঞভিত্তিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রস্তুতি আরম্ভ হল। পরবর্তী ভাবনা বিভিন্নমুখী ধারায় নূতন খাতে প্রবাহিত হয়ে ভারতের চিন্তাজগতে পরিবর্তন সূচনা করল।'- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১২১-২)

(২)
বৈদিক সাহিত্যে উপনিষদের স্থান সংহিতা এবং 'ব্রাহ্মণের' পরবর্তী যুগে। ফলে উপনিষদীয় সাহিত্যে একে একে পূর্ববর্তী যুগের কামনাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতধর্মী সুরের পরিচয়ই পরিস্ফূট হতে দেখা যায়। যে বৈষয়িক সুখভোগ বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রধানতম লক্ষ্য তার অসারতা প্রতিপাদিত হতে থাকে উপনিষদীয় চিন্তায়। নিজেদের কামনাপূর্তির সহায়ক হিসেবে বৈদিক আর্যরা বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু উপনিষদীয় ঋষি বহু

দেবতার উৎসরূপে অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদন করলেন। উপনিষদীয় সাহিত্যের বহু অংশে যজ্ঞীয় সংস্কৃতির নিন্দা বা নতুন ব্যাখ্যা লক্ষিত হয়। এ-প্রসঙ্গে বিভিন্ন উপনিষদে অজস্র দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়। নমুনা হিসেবে যেমন, প্রাচীনতম ছান্দোগ্য-উপনিষদে অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদনে বলা হয়েছে–

‘তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতীতি খল্বেতস্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি।। (ছান্দোগ্য-১/১/১০)

অর্থাৎ :

ওঁকার বা অক্ষর-ব্রহ্মের মহিমা কেউ জানুন বা না জানুন উভয়েরই কর্মক্ষমতা ওঁকার থেকে আসে। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে কর্মের ফল হয় ভিন্ন ভিন্ন। ‘ওম্’-কে জেনে, শাস্ত্রবাক্য ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান হয়ে এবং শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী কর্ম বা যাগযজ্ঞ করলে সেই কর্ম অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। এ-ই হলো ওঁকারের যথার্থ ব্যাখ্যা।

অন্যদিকে ‘মুণ্ডক-উপনিষদ’-এ (মুণ্ডক-১/২/৭-১০)-তে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি উপনিষদীয় ঋষির তীব্র বিরাগ সপরিস্ফুট। যেমন–

‘প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেহভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি।।’ (মুণ্ডক-১/২/৭)।
‘অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে।।’ (মুণ্ডক-১/২/৯)।

অর্থাৎ :

যজ্ঞে আঠারো জন ব্যক্তির প্রয়োজন– যজমান স্বয়ং, তাঁর পত্নী ও ষোলজন ঋত্বিক বা পুরোহিত। তাঁরা সকলেই মরণশীল, অতএব তাঁরা যা করেন তাও ক্ষণস্থায়ী ও বিনাশী। সেই অর্থে তাঁরা যে যজ্ঞ করেন তা নিকৃষ্ট কর্ম। ভেলার মতোই তাঁদের যজ্ঞকর্ম অনিত্য এবং (সংসার সমুদ্র পার করতে) অক্ষম। তবু কিছু নির্বোধ মানুষ আছেন যাঁরা এই কর্মকে শ্রেয়োলাভের উপায় বলে মনে করেন। বস্তুত এই কর্মের ফলে স্বর্গলাভ হতে পারে, কিন্তু এই স্বর্গসুখ নেহাতই সাময়িক। স্বর্গের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেই তাঁদের পুনর্জন্ম হয়, এবং আবার তাঁরা জন্মমৃত্যুর চক্রে প্রবেশ করেন। (মুণ্ডক-১/২/৭)।। কিছু নির্বোধ ব্যক্তি আছেন যাঁদের আচরণ শিশুসুলভ। বহু বিষয়েই তাঁরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তবু নিজেদের সর্বজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান বলে জাহির করেন। তাঁরা নিজেদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত বলে দাবি করেন। আসলে কর্মফলে আসক্তিবশত তাঁরা যাগযজ্ঞ নিয়ে মত্ত থাকেন। সঠিক পথ তাঁদের অজানা। তাই তাঁরা কিছুকাল স্বর্গসুখ ভোগ করেন ঠিকই, কিন্তু অচিরেই মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তাঁরা স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হন এবং অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করেন। (মুণ্ডক-১/২/৯)।।

তাছাড়া, ছান্দোগ্য উপনিষদের এক স্থানে পরস্পরসংলগ্ন কুকুরবাহিনীকে বহিষ্পবমান স্তোত্রগায়কের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন–

‘তে হ যথৈবেদং বহিস্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তীত্যেবম আসসৃপুস্তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ।।’ (ছান্দোগ্য-১/১২/৪)।
‘ওঁ মদাও মোংও পিবাওমোংও দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা২ হন্নমিহা২ হরৎ, অন্নপতেওহন্নমিহা২ হরোওমিতি।।’ (ছান্দোগ্য-১/১২/৫)।
অর্থাৎ :
‘বহিষ্পবমান’ স্তোত্র উচ্চারণ করতে করতে উদ্গীথ ঋষিরা যেমন পরস্পর হাত ধরাধরি করে সর্পগতিতে পরিক্রমা করেন, কুকুরগুলিও তেমনি পরস্পরের লেজ মুখে ধরে পরিভ্রমণ করতে লাগলো। তারপর কিছু পরে উপবেশন করে তাঁরা উচ্চারণ করে উঠলো ‘হিং’। (ছান্দোগ্য-১/১২/৪)।। তারা হিংকার করে গান গাইতে লাগলো– ‘ওম্ অদাম’, আমরা আহার করবো, ‘ওম্ পিবাম’, আমরা পান করবো। হে দেব বরুণ! হে প্রজাপতি! হে সবিতা! হে অন্নপতে! আমাদের জন্য এখানে অন্ন আহরণ করুন...অন্ন এনে দিন, এনে দিন– ওম্ । (ছান্দোগ্য-১/১২/৫)।।

‘প্রকৃতপক্ষে উপনিষদীয় চিন্তাধারার আবির্ভাবের সূচনা বৈদিক সংহিতার মধ্যেই পরিদৃশ্যমান। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতার মর্যাদা দিলেও এদের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধানে সংহিতার যুগেই আর্যমানস উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল। বহু দেবতার মধ্যে প্রাধান্যের অধিকারী কোন্ দেবতা– এ সম্বন্ধে দ্বন্দ্বের সূচনাও বৈদিক সংহিতার যুগেই লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের বিভিন্ন মন্ত্রে বহুর মধ্যে একত্বের অনুসন্ধানের যে প্রারম্ভিক রূপ প্রকাশমান তারই পূর্ণ পরিণতি উপনিষদীয় চিন্তায়। এই দিক দিয়ে বিচার করলে উপনিষদে বৈদিক কর্মকাণ্ডের নিন্দা থাকলেও উপনিষদকে বেদেরই অনুবৃত্তি বলা চলে।’- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১২২)

‘মুণ্ডক-উপনিষদে’ই দুই রকম বিদ্যার উল্লেখ আছে– পরা এবং অপরা। পরা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান এবং অন্যান্য সব বিষয়ের জ্ঞান অপরা বা নিকৃষ্ট বিদ্যার অন্তর্গত। যেমন–
‘তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যৎ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।।’ (মুণ্ডক-১/১/৪)।
‘তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।। (মুণ্ডক-১/১/৫)।
অর্থাৎ :
অঙ্গিরস শৌনককে বললেন, ‘ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলেন জ্ঞান দুই প্রকার, ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ পরম-জ্ঞান; আর আপেক্ষিক জ্ঞান অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কীয় জ্ঞান।’ (মুণ্ডক-১/১/৪)।। এই দুই শ্রেণীর বিদ্যা হলো পরা বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা হলো– ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা (উচ্চারণ বিদ্যা), কল্প (অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিদ্যা), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দার্থ বিদ্যা), ছন্দ, জ্যোতিষ– এই দশটি। আর পরা বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে

জানা যায়, যে ব্রহ্ম শাশ্বত ও নিত্য। (মুণ্ডক-১/১/৫)।।

স্বাভাবিকভাবেই উপনিষৎকার তাঁর নিজ শাস্ত্রের অন্তর্গত বিদ্যাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছেন। কিন্তু বৈদিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়নি, নিকৃষ্ট হলেও তা বিদ্যার স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ ব্যাপারে উপনিষদের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে দ্বিমুখী মনোভাব লক্ষণীয় বলে বিদ্বানেরা মনে করেন। বৈদিক যাগযজ্ঞবহুল ক্রিয়াপদ্ধতি উপনিষদীয় চিন্তার দ্বারা সমর্থিত হয়নি বটে, কিন্তু উপেক্ষার দৃষ্টিতে সব সময় এগুলির বিচার করা হয়নি, বরং নূতন ব্যাখ্যার দ্বারা এগুলির তাৎপর্য বিবেচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে সূচিত হয় নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পুরাতন ভাবধারার সমন্বয়ের প্রয়াস। তাই লতিকা চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'উপনিষদের মধ্যে বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা থাকলেও একই ঐতিহ্যের ধারা যে উপনিষদীয় সংস্কৃতিকেও প্লাবিত করেছিল তা বোঝা যায়।'

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের আবির্ভাব কালকে কোন কোন উপনিষদীয় রচনার সমসাময়িক বলে মনে করা হয়। এই দর্শন দুটির মধ্যেও বৈদিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্তির এক প্রবল প্রচেষ্টা দেখা যায়। বৈষয়িক সুখের যে নশ্বরতার চিন্তা উপনিষদীয় সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনেও তা পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে বলে পণ্ডিতদের অভিমত। কিন্তু এই দর্শন দুটিকে উপনিষদের মতো বৈদিক সংস্কৃতির অনুবৃত্তি বলা চলে না। কারণ এগুলির মধ্যে বেদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের ঘোষণা আছে। তবে ভারতীয় ঐতিহ্যের সাধারণ ভাববাদী ধারা থেকে এই দর্শন দুটি বিচ্যুত নয়। কাজেই নাস্তিক পঙক্তিতে জৈন ও বৌদ্ধদের স্থান নির্দেশিত হলেও আস্তিকতার প্রভাবকে বোধকরি তাঁরা সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেননি।

'বৈদিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার মূলতঃ এক অতীন্দ্রিয় এবং অলৌকিক জগৎকে কেন্দ্র করে। এ জগতের পরিচয় প্রত্যক্ষ বা ব্যবহারিক অনুমান, যা চার্বাক মতে একমাত্র প্রমাণ– তার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব নয়। জাগতিক সুখ ও সমৃদ্ধির কামনার পরিপূর্তির লক্ষ্যে বৈদিক সংস্কৃতি তার নিজস্ব পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিল। এই পথের প্রসার যে অলৌকিক রাজ্যকে ঘিরে সেই রাজ্যের রহস্য উন্মোচনে উপনিষদীয় এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনও ব্রতী– যদিও তাদের লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দু ভিন্ন। বৈদিক চিন্তাধারায় যে অতিজাগতিক রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই দর্শনগুলি তাকে উপেক্ষা করেনি, বরং নিজেদের স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে এই রহস্যের সন্ধান করেছে।'
'একমাত্র চার্বাকী চিন্তার উপরই বৈদিক সংস্কৃতি তার উত্তরাধিকারের কোন ছাপ রেখে যেতে পারেনি। আর বেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষেত্রে চার্বাকের ভূমিকা বোধ হয় প্রধানতম। বস্তুবাদী চার্বাক কাম্য বস্তুর উপভোগকেই তার মুখ্য উপজীব্য করেছে। কাজেই লক্ষ্যের বিচারে বৈদিক দর্শনের সঙ্গে চার্বাক দর্শনের মৌল সাদৃশ্য সহজ সিদ্ধান্তের বিষয় হতে পারে, কিন্তু এ সাদৃশ্য নেহাতই গৌণ। কারণ কামনা পূর্তির উপায়ের নির্দেশনায় উভয়

দর্শনের মূল ব্যবধানের ইঙ্গিত নিহিত আছে। কামনাকারীর চিত্তের তাৎক্ষণিক তুষ্টি বৈদিক বিধানের অনুসরণে সম্ভব নয়। বেদের মধ্যে আছে কেবল কামনার পরিপূর্তির প্রতিশ্রুতি, তাও বহু ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জগতের অন্তরালে এবং লৌকিক অনুভূতির সীমার বহির্দেশে। বৈদিক বিধানের অনুসরণে কামনাকারী তখনকার মত যা লাভ করে তার মধ্যে সুখের স্বাদের সম্পূর্ণ অভাব, বরং অর্থব্যয় এবং সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে তা দুঃখের অনুভূতিই বহন করে। সুখলাভের এই উপায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চার্বাক দর্শনে বিদ্রোহের রূপ ধারণ করেছে। লৌকিক সুখ লাভের জন্য দৈব সাহায্য প্রার্থনায় চার্বাকপন্থী সম্মত নন।'- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১২৪-৫)

বস্তুত যাজকগোষ্ঠির প্রভাবে বৈদিক যজ্ঞীয় চর্চা ক্রমশ জটিল রূপ পরিগ্রহ করে অনুষ্ঠানগত আড়ম্বর বৃদ্ধি পেতে থাকলে এরই প্রতিক্রিয়ায় ব্রাহ্মণোত্তর যুগে বৈদিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে সূচনা– তার পূর্ণ রূপায়ণ চার্বাক মতবাদেই সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আমরা এখন সেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি।

(৩)
ভারতীয় অধ্যাত্ম বিশ্বাস অনুসারে বেদমন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়, বৈদিক ঋষির নিকট এই মন্ত্র প্রকটিত হয়েছে মাত্র। তাই বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। 'শ্রুতি' শব্দের মধ্যে বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় এক জগতের যোগাযোগের ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু চার্বাকী দৃষ্টিভঙ্গি এই বিশ্বাসের বিরোধী এবং বেদের অপৌরুষেয়ত্ব চার্বাক মতে সমর্থনযোগ্য নয়। অন্যান্য বিভিন্ন গ্রন্থের মতো বেদও চার্বাকদের মতে ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা রচিত। চার্বাকেতর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের রচিত নানান গ্রন্থ যেমন 'সর্বদর্শনসংগ্রহ', 'সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ', 'সর্বমতসংগ্রহ', 'প্রবোধচন্দ্রোদয়', 'ষড়্দর্শনসমুচ্চয়', 'তর্কসংগ্রহদীপিকা' ইত্যাদি গ্রন্থাবলিতে এবং অন্যত্র লোকায়তিক চার্বাক বা বৃহস্পতিবচনের যে উদ্ধৃতি আছে তাতে বেদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বেদমন্ত্রের রচয়িতারা চার্বাকী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। যেমন, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সায়ণভাষ্য অনুযায়ী দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট জরায়ু-জাতের অজরত্ব প্রার্থনার মন্ত্র হিসেবে উক্ত হয়েছে–

'সৃণ্যেভ্য জর্ভরী তুর্ফরীতূ নৈতোশেব তুর্ফরী পর্ফরীকা।
উদন্ যজেব জেমনা মদেরূ তা মে জরায়জ্বরং মরায়ু।।'- (ঋগ্বেদ-১০/১০৬/৬)
(যদিও ঋগ্বেদ গ্রন্থে তার তর্জমাটি দেয়া হয়েছে)–
অঙ্কুশ তাড়িত মত্ত হস্তীর ন্যায় তোমরা শরীর অবনত করে শত্রু সংহার কর। শত্রুনিধনকারীর সন্তানের ন্যায় তোমরা শত্রুকে বিদীর্ণ ও বধ কর। তোমরা এমনি নির্মল, যেন জলমধ্যে জন্মেছ, তোমরা বলবান ও জয়শীল। সে তোমরা আমার মরণধর্মশীল দেহকে পুনর্বার যৌবনাবস্থা দান কর।

কিন্তু চার্বাকমতে, জর্ভরী তুর্ফরী ইত্যাদি অপ্রচলিত এবং আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন শব্দের

অন্বয়ে গঠিত বেদমন্ত্রগুলি যে পণ্ডিতবাক্য হিসেবে বিবেচিত হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য, বৃহস্পতিবচনে তা প্রমাণ করার প্রয়াস দেখা যায়। যেমন–

‘ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্তনিশাচরাঃ ।
জর্ফরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্।।’ (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : যারা তিন বেদ রচনা করেছেন তাঁরা নেহাতই ভণ্ড, ধূর্ত ও চোর (নিশাচর)। জর্ফরীতুর্ফরী (প্রভৃতি অর্থহীন বেদমন্ত্র) ধূর্ত পণ্ডিতদের বাক্যমাত্র।

চার্বাক গুরু বৃহস্পতির অভিমত অনুসারে এই মন্ত্রগুলিকে প্রলাপ বলা চলে এবং এগুলির প্রণেতারা পাণ্ডিত্যে না হলেও ভণ্ডামিতে অনেকের চেয়েই উন্নততর। ‘ভণ্ড’ ছাড়াও ‘ধূর্ত’, ‘নিশাচর’ অর্থাৎ রাক্ষস বা চোর ইত্যাদি নিন্দাসূচক নানা শব্দ চার্বাকপন্থীদের মতে এইসব ‘বেদস্য কর্তারঃ’ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।–

‘ধূর্ত্ত-প্রলাপস্ত্রয়ী।’ (বার্হস্পত্যসূত্র-৫৯)
অর্থাৎ : বৃহস্পতির মতে, (বেদের কর্তা) ভণ্ড, ধূর্ত, নিশাচর ত্রয়ী।

যে যাজকশ্রেণীর লোকেরা ‘ব্রাহ্মণে’র যুগে দেবতার স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন, চার্বাক দর্শনে তাঁদের নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা দেখা যায়। চার্বাক মতে এই সব পুরোহিতেরা বুদ্ধি ও পৌরুষবিহীন। এ কারণে জীবিকার অন্য উপায় অবলম্বন করতে না পেরে এরা প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন।–

‘অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্ ।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ।।’ (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/১৪)।।
অর্থাৎ : অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ডধারণ (সন্ন্যাস), ভস্মানুলেপন প্রভৃতি বুদ্ধি ও পৌরুষহীন মানুষের জীবিকার্জনের উপায় বলে বৃহস্পতি মনে করেন।

কিংবা–

‘অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা ।।’ (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : (চার্বাক বলেন,) যাদের না-আছে বুদ্ধি, না খেটে খাবার মুরোদ তাদের জীবিকা হিসাবেই বিধাতা যেন সৃষ্টি করেছেন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, তিন বেদ, সন্ন্যাসীদের ত্রিদণ্ড, গায়ে ভস্মলেপন প্রভৃতি ব্যবস্থা।

স্বর্গ ইত্যাদি যে সব সুখপ্রদ স্থানের বর্ণনা বেদে আছে এবং মানুষকে যার প্রলোভন দেখিয়ে পুরোহিতেরা বঞ্চনা করেন সেগুলিতে চার্বাকদের কোন অনুমোদন নেই। এমনকি স্বর্গের সঙ্গে স্বর্গের দেবতাদেরও চার্বাকী ধারণায় প্রবেশাধিকার নেই।
এছাড়া, বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে চার্বাকেরা বিভিন্ন ধরনের ত্রুটির সন্ধান পেয়েছেন। ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ মতে চার্বাক প্রদর্শিত এই ত্রুটিগুলি তিন ভাগে বিভক্ত– অনৃত, ব্যাঘাত এবং পুনরুক্তি। যেমন–

‘অনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্ত দোষৈর্দূষিততয়া’। (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : (চার্বাক মতে) বেদ অনৃত দোষ (মিথ্যা কথা), ব্যাঘাত দোষ (পরস্পর বিরুদ্ধ কথা) ও পুনরুক্ত দোষে দূষিত হওয়ায় অপ্রমাণ এবং তা কেবল প্রতারকদের জীবিকার উপায় হয়েছে।

বৈদিক প্রামাণ্যের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের ঠিক এই জাতীয় অভিযোগের (বার্হস্পত্যসূত্র-৫৮) উল্লেখ ন্যায়সূত্রের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন–
‘তদপ্রামাণ্যমনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্ত-দোষেভ্যঃ।’- (ন্যায়সূত্র-২/১/৫৭)
অর্থাৎ : (পূর্বপক্ষ বলেন,) অনৃতদোষ, ব্যাঘাতদোষ এবং পুনরুক্তদোষ-বশত অর্থাৎ বেদে মিথ্যা কথা আছে, পদদ্বয় বা বাক্যদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ আছে এবং পুনরুক্তি-দোষ আছে, এজন্য তার (বেদরূপ শব্দবিশেষের) প্রামাণ্য নেই।

মন্ত্রগত অনৃত বা অসত্য দোষের উদাহরণ প্রসঙ্গে কতকগুলি উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, পুত্রকামী ব্যক্তি তাঁর কামনা পূরণের জন্য ‘পুত্রেষ্টি’ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত হবেন, পশুকামীর কামনা পূর্তি হবে ‘চিত্রা’ যজ্ঞের মাধ্যমে– বেদের বিধান এই রকম। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নির্দেশিত যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠানের পরেও পুত্রলাভ বা পশুলাভ অনেক সময় দেখা যায় না। চার্বাক মতে এই ধরনের ব্যাপার বৈদিক মন্ত্রের অসত্যতা প্রতিপাদন করে। বেদবিরোধী এই পূর্বপক্ষীয় যুক্তির বর্ণনা ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ‘ন্যায়ভাষ্যে’ উদ্ধৃত হয়েছে–
‘শব্দস্য প্রমাণত্বং ন সম্ভবতি। কস্মাৎ? অনৃতদোষাৎ পুত্রকামেষ্টৌ। পুত্রকামঃ পুত্রেষ্ট্যা যজেতেতি নেষ্টৌ সংস্থিতায়াং পুত্রজন্ম দৃশ্যতে। দৃষ্টার্থস্য বাক্যস্যানৃতত্বাৎ অদৃষ্টার্থমপি বাক্যং ‘‘অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম’’ ইত্যাদ্যনৃতমিতি জ্ঞায়তে।’- (ন্যায়ভাষ্য-২/১/৫৭)
অর্থাৎ :
বেদরূপ শব্দবিশেষের অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য নাই। কেন? যেহেতু পুত্রকাম ব্যক্তির যজ্ঞে অর্থাৎ পুত্রেষ্টি যজ্ঞবিধায়ক বেদবাক্যে অনৃতদোষ আছে। কারণ, ‘‘পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবে’’– এই বেদবাক্যবিহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে পুত্র জন্ম দেখা যায় না। (অর্থাৎ পূর্বোক্ত বেদবাক্যানুসারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেও যখন অনেকের পুত্র লাভ হয় না, তখন ঐ বেদবাক্য অনৃতদোষযুক্ত অর্থাৎ তা মিথ্যা।) আর পূর্বোক্ত দৃষ্টার্থক বেদবাক্য মিথ্যা বলে ‘‘স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করবে’’ ইত্যাদি অদৃষ্টার্থক বাক্যও মিথ্যা, তা বোঝা যায়।

বেদের অপর একটি নির্দেশ– স্বর্গলাভে অভিলাষী ব্যক্তির অগ্নিহোত্র ইত্যাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান। চার্বাকেরা এ জাতীয় বিধানের মধ্যে মানুষকে প্রতারণার উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত পান। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠাতার স্বর্গপ্রাপ্তি সত্যই হয় কিনা, সে বিষয়ে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অপর পক্ষে, পুত্রেষ্টি ইত্যাদি যজ্ঞ, যেগুলির ফল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য এবং সকলের পক্ষেই যার সঠিকতা বিচার করা সম্ভব, সেগুলির সম্বন্ধে বেদমন্ত্র যে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সব সময়ে সক্ষম নয়, তা এই যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান এবং সেগুলির ফলপ্রাপ্তির বিষয়ে

পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। কাজেই বৈদিক মন্ত্রের সত্যতায় বিশ্বাস রাখা সম্ভব নয়। আর স্বর্গপ্রাপ্তি ইত্যাদি সম্পর্কীয় বেদের বিধান নিছক প্রতারণামূলক। চার্বাকমতে, যিনি বেদে ঐ কথা বলেছেন, তিনি মিথ্যাবাদী বলে আপ্ত নন। সুতরাং তাঁর অন্য বাক্যও মিথ্যা। যে বক্তা মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন, তিনি আপ্ত না হওয়ায় তাঁর অন্যান্য বাক্যগুলিও আপ্তবাক্য নয়। সুতরাং তাও প্রমাণ হতে পারে না।

'ব্যাঘাত' শব্দ পরস্পর বিরোধিতার দ্যোতক এবং বেদের মধ্যে বহু স্থানে একটি মন্ত্রের সাহায্যে অপর একটি মন্ত্রে নির্দেশিত বিধানের বিরোধিতা করা হয়েছে। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে কোন ক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের আগে আবার কোন ক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের পরে আহুতি প্রদানের বিধান দেখা যায়। তাই চার্বাকমতে বেদ প্রমাণ হতে পারে না, এর দ্বিতীয় কারণ– বেদে ব্যাঘাত বা বিরোধ-দোষ আছে। 'ন্যায়ভাষ্যে' পূর্বপক্ষীয় চার্বাকী যুক্তি বর্ণনা দেয়া হয়েছে–

'বিহিতব্যাঘাতদোষাচ্চ হবনে। "উদিতে হোতব্যং, অনুদিতে হোতব্যং, সময়াধ্যুষিতে হোতব্য"মিতি বিধায় বিহিতং ব্যাহন্তি, "শ্যাবোঽস্যাহুতিমভ্যবহরতি য উদিতে জুহোতি, শবলোঽস্যাহুতিমভ্যবহরতি হেনুদিতে জুহোতি, শ্যাবশবলৌ বাঽস্যাহুতিমভ্যবহরতো যঃ সময়াধ্যুষিতে জুহোতি"। ব্যাঘাতাচ্চান্যতরন্-মিথ্যেতি।'- (ন্যায়ভাষ্য-২/১/৫৭)

অর্থাৎ :

হবনে অর্থাৎ উদিতাদি কালত্রয়ে হোমবিধায়ক বেদবাক্যে বিহিত ব্যাঘাত দোষবশত বেদের প্রামাণ্য নাই। কিভাবে? "উদিত কালে হোম করবে, অনুদিত কালে হোম করবে, সময়াধ্যুষিত কালে (সূর্য ও নক্ষত্রশূন্য কালে) হোম করবে"– এই বাক্যের দ্বারা কালত্রয়ে হোম বিধান করে আবার অপর বাক্যের দ্বারা বিহিতকে অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারা কালত্রয়ে বিহিত হোমকে ব্যাহত করা হয়েছে। সেই ব্যাঘাতক বাক্য কী? "যে ব্যক্তি উদিতকালে হোম করে, শ্যাব নামক কুকুর তাঁর আহুতি ভোজন করে। যে ব্যক্তি অনুদিত কালে হোম করে, শবল নামক কুকুর তাঁর আহুতি ভোজন করে। যে ব্যক্তি সময়াধ্যুষিত কালে হোম করে, শ্যাব ও শবল তাঁর আহুতি ভোজন করে"। ব্যাঘাতপ্রযুক্ত অর্থাৎ শেষোক্ত বেদবাক্যের সাথে পূর্বোক্ত বেদবাক্যের বিরোধবশত অন্যতর অর্থাৎ ঐ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে কোন একটি বাক্য মিথ্যা।

তার মানে, বেদে 'উদিত', 'অনুদিত' ও 'সময়াধ্যুষিত' নামক কালত্রয়ে হোমের বিধান করে পরে আবার ঐ কালত্রয়েই বিহিত হোমের নিন্দা করা হয়েছে; ফলত সেই নিন্দা দ্বারা পূর্বোক্ত কালত্রয়ে হোম অকর্তব্য, তাই বলা হয়েছে। সুতরাং পূর্বে যে বিধিবাক্যের দ্বারা কালত্রয়ে হোম কর্তব্য বলা হয়েছে, সেই বিধিবাক্যের সাথে শেষোক্ত অর্থবাদ-বাক্যের বিরোধ হওয়ায় তা প্রমাণ হতে পারে না। ঐ বিরোধবশত তার মধ্যে যে-কোনও একটিকে মিথ্য বলতেই হবে। কালত্রয়ে হোমের কর্তব্যতাবোধক বাক্য মিথ্যা অথবা কালত্রয়ে হোমের নিন্দাবোধক শেষোক্ত বাক্য মিথ্যা। তাছাড়া যিনি ঐরূপ বিরুদ্ধার্থক বাক্যবাদী, তিনি আপ্ত

হতে পারেন না। প্রমত্ত ব্যক্তিকে আপ্ত বলা যায় না। সুতরাং তাঁর কোনও বাক্যই আপ্তবাক্য না হওয়ায় তা প্রমাণ হতে পারে না।

এছাড়াও পুনরুক্তি বা একই শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখের দোষ বেদবচনে আরোপিত হয়েছে। বেদে পুনরুক্তদোষ আছে– এটি চার্বাকমতে বেদের অপ্রামাণ্যের তৃতীয় হেতু। এই চার্বাকী যুক্তির বর্ণনায় 'ন্যায়ভাষ্যে' বলা হয়েছে–

'পুনরুক্তদোষাচ্চ অভ্যাসে দেশ্যমানে। "ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ, ত্রিরুত্তমা"মিতি পুনরুক্তদোষো ভবতি, পুনরুক্তঞ্চ প্রমত্তবাক্যমিতি। তস্মাদপ্রমাণং শব্দোহনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষেভ্য ইতি।'- (ন্যায়ভাষ্য-২/১/৫৭)

অর্থাৎ :

বিধীয়মান অভ্যাসে অর্থাৎ মন্ত্রবিশেষের অভ্যাস বা পুনরাবৃত্তির বিধায়ক বেদবাক্যে পুনরুক্ত-দোষবশত বেদের প্রামাণ্য নাই। কিভাবে? "প্রথম মন্ত্রকে তিনবার অনুবচন করবে, অন্তিম মন্ত্রকে তিনবার অনুবচন করবে"– এতে অর্থাৎ এই বেদবাক্যের দ্বারা প্রথম ও অন্তিম সামিধেনীর তিনবার পাঠের বিধান করায় পুনরুক্তদোষ হয়। পুনরুক্ত প্রমত্তবাক্য। অতএব অনৃত, ব্যাঘাত ও পুনরুক্তদোষ-বশত শব্দ অর্থাৎ বেদনামক শব্দবিশেষ অপ্রমাণ।

বেদে তথা তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ-৩/৫) এগারটি 'সামিধেনী' অর্থাৎ অগ্নিপ্রজ্জ্বলন-মন্ত্র পঠিত হয়েছে। অথচ শতপথ-ব্রাহ্মণে (শতপথ ব্রাহ্মণ-১/৩/৫) পনেরটি সামিধেনী মন্ত্রের পাঠ বিহিত হয়েছে, এবং বলা হয়েছে হোতা পঞ্চদশ সামিধেনী মন্ত্র পাঠ না করলে যজ্ঞ নিষ্ফল হবে। এজন্য এই এগারটি সামিধেনী মন্ত্রের প্রথম ও শেষ মন্ত্রটি তিন তিনবার পাঠের বিধান করা হয়েছে। একই মন্ত্রকে তিনবার উচ্চারণ করলে পুনরুক্তি হয়। প্রমত্ত ব্যক্তিই ঐরূপ পুনরুক্তি করে। আর পুনরুক্ত হলে তা প্রমত্ত-বাক্যই বলতে হবে। প্রমত্ত ব্যক্তি আপ্ত নন, সুতরাং তাঁর বাক্য আপ্তবাক্য না হওয়ায় তা প্রমাণ হতে পারে না। অতএব পূর্বোক্তভাবে, চার্বাক-মতে, প্রথমত অনৃত, দ্বিতীয়ত ব্যাঘাত ও তৃতীয়ত পুনরুক্ত দোষবশত বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না।

এভাবে বেদের মধ্যে আরো অনেক স্ববিরোধ অপরিদৃষ্ট নয়। যেমন বেদের কোথায়ও 'মা হিংস্যাৎ' এই বচনের দ্বারা হিংসা বা জীবহত্যা কোথায়ও নিষিদ্ধ হয়েছে, আবার বিরুদ্ধার্থক অপর বচনের দ্বারা গোহত্যা অনেক ক্ষেত্রে বেদের সমর্থন লাভ করেছে। আরও দেখা যায়, একটি মন্ত্রে রুদ্রের সংখ্যা এক, আবার অপর একটি মন্ত্রে এই সংখ্যা বহু। বেদবিদদের মধ্যেও আবার দুটি দল– কর্মবাদী (যেমন পূর্ব-মীমাংসক) ও জ্ঞানবাদী (যেমন উত্তর-মীমাংসক বা বৈদান্তিক)। এই দুটি দলের মধ্যে পারস্পরিক বিরুদ্ধাচরণের প্রবণতা বেদের মধ্যে সুপরিস্ফূট। এইভাবেও ব্যাঘাত বা বিরুদ্ধাচরণের দোষে দুষ্ট বৈদিক মন্ত্র চার্বাক মতে প্রামাণ্যের মর্যাদা লাভের যোগ্য নয়। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' এই চার্বাকী যুক্তির বিবরণ পাওয়া যায়–

'বৈদিকন্মন্যৈরেব ধূর্ত্তবকৈঃ পরস্পরং কর্মকাণ্ড-প্রামাণ্যবাদিভিঃ জ্ঞানকাণ্ডস্য জ্ঞানকাণ্ড-প্রামাণ্যবাদিভিঃ কর্মকাণ্ডস্য চ প্রতিক্ষিপ্তত্বেন।'- (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ :
(চার্বাক বলেন) বৈদিকমনা ধূর্তবক কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্যবাদী মীমাংসকগণ ও জ্ঞানকাণ্ডের প্রামাণ্যবাদী বেদান্তিগণ পরস্পর বেদের জ্ঞানকাণ্ডের ও কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য খণ্ডন করেছেন, অর্থাৎ মীমাংসক জ্ঞানকাণ্ডের এবং বেদান্তী কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য খণ্ডন করেছেন। পরস্পর পরস্পরের প্রামাণ্য খণ্ডন করায় সমস্ত বেদেরই প্রামাণ্য খণ্ডিত হয়েছে।

এখানে বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বিষয়ে মীমাংসক ও বেদান্তীদের মধ্যে বিরোধটা কোথায়? 'সর্বদর্শনসংগ্রহে'র ভাষ্যে চার্বাকের বক্তব্য ও ব্যাখ্যায়, যাজ্ঞিক কর্ম মীমাংসকের বক্তব্য হলো, যে বাক্য বা বাক্য সমূহের দ্বারা পুরুষের কোন ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি ও কোন ক্রিয়া থেকে নিবৃত্তি জন্মায়, তাই শাস্ত্র। শাস্ত্র হিত বিষয় উপদেশ করেন। যা হিত ও প্রয়োজনবৎ অর্থের বোধ জন্মায়, তা প্রমাণ হয়ে থাকে। বেদের কর্মকাণ্ড বিধেয় ও নিষেধ্য ক্রিয়ার উপদেশ করে পুরুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বোধ জন্মায় বলে প্রমাণ হয়েছে। জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ বা বেদান্ত কোন ক্রিয়ার উপদেশ করেনি। সে ব্রহ্মকে উপদেশ করেছে। ব্রহ্ম ক্রিয়া বা সাধ্য নয়। তা দ্বারা কারও প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি জন্মে না। ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু। সিদ্ধ বস্তুতে শব্দের শক্তিজ্ঞান সম্ভব নয় বলে বেদান্ত ব্রহ্মের বোধও জন্মাতে পারে না। অতএব তা শাস্ত্রও নয়, প্রমাণও নয়। কর্ম-মীমাংসক এভাবে বেদান্তের প্রামাণ্য খণ্ডন করেছেন। অন্যদিকে জ্ঞানকাণ্ডী বেদান্তিরা বলছেন যে, যে বাক্য বা বাক্যসমূহ হিত উপদেশ করে, তাই শাস্ত্র, তাই প্রমাণ। ক্রিয়ার ফল স্বর্গাদি অনিত্য। তার বিনাশ আছে। ব্রহ্মজ্ঞানের ফল ব্রহ্মস্বরূপের প্রাপ্তি। তা-ই মুক্তি। তা নিত্য। তার বিনাশ নাই। তাই কর্ম অপেক্ষা ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। বেদান্ত সেই ব্রহ্মের উপদেশ করেছে। বিচার সহকারে বেদান্ত বাক্য থেকে ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ বৃত্তি উৎপন্ন হলে তা সমস্ত দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যার উচ্ছেদ করে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি জন্মায়, আর কখনও তার দুঃখ সম্বন্ধ হয় না।
বেদান্তিরা আরও বলেন, আর যে কর্ম-মীমাংসক বলেছেন– সিদ্ধ বস্তুতে শক্তিজ্ঞান হয় না, তাও সঙ্গত নয়। আনয়ন ও নয়নাদি ক্রিয়া দ্বারা যেমন কার্যে বা কার্যবিশিষ্ট অর্থে শক্তিজ্ঞান হয়। তদ্রূপ হর্ষ, ভয়, শোক প্রভৃতি দ্বারা সিদ্ধ বস্তুতেও শক্তিজ্ঞান হয়ে থাকে। ব্রহ্মশব্দের ব্রহ্মে শক্তি জ্ঞান হলে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যের দ্বারা পরম পুরুষার্থের সাধক ব্রহ্ম স্বরূপের অনুভব উৎপন্ন হবে। কর্মকাণ্ড পুরুষার্থ নির্বাহের জন্য প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিকে আশ্রয় করেছে। বেদান্ত কর্মজনিত শ্রম বিনাই পুরুষার্থ সম্পাদন করে বলে তা অবশ্যই শাস্ত্র হবে। বিশেষ, বিহিত ক্রিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজক বলে এগুলি গৌণ প্রয়োজন, মুখ্য প্রয়োজন নয়। সুতরাং কর্মকাণ্ড প্রয়োজনবৎ অর্থের বোধক নয় বলে প্রমাণ নয়, বেদান্তই প্রমাণ। এই বলে বেদান্তিগণ কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য খণ্ডন করেছেন। ফলে সম্পূর্ণ বেদের প্রামাণ্য খণ্ডিত হওয়ায় বেদকে প্রমাণ বলা যায় না। এরই সমর্থনে 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' প্রামাণিক চার্বাক-ষষ্ঠির সমর্থন উদ্ধৃত করা হয়েছে (চার্বাকষষ্ঠি-২৪)–

‘প্রলাপমপি বেদস্য ভাগং মন্যধ্ব এব চেৎ ।
কেনাভাগ্যেন দুঃখান্ন বিধীনপি তথেচ্ছথ।।’ (সর্বদর্শনসংগ্রহ)।।
অর্থাৎ : (চার্বাক বলেন,) যদি বেদের অংশবিশেষকেও প্রলাপোক্তি বলেই মেনে থাক, তবে কোন্ দুর্ভাগ্যবশে দুঃখকর বিধানগুলোকে তেমন স্বীকার করছ না?

এর তাৎপর্য হলো, কেবল বেদান্তিরাই যে কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য খণ্ডন করেছেন, তাই নয়। কর্ম-মীমাংসকরাও কোন বিষয় থেকে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জন্মায় না বলে কর্মকাণ্ডের অর্থবাদ ভাগ, মন্ত্রভাগ ও নামধেয় ভাগকে অপ্রমাণ বলায় ফলত সম্পূর্ণ বেদকেই অপ্রমাণ বলেছেন। কারণ বেদের একটি ভাগ প্রমাণ, অপর ভাগগুলিকে অপ্রমাণ বলা যায় না। তাতে ‘অৰ্দ্ধজরতীয় ন্যায়’-এর উপস্থিতি হয়। অর্ধেক একরূপ, অন্য অর্ধ অন্যরূপ হলে তাকে ন্যায়ের পরিভাষায় অৰ্দ্ধজরতী বলে। যেমন একটি কুকুরের অর্ধেক দেহ যৌবনবিশিষ্ট, অপর অর্ধদেহ বার্ধক্য-বিশিষ্ট হলে ঐ কুকুরটিকে অৰ্দ্ধজরতী বলা যায়। তা যেমন অর্ধেক পাকের জন্য এবং অর্ধেক ডিম্বপ্রসবের জন্য হয় না। তেমনি অর্ধেক প্রমাণ, অর্ধেক অপ্রমাণ হতে পারে না। সুতরাং, চার্বাক মতে, বেদ প্রলাপ বাক্য। তা কখনও প্রমাণ হতে পারে না। জীবিকা নির্বাহ ছাড়া এর কোনো প্রয়োজন নেই।

(৪)
জৈমিনির ‘পূর্বমীমাংসাসূত্রে’ পূর্বপক্ষ হিসেবে বেদবিরোধীদের যে মত উদ্ধৃত হয়েছে তার সঙ্গে চার্বাক মতের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। সূত্রবর্ণিত পূর্বপক্ষীয় মত অনুসারে–
‘ইহার চারটি শৃঙ্গ, তিনটি চরণ, দুইটি মস্তক এবং সাতটি হস্ত’, বেদমন্ত্রে (ঋকবেদ-৪/৫৮/৩) অন্তর্ভুক্ত এই জাতীয় উক্তি অসম্ভব এবং অবাস্তব পদার্থের বিদ্যমানতার উল্লেখ করে।
‘হে ওষধি, তুমি একে রক্ষা কর; হে কুঠার তুমি একে হিংসা করো না; হে প্রস্তর সমূহ, তোমরা শোন’– ইত্যাদি মন্ত্রে ওষধি, প্রস্তর, কুঠার ইত্যাতি জড় বস্তুসমূহের সম্বোধন করার বৈদিক প্রচেষ্টা হাস্যকর।
‘বেদমন্ত্রে পরস্পর বিরোধিতার উদাহরণ হিসেবে পূর্বমীমাংসাসূত্রে বর্ণিত পূর্বপক্ষে ‘অদিতিই দ্যৌ এবং অদিতিই অন্তরীক্ষ’ ও ‘রুদ্র একজন দ্বিতীয় নাই এবং জগতে অসংখ্য সহস্র রুদ্র’– এই মন্ত্রগুলির উল্লেখ আছে।
‘সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতূ’ ‘ইন্দ্রঃ সোমস্য কাণুকা’ ইত্যাদি মন্ত্রের কোন অর্থ হয় না। (শাবরভাষ্য-মীমাংসাসূত্র-১/২/৩৪-৮)

এছাড়া– ‘বেদের নিত্যত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্বের খণ্ডন প্রসঙ্গে এই পূর্বপক্ষীয় মতে কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে যে, বেদে ‘কীকট’ নামে জনপদ, ‘প্রমঙ্গদ’ নামে রাজা, ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে এই সব জনগদ বা নরপতির অস্তিত্বের পরবর্তী বেদের রচনাকাল। বেদের কোন কোন অংশে প্রাবাহণি উদ্দালকি ইত্যাদি মরণশীল

মানুষের উল্লেখ আছে। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে বেদের এই বিশেষ অংশসমূহ উল্লিখিত ব্যক্তিগণের অস্তিত্বের পরবর্তী যুগে রচিত। কাঠক, পৈপ্পলাদ, কৌথুম ইত্যাদি বেদ শাখাগুলির বিশেষ বিশেষ নামের মধ্যেও কঠ, পিপ্পলাদ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বেদকর্তার অস্তিত্বের পরিচয় সুপরিস্ফূট। কাজেই বেদকে নিত্য বা অপৌরুষেয় মনে করার কোন কারণ নেই,– বেদবিরোধীদের এটাই অভিমত এবং জৈমিনির মীমাংসাসূত্রে পূর্বপক্ষ হিসাবে এই মতের উল্লেখ দেখা যায়।
পূর্বমীমাংসাসূত্রের শবরস্বামীকৃত ভাষ্যে (শাবরভাষ্য-১/১/৫) বেদের অপ্রামাণ্যবাদীদের মতের এক বিবরণ দেখা যায়। এই মত অনুসারে যে বস্তুর উপলব্ধি বিষয়বোধের সঙ্গে একাত্ম নয় তাকে অসৎ বলা উচিত– উদাহরণ হিসাবে এ ক্ষেত্রে তাঁরা শশশৃঙ্গের উল্লেখ করেন। পশু প্রভৃতির বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার্য নয়, কিন্তু পশুকামী ব্যক্তি পশুলাভের আশায় যজ্ঞ করা সত্ত্বেও কাম্য পশু অদৃশ্যই থাকে। যে কোন ক্রিয়ার ফল হিসাবে কোন বস্তুর সদ্ভাবকে স্বীকার করতে হলে ক্রিয়ার সমকালীন বস্তুটির আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজন। শরীরের মর্দনজনিত সুখ শরীর মর্দন করার সময়েই হয়, পরে নয়। বেদের অপ্রামাণ্যবাদীদের মত অনুসারে বৈদিক যজ্ঞে যে ফলের প্রতিশ্রুতি থাকে সেই ফল যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সময়ে উৎপন্ন হয় না। প্রতিশ্রুত ফলের সদ্ভাব যখন দেখা যায় যজ্ঞ সে সময় অবিদ্যমান থাকে। অবিদ্যমান এই যজ্ঞকে ফলের কারণ হিসাবে কল্পনা করার স্বপক্ষে বেদবিরুদ্ধবাদীরা কোন যুক্তি দেখতে পান না। ফলপ্রাপ্তির সমকালীন অন্য নানা উপায়ের বর্তমানতা দেখা যায়, যেগুলিকে স্পষ্টভাবে এই ফলের কারণরূপে নির্দেশ করা যেতে পারে। শাবরভাষ্যে উল্লিখিত এই মত অনুসারে দৃষ্ট এই সব কারণগুলিকে উপেক্ষা করে অদৃষ্ট বৈদিক যজ্ঞাদিকে এই ফলের কারণ হিসাবে উল্লেখ করার কোন অর্থ হয় না। স্বর্গ ইত্যাদি অদৃষ্ট হলেও বৈদিক যজ্ঞসমূহের কারণতা স্বীকার করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।’- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১২৮-৯)

শ্রীহর্ষের ‘নৈষধীয়’ কাব্যে চার্বাক মতের মাধ্যমে বৈদিক ক্রিয়াপদ্ধতির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। যাজকদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ফল হিসেবে তাঁরা পুত্রলাভকে নির্দেশ করেন। পুত্রজন্মের বিকল্প পুত্রজন্মগ্রহণ না করা, এবং এই দুটি বিকল্পের একটিকে ফল হিসেবে যজ্ঞকারী লাভ করতে বাধ্য। যজ্ঞকারীর পুত্রলাভ হলে ধূর্ত যাজকেরা তাঁদের নির্দেশিত যজ্ঞকেই পুত্রলাভের কারণ হিসেবে প্রচার করেন। পুত্র জন্মগ্রহণ না করার ক্ষেত্রে যাজকেরা যজ্ঞের অঙ্গবৈকল্যকে সমস্ত ব্যাপারের জন্য দায়ী করেন। তাঁরা মন্তব্য করেন যে যজ্ঞানুষ্ঠান যথাবিহিত নিয়মানুসারী না হওয়ার ফলে যজমান যজ্ঞের মাধ্যমে অভিলষিত ফললাভে বঞ্চিত হয়েছেন। চার্বাকষষ্ঠিতে তাই বলা হয়েছে–

‘একং সন্দিগ্ধয়োস্তাবদ্ ভাবি তত্রেষ্টজন্মনি।
হেতুমাহুঃ স্বমন্ত্রাদীনসঙ্গানন্যথা বিটাঃ।।’ (চার্বাকষষ্ঠি-১৯)।।
অর্থাৎ : উভয়পক্ষে সন্দেহের মধ্যে একটি অবশ্যই হবে। তার মধ্যে ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তি হলে ধূর্তেরা নিজেদের মন্ত্র প্রভৃতিকে তার কারণ বলে, অন্যথা হলে সেগুলোর অঙ্গহানি উল্লেখ

করে।

শ্রীহর্ষের বর্ণনা অনুযায়ী ধূর্ত ব্রাহ্মণদের এ ধরনের কৈফিয়ৎ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। চার্বাক মতে বেদের কোন কোন অংশের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদন করার পর অবশিষ্ট অংশকে প্রামাণ্যের মর্যাদা দেওয়া অর্থহীন; কারণ এতে অনবস্থা দোষের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' আমরা অনুরূপ আলোচনা পর্যবেক্ষণ করেছি। সুতরাং বেদের কোন অংশই প্রমাণ নয়– এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই শ্রেয়। 'নৈষধীয়'তে যে চার্বাকদের মত আলোচিত হয়েছে তাঁরা বৈদিক বচনে পরলোকের অস্তিত্বে সন্দেহের বিষয় উল্লেখ করেছেন। বৈদিক সাহিত্যের একেক জায়গায় একেক ধরনের পরলোকীয় বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। পরলোক প্রসঙ্গে বেদ বচনেই যখন সন্দেহ বর্তমান, তখন বেদবাক্যে আস্থাবান ব্যক্তিদের পরলোক সম্বন্ধীয় চার্বাকী ধারণায় ত্রুটির অনুসন্ধান করা অসমীচীন। আর পরলোক প্রসঙ্গে চার্বাকষষ্ঠিতে বলা হয়েছে–

'কো হি বেদাস্ত্যমুষ্মিন্ বা লোকে ইত্যাহ যা শ্রুতিঃ।
তৎপ্রামাণ্যাদমুং লোকং লোকঃ প্রত্যেতু বা কথম্ ।।' (চার্বাকষষ্ঠি-২৬)।।
অর্থাৎ : কে জানে পরলোকে (সুখ) আছে কি-না– এইভাবে যে বেদ বলেছে, তাকে প্রমাণ ধরে নিয়ে পরলোক সম্বন্ধে লোকে কীভাবে বিশ্বাস করবে?

বেদ এবং বেদানুসারী ধর্মশাস্ত্রসমূহের বচনে নানা ভাবে ব্রহ্মচর্যের বিধান আছে; মানুষের উচ্ছৃঙ্খল কাম প্রবৃত্তিকে সংযত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপদেশ এই গ্রন্থগুলিতে প্রচারিত। 'নৈষধীয়'র অন্তর্গত চার্বাকী মতে বৈদিক দেবতা এবং ধর্মশাস্ত্রকারদের ব্যক্তিগত চরিত্রে অসংযম এবং উচ্ছৃঙ্খলতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা হয়েছে। চার্বাক-ষষ্ঠিতে বলা হয়েছে–

'পরদারনিবৃত্তির্যা সোহয়ং স্বয়মনাদৃতঃ।
অহল্যাকেলিলোলেন দম্ভো দম্ভোলিপাণিনা।।' (চার্বাকষষ্ঠি-৭)।।
'গুরুতল্পগতৌ পাপকল্পনাং ত্যজত দ্বিজাঃ।
যেষাং বঃ পত্যুরত্যুচ্চৈর্গুরুদারগ্রহে গ্রহঃ।।' (চার্বাকষষ্ঠি-৮)।।
'যস্ত্রিবেদবিদাং বন্দ্যঃ স ব্যাসোহপি জজল্প বঃ।
রামায়া জাতকামায়াঃ প্রশস্তা হস্তধারণা।।' (চার্বাকষষ্ঠি-১১)।।
'বলাৎ কুরুত পাপানি সন্তু তান্যকৃতানি বঃ।
সর্বান্ বলকৃতান্ দোষানকৃতান্ মনুরব্রবীৎ ।।' (চার্বাকষষ্ঠি-১৩)।।
'ন ভ্রাতুঃ কিল দেব্যাং স ব্যাসঃ কামাৎ সমাসজৎ।
দাসীরতস্তদাসীদ্ যন্মাত্রা তত্রাপ্যদেশি কিম্ ।।' (চার্বাকষষ্ঠি-৩০)।।
অর্থাৎ :
পরস্ত্রী থেকে যে নিবৃত্ত থাকা– সেটা হলো দম্ভ। বজ্রপাণি ইন্দ্র অহল্যার সঙ্গে কামক্রীড়ায় তৎপর হয়ে স্বয়ং তা উপেক্ষা করেছেন। (চার্বাকষষ্ঠি-৭)।। ওহে ব্রাহ্মণের দল! তোমরা

এমন, যাদের পতি চাঁদের গুরুপত্নী সম্ভোগে অত্যন্ত আগ্রহ। অতএব গুরুপত্নী সম্ভোগে যে পাপ তার কল্পনা ত্যাগ কর। (চার্বাকষষ্ঠি-৮)।। ত্রিবেদজ্ঞ পণ্ডিত তোমাদের আরাধ্য ব্যাসদেবও বলেছেন– কামার্ত রমণীর হস্তধারণ যুক্তিযুক্ত। (চার্বাকষষ্ঠি-১১)।। জোর করে পাপ কর, সে-সব তোমাদের না-করা হিসেবে থাকবে। মনুই তো বলেছেন– বলপূর্বক সব কিছু করে ফেলা তো না-করা দোষ। (চার্বাকষষ্ঠি-১৩)।। ঐ ব্যাস ভ্রাতৃবধূর প্রতি নাকি কামবশে আসক্ত হয় নি। তখন দাসীর সঙ্গে সে যে রত ছিল, তাতেও কি মা আদেশ করেছিলেন? (চার্বাকষষ্ঠি-৩০)।।

এই দৃষ্টান্তগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বেদানুসারী নীতিবাক্যগুলির অর্থহীনতায় কোন সন্দেহ থাকে না। যে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ক্রোধ সংযত করতে অসমর্থ তাঁরাই নানাভাবে ক্রোধকে দমন করার পরামর্শ দেন–

'অক্রোধং শিক্ষয়ন্ত্যন্যৈঃ ক্রোধনা যে তপোধনাঃ।
নির্ধনাস্তে ধনায়ৈব ধাতুবাদোপদেশিনঃ।।' (চার্বাকষষ্ঠি-৪৪)।।
অর্থাৎ : যে ক্রোধী তপস্বীরা অপরকে ক্রোধের অভাব বিষয়ে শিক্ষা দেয়, তারা নির্ধন হওয়ায় ধনের জন্যই ধাতুবিষয়ক কথার উপদেশ দেয়।

বেদাদি শাস্ত্রসমূহের প্রবক্তা ব্রাহ্মণদের নিজস্ব আচরণ এবং নির্দেশনার মধ্যে এ ধরনের পরস্পর-বিরোধিতার প্রচুর নমুনা থাকায় চার্বাকেরা এঁদের উপদেশ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী বিচরণ করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন–

'শ্রুতিস্মৃত্যর্থবোধেষু ক্কৈকমত্যং মহাধিয়াম্ ।
ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষা সা নোপেক্ষ্যা সুখোন্মুখী।।' (চার্বাকষষ্ঠি-১৫)।।
অর্থাৎ : বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের অর্থবোধের বিষয়ে মহাজ্ঞানীদের মধ্যে কোথায় ঐকমত্য রয়েছে? ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলের উপর নির্ভরশীল। সুখের অভিমুখী ব্যাখ্যা উপেক্ষণীয় নয়।

(৫)
বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত লোকায়ত বৃহস্পতিবচনের মধ্যে লৌকিক ব্যবহারের সঙ্গে তুলনায় বৈদিক অনুষ্ঠানগুলির অযৌক্তিকতা এবং অর্থহীনতা প্রতিপাদনের চেষ্টা দেখা যায়। যেমন, শ্রীহর্ষের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র বর্ণনায় বার্হস্পত্য-মতে যজ্ঞের সাক্ষাৎ ফল হলো–

'কর্তৃক্রিয়াদ্রব্যবিনাশ'। (প্রবোধচন্দ্রোদয়)
অর্থাৎ, তার তাৎপর্য্য হলো, মৃত্যুর মাধ্যমে যজ্ঞকর্তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, যজ্ঞানুষ্ঠানের পরেই যজ্ঞক্রিয়া অতীতের গহ্বরে প্রবেশ করে, যজ্ঞে ব্যবহৃত দ্রব্যাদিও কিছুক্ষণের মধ্যে বিনষ্ট হয়।

আর তাই 'সর্বমতসংগ্রহ' গ্রন্থে এই বৃহস্পতির মত বর্ণনায় বলা হয়েছে–

'স্বর্গঃ কর্তৃক্রিয়াদ্রব্যবিনাশে যদি যজনাম্ ।
ততো দাবাগ্নিদগ্ধানাং ফলং স্যাদ্ ভুরি ভুরুহাম্ ।।' (সর্বমতসংগ্রহ)

অর্থাৎ : (বার্হস্পত্যরা বলেন,) যে অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত সব অংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তার সাহায্যে যদি যজ্ঞকারীর জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মোচিত হয়, তাহলে দাবানলে বনের যাবতীয় বৃক্ষ ভস্মীভূত হবার পরও সেই বিনষ্ট বৃক্ষ থেকে আমরা অনুরূপভাবে প্রচুর ফল আশা করতে পারি।

বেদমতে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে পশুকে বলি দেওয়া হয় সেই পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। বৃহস্পতিবচনে ঐ ক্ষেত্রে মন্তব্য করা হয়েছে, যা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি, এই বিশ্বাস যজ্ঞে পশুবলির প্রকৃত কারণ হলে যজমান পশুর পরিবর্তে নিজ পিতাকেই যজ্ঞের বলি হিসেবে মনোনীত করতে পারেন; কারণ, পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠেয় ব্যয়সাপেক্ষ অন্য পদ্ধতির তুলনায় এই উপায় অনেকাংশে সহজতর।–

'পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে।।' (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু যদি সরাসরি স্বর্গেই যায়, তাহলে যজমান কেন নিজের পিতাকে হত্যা করে না? (অর্থাৎ, স্বর্গে যাবার অমন সোজা সড়ক থাকতেও যজমান কেন নিজের পিতাকে তা থেকে বঞ্চিত করে?)

চার্বাক মতে দেহনাশের পরই জীবের যাবতীয় অস্তিত্বের অবসান। কাজেই মানুষের মরণোত্তর আত্মার তৃপ্তি বিধানের জন্য শ্রাদ্ধাদি যে সব অনুষ্ঠানের বিধান বেদে আছে, চার্বাকী বর্ণনায় সেগুলিকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। নির্বাপিত দীপ যেমন ঘৃত ইত্যাদির যথেষ্ট সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও আলোকদানে অক্ষম, জীবনদীপ যে ব্যক্তির নির্বাপিত হয়েছে সেও এইভাবে শ্রাদ্ধের মাধ্যমে উৎসর্গীকৃত বিবিধ ভোজ্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও ভোজনরহিত তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় না। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' ও 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' একই নমুনা শ্লোক উদ্ধৃত করে এই চার্বাকী মনোভাব উপস্থাপন করা হয়েছে।–

'মৃতানামপি জন্তূ'নাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারণম্।
নির্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্ধয়েৎ শিখাম্।।' (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : কেউ মারা যাবার পর শ্রাদ্ধকর্ম যদি তার তৃপ্তির কারণ হয়, তাহলে তো প্রদীপ নিভে যাবার পরেও তেল ঢেলে তার শিখা প্রদীপ্ত করা যেতো।

আসলে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানের মূলে অন্তর্নিহিত এই ধারণার স্বীকৃতি থাকে যে ভোজ্যবস্তুর কাছে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত না থেকেও ভোজ্যবস্তু উপভোগ করা সম্ভব– যার ভিত্তিতে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে অনুপস্থিত মৃত আত্মার পক্ষেও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে দেয় ভোজ্যবস্তুর মাধ্যমে পরিতৃপ্তির অধ্যাত্মবাদী কল্পনাতে কোন অসঙ্গতি দেখা যায় না। কিন্তু চার্বাক মতে এ জাতীয় ধারণায় প্রকৃত সার্থকতা থাকলে দূরযাত্রী পথিক সঙ্গে কোনদিন খাদ্যাদি বহন করতো না; কারণ, গৃহের অভ্যন্তর থেকে কোন ব্যক্তি যদি তার উদ্দেশ্যে ভোজ্য উৎসর্গ করতো তাহলেই পথে তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হতো। অনুরূপভাবে এক গৃহের অন্তর্গত অধিবাসীদের প্রত্যেকের

কাছে খাদ্য সরবরাহ করারও কোন প্রয়োজন হতো না, উপরের তলার ব্যক্তিরা নীচের তলায় রাখা খাবারের সাহায্যেই উদরপূর্তি করতে সক্ষম হতো। এটিই চার্বাক মত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। যেমন–

'গচ্ছতামিহ জন্তূ'নাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্।
গেহস্থকৃতশ্রাদ্ধেন পথি তৃপ্তিরবারিতা।।'
'স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে ।।' (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ :
যে পৃথিবী ছেড়ে গেছে তার পাথেয় (পিণ্ড) কল্পনা করা বৃথা, কেননা তাহলে ঘর ছেড়ে কেউ গ্রামান্তর গমন করলে ঘরে বসে তার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিলেই তো তার পাথেয়-ব্যবস্থা সম্পন্ন হতো। (অর্থাৎ গ্রামান্তরগামীর পক্ষে তো তাহলে পাথেয় হিসেবে চাল-চিঁড়ে বয়ে নিয়ে যাবার দরকার হতো না।)।। যিনি স্বর্গে গেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে দান নেহাতই বৃথা, কেননা তাহলে যিনি প্রাসাদের উপরে উঠে গেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে (মাটিতে বসে) দান করলেও তো তাঁর তৃপ্তি হবার কথা।।

'রামায়ণে' জাবালির মাধ্যমে যে চার্বাক মতবাদের প্রকাশ, বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ তার ভিতরও সুপরিস্ফূট। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিরোধিতা প্রসঙ্গেও জাবালি একই ধরনের যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন–

'অষ্টকাপিতৃদৈবত্যমিত্যয়ং প্রসৃতো জনঃ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতো হি কিমশিষ্যতি।।
যদি ভুক্তমিহান্যেন দেহমন্যস্য গচ্ছতি।
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তৎ পথ্যদানং ভবেৎ।।' (রামায়ণ-২/১০৮/১৪-৫)
অর্থাৎ :
শ্রাদ্ধে অর্পিত পিণ্ড-অষ্টক বা ভোজ্য বস্তুর দ্বারা যদি পরলোকস্থিত আত্মার ভোজনস্পৃহা নিবৃত্ত হয়, তাহলে একইভাবে প্রবাসী এবং দূরগামী ব্যক্তিরাও তৃপ্তি পেতে পারেন। বৈদিক শ্রাদ্ধের যাঁরা নির্দেশ দেন শ্রাদ্ধের বিধানের পরিবর্তে তাঁদের এইভাবে ইহলোকস্থ নিজ নিজ বন্ধু ও আত্মীয়ের পথ্য-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত ছিলো।

'বিষ্ণুপুরাণে' নাস্তিকবাদী মায়ামোহকৃত বেদ ও বৈদিক যাগযজ্ঞের নিন্দার মধ্যে পশুবলি ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিরোধিতা প্রাধান্য লাভ করেছে। যজ্ঞে পশুবধের সমর্থনে বেদবিহিত নির্দেশ এই মতে অযৌক্তিক। তাই সেখানে বলা হয়েছে–

'নৈতদ যুক্তিসহং বাক্যং হিংসা ধর্মায় নেষ্যতে।' (বিষ্ণুপুরাণ-৩/১৮/২৪)
অর্থাৎ : অযৌক্তিক হিংসার পথে কখনও ধর্মের অনুষ্ঠান হতে পারে না।

'যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতির মাধ্যমে যজ্ঞকারী তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ফলের অধিকারী হতে পারেন–

বেদের এ ধরনের বিধানকে মায়ামোহের উক্তিতে বালকের বচন বলা হয়েছে; কারণ, পরিণতবুদ্ধি কোন ব্যক্তির মুখে এ জাতীয় বাক্য শোভা পায় না। যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতার ভোজ্য হিসেবে শমী ইত্যাদি কাষ্ঠের ব্যবহার প্রসিদ্ধ। এই সব কাষ্ঠের তুলনায় পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত কোমল বৃক্ষপত্র গুণগত বিচারে শ্রেয়ত্বের দাবি রাখে। 'বিষ্ণুপুরাণে'র অন্তর্গত নাস্তিক মত অনুসারে বেদের নির্দেশ কার্যত এই সব দেবতাদের পশু অপেক্ষাও হীন প্রতিপন্ন করে।'- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১৩২)

বৈদিক যজ্ঞগুলির অন্তর্ভুক্ত কোন কোন ক্রিয়াপদ্ধতি শালীনতার মাপকাঠির বিচারে সমর্থনযোগ্য নয় বলে মনে করা হয়। এই প্রসঙ্গে অশ্বমেধ যজ্ঞের নাম উল্লেখযোগ্য। 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' উদ্ধৃত বৃহস্পতি বচনে অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গীভূত কোন বিশেষ আচারের নিন্দা দেখা যায়। এই জাতীয় অশ্লীল আচারের যাঁরা বিধান দেন বৃহস্পতিবচনে তাঁদেরকে 'ভণ্ড' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়েছে–

'অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নং তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্তিতম্ ।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরং চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্তিতম্।
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচর-সমীরিতম্।।' (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : (বৃহস্পতি বলেন,) সেই ভণ্ডরাই বিধান দিয়েছেন, অশ্বমেধ-যজ্ঞে যজমান-পত্নী অশ্বের শিশ্ন গ্রহণ করবে। তেমনি প্রতারকেরাই (নিশাচর) মাংস খাবার মতলবে (যজ্ঞে পশুবলির) বিধান দিয়েছেন।

(৬)
বৈদিক কর্মকাণ্ডকে ভারতীয় দর্শনকারেরা সকলে সমর্থন না করলেও বেদ সম্বন্ধে ছাঁচাছোলা চার্বাকী মন্তব্য যে বহুক্ষেত্রে বেদ সমর্থকদের বিরক্তি উৎপাদন করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বেদের প্রামাণ্য যুক্তির সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে না; কাজেই যুক্তির মাধ্যমে চার্বাকী আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে এঁদের ভূমিকা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত নয়। বৈদিক মন্ত্র ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে অলৌকিক জগতের ইঙ্গিত মেলে, সেই ইঙ্গিতের সূত্র ধরেই বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন তাদের মতবাদের ব্যবহারিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে। বেদের মাহাত্ম্যের মূলে আছে এই অলৌকিকত্ব। ফলে লৌকিক কোন প্রমাণের মাধ্যমে ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিরূপী এই কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য নিরূপণের প্রয়াস সার্থক হতে পারে না। এ ব্যাপারে বেদের প্রামাণ্যের সপক্ষে চার্বাক মতের সমালোচকদের (ন্যায়কুসুমাঞ্জলী-২/৩) এটাই বক্তব্য যে, বৈদিক কর্ম পদ্ধতি যাঁদের দ্বারা অনুমোদিত তাঁরা প্রকৃত সংযমী এবং সর্বপ্রকার প্রতারণার উর্ধ্বে। তাঁদের মতে বৈদিক কর্মকাণ্ড এই কারণেই উপেক্ষণীয় নয়।

বীতরাগ অথবা কৃতধর্মা পুরুষের উক্তি হিসেবে বেদকে অনেকে প্রামাণ্য দিতে ইচ্ছুক। বেদপ্রামাণ্যের সমর্থক এই দার্শনিকেরা যুক্তি দেখান যে, 'আপ্ত' সংজ্ঞায় পরিচিত এই ব্যক্তিদের বচন সব সময়েই অবিসংবাদী এবং সত্য। কারণ ক্ষীণদোষ এই পুরুষদের মিথ্যা

বলার কোন হেতু থাকতে পারে না। কিন্তু চার্বাকমতে বলা হয়, পুরুষের আপ্তসম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষের মাধ্যমে হতে পারে না। একমাত্র অনুমানের সাহায্যেই জানা সম্ভব কোনও ব্যক্তি প্রকৃত আপ্ত কিনা। কিন্তু এ ব্যাপারে অনুমানের কার্যকরিতা চার্বাকদের অনুমোদন সাপেক্ষ নয়।
চার্বাকেতর ভারতীয় দার্শনিকদের দ্বারা সাধারণভাবে স্বীকৃত তিনটি প্রমাণ– প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবাক্যের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। প্রমাণগুলির মধ্যে প্রথম দুটি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান সম্বন্ধে চার্বাকী মনোভাব ও সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দার্শনিকদের কাছে তৃতীয় প্রমাণ অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ বা আপ্তবাক্য বহুক্ষেত্রে বেদের সঙ্গে অভিন্ন। এই তৃতীয় প্রমাণ সম্বন্ধে চার্বাকী ধারণা কিরূপ তা বেদ বিষয়ে চার্বাকী মনোভাবের ইঙ্গিত আমরা ইতোমধ্যেই উপরিউল্লিখিত সীমিত আলোচনা থেকে পেয়ে গেছি নিশ্চয়ই। অধ্যায়ান্তরে উপস্থাপিত চার্বাকষষ্ঠির প্রামাণিক লোকগাথাগুলি এরকম আরো অনেক প্রামাণ্য-নজির বহন করে।

মোট কথা, বেদের প্রামাণ্য যে অলৌকিকতাকে কেন্দ্র করে, যুক্তি বা অন্য লৌকিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে যা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে প্রচারিত– চার্বাকেরা যুক্তির সাহায্যে তার আবরণ উন্মোচন করতে চেয়েছেন। এ প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা, অতীন্দ্রিয় যে জগতের অস্তিত্বের ইঙ্গিতে বেদবচনের প্রকৃত মাহাত্ম্য নিহিত, সেই অতীন্দ্রিয়তাই বহু ক্ষেত্রে যাজকসম্প্রদায়ের যথেচ্ছচারিতায় মাধ্যম হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চার্বাক মতবাদের আবির্ভাবের জন্য বৈদিক অলৌকিকতার এই অপপ্রয়োগকেই অনেকাংশে দায়ি করা চলে বলে মনে করা হয়। যথেচ্ছচারিতার পথের দিকে অলৌকিকতা বহু ক্ষেত্রেই প্রসারিত। তাই যাজক সম্প্রদায়ের অনাচার যাঁরা প্রতিহত করতে চেয়েছেন তাঁরা অলৌকিকতাকে প্রামাণ্যের আসর থেকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত করে এই যথেচ্ছচারিতার মূলোচ্ছেদে অগ্রসর হয়েছেন। ফলে চার্বাক মতবাদের আবির্ভাব বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের এই আতিশয্যের যুগে নির্ভুল লৌকিক প্রমাণের উপর এই দর্শনে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

চার্বাকী বস্তুবাদ প্রসঙ্গে আলোচনার এ-পর্যায়ে এসে নিশ্চয় এমন প্রশ্ন অস্বাভাবিক হবে না যে, চার্বাককে কী অর্থে বস্তুবাদী দর্শন বলা যায়? অর্থাৎ, কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের কারণে আমরা বলতে পারি যে চার্বাকদর্শন প্রকৃতই বস্তুবাদী দর্শন? এ প্রশ্নে উত্তর নির্ণয়ের সুবিধার্থে ছোট্ট একটি প্রাক্-প্রশ্নও মনে রাখা দরকার, বস্তুবাদের বিপরীতার্থক শব্দ যে ভাববাদ, যার প্রতিপক্ষ হয়ে চার্বাকেরা তাঁদের বস্তুবাদী সিদ্ধান্তগুলিতে অনড় অবস্থান নিয়েছে, সামান্য কথায় সেই ভাববাদ বলতেই বা কী বুঝি আমরা?

। বস্তুবাদ বনাম ভাববাদ।

সাধারণ অর্থে 'বস্তু' বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পদার্থ বিশেষ। এই যে প্রত্যক্ষগ্রাহ্যতা এটাই জ্ঞান। কোনকিছুকে আমরা এভাবেই জানি। প্রত্যক্ষগ্রাহ্যতার সাথে অস্তিত্বশীলতার প্রশ্ন জড়িত। এই অস্তিত্বশীল বস্তুকে ভারতীয় দার্শনিক পরিভাষায় বলা হয় 'সৎ-বস্তু'। আর অস্তিত্বহীন কোন বিষয়কে বলা যায় 'অসৎ'। সেক্ষেত্রে বস্তুবাদ বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয়াতীত কোন বিষয়কে স্বীকার না করা। অন্যদিকে ভাববাদ তার বিপরীত অবস্থানে। বাস্তব জীবনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তায় স্বীকার করেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। কিন্তু এই স্বাভাবিকতার বাইরে গিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের অতীত কোন অতীন্দ্রিয় সত্তায় স্বীকার করার যে রহস্যময় ভাববাদী প্রবণতা, তা কী করে মানব-চেতনায় অনুপ্রবেশ করলো এটি একটি জটিল প্রশ্ন বৈকি। মানুষের সকল কর্মই উদ্দেশ্য বিধায়ক, কোন-না-কোন উদ্দেশ্য এতে থাকবেই। কবে কখন কোথায় কীভাবে কোন্ উদ্দেশ্যে মানব-সভ্যতায় প্রথম এমন ভাববাদী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিলো তা নিশ্চয় করে বলার উপায় নেই। তবে সাধারণ দৃষ্টিতে তার একটি ব্যাখ্যা হাজির করা যেতে পারে।

'ধর্ম' শব্দটিকে ইংরেজিতে 'রিলিজিওন' অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু ধর্ম শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। 'রিলিজিওন' এই ব্যাপক অর্থের একটি সংকীর্ণ খণ্ডিত ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। 'রিলিজিওন'-এর অন্য কোনো উপযুক্ত প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না বলেই আমরা ধর্ম শব্দটি গ্রহণ করেছি। অথচ বস্তুর ধর্ম বললে বোঝা যায় বস্তুর স্বাভাবিক গুণাগুণ। যেমন তরলতা এবং নিম্নগতি জলের স্বাভাবিক ধর্ম। মননশক্তি মানুষের ধর্ম যা মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে। একে বলে ভেদক ধর্ম। সামাজিক রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, ন্যায়ালয়ের বিচারের আইনকানুন সবই ধর্ম। এজন্য আদালতের নাম ধর্মাধিকরণ, বিচারকের নাম ধর্মাধিকারী। অর্থনীতি রাজনীতি, কর্তব্য অকর্তব্য, নৈতিক নিয়মশৃঙ্খলা সবই ধর্মের অন্তর্গত। সহজ কথায় যে নিয়ম নীতির দ্বারা সমাজ চলে তাই ধর্ম। আধ্যাত্মিক ভাবনার রীতিনীতিও এই সমাজধর্মেরই একটি অঙ্গ যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে পূজা পার্বণ যাগযজ্ঞ ইত্যাদির মধ্যে। আরও ব্যাপক অর্থে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রহ নক্ষত্র যে নিয়মশৃঙ্খলা অনুসারে চলে তাও ধর্ম। তবে আমাদের বর্তমান আলোচনায় ধর্ম শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে অধ্যাত্মবাদী শাস্ত্রসম্মত নীতি-নিয়মের প্রতিশব্দ হিসেবে। যার মধ্যে মুখ্যস্থান গ্রহণ করে আছে দেবতা ঈশ্বর পরলোক, স্বর্গসুখের আশ্বাস, সংসারচক্রের আবর্তনের শেষে পারলৌকিক মুক্তি ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় ধারণার আবির্ভাব। নৈয়ায়িকেরা আবার ধর্মাধর্ম কথাটি পাপ-পুণ্য অর্থে ব্যবহার করেন, যার অর্থ দাঁড়ায় পূর্বজন্মের বা ইহজন্মের কর্মজনিত 'অদৃষ্ট'। (দ্রষ্টব্য : হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৬২)

এগুলিই হলো ভাববাদী চিন্তা-চেতনার অস্ত্র ও মাল-মসলা। স্বাভাবিকভাবেই বস্তুবাদী চার্বাকেরা তাই এই ধর্মকে মানতেন না। আর প্রাকৃতিক-নিয়মের যে চিরায়ত বহমানতা তাকে চার্বাকেরা 'স্বভাব-নিয়ম' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন তা আমরা আগেই দেখেছি। এ-

প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে–
'Religion is the sigh of the oppressed creature, the feeling of a heartless world and the soul of soulless circumstances. It is the opium of the people.'
অর্থাৎ : ধর্ম নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন সংসারের বেদনা, নিশ্চেতন নিষ্ঠুর বাস্তবের চেতনা। ধর্ম মানুষের জন্য আফিম-স্বরূপ।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মার্কসের ধর্ম প্রসঙ্গে উদ্ধৃত মন্তব্যটির প্রসঙ্গ হলো শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শাসক শ্রেণী আপন শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার তাগিদে বঞ্চিত নিপীড়িত সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে কেন উৎসাহ দেয় তারই তত্ত্বানুসন্ধান। নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধে অসমর্থ মানুষ তখন আত্মগ্লানির যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় খোঁজে এক কল্পিত ঈশ্বরের করুণার মধ্যে। ধর্মগুলি তো বলেই দিয়েছে গরিবের জন্য স্বর্গের দ্বার অবারিত থাকবে। ইহজগতের দুঃখযন্ত্রণা ঈশ্বরের করুণা, তারই ইচ্ছা। মানুষের মন প্রাণ যাতে ঈশ্বরে সমর্পিত হয়, মৃত্যুর পর অনন্ত স্বর্গসুখের আশ্বাস ও সান্ত্বনার মধ্যে মানুষ যাতে পরমশান্তি লাভ করে, ঐহিক দুঃখ দুর্দশাকে ভুলে থাকতে পারে, করুণাময় ঈশ্বরের এটাই হলো উদার অভিপ্রায়। এভাবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রমজীবী মানুষ আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে আত্মতৃপ্তির সন্ধান পায়। আর শাসক শ্রেণীর কাছে অজ্ঞ সাধারণ মানুষের এই আত্মবঞ্চনাও করুণাময়ের আশীর্বাদ। কারণ বঞ্চিত বুভুক্ষিত মানুষের দৃষ্টি বঞ্চকের দিকে নিবদ্ধ না হয়ে কল্পিত ঈশ্বরের দিকে নিবদ্ধ হয়। 'হে ঈশ্বর, তুমি মঙ্গলময় দয়াময়, দয়া করো।' প্রশ্ন হলো মানব-সমাজে এই ধর্মের প্রথম আবির্ভাব ঘটলো কখন?

'আদিম মানব সমাজে যখন রাজা ছিল না, রাজ্য ছিল না, রাষ্ট্র ছিল না, শাসক শাসিত শ্রেণীভেদ ছিল না তখন ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল জীবনসংগ্রামের প্রয়োজনে। মানুষ তখন প্রকৃতির দুই বিপরীত রূপ লক্ষ করেছে। প্রকৃতি মানুষের অনুকূল ও প্রতিকূল। প্রকৃতির এই দ্বৈত চরিত্র মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে। প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করে জীবনধারণের প্রয়োজনে প্রযুক্ত করার কলাকৌশল মানুষ তখনো আয়ত্ত করে নি। প্রকৃতির কৃপণ আনুকূল্য পেলেও জীবিকা ছিল কঠোর কষ্টসাধ্য। তাই গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের সকল মানুষ মিলেমিশে একই সঙ্গে জীবনসংগ্রামে ব্যাপৃত না থাকলে বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না। পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করে অপরের ক্ষুধার অন্ন আত্মসাৎ করলে কারুর কপালেই অন্ন জুটত না। সুতরাং যা জুটত সবাই তাই ভাগ করে খেত। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়াতে হলে সকলকে একসঙ্গে দাঁড়াতে হত। এ অবস্থায় প্রকৃতির পরস্পর বিপরীত দ্বৈত রূপে মধ্যে প্রতিকূল রূপটাই ছিল মানুষের কাছে প্রধান সমস্যা।... সুতরাং মানুষ তখন স্বাভাবিকভাবেই পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করত। যৌথ জীবনযাত্রার সহযোগিতাই ছিল ধর্ম। এজন্য রাষ্ট্রের বা ধর্মশাস্ত্রের কোনো অনুশাসনের প্রয়োজন ছিল না।'...
'এ অবস্থায় মানুষ তার কঠোর পরিশ্রমের সাফল্য অর্জন করার জন্য প্রাকৃতিক শক্তিগুলির

মধ্যে দৈবশক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করত, প্রকৃতির আনুকূল্য প্রার্থনার মধ্যে জীবনসংগ্রামে উৎসাহ সঞ্চয় করত। তখন পর্যন্ত মানুষের মনে পারলৌকিক সুখের আত্মবঞ্চনাময় আশ্বাসে বিশ্বাসস্থাপনের প্রয়োজন পড়ে নি। মানুষের অধীশ্বর কোনো রাজা বা সম্রাটের তখনও জন্ম হয়নি। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র অধীশ্বরের কল্পনাও তখন সম্ভব হয়নি। ইহলোকে বেঁচে থাকার সমস্যাই তাদের ধ্যান ধারণাকে পরিব্যাপ্ত করে রাখত। বঞ্চনাকারী শাসক শ্রেণীর আবির্ভাবের অভাবে পারলৌকিক সুখের আশ্বাসের মধ্যে ঐহিক সুখলাভের ব্যর্থতা-সঞ্জাত আত্মগ্লানিকে ডুবিয়ে রাখার করুণ কল্পনা তখনো মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করেনি। তাই ধর্ম তখন আফিমের কাজ করেনি। আদিম মানুষ জানত, বেঁচে থাকতে হলে কষ্ট করতে হবে। অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে সুখের মুখ দেখতে হবে। সুখ লাভের পথটি বড়ই দুর্গম... আদিম মানুষ প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করত, মৃত্যুর পরপারে আধ্যাত্মিক আনন্দের সান্ত্বনাময়ী কল্পনার মধ্য দিয়ে নয়।' (হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৬৪-৫)

বলা বাহুল্য, মানুষের সমাজে যখন ঐতিহাসিক নিয়মে শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটলো, সমাজের শাসক শ্রেণী ও তাদের প্রদত্ত সুবিধাভোগী ধর্মগুরু ও ধর্মশাস্ত্রীর দল প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে দৈবশক্তির পুরাতন কল্পনায় রংদার কল্পনা বিস্তারে সবরকম মদত জোগাতে এগিয়ে এলো। ধর্ম যখন রাষ্ট্রশক্তির করায়ত্ত হয়, ধর্মপ্রচারের ভার যখন অনুগত ধর্মগুরুদের হাতে জমা পড়ে তখন এ সংসারে মানুষের দুর্গতির দায়িত্ব থেকে শাসক শ্রেণী অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করে। জনসাধারণের ক্রোধ ও বিক্ষোভ যাতে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে চালিত না হয় সে জন্য সাংসারিক সুখলালসা থেকে মুক্ত হয়ে পরপারে মুক্তিসন্ধানের ব্রত উদযাপনে মানুষকে উৎসাহিত করে। ধর্মের সঙ্গে শাসক শ্রেণী ও রাষ্ট্রশক্তির গাঁটবন্ধনের মর্মার্থ হলো, ধর্ম একটি লাভজনক ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হয়। ধর্মবুদ্ধি আর ব্যবসায়িক বুদ্ধি এক হয়ে সেতুবন্ধন রচনা করলে যজ্ঞে বলিদানের পশু হয়ে সাধারণ মানুষ পরপারে সুখেই খোয়াব দেখতে থাকে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রশক্তি যখন ধর্মে অনুপ্রবেশ করে, তখন ধর্ম হয় প্রতারকের ছদ্মবেশ, চার্বাকের ভাষায় কঞ্চুক। কঞ্চুকের একটি অর্থ খোলস, আর একটি অর্থ বর্ম। সাধারণ মানুষ এই বর্মতুল্য খোলস ভেদ করে ছদ্মবেশীর আসল রূপটি চিনতে না পেরে সহজেই বিভ্রান্ত হয়। সহজ কথায় সভ্যযুগে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম পণ্যে পরিণত হয়েছে। আর ব্যবসায়াত্মিকা ধর্মবুদ্ধি যখন আর একটু উর্ধ্বগামী হয় তখন শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্মের নামে যুদ্ধ অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেড বা জেহাদ।

'মহাভারতে' বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকেও ধর্মযুদ্ধ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পাণ্ডবপক্ষের বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি অর্জুন এই যুদ্ধে বিপুল প্রাণনাশজনিত ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় আত্মীয় পরিজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বিরাগ প্রকাশ করলে শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান অর্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করতে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র আলেখ্যে যে উপদেশামৃত প্রদান করেছিলেন, তার মর্মার্থ কিন্তু এখানে–

‘অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্ ।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি।।
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।।
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।।
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বাহভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।’
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-২/১৭-২০)।
অর্থাৎ :
‘যিনি এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, তাঁহাকেই অবিনাশী আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। কেহই এই অব্যয় আত্মার বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। (গীতা-২/১৭)।। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অতীত, অবিনাশী ও নিত্য আত্মার এই সকল দেহ নশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব হে অর্জুন, তোমার এই জড়দেহ কালে বিনষ্ট হইবেই; কিন্তু তুমি আত্মারূপে অবিনাশী। অতএব যুদ্ধ করিয়া স্বধর্ম পালন কর। (গীতা-২/১৮)।। যিনি ইঁহাকে হন্তা বলিয়া মনে করেন এবং যিনি ইঁহাকে নিহত বলিয়া ভাবেন, তাঁহারা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানেন না। আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না এবং কাহারও দ্বারা নিহতও হন না। কারণ, আত্মা অবিনাশী। (গীতা-২/১৯)।। এই আত্মা কখনও জাত বা মৃত হন না। কারণ, পূর্বে না থাকিয়া পরে বিদ্যমান হওয়ার নাম জন্ম এবং পূর্বে থাকিয়া পরে না থাকার নাম মৃত্যু; আত্মাতে এই দুই অবস্থার কোনটিই নাই। অর্থাৎ আত্মা জন্ম-ও মৃত্যু-রহিত, অপক্ষয়হীন এবং বৃদ্ধিশূন্য; শরীর নষ্ট হইলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।’ (গীতা-২/২০)।।

কী মারাত্মক কথা– ‘ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে’ অর্থাৎ, ‘হত্যা করলেও তাকে সত্যি হত্যা করা হয় না’। কাকে? পরমাত্মাকে। কেননা, পরমাত্মা অজয় অমর শাশ্বত সত্য। তার জন্ম নেই। মৃত্যু নেই। তাই-ই পরব্রহ্ম। পারমার্থিক সত্য। যদিও বৈদান্তিকের ব্যাখ্যায় কথাটার ধার কমিয়ে কৌশলি তর্জমায় বলা হয়েছে– ‘শরীর নষ্ট হইলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।’ কিন্তু এই কথাটার উৎস কিন্তু গীতাও নয়। গীতায় উদ্ধৃত হয়েছে কেবল। মূলত গীতার এই কথাগুলি ‘কঠ-উপনিষদ্’-এর শ্লোকেরই পুনরুক্তি–
‘ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।
হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।। (কঠ-১/২/১৮-৯)
অর্থাৎ :
আত্মা বা পরমাত্মার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। আত্মার কোন উৎপত্তি নেই, আবার আত্মা থেকেও কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। আত্মা জন্মরহিত, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় এবং সদা

বিরাজমান। তাই শরীর হত্যা করলেও তাকে হত্যা করা যায় না। (কঠ-১/২/১৮)।।
হত্যাকারী যদি মনে করে সে হত্যা করছে, হত ব্যক্তি যদি মনে করে তাকে হত্যা করা হচ্ছে– উভয়ের পক্ষেই মনে রাখা দরকার, এই আত্মাকে হত্যা করাও যায় না, তার হত্যাও সম্ভব নয়। (কঠ-১/২/১৯)।।

প্রকৃতপক্ষে শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মাদ্বৈত-বেদান্ত দর্শনের তথা গোটা ভারতীয় ভাববাদী দর্শনের সার-কথাও এটাই। এই গোটা ভাববাদী দর্শন বলতে ভারতীয় ইতিহাসে চরম ভাববাদ– নামান্তরে শূন্যবাদ, ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, পরব্রহ্মবাদ। এই দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য প্রকাশ করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর বলেছেন–
‘শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।।’ (বেদান্তভাষ্য)
অর্থাৎ : কোটি কোটি গ্রন্থ যে সত্য প্রতিপাদন করতে ব্যস্ত, আচার্য তা শ্লোকার্ধেই ব্যক্ত করেছেন। এই মূল সত্য হলো– ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মস্বরূপ।’

তার মানে কী দাঁড়ালো? এই মিথ্যা মায়ার জগতে মিথ্যা শরীরে কে মরলো, কে মারলো এগুলি ধর্তব্যের বিষয় নয়। আসল যে সত্য ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, তিনি তো অবিকারই আছেন। অতএব এই মিথ্যা সংসারে ক্ষুধা তৃষ্ণা বঞ্চনা দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা এগুলি সবই মিথ্যে মায়া মাত্র। এসব মিথ্যে নিয়ে বিচলিত হওয়াই তো বোকামি। সকল সত্যই তো পরলোকে। কিংবা এসবই পূর্বকৃত কর্মের ফল-সমষ্টি, যা ভোগ করে কমাতে না পারলে পরের জন্মেও এসব জন্মরূপ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা নেই। তাই নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই এগুলি ভোগ করে ফেলা সুবুদ্ধির পরিচায়ক। সাধে কি আর ধর্মকে আফিম বলা হয়েছে!

‘আদিম মানবসমাজে ধর্মের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেণীবিভক্ত সভ্য সমাজের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের ভেদরেখাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। আদিম সমাজে মানুষের প্রতিকূল শক্তি ছিল প্রকৃতি। সুতরাং প্রকৃতিতে দেবত্ব আরোপ করে কল্পিত দেবতার কাছে মানুষ তার কঠোর পরিশ্রমের সাফল্য প্রার্থনা করেছে। কিন্তু সভ্য সমাজের আবির্ভাবের পর প্রকৃতিকে বশীভূত করার প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষ যখন আংশিকভাবে আয়ত্ত করেছে তখন মানুষের প্রতিকূল শক্তি রূপে দাঁড়িয়েছে মানুষ, ধর্মকঞ্চুকী শাসক শ্রেণী। পূর্বজন্মের কর্মফল, পরকালের স্বর্গ, নতুন নতুন দেবতা ও ঈশ্বরের আবির্ভাব শাসক শ্রেণীর কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। একমাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট এক ঈশ্বরের কল্পনা বাদ দিলে বাকি সব ছোট বড় পৌরাণিক দেবতার মধ্যে অনেক দেবতার আবির্ভাব যে ঘটানো হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। খ্রিস্টজন্মের কয়েক শতাব্দী আগে কৌটিল্য, রাজকোষে অর্থাভাব ঘটলে নতুন কোনো দেবতার আবির্ভাব ঘটাতে হবে, এই মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে গেছেন। রাত্রির অন্ধকারে বাবরি মসজিদে রামসীতার আবির্ভাব ঘটানো হয়েছিল, এ তথ্য এখন ঐতিহাসিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা হিসাবে সুবিদিত।’- (হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, চার্বাকদর্শন, পৃষ্ঠা-৬৭)

এখানে উল্লেখ আবশ্যক যে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্য কর্তৃক রচিত ‘অর্থশাস্ত্র’কে ‘মহাভারতে’র (মহাভারত-১২/২৯০/১০৪) শান্তিপর্বে ‘যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপশিষ্টজুষ্টে’ অর্থাৎ, ‘শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের দ্বারা সেবিত শাস্ত্র’ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অসাধারণ প্রজ্ঞাবান পণ্ডিত কৌটিল্য ছিলেন মৌর্য-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধান অমাত্য ও উপদেষ্টা। অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধিকরণ ‘বিনয়াধিকারিকম্’-এর ‘রাজপ্রণিধিঃ’ অধ্যায়ে রাজার করণীয় হিসেবে একজায়গায় কৌটিল্যের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হলো–

‘প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম্ ।
নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্ ।। (অর্থশাস্ত্র-১/১৯/৫)।
অর্থাৎ : প্রজাগণের সুখ হলেই রাজার সুখ, প্রজাগণের হিত হলেই রাজার হিত; রাজার নিজের প্রিয় যে বিষয় তাতে তাঁর হিত নয়, প্রজাগণের যেটা প্রিয় তাতেই রাজার হিত।।

কিন্তু রাজকোষে অর্থাভাব ঘটলে অর্থসংগ্রহের প্রক্রিয়া হিসেবে ‘অর্থশাস্ত্রে’ যদি নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটনোর চতুর পরামর্শ বস্তুতই দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এটি যে শাসকদল-কর্তৃক ধর্মের শঠ-ব্যবহারের অতি-গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক নজির হবে তাতে সন্দেহ নেই। প্রকৃতই এমন নজির রয়েছেও। যেমন, ‘অর্থশাস্ত্রে’র পঞ্চম অধিকরণ ‘যোগবৃত্তম্’-এর ‘কোশাভিসংগ্রহণম্’ অধ্যায়ে প্রথমেই কৌটিল্য বলছেন–

‘কোশমকোশঃ প্রত্যুৎপন্নার্থকৃচ্ছ্রঃ সঙগৃহ্ণীয়াৎ।’ (অর্থশাস্ত্র-৫/২/১)
অর্থাৎ : রাজার কোশ ক্ষীণ হয়ে পড়লে, যদি তিনি অর্থকৃচ্ছ্রতা অনুভব করেন, তাহলে তিনি বিবিধ অর্থ-সংগ্রহের দ্বারা কোশবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হবেন।

বলা বাহুল্য, রাজ্যের কোষাগারে দণ্ড, কর ইত্যাদি বহু বহু উপায়ে নিয়মিত অর্থসংগ্রহের স্বাভাবিক যে ব্যাপক-বিস্তৃত প্রক্রিয়া সেটি তো আছেই। কিন্তু সেটাও যদি (যুদ্ধাদি) বিশেষ কোন কারণে রাজার পক্ষে অপ্রতুল হয়ে যায় এবং অন্য কোন স্বাভাবিক ও বৈধ প্রক্রিয়া না থাকে, তবে বিভিন্ন চতুর প্রক্রিয়ায় প্রজা ঠকিয়ে রাজাকে অর্থসংগ্রহ করতে হবে। এটাই এই ‘কোশাভিসংগ্রহণম্’ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য। ফলে অতঃপর কৌটিল্য এই অর্থসংগ্রহের অনেকগুলি প্রজা-ঠকানো চতুর উপায়ের বিস্তারিত প্রস্তাব করেছেন, তার অন্যতম প্রতারণামূলক ধর্ম-ব্যবহারের উপায়টি হলো, যা আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক ও অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক–

‘দেবতাধ্যক্ষো দুর্গ-রাষ্ট্র-দেবতানাং যথাস্বমেকস্থং কোশং কুর্যাৎ। তথৈব চাহরেৎ। দৈবত-চৈত্যং সিদ্ধ-পুণ্যস্থান-ভৌমবাদিকং বা রাত্রাবুত্থাপ্য যাত্রাসমাজাভ্যামাজীবেৎ। চৈত্যোপবনবৃক্ষেণ বা দেবতাভিগমনম্ অনার্তবপুষ্পফলযুক্তেন খ্যাপয়েৎ। মনুষ্যকরং বা বৃক্ষে রক্ষোভয়ং প্ররূপয়িত্বা সিদ্ধব্যঞ্জনাঃ পৌরজনাপদানাং হিরণ্যেন প্রতিকুর্যুঃ। সুরুঙ্গাযুক্তে বা কূপে নাগম্ অনিয়তশিরস্কং হিরণ্যোপহারেণ দর্শয়েদ্ নাগপ্রতিমায়ামন্তশ্ছিদ্রায়াম্ । চৈত্যচ্ছিদ্রে বল্মীকচ্ছিদ্রে বা সর্পদর্শনমাহারেণ প্রতিবদ্ধসংজ্ঞং কৃত্বা শ্রদ্দধানাম্ আদর্শয়েৎ। অশ্রদ্দধানানাম্

আচমন-প্রোক্ষণেষু রসমবপায্য দেবতাভিশাপং ব্রূয়াৎ। অভিত্যক্তং বা দংশয়িত্বা। যোগদর্শনপ্রতীকারেণ বা কোশাভিসংহরণং কুর্যাৎ।'- (অর্থশাস্ত্র-৫/২/৭)।।
অর্থাৎ :
'দেবতাধ্যক্ষ' (রাজ্যের যাবতীয় মঠ-মন্দির-আরাধনালয় ইত্যাদির তত্ত্বাবধায়ক) দুর্গস্থিত দেবতাদের (অর্থাৎ দেবমন্দিরগুলির) এবং রাষ্ট্রগত দেবতাদের (রাষ্ট্রস্থিত সব দেবমন্দিরের) ধন যথাযথভাবে একস্থানে সংগ্রহ করবেন, অর্থাৎ দুর্গদেবতাদের সম্পত্তি এক জায়গায় এবং রাষ্ট্রদেবতাদের সম্পত্তি আর এক জায়গায় সংগ্রহ করবেন (প্রজাসাধারণের কাছে তাঁরা এমন ছল করবেন যে, শত্রুপক্ষের সৈন্যরা এই সম্পত্তি দেবমন্দির থেকে অপহরণ করতে পারে, তাই এগুলি অন্যত্র সরিয়ে রাখা হচ্ছে)। এবং সেই ভাবেই (আলাদা আলাদা ভাবেই) সেই উভয় সম্পত্তি রাজার কাছে সমর্পণ করবেন। কোনও 'সিদ্ধ' পুণ্যস্থানে (পূর্ব থেকেই প্রসিদ্ধ এমন পবিত্রস্থানে) ভূমি ভেদ করে শিবলিঙ্গ আবির্ভূত হয়েছে– এই রকম ঘোষণা করে সেখানে রাত্রিতে (অর্থাৎ বিজনে) একটি 'দৈবতচৈত্য' (দেবতার বেদি) নির্মাণ করে (এবং তার উপর শিবলিঙ্গ স্থাপন করে), উক্ত দেবতাধ্যক্ষ সেখানে 'যাত্রা' (উৎসব) ও 'সমাজের' (বহু লোকের সম্মেলন বা মেলার) আয়োজন করে, দেবতার পূজার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তার দ্বারা জীবিকানির্বাহ করবেন, অর্থাৎ উসবাদিতে উপস্থিত পুণ্যার্থীদের দ্বারা (দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসবশতঃ) প্রদত্ত অর্থ গোপনে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। অথবা, (দেবতাধ্যক্ষ) চৈত্যসংলগ্ন উপবনে কোনও একটি বিশেষ গাছ অ-ঋতুতে অর্থাৎ স্ব-ঋতুর অতিরিক্ত সময়ে (অর্থাৎ অকালে) পুষ্প ও ফলদ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে তা (কৌশলের সাথে) দেখিয়ে খ্যাপিত করবেন যে, ঐ গাছে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে। (এবং ভক্তি ভরে লোকেরা ঐ দেবতার উদ্দেশ্যে যে অর্থ দান করবে, দেবতাধ্যক্ষ তা গোপনে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেবেন)। অথবা, সিদ্ধ পুরুষের বেশধারী গুপ্তচরেরা (শ্মশান ভূমির কাছাকাছি) কোনও গাছে রাক্ষসের বেশধারণ করে অবস্থান করে, 'আমাকে প্রতিদিন এক একজন মানুষকে কররূপে (অর্থাৎ খাদ্যরূপে) দিতে হবে, তা না হলে আমি সকলকে একসাথে ভক্ষণ করব'– এইভাবে মিথ্যা-রাক্ষস-কৃত নির্দিষ্ট 'মনুষ্যকর'– (মানুষ-বলি)-রূপ ভয় উৎপাদন করে পুরবাসী ও জনপদবাসীদের কাছ থেকে প্রভূত হিরণ্য (নগদ টাকা) নিয়ে সেই ভয়ের প্রতিকার করবে (অর্থাৎ প্রতীকার করার ছল করবে) এবং সেই টাকা রাজাকে গোপনে অর্পণ করবে। অথবা, কোনও সুরুঙ্গযুক্ত কূপে রক্ষিত একটি অন্তশ্ছিদ্রযুক্ত নাগপ্রতিমাতে (অর্থাৎ একটি কৃত্রিম নাগমূর্তি দেখানো হবে, কিন্তু যার ভিতর ফাঁকা) কৌশলে 'অনিয়তশিরস্ক' অর্থাৎ ত্রিশীর্ষ বা পঞ্চশীর্ষযুক্ত (বা অসংখ্য শীর্ষযুক্ত) অদ্ভূত নাগ (দর্শকবৃন্দকে) দেখিয়ে (দেবতাধ্যক্ষ) দর্শকদের কাছ থেকে হিরণ্য (টাকা) উপহার হিসাবে গ্রহণ করবেন (এবং তা গোপনে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেবেন)। অথবা, কোনও দৈবতচৈত্যের (দেবতার বেদি) বা বল্মীকের ছিদ্রে দৈবাৎ কোনও সাপ দেখা গেলে, সেই সাপকে 'আহার' অর্থাৎ আয়ত্তীকরণের সাধনভূত মন্ত্র ও ওষধির প্রয়োগদ্বারা নিরুদ্ধগতি করে শ্রদ্ধাবান (বিশ্বাসকারী) লোকদের দেখাবেন (অর্থাৎ দেবতার সান্নিধ্যপ্রভাবে সাপটির সংজ্ঞা প্রতিবদ্ধ হয়েছে একথা বিশ্বাস করাবে)। যারা এ ব্যাপারে শ্রদ্ধাহীন হবে (অর্থাৎ

বিশ্বাস করবে না) তাদের আচমন ও 'প্রোক্ষণ' অর্থাৎ স্নানের দ্রব্যে (জল প্রভৃতিতে) অল্পমাত্রায় বিষ মিশ্রিত করে (অর্থাৎ এমন পরিমাণ বিষ মেশাতে হবে যাতে তার কেবলমাত্র মোহগ্রস্ত হয়, তাদের যেন প্রাণসংশয় না হয়) তাদের মোহিত করে 'এই ব্যক্তিরা নাগদেবতার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হয়েছিল, তাই নাগদেবতার অভিশাপে অর্থাৎ কোপে এই মোহপ্রাপ্তি' এই বলে প্রচার করবে। অথবা, এই সব দেবনিন্দকদের মধ্যে যদি কেউ 'অভিত্যক্ত' (শাস্তিরূপে পূর্ব থেকেই বধ্য হওয়ার সাজাপ্রাপ্ত) থাকে, তাহলে (রাত্রিতে গোপনে) সাপ দিয়ে তাকে দষ্ট করিয়ে (দেবতার অভিশাপ বলে প্রচার করবে)। অথবা, 'যোগদর্শন' প্রতীকারের দ্বারা অর্থাৎ 'ঔপনিষদিক' অধিকরণে প্রোক্ত বিষাদিযোগের প্রতীকার দ্বারা সাপ দ্বারা দষ্ট লোকদের কাছ থেকে ধন গ্রহণ করে রাজকোশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে। (অর্থশাস্ত্র-৫/২/৭)।। (মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত তর্জমা)।

আজ থেকে অন্তত আড়াই হাজার বছর আগেই রাজার কর্তব্যে কৌটিল্যের এই পরামর্শ কতোটা কার্যকর ও অনুসরণীয় ছিলো তা অনুধাবণ করতে খুব একটা কল্পনাপ্রবণ হওয়ারও দরকার আছে কি? পরবর্তীকাল থেকে এই কথিত বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের বর্তমান কালেও এর ভুরি ভুরি নজির আমাদের আশেপাশেই যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এইসব ঘটনাপুঞ্জে থাকে বা রয়েছে রাষ্ট্রের বা শাসকের তথা প্রভাবশালী সমাজপতিদের ইন্ধন ও অনুমোদন। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, ধর্মের সঙ্গে শাসক শ্রেণী ও রাষ্ট্রশক্তির গাঁটবন্ধনের মর্মার্থ হলো, ধর্ম একটি লাভজনক ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হয়। এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রশক্তি যখন ধর্মে অনুপ্রবেশ করে, তখন ধর্ম হয় প্রতারকের ছদ্মবেশ, চার্বাকের ভাষায় কঞ্চুক।

'মানুষ যদি দেবতা বা ঈশ্বরে বিশ্বাসের মোহ ত্যাগ করতে পারতো তা হলে কিন্তু ধর্মের ব্যবসা সম্ভব হতো না। তাই ধর্মের ব্যাসায়ে জাঁকিয়ে বসার জন্য মানুষের বিশ্বাসকে দেবতার ঘরে বন্ধক রাখার প্রয়োজন আছে এবং এই পরবঞ্চক শ্রেণীর পক্ষে ধর্মবিশ্বাসে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য যত্র তত্র দেবতা সৃষ্টির প্রয়োজন আছে, নব জাগ্রত দেবতার অলৌকিক মহিমা প্রচারের জন্য ভাড়াটিয়া দালাল বাহিনীর প্রয়োজন আছে।' -(হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, চার্বাক-দর্শন, পৃষ্ঠা-১৮)

চার্বাক 'সভ্যযুগীয়' দেবতা ও ঈশ্বরের এই কল্পনাবৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছিলেন, সভ্যযুগের দেবতা ও ঈশ্বর এবং তার আনুষঙ্গিক কল্পনাজাল কীভাবে শাসক ও যাজক শ্রেণীর শঠতার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিলো সেই সত্য নির্মমভাবে উদ্ঘাটন করেছিলেন। অন্তত একথা চিন্তা করে লোকায়ত চার্বাক দর্শনের সামাজিক ও দার্শনিক তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করা কর্তব্য বলে মনে হয়।

এই বর্ণবিভাজনকারী প্রতারণামূলক ভাববাদী দর্শনসঞ্জাত ধর্ম-ব্যবস্থাটাকে শাসকশ্রেণী যে

তার নিজ স্বার্থেই টিকিয়ে রাখবে তাতে আর আশ্চর্যের কী ! আমরা ইতঃপূর্বে ধর্মীয় সমাজ-ব্যবস্থায় অনুশাসনমূলক বর্ণবাদী বিধানগুলির গুটিকয় বিষয় 'মনুস্মৃতি'র আলোচনায় উল্লেখ করেছিলাম। এগুলি যে সেকালে রাষ্ট্রের জন্যেও আবশ্যকীয় নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো তার প্রমাণও এই 'অর্থশাস্ত্র'। বলা যায় রাষ্ট্রশাসন ও পরিচালনায় রাজার কর্তব্যের মধ্যে গোটা মনুস্মৃতির প্রায় সমস্ত অনুশাসনের প্রতিধ্বনি শোনা যায় কৌটিল্যের বয়ানেও। যেমন–

[বর্ণধর্মাঃ] : স্বধর্মো ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি। ক্ষত্রিয়স্যাধ্যয়নং যজনং দানং শস্ত্রাজীবো ভূতরক্ষণং চ। বৈশ্যস্যাধ্যয়নং যজনং দানং কৃষিপাশুপাল্যে বণিজ্যা চ। শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষা বার্তা কারুকুশীলবকর্ম চ।'- (অর্থশাস্ত্র-১/৩/১)।।

[সর্বসাধারণাঃ ধর্মাঃ, সর্বেষাং স্ব-স্ব-ধর্মানুষ্ঠানাবশ্যকতা চ] : সর্বেষাম্ অহিংসা সত্যং শৌচম্ অনসূয়া আনৃশংস্যং ক্ষমা চ। স্বধর্মঃ স্বর্গায়ানন্ত্যায় চ। তস্যাতিক্রমে লোকঃ সঙ্করাদুচ্ছিদ্যেত।

[ধর্মানুষ্ঠানস্য রাজধর্মতা] :

তস্মাৎ স্বধর্মং ভূতানাং রাজা ন ব্যভিচারয়েত্ ।
স্বধর্মং সংদধানো হি প্রেত্য চেহ চ নন্দতি।।
ব্যবস্থিতার্যমর্যাদঃ কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ।
ত্রয্যা হি রক্ষিতো লোকঃ প্রসীদতি ন সীদতি।।- (অর্থশাস্ত্র-১/৩/৩)।

অর্থাৎ :

[বর্ণধর্ম] : ব্রাহ্মণের স্বধর্ম হলো– অধ্যয়ন (বেদাদি পাঠ), অধ্যাপনা (অন্যকে পাঠদান), যজন (স্বহিতার্থে যজ্ঞসম্পাদন), যাজন (পরহিতার্থে যজ্ঞানুষ্ঠান), দান (অন্যকে দানকর্ম) ও প্রতিগ্রহ (অন্যের থেকে দানগ্রহণ)। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম– অধ্যয়ন, যজন, দান শস্ত্রোপজীবিত্ব (শস্ত্র ব্যবহারের দ্বারা জীবিকার্জন) ও লোকরক্ষণ অর্থাৎ প্রাণীগণকে রক্ষা করা। বৈশ্যের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষিকাজ, পশুপালন ও বাণিজ্যকর্ম– এগুলি স্বধর্ম। আর ব্রাহ্মণাদি তিন দ্বিজাতির সেবা, বার্তা অর্থাৎ কৃষিকার্য, পশুপালন ও বাণিজ্যকরণ এবং কারুকর্ম (শিল্পীর কাজ) ও কুশীলবকর্ম (চারণাদির কাজ)– এগুলি শূদ্রের স্বধর্ম। (অর্থশাস্ত্র-১/৩/১)।।

সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের পক্ষে আচরণীয় সাধারণ ধর্ম হলো– অহিংসাচরণ, সত্যনিষ্ঠা, (কায়, মন ও বাক্যে–) শুদ্ধি, অসূয়াহীনতা (অর্থাৎ গুণপক্ষপাত), আনৃশংস্য অর্থাৎ অনিষ্ঠুরতা বা দয়ার্দ্ররূপ হৃদয়তা এবং ক্ষমা। স্বধর্মপালন স্বর্গপ্রাপ্তিজনিত সুখের এবং অনন্তসুখপ্রদ মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন। স্বধর্মের লঙ্ঘন হলে লোকসমাজ (কর্মসঙ্কর, বর্ণসঙ্কর– ইত্যাদি) সংমিশ্রণহেতু উচ্ছেদপ্রাপ্ত হবে।

অতএব প্রাণিবর্গ যাতে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত না হয়, সেজন্য রাজার প্রয়াস করা কর্তব্য। যে রাজা তাঁর প্রজাদের মধ্যে স্বধর্মানুষ্ঠান সম্যগ্‌ভাবে ব্যবস্থাপিত করতে পারেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হন।

যে লোকসমাজে আর্যমর্যাদা অর্থাৎ সদাচারের নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত থাকে, যে যে লোকসমাজে বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম পরিপালিত হয় এবং ত্রয়ী-ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ বেদ অধ্যয়নের দ্বারা সংরক্ষিত হয় যে লোকসমাজ, সেই সমাজে প্রজালোক (সুখসমৃদ্ধিহেতু) প্রসন্ন থাকে এবং

(কখনোই) বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। (অর্থশাস্ত্র-১/৩/৩)।।

এতোসব কথার সার-কথাটা কিন্তু এটাই যে, মানুষরূপী প্রাণীদের স্বধর্ম-স্বরূপ বর্ণধর্মটা হলো সবার উপরে। রাজা কাউকে এর অন্যথা করার সুযোগ দিতে পারেন না প্রজালোকের স্বার্থে তথা তাঁর শাসনের স্বার্থেই। এটাই রাজার উপর অর্পিত ধর্ম। অতএব রাজার শাসন-প্রক্রিয়ায় বিচারকার্যে দণ্ডবিধানের নিয়মে 'ব্রাহ্মণদণ্ডক্রমঃ'-তে এমন বিধান থাকা আশ্চর্যের নয়–

'সর্বাপরাধেষু অদণ্ডনীয়ো ব্রাহ্মণঃ।' (অর্থশাস্ত্র-৪/৮/৯)
অর্থাৎ : সকল রকম অপরাধের ক্ষেত্রেই অপরাধী ব্রাহ্মণকে বধ-তাড়নাদির দ্বারা দণ্ড দেওয়া যাবে না।

তবে গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে অভিশপ্ত কোনো চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করে রাজ্য থেকে তাকে নির্বাসিত করা যেতে পারে, কিংবা তাকে আকর প্রদেশে বা খনিময় প্রদেশে বাস করানো যায়। এছাড়া অর্থদণ্ডের স্থলেও ব্রাহ্মণ কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন। শ্রোত্রিয় বা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে কোনো প্রকার কর দিতে হতো না। বহু দিন ভোগ দখল করলেও শ্রোত্রিয়ের সম্পত্তিতে অন্য কারুর অধিকার জন্মাতো না। যুদ্ধে জয়লাভ করেও বিজয়ী রাজা শ্রোত্রিয়ের সম্পত্তি দখল করতে পারতেন না, তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হতো। এসব সুবিধা পাবেন-নাই-বা-কেন, এই ব্রাহ্মণ যাজক-সম্প্রদায়ই তো ধর্মকে ধারণ করে শাসকশ্রেণীর শাসনের সহায়ক ভিত্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত!
বস্তুবাদী চার্বাকেরা এটা ভালো করেই জানতেন, বুঝতেন এবং এইসব প্রবঞ্চনাময় অপবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বাস্তববাদী যুক্তির অস্ত্র নিয়ে প্রতিবাদী বিদ্রোহী হয়ে তাদের গোমড় ফাঁস করতে উদ্যত হয়েছিলেন বলেই বাকি সব ভাববাদে পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবাদী গোষ্ঠি তথা ধর্ম-ব্যবসায়ীরা চার্বাকদের উপর সোজাকথায় মারমুখী হয়ে উঠেছিলেন।

। বস্তুবাদী চার্বাক।

অলৌকিকতাকে সরিয়ে রেখে জড়বস্তুর সাপেক্ষে যে মতবাদ যাবতীয় প্রাকৃতিক নিয়ম বা বিষয়ের যৌক্তিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করে মোটাদাগে তাকেই বস্তুবাদী দর্শনমত বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে চার্বাক-মত কি সফল? এই প্রশ্নের বিপরীতে এক্ষেত্রে হয়তো উল্টো প্রশ্ন রাখা যেতে পারে, কেন নয়?

চার্বাক মতবাদ আলোচনার সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে চার্বাক দর্শন প্রধানত যুক্তিনির্ভর। কিন্তু এ-প্রেক্ষিতে কেউ কেউ হয়তো একধরনের একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলতে পারেন– 'যুক্তির আশ্রয় নিয়ে প্রতিপক্ষকে নানাভাবে পর্যুদস্ত করাকেই সাধারণভাবে চার্বাকী নীতি হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। চার্বাক সর্বক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ। চার্বাকের নীতি নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনায় উজ্জ্বল নয়; চার্বাকী প্রচেষ্টা প্রধানতঃ নূতন দৃষ্টির আলোক নিয়ে প্রাচীনের বিশ্লেষণ এবং এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে নানাভাবে তার ত্রুটি প্রদর্শন।'- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-১৩৯)

এধরনের বক্তব্যকে একদিকে তেমন দোষের বলা যাবে না এজন্যেই যে, কোন অজ্ঞাত কারণে বিলুপ্ত চার্বাকী নিজস্ব গ্রন্থের অভাবে চার্বাকেতর সম্প্রদায়ের দার্শনিক সাহিত্যে চার্বাকের অবস্থান তো বিরোধীপক্ষ হিসেবেই উপস্থাপিত, যার উপর ভিত্তি করেই আমাদেরকে চার্বাকমতের রূপরেখা আঁকতে হচ্ছে। আর চার্বাক-বিরোধী দার্শনিক গ্রন্থে, আগেও বলা হয়েছে, চার্বাকের উপস্থিতি সেটুকুই যেটুকুর যুক্তিকে তাঁরা খণ্ডনের প্রয়োজন উপযোগী মনে করেছেন স্ব-স্ব মতকে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠা দানের লক্ষ্যে। চার্বাক-বিরোধী দার্শনিকরা এটা করেছেন তাঁরা তাঁদের নিজস্ব দায় থেকেই। চার্বাক-মতকে করুণা দেখিয়ে প্রচারের উদ্দেশ্য থেকে তাঁরা তাঁদের দার্শনিক সাহিত্যে পূর্বপক্ষীয় চার্বাকমত উপস্থাপন করেছেন– এমনটা ভাবার অবকাশ নেই। তবু তাঁদের এই কৃত উদ্যোগ থেকেই আজ যেকোনভাবেই চার্বাকমত সম্পর্কিত ধারণাটুকু পাওয়া সম্ভব হচ্ছে বলে তাঁদের এই উদ্যোগকেই আমরা নিশ্চয়ই গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

কিন্তু চার্বাকেরা কেবল বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা অর্থাৎ বিতণ্ডা করেছেন, এ-পর্যায়ে এসে এমনটা বলা নিশ্চয়ই সুবিবেচনা প্রসূত মন্তব্য হবে না। চার্বাক নীতির মাধ্যমে যে বিরোধিতার মনোভাব সুপরিস্ফূট, যে কোন জাতির রাজনীতি, সমাজনীতি বা দর্শননীতি– প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই বিরোধিতার প্রয়োজন আছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরোধিতা না থাকলে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগতভাবে শাসকের যে যথেচ্ছচারিতার সুযোগ আসে, তার পরিচয় কারও কাছেই অবিদিত নয়। ভারতীয় সামাজিক আচরণ পদ্ধতি তার দর্শননীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে যাজকদের যথেচ্ছচারিতাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সমাজজীবনে যে আতিশয্যের সূত্রপাত হয়েছিলো তার প্রতিবাদের মাধ্যমেই চার্বাকী বিদ্রোহাত্মক নীতির সূচনা। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক অনাচারের প্রতিরোধের ভূমিকাতেই চার্বাক

প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ বলে মনে হয়, কিন্তু ভারতীয় সমাজনীতির সঙ্গে দর্শননীতির এই অচ্ছেদ্য যোগের জন্যই দার্শনিক মতবাদের ক্ষেত্রেও চার্বাকের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় কার্যকর।

উপরের মন্তব্য প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উঠে এসেছে যে, চার্বাকের নীতি নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনায় উজ্জ্বল নয়। এই মন্তব্যের ভিত্তি যদি হয় চার্বাকদের মধ্যে আত্মা, অদৃষ্ট, কর্মফল, পরলোক, জন্মান্তর বা পুনর্জন্ম এ-জাতীয় নতুন কোন অবাস্তব অলৌকিক কল্পনার অনুপস্থিতি, তাহলে যথাযথ সম্মান রেখেই বলতে হয় যে চার্বাকের এই কথিত অনুজ্জ্বলতাই তাঁদের বিজ্ঞান-চেতনায় অগ্রণী হয়ে থাকার সবচাইতে বড়ো দার্শনিক উজ্জ্বলতার দৃষ্টান্ত। বলতে বাধা নেই, আধুনিক বিজ্ঞানের আজকের এই কল্পনাতীত সাফল্যের আঁতুর-ঘর যে প্রকৃতি-বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞান-চিন্তায়ও ছিলো অলৌকিক অবাস্তবতাকে একপাশে সরিয়ে রেখে চিরায়ত প্রাকৃতিক নিয়মের যথাযথ ব্যাখ্যা হাজির করা। এই প্রাকৃতিক নিয়মই প্রকৃতির অধিভুক্ত বিভিন্ন বস্তুপুঞ্জের নিজ নিজ ও বিভিন্ন সমবায়ের বৈশিষ্ট্যিকৃত স্বভাব-নিয়ম নয় কি?

চার্বাক দর্শননীতিতে বহু ক্ষেত্রে অসঙ্গতি আছে বলে চার্বাক-সমালোচকরা আরেকটি যে অভিযোগ তোলেন সেটাও কতোটা বস্তুনিষ্ঠ– চার্বাকী নিজস্ব গ্রন্থের অভাব-প্রসূত কারণে বিরোধীপক্ষের স্বেচ্ছাকৃত আরোপিত কৌশল কিনা– পর্যালোচনার দাবি রাখে। চার্বাক সমালোচকরা হয়তো এই বিষয়টা খুব সযতনে এড়িয়ে যান যে, বিরোধী যুক্তির বিরোধিতায় যে প্রতিযুক্তি উপস্থাপিত হয় সেখানেও উপস্থাপিত যুক্তির সমর্থনে একটা দার্শনিক অবস্থান স্পষ্ট হতে হয়। নইলে তা কোন বিচারেই দার্শনিক তত্ত্ব বলে গৃহীত হয় না। চার্বাকরা আত্মার স্বীকৃতির বিপক্ষে যখন যুক্তি স্থাপন করেন সেখানে দার্শনিক সমর্থন হিসেবে দেহকেই আত্মা বলে স্বীকার করার সপক্ষেও প্রয়োজনীয় যুক্তি তুলে ধরেন। কিংবা প্রাকৃতিক ঘটনাপুঞ্জের ব্যাখ্যায় অপ্রমাণিত ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে গিয়ে তার যুক্তির সমর্থনে স্বভাব-নিয়ম বলে একটা তত্ত্বেরও স্বীকৃতি দেন। তার মানে চার্বাকী যুক্তি কেবল হাওয়াই বিরোধিতাই নয়, বরং তার সমর্থনে যে যুক্তির আয়োজন চোখে পড়ে তাকে কোনভাবেই তত্ত্বহীন বলার যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। চক্ষু বন্ধ রাখলেই যে প্রলয় বন্ধ থাকে না– আধুনিক চার্বাক-সমালোচকরা তা না-মানলেও সেকালের প্রাচীন চার্বাক-বিরোধীরা যে খুব ভালো করেই বুঝতেন তার নিদর্শনই হলো সবগুলি চার্বাকেতর দার্শনিক সাহিত্যে সমস্ত সাধ্য ও সামর্থ দিয়ে চার্বাকমত খণ্ডনের ব্যাপক আয়োজন প্রচেষ্টা। অতএব এক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ রাখা অনুচিত যে, চার্বাকমত একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন এবং শুধু তাই নয়, সমকালীন অন্যান্য দর্শনগুলির তুলনায় বিজ্ঞানমনস্ক ভূমিকায় আবির্ভূত একটি অগ্রগামী দর্শন। এবং লোকায়তিক বলে যে যেভাবেই তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান-না-কেন, অবশ্যই তা বস্তুবাদী বা জড়বাদী দর্শন। যা ভারতীয় বস্তুবাদের প্রকৃষ্ট নির্দেশকও।

এ-প্রেক্ষিতে চার্বাকদর্শনকে বস্তুবাদের প্রকৃষ্ট নির্দেশক হিসেবে প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের চিন্তাধারার অনুসরণে আমরা ভারতীয় বস্তুবাদের নির্দেশনাগুলি

চিহ্নিত করে নিতে পারি–
১। শাস্ত্রশাসনের শৃঙ্খলমুক্তি।
২। ভূতচৈতন্যবাদ। অতএব আত্মা প্রসঙ্গে ঔদাসীন্য।
৩। প্রত্যক্ষ-প্রাধান্যবাদ।
৪। স্বভাববাদ।
৫। প্রমাণ প্রসঙ্গে প্রবৃত্তিসামর্থ্যবাদ।

চার্বাক সিদ্ধান্তের সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে নির্ণীত বস্তুবাদের এই নির্দেশনাগুলি নিয়ে নতুন করে আর আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বরং এখন মন্তব্য করা চলে যে, ভারতীয় চিন্তাজগতে চার্বাকের আবির্ভাব যে নিঃসন্দেহে একটা নতুন যুগের সূচনা করেছিলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বাসের বেদীমূলে যুক্তিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেবার ফলে ভারতীয় জনমানসে যে আবিলতা ক্রমশ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিলো, শাস্ত্রশাসনের শৃঙ্খলমুক্তির মধ্য দিয়ে তার অপসারণের প্রচেষ্টার মধ্যে চার্বাকী চিন্তার প্রথম আত্মপ্রকাশ। চিরাচরিত সব কিছুই গ্রহণযোগ্য নয় এবং আপ্তবাক্য নামে যা প্রচলিত, তা সর্বক্ষেত্রে পথের নির্দেশ-প্রদানে অসমর্থ– ভারতীয় জনচিত্তে এই বোধের সূচনা চার্বাক দর্শনের প্রধান অবদান। চার্বাকের যুক্তিবাদী প্রবণতা আমাদের প্রতিদিনের ধারণার বিষয়গুলিকে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখার প্রেরণা দিয়ে বহুকালে মজ্জাগত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

কিন্তু শাস্ত্রশাসনের শৃঙ্খলমুক্তির প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই চার্বাকের প্রথম আবির্ভাব বললে কথাটা পূর্ণাঙ্গ সত্যকথন হয় কিনা তাও ভাবার বিষয়। কেননা চার্বাক নামের আত্মপ্রকাশজনিত জটিলতা যাই থাকুক না কেন, চার্বাকী ভূতবাদী চিন্তার সূচনা যে আরো প্রাচীন লোকায়তিক দেহভিত্তিক প্রাকৃতিক ভাবনার গর্ভে সঞ্চিত ছিলো তা বোধকরি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। আর এই লোকায়ত প্রাকৃত-ভাবনার মূলটুকু রয়ে গেছে আমাদের সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার কৃষিভিত্তিক সমাজ-সংগঠনের আদিম প্রজ্ঞাজাত লোক-অনুষ্ঠানগুলির দ্রষ্টব্যের মধ্যে। বস্তুতান্ত্রিকতার এই ধারাক্রমকে অস্বীকার করে হঠাৎ করে চার্বাকী চিন্তার উদ্ভব হওয়া যে ঐতিহাসিকভাবে সম্ভব নয়, তা স্বীকার করা বোধকরি অমূলক হবে না। তারও অনেককাল পরের বৈদিক সংস্কৃতির প্রাচীনতর নিদর্শন হিসেবে ঋগ্বেদ-সংহিতার যুগের সমাজ-সভ্যতার চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলেও এই ধারণা মোটেও অযৌক্তিক নয় যে, যতোই অলৌকিক মহিমা আরোপ করা হোক-না-কেন, ঋগ্বেদের প্রথমকালের পার্থিব কামনাভিত্তিক চাওয়া-পাওয়াগুলিও একান্তই বস্তুতান্ত্রিক জনমানসেরই সাক্ষ্য বহন করে। বৈদিক যুগের শেষ লগ্নে উপনিষদ্-যুগের আত্মগত জ্ঞানচিন্তার উন্মেষকালেও সকল উপনিষদকাররা বহমান বস্তুতান্ত্রিক বাস্তবতা থেকে যে সমূলে বেরিয়ে আসতে পারেননি তার নজির দেখানোও অসম্ভব হবে না মনে হয়। যদি তাই হয়, ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে দার্শনিক বিচারের দিক থেকে বস্তুনিষ্ঠাহীনতার পরিচায়ক হিসেবে চার্বাকদের একেবারে

একঘরে করে রাখার প্রচলিত প্রথায় তাঁদের বিরুদ্ধে যতো গালমন্দই বর্ষিত হোক না কেন, বস্তুবাদের প্রতিনিধি হিসেবে আসলে তাঁরা একান্তই নিঃসঙ্গ ছিলেন না বলা চলে। বেদান্তের মূল উপপাদ্য যেখানে 'একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, এ জগৎ মিথ্যা', সেই বৈদান্তিক মহলেই এই বস্তুবাদের নজির আকর্ষণীয় বৈকি। এ-প্রসঙ্গে একটু আলোকপাত করা যেতেই পারে।

। উদ্দালক আরুণি সংবাদ: উপনিষদে বস্তুবাদের অনন্য নজির।
আমরা জানি, যা বেদ-এর অন্ত, তাই বেদান্ত। চলতি কথায়, বেদের শেষভাগ। নামান্তরে তাই উপনিষদ বলে খ্যাত, কেননা বৈদিক ঐতিহ্যের দাবি অনুসারে উপনিষদ্-সাহিত্য বেদের শেষভাগ। বেদের মর্যাদায় অধিষ্ঠানের কারণে এই উপনিষদের বাণীও বেদসম্মত দর্শন সম্প্রদায়ের নিকট বেদের মতোই 'শ্রুতি'র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তবে এযাবৎ ১১২টি উপনিষদ নামক গ্রন্থের কথা জানা গেলেও সবগুলিকে 'শ্রুতি'র মর্যাদা দেয়া হয়নি। স্বভাবতই 'উপনিষদ' নাম ব্যবহৃত হলেও এ-জাতীয় সকল গ্রন্থাবলীকে প্রকৃত বৈদিক 'উপনিষদ' মনে করবার কোনো কারণ নেই। কেননা, আগেও বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি প্রাচীন (আরণ্যক'ও) 'উপনিষদ'ই কোনো-না-কোনো 'বেদ' বা বেদের শাখার সঙ্গে সংযোজিত। তাই যেগুলি বেদের অঙ্গীভূত বা ঐতিহ্য অনুসারে বেদের সাথে সংযুক্ত নয় সেগুলিকে বৈদিক সাহিত্যের অংশ বলে স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ সেগুলি অনেক পরে রচিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বেদবিদ পণ্ডিতেরা প্রকৃত বৈদিক উপনিষদ হিসেবে একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপনিষদগুলি হলো,– ঈশ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, কৌষীতকি, মৈত্রী ও শ্বেতাশ্বতর এই তেরোটি উপনিষদ। তার মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদ একেবারে প্রথমকালের উপনিষদ।

এই উপনিষদ্-সাহিত্যেরই এখানে ওখানে বস্তুবাদের উল্লেখ যে আছে সেকথা অনেক আধুনিক বিদ্বানই আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রায় সকলের মতেই উল্লেখগুলো পূর্বপক্ষ মাত্র। অর্থাৎ, প্রচলিত মতে উপনিষদ্-এর দার্শনিক সারাংশ বলতে ভাববাদই, যদিও ঠিক কোন্ ধরনের ভাববাদ তা নিয়ে পরবর্তীকালের উপনিষদ্-অনুগামী বা বৈদান্তিকদের মধ্যেই অনেক তর্কবিতর্ক আছে। এবং এ-প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে বিভিন্ন বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু যে-অর্থেই ভাববাদ হোক-না-কে, তার সমর্থনে বস্তুবাদ খণ্ডন ও বর্জনের প্রয়োজন। অর্থাৎ উপনিষদে বস্তুবাদের উল্লেখ আসলে পূর্বপক্ষই।

কিন্তু এই প্রচলিত মতের বাইরেও তার বদলে দেখানো সম্ভব যে– 'উপনিষদেরই জনৈক প্রখ্যাত ঋষির মতকে সংস্কারমুক্ত মনে বিচার করলে বোঝা যায় যে তাঁর মতের সারাংশ বস্তুবাদ বলে স্বীকৃত হতে বাধ্য।
ঋষিটির নাম উদ্দালক আরুণি। 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ্'-এর একটি পুরো অধ্যায়ে তাঁর মত বর্ণিত হয়েছে। সে-মতের সারমর্ম যে আসলে বস্তুবাদই– এই দাবি খুব একটা অভিনব নয়। ইতিপূর্বে জ্যাকবি (H. Jacobi)– এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য ওয়ালটার রুবেন (Walter Ruben)– বিচারমূলকভাবেও বিষয়টি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আমাদের আধুনিক বিদ্বানেরা উপনিষদ্-এর প্রথাগত ব্যাখ্যায় এমনই অভ্যস্ত যে জ্যাকবি ও রুবেন-এর মতো দিক্পাল ভারততত্ত্ববিদদের বিচারকে একান্ত অনাদরের কুক্ষিতে গোপন রাখা ছাড়া তাঁদের যেন গত্যন্তর নেই। মোটের উপর তাই জ্যাকবি ও রুবেন-এর বিচার বিশেষ সুবিদিত নয়।'- (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১০২)

এই কুক্ষি থেকে তাঁদের বিচার বের করে আনা সময়ের প্রয়োজনেই আবশ্যক মনে হয়। তবে তা করার আগে আরেকটি সহায়ক সাক্ষ্য স্মরণ করা যেতে পারে। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টর কথা ইতঃপূর্বে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে চার্বাকদের ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে তিনি পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাকমতের একটা যুক্তির উল্লেখ করেছিলেন–

'ভূতেষ্বন্নপানাদ্যুপযোগপুষ্টেষু পাট্বী চেতনা ভবতি তদ্বিপর্যয়ে বিপর্যয়ঃ,
ব্রাহ্মীঘৃতাদ্যুপযোগসংস্কৃতে চ কুমার শরীরে পটুপ্রজ্ঞতা জায়তে।'- (ন্যায়মঞ্জরী)
অর্থাৎ :
(চার্বাকমতে) বুদ্ধি বা চৈতন্যের বিকাশ শরীরের সম্যক পরিপুষ্টির উপর নির্ভরশীল। ভোজন, পান ইত্যাদির দ্বারা দেহ পুষ্ট থাকলেই চৈতন্যের সতেজ স্ফূর্তি দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মীঘৃত অথবা অন্য ঔষধাদি সেবনের ফলে বালকের মধ্যেও যথেষ্ট প্রজ্ঞার সঞ্চার হতে দেখা যায়।

যুক্তিটির সংক্ষিপ্ত সারাংশ হলো,– অন্নপানাদি দ্বারা শরীর পুষ্ট হলে চেতনার উৎকর্ষ দেখা যায়; কিন্তু শরীরে পুষ্টির অভাব হলে চেতনাও ক্ষুণ্ন হয়। তাছাড়া ব্রাহ্মীঘৃত খেলে চেতনা বা জ্ঞান বাড়ে। কিন্তু অন্নাদিই বলুন বা ব্রাহ্মীঘৃতই বলুন– এগুলি তো নেহাতই ভূতবস্তু। তাহলে মানতেই হবে, ভূতবস্তুর আধিক্য থাকলে চৈতন্য বাড়ে, ভূতবস্তুর অভাব ঘটলে চৈতন্য কমে। অতএব চৈতন্য ও ভূতবস্তুর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে। জয়ন্তভট্টর বিচারে এই কথা নিছক ভূতচৈতন্যবাদীর কথা, চার্বাকের কথা।

কী যুক্তি দিয়ে জয়ন্তভট্ট এই যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন তা ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে, বর্তমান আলোচনায় তা প্রধান প্রশ্ন নয়। বড়ো প্রশ্ন হলো, চার্বাকের ভূতচৈতন্যবাদের সমর্থনে এরকম যুক্তি জয়ন্তভট্ট কোথা থেকে পেলেন? ব্রাহ্মীঘৃতর কথাটা যে আয়ুর্বেদ থেকে পাওয়া এ-বিষয়ে হয়তো মতান্তর হবে না। কিন্তু গোটা যুক্তিটার কাঠামোর মধ্যে তা তো একটা দৃষ্টান্তমাত্র। আসল প্রশ্ন হলো ওই গোটা যুক্তিটার কাঠামো নিয়ে। অন্ন প্রভৃতি নিছক ভূতবস্তুর বর্তমানতায় চৈতন্য বাড়ে, অবর্তমানতায় চৈতন্য কমে। অতএব ভূতবস্তুই চৈতন্যের আসল কারণ।
'এ-হেন কোনো যুক্তি জয়ন্তভট্ট অধুনালুপ্ত চার্বাকদেরই কোনো রচনা থেকে সংকলন করেছিলেন, তা দাবি করতে যাওয়া কল্পনা-প্রাবল্যেরই পরিচায়ক হবে। যুক্তিটা কি তাহলে তিনি নিছক নিজের মাথা খাটিয়ে উদ্ভাবন করেছিলেন? এমনতর দাবি করারও সত্যিই কোনো কারণ নেই। কেননা, উপনিষদ্-সাহিত্যেই উদ্দালক আরুণির মত প্রসঙ্গে যুক্তিটার অন্তত সারাংশ বর্তমান। আরো বড় কথা হলো, উদ্দালক পরীক্ষামূলকভাবে যুক্তিটা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে পরীক্ষামূলকভাবে কোনো বিষয় প্রমাণ করার এর চেয়ে প্রাচীন কোনো নিদর্শন আর কোথাও আছে বলে জানা নেই। সেদিক থেকে বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনায় প্রচলিত পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিকতা অবশ্যই তার একটা কারণ। কিন্তু সেই সঙ্গে

ভারতীয় বিদ্বানদের পক্ষে উদ্দালককে নিছক আত্মাবাদী বা ভাববাদী বলে ধরে নেবার সুদীর্ঘ প্রথাও নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ দায়মুক্ত নয়।’- (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১০৩)

সে যাক, উদ্দালকের আলোচনায় ফেরা যাক। বর্তমান আলোচনায় উদ্দালকের দার্শনিক মত পুরোটা উদ্ধৃত করার দরকার নেই বা সেই বিস্তৃত উদ্ধৃতির সুযোগও নেই। যেটুকু প্রাসঙ্গিক শুধু সেটুকুরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া যাবে। তবু তার আগে উপনিষদীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে কিছু নমুনা উপস্থাপন করা যেতে পারে। ‘ছান্দোগ্য-উপনিদ্’-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের ষোলটি খণ্ডে এই উদ্দালক আরুণি ও শ্বেতকেতু সংবাদ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। উদ্দালকের বক্তব্যটি একটা আখ্যানের রূপে প্রকাশিত। তা থেকে খুঁটে খুঁটে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিগুলি তর্জমাসহ উপস্থাপন করা হলো, আশা করি আগ্রহী পাঠকের খুব বেশি ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে না–

‘ওঁ। শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্যং ন বৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোহননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি। (ছান্দোগ্য-৬/১/১)।। স হা দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিংশতিবর্ষঃ সর্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায় তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোহস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ–। (ছান্দোগ্য-৬/১/২)।। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি। (ছান্দোগ্য-৬/১/৩)।। যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ । (ছান্দোগ্য-৬/১/৪)।। যথা সৌম্যৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্ । (ছান্দোগ্য-৬/১/৫)।। ন বৈ নূনং ভগবন্তস্ত এতদবেদিষুর্যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি ভগবাংস্ত্বেব মে তদ্ ব্রবীত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ। (ছান্দোগ্য-৬/১/৭)।।
অর্থাৎ :
শ্বেতকেতু নামে উদ্দালক আরুণির এক পুত্র ছিলেন। একবার আরুণি তাঁর পুত্রকে বললেন, ‘শ্বেতকেতু, তুমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে গুরুগৃহে বাস করো। আমাদের বংশে বেদ অধ্যয়ন না করে শুধু নামে মাত্র ব্রাহ্মণ হয়েছেন এমন কেউ নেই। (ছান্দোগ্য-৬/১/১)।। বারো বছর বয়সে শ্বেতকেতু গুরুগৃহে গেলেন। চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত সেখানে থেকে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে গম্ভীরচিত্ত, অবিনয়ী ও পাণ্ডিত্যের অহংকারে পূর্ণ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর পিতা তাঁকে বললেন, ‘শ্বেতকেতু, তুমি দেখছি গম্ভীর, পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীতস্বভাব হয়ে ফিরে এসেছো। কিন্তু তুমি কি সেই উপদেশের কথা গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিলে–। (ছান্দোগ্য-৬/১/২)।। –যে উপদেশের সাহায্যে অশ্রুতবিষয় শোনা যায়, অচিন্তনীয় বিষয় চিন্তা করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জানা যায়।’ (শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করলেন) ‘ভগবন্, কী সেই উপদেশ?’ (ছান্দোগ্য-৬/১/৩)।। হে সোম্য, যেমন একখণ্ড মাটিকে জানলেই মাটির তৈরি সব জিনিসকে জানা যায়। জিনিসগুলি নামে আলাদা বা নামের বিকার, কেবলমাত্র মাটিই সত্য। (ছান্দোগ্য-৬/১/৪)।। হে সোম্য, একতাল সোনাকে জানলে যেমন সোনার

তৈরি সব জিনিসকেই জানা যায়। সোনার অলঙ্কারগুলি কেবল নামের বিকার, কতগুলি শব্দ মাত্র। সোনাই একমাত্র সত্য। (ছান্দোগ্য-৬/১/৫)।। (শ্বেতকেতু বললেন)– 'আমার পূজনীয় আচার্যগণ নিশ্চয়ই এ সত্য জানতেন না। যদি জানতেন তবে বললেন না কেন? অতএব ভগবন্, আপনি আমাকে তা বলুন।' পিতা বললেন, 'সোম্য, তাই হোক।'
(ছান্দোগ্য-৬/১/৭)।।

.

.

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ । তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত। (ছান্দোগ্য-৬/২/১)।। কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ । (ছান্দোগ্য-৬/২/২)।। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোহসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোহসৃজত তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে। (ছান্দোগ্য-৬/২/৩)।। তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত তস্মাদ্যত্র ক্ব চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়তে। (ছান্দোগ্য-৬/২/৪)।।
অর্থাৎ :
হে সোম্য, এই দৃশ্যমান জগৎ প্রকাশের আগে এক ও অদ্বিতীয় সৎরূপে বিদ্যমান ছিলো। এই বিষয়ে কেউ কেউ বলেন, 'এই জগৎ প্রকাশের আগে এক ও অদ্বিতীয় অসৎরূপে বিদ্যমান ছিলো' অর্থাৎ তখন কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিলো না। সেই অসৎ থেকেই সৎ হয়েছে। (ছান্দোগ্য-৬/২/১)।। পিতা বললেন, 'কিন্তু সোম্য, তা কী করে হতে পারে? অসৎ (অর্থাৎ শূন্য) থেকে কী করে সৎ (অস্তিত্ব) উৎপন্ন হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, হে সোম্য, এই জগৎ প্রকাশিত হওয়ার আগে এক ও অদ্বিতীয় সৎরূপেই বর্তমান ছিলো।' (ছান্দোগ্য-৬/২/২)।। সেই সৎ-বস্তু সঙ্কল্প করলেন, 'আমি বহু হবো, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হবো।' তারপর তেজ অর্থাৎ অগ্নি সৃষ্টি হলো। সেই তেজও সঙ্কল্প করলেন, 'আমি বহু হবো, উৎকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হবো।' সেই তেজ থেকে জল উৎপন্ন হলো। তাই যখনই মানুষ শোক করে বা ঘর্মাক্ত হয়, তখনই তেজ থেকে জল উৎপন্ন হয়। (ছান্দোগ্য-৬/২/৩)।। সেই জল সঙ্কল্প করলেন, 'আমি বহু হবো, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হবো।' সেই জল থেকে অন্ন (পৃথিবী) সৃষ্টি হলো। এইজন্য যেখানে যখন বৃষ্টি পড়ে, সেখানেই প্রভূত অন্ন উৎপন্ন হয়। এই অন্নই পৃথিবী। (ছান্দোগ্য-৬/২/৪)।।

.

.

তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজাণি ভবন্ত্যান্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্ ইতি। (ছান্দোগ্য-৬/৩/১)।। সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহম্ ইমাঃ তিস্র দেবতা অনেন জীবেন আত্মনাহনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি। (ছান্দোগ্য-৬/৩/২)।। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতা ইমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেন আত্মন

অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ। (ছান্দোগ্য-৬/৩/৩)।।
অর্থাৎ :
এই জগতে যত ভূত আছে, বিষয় আছে, জীবন আছে, সবই এই ত্রিবিৎকরণ বা তিনের (তেজ, জল, অন্ন) মধ্যে। যেমন– অণ্ডজ (ডিম থেকে জাত), জীবজ (জীব বা পিতামাতার থেকে জাত) এবং উদ্ভিজ্জ (উদ্ভিদ থেকে জাত)। এই তিনের বাইরে কিছু নেই। (ছান্দোগ্য-৬/৩/১)।। পূর্বোক্ত সেই সৎবস্তুস্বরূপ দেবতা আবার সঙ্কল্প করলেন, 'আমি এই তিন দেবতার (অর্থাৎ তেজ, জল ও অন্ন বা পৃথিবীর) মধ্যে আত্মরূপে অনুপ্রবেশ করে নিজেকে নামে রূপে প্রকাশ করি না কেন?' (ছান্দোগ্য-৬/৩/২)।। 'উক্ত তিন দেবতার প্রত্যেককে আগে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (তিন তিন ভাগে বিভক্ত) করে দিই। প্রত্যেকের মধ্যেই প্রত্যেকের কিছু কিছু অংশ ঢুকিয়ে দিই।' এই ভেবে তিনি এঁদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে নিজেকে নানা নামে-রূপে প্রকাশ করলেন। (ছান্দোগ্য-৬/৩/৩)।।
.
.
যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসঃ তদ্রূপং, যৎ শুক্লং তদপাং, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য; অপাগাৎ অগ্নেরগ্নিত্বং; বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং; ত্রীণিং রূপাণীত্যেব সত্যম্ । (ছান্দোগ্য-৬/৪/১)।। এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্বে মহাশালা মহাশ্রেত্রিয়া ন নোহদ্য কশ্চন অশ্রুতম্ অমতম্ অবিজ্ঞাতম্ উদাহরিষ্যতীতি, হি এভ্যো বিদ্যাঞ্চক্রুঃ। (ছান্দোগ্য-৬/৪/৫)।। যদু রোহিতমিবাভূদিতি তেজসঃ তদ্ রূপমিতি, তৎ বিদ্যাঞ্চক্রুঃ; যদু শুক্লমিবাভূদিতি অপাং রূপমিতি, তৎ বিদ্যাঞ্চক্রুঃ; যদু কৃষ্ণমিবাভূদিতি অন্নস্য রূপমিতি, তৎ বিদ্যাঞ্চক্রুঃ। (ছান্দোগ্য-৬/৪/৬)।। যদু অবিজ্ঞাতম্ ইব অভূৎ ইত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাস ইতি, তদ্বিদ্যাঞ্চক্রুঃ; যথা নু খলু সোম্য, ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ একৈকা ভবতি, তস্মে বিজানীহীতি। (ছান্দোগ্য-৬/৪/৭)।।
অর্থাৎ :
স্থূল অগ্নির যে লাল বা রক্তবর্ণ তা সূক্ষ্ম অগ্নির রূপ, যা সাদা বা শুক্লবর্ণ তা সূক্ষ্ম জলের রূপ, আর যা কালো বা কৃষ্ণবর্ণ তা সূক্ষ্ম অন্ন বা পৃথিবীর রূপ। এইভাবে অগ্নির অগ্নিত্ব দূর হলো। কারণ সব পরিবর্তন বা বিকারই শব্দাত্মক, নামমাত্র (অর্থাৎ অগ্নি একটি নাম মাত্র। এর দ্বারা একটি বিশেষ অবস্থাকে বোঝাচ্ছে)। এই তিনটি বর্ণই (অর্থাৎ তিনটি সূক্ষ্ম মহাভূতই) কেবলমাত্র সত্য। (ছান্দোগ্য-৬/৪/১)।। একথা জেনেই প্রাচীনকালে আদর্শ গৃহী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেছিলেন– 'আজ থেকে কোন ব্যক্তি আমাদের এমন কিছু বলতে পারবেন না যা আমরা শুনিনি, চিন্তা করিনি বা আমাদের জানা নেই।' কারণ লোহিতাদি এই তিন রূপের কথা তাঁরা জেনেছিলেন। (ছান্দোগ্য-৬/৪/৫)।। তাঁরা জেনেছিলেন যে, যা কিছু লাল বলে মনে হয় তা তেজের (অগ্নির) রূপ, যা কিছু সাদা বলে মনে হয় তা জলের রূপ, এবং যা কিছু কালো বলে মনে হয় তা অন্ন বা পৃথিবীর রূপ। (ছান্দোগ্য-৬/৪/৬)।। অন্য যা কিছু অজানা ছিলো, তাও যে এই তিন দেবতারই (অর্থাৎ তেজ, জল ও অন্ন বা পৃথিবীর) সমষ্টি বা সংযোগ তা তাঁরা বুঝেছিলেন। হে সোম্য জেনে নাও, এই তিন দেবতা কিভাবে

ত্রিবৃৎ হয়ে শরীর, মন, প্রাণ, বাক্য উৎপন্ন করছে। (ছান্দোগ্য-৬/৪/৭)।।
.
.
অন্নম্ অশিতং ত্রেধা বিধীয়তে; তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমঃ তন্মাংসং, যোহণিষ্ঠঃ তন্মনঃ। (ছান্দোগ্য-৬/৫/১)।। আপঃ পীতাঃ ত্রেধা বিধীয়ন্তে; তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ তন্মূত্রং ভবতি, যো মধ্যমস্তৎ লোহিতং, যোহণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ। (ছান্দোগ্য-৬/৫/২)।। তেজোহশিতং ত্রেধা বিধীয়তে; তস্য যঃ স্থবিষ্ঠোধাতুঃ তদস্থি ভবতি, যো মধ্যমঃ স মজ্জা, যোহণিষ্ঠঃ সা বাক্ । (ছান্দোগ্য-৬/৫/৩)।। অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণঃ তেজোময়ী বাগিতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি, তথা সোম্যেতি হোবাচ। (ছান্দোগ্য-৬/৫/৪)।।
অর্থাৎ :
আমরা যে অন্ন বা খাবার খাই তা শরীরের ভিতরে গিয়ে তিনভাগে বিভক্ত হয়। তার স্থূলতম অংশ মলে, মধ্যম অংশ মাংসে এবং সূক্ষ্মতম অংশ মনে পরিণত হয়। (ছান্দোগ্য-৬/৫/১)।। আমরা যে জল পান করি তা তিনভাগে বিভক্ত হয়। তার স্থূলতম অংশ মূত্রে, মধ্যম অংশ রক্তে এবং সূক্ষ্মতম অংশ প্রাণে রূপান্তরিত হয়। (ছান্দোগ্য-৬/৫/২)।। (ঘি, মাখন প্রভৃতি শক্তি-উৎপাদনকারী) তেজস্কর পদার্থ খেলে তা তিনভাগে বিভক্ত হয়। তার স্থূলতম অংশ অস্থি, মধ্যম অংশ মজ্জা এবং সূক্ষ্মতম অংশ বাক্-এ পরিণত হয়। (ছান্দোগ্য-৬/৫/৩)।। 'অতএব, হে সোম্য, মন অন্নের দ্বারা পুষ্ট হয় এবং প্রাণ জলের দ্বারা। আর বাক্ পরিপুষ্টি লাভ করে তেজের দ্বারা।' (শ্বেতকেতু বললেন)– 'আপনি আমাকে আবার বুঝিয়ে বলুন।' পিতা বললেন, 'হে সোম্য, তাই হোক।' (ছান্দোগ্য-৬/৫/৪)।।
.
.
ষোড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাহশীঃ। কামম্ অপঃ পিব। অপোময় প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যত ইতি। (ছান্দোগ্য-৬/৭/১)।। স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপসসাদ। কিং ব্রবীমি ভো ইতি। ঋচঃ সোম্য যজুংষি সামানীতি। স হোবাচ–ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি। (ছান্দোগ্য-৬/৭/২)।। তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোহভ্যাহিতস্যৈকঃ অঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাৎ, তেন ততোহপি ন বহু দহেদেবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাহতিশিষ্টা স্যাৎ, তয়া এতর্হি বেদান্নানুভবসি। অশান। অথ মে বিজ্ঞাস্যসীতি। (ছান্দোগ্য-৬/৭/৩)।। স হ আশ; অথ হৈনমুপসসাদ। তং হ যৎ কিঞ্চ পপ্রচ্ছ সর্বং হ প্রতিপেদে। (ছান্দোগ্য-৬/৭/৪)।। তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোহভ্যাহিতস্যৈকম্ অঙ্গারং খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং তং তৃণৈঃ উপসমাধায় প্রাজ্বলয়েৎ, তেন ততোহপি বহু দহেৎ। (ছান্দোগ্য-৬/৭/৫)।। এবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টা অভূৎ, সা অন্নেন উপসমাহিতা প্রাজ্বালী, তয়ৈতর্হি বেদান্ অনুভবসি। অন্নময়ং হি সোম্য মন, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাগিতি। তং হ অস্য বিজজ্ঞৌ ইতি, বিজজ্ঞাবিতি। (ছান্দোগ্য-৬/৭/৬)।।

অর্থাৎ :
হে সোম্য, মানুষের ষোলটি কলা বা অংশ আছে। তুমি পনেরো দিন কিছু আহার কোরো না। তবে যত ইচ্ছে জল পান কোরো। কারণ প্রাণ জলের ওপর নির্ভরশীল। জল পান করলে প্রাণ বিয়োগ হয় না। (ছান্দোগ্য-৬/৭/১)।। শ্বেতকেতু পনের দিন কিছু খেলেন না। তারপর পিতার নিকট উপস্থিত হতেই পিতা বললেন, 'সোম্য, তুমি তো সব বেদই অধ্যয়ন করেছো। আমাকে ঋক, যজুঃ, সাম বেদ থেকে কিছু মন্ত্র শোনাও তো।' শ্বেতকেতু বললেন, 'ওসব আমার কিছুই মনে পড়ছে না।' (ছান্দোগ্য-৬/৭/২)।। পিতা আরুণি শ্বেতকেতুকে বললেন, 'হে সোম্য, যদি বিশাল প্রজ্বলিত অগ্নির থেকে জোনাকি পোকার মতো ছোট একখণ্ড অঙ্গারমাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে তার দ্বারা তার চেয়ে বড় কোন বস্তু দগ্ধ করা যায় না। তেমনি তোমার ষোল কলার এক কলা মাত্র অবিশিষ্ট আছে। তার দ্বারা বেদসমূহ বুঝতে পারছো না। ভয় নেই। তুমি নিত্য অন্নভোজন শুরু করো। আহার করো, পরে আমার কথা বুঝতে পারবে। (ছান্দোগ্য-৬/৭/৩)।। শ্বেতকেতু এবার নিয়মিত অন্নাহার করে একদিন পিতার কাছে এলেন। পিতা তাঁকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন, সে সবই তিনি অনায়াসে বুঝতে ও বলতে পারলেন। (ছান্দোগ্য-৬/৭/৪)।। পিতা তাঁকে বললেন, 'হে সোম্য, প্রায় নিভে যাওয়া বিশাল অগ্নিকুণ্ডের সেই জোনাকি পোকার মতো ছোট অঙ্গারটিকে যদি খড়কুটো দিয়ে আবার দাউ দাউ বাড়িয়ে তোলা যায় তবে তার দ্বারা আগের চেয়েও বেশি পরিমাণ বস্তু দগ্ধ করা যায়।' (ছান্দোগ্য-৬/৭/৫)।। 'তেমনি হে সোম্য, তোমার ষোলটি কলার এক কলা মাত্র অবশিষ্ট ছিলো। সেই কলাটি অন্নের দ্বারা বর্ধিত হয়ে প্রজ্বলিত হয়েছে। এখন তার দ্বারাই তুমি বেদ বুঝতে পারছো, সহজে বলে যেতে পারছো। অতএব হে সোম্য, এখন বুঝতে পারছো কেন আমি বলেছি মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময় !' তখন শ্বেতকেতু পিতা আরুণির উপদেশ বুঝতে পারলেন। (ছান্দোগ্য-৬/৭/৬)।।

এই আখ্যানের মাধ্যমে বর্ণিত উপদেশের মূল কথা হলো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণকে 'নিছক সৎ' বলেই উল্লেখ করতে হবে। এই 'সৎ' থেকে পর্যায়ক্রমে আগুন, জল এবং অন্নর উৎপত্তি। আগুনের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে 'বাক্', জলের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে প্রাণ এবং অন্নের সূক্ষমত অংশ থেকে মন উৎপন্ন হয়। শেষ কথাটা– অর্থাৎ নিছক অন্ন থেকে কীভাবে 'মন' উৎপন্ন হতে পারে– সে-বিষয়ে পুত্র পিতা উদ্দালককে একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার অনুরোধ জানালে ব্যাখ্যা হিসেবে উদ্দালক একটা পরীক্ষা করে কথাটার প্রমাণ দিলেন। পুত্রকে তিনি বললেন, পনেরো দিন অন্নভক্ষণ বন্ধ রাখো, কিন্তু জল পান কোরো, কেননা জল থেকেই প্রাণের উৎপত্তি বলে এই পনেরো দিন জল পান করলে প্রাণসংশয় হবে না। ছেলে পনেরো দিন অন্নভক্ষণ বন্ধ রাখলেন, কিন্তু জল পান করে প্রাণরক্ষা করলেন। তারপর উদ্দালক বললেন, বারো বছর ধরে গুরুর কাছে যে-বেদ মুখস্থ করেছো তা আবৃত্তি করে শোনাও। শ্বেতকেতু চেষ্টা করেও বিফল হলেন; বললেন, কিছুই মনে পড়ছে না। পিতা বললেন, অন্ন থেকেই মনের উৎপত্তি; পনেরো দিন কিছু খাওনি বলে তোমার মনের এই অবস্থা– উপনিষদের ভাষায় 'মন' অন্নাভাবে (সাময়িকভাবে) লুপ্ত হয়েছে। এবার ফিরে গিয়ে পনেরো

দিন ধরে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে আবার এসো। শ্বেতকেতু তা-ই করলেন। উদ্দালক বললেন, এবার বেদ আবৃত্তি করে শোনাও। এবার দেখা গেলো, ছেলের বেদ মনে পড়ছে; আবৃত্তি করতে কোনো অসুবিধে হলো না। উদ্দালক বললেন, তাহলে তো দেখতেই পাচ্ছো, অন্ন থেকেই মনের উৎপত্তি!
একেবারে যাকে বলে হাতে-নাতে প্রমাণের আয়োজন। অন্ন-র বর্তমানতায় মনও বর্তমান, অন্ন-র অবর্তমানতায় মন বিলুপ্ত হয়। তাহলে 'মন' বলে যা উল্লেখ করা হয় তা অন্ন থেকেই উৎপন্ন!

এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, উপনিষদ্-সাহিত্যের রচনাকাল আজ থেকে অন্তত আড়াই হাজার বছরেরও বেশি আগেকার ব্যাপার। তখন সবে দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে; দার্শনিক পরিভাষা মার্জিত হতে তখনো বাকি। তাই পরের যুগে 'চৈতন্য', 'মন', 'স্মৃতি' প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের যে-পার্থক্য করার আয়োজন, উপনিষদের যুগে তা প্রত্যাশা করা ইতিহাস-বোধের পরিচায়ক হবে না বলে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন। তখন 'মন' শব্দ দিয়েই সাধারণভাবে চেতনা প্রভৃতি সবকিছুই বোঝা হতো। অতএব, জয়ন্তভট্টর লেখার সঙ্গে এদিক থেকে অনেকটাই তফাৎ থাকবার কথা। তাই পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাকদের ভূতচৈতন্যবাদ বর্ণনার সঙ্গে উদ্দালকের প্রকাশ-ভঙ্গি হুবহু একই হবার কথা নয়। কিন্তু মূল যুক্তিটা যে একই– এবিষয়ে সংশয়ের বিশেষ অবকাশ নেই।

প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ জ্যাকবি ও রুবেন যে-মূল যুক্তি দেখিয়ে উদ্দালককে বস্তুবাদী বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তার মূল কথাটিও এই প্রসঙ্গে দেখা দরকার। এক্ষেত্রে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নাতিদীর্ঘ বক্তব্য থেকেই বিষয়টা খোলাশা হয়ে যায়–
'উপনিষদ্-এর অন্যান্য প্রখ্যাত দার্শনিকেরা পরম সত্য বা জগতের আদিকারণ হিসেবে 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সমগ্র উপনিষদ্-সাহিত্যের কোথাওই উদ্দালকের মুখে 'ব্রহ্ম' শব্দ নেই। তার বদলে তিনি 'সৎ এব' বা 'নিছক সৎ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। জ্যাকবি, রুবেন প্রমুখের দাবি হলো, এই 'সৎ'-কে সাংখ্য-দর্শনের 'প্রকৃতি' বা 'প্রধান'-এর মতোই স্বয়ং-অচেতন বস্তু অর্থে গ্রহণ করতে হবে। ফলে উদ্দালকের মতে স্বয়ং-অচেতন বস্তুই জগৎকারণ; তা থেকেই চৈতন্য প্রভৃতির উৎপত্তি। অর্থাৎ বস্তুবাদই।
বলাই বাহুল্য, বেদান্ত বা উপনিষদ্-এর কোনো ব্যাখ্যাকারই একথা মানেন নি এবং তাঁদের কারুর পক্ষেই কথাটা মানা সম্ভব নয়। বেদান্তমতের ব্যাখ্যাকার শঙ্কর এবং রামানুজ পারস্পরিক মতপার্থক্য ভুলে জোর গলায় এবং একই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, উদ্দালকের 'সৎ'-কে কিছুতেই অচেতন পদার্থ বলে মানা যায় না। তাঁদের প্রতিটি যুক্তির মূল্য সমান নয় এবং এখানে তা উল্লেখ করার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু চরম যুক্তি হিসেবে উভয়েই যা বলেছেন সে-বিষয়ে অন্তত একটা মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যুক্তিটা হলো : পুত্র শ্বেতকেতু মোক্ষলাভের আশায় উদ্দালকের কাছে জ্ঞান ভিক্ষা করেছিলেন; কিন্তু অধ্যাত্মজ্ঞান ছাড়া মোক্ষলাভের কোনো পথ অসম্ভব বলেই পিতার পক্ষে পুত্রকে অচেতন

কোনো পদার্থের উপদেশ দিয়ে বিভ্রান্ত করা তো বঞ্চনারই সামিল হবে। নিজের ছেলেকে কেউ এইভাবে ঠকাতে পারে নাকি?
আধুনিক বৈদান্তিক মহলে এ-হেন যুক্তি কম-বেশি বাহবা পেলেও যুক্তিটা নিয়ে কিছুটা মুস্কিল আছে। সমগ্র উপনিষদ্-সাহিত্যে কোথাও বলা হয়নি যে মোক্ষলাভের আশায় শ্বেতকেতু উদ্দালকের উপদেশ চেয়েছিলেন। 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ্'-এর উপাখ্যানটা থেকে বরং উল্টো কথাই অনুমান হয় : গুরুগৃহে বারো বছর বেদ পড়ে বিদ্যার অভিমান নিয়ে ছেলে বাড়ি ফিরলে উদ্দালক তাকে দেখাতে চান সে-অভিমান আসলে অন্তঃসারশূন্য, কেননা অতদিন ধরে বেদ পড়া সত্ত্বেও প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্ব ছেলের মাথায় ঢোকেনি এবং 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ্'-এ কোথাও এমন ইংগিতমাত্রও নেই যে উদ্দালক-বর্ণিত দার্শনিক তত্ত্বর সম্যক উপলব্ধি থেকেই মোক্ষ বা মুক্তিলাভ সম্ভব। অন্য কোনো উপনিষদ্-এও উদ্দালকের নামের সঙ্গে মোক্ষ বা মুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্যই, উদ্দালকের মতে যেহেতু আদিম বা পরম সত্য 'নিছক সৎ' এবং এই সৎ থেকেই যেহেতু দেহ-বাক্-প্রাণ-মন– মানুষের সবকিছুরই উদ্ভব, সেইহেতু শেষ পর্যন্ত মানষ ওই সৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। কথাটা ছেলের মাথায় ভালো করে ঢোকাবার জন্যে উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন : তুমি আসলে ওই সৎ-ই 'তৎ ত্বম্ অসি'। চলতি কথায় আজকাল যাকে বলি একটা ফর্মুলার মতোই। পরবর্তীকালের বৈদান্তিকেরা এই ফর্মুলার 'তৎ' বলতে পরব্রহ্ম মাত্র– এ-জাতীয় ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করে ফর্মুলাটাকে ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদসূচক একটা মস্ত নজির (মহাবাক্য) হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা কষ্টকল্পনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলে গ্রহণ করলেও উপনিষদ্-এর বাস্তব সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার কোনো কারণ নেই। 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্'-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্দালকের মত বিস্তৃতভাবে আলোচিত; তার মধ্যে আত্মার কথা কোথাও নেই। উপনিষদ্-সাহিত্যের অন্যত্র বরং উল্টো কথাই চোখে পড়ে। উদ্দালককে প্রশ্ন করা হলো : আত্মা বলতে আপনি কী বোঝেন? উদ্দালক সবিনয়ে উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে, আমার কাছে এই পৃথিবীই আত্মা' (ছান্দোগ্য-৫/১৭/১)। এ-হেন পৃথিবী-সর্বস্ব দার্শনিকটিকে যেন তেন প্রকারে ভাববাদীদের দলে ভেড়াবার জন্যে শঙ্কর-রামানুজ অনেক প্রয়াস করেছেন; কিন্তু অন্তত উপনিষদ্-এর কোনো সাক্ষ্য থেকেই তা স্বীকার করার সম্ভাবনা নেই।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১০৫-৬)

এমনকি উপনিষদ্-বহির্ভূত কোনো সাক্ষ্য থেকেও উদ্দালক আরুণিকে ভাববাদীর দলে ভেড়ানোর সুযোগ নেই। পরবর্তীকালের বৈদান্তিকেরা উদ্দালক আরুণির পুত্র শ্বেতকেতুকে মূলতই মোক্ষ-অভিলাষী বলে বর্ণনা করলেও, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত ঐতিহ্যের সঙ্গে তার কোনো মিল হয় না। কেননা, 'কামসূত্র'-র দাবি অনুসারে এই শ্বেতকেতুই কামশাস্ত্রের আদি প্রবক্তা বলে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন।
এই মন্তব্য যে অহেতুক না তা বোঝা যায় 'কামসূত্র'-এ বাৎস্যায়নের স্বীকৃতি বক্তব্য থেকেই–
ধর্ম্মার্থকামেভ্যো নমঃ।। (কামসূত্র-১/১/১)।
শাস্ত্রে প্রকৃতত্বাৎ।। (কামসূত্র-১/১/২)।

তৎসময়াববোধকেভ্যশ্চাচার্যেভ্যঃ।। ইতি।। (কামসূত্র-১/১/৩)।
তৎসম্বন্ধাৎ।। ইতি।। (কামসূত্র-১/১/৪)।
প্রজাপতির্হি প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসাং স্থিতিনিবন্ধনং ত্রিবর্গস্য
সাধনমধ্যায়ানাং শত সহস্রেনাগ্রে প্রোবাচ।। (কামসূত্র-১/১/৫)।
তস্যৈকদেশিকং মনুঃ স্বায়ম্ভুবো ধর্ম্মাধিকারিকং পৃথক্ চকার।। (কামসূত্র-১/১/৬)।
বৃহস্পতিরর্থাধিকারিকম্ ।। (কামসূত্র-১/১/৭)।
মহাদেবানুচরশ্চ নন্দী সহস্রেণাধ্যায়ানাং পৃথক্ কামসূত্রং প্রোবাচ।। (কামসূত্র-১/১/৮)।
তদেব তু পঞ্চভি-রধ্যায়শতৈ রৌদলিকিঃ শ্বেতকেতুঃ সঞ্চিক্ষেপ।। (কামসূত্র-১/১/৯)।
অর্থাৎ :
(গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর-এর তর্জমা)
ধর্ম্ম,অর্থ ও কামের উদ্দেশে নমস্কার। (কামসূত্র-১/১/১)।। সেই সকল দেবতার অধিকারেই এই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইতেছে। (কামসূত্র-১/১/২)।। যে সকল আচার্য্য ধর্ম্মাদির আচার নিজে করিয়াছেন, পরকে ব্যবহার করাইয়াছেন এবং তাহার সঞ্চয় করিয়া গ্রন্থাকারে আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল আচার্য্যকেও নমস্কার। (কামসূত্র-১/১/৩)।। এই শাস্ত্রে তাঁহাদিগের সম্বন্ধ আছে,– এইজন্য। (কামসূত্র-১/১/৪)।। আগম প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, প্রজাপতি আদিকবি ব্রহ্মা প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের স্থিতির (সম্যক পালনের) জন্য প্রথমে লক্ষ অধ্যায়াত্মক ত্রিবর্গ সাধন বিশদভাবে বলিয়াছিলেন। (কামসূত্র-১/১/৫)।। তাহার ঐকদেশিক ধর্ম্মাধিকারিক স্বায়ম্ভুব মনু পৃথক করিয়াছিলেন। (কামসূত্র-১/১/৬)।। বৃহস্পতি অর্থাধিকারিক শাস্ত্রকে পৃথক করিয়াছিলেন। (কামসূত্র-১/১/৭)।। মহাদেবের অনুচর নন্দী সহস্র অধ্যায়াত্মক কামসূত্রকে পৃথক করিয়া বিশদভাবে বলিয়াছিলেন। (কামসূত্র-১/১/৮)।। ঔদ্দালিকি শ্বেতকেতু তাহাই পাঁচশত অধ্যায় দ্বারা সংক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন। (সংগ্রহ করিয়াছিলেন)। (কামসূত্র-১/১/৯)।।

কামশাস্ত্র আর যাই হোক মোক্ষশাস্ত্র নয়। তাই পরবর্তীকালের বৈদান্তিকদের দাবি মানতে গেলে আরো মানতে হবে যে পিতার কাছে মোক্ষধর্মের উপদেশ পেয়েও পুত্র কিন্তু নেহাতই বিপথগামী হয়েছিলেন। এমনতর কথা হজম করা সোজা নয়। কিন্তু দেবীপ্রসাদ বলেন, এমন কথা হজমের চেষ্টা করার দরকার নেই। ‘কেননা, উদ্দালক শ্বেতকেতুকে সত্যিই মোক্ষধর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন– এ-হেন দাবিটাই কাল্পনিক। বরং বেণীমাধব বড়ুয়া দেখাবার চেষ্টা করেছেন, ‘বৃহদারণ্যক উপনিষদ্’-এর সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ হয়, স্বয়ং উদ্দালকেরও কামশাস্ত্রে আগ্রহ ছিল। কেননা ‘বৃহদারণ্যক’-এর এই অংশে উদ্দালক প্রজনন-সমর্থ কোনো একরকম মণ্ড প্রস্তুতের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।’
কিন্তু বর্তমান আলোচনায় আমাদের পক্ষে সে-আলোচনায় প্রবেশ করার সুযোগ নেই, দরকারও নেই। তার চেয়ে বরং অন্য উপনিষদ্-সাহিত্যেও একটু দৃষ্টি ফেলা যাক।

। এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদ-এ বস্তুবাদের নজির।
উপনিষদের দৃষ্টান্তে শুধু যে ছান্দোগ্যের উদ্দালক আরুণিই একমাত্র বস্তুবাদী নজির হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, মোটেও তা নয়। অন্যান্য উপনিষদেও অলৌকিক ভাববাদের মোড়কে ভেতরে বয়ে যাওয়া অন্তঃসলিলা বস্তুবাদী কামনা-প্রাধান্যের নজির বিরল নয়। যেমন, 'তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্' তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত– শীক্ষাবল্লী, ব্রহ্মানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী। শীক্ষাবল্লীকে বলা হয়েছে ব্রহ্মানন্দবল্লীর ভূমিকা বা প্রস্তুতিপর্ব। এই প্রস্তুতিপর্বে ব্রহ্মানন্দ লাভের প্রস্তুতিটা কীরকম তা বোঝার জন্য ঐ উপনিষদ থেকে একটি প্রার্থনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে–

'আবহন্তী বিতন্বানা কুর্বাণা চীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ অন্নপানে চ সর্বদা।
ততো মে শ্রিয়মাবহ লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা।
আ মাযন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্র মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।
দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।। (তৈত্তিরীয়-১/৪/২)
অর্থাৎ :
আমাকে বস্ত্র দাও, গোধন দাও, অন্ন দাও, পানীয় দাও, মেষ প্রভৃতি লোমশ পশু দাও, আমাকে শ্রী অর্থাৎ সৌভাগ্য সমৃদ্ধি দান করো যেন এদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ব্রহ্মচারীরা বেদ অধ্যয়নের জন্য আমার কাছে আসুক, যথাবিধি আসুক। তারা আমার কাছে দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে দমন করা এবং শম অর্থাৎ চিত্তের স্থৈর্য অভ্যাস করতে আসুক।।

এ-প্রেক্ষিতে হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের আকর্ষণীয় মন্তব্যটি হলো– 'একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, এ জগৎ মিথ্যা' এহেন উত্তুঙ্গ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য প্রস্তুতিপর্বটি খুবই উপভোগ্য। এই মিথ্যা জগতের মিথ্যা অন্নজল খেয়ে মিথ্যা বেঁচে না থাকলে, সব কিছু মিথ্যা মায়া মাত্র এই দিব্য জ্ঞান হবে কী করে? তবে একটা ধাঁধা থেকে গেল। 'বেদান্তসূত্র'-র ভাষ্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী কে হতে পারে, কী কী গুণসম্পন্ন হলে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে, এর উত্তরে শংকর চারটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে রয়েছে 'ইহমুত্রার্থভোগবিরাগঃ' অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক সকল রকম সুখভোগ লালসার প্রতি বৈরাগ্য। তা হলে ব্রহ্মানন্দে পৌঁছাবার জন্য সাংসারিক সুখসমৃদ্ধি লাভের এই আকুল আকূতি কেন? এর মধ্যে শংকর-কথিত বৈরাগ্যের লক্ষণ কোথায়? এই আকুল আবেদন যে মূল উপনিষদেই রয়েছে।'- (চার্বাকদর্শন, পৃষ্ঠা-৭৩)

এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে ব্রহ্মানন্দপল্লী ও ভৃগুপল্লীতে যেখানে ব্রহ্মের পাঁচটি কোশ বা স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। 'কোশ' শব্দের অর্থ আবরণও হতে পারে। বহিরাবরণ অন্তরাবরণ রূপে একটি স্থূল আবরণের মধ্যে পরপর সূক্ষ্মতর আবরণের কল্পনা করা হয়েছে। তা হলে অর্থ দাঁড়ালো মূল থেকে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর রূপে পাঁচটি কোশস্তর রয়েছে– (১) অন্নময় কোশ, (২) প্রাণময় কোশ, (৩) মনোময় কোশ, (৪) বিজ্ঞানময় কোশ এবং (৫) আনন্দময় কোশ।

চরম ভাববাদের প্রতিনিধি মায়াবাদী শঙ্করের ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ প্রতিপাদনে ব্যাপৃত কূটকচালের

কথা ভুলে গিয়ে যদি এই পঞ্চকোশস্তরের স্বাভাবিক তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করা যায় তা হলে স্বভাবতই মনে হবে যে পাঁচটি কোশস্তর হলো মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশধারা যা মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র উন্নততর প্রাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'এই স্বাভাবিক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত উপনিষদেই রয়েছে। মনুষ্যত্ব লাভ করতে হলে মানুষকে সর্বপ্রথম প্রাণী রূপে বেঁচে থাকতে হবে এবং বেঁচে থাকতে হলে পৃথিবী থেকে অন্ন জল ও বায়ু সংগ্রহ করতে হবে। সুতরাং অন্নই ব্রহ্ম। উপনিষদের ভাষায় অন্ন থেকেই প্রাণীগণ জন্মগ্রহণ করে। অন্নের দ্বারাই প্রাণীগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।'–

'অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে। সর্বং বৈ তেহন্নমাপ্লুবন্তি। যেহন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্টম্ । তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে। অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে। অদ্যতেহত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যতে। ইতি। (তৈত্তিরীয়-২/২/১)।।

তস্মাদ্বা এতস্মাৎ অন্নরসময়াৎ। অন্যোহন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষাবিধতাম্ । অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। (তৈত্তিরীয়-২/২/২)।।

অর্থাৎ :

পৃথিবীকে আশ্রয় করে আছে যত প্রজা (প্রাণী) সবার জন্ম অন্ন থেকে। অন্নেই জীবন ধারণ করে। আবার জীবন শেষে ঐ অন্নের মধ্যেই ফিরে যায়। কারণ অন্নই হলো সবার বড়। বস্তুর মধ্যে সর্বপ্রথম অন্নের জন্ম। তাই (অন্নময় এই জীবনের) অন্নই হলো সর্বৌষধি (ক্ষয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবার একমাত্র মাধ্যম)। যে অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে সে কাম্য বস্তু অন্ন বা দেহের উপভোগের যাবতীয় বস্তুই পায়। (তৈত্তিরীয়-২/২/১)।। এই অন্নরসময় বা অন্নময় কোশ ছাড়া এর ভেতরে একটি প্রাণময় আত্মা আছে। এটি প্রাণময় কোশ। এই আত্মা অন্নময় কোশকে সম্পূর্ণ ঢেকে রেখেছে, পরিপূর্ণ করে রেখেছে। অন্নময় দেহের মত প্রাণময় এই দেহটিও পুরুষাকার– পাখির মতো। প্রাণ এর মাথা, ব্যান বায়ু (যে বায়ুর সর্বত্র অবাধ গতি) তার দক্ষিণ বাহু। অপান বায়ু (নিম্নগামী বায়ু) তার বাম বাহু। আকাশ তার আত্মা। পৃথিবী তার পুচ্ছ। (তৈত্তিরীয়-২/২/২)।।

'অন্ন দৃষ্টিগোচর স্থূল পদার্থ। কিন্তু বাঁচার জন্য আর একটি সূক্ষ্ম পদার্থ দরকার। সে হলো বায়ু, দৃষ্টিগোচর নয়, স্পর্শগোচর। জলকে বোধ হয় অন্নের মধ্যেই ধরা হয়েছে। পরে স্থানান্তরে জলের কথাও আছে। অন্ন জল ও বায়ু প্রাণধারণের প্রধান উপকরণ। বায়ু ও জল পৃথিবী থেকে সংগৃহীত হয়। তাই পৃথিবী এদের পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ভিত্তিভূমি।'

'তৃতীয় কোশ হলো মন। মন মানুষের মননশীলতা বা বিচারশীলতার উপকরণ। এখান থেকেই অন্য প্রাণী হতে মানুষের স্বাতন্ত্র্য সূচিত হলো। উপনিষদ যেহেতু বৈদিক সাহিত্যের অংশ সেহেতু উপনিষদের বক্তা এস্থলে মনোবৃত্তিকে চতুর্বেদের মননের মধ্যে সীমাবদ্ধ

করেছেন।’–

‘তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোহন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্ । অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তর পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। (তৈত্তিরীয়-২/৩/২)।।

অর্থাৎ :

অন্নময় কোষ নিয়ে শরীরের যিনি আত্মা, তিনি প্রাণময় কোষেরও আত্মা– একই আত্মা। এছাড়া আর একটি আত্মা (কোশ) আছে– সেটি হলো মনোময় কোশ। এই মনোময় কোশ প্রাণময় কোশকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। এরই আকার পাখিরূপী মানুষের মতো। এর শির বা মাথা হলো যজুর্বেদ। ঋগ্বেদ ডান পাখা বা ডান বাহু। সামবেদ বাম পাখা বা বাম বাহু। এই মনোময় কোশের বা দেহের আত্মা হলো আদেশ (বেদের ব্রাহ্মণভাগ)। আর পুচ্ছ অবস্থান করে আছে অথর্ববেদের ঋষি অথর্বা ও আঙ্গিরসের দর্শনের ওপর। (তৈত্তিরীয়-২/৩/২)।।

মনের মননশীলতা বা মনোবৃত্তিই হলো বিজ্ঞান বা বিশিষ্ট উন্নততর জ্ঞানের ভিত্তি। মানুষ মনের দ্বারাই বিশ্বচরাচর সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে। একেই বলা হয়েছে বিজ্ঞানময় কোশ বা বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম। বৈদিক ঋষির মতে বেদই হলো সকল জ্ঞানের আধার। তাই উপনিষদের ঋষি এই জ্ঞানকে বেদজ্ঞানে সীমাবদ্ধ করেছেন।–

‘তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ মনোময়াৎ। অন্যোহন্তরঃ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্ । অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। (তৈত্তিরীয়-২/৪/২)।।

অর্থাৎ :

প্রাণময় কোশের আত্মা এবং মনোময় কোশের আত্মা অভিন্ন। এছাড়া এর ভেতরে আর একটি আত্মা বা কোশ আছে। তা হলো বিজ্ঞানময় কোশ। এই বিজ্ঞানময় কোশ প্রাণময় কোশকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। এরও আকার পাখিরূপ পুরুষাকার– প্রাণময় কোষের অনুরূপ। এর মাথা হলো শ্রদ্ধা। ঋত এই পাখিরূপী পুরুষাকার কোশের ডান পক্ষ বা ডান বাহু। সত্য হলো উত্তর পক্ষ বা উত্তর বাহু। যোগ হলো তার আত্মা। আর এই কোশময় শরীর অবস্থান করে আছে মহ বা মহত্ত্বের ওপর। (তৈত্তিরীয়-২/৪/২)।।

যাজ্ঞিক মতে বেদজ্ঞানের উপযোগিতা নিখুঁতভাবে বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ। এই সব অনুষ্ঠানের দ্বারা উৎপন্ন হয় বাঞ্ছিত ফললাভের আনন্দ। আনন্দই জীবনের লক্ষ্য। এভাবেই অন্নব্রহ্ম থেকে আনন্দব্রহ্মে উত্তরণ। আনন্দব্রহ্মের দুটি পক্ষ, একটি ‘মোদ’ অপরটি ‘প্রমোদ’। আনন্দব্রহ্মের শির বা মস্তক হলো ‘প্রিয়’ (প্রার্থিত বস্তুর দর্শনজনিত সুখ)। ‘মোদ’ শব্দের অর্থ ইষ্ট বস্তুলাভজনিত সুখ। ‘প্রমোদ’ শব্দের অর্থ ইষ্ট বস্তুর ভোগজনিত সুখ।–

‘তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্ । অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। (তৈত্তিরীয়-২/৫/২)।।
অর্থাৎ :
মনোময় কোশের যে আত্মা, বিজ্ঞানময় কোশেরও সেই একই আত্মা থাকলেও আর একটি আত্মা আছে, তা আনন্দময় কোশ। বিজ্ঞানময় কোশকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে আনন্দময় কোশ। এই কোশও বিজ্ঞানময় কোশের মতোই পুরুষাকৃতিসম্পন্ন। প্রিয় হলো তার শির বা মাথা। মোদ হলো পাখিরূপী সেই পুরুষের ডান পক্ষ বা বাহু। প্রমোদ হলো বাম পক্ষ বা বাহু। আনন্দ তার আত্মা। আর ব্রহ্ম তার পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠা। (তৈত্তিরীয়-২/৫/২)।।

নিজ মতের উপযোগী ভাষ্য তৈরি করতে অনেক চেষ্টাচরিত করেও জুত করতে না-পেরেই হয়তো ব্রহ্মাদ্বৈতবাদী আচার্য ‘শঙ্কর বলতে বাধ্য হলেন ব্রহ্মের এই পাঁচটি স্তরই ভৌতিককার্যস্বরূপ গৌণব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য, পরম কারণ-স্বরূপ চৈতন্যময় পরব্রহ্ম বা মুখ্যব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। মুখ্যব্রহ্মই এই গৌণব্রহ্মের ভিত্তি (‘পুচ্ছ’)। উপনিসদুক্ত পঞ্চকোশী ব্রহ্ম ‘পুরুষবিধ’ বা পাঞ্চভৌতিকদেহাশ্রিত, তাই গৌণ।’- (হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, চার্বাবদর্শন, পৃষ্ঠা-৭৪)
তার মানে, ব্রহ্মাদ্বৈতবাদী শঙ্করের এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মও ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধে একাধিক হতে পারেন– একজন মুখ্যব্রহ্ম বা পরমব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্ম, অন্যজন গৌণব্রহ্ম বা স্বগুণ ব্রহ্ম। অদ্বৈত-বেদান্তমতে এই স্বগুণ ব্রহ্ম আসলে জগতের মতোই মিথ্যা ভ্রম বা মায়া, ব্যবহারিক প্রয়োজনেই কল্পিত হন মাত্র।

কিন্তু শঙ্কর যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, ‘তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্’-এর ভৃগুপল্লী বা অন্তিম অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় সেখানে বারবার বলা হয়েছে– এই পৃথিবীর অন্ন জল বায়ু উপেক্ষা করবে না। প্রচুর অন্ন উৎপাদনের চেষ্টা করবে, তবেই তুমি মহান হবে, পশুসম্পদ ও সন্তানসম্পদ লাভ করবে, ব্রহ্মতেজের অধিকারী হবে, কীর্তিতে মহান হবে। অন্ন জল বায়ু ও তেজের উপাসনা করো। যেমন–
‘অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ ব্রতম্ । প্রাণো বা অন্নম্ । শরীরম্ অন্নাদম্ । প্রাণে শরীরং প্রতির্ষ্ঠিতম্ । শরীরে প্রাণঃ প্রতির্ষ্ঠিতঃ। তদেতং অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ । স য এতদ্ অন্নম্ অন্নে প্রতির্ষ্ঠিতং বেদ প্রতিতির্ষ্ঠতি। অন্নবান্ অন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা। (তৈত্তিরীয়-৩/৭/১)।।
অর্থাৎ :
অন্নকে কখনও নিন্দা করবে না। এটা তোমার ব্রত,– তোমার কর্তব্য-কর্ম। প্রাণই অন্ন আর শরীর অন্নভোক্তা। প্রাণে শরীর প্রতির্ষ্ঠিত। শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। এই অন্ন এভাবে আরেক অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এভাবে অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলে জানেন, তিনিই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত

হন। সুপ্রচুর অন্নের মালিক হয়ে অন্নভোক্তা তো হনই, এমনকি পুত্রাদি, পশু, ব্রহ্মতেজ এবং কীর্তিতেও মহান হন। (তৈত্তিরীয়-৩/৭/১)।।

অন্যান্য উপনিষদ্ থেকে 'তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্'-এর একটা বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হলো, এই উপনিষদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'অন্নচিন্তা' আর 'অন্নস্তুতি'। প্রথম পর্বেই বেঁচে থাকার আকুল আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করেছি– অন্ন চাই, জল চাই, বস্ত্র চাই, গৃহপালিত পশু চাই। শেষ পর্যন্ত একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। উপসংহারটি আরও উল্লেখযোগ্য–

'অহমন্নম্-অহমন্নম্-অহমন্নম্ । অহমন্নাদো ৩ হহমন্নাদো ৩ হহমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা ৩ স্য। পূর্বং দেবেভ্যোহমৃতস্য না ৩ ভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেব মা ৩ বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তম ৩ স্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবা ৩ ম্ । সুবঃ ন জ্যোতীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ। (তৈত্তিরীয়-৩/১০/৬)।।
অর্থাৎ :
আমি অন্ন... আমি অন্ন... আমি অন্ন। আমিই অন্ন গ্রহণ করি... আমিই অন্ন গ্রহণ করি। আমিই শ্লোক রচনা করি... আমিই শ্লোক রচনা করি... আমিই শ্লোক রচনা করি। এই মূর্ত-অমূর্ত জগতে আমিই সবার আগে প্রথম উৎপন্ন হয়েছি। দেবতাদেরও পূর্বে আমি জন্মেছি। আমিই অমৃতের অধিষ্ঠান। যে অন্নস্বরূপ আমাকে অন্নপ্রার্থীর হাতে নির্দ্বিধায় তুলে দেয়, দান করে, সে সেভাবেই আমাকে রক্ষা করে। আর অন্নার্থ যাকে বিমুখ করে অন্নদান না করে নিজের উদরপূর্তি করে, সেই অসদাচারীকে আমিই ভক্ষণ করি। সূর্যের মতোই আমি স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ময়। আমারই অভিব্যক্তি, আমারই প্রকাশ লোকালোক নিয়ে এই ভুবন। এই জ্ঞান যার আয়ত্তে, সবকিছুই তার আয়ত্তে। এই রহস্য যে জেনেছে, তার সবই জানা হয়েছে। এই হলো উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। (তৈত্তিরীয়-৩/১০/৬)।।

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন– 'আমিই অন্ন, কারণ আমিই অন্ন ভক্ষণ করে 'আমি' হয়েছি (অহমন্নম্ অহমন্নাদঃ)। অন্ন-রসময় উপাদানসমন্বিত দেহেই চেতনারূপে আমি আবির্ভূত হয়েছি। এই জগতে আমিই প্রথম চেতনা-সমৃদ্ধ জীব, তাই আমি দেবতাদেরও পূর্বে জন্মেছি। আমিই অমৃতের অধিষ্ঠান। স্পষ্টতই এখানে 'আমি' বলতে মানব জাতিকে বোঝাচ্ছে। এর পরের কথাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ, আমাকে বঞ্চিত করে কেউ যদি একা একা অন্ন ভক্ষণ করে, তাহলে আমি তাকে ভক্ষণ করি। তাৎপর্য অতি পরিচ্ছন্ন। অন্যকে বঞ্চিত করে কেউ একা অন্ন ভক্ষণ করবে না। তাহলে সমাজে একে অন্যকে ভক্ষণ করবে। অর্থাৎ মানবসমাজ ধ্বংস হবে।'- (চার্বাকদর্শন, পৃষ্ঠা-৭৭)

হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় আরো বলছেন– 'সমস্ত উপনিষদটি পরিব্যাপ্ত করে আছে অন্নস্তুতি এবং অন্নসমৃদ্ধ মানুষের মহিমা। শংকর কিন্তু এর মধ্যে যেখানেই আমি রয়েছে সেখানেই 'অহং' শব্দের অর্থ করেছেন, চৈতন্যস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মা। সুতরাং অন্নময়ী পৃথিবী মায়া মাত্র। স্তুতি বন্দনা করা হয়েছে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে। তাই শংকরের সিদ্ধান্ত, অন্নব্রহ্ম থেকে আনন্দব্রহ্ম

পর্যন্ত অমুখ্য, গৌণ বা কার্য ব্রহ্মের কথাই বলা হয়েছে। না বলে উপায় কী? আনন্দব্রহ্মের স্তুতি করতে গিয়ে ঋষি বলেছেন, যিনি আনন্দব্রহ্মকে জানেন তিনি প্রচুর অন্নের অধিকারী হন, প্রচুর পশু ও সন্তানের অধিকারী হন, প্রভূত যশ লাভ করেন। এই কি শংকরের ব্রহ্মানন্দ? কী করে হবে? ঋষি যে বলেছেন, মানুষের বাঁচার জন্য প্রচুর অন্ন ফলাতে হবে (অন্নং বহু কুর্বীত)। লক্ষ রাখতে হবে ঋষি আনন্দময় কোশের কথা বলেই আবার অন্নস্তুতিতে ফিরে গেলেন এবং অন্নের মহিমা দিয়েই উপসংহার করলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শংকরকে অনেক কসরত করতে হয়েছে। 'চৈতন্যস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই সৎ' এই মত তৈত্তিরীয় উপনিষদ-এর দোহাই দিয়ে প্রমাণ করা খুবই কষ্টসাধ্য। তাই তিনি ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠ অনুবাকে (পরিচ্ছদে) 'অসৎ' শব্দের অর্থ করলেন আকাশকুসুম তুল্য অলীক। আবার ঠিক তার পরেই সপ্তম অনুবাকে 'অসৎ' শব্দের অর্থ করলেন একমাত্র সৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ অসৎ মানে সৎ। গরজ বড় দায়, তাই অনেক সময় গায়ের জোরে ব্যাখ্যা করতে হয়।'

.

সে যাক, তবে এটুকু বলা যায় যে, ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের পরিচায়ক বলতে শুধুমাত্র চার্বাকই নয়। উপনিষদ্-এর প্রখ্যাত দার্শনিক উদ্দালক আরুণি থেকে শুরু করে বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদ, সাংখ্যর আদিরূপ, ন্যায়-বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ প্রভৃতিকেও বিশুদ্ধ বস্তুবাদ আখ্যা দেওয়া যাক আর না-ই যাক, অন্তত বস্তুবাদ ঘেঁষা দার্শনিক মত বলে গ্রহণ করার নানা কারণ আছে। চার্বাক-প্রসঙ্গে অধুনালভ্য বাস্তব তথ্য এমনই অপ্রতুল যে অন্যান্য বস্তুবাদী বা বস্তুবাদ-ঘেঁষা মতামতের সঙ্গে চার্বাক-মতের তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ সত্যিই সংকীর্ণ। তবু, দেবীপ্রসাদ বলেন,– 'এটুকু অনুমানে বোধহয় বাধা নেই যে উত্তরকালে বিশেষত ন্যায়-বৈশেষিকদের পরমাণুবাদের সমর্থনে অনেক দিক্পাল দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছিল বলেই দার্শনিক মত হিসেবে তা তুলনায় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কিন্তু, এই উৎকর্ষের খাতিরে ন্যায়-বৈশেষিকদের পক্ষে অনেকাংশে মাথা নোয়াবারও দরকার হয়েছিল; প্রসঙ্গ-বিশেষ ভাববাদের সঙ্গে কমবেশি আপোসও করতে হয়েছিল।'
অপরপক্ষে, 'চার্বাকমত উত্তরকালে দার্শনিক বিচারের দিক থেকে হয়তো সে-উৎকর্ষের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তার কারণ বোধহয় এই যে, চার্বাকপক্ষ থেকে কোথাও কোনোরকম আপোসের আভাসই পাওয়া যায় না। চার্বাকমত হিসেবে যেটুকু আমাদের কাছে টিকে আছে তা থেকে অনায়াসেই অনুমান হয় বস্তুবাদ হিসেবে তা সম্পূর্ণ আপোসহীন। ফলে দার্শনিক উৎকর্ষের দিক থেকে সুযোগ-বঞ্চিত হলেও বস্তুবাদের বৈপ্লবিক ভূমিকার দিক থেকে ভারতীয় ইতিহাসে চার্বাকমত অতুলনীয়।' (দ্রষ্টব্য : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১০৭)

শাস্ত্রবচন বলে ব্যাপারটাকেই চার্বাক স্রেফ ধোঁকাবাজি বলে ঘোষণা করে ধর্মের নামে লোকবঞ্চনা এবং শ্রেণীশোষণের পথ বন্ধ করতে চেয়েছিলো; দেহাতীত আত্মার কথা নস্যাৎ

করে পরলোক পরজন্ম– এবং তার তত্ত্বগত ভিত্তি কর্মফলবাদ– একেবারে বরবাদ করতে চেয়েছিলো। ফলে সাবেকি ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে বড় দুর্ভোগ জাতিভেদের বিরুদ্ধে অভিযানের পথ প্রদর্শন করেছিলো। প্রামাণিক লোকগাথায় তাই নির্দ্বিধ চার্বাকী ঘোষণা–

‘ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ।।’ (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
অর্থাৎ : (লোকায়তিক চার্বাকেরা বলেন) স্বর্গ বলে কিছু নেই, অপবর্গ বা মুক্তি বলেও নয়, পরলোকগামী আত্মা বলেও নয়। বর্ণাশ্রম-বিহিত ক্রিয়াকর্মও নেহাতই নিষ্ফল।

চতুর্ভূতমাত্রর তত্ত্বকে দার্শনিক উৎকর্ষের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হোক-আর-নাই-হোক, সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় ইতিহাসে চার্বাকমতের বৈপ্লবিক ভূমিকা অবশ্যই অতুলনীয়। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ইতিহাসে প্রকৃতিবিজ্ঞানের যতটা বিকাশ তারও তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে চার্বাকমতের মধ্যেই বিবিধ উপাদান পাওয়া যায়। কীভাবে? ইতঃপূর্বে চার্বাকী প্রত্যক্ষ-প্রাধান্যবাদের আলোচনায় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের আদিগ্রন্থ ‘চরক-সংহিতা’ ও ‘সুশ্রুত-সংহিতা’র কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছিলো। বর্তমান প্রসঙ্গে বস্তুবাদের সহচর হিসেবে সংক্ষিপ্তভাবে আরেকটু আলোচনা করা যেতেই পারে।

। বস্তুবাদের অন্যতম সহচর।
আয়ুর্বেদের আদি-গ্রন্থ বলতে সুপ্রাচীনকালের 'চরক-সংহিতা' ও 'সুশ্রুত-সংহিতা'। তার মধ্যে 'সুশ্রুত-সংহিতা' হলো প্রাচীন শল্যবিদ্যর আকরগ্রন্থ। উভয় গ্রন্থেই একথা স্বীকৃত যে অনেকের হাত ঘুরে– অনেকভাবে পরিবর্তিত হয়ে– গ্রন্থ দুটি শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে পৌঁছেছে। পরবর্তীকালে উভয় সংকলনের মধ্যে হাজারো বিষয় প্রক্ষিপ্ত হয়েছে– তার মধ্যে অজস্র বিষয়ের সঙ্গে আয়ুর্বেদের মূল প্রতিপাদ্যর কোনো সম্পর্ক নেই। এ-প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ বলেন, কেন এবং কীভাবে সংযোজিত হয়েছে তা নিয়ে এখনো বিস্তর গবেষণা বাকি। তবুও সংযোজিত যে হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। উভয় সংকলনের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকেই তা প্রমাণ করা সম্ভব বলেও দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন। তাই 'চরক-সংহিতা' বা 'সুশ্রুত-সংহিতা' থেকে যে-কোনো কথা উদ্ধৃত করেই তা প্রকৃত আয়ুর্বেদ সম্মত মত বলে ঘোষণা করা নিরাপদ তো নয়ই, অনেক সময় বিশেষ বিভ্রান্তিকর। সে যাক, আপাতত চার্বাক-আলোচনায় বস্তুবাদী যে নির্দেশকগুলি ইতোমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে, 'চরক-সংহিতা' এবং 'সুশ্রুত-সংহিতা'য় এগুলির পরিচয় পেলেই আয়ুর্বেদের দার্শনিক ভিত্তিকে বস্তুবাদ-সম্মত বলে স্বীকার সুযোগ থাকে।

'চরক-সংহিতা'র বক্তব্য অনুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা মূলত দু-রকম– 'দৈব-ব্যপাশ্রয় ভেষজ' এবং 'যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ভেষজ'। প্রথমটির বৈশিষ্ট্য হলো, মন্ত্র, তাগা-তাবিজ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, ইত্যাদি। মোটের উপর 'অথর্ববেদ'-এ যে চিকিৎসার নির্দেশ রয়েছে তা। কিন্তু 'চরক-সংহিতা'য় এ-জাতীয় চিকিৎসা কৌশলের গণ্ডি ছেড়ে দ্বিতীয় পদ্ধতি 'যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ভেষজে'র দিকে অগ্রসর হবার আয়োজন করেছে। এই 'যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ভেষজ' চিকিৎসা কৌশলের লক্ষণ হিসেব বলা হয়েছে–
'আহার ঔষধ দ্রব্যান্যাং যোজনা'। (চরক-সংহিতা)
অর্থাৎ : আহার ঔষধ হিসেবে দ্রব্যের ব্যবহার।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে,– 'সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বিচারমূলকভাবে দেখিয়েছেন যে 'অথর্ববেদ'-এ ওষধি বলে নানা শিকড়বাকড়ের উল্লেখ থাকলেও তা তাগা-তাবিজ হিসেবে ধারণ করারই নির্দেশ। পক্ষান্তরে 'চরক-সংহিতা'য় আহার বা ঔষধ হিসেবে সেবনাদির যে-নির্দেশ তার তালিকায় ১৬৫ রকম জীবজন্তুর রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, দুধ, মুত্র ইত্যাদি ছাড়াও প্রায় ৯১০ রকম গাছগাছড়ার ছাল-মূল-ফল প্রভৃতি নির্দিষ্ট হয়েছে। আহার বা ঔষধ হিসেবে সেবনীয় দ্রব্যের এই বিশাল তালিকা থেকে ক্ষয়রোগ প্রভৃতির নিরাময়-উদ্দেশ্যে গোমাংস জাতীয় শাস্ত্র-নিষিদ্ধ খাদ্যের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১৩৭)
অতএব, এ-বিষয়ে আর বিস্তৃততর আলোচনার সুযোগ না-থাকলেও অন্তত এটুকু মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে শ্রুতি-স্মৃতির কড়া পাহারাদারি এমনভাবে অবজ্ঞা করার নিদর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আর কোথাও খোঁজবার চেষ্টা নিষ্ফল হয়তো। বস্তুবাদী নির্দেশক

হিসেবে শাস্ত্রশাসনের শৃঙ্খলমুক্তির এটি অবশ্যই এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

বস্তুবাদী দ্বিতীয় নির্দেশক হলো ভূতবাদ বা এমনকি ভূতচৈতন্যবাদ। এ-বিষয়ে পাছে কোনো সন্দেহ থাকে তা দূর করার উদ্দেশ্যেই যেন 'চরক-সংহিতা'য় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উক্ত হয়েছে–

'সর্বং দ্রব্যং পঞ্চভৌতিকম্ অস্মিন্ অর্থে; তৎ চেতনাবৎ, অচেতনং চ'।
(চরকসংহিতা-১/২৬/১০)
অর্থাৎ : এই শাস্ত্রে (অর্থাৎ আয়ুর্বেদ-এ) সব দ্রব্যই পঞ্চভূতে গড়া; তার মধ্যে কোনোটা চেতনাযুক্ত, কোনোটা বা অচেতন।

কিন্তু চেতনাযুক্ত দ্রব্য বলতে কী বোঝায়? উত্তরে বলা হয়েছে–
'সেন্দ্রিয়ং চেতন, দ্রব্যম্; নিরিন্দ্রিম্ অচেতনম্'। (চরকসংহিতা-১/১/৪৮)
অর্থাৎ : ইন্দ্রিয়যুক্ত দ্রব্যই চেতন; অচেতন বলতে ইন্দ্রিয়হীন।

এখন তাহলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, ইন্দ্রিয়ের উপাদান বলতে আসলে কী? এ-বিষয়ে 'চরক-সংহিতা'য় বিস্তৃত আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে ইন্দ্রিয়গুলিও ভূতবস্তু দিয়ে গড়া। অতএব চেতন-পদার্থের নজির থেকেও ভূত-অতিরিক্ত কোনো কিছুর প্রমাণ হয় না। এই মতকে চার্বাকদের ভূতচৈতন্যবাদ বলতে কারো দ্বিধা থাকুক আর নাই থাকুক, অন্তত সমগোত্রীয় মত বলে অস্বীকার করা নেহাতই গায়ের জোরের ব্যাপার হবে বলে দেবীপ্রসাদ মনে করেন। আয়ুর্বেদের আকরগ্রন্থ যে ভূতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ে তাতে আরও অনেক নজির রয়েছে। আপাতত একটি নজিরই যথেষ্ট হবে। তবে–
'সুশ্রুত-সংহিতা' থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সংকলনটির রচনাকালে বেদান্ত প্রভৃতি নানা দার্শনিক মত প্রচলিত হয়েছিলো। দার্শনিক গ্রন্থ নয় বলেই এজাতীয় মতের মধ্যে কোনটি দার্শনিক বিচারের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য– এ প্রশ্ন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচনা বহির্ভূত। তবু একটি প্রশ্ন উপেক্ষা করা যায় না। বিভিন্ন দার্শনিক মতের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সীমিত উদ্দেশ্যের দিক থেকে কোন্ মতটি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বা প্রয়োজনীয়? 'সুশ্রুত-সংহিতা'য় এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর : দার্শনিক বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে যে-মতের মূল্য যাই হোক না কেন, অন্তত চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতাদর্শগত দাবির দিক থেকে বস্তুবাদই অপরিহার্য।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১৩৮)
তাই এতে বলা হয়েছে–
'ভূতেভ্যঃ হি পরং যস্মাৎ নাস্তি চিন্তা চিকিৎসিতে'। (সুশ্রুতসংহিতা-৩/১/১৭)
অর্থাৎ : যে-মতে ভূতবস্তুই পরম সত্য তা ছাড়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রয়োজনে আর কোনো চিন্তার অবকাশ নেই।

বস্তুবাদী মতাদর্শের আরেকটি নির্দেশক হলো প্রত্যক্ষ-প্রাধান্যবাদ। বলার অপেক্ষা রাখে না

যে, আয়ুর্বেদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর পদে পদেই নির্ভরতা। রোগীর প্রকৃত রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে কোন্ দ্রব্য কীভাবে ব্যবহার করলে মানবদেহে আরোগ্যাদি বিষয়ে কী প্রভাব দেখা যায়– 'চরক-সংহিতা'র দাবি অনুসারে তা সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত পরিদর্শনের পরে তবেই কোনো নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। এ-বিষয়ে দীর্ঘ মন্তব্য ব্যাখ্যা করে উপসংহার হিসেবে উক্ত হয়েছে–

'সম্যক্ উপদিশামঃ সম্যক্ পশ্যামঃ চ ইতি'। (চরকসংহিতা-৩/৩/৩৬)
অর্থাৎ : আমরা সম্যক্‌ভাবে পরিদর্শন করবো এবং তারই নির্ভরে সম্যক্ উপদেশ দেবো।

'চরক-সংহিতা'র অন্যত্র আবার প্রত্যক্ষফলকে চরম প্রমাণ ধরে উক্ত হয়েছে–

'প্রাণঃ প্রাণভৃতম্ অন্নম্ প্রত্যক্ষফল দর্শনাৎ'। (চরকসংহিতা-১/২৭/৩)
অর্থাৎ : অন্নই হচ্ছে প্রাণীদের প্রাণ, কেননা এ বিষয়ে প্রত্যক্ষফল দেখা যায়।

প্রত্যক্ষফল দর্শনের উপর আয়ুর্বেদে গুরুত্ব বোঝাবার উদ্দেশ্যে সুশ্রুতের মন্তব্য ইতঃপূর্বেও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে–

'প্রত্যক্ষলক্ষণফলাঃ প্রসিদ্ধাঃ চ স্বভাবতঃ।
নৌষধীর্হেতুভির্বিদ্বান্ পরীক্ষেত কথঞ্চন।।
সহস্রেণাপি হেতুনাং ন অন্বষ্ঠাদির্বিরেচয়েৎ।
তস্মাত্তিষ্ঠেত্তু মতিমানাগমে ন তু হেতুষু।।' (সুশ্রুতসংহিতা-১/৪১/২৩-২৪)
অর্থাৎ :
প্রত্যক্ষফলদৃষ্ট কোনো বিষয় অস্বীকার করবার উপায় নেই; প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ বিষয়কে শুধুমাত্র হেতু বা যুক্তি দিয়ে বিচার করতে যাওয়া বিদ্বানের লক্ষণ নয়। যেমন, অন্বষ্টজাতীয় ফল থেকে চোখে দেখা যায় যে আমাশয় প্রভৃতি রোগে মলরোধ হয়– কিন্তু সহস্র যুক্তি বা হেতু প্রয়োগ করেও প্রমাণ করা যাবে না যে অন্বষ্ঠ জাতীয় ফল বিরেচনের কারণ হতে পারে।

তাছাড়া, 'সুশ্রুত-সংহিতা'য় প্রত্যক্ষ-পরায়ণতার একটা নজির তার সমকালীন বিচেনায় একবাক্যে দুঃসাহসী বলা চলে। শরীরের অভ্যন্তরীণ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা অবশ্যই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বর্ণিত। কিন্তু শুধু তার উপর নির্ভর করেই শল্যবিদ্যা শেখা যায় না। তার জন্যে লাশ কাটায় হাত পাকানোও দরকার। কেননা শুধুমাত্র শব-ব্যবচ্ছেদ করেই বইতে যা লেখা আছে তার সঙ্গে নিজের হাতে লাশ কেটে স্বচক্ষে দেখে মিলিয়ে নিতে হবে। শল্যবিদ হবার এটা অনিবার্য শর্ত। এ-ছাড়া জ্ঞান নিঃসংশয় হবে কী করে?–

'তস্মাৎ নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হর্ত্রা শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যগ্ দ্রষ্টব্যঃ অঙ্গ-বিনিশ্চয়ঃ।।
প্রত্যক্ষতঃ হি যৎ দৃষ্টং শাস্ত্র-দৃষ্টং চ যৎ ভবেৎ।
সমাসতঃ তৎ উভয়ং ভূয়ঃ জ্ঞান-বিবর্ধনম্ ।।' (সুশ্রুতসংহিতা-৩/৫/৫৯-৬০)
অর্থাৎ :

‘ত্বক্ পর্যন্ত সমস্ত দেহের যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উক্ত হইয়াছে, শল্যজ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার কোন অঙ্গ বর্ণন করিতে পারা যায় না। অতএব শল্যাপহর্তা যদি নিঃসংশয় (সন্দেহরহিত) জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে একটি মৃতদেহকে শোধন করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল সম্যক্রূপে দর্শন করা তাঁহার কর্তব্য। যাহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয় এবং যাহা শাস্ত্রে দেখা যায় তদুভয়ই উভয় বিষয়ে সহজে অধিকতর জ্ঞান বর্ধন করিয়া থাকে।।’ (দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর তর্জমা। শারীরস্থান, পঞ্চম অধ্যায়)

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পৃথিবীর ইতিহাসেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের খাতিরে নিজের হাতে লাশ কাটা বলে ব্যাপারটার বিরুদ্ধে কী পরিমাণ বাধা ছিলো। সংস্কারে আটকায়, বিশেষত ধর্মসংস্কারে। আমাদের সংস্কৃতিতে তো সেটা ভয়ানক পর্যায়েই ছিলো। ধর্মশাস্ত্রের শাসন অনুসারে লাশ ছুঁলেও স্নান করতে হয়। এমনকি যে গ্রাম দিয়ে শববহন করা হয় সেই গ্রামকে গ্রামই সাময়িকভাবে অপবিত্র হয়। পবিত্রতা কীভাবে ফেরাতে হবে তারও বিধান দেয়া আছে ধর্মশাস্ত্রে। এই বদ্ধমূল সংস্কারের শেকড় যে কত গভীর ছিলো তা যতোই পিছিয়ে যাওয়া যায় ততই ভয়ানক মহাপাতকতার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। আর সুশ্রুতের সমকালীন অবস্থাটা কল্পনা করে নেয়াই সঙ্গত। সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষজ্ঞানের খাতিরে এরকম একটা নির্দেশ দেওয়া যে কী অসামান্য বুকের পাটার পরিচায়ক তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। সেদিক থেকে শাস্ত্রকারদের প্রচণ্ড চোখ-রাঙানির পরোয়া না-করে ‘সুশ্রুত-সংহিতা’ রীতিমতো বেপরোয়া মনোভাবই প্রকাশ করে বস্তুবাদী পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে ত্রুটি করেনি।

বস্তুবাদের আরেকটি নির্দেশক হলো স্বভাববাদ। এটিকে সমর্থন করা মানে প্রকারান্তরে নাস্তিকবাদেরই সমর্থন বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু ‘চরক-সংহিতা’ এবং ‘সুশ্রুত-সংহিতা’ থেকে স্বভাববাদের সমর্থনে অনেক উক্তিই উদ্ধৃতিযোগ্য। যেমন, আয়ুর্বেদমতে খাদ্যবিশেষ গুরুপাক বা লঘুপাক। কিন্তু কেন? ‘সুশ্রুত-সংহিতা’য় বলা হয়েছে, এই প্রশ্নের শুধু একটাই জবাব আছে। স্বভাব।–

‘গুরু-লাঘব-চিন্তা ইয়ং স্বভাবং ন অতিবর্ততে’। (সুশ্রুতসংহিতা-১/৪৬/৪৪৮)
অর্থাৎ : গুরুত্ব ও লঘুত্ব স্বভাবকে অতিক্রম করে না। অর্থাৎ যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, জঙ্ঘাল ও জঙ্গল পশুর মাংস কেন লঘু?– তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, স্বভাব। (দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর তর্জমা)।

‘চরক-সংহিতা’-তেও জল, লবণ, প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের বিশিষ্ট গুণাগুণের কারণ হিসেবে ‘স্বভাব’ই উল্লিখিত হয়েছে (যথা, চরকসংহিতা-১/২৭/৪)। উভয় সংহিতা থেকেই এ-জাতীয় অনেক নিদর্শন উদ্ধৃত করা যায়। যেমন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রাজ্ঞ প্রতিনিধি ভরদ্বাজ স্বীয় মত হিসেবে বলছেন–

‘ভাবহেতু স্বভবাস্তু ব্যাধীনাং পুরুষ্যস্য চ।
খর-দ্রব-চল-উষ্ণত্বং তেজঃ-অন্তানাং যথা এব হি।। (চরকসংহিতা-১/২৫/২১)

অর্থাৎ : স্বভাবই ব্যাধি এবং পুরুষের একমাত্র কারণ; যেমন (পৃথিবী থেকে শুরু করে) তেজ পর্যন্ত সমস্ত দ্রব্যের গুণ বলতে খর, দ্রব, চল, উষ্ণতা পর্যন্ত সব কিছুরই কারণ বলতে স্বভাব।

এ-প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ মন্তব্য করেন, 'পরে অবশ্য 'চরক-সংহিতার'ই একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে শাস্ত্রশাসনের প্রবক্তাদের তুষ্ট করবার আশায় ভরদ্বাজকে আস্তিক পথে আনবার দীর্ঘ প্রয়াস করা হয়েছে; কিন্তু সেই নজির থেকেই প্রমাণ হয় যে আয়ুর্বেদের এই আদি প্রবক্তাটির নিজস্ব মত বলতে ঘোর নাস্তিকতাই। তারই নমুনা এই স্বভাববাদ। কিন্তু দার্শনিক সাহিত্যে স্বভাববাদের বিশিষ্ট প্রবক্তা বলতে বস্তুবাদী চার্বাকই। এদিক থেকেও তাই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সঙ্গে বস্তুবাদের আত্মীয়তা স্বীকার করার সুযোগ থাকে।'- (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১৪১)

বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আর একটি দাবি হলো প্রমাণ প্রসঙ্গে প্রবৃত্তিসামর্থ্যবাদ। অর্থাৎ প্রমাণবস্তুটি যে প্রকৃতই জল, কোনভাবেই মরীচীকা বা অন্য কিছু নয় তার প্রমাণ হবে তৃষ্ণা মেটানোর প্রবৃত্তিসামর্থ্যতা দিয়ে। অন্যভাবে বললে, বাস্তব কর্ম জীবনে একটা কথা খাটে কিনা তা থেকেই প্রমাণ হবে কথাটা সতি কিনা। সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের আসল মাপকাঠি বলতে প্রয়োগক্ষেত্রে সাফল্য। 'চরক-সংহিতা'য় প্রায় আগাগোড়া যে এই কথা স্বীকৃত তা নিয়ে বিস্তৃত বিচারের বোধহয় দরকার পড়ে না। নেহাত নমুনা হিসেবে শুধু একটা উদ্ধৃতিই যথেষ্ট হবে বোধকরি। ডাক্তার ভালো কি মন্দ– কিংবা কতোটা ভালো তার আলোচনায় 'চরক-সংহিতা'য় বলা হয়েছে–

'স চ এব ভিষজং শ্রেষ্ঠঃ রোগেভ্যঃ যঃ প্রমেচয়েঃ।।
সম্যক্-প্রয়োগং সর্বেষাং সিদ্ধিঃ আখ্যাতি কর্মণাম্ ।
সিদ্ধিঃ আখ্যাতি সর্বৈঃ চ গুণৈঃ যুক্তং ভিষক্তমম্ ।।' (চরকসংহিতা-১/১/১৩৪-৫)

অর্থাৎ : রোগ বাস্তবিকই সারাতে পারলেন কিনা তা থেকেই বোঝা যাবে ডাক্তার আর তার ডাক্তারি বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব কতোটুকু। কর্মপ্রয়োগের মাধ্যমে কর্মজীবনে সাফল্য থেকেই বোঝা যায়, ডাক্তার কতোটা বিদ্যা ও গুণ সম্পন্ন।

তাহলে চার্বাকের প্রতি তাচ্ছিল্য যত চালুই হোক-না-কেন, মতটা যে সত্যিই তুচ্ছ নয় তা আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের বস্তুবাদী দৃষ্টান্তগুলি থেকেই অনুমান করা অসম্ভব নয়। বোঝাই যায়, দীর্ঘদিন ধরে তার একটা বিকৃত মত প্রচারের চেষ্টা সত্ত্বেও চার্বাকের মূল দাবিগুলিই প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত ভিত্তির উপাদান। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিশেষ প্রতিশ্রুতি আয়ুর্বেদের আদি রূপটিতে– যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ভেষজে। তারই কিছু নমুনা থেকে চার্বাকের বিশিষ্ট দাবিগুলির পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা জানি যে, চার্বাকের বিরুদ্ধে অধ্যাত্মবাদীদের প্রবল বিদ্বেষের প্রধান কারণ শাস্ত্রের শাসন একেবারে নস্যাৎ করবার আয়োজন। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রধানতম ভিত্তি আত্মা,

পরকাল, কর্মফল, এবং এই প্রসঙ্গেই শ্রাদ্ধাদি রকমারি ক্রিয়াকর্ম। চার্বাকমতে এ সবই ভণ্ড-ধূর্ত চোরদের আবিষ্কার। উদ্দেশ্য হলো, এই সব রকমারি মিথ্যে কথা দিয়ে সাধারণের মনে অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সৃষ্টি এবং সে-বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারলে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ কিছু কামিয়ে নেওয়া যায়। যারা এ-ধরনের কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে ধর্মশাস্ত্রকারদের আক্রোশটা বোঝা কঠিন নয়। অবশ্য শাস্ত্র-বিরোধের খাতিরে বেশ কিছু দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করাও দরকার। প্রধানত চার্বাক পক্ষ থেকেই সে-প্রয়াসও হয়েছিলো।

কিন্তু সেই মতেরই সারাংশ মানলে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের– যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ভেষজের– অবস্থাটা কী হবে? মোটের ওপর একই রকম হওয়ার কথা। এবং তা হয়েছিলোও। এ-প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ বলছেন–
'যজুর্বেদ' থেকে শুরু করে মনুস্মৃতির টীকাভাষ্যকার কুল্লুকভট্ট ও মেধাতিথির রচনায় চিকিৎসক ও শল্যবিদদের বিরুদ্ধে অজস্র বিষোদ্গার! চার্বাকদর্শনের মতো আয়ুর্বেদে অবশ্যই শাস্ত্রশাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো জেহাদ নেই; দরকারও ছিল না। কিন্তু যে-মূল দার্শনিক তত্ত্ব মানলে শাস্ত্রশাসনকে অবজ্ঞা না-করে উপায় নেই তারই উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই অন্তত পরোক্ষভাবে শাস্ত্রশাসন উপেক্ষিত হতে বাধ্য। আয়ুর্বেদের বিরুদ্ধে ধর্মশাসকদের কটূক্তির অন্তত একটা বড় কারণ এইদিক থেকে অনুমানের সুযোগ থাকে।
এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ করতে প্রলোভন হয়। আধুনিক বিদ্বানদের বিচারে 'ঋগ্বেদ'-এর প্রাচীনতর অংশে বর্ণাশ্রম সমাজের নজির নেই। চিকিৎসা-বিজ্ঞান বা শল্যবিদ্যার বিরুদ্ধেও নয়। পক্ষান্তরে চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী বলে অশ্বিদ্বয় বা নাসত্যদ্বয়ের প্রশংসায় 'ঋগ্বেদ' মুখর। কিন্তু 'যজুর্বেদ'-এর যুগে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সেই সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি ঘৃণাও। ফলে, পৃথিবীর ইতিহাসে যা আর কোথাও চোখে পড়ে না, এমনকি প্রাচীন অশ্বিদ্বয় দেবতা হলেও তাদের জাত গেল! অশ্বিদ্বয় প্রসঙ্গে 'যজুর্বেদ'-এ ঘোষিতহলো : 'অপূতৌ বা ইমৌ'– দেবতা দুটি অপবিত্র। কিন্তু হঠাৎ অপবিত্র হয়ে গেল কেন? যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে : 'মনুষ্যচরৌ ভিষজৌ ইতি'।... সোজা কথায়, চিকিৎসা-প্রসঙ্গে দেবদ্বয় ইতরজনের সঙ্গে বড় বেশি মাখামাখি করেছে!'-
(ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১৪৩)

অতএব সেই সাধারণ লোক বা ইতরজনের কথায় ফিরে আসতে হলো। তাদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই চার্বাকমত লোকায়ত নামেও প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রকারদের চোখে এদের সঙ্গে মেশামেশিটা বড় ভালো ব্যাপার নয়; তার ফলে এমনকি প্রসিদ্ধ দেবতাদেরও জাত যাবার ভয়। এ-হেন শাস্ত্রশাসনের ভয়েই কি ইতর জনগণের সহজাত ধ্যানধারণার পরিচায়ক লোকায়ত দর্শনের বিরুদ্ধে এতো বিষোদ্গার? কথাটা মানতে গেলে আরো স্বীকার করতে হবে যে সাধারণভাবে দার্শনিক মহলেও শাস্ত্রশাসনের আতঙ্কটা বড় কম ছিলো না। দেবীপ্রসাদের মতে, বিষয়টা বুঝতে হলে সংকীর্ণ অর্থে দর্শন ছেড়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়। সেক্ষেত্রে সমাজ-শাসনের ধর্মীয় সংবিধানরূপ 'মনুস্মৃতি'র বর্ণবাদী বিধানগুলি

স্মরণ করলেই এর রূপরেখাটা স্পষ্ট হয়ে যাবে আশা করি।

কেন চার্বাক পাঠ প্রাসঙ্গিক ?
রণদীপম বসু
...
একটা পর্যায় থেকে, মানব সভ্যতার ইতিহাস আসলে ধর্মেরই ইতিহাস। সম্ভবত কথাটা বলেছিলেন দার্শনিক ম্যাক্স মুলার, যিনি প্রাচীন ভারতীয় দর্শন তথা বৈদিক সাহিত্য বা সংস্কৃতিরও একজন অনুসন্ধিৎসু বিদ্বান হিসেবে খ্যাতিমান। তবে যে-ই বলে থাকুন না কেন, সভ্যতার এক দুর্দান্ত বিন্দুতে দাঁড়িয়েও উক্তিটির রেশ এখনো যেভাবে আমাদের সমাজ সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে খুব দৃশ্যমানভাবেই বহমান, তাতে করে এর সত্যতা একবিন্দুও হ্রাস পায় নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা অনেক বেশিই প্রকট থেকে প্রকটতরই হচ্ছে বলে মনে হয়।

বর্তমান বিশ্বে এমন কোন সভ্যতার উন্মেষ এখনো ঘটেনি যেখানে মানুষের জন্ম মৃত্যু বিবাহ উৎসব উদযাপন তথা প্রাত্যহিক জীবনাচরণের একান্ত খণ্ড খণ্ড মুহূর্তগুলো কোন না কোন ধর্মীয় কাঠামো বা অনুশাসনের বাইরে সংঘটিত হবার নিরপেক্ষ কোন সুযোগ পেয়েছে আদৌ। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, গোষ্ঠির সাথে গোষ্ঠির, সমাজের সাথে সমাজের ইত্যাদি পারস্পরিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতগুলো এখনো ধর্মকেন্দ্রিকতার বাইরে একচুলও ভূমিকা রাখতে পারে নি বলেই মনে হয়। এমন কি মানুষ হিসেবে আমাদের ব্যক্তি বা সামাজিক পরিচয়ের অন্তঃস্থ চলকগুলোও নিরেট ধর্মীয় পরিচয়েই মোড়ানো। একেবারে বহিরঙ্গের পরিচ্ছদে যে যেই রঙের আঁচড়ই লাগাই না কেন, এই আলগা পোশাকের ভেতরের নিজস্ব যতœশীল শরীরটা যে আসলেই কোন না কোন ধর্মীয় ছকের একান্তই অনুগত বাধক হয়ে আছে তা কি আর স্বীকার না করার কোন কারণ সৃষ্টি করতে পেরেছে ? অন্তত এখন পর্যন্ত যে পারে নি তা বলা যায়। আর পারে নি বলেই আরো অসংখ্য না-পারার ক্ষত আর ক্ষতিয়ানে বোঝাই হতে হতে আমরা ব্যক্তিক সামাজিক ও জাতিগতভাবেও একটা ঘূর্ণায়মাণ বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে পড়ছি কেবল, বাইরের সীমাহীন সম্ভাবনায় পা রাখতে পারছি না সহজে। এবং একই কারণে আমাদের সমাজ-সংগঠন-চিন্তা বা দর্শনের জগতটাও অসহায়ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা স্থবিঢ় ও অনতিক্রম্য বিন্দুতে। বাড়ছে না আমাদের বৃত্তাবদ্ধতার আয়তন বা সংগঠিত করা যাচ্ছে না কোন সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডও। এবং আমাদের বৃহত্তর সমাজ-মানসের বিজ্ঞান-চেতনাও দুঃখজনকভাবে থেকে যাচ্ছে শূন্যের কোঠায়। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে ? কেনইবা এই অচলায়তন ভাঙা সম্ভব হচ্ছে না ?

প্রশ্নের আকার যতো শীর্ণই হোক না কেন, ভাবগত অর্থে এতো বিশাল একটা প্রশ্নকে সামনে রেখে কোন একরৈখিক আলোচনা যে আদৌ কোন মীমাংসা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যে একান্তই অকার্যকর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে আলোচনার কান ধরে টান দিলে হয়তো এমন অনেক প্রাসঙ্গিক প্রশ্নও সামনে চলে আসার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যাবে না, যেগুলোর যথাযথ উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যেই কোন না কোন সমাধানের বীজ

লুকিয়ে থাকতে পারে। সে বিবেচনায় একেবারে নিশ্চুপ থাকার চেয়ে কিঞ্চিৎ হল্লাচিল্লা করায় সম্ভাব্য সুবিধা রয়েছে বৈ কি। এই কাজটুকুই প্রথম শুরু করেছিলেন লোকায়তিক চার্বাকেরা।

সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতির বহুমাত্রিক স্রোতে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে মানুষের লিঙ্গীয় অবস্থান বা আরও খোলাশা করে বললে সামগ্রিক জনগোষ্ঠির অর্ধাংশ জুড়ে যে নারী- তাঁর ভূমিকা, কার্যকর প্রভাব ও অবস্থান চিহ্নিত করতে গেলে অনিবার্যভাবেই প্রচলিত ধর্ম ও অনিরপেক্ষ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গটি অনায়াসে সামনে চলে আসে। কেননা নারীকে কোন্ উপজীব্যতায় বিবেচনা ও মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে তা দিয়েই প্রচলিত ধর্মগুলোর বাইরের মোহন চেহারার আড়ালে ভেতরের প্রকৃত চেহারাটা সহজেই বুঝে ফেলা যায়। আর অনিরপেক্ষ বলা হচ্ছে এজন্যেই যে, মোহন মাদকতায় আক্রান্ত আমাদের ধর্মীয় চেতনদৃষ্টি যে প্রকৃতপক্ষেই লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক ও সুস্পষ্টভাবেই পুরুষতান্ত্রিক পরম্পরায় গড়ে ওঠা তা আর অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই যুক্তিশীল মনে প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক, আমাদের যুক্তিরহিত আবেগের এই অন্ধ স্রোত আর বিকল চেতনার প্রশ্নহীন আনুগত্য- যে অচলায়তনে এমন হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে, কী এমন জাদুর কাঠি রয়েছে ওই ধর্মতত্ত্বের পেছনে ? যুক্তিহীন কিছু অচল প্রাচীনত্ব ছাড়া আদৌ কি আছে কিছু ? এটাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন চার্বাকেরা।

খুব মোটা দাগে দেখলে, ধর্মের দুটো দিক। একটি তার ভেতরগত দর্শন, অন্যটি বহিঃরঙ্গের নীতিশাস্ত্র। এই দুয়ের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে যাবতীয় ধর্মীয় অনুশাসন ও প্রয়োগিক সিদ্ধান্তগুলো। এবং এই অনুশাসনমূলক আচার কাঠামোর বৃত্তে ঢুকে পড়ে আচরিত সমাজদেহের বাইরের চেহারাটা শেষপর্যন্ত সেভাবেই সেজে ওঠে, ভেতরের দর্শন তাকে যেভাবে সাজায়। এটাই মানব-সভ্যতায় আরোপিত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি, যা অখণ্ড মানব-সংস্কৃতির আবহমান নিরপেক্ষ ধারাটিকে কালক্রমে খণ্ডিত ও গ্রাস করে এক অমোচনীয় পরিচয়-সংকটে ফেলে দেয়। মানুষের অখণ্ড পরিচয় ছিটকে পড়ে খণ্ডিত ধর্মীয় পরিচয়ে। তাই ধর্মীয় সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস হলো মানুষের খণ্ডিত হবারই ইতিহাস, মানবতার অবনমনের ইতিহাস এবং অমানবিক আধিপত্যবাদেরও ইতিহাস। বস্তুত এটাই মানব-সমাজের আদি মৌল ইতিহাস। যা মানবিক অধঃপতনের কলঙ্কময় দলিল হয়ে গেঁথে আছে প্রচলিত ধর্মগ্রন্থগুলোর পাতায় পাতায় অবশ্য-পালনীয় ধর্মীয় অনুশাসনের মোড়কে। যুগে যুগে এই মোড়কের অদল-বদলটুকু হয়েছে কেবল, পাল্টায়নি তার ভেতরের অন্ধ দর্শনটা একটুও। স্বভাবে প্রভাবে অবিকৃতই থেকে গেছে তা। 'মনুস্মৃতি'র অনুশাসনগুলি সেকথাই মনে করিয়ে দেয়। এবং তখনই আরো জোরো-সোরে সেই প্রয়োজনটাই মনে করিয়ে দেয়, কেন চার্বাক পাঠ আজ খুব প্রাসঙ্গিক।

ইতোমধ্যেই আমরা অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছি যে চার্বাক কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম নয়।

চার্বাক একটি পরম্পরা। যার মূল চেতনা উপ্ত আছে সেই সুপ্রাচীন কোনো লোকায়ত চিন্তা-চেতনা-অভিজ্ঞতার গভীরে। যাঁরা কোন প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাসী না হয়ে হয়েছিলেন মুক্ত-চিন্তার দিশারী। কেন তাঁরা প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাসী হতে পারেননি এটুকু মনে হয় আবার নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। কেননা বর্তমান গ্রন্থটির পটভূমিই তো তাই। কান ধরে টান দিলে যেমন মাথাটিও এগিয়ে আসে, তেমনি চার্বাককে পাঠ করতে গেলেই টান পড়ে যায় চার্বাকেতর অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মাথায়ও। আর এ-কারণেই কেন দর্শন পাঠ জরুরি না বলে বলা হচ্ছে কেন চার্বাক পাঠ প্রাসঙ্গিক।

কী এবং কেন?Ñ এই দুটি প্রশ্নকে যদি তুলনা করা হয় দর্শনের দুটি চোখ হিসেবে, তবে চার্বাক হচ্ছেন তাঁরাই, যাঁরা কোন কিছুকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার আগে যাঁরা নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করতে জানতেনÑ কেন এরকম হবে, ওরকম নয় কেন? এবং সাধারণ কান্ডজ্ঞান ব্যবহার করে যাঁরা স্বাভাবিক অর্থেই জগতকে দেখেছেন এক প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে বস্তুগত অর্থে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মানদন্ডে। যাবতীয় বিষয়কে যাঁরা প্রত্যক্ষ-প্রাধান্যের কষ্টিতে ঘষে যাচাই করে নিতে সদা প্রস্তুত ছিলেন। কেননা প্রাকৃতিক স্বতঃস্ফূর্ততার বাইরে যা-কিছু রহস্যময়তা, সেখানে থেকে যায় কল্পনার আতিশয্যের সমূহ সুযোগ। আর তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে যতোসব কুপ্তক-প্রবঞ্চক গোষ্ঠির যাবতীয় ছল-চাতুরির অবকাশ। এই অবকাশকে ঘিরে ছলা-কলার মাধ্যমে সহজ সরল অজ্ঞ জনগোষ্ঠিকে মোহগ্রস্ত করে গড়ে উঠে এমন এক পরজীবী ব্যবসায়িক শ্রেণী যাদের উপজীব্য কেবলই মানুষকে ঠকিয়ে নিজের ফায়দা তোলা। সেক্ষেত্রে ধর্ম নামের এক অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের পুঁজিই যে এই প্রতারকদের জন্য হয়ে উঠেছিলো সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম, সেটি খুব সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন চার্বাকেরা। কীভাবে? সেই সাধারণ কান্ডজ্ঞান ব্যবহার করেই, যা প্রতিটি মানুষই সহজাতভাবে পেয়ে থাকে। এই কান্ডজ্ঞান আর কিছুই নয়, লোকব্যবহার-কৃত অতি সাধারণ কিছু বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গি। যা আমরা প্রতিনিয়তই ব্যবহার করে থাকি। তাই কোন কিছু প্রশ্নহীন বিশ্বাসে গ্রহণ করার আগে যে অন্তত নিজেদের কল্যাণেই সাধারণ যুক্তি বা কান্ডজ্ঞান ব্যবহার করা আবশ্যক, অন্তত এটুকু উপলব্ধির জন্যেও চার্বাক পাঠ আজ খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

চার্বাকেরা তাঁদের স্বাভাবিক কান্ডজ্ঞান দিয়েই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ধর্ম। আর মানুষের জন্য ধর্ম হতে হলে সেটা হতে হবে মানবীয় ধর্ম, যেখানে মানুষের প্রয়োজনে মানুষই হবে প্রধান ও মুখ্য। কিন্তু মানুষকে ছাপিয়ে ধর্মই যেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না, হয়ে যায় অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত ক্রিড়নক কিছু বস্তুপিন্ডের মতো। আর তার নিয়ন্ত্রক হয় শাস্ত্র নামের অনড় কিছু অলৌকিক বিধান-গ্রন্থ। কিন্তু বস্তুগত কোন কিছুই যে কোন অলৌকিক শূন্য থেকে সৃষ্টি হতে পারে না, সেটাও মুক্ত-মনা চার্বাকদের সাধারণ যুক্তিতে-বুদ্ধিতে-বিচারে-বিশ্লেষণে বুঝতে কষ্ট হয়নি। সেগুলি যে কোন-না-মানুষেরই সৃষ্টি এবং তাকে অপৌরুষেয় বলে চালিয়ে দেয়ার মধ্যে কিছু

স্বার্থবাদী প্রবঞ্চক গোষ্ঠিরই প্রচারণা কার্যকর সেটাও প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন চার্বাকেরা। আর এর জন্যে যে স্বাভাবিক কান্ডজ্ঞানের বাইরে কূট-তার্কিক হবারও প্রয়োজন হয় না, তাও হাতে-নাতে দেখাতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে যখন বর্তমান প্রচলিত বিজ্ঞান অর্থে বিশেষায়িত কোন শাস্ত্রের জন্মই হয়নি তখনো প্রকৃতিলব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কোনকিছুর ব্যাখ্যার প্রয়োজনে সাধারণ যুক্তি-বোধ প্রয়োগের প্রবক্তরা যা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন, এই আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অকল্পনীয় উৎকর্ষের যুগে এসেও যদি কল্পনাপ্রসূত অবাস্তব বিষয়ে সেই তাঁদের উত্তরসূরী হয়ে আমাদের যাঁদের সাধারণ কান্ডজ্ঞানটুকুই প্রশ্নহীন স্তব্ধতায় নিথর হয়ে থাকে এবং প্রকারান্তরে আমাদের মানস-জগতের ক্রিয়া-কান্ড ভূতের মতো পিছন-পা হয়ে হাঁটতে থাকে, তাহলে বলতেই হয়, আমাদের মানসিক বিকাশ এই হাজার বছরেও বুঝি এক কদমও এগোয়নি। বরং সময়ের সাপেক্ষে ভাবলে বলতে হয় পিছিয়েই যাচ্ছে কেবল। সেক্ষেত্রে আমাদের যথাযথ মানবিক ও চেতনাগত মুক্ত-বিকাশের সমর্থনে মানসিক পুষ্টি সরবরাহের দায়িত্বটা ফের চার্বাক-পাঠের প্রাসঙ্গিকতার ঘাড়েই অর্পণ করতে হবে। অন্তত নিজেকে যাচাই করবার প্রয়োজনে হলেও।

লোকায়ত-চার্বাক হচ্ছে মানব-বিশ্বের প্রাচীনতম জড়বাদী দর্শন। নিজেদের সমকালীন জ্ঞানস্তরের সাপেক্ষে যুক্তির শাণিত অস্ত্রে তাঁরা তাঁদের যথাসাধ্য শক্তিতে আঘাত করেছিলেন অতীন্দ্রিয় ভাববাদী বিশ্বাসগুলির সন্ধিতে সন্ধিতে। নিজেদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেই প্রতিপক্ষ হিসেবে সমবেত অধ্যাত্মবাদী গোষ্ঠিগুলির অবিরাম আঘাতও ঠেকিয়ে গেছেন কোন আপোষের মধ্যে না গিয়েই। এই অনমনীয় শক্তিটাই হলো চার্বাক-দর্শনের যুক্তিবাস্তবতা। যা আজও বিজ্ঞানমনস্ক মুক্তচিন্তকদের অপরিমেয় অনুপ্রেরণার উৎস।
চার্বাকদের নিজস্ব সাহিত্য আজ বিলুপ্ত ঠিকই। ফলে তাঁদের নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ অবিকৃত অবয়ব কেমন ছিলো আমাদের জানার সুযোগ নেই। কিন্তু তাঁরা অধ্যাত্মবাদী দর্শনবিশ্বাসে যে আঘাতগুলি করেছিলেন, অধ্যাত্মবাদী দর্শন-সাহিত্যে সেই আঘাতের চিহ্নগুলি অনুসন্ধান করে করে চার্বাক দর্শনের মোটামুটি একটা রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন আধুনিককালের বিদ্বান গবেষকেরা। তাঁদের এই মহতি প্রচেষ্টার যথাসাধ্য পূর্ণ সহায়তা নিয়েই এই গ্রন্থেও চেষ্টা করা হয়েছে চার্বাক-দর্শনের একটা সম্ভাব্য অবয়ব তৈরির। পুন পুন পাঠের মধ্য দিয়ে এই অবয়বটা আরো স্পষ্টতর করে নিজেদেরকে প্রয়োজনীয় যুক্তিশীল করে পুনঃনির্মাণ করে নেয়ার মধ্যেই আসলে নিহিত রয়েছে চার্বাক-পাঠের প্রকৃত প্রাসঙ্গিকতা।

অলীকতাময় ভাববাদের অবাস্তবতায় গড়া কল্পরঙের পর্দাটা সরিয়ে যদি আমরা 'যে বস্তুটি প্রকৃত যা' সেটি সেভাবে দেখতে সমর্থ হই, তবেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির যথাযোগ্য স্বচ্ছতা ফিরে পেতে পারি। এবং তবেই আমরা যতো সব জাল-জালিয়াতির কুঞ্চক থাবা থেকেও নিজেদের মুক্ত করে একটা অনন্ত সম্ভাবনাময় আগামীর যাত্রী হতে পারি। আমাদের যুক্তিশীল বিজ্ঞানদৃষ্টিই পারে আমাদেরকে পেছন-দৃষ্টি থেকে ফিরিয়ে সামনে তাকাতে সাহায্য

করতে। অপার সম্ভাবনার উৎস হিসেবেও প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষ নিজেকে চিনতে পারবে তখন। চার্বাক আমাদেরকে সেই পাঠই দেয়ার চেষ্টা করেছে তাঁর সাধ্য অনুযায়ী। চার্বাক-পাঠের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে সেই যুক্তিবোধের উপলব্ধি জেগে উঠবে, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে আমাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের বহমান দৃষ্টি-স্বচ্ছতা, এটুকু আশা নিশ্চয় করতেই পারি। মানুষই তো মানুষের জন্যে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করার স্বপ্ন দেখতে পারে। আমরাও পারি একে অন্যের আস্থাবান কাঁধে হাত রেখে এমন এক বৌদ্ধিক আগামীর স্বপ্ন দেখতে যেখানে 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির সাম্যতায় অনাবশ্যক অন্ধতা ঝেড়ে ফেলে অযৌক্তিক সংস্কারের উর্ধ্বে নিজেদের অধিষ্ঠিত করা কি অসম্ভব কিছু? নিশ্চয়ই তা নয়।

...

৩.০ : ঈশ্বরবাদ

ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে নিশ্চয়ই ঈশ্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ। তাই ঈশ্বরবাদের ভূমিকা প্রসঙ্গেও কিছু আলোচনা আবশ্যক বলে মনে হয়। কেননা সাধারণ প্রবণতায় আস্তিকতার সঙ্গে সেশ্বরবাদকে অঙ্গাঙ্গীভাবে অনেকেই যুক্ত করে দেখেন এবং নাস্তিকদের একাত্ম করেন নিরীশ্বরবাদীদের সঙ্গে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেশ্বরবাদ ভারতীয় দর্শনে আস্তিকতার আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে কখনোই গণ্য হয়নি। লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে সনাতনপন্থীদের বিচারে বেদের প্রতি আনুগত্যই আস্তিকতার প্রধান মানদণ্ড হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে। আর তাই বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্বাক দর্শনের 'নাস্তিক' সংজ্ঞা হয়েছে এই মানদণ্ডেরই অনুসরণে; ঈশ্বরের প্রতি ঔদাসীন্য বা ঈশ্বরবিরোধিতাকে কেন্দ্র করে নয়। সে-কারণে ভারতীয় বহু দর্শন আস্তিক হলেও সেশ্বর হতে বাধ্য হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের প্রতি ঔদাসীন্য ভারতীয় দর্শনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন জাগতিক সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের রহস্য উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছে মূলত কর্মফলবাদের মাধ্যমে। সব ক্ষেত্রে কর্মবাদের সঙ্গে ঈশ্বরকে যুক্ত করা হয়নি। যেমন বিজ্ঞানভিক্ষুর সাংখ্যপ্রবচনসূত্র তথা সাংখ্য মতে কর্মফলবাদের সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণার কোন সঙ্গতি নেই। আর মীমাংসা-মতে মীমাংসকাচার্য কুমারিল ভট্টও তাঁর শ্লোকবার্তিক গ্রন্থের সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার-এ কর্ম এবং ঈশ্বরেচ্ছা উভয়কে জগৎসৃষ্টির মূলে একত্র যুক্ত করতে অনিচ্ছুক। বৌদ্ধ দর্শনে তো ঈশ্বরের কোন স্থানই নেই। আর বেদানুগ হওয়ার ফলে মীমাংসা দর্শন বৈদিক দেবদেবীসমূহকে তার বিষয়বস্তুর পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করেছে বটে, যদিও সেখানে নামসর্বস্বতা ছাড়া কোন দেবমহিমার কোন উপস্থিতি চোখে পড়ে না; কিন্তু ঈশ্বরকে এখানেও কোন প্রবেশাধিকার দেয়নি। মীমাংসার আদিগ্রন্থ জৈমিনির মীমাংসাসূত্রেই ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নেই। বরং মীমাংসক আচার্য প্রভাকর এবং কুমারিল ভট্ট ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমর্থনে প্রদত্ত বিভিন্ন দার্শনিকদের যুক্তির বিরোধিতা করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অসার্থকতা প্রমাণ করার যে অভূতপূর্ব চেষ্টা করেছেন, যুক্তিনিষ্ঠতায় ভারতীয় দর্শনেই তা প্রায় বিরল বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে মীমাংসা-দর্শনে বিস্তারিত আলোচিত হলেও প্রসঙ্গ বিবেচনায় বর্তমান আলোচনার শেষে তার কিছু নমুনা-দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হবে।

নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসেবে মীমাংসা দর্শন নিরীশ্বরবাদী হলেও পরবর্তীকালে মীমাংসকেরা হয়তো মানবমনের অন্তর্নিহিত ভগবৎ বিশ্বাসের কাছে নতি স্বীকার করেছেন এবং দার্শনিক যুক্তির বন্ধনে মীমাংসা দর্শনকে সেশ্বরবাদের সঙ্গে যুক্ত করার এক বিশেষ প্রয়াস এঁদের মধ্যে সুপরিস্ফুট। এরকম প্রয়াসেরই পূর্ণ রূপায়নের পরিচয় বহন করে বেদান্ত দেশিকের 'সেশ্বর মীমাংসা' নামক গ্রন্থটি। এই নামেই বলে দেয় প্রকৃত বা আদি মীমাংসা-দর্শন কোনভাবেই সেশ্বর নয়।

অন্যদিকে ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন সাধারণভাবে সেশ্বরবাদ হিসেবে গণ্য হলেও প্রাথমিক

পর্যায়ে ঈশ্বরের প্রতি একই ধরনের ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছে। ন্যায়সূত্রের স্থানবিশেষে ঈশ্বরের এক সাধারণ উল্লেখ থাকলেও ঈশ্বরবাদের পক্ষে সূত্রকার গৌতমের কী জাতীয় সমর্থন ছিলো তা বলা কঠিন। কেননা ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে–

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাফল্যদর্শনাৎ। (ন্যায়সূত্র-৪/১/১৯)।।
অর্থাৎ : কর্মফলমুক্ত পুরুষই ঈশ্বর। (মুক্ততর্জমা)

অতি স্বাভাবিকভাবেই কয়েকজন নৈয়ায়িক ব্যাখ্যাকার এই সূত্রগুলিতে গৌতমের নিজস্ব সিদ্ধান্তের বদলে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় বিশেষ মতবাদের সমালোচনা আবিষ্কার করেছেন। নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য, বাচস্পতি মিশ্র এবং বর্ধমানের মতে সূত্রটিতে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সূত্রকারের নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত হয়নি, বেদান্ত মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে সূত্রটি এখানে উপস্থাপিত। সূত্রকারের এই ক্রটি সংশোধনের চেষ্টাই হয়তো ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্যের বক্তব্য–

‘গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ’। (ন্যায়ভাষ্য-৪/১/২১)
অর্থাৎ : গুণবিশিষ্ট (পরম) আত্মাই ঈশ্বর। (মুক্ততর্জমা)

উদয়নাচার্য (ন্যায়কুসুমাঞ্জলি), উদ্দ্যোতকর (ন্যায়বার্তিক) প্রমুখ পরবর্তী নৈয়ায়িকেরা স্পষ্টভাবেই সেশ্বর সংজ্ঞার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করেছেন। একইভাবে কণাদের বৈশেষিকসূত্রের মধ্যেও ঈশ্বরের উল্লেখ নেই। যদিও বৈশেষিক দর্শনের পরবর্তী আচার্যদের প্রচেষ্টায় অবশ্য এই শাস্ত্র সেশ্বরবাদের তালিকায় নিজের নামকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর ন্যায়-বৈশেষিক অনুসারী আচার্য অন্নংভট্টের স্পষ্ট ঘোষণা–

‘তত্র ঈশ্বরঃ সর্বজ্ঞঃ পরমাত্মা এক এব’। (তর্কসংগ্রহ)।
অর্থাৎ : নিত্য পরমাত্মা বা ঈশ্বর এক ও সর্বজ্ঞ।

এবং তর্কসংগ্রহদীপিকা টীকায় অন্নংভট্ট বলেন–

‘নিত্যজ্ঞানাধিকরণত্বং ঈশ্বরত্বম’। (তর্কসংগ্রহদীপিকা)।
অর্থাৎ : পরমাত্মা বা ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানের অধিকরণ বা আশ্রয়।

অন্যদিকে আমরা জানি যে, আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদীদের সভার পুরোভাগে আপন স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। যুক্তিবাদের সমর্থক এই দর্শনের আচার্যরা ঈশ্বরীয় শক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার বা ঈশ্বরকে দার্শনিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে আদি স্থান দেবার পক্ষে যুক্তির কোন সমর্থন খুঁজে পাননি। যেমন সাংখ্যকারিকায় দেখা যায়–

বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য।। (সাংখ্যকারিকা-৫৭)
অর্থাৎ : যেমন বাছুরের বৃদ্ধির জন্য অচেতন দুধের (গাভীর স্তন থেকে নিঃসৃত হবার) প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ পুরুষের মুক্তির জন্য অচেতন প্রধানেরও (সৃষ্টির) প্রবৃত্তি হয়ে থাকে।
.

তস্মাত্তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্ ।
গুণকর্ত্তৃত্বেহপি তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ।। (সাংখ্যকারিকা-২০)
অর্থাৎ : সেইহেতু, পুরুষের সংযোগবশত অচেতন মহদাদি চেতনার মতো মনে হয় এবং ত্রিগুণের কর্তৃত্ববশত উদাসীন পুরুষ কর্তার মতো প্রতিভাত হন।
.
পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃত সর্গঃ।। (সাংখ্যকারিকা-২১)
অর্থাৎ : পুরুষের মুক্তির জন্য এবং প্রধানের (তথা মূলপ্রকৃতির) ভোগের জন্য পঙ্গু ও অন্ধের মতো উভয়ের (অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির) সংযোগ হয়। (পুরুষ ও প্রকৃতির) সংযোগবশত মহদাদি ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি হয়।

সাংখ্যদর্শনের অন্যান্য গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বিতর্ক ঈশ্বরের প্রসঙ্গে দর্শনটির একই মনোভাবেরই সাক্ষ্য দেয়। আবার সাধারণের কাছে সাংখ্যের সমান্তর দর্শন যোগদর্শনের পরিচিতি সেশ্বর-সাংখ্য হিসেবে। কারণ বিভিন্ন তত্ত্বের স্বীকৃতিতে উভয় দর্শনের সাম্য থাকলেও ঈশ্বরের স্বীকৃতি প্রসঙ্গ একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করেছে। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু 'পুরুষবিশেষ' রূপে ঈশ্বরের কল্পনা সাংখ্য বা যোগের দার্শনিক কাঠামোতে নেহাতই খাপছাড়া বলে বিদ্বজ্জনেরা মনে করেন। কারণ, সাংখ্য-যোগমতে আদি তত্ত্বের অন্যতম পুরুষ সংখ্যায় বহু হয়েও গুণগত পার্থক্যের কোন অপেক্ষা রাখে না। যেমন পতঞ্জলির যোগসূত্রে বলা হয়েছে–
ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঈশ্বরঃ। (যোগসূত্র-১/২৪)।।
তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্ । (যোগসূত্র-১/২৫)।।
অর্থাৎ : যে পরমপুরুষকে ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং আশয় অধীন করতে পারে না, যিনি সর্বাত্মা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তিনিই ঈশ্বর। (যোগসূত্র-১/২৪)।। যিনি ঈশ্বর, তিনি সর্বজ্ঞ। তাঁতে নিরতিশয় সর্বজ্ঞত্ব-বীজ নিহিত আছে। (যোগসূত্র-১/২৫)।।

'এইভাবে অনধিকার প্রবেশকারী ঈশ্বরকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যাখ্যাকারেরা নানাভাবে সচেষ্ট হলেও ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্তি যোগদর্শনের তাত্ত্বিক বিন্যাসের সঙ্গে পরিপূর্ণ সঙ্গতি রাখতে কোনক্রমে সক্ষম হয়নি।'- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৬২)। অদ্বৈত-বেদান্তমতের প্রবর্তক শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (শাঙ্করভাষ্য-২/২/৩৭) যোগদর্শনের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণার অসঙ্গতির উল্লেখ করেছেন।

তাছাড়া দুটো দর্শনের ভিন্নতা সত্ত্বেও দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে সাংখ্য ও যোগ প্রায় অভিন্ন হওয়ায় সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রকৃত বেদপন্থী দার্শনিকেরা যে বিবেচনায় নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যকে একান্তভাবেই বেদ-বিরোধী বলে চিহ্নিত করেন, সেই একই বিবেচনায় যোগকেও তাই বেদ-পন্থী বলে স্বীকার করার খুব সুযোগ থাকে না। এবং তা যে ছিলোও না, দার্শনিক

সাহিত্যে এর নমুনা বিরল নয়। ব্রহ্মবাদী দার্শনিক বাদরায়ণ তাঁর ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বেদ বা শ্রুতি-বিরোধী সাংখ্যমত খণ্ডনের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় সাংখ্য-খণ্ডনের ফলে যে যোগ-দর্শনও খণ্ডিত হয় তা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে একটি সূত্র রচনা করেছিলেন-

‘এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।। (ব্রহ্মসূত্র : ২/১/৩)
অর্থাৎ : এর দ্বারা যোগদর্শনকেও খণ্ডন করা হলো।

এই সূত্রটির ভাষ্যে প্রখ্যাত অদ্বৈতবাদী বেদান্ত দার্শনিক শংকারাচার্যের বক্তব্য প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতটিও প্রাসঙ্গিক–
‘তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহদাদীনি চ কার্যানি অ-লোকবেদ প্রসিদ্ধানি কল্পান্তে’। অর্থাৎ, যোগদর্শনেও শ্রুতি বিরুদ্ধ– বস্তুত লোকপ্রসিদ্ধি বিরুদ্ধ এবং বেদ-বিরুদ্ধও– প্রধান বা প্রকৃতির এবং প্রধানোৎপন্ন মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির (সাংখ্যসম্মত) উপদেশ আছে। এই কারণেই যোগের প্রত্যাখ্যান প্রয়োজন। শংকর প্রশ্ন তুলেছেন, সাংখ্য-প্রত্যাখ্যানের ফলে যোগও যদি প্রত্যাখ্যাত হয় তা হলে এই অতিদেশ-সূত্রটির অবতারণা কেন? উত্তরে তিনি বলছেন, প্রয়োজন এই যে শ্রুতিতে সম্যক-দর্শনের-উদ্ভব-উপায় হিসেবে– অর্থাৎ সাধনপদ্ধতি অর্থে– যোগের প্রশংসা আছে; কিন্তু তা থেকেই কেউ যেন কল্পনা না করেন যে যোগের দার্শনিক তত্ত্বও শ্রুতি-সমর্থিত। প্রসঙ্গত, যোগদর্শনের বেদ-বিরুদ্ধতা বিষয়ে শংকরের সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্ত দার্শনিক রামানুজ সম্পূর্ণ একমত। যোগ-দর্শন স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যাখ্যান করবার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি স্পষ্টই ‘অবৈদিকত্বাৎ’ শব্দ ব্যবহার করেছেন।– (ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-২৬)।

সাংখ্য ও যোগদর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক যে অনেক গভীর তা কেউ অস্বীকার করেন না। যেমন ভগবদ্গীতায়ও বলা হয়েছে–

‘যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।’- (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৫/৫)
অর্থাৎ : সাংখ্য যার অধিগম্য, যোগও তার অধিগম্য। সাংখ্য ও যোগের ফল একই মোক্ষ বলে উভয়কে যিনি অভিন্ন দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী, সম্যক্ জ্ঞানী।

তবে তত্ত্বগত বিচারে উভয় দর্শনের ঐক্য সত্ত্বেও সাংখ্যের উপযোগিতা যেখানে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, যোগদর্শনের উপযোগিতা সেখানে প্রধানত ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্র করে।
যে দর্শন কেবল তত্ত্ব-নিদিধ্যাসন এবং বৈরাগ্য-অভাসের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারে বিশ্বাসী, তাকে সাংখ্য এবং যে দর্শন তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ ক্রিয়ার সাহায্যে আত্মসাক্ষাৎকারে বিশ্বাসী, তাকে যোগ বলা হয়। সাংখ্য বর্ণিত পুরুষতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, জগৎ পরিণাম, সৎকার্যবাদ এবং মোক্ষ এসব যোগসম্মত। তবে কৈবল্যলাভের উপায় সম্পর্কে

যোগ দর্শনে সাংখ্যের অতিরিক্ত কিছু নির্দেশ আছে। সাংখ্যদর্শনে বিবেকজ্ঞানকেই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং কৈবল্যলাভের উপায় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে যোগ দর্শনে বিবেকজ্ঞান লাভ ও কৈবল্য প্রাপ্তির জন্য অতিরিক্ত কিছু প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াগুলিকে এককথায় 'যোগ' বলা হয়।

ভারতীয় দর্শনে ব্যবহারিক উপযোগিতা একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। তাই অন্যান্য ভারতীয় দর্শনগুলি একই সংজ্ঞার মাধ্যমে দর্শনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক এই উভয় দিককে পরিস্ফুট করতে সচেষ্ট। অন্যদিকে সাংখ্য-যোগের মধ্যে এই প্রয়াস দুটি সুনির্দিষ্ট দর্শন পদ্ধতির সৃষ্টি করেছে। দুই সম্প্রদায়ের ভিত্তি এক হলেও এদের ব্যবহারিক প্রয়োগ ভিন্ন। যে তাত্ত্বিক মতবাদ সাংখ্যদর্শনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় রূপায়িত, সেই মতবাদেরই পটভূমিকায় মোক্ষপথের যাত্রীকে যোগদর্শন তার অভীষ্ট পথের সন্ধান দিয়েছে সুসংহত উপায়ের নির্দেশনায়। প্রকৃষ্ট জ্ঞান হিসেবে সাংখ্যের এবং শ্রেষ্ঠ বল হিসেবে যোগের যে প্রশংসা মহাভারতে (শান্তিপর্ব, মহাভারত-১২/৩০০-৩০১) দেখা যায় তা নিশ্চয়ই উভয় শাস্ত্রের পারস্পরিক ভেদেরই ইঙ্গিত বহন করে। তাই মোক্ষশাস্ত্রেও বলা হয়–

'নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্'।
অর্থাৎ : সাংখ্যতত্ত্বের তুল্য জ্ঞান নেই, যোগের তুল্য বল বা শক্তি নেই।

তাত্ত্বিকভাবে খাপছাড়া মনে হলেও যোগদর্শনে ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্তি যে এই ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তারই ভিত্তিতে, একটু তলিয়ে দেখলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে। মোক্ষ বা আত্মস্বরূপ উপলব্ধির প্রধানতম উপায় হিসেবে যোগ চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপর প্রাধান্য অর্পণ করেছে। যেমন–

'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'।- (যোগসূত্র-১/২)
অর্থাৎ : চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ।

এবং–

'বিষয়সম্বন্ধাৎ চিত্তস্য পরিণাম-বিশেষা বৃত্তয়ঃ'।- (যোগসূত্র)
অর্থাৎ : বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়ার ফলে চিত্তের যে বিষয়াকারে পরিণতি, তাই চিত্তের বৃত্তি।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিত্তের বহির্মুখী চিত্তকে সূক্ষ্মাভিমুখী করে এবং সূক্ষ্ম থেকে ক্রমে সূক্ষ্মতর বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়ে পরিণামে চিত্তকে আত্মতত্ত্বে বিলীন করার মাধ্যমেই জীবের পরমার্থপ্রাপ্তি সম্ভব বলে যোগদর্শনের অভিমত। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঙ্গযুক্ত যে ক্রিয়াপদ্ধতির বিধান যোগে আছে 'সমাধি' তার অন্তিম এবং প্রধানতম পর্যায়। যেমন–

'সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিতস্য সমাধিপরিণামঃ'। (যোগসূত্র-৩/১১)
অর্থাৎ : নানা বস্তু সম্বন্ধীয় নানা প্রকার মনোবৃত্তির নিবৃত্তি হলে যে এক পরমবস্তু বিষয়ক পরমাবৃত্তি উদিত হয়, তা-ই সমাধি-পরিণাম।

সমাধির সার্থক রূপায়ন নির্ভর করে অব্যবহিত পূর্ববর্তী অপর দুটি যোগাঙ্গ ‘ধ্যান’ এবং ‘ধারণা’র যথার্থ অনুশীলনের উপর। ‘ধ্যান’ চিত্তের একাগ্রতা এবং ‘ধারণা’ একাগ্র চিত্তের বিশেষ এক বিষয়ে অভিনিবেশের অর্থে ব্যবহৃত। যেমন–

‘দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা’- (যোগসূত্র : ৩/১)
‘তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্’- (যোগসূত্র : ৩/২)
অর্থাৎ : চিত্তকে কোন দেশে (নাড়ীচক্রে, ভ্রূমধ্যে, নাসাগ্রে অথবা কোন দিব্যমূর্তিতে) আবদ্ধ বা সংস্থিত রাখাকেই বলা হয় ধারণা (যোগসূত্র-৩/১)।। ধারণাতে প্রত্যয় বা জ্ঞানবৃত্তির স্থির আলম্বন বা একতানতাকেই ধ্যান বলে। (যোগসূত্র-৩/২)।।

ধারণা ও ধ্যানের মধ্যে পার্থক্য হলো, ধ্যান অবিচ্ছিন্ন আর ধারণা বিচ্ছিন্ন। একই বিষয় সম্পর্কে চিন্তা হলেও ধারণার ক্ষেত্রে খণ্ড খণ্ড জ্ঞানের উদ্ভব হয়, আর ধ্যানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিষয় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহের মতো চলতে থাকে। ধারণার প্রত্যয়কে বিন্দু বিন্দু জল বা তেলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অন্যদিকে ধ্যানের প্রত্যয় হলো অবিচ্ছিন্ন জলধারা বা তৈলধারার ন্যায়। ধ্যানশক্তির বলে সাধক যে কোন বিষয় অবলম্বন করে ধ্যান করতে পারেন। এই ধ্যান এবং ধারণাযুক্ত চিত্ত পরিণামে সমাধিলাভে সমর্থ হয়; এ অবস্থায় একাগ্র চিত্তের বিশেষ ধারণা অপর সব কিছুকে আত্মসাৎ করে এককভাবে বিরাজ করে।–

যথাভিমতধ্যানাৎ বা। (যোগসূত্র-১/৩৯)।।
তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ। (যোগসূত্র : ৩/৩)।।
অর্থাৎ : নিজের অভিমত যে কোন দিব্যবস্তু ধ্যান করো না কেন, তার প্রভাবে অবশ্যই একাগ্রশক্তি প্রবল হবে (যোগসূত্র-১/৩৯)।। ধ্যান যখন ধ্যেয়ের স্বভাবের আবেশে জ্ঞানাত্মক স্বভাবশূন্য হয় তখন তাকে সমাধি বলা হয়। (যোগসূত্র-৩/৩)।।

যোগশাস্ত্রে ধারণার বিষয় হিসেবে ঈশ্বরের বিশেষ কোন রূপের উপযোগিতা অনস্বীকার্য এবং যোগসূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানকে সমাধিলাভের এক প্রকৃষ্ট উপায় হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যেমন–

‘সমাধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ’। (যোগসূত্র-২/৪৫)
অর্থাৎ : ঈশ্বর প্রণিধান বা ভগবানে চিত্ত নিবেশ দ্বারা সমাধি হয়।

কিন্তু প্রকৃষ্ট হলেও ঈশ্বরপ্রণিধান সমাধিপথের যাত্রীদের অবশ্য অনুসরণীয় হিসেবে নির্দেশিত হয়নি। কারণ যোগের তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে ঈশ্বরের আবশ্যিক কোন যোগ নেই। ধ্যানশক্তির বলে সাধক যে কোন বিষয় অবলম্বন করেই ধ্যান করতে পারেন। পাতঞ্জলসূত্রে বলা হয়েছে–

‘যথাভিমতধ্যানাৎ বা।’- (যোগসূত্র-১/৩৯)
‘ত্রয়মেকত্র সংযমঃ’। (যোগসূত্র-৩/৪)

‘তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ’। (যোগসূত্র-৩/৫)
অর্থাৎ :
নিজের অভিমত যে কোন দিব্যবস্তু ধ্যান করো না কেন, তার প্রভাবে অবশ্যই একাগ্রশক্তি প্রবল হবে। (পাতঞ্জল-১/৩৯)।। পার্থিব কিংবা অপার্থিব কোন বস্তুতে বা বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির যে সন্মিলিত প্রয়োগ, তারই এক নাম সংযম। (পাতঞ্জল-৩/৪)।। সংযম আয়ত্ত হলে দিব্যজ্ঞানময়ী পরমাবুদ্ধি স্ফূরিত হয়। সেই বুদ্ধিপ্রভাবে অসম্ভব সম্ভব হয়। অসাধ্য সাধ্য হয়। তার প্রভাবে করা যায় না এমন কার্য নেই। (পাতঞ্জল-৩/৫)।।

তাই হয়তো একাগ্র চিত্তের চরম পরিণতি সমাধির লক্ষ্যের সহায়ক হিসেবেই ঐশ্বরিক রূপে ভাবনার উপযোগিতায় ঈশ্বরপ্রণিধানকে সমাধির অন্যতম সাধন বলে যোগসূত্রের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে এভাবে–
‘ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা।’- (যোগসূত্র-১/২৩)
অর্থাৎ : শুদ্ধভক্তি সহকারে ঈশ্বরের অর্চনা করলেও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অধিকারী হওয়া যায় (পাতঞ্জল-১/২৩)।

এবং এই উপযোগিতারই স্বীকৃতি দেখা যায় সমাধির প্রস্তুতি হিসেবে উপস্থাপিত বিভিন্ন যোগাঙ্গের অন্যতম নিয়মের মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধানের অন্তর্ভুক্তিতে। যেমন–
‘তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।’- (যোগসূত্র-২/১)
‘স সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ।’- (যোগসূত্র-২/২)
অর্থাৎ :
তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধানকেই ক্রিয়াযোগ বলা হয় (পাতঞ্জল-২/১)। ঐ ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান অভ্যাস করতে করতে নানাপ্রকার ক্লেশের ক্ষয় হতে থাকে এবং তার সাথে সাথে সমাধির অনুকূলশক্তিও বৃদ্ধি হতে থাকে (পাতঞ্জল-২/২)।

অন্যান্য বিভিন্ন নিয়মের অভ্যাসের মতো ঈশ্বরপ্রণিধানের অভ্যাসও যে যোগীকে তার লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে যোগদর্শনের আচার্যরা তা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের এই ব্যবহারিক উপযোগিতার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হননি। বস্তুতপক্ষে–
‘তাত্ত্বিক বিচারের দ্বারপথে দার্শনিক মতবাদের রাজ্যে ঈশ্বরের প্রবেশ কষ্টসাধ্য। তৎসত্ত্বেও মানুষের সহজ ধর্মবিশ্বাস স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তারই ভিত্তিতে ভারতের দর্শন বহুক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেছে। প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক মতবাদ এবং ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা কোনদিন সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ প্রাথমিক পর্যায়ে নিরীশ্বরবাদী হলেও ব্যাখ্যাকারদের ধর্মীয় মতবাদের প্রভাবে পরিণামে সেশ্বরবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। ন্যায় ও

বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্য এবং টীকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভাষ্যকারদের মধ্যে অনেকেই শৈব সম্প্রদায় ভুক্ত। ফলে উভয় দর্শনেই ঈশ্বর ক্রমশঃ তাঁর আসন নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। নিরীশ্বরবাদী হিসাবে সুপরিচিত সাংখ্যদর্শনও বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে একাত্ম হয়ে মহাভারত এবং ভাগবতপুরাণে সেশ্বরবাদে রূপান্তর লাভ করেছে। মহাভারত ও পুরাণাদিতে অভিব্যক্ত সাংখ্যমত অবশ্য এই দর্শনের যুক্তিবাদী রূপ সম্পূর্ণ লুপ্ত এবং সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মমতের দার্শনিক ভিত্তি হিসাবে এই মতে বর্ণনা করা যায়।’- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৬৪)।

এবং পরবর্তী যুগের ভাষ্যকার সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু এই ধর্মবিশ্বাসেরই প্রভাবে সাংখ্যদর্শনকে সেশ্বরবাদ হিসেবে প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সাংখ্যের নিজস্ব দার্শনিক কাঠামো যে ঈশ্বরকে স্বীকার করার পথে প্রধান বাধা প্রসঙ্গক্রমে তারও উল্লেখ বিজ্ঞানভিক্ষুর রচনায় (সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, ভূমিকা) দৃষ্ট হয়। যেমন–
‘ঈশ্বরব্যবস্থাপনস্য স্বশাস্ত্রেহনুপযোগাৎ’। (বিজ্ঞানামৃতভাষ্য, পৃ-১২৯)
অর্থাৎ : ঈশ্বর স্বীকৃতির ব্যবস্থা এই শাস্ত্রের পক্ষে অনুপযোগী। (মুক্ততর্জমা)
আর তাই হয়তো সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের ভূমিকায় ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু স্বয়ং স্বঘোষিত দায়িত্ব নিয়ে আরো বললেন–
‘কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞান-সুধাকরম্ ।
কলাবশিষ্টং ভূয়োহপি পুরয়িষ্যে বচোহমৃতৈঃ।। (সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)
অর্থাৎ : সাংখ্যশাস্ত্র কালসূর্যের গ্রাসে পতিত হয়েছে এবং তার কলামাত্রই অবশিষ্ট আছে ; আমি অমৃতবাক্যের দ্বারা তা পূরণ করবো।

সেশ্বরবাদের অবদানের প্রসঙ্গে এটা স্পষ্ট যে ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র কতিপয় মতবাদের সমষ্টিই নয়, ব্যবহারিক উপযোগিতাকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় দর্শনের সার্থকতা। আর যে ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারপথে এই ঈশ্বর ভারতীয় দর্শনে প্রবেশ লাভ করেছেন সেই বিশ্বাস যুক্তি বা অনুমানের সঙ্গে সমানভাবেই ভারতীয় দার্শনিক জগতে প্রমাণ হিসেবে গণ্য এবং প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ঋষি এবং কথিত সত্যদ্রষ্টাদের উক্তিতে বিশ্বাসের রূপ নিয়ে ‘শব্দ’ বা ‘শ্রুতি’ এই প্রমাণের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। যুক্তির মাধ্যমে যার বিচার হয় না সেই ধর্মচেতনা ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেহেতু বেদান্তদর্শনে এই ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব অপরিসীম, তাই সেশ্বরবাদের সঙ্গে বেদান্তের একাত্মতা খুব সহজ পদ্ধতিতেই দেখা যায়। মোটকথা ঈশ্বরের সঙ্গে বেদান্তের সহজ, স্বাভাবিক সম্পর্কের মূল অনুসন্ধান করতে হয় ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে দর্শনটির এই অঙ্গাঙ্গী-যোগের মধ্যে।

অন্যদিকে ‘নিরীশ্বর বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনও ব্যবহারিক পর্যায়ে সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে একাত্ম করে ভারতের অন্য আস্তিক দর্শনগুলির মতই সেশ্বরবাদের রূপ নিয়ে ধর্মমতে পরিণতি লাভ করেছে। বুদ্ধদেব এবং জৈন তীর্থঙ্করেরা ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকলেও পরবর্তী অনুগামীরা ক্রমে নিজ নিজ ধর্মমার্গের প্রবর্তকদের মধ্যেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করতে থাকেন। আর এইভাবে তাঁরা সাধারণ ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি বিধানে প্রয়াসী হন। বৌদ্ধ এবং জৈন মতবাদ দর্শনের পর্যায় থেকে পরিপূর্ণ ধর্মমতে রূপান্তর লাভ করে এবং বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীদের আপন গণ্ডীতে ক্রমশঃ আত্মসাৎ করতে আরম্ভ করে।'- (লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, পৃষ্ঠা-৬৬)।

অতএব, পরিশেষে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আত্মা, জন্মান্তর, কর্মফল, অদৃষ্ট, মোক্ষ, ঈশ্বর, শ্রুতি এবং অনুমান প্রমাণ ইত্যাদি ধারণার উৎসগুলিই আসলে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের উর্বর কল্পক্ষেত্রটিকে বহুবিচিত্রভাবে পল্লবিত করেছে। সাধারণ জনজীবনে সার্বিকভাবে এর পরবর্তী প্রভাবও নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য। এবং সেগুলিই যদি প্রতিরোধের নিমিত্তে প্রতিরোধাত্মক চার্বাকী মতের উত্থানের চূড়ান্ত কারণ হয়ে থাকে তবে সে সম্ভাবনাকেও নিশ্চয়ই উড়িয়ে দেয়া যাবে না। তবে ওই আলোচনায় যাবার আগে ইতঃপূর্বে যে বিষয়টি দৃষ্টান্তের অপেক্ষায় অসম্পূর্ণ থেকে গেছে সেদিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক।

আগেই বলা হয়েছে মীমাংসকরা নিরীশ্বরবাদী। এবং সে-প্রেক্ষিতে মীমাংসক শবরস্বামী, আচার্য প্রভাকর মিশ্র এবং কুমারিল ভট্ট ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমর্থনে প্রদত্ত বিভিন্ন দার্শনিকদের যুক্তির বিরোধিতা করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অসার্থকতা প্রমাণ করার যে অভূতপূর্ব চেষ্টা করেছেন, যুক্তিনিষ্টতায় ভারতীয় দর্শনেই তা প্রায় বিরল। কীভাবে?